বাংলাদেশে নারী মুক্তির ক্ষেত্রে জেন্ডার ও ধর্মের অবস্থান ঃ একটি বিশ্লেষণ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধীনে পিএইচডি ডিগ্রী অর্জনের শর্তপূরণের জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

তত্বাবধায়ক
ড.খন্দকার নাদিরা পারভীন
অধ্যাপক, রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা

গবেষক
রওশন আরা বেগম
রেজিষ্ট্রেশন নং ৬৫/ ২০১০-১১
রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে নারী মুক্তির ক্ষেত্রে জেন্ডার ও ধর্মের অবস্থান ঃ একটি বিশ্লেষণ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধীনে পিএইচডি ডিগ্রী অর্জনের শর্তপূরণের জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

তত্বাবধায়ক
ড.খন্দকার নাদিরা পারভীন
অধ্যাপক, রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা

গবেষক
রওশনআরা বেগম
রেজিষ্ট্রেশন নং ৬৫/ ২০১০-১১
রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা

২৫ আগষ্ট ২০১৫

প্রত্যয়ন পত্র

আমি এই মর্মে প্রত্যয়ন করছি যে, **বাংলাদেশে নারী মুক্তির ক্ষেত্রে জেন্ডার ও ধর্মের অবস্থান - একটি বিশ্লেষণ -** শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের পিএইচডি ডিগ্রীর গবেষক রওশনআরা বেগম কর্তৃক আমার সরাসরি তত্বাবধানে প্রস্তুত একটি মৌলিক গবেষণা কর্ম। আমার তত্বাবধান এবং নির্দেশনা ক্রমে যথাযথ গবেষণার মাধ্যমে পিএইচডি ডিগ্রীর জন্য এটি প্রণীত হয়েছে। আমার জানা মতে, ইতিপূর্বে এই শিরোনামে কোথাও এবং অন্য কোন ভাষায় পিএইচডি ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে কোন গবেষণা কর্ম সম্পাদিত হয়নি। গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আদ্যান্ত পর্যালোচনায়, আমার নিকট গৃহীত কার্যক্রম জমা দেওয়ার জন্য যথার্থ প্রতীয়মান হয়েছে।

আমি এটি গ্রহণ করছি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে জমা দেওয়ার জন্য সুপারিশ করছি।

ড. খন্দকার নাদিরা পারভীন

তারিখ ঃ ২৫ আগষ্ট ২০১৫

অধ্যাপক, রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা

ঘোষণা পত্র

আমি এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, **বাংলাদেশে নারী মুক্তির ক্ষেত্রে জেন্ডার ও ধর্মের অবস্থান - একটি বিশ্লেষণ** – শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি একটি মৌলিক গবেষণা। ড.খন্দকার নাদিরা পারভীন, প্রফেসর, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, এর প্রত্যক্ষ তত্বাবধানে এটি সম্পন্ন হয়েছে।

এই মৌলিক গবেষণা কর্মটি যথাযথ গবেষণার মাধ্যমে পিএইচডি ডিগ্রীর জন্য প্রণীত হয়েছে। ইতিপূর্বে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে অথবা কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ডিগ্রী বা ডিপ্লোমা লাভ করা বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে উপস্থাপিত হয়নি। প্রকাশিত অন্য কোন গ্রন্থ থেকে কোন সহযোগিতা কিংবা কোন তথ্য নেয়া হ'লে তা রেফারেন্স হিসেবে সংযোজন করা হয়েছে।

তারিখ ঃ ২৫ আগষ্ট ২০১৫

রওশন আরা বেগম, পিএইচ.ডি গবেষক
রেজিষ্ট্রেশন নং ৬৫, শিক্ষাবর্ষ ঃ ২০১০ -১১
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা

গ্রন্থস্বত্ব ©রওশন আরা বেগম, ২০১৫
গবেষণা গ্রন্থের সকল স্বত্ব সংরক্ষিত। লেখকের পূর্ব অনুমতি ব্যতিরেকে এই থিসিসের কোন তথ্য অন্য কোন কাজে গ্রহণ, মুদ্রন বা প্রকাশ, ফটোকপি, রেকর্ড করা যাবেনা। এর কোন তথ্য বা কোটেশন তার পূর্ব লিখিত অনুমোদন ব্যতিরেকে প্রকাশ করা যাবেনা।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

সকল প্রশংসা মহান স্রষ্টা পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র। যিনি আমাকে তাঁর সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব 'মানুষ' হিসেবে সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর অনুকুলে দায়িত্ব পালনের নিমিত্তে প্রেরণ করেছেন এই পৃথিবীতে। তিনি তাঁর সৃষ্ট জীবকে পৃথিবীতে আনয়নের জন্য জন্মদাত্রীর মহান এক দায়িত্ব দিয়েছেন নারী জাতিকে এবং তারই পরিপ্রেক্ষিতে নারীজাতিকে দিয়েছেন **'মা'** এর বিশেষ সম্মান এবং মর্যাদা। তিনি আমাকে সেই সত্য অনুভব করে এই গবেষণার তওফিক দিয়েছেন। আমার এই কর্ম-সাধনা মহান আল্লাহর দয়ায় শেষ করতে পেরেছি। তারই প্রেক্ষিতে পরম দয়ালু মহান স্রষ্টা আল্লাহ্‌পাকের নিকট আমি প্রতিনিয়তই শোকর আদায় করছি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ থেকে পিএইচ.ডি ডিগ্রীর পরিপূরক **'বাংলাদেশে নারী মুক্তির লক্ষ্যে জেন্ডার ও ধর্মের অবস্থান - একটি বিশ্লেষণ'** বিষয়ক গবেষণা কার্যক্রম সমাপ্তিতে যাঁরা আমাকে সাহায্য সহযোগিতা করেছেন তাঁদের সকলের কাছেই আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

সবার আগে যাঁর নাম উল্লেখ করতে হয় তিনি অধ্যাপক ড.ইউ.এ.বি.রাজিয়া আক্তার বানু। তাঁর উৎসাহেই আমি গবেষণার জন্য এই বিষয়টি গ্রহণে উদ্বুদ্ধ হই এবং গবেষণার প্রস্তাব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে জমা দিই। তিনি ইতিমধ্যে আকস্মিক ভাবে মৃত্যু বরণ করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তাঁর প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। আমি তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি।

সে সময়েই রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগ থেকে আমার তত্বাবধায়ক হিসেবে নির্ধারণ করে দেওয়া হয় **প্রফেসর ড.খন্দকার নাদিরা পারভীনকে**। তিনি গবেষণার বিষয়টি অত্যন্ত উৎসাহের সাথে গ্রহণ করেন। সর্বক্ষণ সাহায্য - সহযোগিতা, আদেশ - নির্দেশ, উৎসাহ-উদ্দীপনা এবং মূল্যবান সব উপদেশ প্রদান করে তিনি আমাকে আন্তরিক ভাবে সহযোগিতা করেছেন। প্রতিটি বিষয় নিয়ে তাঁর সাথে আলোচনা করে আমি অগ্রসর হয়েছি। গ্রন্থের প্রতিটি অধ্যায় খুঁটিয়ে দেখে দিয়ে যে সহযোগিতা তিনি আমাকে করেছেন তা অতুলনীয়। এই গবেষণা কর্ম পরিচালনার ক্ষেত্রে বিষয়গত এবং তত্বগত ও ধারণাগত পরামর্শ ও মতামত দিয়ে আমাকে সবচেয়ে বেশী কৃতার্থ করেছেন তিনি। যা গবেষণা কার্যক্রম এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং গবেষণাটি সমাপ্ত করার ক্ষেত্রে প্রচুর সহায়ক হয়েছে। তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশই সব নয়, আমি তাঁর কাছে ঋণীই হয়ে রইলাম।

পেপার প্রেজেনটেশনের সময় বিভিন্ন তথ্য উপাত্ব প্রদানের মাধ্যমে রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগের বিভাগীয় প্রধান সহ সকল বিভাগীয় শিক্ষক গণের সহযোগিতার জন্য আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি এই বিভাগের অন্যান্য পিএইচ.ডি গবেষকদের নিকটও।

গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয়, সমাজ কল্যান, আইন ও বিচার বিভাগ, স্থানীয় সরকার বিভাগ, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর থেকে বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত সংগ্রহের ক্ষেত্রে এতদসংশ্লিষ্ট বেশ কয়েকজন কর্মকর্তা, কর্মচারীদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। বিশেষভাবে মহিলা অধিদপ্তরের অতিরিক্ত পরিচালক শামীমা হক (যুগ্ম সচিব), আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ - উম্মে কুলসুম, পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয় এর Director (P&O) কাজী আনারকলি (উপসচিব), মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের যুগ্ম সচিব - লায়লা জেসমিন, মহিলা মন্ত্রনালয়ের 'প্লাউ' ইউনিটের সিনিয়র সহকারী প্রধান - নূরুন্নাহার বেগম সহ সকলের নিকট আমাকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহে সহযোগিতা করার জন্য আমি বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ । কৃতজ্ঞ আমি দেশব্যাপী কর্মরত জেলা এবং উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তাগণের নিকটও। যারা দেশের জেলা এবং উপজেলা থেকে বিদ্যমান তথ্য উপাত্ত সরবরাহ করে, একই

সাথে নিজেদের এবং দেশব্যাপী মসজিদের ঈমাম সাহেবগণের এবং নির্যাতনের শিকার ভিকটিমদের সাক্ষাৎকার গ্রহণের বিষয়ে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করেছেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীতে অধ্যয়নের সময় প্রয়োজনীয় পুস্তকাদি সরবরাহ করে সহযোগীতা করার জন্য লাইব্রেরীতে কর্মরত উপগ্রন্থাগারিক মনোয়ারা বেগম, শাহীন আক্তার এবং সিনিয়র গ্রন্থাগার সহকারী রীনা রানী সরকার গণের কাছেও আমি কৃতজ্ঞ।

কৃতজ্ঞতার শেষ নেই আমার জীবন সাথী মোস্তফা কামালের নিকট। যাঁর অপরিসীম ধৈর্য এবং সহানুভূতি ব্যতীত এ গবেষণা শেষ করা সম্ভব হতোনা।

কৃতজ্ঞ আমি কানাডায় অবস্থানরত আলবার্টা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি গবেষণারত আমার পুত্র সৈকত আর পুত্র বধূ তানীর নিকট। প্রতিদিন স্কাইপিতে বসলে আমার থিসিসের বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা এবং থিসিসের বিষয় সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন গ্রন্থের বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা এবং কোন কোন গ্রন্থের সংশ্লিষ্ট অংশ Internet এর মাধ্যমে প্রেরণ পূর্বক প্রচুর সহযোগিতা করার জন্য। তাদের পাঠানো Great women of Islam (who were given the good news of Paradise) by Mahmood Ahmed Ghadanfar, translated by Jamila Muhammed Quwi গ্রন্থখানি আমাকে গবেষণার তথ্য উপাত্তের যথার্থতা নির্ণয়ে যথেষ্ট সহায়ক হয়েছে।

আইনজীবিগণের এবং এনজিওতে কর্মরত কর্মকর্তাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করার জন্য আমার ছোট বোন আইনজীবি সুফিয়া আক্তার হেলেন এবং এনজিওতে কর্মরত সালমা নাসরিন মুন গণের নিকটও আমি কৃতজ্ঞ। আমার ভ্রাতুস্পুত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সানীর নিকট আমি বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ। ইন্টারনেট থেকে তথ্য সংগ্রহ, সেসব তথ্য থিসিসে বিভিন্ন ছকাকারে ব্যবহারের ক্ষেত্রে তার সহযোগিতা আমার সহায় হয়েছে অনেক।

স্মরণ করছি মা ও বাবাকে। যাঁদের অনুপ্রেরণায় গবেষণা উপযোগী মানসিকতা জন্ম নিয়েছে আমার মধ্যে। বাবা আমাকে লেখা-লেখি এবং অনুসন্ধান মূলক কাজে উৎসাহ দিতেন আর মা দিয়েছেন সঠিক ভাবে ধর্মকে পর্যালোচনা করে সঠিক অর্থে ধর্মকে বুঝে চলার দিক নির্দেশনা। তাঁদের সেই উৎসাহ উদ্দীপনা মনের গভীরে বিদ্যমান ছিল ও আছে। তাই ধর্মের মূল বিষয়গুলো অনুসন্ধান করে নারীদের উদ্দেশ্যে ধর্মের মৌলিক বিষয় চিহ্নিত করে নারী মুক্তির ক্ষেত্রে ধর্ম যে একটি মৌলিক বিষয় তা নির্ণয়ের প্রচেষ্টা আমার বর্তমান গবেষণার মূল লক্ষ্য হয়েছে। আমার সাধনার উৎস আমার উৎসাহ উদ্দীপনা এবং সফলতার মূল আমার মা ও বাবার কাছে অপরিসীম কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি এবং আমি মহান আল্লাহ্পাকের কাছে তাঁদের আত্মার শান্তি এবং মাগফেরাত কামনা করছি।

রওশন আরা বেগম, পিএইচ.ডি গবেষক
রেজিস্ট্রেশন নং৬৫, শিক্ষাবর্ষ ঃ ২০১০ -১১
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা

সারসংক্ষেপ

'বাংলাদেশে নারী মুক্তির ক্ষেত্রে জেন্ডার ও ধর্মের অবস্থান - একটি বিশ্লেষণ' – শিরোনামের গবেষণা কার্যক্রমটি আমার পিএইচডি ডিগ্রীর গবেষণা সন্দর্ভ। গবেষণার প্রধান লক্ষ্য হলো- বাংলাদেশে বিভিন্ন অত্যাচার, নির্যাতন অসম্মান এবং অমর্যাদা থেকে নারী জাতির মুক্তির লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক উদ্যোগ, জেন্ডার ইস্যুর ব্যাপক কার্যক্রম সত্বেও কার্যকর অর্থে কেন নারী মুক্তি ঘটছেনা তার কারণ অনুসন্ধান করা। সে কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে লক্ষ্যনীয় হয়েছে যে, ধর্মপ্রিয় বাংলাদেশের জনগণ মূলতঃ ধর্মের অপব্যাখ্যা এবং কুসংস্কারে পরিবেষ্টিত হয়ে আছে। এই অপব্যাখ্যা এবং কুসংস্কারের অধিকাংশই নারীজাতিকে ঘিরে। যার কারণে দীর্ঘ সময় ধরে নারীজাতি বিদ্যমান রয়েছে একটি অসম্মান এবং অমর্যাদাকর অবস্থানে। তার পরিধি এতই ব্যাপক যে, পুরুষ সমাজের মধ্যকার কেহ কেহ নারী - নির্যাতনকে তাদের ধর্মীয় অধিকার হিসেবে বিবেচনা করে আসছেন। যদিও ধর্মের মৌলিক আদর্শে নারী জাতির সম্মান এবং মর্যাদার বিষয়টি গুরুত্ব পেয়ে আছে। এ বিষয়টি বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর জানা না থাকার কারণে একই সাথে জেন্ডার ইস্যুর মধ্যে ধর্মকে পর্যালোচনার কোন ব্যবস্থা না থাকার কারণে, বাংলাদেশে সত্যিকার অর্থে নারী মুক্তি পুরোপুরি বাস্তবায়িত হচ্ছেনা। সে লক্ষ্যে বর্তমান গবেষণায় ধর্ম এবং জেন্ডার ইস্যুর সাথে সমন্বয় সাধনের প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।

গবেষণার শুরুতে গবেষণার যৌক্তিকতা, তাৎপর্য ও প্রয়োজনীয়তা, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য,পদ্ধতি, সীমাবদ্ধতা এবং সংগঠন ইত্যদির উপর বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। অতঃপর নারী মুক্তি সংক্রান্ত বিষয়টি কি এবং কেন তা বিশ্লেষন করা হয়েছে। যেহেতু পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ইত্যাদি বিভিন্ন ভাবেই নারীরা নির্যাতিত তাই নারীদেরকে নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা করা বা রক্ষা পাওয়া এবং তাদের জন্য পারিবারিক এবং সামাজিক ভাবে একটি সম্মানজনক অবস্থান সৃষ্টি হওয়াকেই বর্তমান গবেষণায় **নারী মুক্তি** হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

মূলতঃ নারীজাতির মুক্তির লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ আজ শুধু মাত্র বাংলাদেশের বিষয়ই নয়। এটি বর্তমানে একটি আন্তর্জাতিক ইস্যু হিসেবে দাঁড়িয়েছে। আর সে জন্যই নারী মুক্তির লক্ষ্যে **জেন্ডার ইস্যু** নামীয় একটি আন্তর্জাতিক ইস্যু বিশ্ব জুড়ে কাজ করছে। বাংলাদেশও তার থেকে পিছিয়ে নেই।

বর্তমান গবেষণায় জেন্ডার ইস্যুর বিস্তারিত পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। নারী জাতির মুক্তির লক্ষ্যে প্রাথমিক পর্যায়ে আন্তর্জাতিক ভাবে যে কার্যক্রম সমূহ গৃহীত হয় সেগুলো মূলতঃ নারীর কল্যান সাধন, দারিদ্রতা বিমোচন, কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি সহ, নারীকে বেশ কিছু সুযোগ সুবিধা প্রদান সংক্রান্ত বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে নারীদের অবস্থা পরিবর্তনের কার্যক্রমের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। অতঃপর নারী উন্নয়ন, নারী এবং উন্নয়ন ভিত্তিক কার্যক্রমের মাধমে নারী জাতির অবস্থার উন্নয়নের জন্য গৃহীত কার্যক্রমের ফলে নারীদের অবস্থার উন্নতি ঘটতে থাকে। আবার জেন্ডার ইস্যুর উদ্ভাবনের সাথে সাথেই জেন্ডার ও উন্নয়ন, জেন্ডার মেইনস্ট্রিমিং এবং জেন্ডার বাজেটিং ইত্যাদি কর্মসূচীর মাধ্যমে দেশ বিদেশে গৃহীত উদ্যোগের ফলে নারী জাতি বের হয়ে আসতে থাকে ঘর থেকে।

জেন্ডার ইস্যুর বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্যেই দেখা দেয় 'নারীবাদ' নামের আরেকটি ধারণা। নারীবাদীদের প্রদত্ত বিভিন্ন ধারণায়ও দেওয়া হতে থাকে নারী জাতির মুক্তির লক্ষ্যে একাধিক ধ্যান - ধারনা। মার্ক্সীয়, আমূল, সমাজতান্ত্রিক, সাংস্কৃতিক, ইকো বা পরিবেশ, বৈশ্বিক ইত্যাদি বিভিন্ন নামের ধ্যান-ধারণায় উদ্ভব ঘটে বিভিন্ন মতামতের নারীবাদ।

নারী মুক্তির লক্ষ্যে নারী উন্নয়ন, জেন্ডার ইস্যু, নারীবাদ ইত্যাদি বিভিন্ন তত্ব / মতবাদ বাস্তবায়নের জন্য স্বয়ং জাতিসংঘ এবং আন্তর্জাতিক অন্যান্য সংস্থা গ্রহণ করেছে বিভিন্ন উদ্যোগ। যেমন - মানবাধিকার সনদ, নারীর প্রতি

সকল প্রকারের বৈষম্য বিলোপ সনদ (CEDAW), নারী মুক্তির লক্ষ্যে ১২ টি নির্দিষ্ট বিষয় সনাক্ত করে বেইজিং প্লাটফরম ফর এ্যাকশন (BPFA) - ১৯৯৫ , মিলিনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল (MDG), বিশ্বব্যাংক, আই এম এফ কর্তৃক প্রণীত দারিদ্র হ্রাস করণ কৌশলপত্র বা পি আর এসপি (PRSP)। এই সব আন্তর্জাতিক উদ্যোগ সমুহ বিশ্বব্যাপী নারী জাতির মুক্তি ও নারীদের অবস্থার উন্নয়নের দিক নির্দেশনা দিয়েছে। প্রতিটি আন্তর্জাতিক ইস্যুকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশ তার গৃহীত ব্যবস্থাদির সাথে সমন্বয় সাধন পূর্বক একের পর এক উদ্যোগ গ্রহণ করে যাচ্ছে।

নারী শিক্ষা, চাকুরী প্রাপ্তি, স্বাস্থ্যের উন্নতি, আইন কানুন সৃষ্টি ও বিচার ব্যবস্থা পরিচালনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে কার্যক্রম চলছিল বাংলাদেশে স্বাধীনতার উষালগ্ন থেকেই। ফলে যখনই জেন্ডার ইস্যুর উদ্ভব হয়েছে তখন বাংলাদেশের পক্ষে বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ গ্রহণ বিলম্ব হয়নি। মানবাধিকার সনদ, নারীর প্রতি সকল প্রকারের বৈষম্য বিলোপ সনদ (CEDAW), বেইজিং প্লাটফরম ফর এ্যাকশন (BPFA) - ১৯৯৫ এর আলোকে বেইজিং ঘোষণা ও কর্মপরিকল্পনা, মিলিনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল (MDG), দারিদ্রহ্রাস করণ কৌশলপত্র বা (PRSP) - র আলোকে বাংলাদেশে প্রণীত হয়েছে নারী উন্নয়ন নীতিমালা এবং এই নীতি মালার আলোকে গৃহীত হয়েছে এবং হচ্ছে বিস্তর কার্যক্রম। এই সব কার্যক্রম চলছে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা তথা কেন্দ্র থেকে গ্রামীন পর্যায় পর্যন্ত। ফলে বাংলাদেশে নারীদের অবস্থার বেশ কিছু উন্নতি হয়েছে।

কিন্তু উন্নতি যেটুকু হয়েছে তাকে নারী মুক্তি বলা যায়না। অর্থাৎ অদ্যাবধি বাংলাদেশে মুক্তি মেলেনি নারী জাতির। কারণ বন্ধ হয়নি বাংলাদেশে নারী নির্যাতন। হত্যা, ধর্ষণ, অ্যাসিড নিক্ষেপ, যৌতুক আদায় অন্যথায় নির্যাতন এবং বাল্য বিয়ে, ইভটিজিং, ফতোয়াবাজী, নারী ও শিশু পাচার, গৃহ পরিচারিকা নির্যাতন, পারিবারিক নির্যাতন, আত্ম হত্যা ইত্যাদি চলছেই। আবার হত্যাকে আত্মহত্যার নামে প্রচার, মুঠো ফোনে আপত্তিকর ভিডিও ধারণ করে আর্থিক, শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন সহ আরও বিভিন্ন প্রকারের নিষ্ঠুর সব নির্যাতনের চিত্র যা সাম্প্রতিক সময়ের পত্র পত্রিকার পাতা খুললেই লক্ষ্যনীয় হয়ে ওঠে, যা সংগঠিত হয়েই চলছে বাংলাদেশে। যার বাস্তব সব চিত্র তুলে ধরা হয়েছে বর্তমান গবেষণায়। তাতে স্বাভাবিক ভাবেই একটি প্রশ্নের উদ্ভব হয়েছে তা হ'ল নারী মুক্তির ক্ষেত্রে দেশীয় এবং অন্তর্জাতিক পর্যায়ের এত সব উদ্যোগ পুরোপুরি সফল হচ্ছেনা কেন?

সে প্রশ্নের উত্তর খুজতে গিয়ে লক্ষ্যনীয় হয়েছে যে, বাংলাদেশে যুগ যুগ ধরে নারীজাতিকে নিয়ে বিশেষভাবে পুরুষ সমাজ কর্তৃক নারী নির্যাতন সহ যে সব জঘন্য ঘটনা ঘটানো হচ্ছে তার বেশির ভাগই হচ্ছে ধর্মের নামে। যেন ধর্ম পুরুষদেরকে এ ধরনের নির্যাতনের অধিকার দিয়ে রেখেছে। যে নারীর গর্ভে তাদের জন্ম , যে নারী নিজের জীবন বাজি রেখে তাদেরকে দেখাচ্ছে এই পৃথিবীর আলো - সেই নারীই কখনও তাদের স্ত্রী কখনও তাদের মা, বোন, খালা, নানী, ফুফু। সেই নারীকেই তারা আপন হাতে নির্যাতন করেই যাচ্ছে।

আসলে দীর্ঘ সময় ব্যাপী ধর্মকে যথাযথ ভাবে অনুশীলন করা হচ্ছেনা এবং ধর্মের প্রকৃত তথ্যও উন্মোচিত হচ্ছেনা। আবার বাংলাদেশে নারী মুক্তির প্রশ্নে হয় ধর্মকে বাদ দেয়ার কথা বলা হচ্ছে নতুবা বলা হচ্ছে - ধর্মের পরিবর্তে অন্য কিছু গ্রহণের কথা। অথচ সত্য নিয়ে কথা হচ্ছেনা। মূল সত্য এখানে যে, ধর্ম মূলতঃ নারী নির্যাতনের হাতিয়ার নয় বরং ধর্মই নারী মুক্তির দিশারী । তাই নারী মুক্তির লক্ষ্যে অনুশীলন করা প্রয়োজন -ধর্মকে। এই সত্য উপলব্ধির প্রেক্ষিতেই বর্তমান গবেষণায়, ইসলাম ধর্মের ক্ষেত্রে পবিত্র কুরআনের নারী সংশ্লিষ্ট বেশ কিছু বিষয়, হাদিস, শরীয়ার বিধান এ ভুল এবং অপব্যাখ্যার বিষয়টি প্রখ্যাত ইসলামিক চিন্তাবিদগণের প্রদত্ত ব্যাখ্যার আলোকে তুলে ধরা হয়েছে এবং দেখানো হয়েছে যে, ধর্মের মাধ্যমে নারী নির্যাতনের কোন সুযোগই নেই বরং ধর্মই – নারী মুক্তির দিশারী ।

এই বিষয়টি উপলব্ধির মাধ্যমে বর্তমান গবেষণায় সার্বিক পর্যালোচনায় লক্ষ্যনীয় হয়েছে যে, শুধু মাত্র ধর্মের অপব্যাখ্যাই নয় একই সাথে নারী জাতির মুক্তি এবং উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রম এবং উদ্যোগ সমূহের মধ্যে, আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে এবং জেন্ডার ইস্যু বাস্তবায়নে বিদ্যমান রয়েছে বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা। একই সাথে ধর্মের সাথে রয়েছে গৃহীত ব্যবস্থাদির প্রতিবন্ধকতা। পুরো বিষয়টি পর্যালোচনা করে দেখানো হয়েছে যে, মূলতঃ ধর্মেই রয়েছে নারীজাতির অধিকার এবং মর্যাদার কথা - যা নারী মুক্তির সত্যিকারের দিশা।

সেই আঙ্গিকে পবিত্র কুরআনে প্রদত্ত নারী - পুরুষের সমান অধিকারের এবং নারীর মর্যাদার সাথে জেন্ডার ইস্যুর সমান অধিকারের বিষয়াদি সমন্বয়ের মাধ্যমে জেন্ডার ইস্যুর সাথে নতুন একটি এ্যাপ্রোচের প্রস্তাবের মাধ্যমে সমাপ্তি টানা হয়েছে **বাংলাদেশে নারী মুক্তির ক্ষেত্রে জেন্ডার ও ধর্মের অবস্থানঃ একটি বিশ্লেষণ -** শিরোনামে গবেষণাটি।

গবেষণায় ব্যবহৃত কয়েকটি ইংরেজী সংক্ষিপ্ত শব্দের পূর্ণরূপ

AIDS ঃ Acquired Immuno Deficiency Syndrome

BANBAIS ঃ Bangladesh Bureau 0f Educational Information and Statistics

BNWLA ঃ Bangladesh Women Lawyears Association

BPFA ঃ Beijing Platform for Action

CEDAW ঃ convention on the Elemination of all forms of Discrimination against Women

CRC ঃ Convention on the Rights of the Child

CSW ঃ Committee of Soviet Women

DAWN ঃ Development Alternative with Women for a New Era

DWA ঃ District Women Association

EPZ ঃ Export Processing Zone

GAD ঃ Gender & Development

GDD ঃ Gender Disaggregated Data

GRB ঃ Gender Responsive Budget

HIV ঃ Human Immunodeficiency Virus

ILO ঃ International labour Organisation

INSTRAW ঃ Institution of Training and Research for the Advancement of Women.

IWYT ঃ Inter National Women Year Tribune

MDG ঃ Millinium Development Goal.

MTBF ঃ Medium Term Budget Framework

MoWCA ঃ Ministry of Women & Children Affairs

NCWCD ঃ National Committee for Women and Child Development

NGO ঃ Non Government organization

NHRC ঃ National Human Rights Commission

NPFA ঃ National Plan for Action

NPWA ঃ National Policy for Women Advancement

NSAPR ঃ National Streategy for Accelerated poverty Reduction

OCC ঃ One Stop Crisis centre

PPP ঃ Public Private Partnership

PFA ঃ Platform For Action

PRS ঃ Proverty reduction strategy

PRSP ঃ Proverty reduction strategy paper

SAARC ঃ South Asian Associaton for Regional Cooperation

SEAW ঃ Self Employed Association for Women.

SME ঃ Small and Medium Enterprise

UNDAF ঃ United Nations Development Assistance Fund

UNDP ঃ United Nations Development Programme

UNFPA ঃ United Nations' Fund for population

UNGA ঃ United Nations General Assembly

UNHCR ঃ United Nations High Commissioner For Refugees

UNICEF ঃ United Nations Childrens Emergency Fund

UNSD ঃ United Nations Statistics Department

VGD ঃ Vulnerable group development

VAW ঃ Violence against women

Dhaka University Institutional Repository

WAD ঃ Women and Development

WID ঃ Women in Development

WID UNIT ঃ Women in Development Unit

WPA ঃ World Plan of ActionFrame

WFP ঃ Wid Focal Point

WHO ঃ World Health Organisation

সূচী পত্র

পৃষ্ঠা নং

প্রত্যয়ন পত্র	i
ঘোষণাপত্র	ii
কৃতজ্ঞতা স্বীকার	iii - iv
সারসংক্ষেপ	v - vii
গবেষণায় ব্যবহৃত ইংরাজি সংক্ষিপ্ত শব্দের পূর্ণরূপ	viii – xi

প্রথম অধ্যায়
ভূমিকা

১.১	গবেষণার মূল প্রতিপাদ্য	১ - ৩
১.২	গবেষণার যৌক্তিকতা, তাৎপর্য ও প্রয়োজনীয়তা	৪ - ৯
১.৩	সংশ্লিষ্ট সাহিত্য/পুস্তক পর্যালোচনা	৯ ১৩
১.৪	গবেষণার উদ্দেশ্য	১৪
১.৫	গবেষণার লক্ষ্য	১৪
১.৬	গবেষণার পদ্ধতি	১৪ - ১৮
১.৭	গবেষণার ক্ষেত্র	১৮
১.৮	গবেষণার সীমাবদ্ধতা	১৮
১.৯	গবেষণার বিষয়বস্তুর বিন্যাস	১৯ - ২১

দ্বিতীয় অধ্যায়
নারী মুক্তির লক্ষ্যে নারী-উন্নয়ন, জেন্ডার এবং নারীবাদ

২.১	ভূমিকা	২২
২.২	নারীমুক্তি কি এবং কেন	২২ ২৫
২.৩	নারী মুক্তির লক্ষ্যে গৃহীত প্রাথমিক প্রচেষ্টা বা কার্যক্রম	২৬
২.৩.১	নারীদের অবস্থার উন্নয়নে প্রাথমিক কার্যক্রম বা এ্যাপ্রোচ	২৬ - ৩০
২.৩.২	উন্নয়নে নারী ও নারী এবং উন্নয়ন	৩০ - ৩৩
২.৪	জেন্ডার এবং তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়াদি	৩৩ - ৪০
২.৫	জেন্ডার এবং উন্নয়ন কার্যক্রম এবং তা বাস্তবায়ন সম্পৃক্ত বিষয়াদি	৪০ - ৪৫
২.৬	নারীবাদ এবং নারীবাদের উন্মেষ ও বিকাশ	৪৫ ৪৯
২.৭	নারীবাদের বিভিন্ন ধরণ	৪৯ ৫৩
২.৮	উপসংহার	৫৩ ৫৪

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়
নারী মুক্তির লক্ষ্যে জেন্ডার ইস্যু বাস্তবায়নে আন্তর্জাতিক দিক নির্দেশনা

৩.১	ভূমিকা	৫৫
৩.২	উন্নয়ন দশক, নারী বর্ষ, নারী দশক এবং সম্মেলন উদযাপন	৫৫ ৫৮
৩.৩	নারী মুক্তির লক্ষ্যে - আন্তর্জাতিক ঘোষণা ও সনদ	৫৯ - ৬১
৩.৪	নারী মুক্তির লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক কর্মপরিকল্পনা এবং সনদসূত্র	৬১
৩.৪.১	নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ(CEDAW)	৬২ - ৬৮
৩.৪.২	চতুর্থ বিশ্বনারীসম্মেলন এবং বেইজিং প্ল্যাটফরম ফর অ্যাকশন(PFA)	৬৮ - ৭২
৩.৪.৩	মিলিনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল(MDG)	৭৩ - ৭৬
৩.৪.৪	দারিদ্র হ্রাস করণ কৌশলপত্র (PRSP)	৭৭ - ৭৯
৩.৫	উপসংহার	৭৯ - ৮০

চতুর্থ অধ্যায়
নারী মুক্তির লক্ষ্যে বাংলাদেশে জেন্ডার সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম

৪.১	মানচিত্রে বাংলাদেশ	৮১
৪.২	বাংলাদেশের নারীদের সাংবিধানিক অধিকার এবং জেন্ডার ভিত্তিক আন্তর্জাতিক কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ততা	৮২ ৮৯
৪.৩	নারী মুক্তির লক্ষ্যে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতির মাধ্যমে জেন্ডার ভিত্তিক কার্যক্রম	৮৯ - ৯০
৪.৩.১	নারী উন্নয়নে সাংগঠনিক ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা	৯১ -১০০
৪.৩.২	কর্ম পরিকল্পনা ও কর্মসূচিগত কৌশল প্রণয়ন	১০০ - ১০৬
৪.৩.৩	নারীর দারিদ্র দূরীকরণ	১০৬ - ১১১
৪.৩.৪	শিক্ষা ক্ষেত্রে নারীদের জন্য পুরুষের সমান সুযোগ সৃষ্টি	১১২ - ১১৯
৪.৩.৫	কর্মক্ষেত্রে নারীর সমান অধিকার নিশ্চিত করে নারীর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা	১১৯ - ১২৪
৪.৩.৬	জাতীয় অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে নারীর সক্রিয় ও সম অধিকার নিশ্চিত করা এবং নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন	১২৪ - ১২৭
৪.৩.৭	নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন	১২৭ - ১৩২
৪.৩.৮	নারীর প্রশাসনিক ক্ষমতায়ন	১৩২ - ১৩৬
৪.৩.৯	নারীর স্বাস্থ্য ও পুষ্টি উন্নয়ন	১৩৭ - ১৩৯
৪.৩.১০	জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট প্রণয়ন	১৪০ - ১৪১
৪.৩.১১	নারীর প্রতি সকল প্রকার নির্যাতন দূরীকরণ	১৪১ - ১৬৩

৪.৩.১২	নারী মুক্তির লক্ষ্যে এনজিওদের পরিচালিত কার্যক্রম	১৬৩ - ১৬৬
৪.৩.১৩	নারীর মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করণ	১৬৬ - ১৬৮
৪.৩.১৪	মেয়ে শিশু	১৬৮ - ১৭০
৪.৪	উপসংহার	১৭০ - ১৭২

পঞ্চম অধ্যায়
বাংলাদেশে নারী নির্যাতনের স্বরূপ

৫.১	ভূমিকা ১৭৩	১৭৩
৫.২	নারী নির্যাতনের ধরণ, অবস্থান এবং বয়স সীমা	১৭৪- ১৭৮
৫.৩	নারী নির্যাতনের প্রকার ভেদ এবং বিবরণ	১৭৮
৫.৩.১	ধর্ষণ	১৭৮ - ১৮৬
৫.৩.২	এ্যাসিড সহিংসতা	১৮৭ - ১৯২
৫.৩.৩	যৌতুক জনিত নিষ্ঠুরতা	১৯২ - ১৯৬
৫.৩.৪	বাল্য বিবাহ	১৯৬ - ২০০
৫.৩. ৫	ইভটিজিং বা যৌন হয়রানী	২০১ - ২০৬
৫.৩. ৬	ফতোয়াবাজী	২০৬ - ২১২
৫. ৩.৭	নারী ও শিশু পাচার	২১৩ - ২১৬
৫.৩. ৮	গৃহ পরিচারিকা নির্যাতন	২১৬ - ২২০
৫.৩. ৯	পারিবারিক নির্যাতন	২২০ - ২২৯
৫.৩.১০	আত্মহত্যা	২২৯ - ২৩৪
৫.৩.১১	হত্যা এবং হত্যাকে আত্মহত্যায় রূপান্তরের প্রচেষ্টা	২৩৪ - ২৩৭
৫.৩.১২	নারী নির্যাতনে মুঠোফোন, ভিডিও, ইন্টারনেট ইত্যাদি	২৩৭ - ২৪০
৫.৩. ১৩	বিবিধ নির্যাতন	২৪১ - ২৪৩
৫.৪	আদিবাসী নারীদের অবস্থা	২৪৩ - ২৪৪
৫.৫	উপসংহার	২৪৪ - ২৪৮

ষষ্ঠঅধ্যায়
বাংলাদেশে নারীমুক্তির ক্ষেত্রে ধর্মের অবস্থান

৬.১	ভুমিকা	২৪৯
৬.২	হিন্দু, বৌদ্ধ, ইহুদী, খৃষ্টান ধর্মে নারীদের ঘিরে বিকৃতি, অপব্যাখ্যা এবং কুসংস্কার	২৪৯ - ২৫৫

৬.৩	নারীদের কেন্দ্র করে ইসলাম ধর্মে বিকৃতি, অপব্যাখ্য চিহ্নিত করে ধর্মের মৌলিক বিষয়ের অনুসন্ধান	২৫৫
৬.৩. ১	পবিত্র কুরআন এবং নারীর অধিকার বিশ্লেষণ	২৫৬ - ২৭৫
৬.৩. ২	নারীদের কেন্দ্র করে পবিত্র হাদিসের মধ্যে সৃষ্ট বিকৃতি সনাক্ত করে হাদিসের মৌলিকত্ব অনুসন্ধান	২৭৫ - ২৯৮
৬.৩. ৩	নারীদের কেন্দ্র করে শরীয়ত সংশ্লিষ্ট বিষয়	২৯৮ - ২৯৯
৬.৩. ৪	শরীয়তের নামে প্রচলিত কয়েকটি বিধান এবং নারীদের অবস্থান	২৯৯ - ৩২০
৬.৪	উপসংহার	৩২০ - ৩২১

সপ্তম অধ্যায়

বাংলাদেশে নারী মুক্তির লক্ষ্যে পরিচালিত কার্যক্রমের উপর সার্বিক পর্যালোচনা এবং ধর্মীয় অপব্যাখ্যার কারণ অনুসন্ধান

৭.১	ভূমিকা	৩২২ - ৩২৩
৭.২	নারী মুক্তির লক্ষ্যে বাংলাদেশে গৃহীত দাপ্তরিক যাবতীয় কার্যক্রমের সীমাবদ্ধতা জটিলতা এবং কার্যকর ব্যবস্থার অভাব	৩২৩ - ৩২৪
৭.২.১	সাংবিধানিক বিধান বাস্তবায়নে কার্যকর ব্যবস্থার অভাব	৩২৪
৭.২.২	নারী মুক্তির লক্ষ্যে বাংলাদেশে গৃহীত দাপ্তরিক কার্যক্রমের সীমাবদ্ধতা	৩২৪ - ৩২৫
৭.২.৩	শিক্ষা ক্ষেত্রে জেন্ডার বৈষম্য	৩২৫ - ৩২৮
৭.২.৪	মাতৃমৃত্যুর হার কমানোর ক্ষেত্রে এবং কন্যা শিশুর ক্ষেত্রে জেন্ডার বৈষম্য	**৩২৮ - ৩২৯**
৭.২.৫	রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এবং উচ্চপদে চাকুরির ক্ষেত্রে জেন্ডার বৈষম্য	৩৩০ - ৩৩৩
৭.২.৬	জাতীয় বাজেটকে সংবেদনশীল করার ক্ষেত্রে কিছু সীমাবদ্ধতা	৩৩৩ - ৩৩৪
৭.২.৭	নারীদের ব্যবসা-বানিজ্য, পারিবারিকশ্রম, এনজিও কার্যক্রম এবং চলাফেরার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা/প্রতিবন্ধকতা	৩৩৫ - ৩৪০
৭.২.৮	বিদ্যমান আইনী বিধিব্যবস্থায় সীমাবদ্ধতা/দূর্বলতা	৩৪০- ৩৫১
৭.২.৯	জেন্ডার সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থাদির মধ্যে বিদ্যমান সীমাবদ্ধতা/ জটিলতা	৩৫১ - ৩৫৪
৭.২.১০	নারীবাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে বিদ্যমান কিছু জটিলতা এবং যৌনতাকে অবাধ এবং উন্মুক্ত করা	৩৫৪ - ৩৫৬
৭.২.১১	বি পিএফএ, এমডিজি, পিআরএসপি বাস্তবায়নে বিদ্যমান কিছু সীমাবদ্ধতা	৩৫৬ - ৩৬০
৭.২.১২	দীর্ঘমেয়াদী ও নির্ভরযোগ্য উন্নয়ন লক্ষ্য এবং ২০১৫ এর পরবর্তী গৃহিতব্য বিষয়াদি নির্ধারণ	৩৬০ - ৩৬২
৭.৩	সিডো সনদ এবং নারী উন্নয়ন নীতিমালার সাথে বিদ্যমান ধর্ম বিষয়ক কিছু জটিলতা/ প্রতিবন্ধকতা	৩৬২
৭.৩.১	সিডো সনদ এবং ধর্মের সাথে এর কিছু জটিলতা বিশ্লেষণ	৩৬২- ৩৬৬
৭.৩.২	নারী উন্নয়ন নীতিমালা এবং ধর্ম	৩৬৬ - ৩৬৯

৭.৪	ধর্মে অপব্যাখ্যা ও কুসংস্কারাদি সৃষ্টির কারণ ও সময় সীমার অনুসন্ধান	৩৬৯- ৩৭৩
৭.৫	উপসংহার	৩৭৪ -৩৭৫

অষ্টম অধ্যায়

জরীপের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য/ উপাত্ত উপস্থাপন, গবেষণার বিষয়বস্তুর ভিত্তিতে বিদ্যমান কুসংস্কার বিশ্লেষণ এবং ফলাফল নির্ধারণ ও সুপারিশ/প্রস্তাব

৮.১	ভূমিকা	৩৭৬
৮.২	নির্যাতিত নারী, মসজিদের ঈমাম/ ধর্মীয়নেতৃবৃন্দ, সমাজের বিশিষ্ট ব্যাক্তিত্ব, সরকারী-বেসরকারী কর্মকর্তাগণের প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে জরিপ,সাক্ষাৎকার গ্রহণএবং ফলাফল বিশ্লেষণ	৩৭৬- ৩৭৭
৮.২.১	নির্যাতিত নারীদের উপর প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে জরিপ, সাক্ষাৎকার গ্রহণ এবং প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ	৩৭৭ - ৩৮০
৮.২.২	ধর্মীয় ঈমাম/আলেম/মুহাদ্দেসগণের উপর প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে জরিপ, সাক্ষাৎকার গ্রহণ এবং প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ	৩৮০ - ৩৮৪
৮.২.৩	সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বগণের অলোচনা, তাদের উপর প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে জরিপ, সাক্ষাৎকার গ্রহণ এবং প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ	৩৮৪ - ৩৮৮
৮.২.৪	সরকারী উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণের উপর প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে জরিপ সাক্ষাৎকার গ্রহণ এবং প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ	৩৮৮- ৩৯০
৮.২.৫	জেলা এবং উপজেলায় কর্মরত মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তাগণের উপর প্রশ্ন পত্রের মাধ্যমে জরিপ, সাক্ষাৎকার গ্রহণ এবং প্রাপ্ত তথ্য-উপা ত্ত বিশ্লেষণ	৩৯০ - ৩৯৩
৮.২.৬	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫জন এবং ১ জন প্রাইভেট শিক্ষার্থী সহ মোট ৬ জন শিক্ষার্থীর গৃহীত সাক্ষাৎকারের ফলাফল	৩৯৩
৮.২.৭	গৃহবধুগণের সাক্ষাৎকার গ্রহণ এবং প্রাপ্ত ফলাফল	৩৯৪
৮.৩	ধর্মের নামে বিদ্যমান কতিপয় কুসংস্কারাদির উপর বিশ্লেষণ	৩৯৪ - ৪১১
৮.৪	গবেষণার বিষয়বস্তুর আলোকে ফলাফল নির্ধারণ এবং সুপারিশ /প্রস্তাবনা	৪১১ - ৪১২
৮.৫	**সহায়ক গ্রন্থাপঞ্জী, গেজেটিয়ারস, নথিপত্র,পত্রপত্রিকা ইত্যাদি**	**৪১৩ - ৪৩১**
৮.৬	**চিত্র/ প্রামান্য চিত্র/ পাইচার্ট**	**৪৩২ - ৪৫৭**
৮.৭	**পরিশিষ্ট (১ - ২৪)**	**৪৫৮- ৫২৩**
৮.৮	**গবেষণায় ব্যবহৃত তিনসেট নমুনা প্রশ্নমালা (১,২,৩)**	**৫২৪ - ৫৩০**

গবেষণায় ব্যবহৃত সারণী

সারণী ১	২০০৫ এ নারী নির্যাতনের একটি আন্তর্জাতিক চিত্র	২
সারণী ২	সেক্স এবং জেন্ডার এর ধারণাগত পার্থক্য	৩৩
সারণী ৩	সেক্স এবং জেন্ডার ভিত্তিক নারী ও পুরুষের মধ্যকার ভিন্নতা	৩৪
সারণী ৪	বাস্তবমুখী জেন্ডার চাহিদা এব কৌশলগত জেন্ডার চাহিদা	৩৯ - ৪০
সারণী ৫	বিবিএস এর হাউজহোল্ড ইনকাম এন্ড এক্সপেনডিসার সার্ভে ২০১০ অনুসারে বাংলাদেশের ২০০৫ এবং ২০১০এর দারিদ্রের পরিমাপ	১০৬
সারণী ৬	ভূমি মন্ত্রনালয় সংশ্লিষ্ট বাজেটে সর্বোচ্চ বরাদ্দকৃত নারীবান্ধব কার্যক্রম	১১১
সারণী ৭	শিক্ষা স্তরে ভর্তির সুবিধা প্রাপ্ত ছাত্রীর সংখ্যা (২০১০-২০১১)	১১৩- ১১৪
সারণী ৮	প্রাথমিক শিক্ষাস্তর সমাপ্তকারী ছাত্রছাত্রীর হার (২০০৫-৬ থেকে ২০১১-১২ পর্যন্ত)	১১৪ - ১১৫
সারণী ৯	শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে সমাপ্তকারী শিক্ষার্থীর শতকরা হার (২০১১)	১১৬
সারণী ১০	শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে ঝরে পড়া শিক্ষার্থীর শতকরা হার (২০১১)	১১৭
সারণী ১১	সরকারী এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০১২ সনের শিক্ষক এবং ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা	১১৭
সারণী ১২	প্রবাসী কল্যান ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রনালয়ের নারী ও পুরুষ সুবিধাভোগী	১২২
সারণী ১৩	বিভিন্ন সংসদে নারী সদস্যদের সংখ্যা ও শতকরা হার (১৯৭৩ - ২০১৩)	১২৯
সারণী ১৪	২০১১ সনে পাবলিক সেক্টর/ সরকারী চাকরীর বিভিন্ন শ্রেনীতে নারী ও পুরুষ	১৩৩ - ১৩৪
সারণী ১৫	দন্ডবিধিতে নারী ও শিশু নির্যাতন সংক্রান্ত অপরাধের সাজা সংশ্লিষ্ট ধারা	১৪৩ - ১৪৪
সারণী ১৬	বাল্য বিয়ের জন্য শাস্তি (বাল্য বিবাহ নিরোধ আইন ১৯২৯)	১৪৫
সারণী ১৭	ধর্ষণ জনিত অপরাধ ও সাজা	১৫৪
সারণী ১৮	দহনকারী পদার্থ দ্বারা সংগঠিত অপরাধ এবং সাজা	১৫৫
সারণী ১৯	যৌতুকের জন্য সংগঠিত অপরাধ এবং সাজা	১৫৬
সারণী ২০	নারী পাচার সংক্রান্ত অপরাধ এবং সাজা	১৫৭
সারণী ২১	নারী নির্যাতনের ধরণ	১৭৪ - ১৭৫
সারণী ২২	নারী নির্যাতনের অবস্থান	১৭৬
সারণী ২৩	ভ্রুনাবস্থা থেকে প্রাপ্ত বয়স্ক এবং বার্ধক্য পর্যন্ত নারী নির্যাতনের বিভিন্ন রূপ	১৭৭ - ১৭৮
সারণী ২৪	ধর্ষণজনিত নির্যাতনের সংখ্যা (২০০৩-২০০৯)	১৭৯- ১৮০
সারণী ২৫	ধর্ষণজনিত নির্যাতনের সংখ্যা (২০১০)	১৮০- ১৮১
সারণী ২৬	২০১৩ এ সংগঠিত বেশ কিছু এ্যাসিড সহিংসতা	১৮৭
সারণী ২৭	এ্যাসিড সহিংসতাঘটনার মমিলা সংক্রান্ত তথ্য	১৮৯

সারণী ২৮	যৌতুককে কেন্দ্র করে নির্যাতন (২০১০)	১৯৪-১৯৫
সারণী ২৯	সালিশ ও ফতোয়ার মাধ্যমে [illegible] নির্যাতন ([illegible])	২০৯
সারণী ৩০	গৃহপরিচালিকা নির্যাতন (২০১০)	২১৮
সারণী ৩১	পারিবারিক নির্যাতন (২০১০)	২২৪
সারণী ৩.	জুন ২০১৩ থেকে ফেব্রুয়ারী ২০১৪ পর্যন্ত নির্যাতনের কারণে মামলার সংখ্যা	২৪৬
সারণী ৩৩	বাইবেলের কমন ডকুমেন্ট	২৫৪
সারণী ৩৪	ইসলামিক বিধিব্যবস্থায় নারী ও পুরুষের আয় ও ব্যয়ের খতিয়ান	২৫৮
সারণী ৩৫	বিভিন্ন শিক্ষা স্তরে ভর্তির সুবিধা প্রাপ্ত ছাত্রও ছাত্রীর সংখ্যা	৩২৬- ৩২৭
সারণী ৩৬	জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতির বার বার পরিবর্তন	৩৬৭ - ৩৬৮
সারণী ৩৭	নির্যাতিত নারীদের প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে জরিপ এবং গৃহীত সাক্ষাৎকার	৩৭৭ -৩৭৮
সারণী ৩৮	আলেম উলেমাগণের প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে জরিপ এবং গৃহীত সাক্ষাৎকার	৩৮১
সারণী ৩৯	লেখিকা সংঘ সহ অন্য কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব গণের প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে জরিপ এবং গৃহীত সাক্ষাৎকার	৩৮৫- ৩৮৬
সারণী ৪০	সরকারী উর্দ্ধতন কর্মকর্তাগণের উপর প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে জরিপ এবং গৃহীত সাক্ষাৎকার	৩৮৮- ৩৮৯
সারণী ৪১	জেলা উপজেলায় কর্মরত মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তাগণের উপর প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে জরিপ এবং সাক্ষাৎকার	৩৯১

প্রথম অধ্যায়
ভূমিকা

১.১.গবেষণার মূল প্রতিপাদ্য

যে কোন রাষ্ট্রকে সুশৃঙ্খল ভাবে পরিচালনার মাধ্যমে যথাযথ উন্নয়ন সাধনের জন্য প্রয়োজন রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে পুরুষ - নারী উভয়কেই সেই রাষ্ট্রের উন্নয়নের মূল স্রোত ধারায় সম্পৃক্ত করণ। পৃথিবী জুড়ে এই সত্যটি উপলব্ধির ফলেই লক্ষ্যনীয় হয়ে ওঠে যে, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে পুরুষ শাসিত সমাজে নারীরা তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত, তারা পুরুষের সমান তো নয়ই বরং পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবেও স্বীকৃত নয়। তাদেরকে লেখাপড়া করতে দেওয়া হয়নি, দেওয়া হয়নি কোন প্রকারের আর্থিক উপার্জনের সুযোগ। তাদের ঘরের বাইরে যাওয়ার সুযোগও ছিল সীমিত। তারা ছিল এক প্রকারের গৃহবন্ধী। এভাবে দীর্ঘ সময় ধরে নারীদের রাখা হয়েছিল পুরুষের অধীনে তাদের সেবাদাসী হিসেবেই। পুরুষের তুলনায় নারীদের এরূপ হীনতম পারিবারিক ও সামাজিক অবস্থানের কারণেই স্বাভাবিক ভাবেই পুরুষ কর্তৃক নারীরা নিয়মিত নির্যাতনের শিকার হয়েছে। হয়েছে শারীরিক ও মানসিক ভাবে নির্যাতিত ও নিষ্পেষিত। বলা যায় সুদূর অতীত থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত নারীদের এরূপ সামাজিক ও পারিবারিক অবস্থা কমবেশী পৃথিবীর সব দেশেই বিদ্যমান।

ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, ১৯৯৩, UNFPA এর এক Survey Report এবং অন্যান্য তথ্য সূত্রের ভিত্তিতে বাংলাদেশের স্টেপস টুয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট নামীয় স্বনামখ্যাত এনজিও সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত গবেষণাধর্মী মাসিক পত্রিকা 'উন্নয়ন পদক্ষেপ' এ প্রকাশিত এক তথ্যের ভিত্তিতে জানা যায়, বর্তমান বিশ্বে প্রতি ৩ জনে একজন নারী বিভিন্ন ধরনের শারীরিক, মানসিক ও মনস্তাত্বিক নির্যাতনের শিকার এবং শিল্পোন্নত দেশগুলোতে প্রতি ৪ জনে একজন নারী তার স্বামী বা পার্টনারের হাতে খুন হয়। যুক্তরাজ্যের এ যাবৎ সংগঠিত হত্যা কান্ডের ফলে নিহত নারীদের শতকরা ৫০ ভাগ খুন হয়েছে তাদের স্বামী, প্রেমিক বা ছেলে বন্ধুর হাতে । ডেনমার্কে ২৫% নারী নির্যাতনের শিকার হয়ে বিয়ে বিচ্ছেদ ঘটাতে বাধ্য হয়েছে। ফ্রান্সে স্বামীর সহিংসতার শিকার হয়েছে ৫১% গৃহবধু। শুধু ভারতেই প্রতি বছর যৌতুক জনিত নির্যাতনে ২৫০০০ নারী মারা যায়। পাকিস্তানে ৭৭% কর্মজীবি মহিলা তাদের স্বামীর হাতে নির্যাতিত হয়। সেখানে পারিবারিক সহিংসতার শিকার হয়েছে ৭০ থেকে ৯০ ভাগ নারী। আবার ১৯৯৫ সালের এক জরিপের তথ্যানুযায়ী - শ্রীলংকার ৬০% নারী তাদের স্বামীর হাতে নিয়মিত মার খায়, মেক্সিকোতে প্রতি তিনজনে একজন নারী পারিবারিক নির্যাতনের শিকার হয়, ব্যাংককের বৃহত্তম বস্তির ৫০% এবং পাপুয়া নিউগিনির ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে প্রায় ৬০% নারী প্রতিনিয়ত শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়।[১]

---

[১]. শাহেদা ফেরদৌসী মুন্নী ঃ 'পারিবারিক নির্যাতন'(প্রবন্ধ), উন্নয়ন পদক্ষেপ, ১০ বর্ষ সংখ্যা, পঁয়ত্রিশতম সংখ্যা, অক্টোবর ২০০৪, স্টেপস টুওয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট, লালমাটিয়া, ঢাকা - ১২০৭, পৃঃ ১২ , ১৩।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) এক সূত্র থেকে ২০০৫ এ নারী নির্যাতনের একটি আন্তর্জাতিক চিত্র নিম্নের ছকে তুলে ধরা হয়েছে -

সারণী -১

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) এক সূত্র থেকে ২০০৫ এ নারী নির্যাতনের একটি আন্তর্জাতিক চিত্র

দেশের নাম	□□□□□	নির্যাতনের ধরন		
		শারীরিক নির্যাতন	যৌন নির্যাতন	যৌন ও শারীরিক নির্যাতন
□□□□□□□□	□□□	□□%	□□%	□□%
পেরু	□□□	□□%	□□%	□□%
	গ্রাম	□□%	□□%	□□%
□□□□□□□	□□□	□□%	□□%	□□%
	গ্রাম	□□%	□□%	□□%
□□□□□□□□	□□□	□□%	□□%	□□%
	গ্রাম	□□%	□□%	□□%
থাইল্যান্ড	□□□	□□%	□□%	□□%
	গ্রাম	□□%	□□%	□□%
ব্রাজিল	□□□	□□%	□□%	□□%
	গ্রাম	□□%	□□%	□□%
□□□□	□□□	□□%	□%	□□%

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার উল্লেখিত তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে যে, নারী নির্যাতনের ক্ষেত্রে ইথিওপিয়া, পেরু, বাংলাদেশ, তানজিয়া, থাইল্যান্ড, ব্রাজিল, জাপানের মত দেশসমুহে নারী নির্যাতনের অবস্থা ভয়ংকর ভাবেই বিদ্যমান। যদিও তন্মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান দ্বিতীয় যা অত্যন্ত দুঃখজনক [২]।

ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার উপরে উল্লেখিত পরিসংখ্যান সমূহ কিছুটা পুরনো হলেও বর্তমানেও এই অবস্থার খুব বেশী পরিবর্তন হয়নি।

---

২. " Violence against women: a statistical overview, challenges and gaps in data collection and methodology and approaches for overcoming them" নামীয় Expert group Meeting Organised by: UN Division for the Advancement of Women in Collaboration with: Economic Commission for Europe (ECE) and World Health Organization(WHO) 14 April, 2005, Geneva, Switzerland থেকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য উদ্ধৃত করেন খাদিজা লীনা এবং চিররঞ্জন সরকারঃ 'নির্যাতিত নারী উপেক্ষিত মানবাধিকার, ৩৮ বাংলাবাজার, ঢাকা, ২০১১, পৃঃ ২৩।

তবে বর্তমান বিশ্বে এ সবের কারণ অনুসন্ধান সহ প্রতিরোধের প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে। নারীদেরকে নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা করা, তাদের অধিকার আদায়, নারী ও পুরুষের মধ্যে সমতা স্থাপন এবং উন্নয়নের মূল স্রোত ধারায় নারীকে সম্পৃক্ত করণের লক্ষ্যে পৃথিবী জুড়ে চলছে বিভিন্ন প্রক্রিয়া। নারীদেরকে নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা করতে হলে প্রয়োজন নারীদের আর্থিক ও সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন - এই ধারণা থেকে প্রাথমিক পর্যায়ে নারীদের অবস্থার উন্নয়নের জন্য গৃহীত হতে থাকে নানারূপ উন্নয়ন প্রক্রিয়া বা Approach সমূহের। উন্নয়ন প্রক্রিয়া বা Approach সমূহের বিভিন্ন ভুল ত্রুটি বা সীমাবদ্ধতার পরিপ্রেক্ষিতে উদ্ভব ঘটে নারী উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন ধরনের ইস্যু এবং বাদ সমূহের। সেগুলো হ'ল জেন্ডার ইস্যু, নারীবাদ ইত্যাদি। জেন্ডার ইস্যু এবং নারীবাদ এর মাধ্যমে দেশে দেশে গৃহীত বিভিন্ন প্রক্রিয়ার সাথে সম্পৃক্ত হয় আন্তর্জাতিক মহল, স্বয়ং জাতিসংঘও।

১৯৪৮ সালে প্রকাশ করা হয় জাতিসংঘের সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা। এর বিভিন্ন ধারায় লিঙ্গ, ধর্ম, বর্ণ জাতি, ভাষা, রাজনৈতিক মতাদর্শ বা সামাজিক অবস্থান ভেদে বৈষম্যের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের অঙ্গীকার করা হয়েছে। নারী- পুরুষের সমানাধিকার ও স্বাধীনতার কথা বলা হয়েছে। এ ছাড়া, এ ঘোষণায় নারীর বৈষম্যমুক্ত আইনি সহায়তা পাওয়া এবং চিন্তা, বিবেক ও ধর্মাচরণের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হয়েছে। এ ঘোষণার ৫ নম্বর ধারায় আরো বলা হয়েছে যে, 'নারীদের দুংখ- কষ্ট, অত্যাচার কিংবা যে কোন ধরনের নিষ্ঠুর, অমানবিক বা অবমাননাকর ব্যবহার বা নির্যাতনমুক্ত ভাবে বাঁচার অধিকার রয়েছে।[৩]

বর্তমান গবেষণাটি হলো বাংলাদেশকে ঘিরে। গবেষণায় **'বাংলাদেশে নারী মুক্তির ক্ষেত্রে জেন্ডার ও ধর্মের অবস্থান - একটি বিশ্লেষণ'** নামীয় বিষয়টি নেওয়া হয়েছে। এই বিষয়টি বেছে নেওয়ার কারণ এখানে যে, প্রথমতঃ বাংলাদেশে নারীদের বিদ্যামান অবস্থা এবং সেই সাথে জেন্ডার ইস্যুর মাধ্যমে তাদের অবস্থার উন্নয়ন প্রক্রিয়ার পর্যালাচনা, একই সাথে নারীদের কেন্দ্র করে ধর্মের মৌলিক বিষয়াদি পর্যালোচনা করা হয়েছে এখানে। গবেষণায় দেখা গেছে যে, জেন্ডার ইস্যুর মত একটি আন্তর্জাতিক ইস্যুর মাধ্যমে নারী মুক্তির বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের পরও বাংলাদেশে নারীদের মুক্তি ঘটছেনা বরং বিভিন্ন নিত্য নতুন প্রক্রিয়ায় নারী নির্যাতনের নতুন মাত্রা যোগ হচ্ছে। তার কারণ অনুসন্ধানে দেখা যায় যে, নারীদের প্রতি বিদ্যমান নির্যাতনের অধিকাংশই সংগঠিত হচ্ছে ধর্মের নামে। ধর্মীয় বিধিবিধানের নামে। নারীদের উপর পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের লক্ষ্যে।

নারীদের উপর নির্যাতনকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সবচেয়ে বড় হাতিয়ার হিসাবে পুরুষ সমাজ যুগ যুগ ধরে ব্যবহার করেছে ধর্মকে। এমন ভাবে ধর্মীয় কিছু অপব্যখ্যা এবং কুসংস্কার তৈরি করা হয়েছে যেন ধর্মই পুরুষকে নারী জাতির উপর শ্রেষ্ঠত্ব এবং নির্যাতনের অধিকার দিয়েছে। পৃথিবীতে বিদ্যমান সব ক'টি ধর্মের ক্ষেত্রে একই ঘটনা ঘটানো হয়েছে। ফলে বাংলাদেশ সহ পৃথিবীর ধনী দরিদ্র সব দেশেই নারীদের অবস্থান পুরুষের তুলনায় তুচ্ছ এবং পৃথিবী জুড়ে নারী নির্যাতন স্বাভাবিক বিষয় হিসেবে দাঁড়িয়েছে। ধর্মের নামে নারী নির্যাতনের মাত্রা এত অধিক হয়েছে যে, বর্তমানে মানুষ ধর্মের উপর দিন দিন আস্থা হারিয়ে ফেলতে শুরু করেছে এবং জীবন থেকে ধর্মকে বাদও দিতে চাচ্ছে।

৪. জাতি সংঘের সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা, ১৯৪৮।

মূলতঃ ধর্ম এমন একটা বিষয়, যা চাইলেই জীবন থেকে বাদ দেয়া সম্ভব নয়। এই বিষয়টি উপলব্ধির কারণেই বর্তমান গবেষণায় ধর্মের মৌলিক বিষয়াদি অনুসন্ধান করা হয়েছে। তাতে দেখা গেছে যে, মূলতঃ ধর্ম নয় বরং ধর্মের নামে সৃষ্ট বেশ কিছু অপব্যাখ্যা, কুসংস্কার সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে এমন ভাবে শিকড় গেঁড়ে বসেছে যে, সেগুলোকেই মানুষ ধর্ম জ্ঞান করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। এই সব অপব্যাখ্যা আর কুসংস্কারগুলোর অধিকাংশই এসেছে নারীকে ঘিরে এবং পুরুষের সীমাহীন শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিদানের লক্ষ্যে। বর্তমান গবেষণায় বিদ্যমান সেসব অপব্যাখ্যা আর কুসংস্কার থেকে ধর্মকে উদ্ধার করার একটা প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে। একই সাথে নারী কেন্দ্রিক ধর্মের মৌলিক আদর্শের অনুসন্ধান করা হয়েছে। তাতে লক্ষ্যনীয় হয়েছে যে, ধর্মের মৌলিক আদর্শে নারী নির্যাতনের কোন সুযোগ তো নেইই বরং রয়েছে নারীর অধিকার ও মর্যাদার কথা।

গবেষণায়, অনুসন্ধান করে নারীর ধর্মীয় অধিকার এবং মর্যাদার বিষয় সমূহ সনাক্ত করে তা জেন্ডার ইস্যুর সাথে সম্পৃক্ত করে নতুন একটি Approach বা ইস্যুর প্রস্তাব দিয়ে শেষ করা হয়েছে **"বাংলাদেশে নারীমুক্তির ক্ষেত্রে জেন্ডার ও ধর্মের অবস্থান - একটি বিশ্লেষণ"** - নামীয় গবেষণা কার্যক্রম।

১.২ গবেষণার যৌক্তিকতা, তাৎপর্য ও প্রয়োজনীয়তা

বাংলাদেশ সহ পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই নারী মুক্তি এবং নারীদের অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে জেন্ডার ইস্যুর কার্যক্রম বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্নভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। ১৯৫৫ থেকে ১৯৮৫ পর্যন্ত দীর্ঘ সময় ধরে নারীদের জীবনের বাস্তব সমস্যাদি দূরীকরণ, দারিদ্রতা বিমোচন, লেখাপড়া শেখানো এবং পেশার ক্ষেত্রে সুযোগ সুবিধা প্রদানের জন্য বিভিন্ন Approach যেমন Welfare Approach, Anti poverty Approach, Efficiency Approach নামীয় Approach সমূ কার্যকর ছিল।

এসব Approach সমুহের আঙ্গিকে কার্যক্রম চলাকালে লক্ষ্যনীয় হয় যে, শুধু মাত্র কল্যান সাধন, দারিদ্রতা দূরীকরণ, ক্ষমতা বৃদ্ধি করণের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেই চলবেনা। পর্যায়ক্রমে আরও দু'টি Approach যেমন Equity এবং Empowerment Approach এর মাধ্যমে নারী ও পুরুষের মধ্যে সমতা স্থাপনের পূর্বক নারীকে পুরুষের মত ক্ষমতাধর করার লক্ষ্যেও কার্যক্রম গ্রহণ আবশ্যক। তখন এসব Approach এর সহায়তায় প্রাথমিক পর্যায়ে নারীকে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করে দেওয়া থেকে শুরু করে পরবর্তীতে নারীকে পুরুষের সমকক্ষে আনয়ন করে উন্নয়নের স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করানোর প্রচেষ্টা নেওয়া হয়।

বাংলাদেশও তৎপ্রেক্ষিতে কার্যকর ভূমিকা পালনে সচেষ্ট হয়। নারীদেরকে বিদ্যাশিক্ষা এবং চাকুরী পাওয়া থেকে শুরু করে বিভিন্ন কঠিন কঠিন কাজেও সম্পৃক্ত করানো হয়। দেখা যায় যে, বিদ্যমান সব ধরনের কাজে নারীকে সম্পৃক্ত করে, নারীদের পুরুষের সমান অবস্থানে নেয়ার প্রচেষ্টায় নারীদের অবস্থার কিছুটা উন্নতি হলেও, নারী জাতির মুক্তি ঘটেনি। নারী নির্যাতনও বন্ধ করা সম্ভব হয়নি।

পরবর্তীতে 'জেন্ডার' ইস্যুর মাধ্যমে নারীদের অবস্থা পরিবর্তনের কার্যক্রম আরও জোরদার করা হয় এবং নারী ও পুরুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জেন্ডার ও উন্নয়ন, জেন্ডার মেইনস্ট্রিমিং এবং জেন্ডার বাজেটিং ইত্যাদি কর্মসূচীর মাধ্যমে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। যার মাধ্যমে বাংলাদেশ সহ সর্বত্রই নারীর অধিকার অর্জনের বিষয়টি কিছুটা সফলতা অর্জন করে।

কিন্তু আবারও লক্ষ্যনীয় হয় যে, নারী জাতির মুক্তি ঘটেনি। এ ক্ষেত্রে যে বিষয়টি লক্ষ্যনীয় হয়ে ওঠে, তা হলো, শুধু মাত্র কিছু অধিকার অর্জনের মাধ্যমেই নারীদের মুক্তি সম্ভব নয়। কারণ মানব শিশুকে পৃথিবীতে আনয়নের ক্ষেত্রে নারীর মাতৃত্বের যে এক অনবদ্য ভূমিকা রয়েছে তারও মূল্যায়ন হওয়া আবশ্যক। কিন্তু জেন্ডার ইস্যুতে নারী ও পুরুষের সমান অধিকারকে গুরুত্ব দেওয়া হলেও নারীর মর্যাদা তথা নারীর মাতৃত্বের মর্যাদা এখানে নিশ্চিত হয়নি এবং নারীর গর্ভ ধারণ ও সন্তান জন্মদানের মত বিশাল ভূমিকার সাথে পুরুষের কোন ভূমিকা সমান হবে তাও এ ক্ষেত্রে নির্ধারণ করা যায়নি। যে লক্ষ্যকে সামনে রেখে ১৯৯৫ সালে বেইজিং আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলনের প্লেনারি সেশনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন ফাষ্টলেডী হিলারী ক্লিনটন নারীর মর্যাদার দাবী করে বলেছেন, " নতুন মর্যাদা, নতুন সম্মান চাই নারীদের জন্য। যারা মা হিসেবে, মেয়ে হিসেবে এই বিশ্বে মানব সমাজকে বাঁচিয়ে রাখছে তাদের অকল্যান করে সমাজ ও রাষ্ট্র এগুতে পারেনা।" [৪]

কিন্তু দাবীই যা উঠেছে বাস্তবে তা নিশ্চিত করার কোন উপায় স্থির করা যায়নি। এর কারণ হিসেবে দেখা যায় যে, জেন্ডার ইস্যুতে নারী ও পুরুষের সমান অধিকারকে গুরুত্ব দেওয়া হলেও নারীর মাতৃত্বের ভূমিকার সাথে সমান করে পুরুষের জন্য কোন ভূমিকা স্থির করা হয়নি। একই সাথে নারীর মর্যাদা তথা নারীর মাতৃত্বের মর্যাদা নিশ্চিত করা হয়নি। এ ক্ষেত্রে নারীর মর্যাদার প্রশ্ন গুরুত্বপূর্ণ এ কারণে যে, মানব শিশুকে পৃথিবীতে আনয়নের ক্ষেত্রে নারীর মাতৃত্বের যে এক অনবদ্য ভূমিকা রয়েছে তারও মূল্যায়ন হওয়া আবশ্যক। যে বিষয়টি নির্ধারণ করা রয়েছে ধর্মে। নারীর মর্যাদা নিশ্চিত করতে তাই ধর্মের দিকে লক্ষ্য করতেই হবে। তবে অবশ্যই ধর্মের মৌলিক আদর্শের দিকে।

ইসলাম ধর্মের ক্ষেত্রে যখন আবদুল্লাহ্ ইউসুফ আলী কর্তৃক পবিত্র কুরআনের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা, পবিত্র কুরআন ও যথাযথ হাদিসের ভিত্তিতে জামাল বাদাবীর, প্রফেসর রফিউল্লাহ্ শিহাব, ইঞ্জিনিয়ার আসগর আলী, ডা.জাকির নায়েক সহ আরও অনেকের ইসলাম ধর্মে নারীদের অধিকার ও মর্যাদা সংক্রান্ত গবেষণা মূলক গ্রন্থ, প্রদত্ত তথ্য সমূহ পর্যালোচনা করা হয় তখন ইসলাম ধর্মে নারীর অধিকার ও মর্যাদার প্রকৃত বিষয়সমূহ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। যদিও বাস্তবে এসব বিষয়াদির প্রচার ও প্রচলন খুবই সীমিত বরং প্রচলিত রয়েছে নারীর অমর্যাদা, অসম্মান এবং নির্যাতনের কথা। এসব অমর্যাদা, অসম্মান ও নির্যাতন চলছে ধর্মের অপব্যাখ্যা ও কুসংস্কারের মাধ্যমে। তাই নারীকে ঘিরে সমাজে বিদ্যমান ধর্মের অপব্যাখ্যা ও কুসংস্কার সমূহ সনাক্ত করে ধর্মের মৌলিক আদর্শ সমূহ চিহ্নিত করে নারী সংক্রান্ত ধর্মের মৌলিক আদর্শের সাথে জেন্ডার ইস্যুর সমন্বয় সাধনের মাধ্যমেই নারী মুক্তির একটি যুক্তিসঙ্গত দিশা অন্বেষণ করা হয়েছে বর্তমান গবেষণায়।

[৪]. মালেকা বেগম ঃ নারীর চোখে বিশ্ব (চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলন), সাহিত্য প্রকাশ, আগষ্ট ১৯৯৬, ভাদ্র ১৪০৩, পৃঃ ৩৭-৩৮।

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমান গবেষণায় জেন্ডার ইস্যুর কিছু সীমাবদ্ধতার উপরও গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। তাহলো মাতৃত্ব এবং তৎসম্পর্কিত শারীরিক ও মানসিক কষ্ট একই সাথে পারিবারিক কাজকর্মের যাবতীয় দায়িত্ব নারীর উপর একক ভাবে বিদ্যমান থাকা অবস্থাতেই পুরুষের পাশাপাশি উন্নয়নমূলক কাজে সমান অংশ গ্রহণের মাধ্যমে বাড়তি দায়িত্ব নারীর উপর অর্পিত হওয়া। যাতে করে নারীর এক দিনে দুই বা ততোধিক কর্মদিবসের সূচনা ঘটেছে। যদিও এই বিষয়টি উপলব্ধির মাধ্যমেই আন্তর্জাতিকভাবে Gender and Development(GAD) Approach এর উদ্ভব। এই Approach টি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এই কারণে যে, এখানে কিছুটা হলেও Gender Balance করার প্রয়াস রয়েছে। এখানে নারী ও পুরুষের ভূমিকাকে Productive, Reproductive এবং Community development নামে তিন ভাগে ভাগ করে, নারীর মাতৃত্ব এবং তৎসম্পর্কিত যাবতীয় দায়িত্বকে Reproductive role হিসেবে চিহ্নিত করে তাতে পুরুষকে সম্পৃক্ত করানোর ব্যাপক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে। এখানে সন্তান জন্মের সময় পিতার উপস্থিতি, সন্তানের যত্নে পিতার ভূমিকা রাখা এবং ঘর- গৃহস্থালীর কাজে পুরুষকে অংশগ্রহণের বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণের প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হয়।

কিন্তু এ পর্যন্তই! পুরুষকে এসব কাজে বাধ্য করার ক্ষেত্রে কোন প্রক্রিয়া গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। আবার এখানেও নারীর দীর্ঘমেয়াদী গর্ভধারণের কষ্ট এবং তীব্র তীক্ষ্ণ প্রসব যন্ত্রণার মাধ্যমে সন্তান জন্মদান প্রক্রিয়ায় একক সম্পৃক্তির সাথে পুরুষের কোন ভূমিকার মাধ্যমে সমান করা সম্ভব তাও সুস্পষ্ট হয়নি। তাই নারীকে পুরুষের সমান কর্মসংস্থানে আনয়নের বিষয়টি আকর্ষণীয় হলেও এখানেও নারীর সত্যিকারের মুক্তির বিষয়ে ফাঁক থেকেই যাচ্ছে এবং এর গ্রহণযোগ্যতা ও স্থায়িত্বতা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিচ্ছে।

অর্থাৎ - সন্তান ধারণ ও জন্মদান সংক্রান্ত নারীর একক ভূমিকার সাথে ঘর গৃহস্থালীর কাজ, সন্তান লালন পালনের দায়িত্ব পালনকারী নারীদের উপরই উপার্জনের এবং পরিবার ও দেশের উন্নয়নের দায়ভার সম্পৃক্ত হওয়ার কারণে নারীদের উপর শুধু তিন বা ততোধিক নয় প্রচুর কর্মদিবসের দায়ভার চেপে বসেছে। পরিবর্তে দরিদ্র পরিবারের কর্মজীবি মেয়েদের স্বামীরা অলস এবং অথর্ব হয়ে স্ত্রীদের উপার্জিত অর্থেই বসে বসে খেতে শুরু করেছে। আবার এইসব স্বামীদের কেউবা এই ধরনের উপার্জনশীল একাধিক নারীকে বিয়ে করে তাদের ইটভাঙ্গা, মাটিকাটার মত হাড় ভাঙ্গা পরিশ্রমের মাধ্যমে উপার্জনের পয়সাগুলি নিয়ে নিচ্ছে। প্রায়ই এইসব নারীদের কেউ কেউ বাইরে পুরুষের বলপ্রয়োগেরও শিকার হচ্ছে, ফলে সে জন্ম দিচ্ছে বৈধ এবং অবৈধ সন্তান এবং সে স্ব -উপার্জনে এইসব সন্তানদের প্রতিপালনে বাধ্য হচ্ছে। শুধু নিম্নবিত্তই নয় মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্ত, বড় বেতনের চাকুরী করছেন যে সব নারীরা তারাও বিভিন্ন ধরনের কষ্টের শিকার হচ্ছেন। নিজেদের উপর ঘর, গৃহস্থালি, সন্তানধারণ, জন্মদানের মত ভূমিকা নিয়েই তারা চাকুরী করছেন। তারা যাবতীয় দাপ্তরিক দায়িত্ব পুরুষের সমান কখনো বা বেশীই করে থাকেন এবং অফিস থেকে ঘরে ফিরে এসে সংসারে সন্তানদের যাবতীয় দায়িত্ব এককভাবে করে থাকেন।

আবার সমান অধিকারের নামে নারীর অর্থিক উপার্জন সংসারে ভাগ হয়ে যাচ্ছে। প্রকাশ্যে কিংবা অপ্রকাশ্যে। অর্থাৎ Gender and Development (GAD) Approach নারীর মাতৃত্বজনিত ভূমিকাকে Reproductive role উল্লেখ করে কিছুটা স্বীকৃতি দিলেও এখানে নারীর মাতৃত্বের নিরাপত্তা পুরোপরি নিশ্চিত হয়নি। এতে নারীর উপর দুই দিবস মাত্র নয় বহু দিবসের কর্মভার চেপে বসেছে। সেই সাথে সংসারের আর্থিক দায়িত্বের বোঝাও তার উপর চেপে গেছে। এ সবের কোন সমাধান অদ্যাবধি জেন্ডার ইস্যু (Gender Issue) দেয়নি।

জেন্ডার ইস্যুকে কেন্দ্র করেই ফেমিনিষ্ট বা নারীবাদীদের উদ্ভব। সেগুলো হল 'উদার বা ব্যক্তি স্বাতন্ত্রবাদী নারীবাদ', 'মার্ক্সীয় নারীবাদ', 'আমূল নারীবাদ' ইত্যাদি। এই সব মতাদর্শীরা নারী মুক্তির লক্ষ্যে যেনো বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। তাদের বিদ্রোহ ধর্মীয় রক্ষণশীলদের বিরুদ্ধে। বাংলাদেশের প্রখ্যাত লেখক হুমায়ুন আজাদ এই মতাদর্শীদের অন্যতম। তিনি তাঁর 'নারী' গ্রন্থে ধর্মীয় রক্ষণশীলদের বিরুদ্ধে বলেন, "ধর্মীয় রক্ষণশীলরা দীর্ঘদিন যাবৎ নারীকে বন্দী জীবন যাপনে বাধ্য করেছিল। ... তাঁরা মনে করেন পুরুষদের সীমাহীন শ্রেষ্ঠত্বে, নারীদের নিকৃষ্টতায়। .... নারী উপযুক্ত নিকৃষ্ট কাজের এবং নিকৃষ্টকে নিকৃষ্ট রূপে রাখাই শ্রেয়"।[৫] বর্তমান বিশ্বে নারীবাদের লড়াই মূলতঃ এই মতবাদের বিরুদ্ধেই। তবে এই ক্ষেত্রে যে গলদটি সৃষ্টি হয়েছে তাহলো- আধুনিক নারীবাদিগণ ধরেই নিয়েছেন যে রক্ষণশীলরা যা যা বলেছেন এবং করেছেন তা'ই ধর্ম কিংবা ধর্মের বিধান। হুমায়ুন আজাদ তাঁদের এই ধারণাকেই তুলে ধরেছেন এইভাবে, "এ মতবাদ মেলে পিতৃতন্ত্রের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থে, ধর্ম গ্রন্থ, আইন, দর্শন সবখানেই এই মতবাদ ছড়িয়ে আছে"।[৬]

মূলত নারীবাদীগণ সমাজে প্রচলিত ধর্মের অপব্যাখ্যা এবং কুসংস্কারকেই প্রকৃত ধর্ম জ্ঞান করেছেন। এর কারণও রয়েছে। প্রচলিত অপব্যাখ্যা এবং কুসংস্কারসমূহ দীর্ঘ সময়ব্যাপী সমাজে ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করে আছে। পক্ষান্তরে পূর্বে উল্লেখিত ধর্ম সংক্রান্ত লেখক গণের গ্রন্থ সমূহ সহ অনুরূপ আরও গ্রন্থাদি পর্যালোচনায় এটি স্পষ্ট হয় যে, কুসংস্কার ধর্ম নয় বরং ধর্ম হীনতা এবং ধর্মের মৌলিক আদর্শ মূলতঃ যাবতীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে।

ধর্মের মৌলিক বিষয় পর্যালোচনা না করে কুসংস্কার ও অপবাখ্যাকে ধর্ম জ্ঞান করে ধর্মকে একেবারে বাতিল করতে গিয়ে উল্লেখিত মতবাদ কখনও কখনও নারীর ক্ষতিরও কারণ হয়েছে। এমনকি শুধু নারীরই নয় সে সব তত্ত্বের কোন কোন বিষয় মানব সভ্যতার জন্যও হুমকি স্বরূপ হয়ে উঠেছে। উপরে উল্লেখিত উদার নারীবাদ, মার্ক্সীয় নারীবাদ এবং আমুল নারীবাদের সকলেই নারী পুরুষের যাবতীয় বৈষম্য দূরীকরণ পূর্বক সমতা তথা ইকুয়ালিটি স্থাপনে একমত। এ লক্ষ্যে তারা লেখাপড়া এবং পেশার ক্ষেত্রে নারীর প্রতি যে কোন সীমারেখার বিরোধী।

দীর্ঘদিনের বৈষম্য দূরীকরণের লক্ষ্যে উদার নারীবাদীরা কোন কোন পেশায় পুরুষ না নিয়ে শুধু নারীদের নিয়োগের পক্ষপাতি, মার্ক্সীয় নারীবাদীরা শুধু সমাজেই নয় পরিবারেও পূঁজিবাদের বিলুপ্তি ঘটিয়ে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার পক্ষে। তাঁরা মনে করেন রাষ্ট্রকেই পালন করতে হবে পরিবারের আর্থিক দায়িত্ব। সেখানে বিয়ে থাকবে কিন্তু কোন আর্থ - চুক্তি থাকবেনা। পুরুষ হবে ভরণপোষণ মুক্ত, যদিও তারা নারীর সন্তান ধারণের পক্ষপাতি। আর আমুল নারীবাদীরা সকল প্রকারের নারী শোষণের কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন - যৌনতাকে। তারা সমকাম, বিষমকাম ইত্যাদি সকল রকমের কামকে একাকার করে দিয়ে ঘটাতে চাচ্ছেন নারীও পুরুষের মধ্যে সমতা তথা ইকুয়ালিটি।

---

[৫]. হুমায়ুন আজাদ ঃ নারী , ২য় সং, ৩য় মুদ্রন, আগাম প্রকাশনী, ৩৬ বাংলা বাজার, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃঃ ৩২৮।

[৬]. পূর্বোক্ত পৃঃ ৩২৭।

Dhaka University Institutional Repository

আমুল নারীবাদীরা এই ইকুয়ালিটির পক্ষে যৌনতাকে এতই অবাধ ও উন্মুক্ত করতে চাচ্ছেন যে, সেখানে নারী- পুরুষ, পুরুষ - পুরুষ, নারী-নারী কোন ভেদাভেদ থাকবেনা। এভাবেই তারা নারীকে যৌন পীড়নের হাত থেকে রেহাই দিতে চাচ্ছেন।

ইতিমধ্যে পাশ্চাত্যে যৌনতাকে অবাধ করে দিয়ে কিছু পরীক্ষা-নীরিক্ষাও হচ্ছে। যার পরিণতিতে নারী এমন কিছু সন্তানের মা হচ্ছে যাদের পিতাদের খুঁজে পাওয়া কঠিন হয়ে পড়ছে। এই সমস্যার সমাধান কল্পে নারীকে গ্রহণ করতে হচ্ছে অবিবাহিত মাতা (Unmarried mother) হওয়ার দায়িত্ব পক্ষান্তরে পুরুষদের কিন্তু জেন্ডার ইস্যুর সমতার নামে অবিবাহিত পিতা (Unmarried father) হওয়ার দায়িত্ব দেয়া যাচ্ছেনা। মূলতঃ এ ধরনের যৌন Equality, নারীর Security র ক্ষেত্রে প্রশ্নবোধক হয়ে দেখা দিচ্ছে। এই অবাধ যৌনতা এবং সমকামীতাই কিন্তু ভয়াবহ এইডস এরও কারণ। যা শুধু নারীকেই নয়, ধ্বংস করবে পুরুষকেও অর্থাৎ মানব প্রজাতিকেই। এ ক্ষেত্রেও একটি যথার্থ পন্থা অবলম্বনের জন্য আবারও ধর্মের মৌলিক আদর্শের সাথে সমন্বয়ের আবশ্যকতা দেখা দেয়।

যদিও পৃথিবীতে বিদ্যমান সবকটি ধর্মেই অনুপ্রবেশ করেছে বিস্তর কুসংস্কার ও অপব্যাখ্যা। এসব কুসংস্কার ও অপব্যাখ্যা বেশিরভাগই নারীকে ঘিরে। প্রতিটি ধর্মে তো বটেই, ক্ষোদ ইসলাম ধর্ম ও এর থেকে নিস্কৃতি পায়নি। অপব্যাখ্যার কঠোর শাসনে এ দেশের নারীরা হয়েছে গৃহবন্দী। তাকে অসূর্যাস্পর্শা রমনী খেতাব দিয়ে সূর্য পর্যন্ত দেখতে দেয়া হয়নি। বিদ্যা শিক্ষা হারাম ঘোষণার মাধ্যমে নারীকে রাখা হয়েছে অজ্ঞ ও মূর্খ করে। অজ্ঞ ও মূর্খ নারীদের পুরুষের সেবা দাসী ছাড়া আর কিছুই হতে দেওয়া হয়নি। এই পাক-ভারত উপমহাদেশেই নারীকে বিদ্যালয়ে যেতে দেয়নি এবং পুরুষের পাশাপাশি কর্মস্থলে চাকুরী করতে দেয়নি যে পুরুষেরা, সে পুরুষেরাই নর্তকী হিসেবে, বাইজী হিসেবে এবং পতিতা হিসেবে ভোগ করেছে অন্য নারীদের দীর্ঘ সময় ধরে। কেউ প্রশ্ন করেনি কোনটি ধর্ম এবং কোনটি অধর্ম?

যদিও পবিত্র কুরআনে সরাসরি হস্তক্ষেপের সাহস কেউ করেনি তবে নারীদের সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আয়াতের ব্যাখ্যায় নিজেদের মনগড়া অভিমত প্রদানের প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে, নারীকে সর্বাপেক্ষা অধিক কষ্ট দেয়া হয়েছে প্রচলিত শরীয়তের বিধানের নামে, কোন কোন ক্ষেত্রে পবিত্র কুরআনের যথেষ্ট ব্যত্যয় ঘটিয়ে। যাঁরা মুসলমানদের জন্য পবিত্র কুরআনের আলোকে শরীয়তের বিধান প্রণয়ন করেছেন, তাঁরা হচ্ছেন ঈমাম আবু হানিফা, ঈমাম মালিকী, ঈমাম হাম্বলী এবং ঈমাম শাফেয়ী। আশ্চর্যজনক হলেও সত্য যে, উল্লেখিত ঈমামগণের লেখা মূলগ্রন্থ গুলোর কোন অস্তিত্বই মুসলিম বিশ্বের কোথাও নেই। এ সম্পর্কে স্যার আব্দুর রহিম বলেন-"তবে তাঁহাদের প্রবর্তিত মাযহাব কালের গর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে এবং অতঃপর এ যাবৎ যাহা করা হইয়াছে এবং হইতেছে তাহা এই ঈমামদের প্রবর্তিত আইনের টিকার ভাষ্য মাত্র"।[৭] অর্থাৎ পরবর্তীকালের এই টিকাকার ও ভাষ্যকারদের হাতে পড়েই তাদের নিজস্ব চিন্তা চেতনার মাধ্যমে শরিয়তের বিধানে ধর্মের মৌলিক আদর্শের প্রচুর বরখেলাফ ঘটেছে।

[৭]. স্যার আবদুর রহিম ঃ ইসলামী আইন তত্ব, অনুসৃতিঃ গাজী শামছুর রহমান, ২য় সং, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, পৃঃ ২৬।

Dhaka University Institutional Repository

একই ভাবে হাদিসও বিকৃত হয়েছে। জাল ও মনগড়া হাদিসের দাপটে মৌলিক বিশুদ্ধ হাদিসের বাস্তব প্রয়োগ খুবই সীমিত। জাল ও মনগড়া হাদিস থেকে মৌলিক হাদিসকে উদ্ধারের প্রয়াসও ছিল বড় বড় ইসলামী চিন্তাবিদগণের। কিন্তু সেসব লেখাও অজ্ঞাত রহস্যজনিত কারণে প্রচার পায়নি। এ সম্পর্কে মাওলানা আব্দুর রহিম বলেন, "এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, হাদিসের এই দীর্ঘ ধারাবাহিতায় এমন একটা অবস্থা দেখা দিয়াছে যখন দুষ্ট লোকেরা স্বার্থ কিংবা অসদুদ্দেশ্যে প্রণোদিত হইয়া নিজেদের কথাকে রসুলের হাদিস নামে চালাইয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছে এবং এমন কিছু কিছু কথা রসুলের বিরাট হাদিস সমুদ্রের সহিত মিশিয়া যাইবার সুযোগ লাভ করিয়াছে"।[৮] তিনি আরও বলেন, "এই ফিতনা সমুহের প্রায় সকল ধারকই নিজস্ব ভাবে কথা রচনা করিয়া রসুলের নামে হাদিস বর্ণনা করিতে শুরু করে। উহার সহিত প্রকৃত হাদিসের মত সম্পূর্ণ মনগড়া ভাবে বর্ণনা সূত্র (সনদ) জুড়িয়া দেওয়া হয় এবং উহাকে এমন ভাবে পেশ করা হইতে থাকে যেনো সকলেই উহাকে রসুলের মুখ নিঃসৃত বাণী বলিয়া বিশ্বাস করিয়া লয়"।[৯]

এটিও সত্য যে, বিখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদগণ বসে থাকেননি। তাঁরা তাঁদের লেখনীর মাধ্যমে পবিত্র কুরআনের নারী বিষয়ক আয়াত সমূহের মৌলিক ব্যাখ্যা প্রদান, শরিয়তের বিধানে আনা ধর্মের মৌলিক আদর্শের বরখেলাফ এবং জাল হাদিস থেকে প্রকৃত ধর্মকে উদ্ধারের চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। তবে অজ্ঞাত রহস্য জনিত কারণে সেগুলোও যথাযথ ভাবে প্রচার পায়নি। পূর্বে উল্লেখিত ইসলামী চিন্তাবিদগণের গ্রন্থসমুহ তার উদাহরণ। যেগুলো খুব বেশী প্রচার পায়নি।

সে সব লেখকগণের লেখা অনুসন্ধানের মাধ্যমেই ইসলাম ধর্মের মৌলিক আদর্শ উদ্ভাবন সম্ভব। অর্থাৎ ইসলাম ধর্মের মৌলিক আদর্শের অনুসন্ধান বর্তমান গবেষণার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। অতঃপর নারী- সংশ্লিষ্ট ইসলাম ধর্মের উক্ত মৌলিক বিষয়াদির সাথে জেন্ডার ইস্যুর সমন্বয় সাধনই বর্তমান গবেষণার মুল লক্ষ্য। জেন্ডার ইস্যুর সাথে ধর্মীয় মৌলিক বিষয়ের সমন্বয় সাধন পূর্বক নারী মুক্তির একটি সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা সৃষ্টির কাজ পূর্বে হয়েছে মর্মে লক্ষ্যনীয় হয়নি। এটিই বর্তমান গবেষণার ব্যতিক্রমী দিক। ফলে বর্তমান গবেষণা যৌক্তিক ও তাৎপর্যময় এবং একটি সময়োপযোগী গবেষণা, যা নারী মুক্তির ক্ষেত্রে মৌলিক একটি পথ প্রদর্শক হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

১.৩ সংশ্লিষ্ট সাহিত্য/পুস্তক পর্যালোচনা

বাংলাদেশে নারী মুক্তির লক্ষ্যে সরকারী, বেসরকারী সংস্থা সহ আন্তর্জাতিক সংস্থা সমুহও বিস্তর কাজ করে যাচেছ। প্রতিটি ক্ষেত্রে গৃহিত কার্যক্রমের পাশাপাশি জেন্ডার ইস্যু এবং নারীদের অবস্থার উপর গবেষণা মূলক কার্যক্রম গৃহীত হচ্ছে আবার সে সবের উপর গ্রন্থাদিও প্রকাশ হচ্ছে প্রচুর। ব্যক্তিগত উদ্যোগেও লেখালেখি হচ্ছে। আবার ধর্মের মধ্যে নারী মুক্তির সহায়ক বিষয়াদি নিয়েও লেখালেখি হয়েছে বিস্তর।

---

৮. মওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহিমঃ হাদিস সংকলনের ইতিহাস, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ১৯৯২, পৃঃ ৫৬৬।

৯. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫৬৬।

জেন্ডার বিষয়ক শাহীন রহমানের রচনা, গ্রন্থনা ও সম্পাদনা 'জেন্ডার প্রসঙ্গ' গ্রন্থ অন্যতম। শাহীন রহমানের 'জেন্ডার প্রসঙ্গ' গ্রন্থখানি স্টেপস টুয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট সংস্থা কর্তৃক ফেব্রুয়ারী ২০০৭ এ দ্বিতীয় বার প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে জেন্ডার এবং তৎসংশ্লিষ্ট বিস্তারিত তথ্যাদি এসেছে। গ্রন্থে মোট ১৫টি অধ্যায়ে তিনি জেন্ডার সংশ্লিষ্ট যাবতীয় বিষয়াদি বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেছেন। তাঁর গ্রন্থ সম্পর্কে তাঁর নিজের একটি মন্তব্য হলো, "এটা উল্লেখ করা জরুরী যে, এটি লেখকের কোনো মৌলিক রচনা নয়। আমাদের দেশে জেন্ডার ইস্যুতে যে সব বই পত্র পাওয়া যায়, তা থেকেই নিজের মতো করে সহজভাবে প্রয়োজনীয় অংশটুকু এখানে তুলে ধরা হয়েছে। ক্ষেত্র বিশেষে ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত জেন্ডার ইস্যু সংক্রান্ত বিভিন্ন রচনার সংশ্লিষ্ট কিছু অংশও সরাসরি ভাবানুবাদের আকারে এখানে এসেছে। সে বিবেচনায় এই গ্রন্থটিকে বরং রচনা না বলে ছায়া অবলম্বনে রচিত কিংবা সম্পাদিত সংকলন বলাটাই বোধহয় অধিক যুক্তিযুক্ত"।[১০]

লেখক যাই বলুন না কেন, বাংলা ভাষায় নারী উন্নয়ন, জেন্ডার এবং উন্নয়ন ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়ে এটি একটি মৌলিক গ্রন্থ হয়েছে তাতে কোনই সন্দেহ নেই। তিনি জেন্ডার প্রেক্ষাপটে এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে নারী উন্নয়নের বিষয়াদি স্পষ্ট করে দেখিয়েছেন। তিনি প্রথমতঃ দেখিয়েছেন উন্নয়ন কি এবং বিশ্ব প্রেক্ষাপটে উন্নয়ন কিরূপ। অতঃপর জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে নারী উন্নয়ন কি ও কেন তা বোঝাতে গিয়ে জেন্ডার, পিতৃতন্ত্র বা পুরুষতন্ত্র এবং নারীবাদ বিষয়ক যাবতীয় বিষয়াদি তুলে ধরেছেন। একই সাথে তিনি জেন্ডারকে সম্পৃক্ত করে তুলে ধরেছেন মিলিনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল এবং জেন্ডার, পিআরএসপি এবং জেন্ডার, জেন্ডার এবং বিশ্বায়ন, জেন্ডারের আলোকে রাজনীতি এবং গণতন্ত্র, জেন্ডার এবং গর্ভনেন্স, আইন-কানুনঃ জেন্ডার প্রেক্ষিত, জেন্ডার এবং সংগঠন উন্নয়ন, জেন্ডার বাজেট, মানবাধিকার এবং নারীর মানবাধিকার, নারী নির্যাতন ঃ ধারণা, ধরণ ও প্রতিকার, কতিপয় জেন্ডার বিষয়ক পরিভাষা ও ধারণা। অর্থাৎ জেন্ডার সংশ্লিষ্ট যাবতীয় বিষয়াদি তিনি এই গ্রন্থে বিস্তারিত ভাবে বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতিতে আলোচনা করেছেন। এই গ্রন্থটি পর্যালোচনায় বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে জেন্ডার সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির উপর বিস্তারিত ধারণা নেয়া সম্ভব হয়। শাহীন রহমানের অফুরন্ত পরিশ্রমের ফসল এই গ্রন্থখানি বর্তমান গবেষণায় জেন্ডার বিষয়ক ধারণা গ্রহণ, তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে সহায়ক হয়েছে।

বিংশ শতাব্দির প্রায় মধ্যভাগে রচিত হয়েছে উইনিফ্রেড হল্টবীর 'নারী এবং ক্রম পরিবর্তিত সভ্যতা' (Women and a changing civilization) নামীয় গ্রন্থখানি। গ্রন্থে লেখিকা সভ্যতার অগ্রগতিতে নারীর স্থান নির্ণয় করেছেন। কিভাবে কোন প্রক্রিয়ায় কার স্বার্থে ও তৎপরতায় সভ্যতার উষালগ্ন থেকে পুরুষ আর নারীর মধ্যে নারীকে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসেবে গণ্য করে আসছে তা বিশ্লেষণ করেছেন। আবার এর বিরুদ্ধে নারীর সচেতনতা বৃদ্ধি পাওয়া, প্রতিরোধ গড়ে ওঠা সত্বেও সেই ব্যবস্থাটি কেন টিকে আছে সে সম্পর্কে লেখিকা সুস্পষ্ট ধারণা দিয়েছেন। বইটির বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগের শিক্ষক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, "মেয়েদের ওপর পুরুষের যে আধিপত্য সেটা আসলে একটা বৈষম্য। মেয়েরা পুরুষের মতো জাতি, শ্রেণী ও সম্প্রদায়গত বৈষম্য দ্বারা তো পীড়িত হয়ই, তাদেরকে

[১০]. শাহীন রহমানঃ জেন্ডার প্রসঙ্গ (রচনা গ্রন্থনা ও সম্পাদনা), স্টেপস টুয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট, দ্বিতীয় প্রকাশ, ফেব্রুয়ারী ২০০৭, লালমাটিয়া, ঢাকা, ১২০৭, পৃঃ ০৭ এর ' লেখকের কথা' অংশ থেকে।

Dhaka University Institutional Repository

একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর বৈষম্যের মধ্যেও আটকে রাখা হয়, এই সরল বিবেচনায় যে তারা ছেলে নয় মেয়ে হয়ে জন্মেছে। রাষ্ট্র এবং সমাজ উভয়েই পুরুষতান্ত্রিক, কেবল পুরুষতান্ত্রিক নয়, নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে পিতৃতান্ত্রিকই। যেদিন থেকেই পুরুষ ক্ষমতা পেয়ে গেছে সেদিন থেকে পুরুষের কাজ এবং মেয়েদের কাজকে পুরুষেরা আলাদা করে ফেলতে পেরেছে। মেয়েদের কাজ ঘরে, কাজেই সে কাজের কোন অর্থনৈতিক মূল্য নেই, যেমনটি পুরুষদের কাজের রয়েছে। তদুপরি নারী জন্মের চরিতার্থতা রয়েছে সন্তানের জন্মদান ও লালনপালনে এই ভাবমূর্তিও তৈরী হয়েছে। সেই ভাবমূর্তি অক্ষুন্ন রাখতে গিয়ে মেয়েরা অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পেশাগত ক্ষেত্রে পুরুষদের তুলনায় পিছিয়ে পড়েছে। সামন্তবাদী সমাজ যেমন পুঁজিবাদী সমাজের তেমনি পুরুষ নারীকে উপভোগের সামগ্রী হিসেবে দেখতে পছন্দ করে"।[১১]

বইটি নারীদের অগ্রগতির আর্থ সমাজতাত্বিক একটি বিশ্লেষণ, যেখানে লেখিকা সতর্ক করে দেন নারীর শত্রু সম্পর্কে। সে শত্রু কখনও সে নিজে, কখনও শত্রু পুরুষ জাতি আবার কখনও অন্য নারীরা। আবার এটিও তিনি উপলব্ধি করেছেন যে ,"পুরুষ বা নারী বিদ্বেষ নয়, নয় পারস্পরিক ঘৃণা বা বৈরীতা বরং শ্রদ্ধাবোধ, ভালবাসা ও সহমর্মীতা গড়ে তুলবে সেই বিশ্ব যেখানে আধিপত্য নয়, শাসন নয় বরং থাকবে বন্ধুত্ব ও সহযোগিতা .. .. নারী পুরুষের যৌথ জীবন হবে প্রতিযোগিতার নয় আনন্দের, উপভোগের, উৎসবের"।[১২] এই গ্রন্থখানি যদিও প্রধানতঃ যুক্তরাজ্যের এবং আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে প্রণীত কিন্তু বর্তমান গবেষণায় যেখানে আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট এসেছে সেখানে আলোচনায় অত্যন্ত সহায়ক হয়েছে। একই সাথে বর্তমান গবেষণায় পবিত্র কুরআনের যে সত্য তুলে ধরার প্রয়াস রয়েছে তা হলো 'স্বামী প্রভূ নয় বন্ধু' সেই আবেগই এই গ্রন্থের মূল উপজীব্য বলে গ্রন্থখানি সার্বিকভাবেও বর্তমান গবেষণার জন্য সহায়ক হয়েছে।

প্রখ্যাত লেখিকা সেলিনা হোসেনের সম্পাদনায় 'জেন্ডার ও উন্নয়ন কোষ' নামীয় মোট ২৮টি অধ্যায়ে ১৫৮ জন লেখকের রচনায় সমৃদ্ধ করে প্রণীত হয়েছে দুই খন্ডের বিশাল গ্রন্থখানি। গ্রন্থের দুইজন উপদেষ্টা ড. হামিদা হোসেন, ড. আতিউর রহমান বইটির পান্ডুলিপি চুড়ান্ত করণ পর্যন্ত প্রক্রিয়ার সাথে সম্পৃক্ত থেকে সহযোগিতায় ছিলেন। গ্রন্থের প্রথম খন্ডে সংযোজিত হয়েছে মোট ১২টি অধ্যায়। সেগুলো হলো-

১. অধিকার, ২.অভিবাসন, ৩. অর্থনীতি ৪. আইন, ৫. আদিবাসী, ৬. ইতিহাস ৭. উন্নয়ন, ৮. ক্ষমতায়ন ৯. কৃষি ১০. গণমাধ্যম ১১. জাতিসংঘ ১২. জেন্ডার।

দ্বিতীয় খন্ডে এসেছে মোট ১৬টি অধ্যায়। তা হলো ১৩. দলিত জনগোষ্ঠি ১৪. দিবস ১৫. দুর্যোগ ১৬. ধারণা/প্রত্যয় ১৭. পরিবেশ ১৮. পেশা ১৯. প্রযুক্তি ২০. প্রাকৃতিক সম্পদ ২১. প্রান্তিক জনগোষ্ঠী ২২. বই ২৩. ভূমি ২৪. শিক্ষা ২৫. শিল্প-বানিজ্য ২৬.সংস্কৃতি ২৭. সহিংসতা ২৮. স্বাস্থ্য।

প্রতিটি অধ্যায়ে জেন্ডার ইস্যুকে উন্নয়ন ইস্যুর সাথে সমন্বিত প্রবন্ধ রচনা করা হয়েছে। নারীর পিছিয়ে থাকা অবস্থান এবং নারী -পুরুষের জীবনমানের সমস্যা এবং বৈষম্য সমূহ চিহ্নিত করে সমাধানের প্রস্তাব রাখা হয়েছে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সামগ্রিক উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে যথার্থ অবস্থানে আনয়নের ক্ষেত্রে সহায়তা করা

---

[১১]. উইনিফ্রেড হল্টবিঃ নারী এবং ক্রমপরিবর্তিত সভ্যতা, (ভাষান্তর মোবাশ্বেরা খানম), রেহানা হক, সুবর্ণ ১৫০, বঙ্গবন্ধু জাতীয় ষ্টেডিয়াম, দোতলা, ঢাকা , ২০১০, পৃ ঃ ৬।

[১২]. উইনিফ্রেড হল্টবি ঃ নারী এবং ক্রমপরিবর্তিত সভ্যতা,(ভাষান্তর মোবাশ্বেরা খানম) গ্রন্থে মোবাশ্বেরা খানম এর উদ্ধৃতি, পূর্বোক্ত পৃঃ ২৩।

হয়েছে। জেন্ডার এবং উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান চিহ্নিত করণের প্রচন্ড সহায়ক একটি গ্রন্থ এটি। জেন্ডারকে কেন্দ্র করে এতদসংক্রান্ত লেখক, গবেষকদের জন্য গবেষণার কাজে ও সহায়ক হয়েছে।

সম্পাদিকা সেলিনা হোসেনের ভাষায়,"পুরুষ তান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নারীদের জীবন যে বৈষম্যের পরিস্থিতিতে অতিবাহিত হয় তা প্রতিটি অধ্যায়ের ভুক্তিতে[১৩] আলোচিত হয়েছে। সমস্যা বা প্রতিবন্ধকতার স্বচ্ছ উপস্থাপন করা পরোক্ষভাবে সমাধানের বা পরিবর্তনের এক রকম দিক নির্দেশনা। তাই ব্যক্তি, পরিবার, জনগোষ্ঠি, জাতিগোষ্ঠি, সমাজ, রাষ্ট্র তার স্ব স্ব স্থান থেকে নিজস্ব ইতিবাচক পরিবর্তন সাধন করবে। এটা গনতান্ত্রিক স্বাধীনতা। যার মধ্য দিয়ে জেন্ডার বৈষম্য দূর করে টেকসই উন্নয়নের পথ প্রশস্ত করা সম্ভব" ।[১৪] বর্তমান গবেষণায় বাংলাদেশে জেন্ডার কার্যক্রমের অবস্থান নির্ণয়ের ক্ষেত্রে গ্রন্থখানি প্রচুর সহায়ক হয়েছে।

'নির্যাতিত নারী উপেক্ষিত মানবাধিকার' গ্রন্থটি রচনা করেছেন খাদিজা লীনা এবং চিররঞ্জন সরকার যৌথ ভাবে। ১২০ পৃষ্ঠার গ্রন্থে বিস্তারিত ভাবে তথ্য সমৃদ্ধ করে একটি পর্যালোচনা মূলক সমীক্ষা প্রণয়ন করেছেন বাংলাদেশের নারী নির্যাতনের যাবতীয় চিত্র সমৃদ্ধ করে। লেখক লেখিকা নিজেরাই বলেছেন,"এই সমীক্ষার সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে – বাংলাদেশে নারীর প্রতি সহিংসতার ও নির্যাতনের একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র অনুসন্ধান করা, নির্যাতন ও সহিংসতার কারণগুলো খুঁজে বের করা এবং এ ব্যাপারে সরকার, রাজনৈতিক দল, নাগরিক সমাজ ও মানবাধিকার কর্মী ও গবেষকদের সামনে প্রাথমিক তথ্য উপস্থাপন করা" ।[১৫] গ্রন্থখানি নারী নির্যাতনের তথ্য উপাত্ত পাওয়ার ক্ষেত্রে যথেষ্ট সহায়ক একটি গ্রন্থ । ফেব্রুয়ারী ২০১১ এ প্রকাশিত এই গ্রন্থে নারী নির্যাতনের সাম্প্রতিক সময়ের হাল নাগাল সব চিত্র বাস্তব উদাহরণ সহ উপস্থাপন করা হয়েছে। বাংলাদেশে নারী নির্যাতনের একটি সঠিক অবস্থা বোঝার জন্য গ্রন্থখানি যে কোন গবেষক, লেখক, পাঠকদের জন্য তথ্যসমৃদ্ধ, যুৎসই একখানি গ্রন্থ হয়েছে। বর্তমান গবেষনায় নারী নির্যাতনের চিত্র অঙ্কনে তথ্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে গ্রন্থটি প্রচুর সহায়ক হয়েছে।

Meghna Guhathakurta র সম্পাদনায় বাংলাদেশের পাঁচজন বিশিষ্ট লেখিকা কর্তৃক প্রণীত পাঁচটি প্রবন্ধ সম্মিলিত Contemporary Feminist Perspectives গ্রন্থে, Meghna Guhathakurta এর 'Contemporary Debates in Feminist Theory and Practice এবং Sultana Kamal এর 'Feminist Legal Research' নামীয় প্রবন্ধ দু'টি আর Kamla Bhasin ও Nighat Said khan প্রণীত 'Some Questions on Feminism and its Relevance in South Asia গ্রন্থে নারীবাদের উত্থান কার্যক্রম ইত্যাদির উপর বিস্তারিত পর্যালোচনা করা হয়েছে। বর্তমান গবেষণায় নারীবাদের উপর তথ্য উপাত্ত সংগ্রহে এই গ্রন্থ সমূহ সহায়ক হয়েছে।

প্রখ্যাত লেখক হুমায়ুন আজাদের 'নারী' গ্রন্থখানিও নারীবাদের উপর বিশ্লেষণাত্মক একটি গ্রন্থ। নারীবাদের উৎপত্তি -বিস্তার -বিশ্লেষণ ইত্যাদি যাবতীয় বিষয় এই গ্রন্থটিতেও বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়েছে। বর্তমান গবেষণায় নারীবাদ সংশ্লিষ্ট তথ্যউপাত্ত বিশ্লেষণে এই গ্রন্থখানিও সহায়ক হয়েছে।

---

[১৩].মূল প্রবন্ধের বিষয় সম্পৃক্ত ছোট ছোট বিষয় অন্তর্ভুক্ত হওয়া।

[১৪]. সেলিনা হোসেন (সম্পাদিত) ঃ 'জেন্ডার ও উন্নয়ন কোষ', ১ম খন্ড, সময় প্রকাশনী, ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা, ২০০৯, পৃঃ ৬৩৯।

[১৫].খাদিজা লীনা এবং চিররঞ্জন সরকার ঃ নির্যাতিত নারী উপেক্ষিত মানবাধিকার', পূর্বোক্ত, পৃঃ ১০।

Prof. Rafiullah Shehab প্রণীত 'Rights of Women in Islamic Shariah' গ্রন্থখানি ধর্মের নামে প্রচলিত যাবতীয় কুসংস্কার এবং অপব্যাখ্যা, শরীয়া- বিধানে অনুপ্রবেশ করানো পবিত্র কুরআন বিরুদ্ধ বিধান সমূহকে পবিত্র কুরআন, বিশুদ্ধ হাদিস এর মাধ্যমে চমৎকারভাবে সনাক্ত করা হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় পর্দার নামে নারীজাতিকে গৃহবন্দী জীবন যাপনে বাধ্য করণের অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে তিনি নবীজি(সঃ) এর আমলে নারীদের প্রাকৃতিক ডাকে বাইরে যাওয়া, নারীদের মসজিদে ঘুমানো, মসজিদে গিয়ে নামাজ আদায় করা, ঈদে সকলের সাথে দেখা করে শুভেচ্ছা বিনিময়, বাড়িতে পুরুষ অতিথিদের আপ্যায়ন করা, পুরুষ পরিবেষ্টিত অবস্থায় পবিত্র হজ্বব্রত প্রতিপালন, পশু জবাই করা ইত্যাদি উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করে পবিত্র কুরআন ও হাদিসের ব্যাখ্য দিয়ে প্রমাণ করেন যে, æThere is no restriction on women to go out of their houses for taking part in fruitful activities" ।[১৬]

শুধু পর্দার বিষয়েই নয় তিনি বিয়েতে নারীর মোহরানার অধিকার, বাল্য বিয়ে নয়, যৌতুক নয়, নারীদের তালাকের অধিকার, স্ত্রীকে মারধর না করা, হুর সংক্রান্ত ভ্রান্ত ধারণা, আদালতে নারীর সাক্ষী প্রদান সহ ধর্মের আকারে বিদ্যমান যাবতীয় অপব্যাখ্যা এবং কুসংস্কার সমূহ পবিত্র কুরআন এবং বিশুদ্ধ হাদিসের আলোকে সনাক্ত করে ধর্মের মৌলিক বিষয়াদি সনাক্ত করেছেন। বর্তমান গবেষণায় কুসংস্কার এবং অপব্যাখ্যা সমূহ সনাক্ত করণের ক্ষেত্রে এই গ্রন্থটিকে প্রধানতঃ ব্যবহার করা হয়েছে।

এই সাথে Women in Islam, translated & edited by Nicholas Awde, Hippocrene books, INC, New York থেকে ২০০৫ এ প্রকাশিত, ইঞ্জিনিয়ার আসগর আলী রচিত Women in Islam, ডা.জাকির নায়েক এর লেকচার সমগ্র, Hammudah Abdalati র Islam in Focus, মোহাম্মদ আকরম খাঁর কোরআন শরীফ, মোস্তফা চরিত গ্রন্থ সমূহে কুসংস্কার এবং অপব্যাখ্যা সমূহ সনাক্ত করে মৌলিক বিষয়াদি নির্ধারণের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সহায়ক হয়েছে।

Cambridge এ অবস্থিত Islamic texts Society থেকে প্রকাশিত Mohammad Hashim Kamali কর্তৃক রচিত Principles of Islamic Jurisprudence অনুসারে শরীয়ার বিধান সমূহ, মোহাম্মদ আকরম খাঁর কোরআন শরীফের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ও মোস্তফা চরিত থেকে নবী জীবনী, হাদিস এবং বিকৃতি থেকে হাদিসের উদ্ধার, শরীয়ার বিধানে অতিরিক্ত বিষয় সংযোজন এবং পবিত্র কুরআন অনুসারে মূল বিষয়াদির উপর বিস্তারিত আলোচনায় মূল বিষয়াদি জানা গেছে।

ইসলামী ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত হাদিস সমূহের মূল গ্রন্থ বোখারী-শরীফ, মুসলিম শরীফ, দাউদ এবং তিরমিজি শরীফ, মেশকাত শরীফ থেকে হাদিস, হাদিসের প্রকার ভেদ সম্পর্কে বিস্তারিত জানা গেছে। একই সাথে গাজী শামছুর রহমান কর্তৃক অনুসৃতি স্যার আব্দুর রহিমের ইসলামী আইন তত্ব, মওলানা মুহম্মদ আব্দুর রহীম এর হাদীস সংকলনের ইতিহাস থেকে হাদিসের বিকৃতি এবং বিকৃতির হাত থেকে উদ্ধারের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির বিশদ বিবরণ রয়েছে।

বর্তমান গবেষণায় উল্লেখিত যাবতীয় গ্রন্থাবলী বিস্তারিত ও বিশদ ভাবে কাজে লেগেছে।

---

[১৬] Prof. Rafiullah Shehab ঃ 'Rights of Women in Islamic Shariah' published by Abdul Majid, 17-Urdu Bazar,Lahore, August,1986, page-14.

Dhaka University Institutional Repository

১.৪. গবেষণার উদ্দেশ্য

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ । একটি দেশের উন্নয়ন অবকাঠামোকে সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনায় এগিয়ে নিতে হলে প্রয়োজন সে দেশের নারী-পুরুষ উভয়ের উন্নয়ন। আবার বাংলাদেশ একটি মুসলিম প্রধান দেশ। এখানে রয়েছে অন্যান্য ধর্মের অধিবাসীগণও। সকলেই স্ব - স্ব ধর্মকে ভালোবাসেন এবং প্রাধান্য দেন। কিন্তু প্রতিটি ধর্মেই প্রবেশ করেছে বিস্তর কুসংস্কার এবং অপব্যাখ্যা - যার অধিকাংশই নারীদের ঘিরে। এসব কুসংস্কার এবং অপব্যাখ্যার মধ্যে নারীদের গৃহবন্ধী করে রাখার প্রবনতা বিদ্যমান। যা দেশের প্রকৃত উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করছে।সেজন্যই বর্তমান গবেষণায় ধর্মের অপব্যাখ্যা এবং কুসংস্কার সরিয়ে মৌলিক বিষয়াদির অন্বেষন এবং তার মাধ্যমে জেন্ডার ইস্যুর সাথে একটি যোগসূত্র স্থাপনের প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে । সেই লক্ষ্যেই বর্তমান গবেষণার নিম্নরূপ উদ্দেশ্য সমূহ স্থির করা হয়েছে -

- নারী মুক্তি কি ও কেন তা পর্যালোচনা পূর্বক নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে জেন্ডার ইস্যুর বিশ্লেষণ এবং বাংলাদেশে নারীমুক্তির লক্ষ্যে জেন্ডার ইস্যুর অবস্থান নির্ধারণ;
- বাংলাদেশে নারী মুক্তির লক্ষ্যে তথা নারীদের আর্থিক ও সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সাধন, নির্যাতন প্রতিরোধে জেন্ডার ইস্যুর আলোকে সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগ সমূহ বিশ্লেষণ;
- বাংলাদেশে নারী নির্যাতন সংক্রান্ত চিত্র অন্বেষণ, নির্যাতন সংক্রান্ত তথ্য গ্রহণ এবং তার স্বরূপ বিশ্লেষণ;
- নারী সংক্রান্ত ধর্মীয় অপব্যাখ্যা, কুসংস্কার সমূহ চিহ্নিত করে ধর্মের মৌলিক বিষয়াদির অনুসন্ধান এবং চিহ্নিত করণ;
- বাংলাদেশে নারী মুক্তির ক্ষেত্রে জেন্ডার ও ধর্মের অবস্থান বিশ্লেষণ এবং
- জেন্ডার ইস্যুর সাথে ধর্মের মৌলিক বিষয়াদির সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে নারীর অধিকার এবং মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করে, নারী মুক্তির একটি সঠিক পন্থা নির্ধারণের প্রচেষ্টা গ্রহণ|

১.৫. গবেষণার লক্ষ্য

বাংলাদেশে নারী মুক্তির লক্ষ্যে Gender & Development ইস্যুর মধ্যকার নারী ও পুরুষের সমান অধিকার সংক্রান্ত Approach টির সাথে পবিত্র কুরআন ও হাদিসে প্রদত্ত নারীর অধিকার ও মর্যাদাকে সমন্বয় করে পবিত্র কুরআনিক অধিকার এবং মর্যাদাকে Gender & Development Approachটির সাথে সমন্বয় সাধন পূর্বক নতুন একটি Approach এর সুপারিশ ই বর্তমান গবেষণার মূল লক্ষ্য।

১.৬. গবেষণার পদ্ধতি

বাংলাদেশে নারীমুক্তির ক্ষেত্রে জেন্ডার ও ধর্মের অবস্থান - একটি বিশ্লেষণ - শীর্ষক গবেষণা কর্মটি একটি সামাজিক গবেষণা কর্ম। গবেষণায় একদিকে নারী জাতিকে নির্যাতনের হাত থেকে মুক্তির লক্ষ্যে জেন্ডার ইস্যু, অন্যদিকে ধর্ম সংক্রান্ত পর্যালোচনার মাধ্যমে গবেষণার উদ্দেশ্য, গুরুত্ব, পরিধি এবং গবেষণার সমস্যাদির প্রকৃতি বিবেচনা করে গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করার জন্য নিম্নে বর্নিত পদ্ধতি সমূহ অনুসরণ করা হয়েছে-

১. <u>ঐতিহাসিক, বর্ণনামূলক ও বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতি ঃ</u>

এসব পদ্ধতিতে মাধ্যমিক (Secondary) তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহের জন্য ঢাকায় অবস্থিত বিভিন্ন গ্রন্থাগার থেকে জেন্ডার কার্যক্রমের শুরু, আন্তর্জাতিক অবস্থান থেকে বাংলাদেশ পর্যন্ত এই কার্যক্রমের বিস্তার বিস্তৃতি সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ, বাংলাদেশে নারী উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম সংক্রান্ত এবং অন্যান্য ধর্ম সহ বিশেষভাবে ইসলাম ধর্ম, ইসলামী আইন ও ধর্মীয় অপব্যবহার সম্পর্কিত গ্রন্থ, বিশ্বকোষ, অভিসন্দর্ভ, জার্নালে প্রকাশিত নিবন্ধ, প্রবন্ধ, সম্পাদকীয়, উপসম্পাদকীয়, প্রতিবেদন ইত্যাদি উৎস হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।

উল্লেখিত গ্রন্থাবলী ও প্রকাশনা থেকে গবেষণা বিষয়ক মৌলিক ধারণা লাভের সাথে সাথে তাত্বিক ও কাঠামোগত জ্ঞান ও লাভ করা হয়েছে। বিশেষ করে পত্র-পত্রিকার প্রতিবেদন, প্রকাশিত তথ্য গবেষণার ক্ষেত্রে মূলসূত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।

২. <u>জরিপ পদ্ধতি ও কেইস স্টাডি</u>

গবেষণা কর্মে প্রাথমিক তথ্য - উপাত্ত সংগ্রহের জন্য জরিপ পদ্ধতি ও কেইস স্টাডি ব্যবহার করা হয়েছে। এই পদ্ধতিতে যে সব টুলস ব্যবহৃত হয়েছে তা হলো ঃ

<u>প্রাথমিক উপাত্ত ও তথ্য ঃ প্রাথমিক ও তথ্য হিসেবে নিম্নেবর্ণিত পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে -</u>

(১) মহাগ্রন্থ আল-কোরআন ও হাদীস শাস্ত্র,

(২) জেন্ডার সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাবলী

(৩) প্রশ্নমালা

(ক) ইমামদের জন্য প্রশ্নমালা

(খ) সামাজিক এলিট ও মানবাধিকার কর্মীদের জন্য প্রশ্নমালা

(গ) নির্যাতীত নারীদের জন্য প্রশ্নমালা

৩. <u>গবেষণার মূখ্য সূত্র হিসেবে যে সকল বিষয় ব্যবহার করা হয়েছে -</u>

প্রথমত ঃ **<u>সংশ্লিষ্ট পুস্তকাদি পর্যালোচনা এবং দপ্তর/সংস্থার থেকে তথ্য সংগ্রহ</u>**

গবেষণায় বাংলাদেশে নারী মুক্তির লক্ষ্যে দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পরিচালিত কার্যকমের উপর বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। জেন্ডার বিষয়ক সুস্পষ্ট ধারণা উপস্থাপন, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এতদসংশ্লিষ্ট কার্যক্রম পরিচালনা এবং আন্তর্জাতিক দিক নির্দেশনা সংক্রান্ত ধারণা লাভ অতঃপর তার আঙ্গিকে বাংলাদেশে নারী মুক্তির লক্ষ্যে পরিচালিত কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্যাদির উপর ধারণা প্রদানের লক্ষ্যে গবেষণার তথ্য উপাত্ত নিম্নোক্তভাবে সংগ্রহ করা হয়েছে-

(১) পবিত্র কুরআন, হাদিস শাস্ত্র এবং শরীয়া সংক্রান্ত মৌলিক গ্রন্থাদি পর্যালোচনা;

(২) পবিত্র কুরআন, হাদিস শাস্ত্র এবং শরীয়া সংক্রান্ত দেশী বিদেশী সুপ্রসিদ্ধ ব্যাখ্যা দাতাগণের প্রদত্ত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ;

(৩) জেন্ডার সংক্রান্ত আনুষঙ্গিক বইপত্র, গবেষণা গ্রন্থ, এবং বিশেষজ্ঞগনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ অধ্যায়ন ও বিশ্লেষনের মাধ্যমে তথ্য/ উপাত্ত সংগ্রহ;

(৪) সারা দেশ জুড়ে সাম্প্রতিক সময়ের নারী নির্যাতনের তথ্য সহ স্বরাষ্ট্র, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান, সমাজ কল্যান এবং আইন ও বিচার মন্ত্রনাল থেকে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ ;

(৫) মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ঢাকা মেডিকেল কলেজ সংশ্লিষ্ট ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার সহ ৬৪ টি জেলা এবং জেলা সংশ্লিষ্ট উপজেলার মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তাদের মাধ্যমে এবং জেলা ও উপজেলা থেকে নির্যাতিত নারীদের থেকে নির্যাতন সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ ;

(৬) ধর্মীয় বিশেষজ্ঞ এবং মসজিদের ঈমামদের সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে নারী নির্যাতন ধর্মীয় মৌলিক বিধানের সাথে সংগতিপূর্ণ নাকি অসংগতিপূর্ণ, নারী নির্যাতন বন্ধে ধর্মের মৌলিক বিষয়াদি কতখানি যথার্থ সেই বিষয়ে মতামত গ্রহণ ;

(৭) প্রশ্নপত্র বিলি করে উত্তর সংগ্রহের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ।

দ্বিতীয়ত ঃ <u>সাম্প্রতিক সময়ের পত্রপত্রিকা থেকে রিপোর্ট সংগ্রহ, বিশেষ করে নারী নির্যাতন সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ</u>

পত্রপত্রিকার রিপোর্ট থেকে বর্তমান গবেষণায় নারী নির্যাতনের একটি বিশাল চিত্র অংকিত হয়েছে। গবেষণার শুরু থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত বাংলাদেশের গ্রামীন এবং শহর এলাকায় সংগঠিত নির্যাতন এবং তৎসংশ্লিষ্ট তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য পত্র পত্রিকার আশ্রয় নেয়া হয়েছে। নির্যাতনের সংশ্লিষ্ট ঘটনাটি কারা কখন কীভাবে ঘটিয়েছে এর সাথে কারা জড়িত ইত্যাদি বিষয় বিস্তারিত জানার জন্যও পত্রিকার রিপোর্টের উপর নির্ভর করা হয়েছে। এক একটি ঘটনাকে সুচারুরূপে জানা এবং বিশ্লেষনের জন্য একাধিক পত্রিকার এমনকি যে কয়টি পত্রিকা পাওয়া গেছে তার সব কয়টির সাহায্য নেওয়া হয়েছে। দৈনিক পত্রিকা থেকে ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ ও নাম ঠিকানা সংগ্রহ করা হয়েছে।

তৃতীয়ত ঃ <u>ঘটনাটি সংঘটিত হওয়ার স্থানে সরাসরি গমন করে এবং ঘটনাস্থলের কর্মরত সরকারী বেসরকারী কর্মকর্তা , সামাজক প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ</u>

ক্ষেত্র যাচাইমূলক কাজটি সম্পন্ন করা হয়েছে ঘটনাটি সংঘটিত হওয়ার স্থানে সরাসরি গমন করে এবং ঘটনাস্থলের কর্মরত সরকারী বেসরকারী কর্মকর্তা, সামাজক প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করে। এলাকার বিভিন্ন শ্রেণীর লোকদের সাথে সরাসরি কথাবার্তা, আলাপ আলোচনা, টেলিফোনে আলোচনা, প্রশ্নপত্র পূরণ ও ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে ঘটনাটির সঠিক ও বিস্তারিত তথ্যাবলী জানার চেষ্টা করা হয়েছে। এলাকার সাধারণ মানুষ, দিন মজুর, মসজিদের ঈমাম, মাদরাসা, স্কুল ও কলেজের শিক্ষক, জনপ্রতিনিধি - বিশেষতঃ মেম্বার চেয়ারম্যান ও সাংবাদিক এবং এলাকায় কর্মরত এনজিও কর্মকর্তা এবং সরকারী কর্মকর্তাগণের সহযোগিতায় তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

চতুর্থত ঃ সঠিক তথ্য উপাত্ত সংগ্রহের নিমিত্তে প্রশ্নপত্র তৈরী করে কার্যক্রম গ্রহণ

সঠিক তথ্য উপাত্ত সংগ্রহের নিমিত্তে প্রশ্নপত্র তৈরী করে এর ভিত্তিতে জরিপ কার্য পরিচালনা করা হয়েছে, যাতে করে মাঠ পর্যায়ে থেকে ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্টদের নিকট থেকে সঠিক তথ্য আনা সম্ভব হয়। সর্বমোট তিনটি প্রশ্নপত্র তৈরী করা হয়েছে -

(ক) ১নং প্রশ্নটি তৈরী করা হয়েছে সমাজের এলিট শ্রেনী, সরকারী উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, আইনজীবি মাঠপর্যায়ে কর্মরত কর্মকর্তাগণের জন্য। জেন্ডার ইস্যু, নারী নির্যাতন এবং ধর্মের বিষয়ে তাদের পরিস্কার ধারণা সংগ্রহের জন্য। সরকারী বেসরকারী কর্মকর্তা এবং এনজিওদের মতামত ও এর মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে। জেলার এবং উপজেলার মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা গণের সাক্ষাৎকার ও গ্রহণ করা হয়েছে। যেহেতু এদের প্রায় সকলেই মানবাধিকারের জন্য কাজ করে থাকেন তাদের সুস্পষ্ট মতামত ও মনোভাব জানার জন্য এ প্রশ্নপত্র তৈরী করে দেশের শীর্ষস্থানীয় ১৬২ জনের সাক্ষাৎকার ভিত্তিক জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

(খ) ২নং প্রশ্নপত্রটি তৈরী করা হয়েছে দেশে বিদ্যমান মসজিদ সমূহের ঈমাম সাহেব/ ধর্মীয় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব গণের জন্য। যেহেতু ধর্মীয় অপব্যাখ্যার সাথে ধর্মীয় নেতৃস্থানীয়দের জড়িত করা হয় এবং ধর্মীয় বিষয়াদি বাস্তবায়নে ঈমামগণ প্রত্যক্ষভাবে জড়িত সে কারণে ঈমামসাহেব গণের সুস্পষ্ট মতামত জানার জন্য তাদের জন্য আলাদা প্রশ্নপত্র তৈরী করা হয়েছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকার সর্বমোট ১১৫জন ঈমামগণের সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে প্রশ্নপত্র জরিপের কাজ করা হয়।

(গ) ৩ নং প্রশ্নটি তৈরী করা হয়েছে নির্যাতনের শিকার নারীদের জন্য। যে নারীটির উপর নির্যাতনমূলক শাস্তি কার্যকর করা হয়েছে অথবা সামাজিক চাপ সৃষ্টি করা হয়েছে অথবা একঘরে করা হয়েছে কিংবা তালাক দেয়া হয়েছে কিংবা নারীরা পৃথক অবস্থানে যেতে বাধ্য হয়েছে সেই নারীদের জন্যই করা হয়েছে এ প্রশ্নমালাটি। তার মাধ্যমে ৫০টি জেলা থেকে ৬৪ জন নির্যাতিত নারীর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে।

৪. নারী নির্যাতনের ঘটনা সমীক্ষা (Case study)

নারী নির্যাতনের বেশ কিছু ঘটনা গবেষণা চলাকালীন সময়ের পত্র পত্রিকার থেকে উদাহরণ হিসেবে সংগ্রহ করা হয়েছে। যা ৫ম অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়েছে। আবার বিভিন্ন জেলায় জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা যারা নারী নির্যাতন বন্ধের লক্ষ্যে কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকেন তাদের মাধ্যমে এবং কখনও সরাসরি ভিকটিমদের কাছ থেকে প্রশ্নপত্র এবং সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে নিম্নে উল্লেখিত পরিমান তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে-

(১) ঢাকা বিভাগের বিভিন্ন জেলা থেকে ৮ জন নির্যাতিত নারীর;
(২) চট্টগ্রাম বিভাগের বিভিন্ন জেলা থেকে ১১ জন নির্যাতিত নারীর;
(৩) রাজশাহী বিভাগের বিভিন্ন জেলা থেকে ১১ জন নির্যতিত নারীর;
(৪) খুলনা বিভাগের বিভিন্ন জেলা থেকে ২৫ জন নির্যতিত নারীর;
(৫) জেলার নাম উল্লেখ নেই এই রকম ৪ জন নারীর।

৫. উপাত্ত বিশ্লেষণ কৌশল এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ

মানুষের সহজাত প্রবৃত্তির মত পৃথিবীর সূচনালগ্ন থেকে মানুষ যেমন ধর্মের অনুসরণ করে আসছে ঠিক তেমনি এর ভুল ব্যাখ্যা বা অপব্যাখ্যাও হয়ে আসছে। কেউ কেউ ধর্মের ভুল ব্যাখ্যা করে আসছেন অথবা তার ভুল অনুসরণ করেছেন সৎউদ্দেশ্যে অথবা না জেনে। আবার কেউ কেউ এর ভুল ব্যাখ্যা করেছেন অসৎ উদ্দেশ্যে। অতএব এ কথা বলা যায় ধর্মের অপব্যবহার বা অসদ্ব্যবহার সকল যুগে ও সকল সময়ে হয়েছে এবং হচ্ছে। সুতরাং ধর্মীয় বিধানের ব্যবহার, অপব্যবহার ও অসদ্ব্যবহার কোন একটি নির্দিষ্ট সময়ের সাথে জড়িত না হলেও বাংলাদেশে এমন কিছু ঘটনা সংঘঠিত হচ্ছে, যেগুলো দেশে এমনকি বিদেশে প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক্স মিডিয়ার মাধ্যমে ব্যাপক প্রচার লাভ করছে। যার মাধ্যমে প্রতীয়মান হচ্ছে বাংলাদেশে নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটছে পর্যাপ্ত পরিমানে। জেন্ডার ইস্যুর মাধ্যমে যদিও নারী মুক্তির কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে কিন্তু নারীদের ঘিরে ধর্মীয় অপব্যাখ্যার কারণে নারীমুক্তি সকল কার্যক্রমই বাধাগ্রস্থ হচ্ছে। আবার ধর্মের সঠিক ব্যাখ্যা না জানার কারণেও জেন্ডার ইস্যু ফলপ্রসু হতে সক্ষম হচ্ছেনা।

বর্তমান গবেষণায় জেন্ডার ইস্যু এবং ধর্মীয় মৌলিক বিষয়াদি অন্বেষনের ক্ষেত্রে আনুষঙ্গিক বই পত্র, গবেষণা গ্রন্থাদি পর্যালোচনা করে গবেষণার ভিত্তি তথা জেন্ডার ইস্যু এবং জেন্ডার ইস্যুর প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের অবস্থা এবং ধর্মীয় মৌলিক বিষয়াদি চিহ্নিত করে তৈরী করা হয়েছে গবেষণার মৌলিক ভিত্তি। গবেষণায় নারী নির্যাতনের বিষয় **বর্ণ**নার কালে তার প্রেক্ষিতে বিদ্যমান অবস্থা দেখাবার জন্য প্রত্যেকটি নির্যাতনের বিষয় পর্যালোচনা করে উদাহরণ হিসেবে তৎসংশ্লিষ্ট সংগঠিত নির্যাতনের অবস্থা দেখানো হয়েছে।

আবার গবেষণার শেষে সরাসরি নির্যাতিত নারীদের গৃহীত সাক্ষাৎকার সহ তাদের উপর নির্যাতনের বাস্তব চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। একই সাথে জেন্ডার বিশেষজ্ঞ, ঈমামগণ, নির্যাতিত নারী, বিশেষজ্ঞগণের মতামত, প্রশ্নমালার মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে উপরে বর্ণিত পদ্ধতিতে গৃহিত সিদ্ধান্ত যাচাই এর মাধ্যমে একই সাথে যাবতীয় বিষয় বিশ্লেষণের মাধ্যমে লব্ধ ফলাফলের ভিত্তিতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে যাওয়া হয়েছে।

এভাবে কিছুটা নৃতাত্বিক কিছুটা সামাজিক ইতিহাস তথা সাহিত্য ইতিহাস ও সাহিত্য সমালোচনার বিবিধ পদ্ধতি অবলম্বন করে পরিচালনা করা হয়েছে এই গবেষণা কার্যক্রম।

১.৭. গবেষণার ক্ষেত্র

পুরো বাংলাদেশের নারীদের ঘিরে বিদ্যমান অবস্থাই বর্তমান গবেষণার ক্ষেত্র হিসেবে ধরা হ[illegible]।

১.৮. গবেষণার সীমাবদ্ধতা

বর্তমান গবেষণাটি মূলতঃ ইসলাম ধর্মকে কেন্দ্র করে পরিচালিত হয়েছে। যদিও বাংলাদেশে বিদ্যমান সব ক'টি ধর্মেই অপব্যাখ্যা ও কুসংস্কার প্রবেশ করিয়ে ধর্মের মৌলিক বিষয়াদিতে যথেষ্ট পরিবর্তন করা হয়েছে। সে অবস্থায় বাংলাদেশে বিদ্যমান সবক'টি ধর্ম ও ধর্মীয় বিধিবিধান পর্যালোচনা করে গবেষণাটি পরিচালনা করা হলে গবেষণাটি একটি বিশাল আকার ধারণ করতো, যাতে বিস্তর সময়েরও প্রয়োজন হতো। সময়ের সীমাবদ্ধতার কারণে বর্তমানে অন্যান্য ধর্মের উপর সামান্য আলোকপাত করে অন্যান্য ধর্মের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনায় না যাওয়ার সীমাবদ্ধতা বিদ্যমান রেখেই গবেষণাটি পরিচালনা করা হয়েছে।

১.৯. গবেষণার বিষয়বস্তুর বিন্যাস

গবেষণা কার্যক্রমটি উপসংহার সহ মোট ৮ টি অধ্যায়ে ভাগ করা হয়েছে -

প্রথম অধ্যায়ে হলো ভূমিকা| এখানে গবেষণার যৌক্তিকতা, তাৎপর্য ও প্রয়োজনীয়তা, গবেষণার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, পদ্ধতি, সীমাবদ্ধতা এবং সংগঠন ইত্যদির উপর বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

নারী মুক্তি কি ও কেন তা বিশ্লেষিত হয়েছে **দ্বিতীয় অধ্যায়ে** । দেখানো হয়েছে নারী মুক্তি হলো নারীদের নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা করা বা রক্ষা পাওয়া এবং সামাজিক ও পারিবারিক সম্মানজনক অবস্থান সৃষ্টি হওয়া। একই সাথে নারী মুক্তির লক্ষ্যে জেন্ডার ইস্যু নামীয় আন্তর্জাতিক ইস্যুটি সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে। জেন্ডার ইস্যু নারী মুক্তির লক্ষ্যে একটি আন্তর্জাতিক উদ্যোগ। আন্তর্জাতিক ভাবে নারী মুক্তির লক্ষ্যে প্রাথমিক পর্যায়ে নারীর কল্যান সাধন, দারিদ্রতা বিমোচন, কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি সহ নারীকে বেশ কিছু সুযোগ সুবিধা প্রদান সংক্রান্ত বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে নারীদের অবস্থা পরিবর্তনের কার্যক্রম শুরু করে। অতঃপর আসে জেন্ডার, জেন্ডার ও উন্নয়ন, জেন্ডার মেইনস্ট্রিমিং এবং জেন্ডার বাজেটিং ইত্যাদি কর্মসূচীর মাধ্যমে বিভিন্ন কার্যক্রম। এরই মাঝে চলতে থাকে নারী মুক্তির লক্ষ্যে 'নারীবাদে'র বিভিন্ন ধারণা। এসব কিছুর উপরই বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে **দ্বিতীয় অধ্যায়ে।**

নারী উন্নয়ন, জেন্ডার ইস্যু, নারীবাদ ইত্যাদি বিভিন্ন মতবাদ/ তত্বের আলোকে স্বয়ং জাতিসংঘ গ্রহণ করে নারী মুক্তির লক্ষ্যে বিভিন্ন উদ্যোগ। মানবাধিকার সনদ, নারীর প্রতি সকল প্রকারের বৈষম্য বিলোপ সনদ (CEDAW), নারী মুক্তির লক্ষ্যে ১২টি নিদিষ্ট বিষয় সনাক্ত করে বেইজিং ফ্লাটফরম ফর এ্যাকশন (১৯৯৫) - এর বেইজিং ঘোষণা ও কর্মপরিকল্পনা তার মধ্যে অন্যতম। একই সাথে মিলিনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল(এমডিজি), বিশ্বব্যাংক, আই এম এফ কর্তৃক প্রণীত দারিদ্র হ্রাস করণ কৌশলপত্র বা পি আর এসপি ও রয়েছে। এই সব আন্তর্জাতিক উদ্যোগ সমুহ বিশ্বব্যাপি নারী জাতির মুক্তি ও নারীদের অবস্থার উন্নয়নের দিকনির্দেশনা। বাংলাদেশ ও তার মধ্যে বিদ্যমান। প্রতিটি আন্তর্জাতিক ইস্যুকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশ গ্রহণ করে যাচ্ছে একের পর এক উদ্যোগ ও ব্যবস্থাদি। আন্তর্জাতিক দিক নির্দেশনার আলোকে বাংলাদেশের গৃহীত কার্যক্রমের অবস্থা বুঝতে হলে এই দিক নির্দেশনা সমুহের উপর ধারণা প্রয়োজন। সেই লক্ষ্যেই গ্রন্থের **তৃতীয় অধ্যায়ে** এইসব আন্তর্জাতিক দিকনির্দেশনা সমূহের উপর বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে জেন্ডার ইস্যুর আলোকে জাতিসংঘের গৃহিত উদ্যোগ সমূহের প্রেক্ষিতে শরীক রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অবস্থান তুলে ধরা হয়েছে। তাতে দেখানো হয়েছে যে, স্বাধীনতার ঊষালগ্ন থেকেই নারী মুক্তির লক্ষ্যে বাংলাদেশ কাজ করে যাচ্ছে। জেন্ডার ইস্যুর আলোকে জাতিসংঘের উদ্যোগ তথা জাতিসংঘের হস্তক্ষেপের কারণে তা আরো দৃঢ় হয়েছে, বিভিন্ন উদ্যোগ ও একের পর এক গৃহিত হয়েছে। নেওয়া হয়েছে প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ। নারী শিক্ষা, চাকুরী প্রাপ্তি, স্বাস্থ্যের উন্নতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে যথেষ্ট সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে। আইন কানুন সৃষ্টি হয়েছে প্রচুর, সে সব দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর করার প্রয়াস ও নেওয়া হয়েছে। নারীরা বিচার প্রার্থী হতে পারছে। মানবাধিকার সনদ, নারীর প্রতি সকল প্রকারের বৈষম্য বিলোপ সনদ (CEDAW), বেইজিং প্ল্যাটফরম ফর এ্যাকশন (BPFA) -১৯৯৫ এর আলোকে বেইজিং ঘোষণা ও কর্মপরিকল্পনা, মিলিনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল (MDG), দাবিদ্র হ্রাস করণ কৌশলপত্র বা পি আর এস পি (PRSP) এর আলোকে প্রণীত হয়েছে নারী উন্নয়ন নীতিমালা এবং এই নীতি মালার আলোকে গৃহীত হয়েছে এবং হচ্ছে

যাবতীয় কার্যক্রম। তারই আলোকে গৃহীত যাবতীয় কার্যক্রমের উপর বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়েছে **চতুর্থ অধ্যায়ে** ।

৫ম অধ্যায়ে তুলে ধরা হয়েছে বাংলাদেশের নারী নির্যাতনের বাস্তব সব চিত্র। সেগুলো হলো- হত্যা, ধর্ষণ, অ্যাসিড নিক্ষেপ, যৌতুক জনিত নিষ্ঠুরতা, বাল্য বিয়ে, ইভটিজিং বা যৌন হয়রানী, ফতোয়াবাজী, নারী ও শিশু পাচার, গৃহ পরিচারিকা নির্যাতন, পারিবারিক নির্যাতন, আত্মহত্যা ইত্যাদি। আবার হত্যাকে আত্মহত্যার নামে প্রচার, মুঠো ফোনে আপত্তিকর ভিডিও ধারণ করে আর্থিক, শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন সহ আরও বিভিন্ন প্রকারের নিষ্ঠুর সব নির্যাতনের চিত্র। সাম্প্রতিক সময়ের পত্র পত্রিকায় উল্লেখিত ঘটনাকে উদাহরণ হিসেবে নিয়ে বিস্তারিত তুলে ধরা হয়েছে এখানে। নারী নির্যাতনের এ চিত্র থেকে এটি স্পষ্ট যে, বাংলাদেশে বিদ্যমান জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক বিশাল কার্যক্রম সত্বেও মুক্তি মেলেনি নারী জাতির। স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন আসে কিন্তু কেন? এর উত্তর খোজা হয়েছে পরের অধ্যায়ে।

এটি একটি অশ্চর্যের ব্যাপার যে, যুগ যুগ ধরে নারীজাতিকে নিয়ে বিশেষভাবে পুরুষ সমাজ কর্তৃক নারী নির্যাতন সহ যে সব জঘন্য ঘটনা ঘটানো হচ্ছে তার বেশির ভাগই হচ্ছে ধর্মের নামে। যেন ধর্ম পুরুষদেরকে এ ধরনের নির্যাতনের অধিকার দিয়ে রেখেছে। যে নারীর গর্ভে তাদের জন্ম, যে নারী নিজের জীবন বাজি রেখে তাদেরকে দেখাচ্ছে এই পৃথিবীর আলো, সেই নারীকেই তারা আপন হাতে নির্যাতন করেই যাচ্ছে। এটি আরও আশ্চর্যের ব্যাপার যে, এ বিষয়ে কেউ কথা বলছেন না। মূলতঃ বিস্তারিত ভাবে ধর্মকে অনুশীলন করা হচ্ছেনা এবং ধর্মের প্রকৃত তথ্যও উন্মোচন করা হচ্ছেনা। সমাজে হয় ধর্মকে বাদ দেয়ার কথা বলা হচ্ছে নতুবা ধর্মের পরিবর্তে অন্য কিছু গ্রহণের কথা বলা হচ্ছে। অথচ মূল সত্য নিয়ে কথা বলা হচ্ছেনা। মূল সত্য এখানে যে, ধর্ম মূলতঃ নারী নির্যাতনের হাতিয়ার নয় বরং ধর্মই নারী মুক্তির দিশা। গবেষণার **৬ষ্ঠ অধ্যায়ে** বিশেষতঃ ইসলাম ধর্মের ক্ষেত্রে পবিত্র কুরআনে নারী সংশ্লিষ্ট বেশ কিছু বিষয়ের ক্ষেত্রে, হাদিস, শরীয়ার বিধান এ ভুল এবং অপব্যাখ্যার বিষয়টি প্রখ্যাত ইসলামিক চিন্তাবিদগণের প্রদত্ত ব্যাখ্যার আলোকে তুলে ধরা হয়েছে এবং দেখানো হয়েছে যে ধর্মের মৌলিকত্বে নারী নির্যাতনের কোন সুযোগই নেই বরং ধর্মই নারী মুক্তির দিশা ।

৭ম অধ্যায়ে সার্বিক অবস্থার উপর একটি পর্যালোচনা করা হয়েছে। নারী মুক্তির লক্ষ্যে দেশী বিদেশী এবং আন্তর্জাতিক এতসব উদ্যোগের পরও কেন নারী জাতির মুক্তি ঘটছেনা, হচ্ছেনা নারীদের অবস্থার উন্নয়ন তা বোঝার জন্য বাংলাদেশের গৃহীত কার্যক্রমের এবং উদ্যোগ সমূহের সীমাবদ্ধতা এবং একই সাথে আইনী সীমাবদ্ধতা কি এবং কোথায় সে চিত্র তুলে ধরা হয়েছে ৭ম অধ্যায়ে। ৭ম অধ্যায়ে আরও তুলে ধরা হয়েছে জেন্ডার ইস্যু, নারীবাদ এবং সিডো সনদ, পিএফ্এ, এমডিজি এবং পিআরএসপির কিছু সীমাবদ্ধতা এবং ধর্মের সাথে তাদের প্রতিবন্ধকতা।

অতঃপর **৮ম অধ্যায়ে** এসে বিষয়টির উপর পর্যালোচনা করে দেখানো হয়েছে যে, ধর্মেই রয়েছে নারীজাতির অধিকার এবং মর্যাদা। সেখানেই রয়েছে নারী মুক্তির সত্যিকারের দিশা। জেন্ডার ইস্যু , নারীবাদ এবং ধর্মীয় বিষয়াদির উপর - ধর্মীয় বিষয়ে নেতৃত্বদানকারী মসজিদের ঈমামগণের একই সাথে নারী নেতৃগণের এবং নির্যাতিত কিছু নারীদের সাক্ষাৎকার গ্রহনের মাধ্যেমে তাদের মতামত পর্যালোচনা করা হয়েছে। দেখা গেছে তারা জেন্ডার ইস্যুর মাধ্যমে নারী জাতির মুক্তির প্রত্যাশা করছেন। অনেকেই ধর্মের সাথে এর সমন্বয় প্রত্যাশা করেছেন। বাংলাদেশের সমাজে বিদ্যমান বেশ কিছু অপব্যাখ্যা এবং কুসংস্কার সমূহ সনাক্ত করে সেগুলো অপনোদনের মাধ্যমে ধর্ম কিভাবে নারীর অধিকার এবং মর্যাদাকে নিশ্চিত করেছে তা বিশ্লেষণ করে

নারীর অধিকার এবং মর্যাদার বিষয়ে ধর্মের মৌলিক আদর্শকে আরও স্পষ্ট করা হয়েছে এই অধ্যায়ে। এবং ধর্মের মৌলিক আর্দশের ভিত্তিতে নারীর মর্যাদাকে তার অধিকারের সাথে বিবেচনা করে জেন্ডার ইস্যুর সাথে সম্পৃক্ত করে জেন্ডার এবং নারীর মর্যাদা নামীয় এ্যাপ্রোচটির উদ্ভাবন করে জেন্ডার ইস্যুর সাথে একটি নতুন ইস্যু সম্পৃক্ত করার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে গ্রন্থের **৮ম অধ্যায়ে**।

সেই আঙ্গিকে পবিত্র কুরআনে প্রদত্ত নারী - পুরুষের সমান অধিকারের সাথে নারীর মর্যাদার সমন্বয়ের মাধ্যমে জেন্ডার ইস্যুর সাথে নতুন একটি এপ্রোচের প্রস্তাব এর মাধ্যমে সমাপ্তি টানা হয়েছে **বাংলাদেশে নারী মুক্তির ক্ষেত্রে জেন্ডার ও ধর্মের অবস্থান ঃ একটি বিশ্লেষণ-** শিরোনামে গবেষণা কার্যক্রম।

দ্বিতীয় অধ্যায়

নারী মুক্তির লক্ষ্যে নারী উন্নয়ন, জেন্ডার এবং নারীবাদ

একটি রাষ্ট্র নির্ভর করে সেই রাষ্ট্রের সমাজ ব্যবস্থার উপর। আর সমাজ ব্যবস্থা নির্ভর করে পরিবার ব্যবস্থার উপর। অর্থাৎ একটি পরিবারই হলো রাষ্ট্রের চাবিকাঠি। আর পরিবারের চাবিকাঠি হলেন সেই পরিবারের মা তথা নারী। কারণ যেই মানব সন্তানদের নিয়ে গড়ে ওঠে পরিবার এবং রাষ্ট্রের সমাজ ব্যবস্থা, সেই মানব শিশুদের গর্ভে ধারণ করেন, জন্ম দেন, জন্মের পরে নিজের বুকের দুধে তিলে তিলে বড় করেন - মা। তাই একটি সভ্য সমাজ গড়ে তুলতে হলে এবং পরিবারকে, সমাজকে, রাষ্ট্রকে সত্যিকার অর্থে উন্নতির পর্যায়ে নিতে চাইলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন পরিবারে শান্তি। পরিবারের শান্তির চাবিকাঠি হলেন - সেই মা তথা নারী। কারণ তাঁর পক্ষেই সন্তানদের তথা রাষ্ট্রের নাগরিকদের যথাযথ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা সহজ ও স্বাভাবিক। তাই নারীকে তথা মা'কে হতে হবে মুক্ত মনের মানুষ। মননে মেধায় যিনি পরিপূর্ণ। তাঁকে নিয়ে আসতে হবে উন্নয়নের পর্যায়ে। আর সেজন্যই তাঁকে নির্যাতন করা যাবেনা। দিতে হবে মানুষের মর্যাদা।

এই সত্য উপলব্ধি করার কারণেই বর্তমানে দেশে- বিদেশে, আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সর্বত্রই নারী মুক্তির বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত হচ্ছে। শুধু বিবেচনাই নয়, বর্তমান বিশ্ব নারী মুক্তির বিষয়ে সোচ্চার হয়ে ওঠেছে, গ্রহণ করছে পদক্ষেপের পর পদক্ষেপ। তন্মধ্যে জেন্ডার ইস্যু অন্যতম।

বিশ্বজুড়ে নারী মুক্তির বিষয়ে গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে বুঝতে হলে প্রথমেই বুঝতে হবে নারী মুক্তি কি এবং কেন? অতঃপর দেখা যাবে এই বিষয়ে গৃহীত জেন্ডার এবং তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়াদির ধরণ- ধারণ।

২.২ নারী মুক্তি কি এবং কেন

করা ক্তুম কীরান কথেঅত্যাচার ও বৈষম্য ে ,প্রকার নির্যাতন হচ্ছে সকল ক্তনারী মু ,সহজ ভাষায় বলা যায় (পুরুষ উভয়েই - নারী) মানুষ মাত্রই ,এটি সত্যি যে ।াক্ষবুস রীরান বাভে কজামাস ও র্কথএবং আ এ প্রসংঙ্গে রুশোর সেই অবিস্মরণীয় বাণী ।াকেথ নির্যাতনের ঝুকি বহন করে এবং নির্যাতিতও হয়ে ।"কজেনেখিদেকন্তু সর্বত্রই সে শৃঙ্খলিত হেয়ে জন্মায় বটে ক্তি"মানুষ মু ,উল্লেখযোগ্য[১]

নির্যাতনের ক্ষেত্রে ,াপিও এটি সত্য যেথত ,াই বলেছেনথপুরুষ উভয়ের নির্যাতনের ক- ও রুশো নারীদয নারীরাও নির্যাতিত হয়তো বটেই একই থকারণ সমাজে পুরুষের সা ।নারীর নির্যাতনের মাত্রা অত্যধিক া নারী হবার কারণেই তার চেয়েও অধিক নির্যাতন ভোগ করেথনারী শুধুমাত্র তার লিঙ্গীয় পরিচয়ে ত থসা ।াকেথ

এ প্রসঙ্গে মোবাশ্বেরা খানমযথার্থই বলেছেন, " বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত সাফল্যের শিখর স্পর্শী সভ্যতার এই বিপুল আয়োজনের সাথে যেমন জড়িয়ে আছে শিক্ষিত মুক্ত চিন্তার মানুষের মেধা ও মননচর্চা এবং নতুন

---

[১]. উইনিফ্রেড হল্টবি ঃ Women and a changing Civilization, ১৯৩৪, (ভাষান্তর ঃ মোবাশ্বেরা খানম ' নারী এবং ক্রমপরিবর্তিত সভ্যতা' গ্রন্থের ভুমিকায় প্রদত্ত মোবাশ্বেরা খানম এর নিজস্ব বক্তব্য, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৭।

ও সুন্দরের সাধনা, তেমনি এর প্রতিটি পদক্ষেপই কিন্তু রক্তাক্ত হয়েছে সেই সব তথা কথিত অজ্ঞ, অন্ত্যজ, শ্রমজীবি মানুষের শোণিত ধারায়, সমাজে যারা চিরকাল ব্রাত্য বলে উপেক্ষিত, সমাজে যাদের অবস্থান প্রান্তিক। আবার এই সত্যের গভীরে লুকিয়ে আছে আরও একটি নিদারুন এক মর্মান্তিক সত্য যে, সেই দুর্বল, শোষিত মানুষের মতই আরো একটি প্রজাতি আরো অবহেলিত ও নির্যাতিত হয়ে আসছে নীরবে, যার নাম – নারী, যাকে পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে স্বীকার করতেও একসময় দ্বিধান্বিত ছিল পুরুষ সমাজ। এমনকি যে পুরুষ-শ্রেণী নিজেরা বৈষম্যের শিকার তারাও 'মেয়ে - মানুষ' আখ্যা দিয়ে অস্বীকার করার চেষ্টা করেছে তার মানবিক অস্তিত্বকে। বলতে গেলে অষ্টাদশ শতকের আগ পর্যন্ত পশ্চিমে এবং প্রাচ্যে, আমাদের এই প্রাচীন সভ্যতা গর্বী উপমহাদেশেও নারী মানুষ হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়া দূরে থাক, পুরুষহীন অবস্থায় একাকী বেঁচে থাকার অধিকার পর্যন্ত হারিয়েছে বহু বছর বহুকাল ব্যাপী"।[২] তিনি আরও বলেন, "আশ্চর্যের নয়কি যে নারী গর্ভজাত পুরুষই সেই আদিকাল থেকে তার বুদ্ধি বৃত্তিকে ব্যবহার না করে বরং নানা পন্থায় সতীত্ব, মাতৃত্ব, সমাজ, সভ্যতা, পরিবার ও সন্তান ইত্যাদির দোহাই দিয়ে তাকে বন্দীই কেবল করে রাখতে চায়নি, তার সমস্ত অধিকার হরণ করেছে; তার মেধা, জ্ঞান ও যৌক্তিক ক্ষমতার যে কোন ধরনের বিকাশকে স্তব্ধ করে রাখতে চেয়েছে। পেশী শক্তি ও দৈহিক ক্ষমতার সাথে কতিপয় পুরুষের শক্তির একচ্ছত্র আধিপত্যই যেন গড়ে তুলেছে সে সমাজ, যেখানে নারী নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর আর তাই এই একবিংশ শতাব্দীতেও সমাজের একটি প্রধান বিশেষণ- পুরুষতান্ত্রিক"।[৩]

আর আজও বিশ্ব জুড়ে নারীরা সেই 'পুরুষতান্ত্রিকতার' কবলেই হয়ে আছে বন্দী ।

১৯৩৪ সালে প্রকাশিত হয় উইনিফ্রেড হল্টবির Women and a changing Civilization নামীয় গ্রন্থখানি। যা বাংলাভাষায় ভাষান্তর করেন মোবাশ্বেরা খানম, "নারী এবং ক্রম পরিবর্তিত সভ্যতা" নামে।
,ইউরোপ ,মিসর ,গ্রীস ,হল্টবী ও তাঁর এই গ্রন্থে কালকে ক্রমানুসারে সাজিয়ে স্থানকে প্রসারিত করে তরেক তরেক্তস্রগাধাব কশোকবি কিসনিাম রীরান বাভে কর্তির্নযপ ষবতরাভ ও য্চাপ্যধম কথেআমেরিকা ে ,গুয্যধম কথেখিয়েছেন প্রাচীন সমাজ দেনারীকে করে ফেলা হয়েছে পুরুষতন্ত্রের ইচ্ছাধীন তা বিস্তারিত ে ।প্রক্ষিতের দেইত্যাদিও নাৎসীবা দফ্যাসিবা ,সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা ,দপুজিবা ,দসামন্তবা[৪]সালে ১৯৪৯ আর ন্গ ীয়জলাক ররয়েভুবে য্দ প্রকাশিত সিমন্থ The Second Sex এ সিমন তাঁর জীবন বোধের অভিজ্ঞতা থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, - নারী হয়ে কেউ জন্মায় না ধীরে ধীরে নারী হয়ে উঠে। তাঁর বইয়ের প্রথম পংক্তিতেই তিনি উল্লেখ করেছেন যে, Women? Very simple, say the Fanciers of formulasঃ she is a womb, an ovary; She is a female this word is sufficient to define her। [৫] এটিই হলো নারীর লিঙ্গীয় পরিচয়, যা তাকে গৃহবন্দী করে রেখে, নির্যাতনের চরম শিখরে নিয়ে পৌঁছিয়েছে।

---

[২]. মোবাশ্বেরা খানম ঃ পূর্বোক্ত, পৃঃ ১১।

[৩].পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ১১

[৪]. উইনিফ্রেড হল্টবি ঃ "নারী এবং ক্রম পরিবর্তিত সভ্যতা, ১৯৩৪, ভাষান্তর ঃ(মোবাশ্বেরা খানম ,পূর্বোক্ত),২০১০, পৃ ঃ ৩৩-৫৮।

[৫]. Simone De Beauvoir ঃ The Second Sex,translated by H.M. parshley,Vintage Books, Random House, New York, উদ্ধৃত করেন মোবাশ্বেরা খানম,পূর্বোক্ত পৃ ঃ ১৭।

াহরণ দী করে রাখার উদনারীকে গৃহবন ।রাখা ী করেদম সুযোগই হলো নারীকে গৃহবন্দনারী নির্যাতনের প্র রশদেকারণ পুরো উনবিংশ শতাব্দি ধরে পাকভারত উপমহা ।য়া যায়দ কথেশ দেপাকভারত উপমহা গারে ীক্ষা বঞ্চিতদশিক্ষা ,রদে কথে কথেআলো বাতাস ক্তুনিয়ার মুদ তারা ছিল ীদনারীরা ছিল গৃহে বন র্যস্পর্শা রমণী অস ।া ছিল আভিজাত্যের পরিচায়কী করে রাখব কীরান জামেস স ।নীহাসৎকচি কাশে ।ণীত্ব অ লব্ব অ লছ ারাত য়গে তিয়েভার পালন করদ হওয়ার া কত কঠোর ছিল এপ ইএ মানে র্দিপ । বাসিনী' নামীয় লেখায়-করেছেন বিশ শতকের শুরুতে বেগম রোকেয়া তাঁর ' অবরোধ ক্তপ ব্যব্রতার স ।া কিছু বলিথএখন নিজের ক ।কুকথ রদে ।থ"অপরের ক ,নলবে কপেম্স রজনে িয়কারে মগব নাখেস ছাই কিছুই বুঝিতামনা ।তইহ তরেকি দির হইতেও পদসবে মাত্র পাচঁ বৎসর বয়স হতেই আমাকে স্ত্রী লোক ,রতো অন্তঃপুরে যাইতে নিষেধদপুরুষ ।তইহ তরেকি দিচ পথঅ ;ইান তহোয খ্রুম্স ওরাহাক নক ,য র দচ তাহাথেঅ - কিন্তু মেয়ে মানুষের অবাধ গতি ।সহিতে হয়নাই র অত্যাচার আমাকেদসুতরাং তাহা অমনি বাড়ির লোক ;পাড়ার স্ত্রীলোকেরা হঠাৎ বেড়াইতে আসিত ।খিতেই লুকাইতে হইবেদখিতে না দে কখনও কোন ,ঘরে ঝাঁপের অন্তরালেকখনও রান্না -আমি যেন প্রাণ ভয়ে যত্রতত্র ,চক্ষুর ইসারা করিত ।"চীন রষাপেক্তেকখনও ত ,অভ্যন্তরে রচাকরানীর গোল করিয়া জড়াইয়া রাখা পাটি[৭]

কথের লেখাপড়া দী করে রাখা এবং তাদের গৃহবন্দবীর সর্বত্রই নারীথেএভাবে শুধু পাকভারতেই নয় পৃ র উপর একের পর এক শারীরিক ও মানসিক নিপীড়ন দবঞ্চিত রাখার সুযোগে পুরুষ কর্তৃক যুগযুগ ধরে নারী ।াকেথ য়া চলতেইওদুঃখ দে যন্ত্রনা ও ,বিহীন কষ্ট দরকে প্রতিবাদাকে সহজেই এবং তাথে করা হতে । াকে অবাধেথ তলেচ্ছ র্নযপ ারক া্যতহ রকে রশু কথের মারধর করা দেনারী

বী থ্পি নার্মতব ্যনজ রারক রাদ্ধউ কথেলক অবস্থান ট্রীজীবন এবং নির্যাতনমদনারীজাতিকে এ ধরনের বন র ক্তমি কথে তার ।নির্যাতনের সংজ্ঞা নির্ধারণ করা হচ্ছে জাতিসংঘ কর্তৃক নারী ।ার হয়ে উঠেছেচ স তম সভার সিদ্ধান্ত মাফিক নারীর প্রতি কঠোর ৮৫ রদজাতিসংঘের সাধারন পরিষ ।উপায় বের করা হচ্ছে ছ হে ালব য়দেআচরণকে সহিংসতা আখ্যা ি, ''এমন কোন কাজ বা আচরণ যা নারীর শারীরিক, মানসিক এবং যৌন ক্ষতির কারণ সহ বিভিন্ন প্রকারের দুর্ভোগের কারণ হয়, যাতে হুমকি প্রদান, তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজে বাধ্য করা, তার স্বাধীনতা হরণ করা হয় - সেই ঘটনা ব্যক্তিগত বা প্রকাশ্যে যেভাবেই ঘটে থাকুক না কেন - তা-ই নারীর প্রতি সহিংসতা।[৮]

জাতিসংঘের ,এ ১৯৯৩ ,Declaration On the Elimination of Violance Against Women ুর্ভোগের দ তাকে ক্ষতিগ্রস্থ ও ,নাহত করেদব বাভেকবজি ,মানসিক ,করীরাশ কীরান ায ণরচাঅ বসয

[৬].রওশন আরা বেগম ঃ নবাব ফয়জুন্নেছা ও পূর্ববঙ্গের মুসলিম সমাজ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারী ২০১১, পৃ ঃ ১২০।

[৭].বেগম রোকেয়া ঃ অবরোধ- বাসিনী, (আব্দুল কাদির সম্পাদিত ঃ রোকেয়া রচনাবলী) বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৩, পৃ ঃ ৪৮৮ -৪৮৯।

[৮].জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৮৫তম সভার সিদ্ধান্ত, উদ্ধৃত করেন খাদিজা লীনা এবং চিররঞ্জন সরকার ঃ নির্যাতিত নারী উপেক্ষিত মানবাধিকার, পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ১১।

লক কাজ ও চলা্মাছ্ববলপ্রয়োগ করে এবং নারীর স্ে ,ানদহুমকি প্র ,র্শনদভয় ভীতি প্র ,ার করেদভাগী ।ফরার ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করে সেগুলোকে নারী নির্যাতন বলা হয়েছে[৯]

জাতিসংঘের চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলন (১৯৯৫) - এর বেইজিং ঘোষণা ও কর্মপরিকল্পনার **১১৩** ধারায় যে সব আচরণ নারীর শারীরিক, যৌন ও মনস্তাত্বিক ক্ষতি বা বিপর্যয় ঘটায় বা ঘটানোর সম্ভাবনা থাকে একইসঙ্গে থাকে দমন- পীড়ন বা অবাধ স্বাধীনতা হরণের হুমকি, যা জনজীবন বা ব্যক্তিজীবন যে কোন ক্ষেত্রেই সৃষ্টি করা হয় বা সৃষ্টি করা হতে পারে তাকেই নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা বোঝানো হয়েছে।[১০]

উপরের আলোচনার ভিত্তিতে সার্বিক বিবেচনায় সুনির্দিষ্ট ভাবে বলা যায়- " নারীর প্রতি নারী ও পুরুষের এমন সব কার্যকলাপ যা তাকে মানুষ হিসাবে মূল্যায়ন তো করেইনা বরং তার ইচ্ছার স্বাধীনতায় এবং শরীর ও মনের স্বাভাবিক গতি ও বিকাশে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে এবং যাতে নারীরা শারীরিক, মানসিক এবং আর্থিক ভাবে ক্ষতির শিকার হয় এবং কখনও বা তার জীবন পুরোপুরি বিপন্ন হয়ে পড়ে- তা-ই নারী নির্যাতন বা নারীর প্রতি সহিংসতা" ।

আর নারীদেরকে এ সব সহিংসতা থেকে, সামাজিক ও পারিবারিক অসম্মান জনক অবস্থান থেকে এবং নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা করে তার জন্য সম্মানজনক একটি অবস্থান নির্ধারণ করে তা বাস্তবায়ন করাকে বর্তমান গবেষণায় **'নারী মুক্তি '** বলা হয়েছে। অর্থাৎ নারী মুক্তি হলো নারীদের জন্য পারিবারিক, সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে একটি সম্মান জনক অবস্থান সৃষ্টি হওয়া এবং নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা করা বা রক্ষা পাওয়া।সেজন্যই ক্তসমাজ এবং রাষ্ট্রকে সুশৃঙ্খল ভাবে পরিচালনার জন্য অবশ্যই প্রয়োজন নারী মু ,পরিবার ।র জন্য একটি সম্মানজনক অবস্থানদএবং প্রয়োজন তা

"শ্রেণী সমাজের সকল পর্যায়েই পুরুষতন্ত্র নারীকে ,নছলেবে ইথাথবিষয়ে জনাব যতীন সরকার য এ য়ম্ভরতা অর্জনব্স কতনির্থেযাতে অ নারী ,বঞ্চিত করে রাখার নানা কৌশল উদ্ভাবন করেছে - মানবাধিকার -জামস াব াতকতনিৈ-ধর্ম বা নীতি ,করতে না পারে সে রকম সমাজনীতি ও রাষ্ট্রীয় আইন প্রণয়ন করেছে নারীর মনোজগ ,ছয়েদেশৃঙ্খলার নামে নারীর ওপর নানা বিধিনিষেধ চাপিয়ে ি তলখিৃশ বাভেনমএ ওকে বা পুরুষের থল ভাবতে বাধ্য হয় অর্বুদ াই নিজেকে পুরুষের চেয়ে হীন ওদকরে রেখেছে যাতে নারী সর্ব মনোরঞ্জন করাকেই জীবনের চরম প্রাপ্তি বলে মনে করে"[১১] ।

র ক্তমি রজামেস ীরান কথেসংগ্রামের প্রয়োজন পুরুষতন্ত্রের শৃঙ্খল ক্তে" সেরকম মু,তাই তিনি বলেন ।জন্যও"[১২]

---

[৯]. United Nations General Assembly resulations 48/104 On Declaration On the Elimination of Violance Against Women, 1993 ধারা-১, ২।

[১০]. জাতিসংঘের চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলন (১৯৯৫) - এর বেইজিং ঘোষণা ও কর্মপরিকল্পনা, ধারা - ১১৩।

[১১]. যতীন সরকার ঃ মুক্তি (প্রবন্ধ), (সেলিনা হোসেন সম্পাদিত ঃ জেন্ডার ও উন্নয়ন কোষ) , ১ম খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ৬৩৯।

[১২]. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬৩৯।

২.৩ নারী মুক্তির লক্ষ্যে গৃহীত প্রাথমিক প্রচেষ্টা বা কার্যক্রম

র অবস্থার উন্নয়ন এবং দর্বক নারীদূরীকরণ পূদ হূমস ্যমষবৈ য়্যানঅ নাম্যদবিশ্বব্যাপি নারী ও পুরুষের মধ্যে বি /র অবস্থার উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রমদমতঃ শুরু হয় নারীথের লক্ষ্যে প্রক্তুমি কথেনির্যাতনের হাত ে ীরান নয়েনেউ' ইতণ্ণস্বঅ ।লচ মর্ক্রযাক তত্তেভি রিহূএই এ্যাপ্রোচ সম ।ণহ্গ গ্যাদএ্যাপ্রোচের মাধ্যমে উে তত্ব নারী উন্নয়ন.২ এপ্রোচ এবং .১ - যাক এসব খাদে ।' কার্যক্রমের উদ্ভব ঘটেএবং' নারী এবং উন্নয়ন ।কিভাবে পরিচালনা করছে ,ধরনের কার্যক্রম ।নকর লক্ষ্যে ক্তেহ নারী মূসিম

২.৩.১ নারীদের অবস্থার উন্নয়নে প্রাথমিক কার্যক্রম বা এ্যাপ্রোচ

জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক পরিসরে নারীমুক্তির লক্ষ্যে নারী উন্নয়নের বিষয়টি যখন গুরুত্ববহ হয়ে ওঠে তখন সামগ্রিক ভাবে নারীর উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম গৃহিত হতে থাকে। নারীদের উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রাথমিক পর্যায়ে দেশে বিদেশে যে সব কার্যক্রম বা এ্যাপ্রোচ পরিচালিত হতে থাকে, সেগুলো হ'ল -

- কল্যাণ মূলক কার্যক্রম (Welfare approach)
- দারিদ্র বিমোচন কার্যক্রম (Anty poverty approach)
- দক্ষতা বৃদ্ধি কার্যক্রম (Efficiency approach)
- সমদর্শী কার্যক্রম (Equity approach)
- ক্ষমতায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম (Empowerment approach)

এ্যাপ্রোচ সমুহের পরিচিতি এবং এ্যাপ্রোচ সমুহের আওতায় পরিচালিত কার্যক্রম নিম্নরূপ -

১. কল্যানমূলক কার্যক্রম/ এ্যাপ্রোচ (Welfare approach)

৫০ ও ৬০ এর দশকে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে নারী উন্নয়নের জন্য প্রাথমিক পর্যায়ে যে কার্যক্রমটি পরিচালিত হয় তা হলো - **কল্যানমূলক কার্যক্রম** (Welfare approach)। ইউরোপের দারিদ্র আইন (Poor Law) দ্বারা এই এ্যাপ্রোচটি প্রভাবিত। এর মূল উদ্দেশ্য হলো - নারীকে একজন ভালো মা বা গৃহবধু হিসাবে চিহ্নিত করা। আদর্শ গৃহবধু এবং মা হিসাবে সুষ্ঠুভাবে সংসার পরিচালনা এবং সন্তান লালন পালন করে সন্তানদের মানুষ করার ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা পালন করানোই এই এ্যাপ্রোচের মূল লক্ষ্য।

সেই লক্ষ্যে এই এ্যাপ্যোচ একজন আদর্শ মা ও গৃহবধু হিসাবে নারীদের ভূমিকা পালনের প্রয়োজনীয় পরিসেবা ও অন্যান্য সহায়তা প্রদান করে থাকে। যেমন, নারীর ঘন ঘন সন্তান ধারণের সমস্যার ক্ষেত্রে জন্ম - নিয়ন্ত্রন সমগ্রী ও সেবা প্রদান, খাদ্য সাহায্য, মা ও শিশু স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপন, পুষ্টি শিক্ষা, পানীয় জল ও স্যানিটেশন সহায়তা, পরিবার পরিকল্পনা সেবা, কুটির শিল্প ভিত্তিক প্রযুক্তি সাহায্য ইত্যাদি। এই এ্যাপোচের বহুল প্রয়োগ ঘটে তৃতীয় বিশ্বের সাবেক উপনিবেশিক দেশগুলিতে। সেজন্য একে উপনিবেশিক মডেল (Colonial model) বলেও অনেকে অভিহিত করেন।[১৩]

---

[১৩].শাহীন রহমান ঃ জেন্ডার প্রসংগ (দ্বিতীয় প্রকাশ) পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ৭৮ এবং ফারজানা নাজঃ ঃ জেন্ডার শব্দকোষ, এ এইচ ডেভেলপমেন্ট পাবলিশিং হাউজ, ১৪৩ নিউমার্কেট,ঢাকা-১২০৫, ২০০৮, পৃঃ ১৫।

যদিও এই এ্যাপ্রোচ সরকার ও এনজিও গুলোর কাছে রাজনৈতিকভাবে নিরাপদ এবং জনপ্রিয়, তথাপিও এই এ্যাপ্রোচ মধ্যে নিম্নরূপ দূর্বলতা সমূহও বিদ্যমান-

- এই এ্যাপ্রোচ নারীদের আত্মনির্ভরশীল করার পরিবর্তে পরনির্ভরশীল করে তোলে;
- এটি পিতৃতান্ত্রিক সমাজ কাঠামোকে চেলেঞ্জ করে না;
- এই এ্যাপ্রোচ নারীর মর্যাদা, ক্ষমতা, নিয়ন্ত্রন, অধিকার ইত্যাদি বৃদ্ধি অর্থাৎ কৌশলগত জেন্ডার চাহিদা পূরণে সহায়তা করেনা;
- এ ক্ষেত্রে ধরেই নেয়া হয় যে, নারী মানেই পিছিয়ে পড়া, নারী মানেই ট্রাডিশনাল বা গৎবাঁধা এবং পুরুষ হলো আধুনিক ও প্রগতিশীল;
- ফলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রকল্প সমূহ সহজেই পুরুষ কেন্দ্রিক হয়ে পড়ে।[১৪]

২. দারিদ্র বিমোচন সংক্রান্ত কার্যক্রম/এ্যাপ্রোচ(Anty poverty approach)

দারিদ্র বিমোচন সংক্রান্ত কার্যক্রম/এ্যাপ্রোচ (Anty poverty approach)১৯৭০ দশকে উদ্ভুত হয়। ৬০ এর দশকের শেষের দিকে এটি লক্ষ্যনীয় হয়ে ওঠে যে, দরিদ্রদের মধ্যে নারীরা হচ্ছে দরিদ্রতম (Poorest of the poor)। বিশ্বব্যাংক, আইএলও (ILO) এর মত আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান সমূহও বুঝতে সক্ষম হয় যে, উন্নয়ন পরিকল্পনায় দীর্ঘ সময় ধরে নারীদের উপেক্ষা করা হয়েছে। তাই তারা দারিদ্র বিমোচন ও যথাযথ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য নারীদের উৎপাদনশীলতায় অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। এই এ্যাপ্রোচ অনুযায়ী যেহেতু নারীরা হল দরিদ্রদের মধ্যে দরিদ্রতম (Poorest of the poor), তাই আদর্শ মা ও গৃহবধূ হওয়ার বাইরে তাদের আয় উপার্জন থাকা প্রয়োজন।

প্রথমে দরিদ্র নারীদের তাদের পরিবারের চাহিদা পূরণের জন্য সাহায্যের প্রয়োজনে আয়, উর্পাজন, দক্ষতা উন্নয়ন ও ক্ষুদ্র ঋনের মাধ্যমে নারীদের তাদের পরিবারের মৌলিক চাহিদা পূরণে সক্ষম করে তোলার কথা বিবেচনায় আনা হয় এবং নারীর উৎপাদনমূলক ভূমিকায় আসার উপর জোর দেয়া হয়। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ভিত্তিক আয় উপার্জন মূলক প্রকল্প, ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্প, লাগসই প্রযুক্তি প্রদানের মাধ্যমে এই এ্যাপ্রোচ কার্যক্রম শুরু হয়। '৭০ দশক থেকে দরিদ্র নারীদের জন্য আয় উপার্জনমূলক প্রকল্প ব্যাপক ভাবে বিস্তার লাভ করে এবং এই এপ্রোচ বহুল প্রচলিত উন্নয়নের রূপ লাভ করে।[১৫]

তথাপিও এই এ্যাপ্রোচে নিম্নের বাস্তব দিক সমূহ বিবেচনা করা হয়নি –

- নারীদের চলাফেরার সীমিত স্বাধীনতা;
- কর্মসংস্থান ও প্রবৃদ্ধি সৃষ্টিতে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের সীমিত সক্ষমতা;
- নারীর আয়মূলক প্রকল্প পুরুষের আয়মূলক প্রকল্পের মত যথাযথ গুরুত্ব পায়নি;
- এই এ্যাপ্রোচ দরিদ্র নারীকে আলাদা বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠী হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে;

[১৪].আশরাফ সিদ্দিকী ঃ ওয়েলফেয়ার অ্যাপ্রোচ (প্রবন্ধ),(সেলিনা হোসেন সম্পাদিত ঃ জেন্ডার ও উন্নয়ন কোষ), ১ম খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ৫৪৪।

[১৫].শাহীন রহমান ঃ জেন্ডার প্রসংগ, পূর্বোক্ত, পৃ: ৭৮, এবং ফারজানা নাজ ঃ জেন্ডার শব্দকোষ, পূর্বোক্ত , পৃ ঃ ১৫।

- নারীদের আয়ের সীমিত অবস্থা বিবেচনা করে পর্যাপ্ত আর্থিক সাহায্য করা হয়নি;
- হয়েছে ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প ভিত্তিক আয় উপার্জনমূলক প্রকল্প, ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্প ইত্যাদির ক্ষেত্রে;
- নারী যে ঘরে বাইরে মিলিয়ে বহুগুন কাজের বোঝা বহন করছে তাও বিবেচনায় নেওয়া হয়নি।[১৬]

৩. দক্ষতা বৃদ্ধি কার্যক্রম/ এ্যাপ্রোচ (Efficiency approach)

বিশ্বব্যাংক এবং আইএমএফ এর কাঠামোগত পুনর্বিন্যাস নীতিমালার সাথে সম্পর্কিত **দক্ষতা বৃদ্ধি কার্যক্রম/ এ্যাপ্রোচ (Efficiency approach)** এর উদ্ভব ঘটে ১৯৮০ দশকে। সে সময়ে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা, ঋণ সংকটের প্রেক্ষিতে বিশ্বব্যাংক এবং আইএমএফের কাঠামোগত পুনর্বিন্যাস কর্মসূচির প্রয়োজন হয়। তখনই লক্ষ্যনীয় হয় যে উন্নয়নের ক্ষেত্রে নারীর অর্থনৈতিক অবদান একেবারেই সীমিত। তখন ক্রমবর্ধমান হারে নারীর দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির উপর বিশ্বব্যপী জোর দেওয়া হতে থাকে।

নারীদেরকে যে দীর্ঘ সময় ধরে উন্নয়ন থেকে বঞ্চিত করে রাখা হয়েছিল তার বিরুপ প্রতিক্রিয়াকে চিহ্নিত করে এই এ্যপ্রাচ দেখায় যে, 'নারীদেরই কেবল উন্নয়ন প্রয়োজন তা নয়, বরং উন্নয়নেরই প্রয়োজন নারীদের'। এ ক্ষেত্রে তৃতীয় বিশ্বের রপ্তানী সাফল্য 'গার্মেন্টস ফ্যাক্টরী' এবং সাব সাহারার আফ্রিকায় 'খাদ্য সংকট' সমাধানের পেছনে নারীর যে 'ক্ষিপ্র আঙ্গুল' কাজ করেছে তা উদাহরণ হয়ে দাঁড়ায়। তখন লক্ষ্যনীয় হয় যে, পুরুষের চাইতে নারীরা আরও বেশী দক্ষ ও প্রত্যয়ী। তখনই নারীর অব্যবহৃত দক্ষতা ও শ্রম সময়কে কাজে লাগানোর জন্য নারীকে একই সাথে 'উৎপাদক' এবং 'সামাজিক ব্যবস্থাপক'(community manager) হিসেবে বিবেচনা করা হতে থাকে।[১৭]

দক্ষতা এ্যপ্রোচের মূল লক্ষ্য হল নারীর অর্থনৈতিক অবদানের মাধ্যমে উন্নয়নকে আরও দক্ষ ও কার্যকর করে তোলা এবং নারীকে উন্নয়নের প্রান্ত থেকে উদ্ধার করে মূল ধারায় নিয়ে আসা। তবে এই ক্ষেত্রে নারীর সংসার পরিচালনা, সন্তান লালন-পালনের বিষয় বিবেচনায় আনা হয়নি।

এ পদ্ধতির সমালোচনা করে শাহীন রহমান বলেন, " কিন্তু দক্ষতা এ্যাপ্রোচ এই ভ্রান্ত ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত যে, নারীর শ্রম দিবস বুঝিবা স্থিতিস্থাপক বা সংকোচন - প্রসারণ যোগ্য (Elastic)। কেননা এখানে মনে করা হয় যে, সন্তান লালন - পালন, জ্বালানী সংগ্রহ, খাদ্য প্রক্রিয়ায়াজাত করণ, রান্না-বান্না, সেবা যত্ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যবহৃত নারীর মজুরী বিহীন শ্রম ও সময় ইচ্ছেমত বাড়ানো কমানো যায়"।[১৮]

---

[১৬].আশরাফ সিদ্দিকী ঃ দারিদ্র বিমোচন অ্যাপ্রোচ(প্রবন্ধ), (সেলিনা হোসেন সম্পাদিত ঃ জেন্ডার ও উন্নয়ন কোষ,) ১ম খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ১২৬।

[১৭]. ফারজানা নাজ ঃ জেন্ডার শব্দকোষ, পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ১৬, ২৬।

[১৮]. শাহীন রহমান ঃ জেন্ডার প্রসংগ, পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ৮২।

জনাব আশরাফ সিদ্দিকী তাঁর 'এফিসিয়েন্সি এ্যাপ্রোচ ' প্রবন্ধে বলেন,"যদিও এই এ্যাপ্রোচের মাধ্যমে নারী ও জেন্ডার বিষয়টি উন্নয়নের মূল স্রোতে আনার ধারণা করা হয় তথাপি এ ক্ষেত্রে মূলত উন্নয়ন নারীর জন্য কী করবে তা বিবেচনা না করে নারী উন্নয়নের জন্য কি করবে তাই দেখা হয়" ।[১৯]

৪. সমদর্শী বা ন্যায়ানুগ কার্যক্রম/ এ্যাপ্রোচ (Equity approach)

এটি যুক্তরাষ্ট্রের উন্নয়নে নারী আন্দোলনের ফল। যার উদ্ভব ঘটে জাতিসংঘের নারীদশকে(১৯৭৬ -৮৫)। যেহেতু কল্যানমূলক, দারিদ্র বিমোচন এবং দক্ষতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত এ্যাপ্রোচ সমূহের কার্যক্রম শুধুমাত্র দরিদ্র নারীদের অবস্থার উন্নয়নের প্রচেষ্টার মধ্যেই সীমাবদ্ধ - তা কোন অবস্থাতেই পিতৃতান্ত্রিক সমাজ কাঠামোকে চেলেঞ্জ করেনা। তাই বিদ্যমান পিতৃতান্ত্রিক সমাজ কাঠামোকে কিছুটা চেলেঞ্জ করেই **সমদর্শী বা ন্যায়ানুগ কার্যক্রম/ এ্যাপ্রোচ (Equity approach)** এর উদ্ভব।

এই এ্যাপ্রোচ ভিত্তিক কার্যক্রম হ'ল –

- ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের উভয় ক্ষেত্রেই নারী পুরুষের মধ্যকার বিদ্যমান অসমতার বিলুপ্তি;
- পরিবারের অভ্যন্তরে, একই সাথে বাজার অর্থনীতির ব্যবস্থায় নারীর অধিনস্থতার উৎসকে চিহ্নিত করা এবং তা দূর করা;
- পুরুষের মত নারীদেরও জীবনের সর্বক্ষেত্রে সমানাধিকার প্রদান;
- ভূমির অধিকার, উত্তরাধিকার, বিবাহ ও বিচ্ছেদের অধিকার, সন্তানের অভিভাবকত্ব, সংসারে সমতা, আয়, প্রজনন ও শরীরের উপর নিয়ন্ত্রন অর্জন, সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী অবস্থানে যাওয়া;
- নারীর মজুরী ও মজুরী বিহীন কাজের অর্থনৈতিক মূল্যের স্বীকৃতি প্রদান ইত্যাদি।[২০]

এই এ্যাপ্রোচ বিষয়েও শাহীন রহমান বলেন, '' নারী - পুরুষের মধ্যে বিদ্যমান অসমতা ও বৈষম্যকে চেলেঞ্জ করার দরুন এই এ্যাপ্রোচ পশ্চিমা নারীবাদ রূপে সমালোচিত। বিভিন্ন দেশের নিজস্ব ঐতিহ্যের পরিপন্থি বিধায় সমদর্শী এ্যাপ্রোচ খুব কমই গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করতে পেরেছে" ।[২১]

৫. ক্ষমতায়ন এ্যাপ্রোচ (Empowerment approach)

১৯৭৫ পরবর্তী সময়ে তৃতীয় বিশ্বের নারীবাদী সাহিত্য ও তৃণমূল সংগঠনের অভিজ্ঞতা থেকে আত্ম-নির্ভরশীলতা অর্জনের মাধ্যমে নিজেদের ক্ষমতায়নের প্রত্যাশী নারী গ্রুপের মধ্য থেকে **ক্ষমতায়ন এ্যাপ্রাচ (Empowerment approach)** এর উদ্ভব ঘটে। সে সময়ে বিবেচনা করা হয় যে, নারীর ক্ষমতা অর্জন পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন কোন ঘটনা নয়। তা উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়ার বিষয়ও নয় বরং তাদেরকে নীচ থেকেই (bottom up) নিজেদের উদ্যোগেই গড়ে উঠতে হবে।

---

[১৯]. আশরাফ সিদ্দিকী ঃ এফিসিয়েন্সি অ্যাপ্রোচ (প্রবন্ধ),(সেলিনা হোসেন সম্পাদিত ঃ জেন্ডার ও উন্নয়ন কোষ), ১ম খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ১১০।

[২০]. শাহীন রহমান ঃ জেন্ডার প্রসংগ, পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ৮২-৮৩।

[২১].শাহীন রহমান ঃ জেন্ডার প্রসংগ, পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ৮০।

এ উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমেই সমাজে বিদ্যমান নারীদের হীন মর্যাদাকে চ্যালেঞ্জ করে গড়ে উঠে ক্ষমতায়ন এ্যাপ্রোচ । এটি নারীর অধীনস্ততাকে পুরুষ কর্তৃক সৃষ্ট সমস্যা তো বটেই একই সাথে উপনিবেশিক শোষণ-নিপীড়নের সমস্যা হিসেবেও বিবেচনা করে। তাই এটি নারীদেরকে নিজেদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির কথা বলে।

এই এ্যাপ্রোচ সমতা অর্জনের জন্য কিছু লক্ষ্যও স্থির করে। তা হ'ল -

- প্রচলিত উন্নয়ন ধারা কিভাবে নারীর উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে তার ব্যাখ্যা গ্রহণ;
- নারীদের পুরুষের অধীনস্থ করে রাখার প্রবনতা দূর করে বিদ্যমান অসম ক্ষমতা পুনর্বিন্যাস করা;
- নারীদেরকে কর্মসংস্থান ও বাজার ব্যবস্থায় অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা;
- প্রয়োজনে সরাসরি রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের মাধ্যমে নারীকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা দিয়ে নারী- পুরুষের মধ্যকার অসমতা হ্রাস করা।

স্বাবলম্বী নারী গ্রুপ গঠন, নারীদের নিজেদের উদ্যোগে সরকারের বিভিন্ন নির্বাচনে প্রার্থী হওয়া এর উদাহরণ। ১৯৮৫ সালে ভারতের বাঙ্গালোরে গড়ে ওঠা ডন (Development Alternative with women for a New Era- DAWN) নামের একটি নারী সংগঠন, যা পরবর্তীতে সমগ্র তৃতীয় বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে এবং গুজরাটের আহমদাবাদের সিওয়া (SELF EMPLOYED WOMEN ASSOCIATION/ SEWA) ক্ষমতায়ন এ্যাপ্রোচ এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।[২২]

২.৩.২ <u>উন্নয়নে নারী (Women in development - WID) ও নারী এবং উন্নয়ন (Women and development - WAD)</u>

১৯৭০ এর দশকে নারীর অধিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে উন্নয়নে নারী (Women in development - WID) এবং নারী এবং উন্নয়ন(Women and development -WAD) তত্ত্বের উদ্ভব। এই তত্ত্বের আলোকে গৃহীত হয় নিম্নের বিস্তর কার্যক্রম সমূহ-

১. <u>উন্নয়নে নারী (Women in development - WID)</u>

১৯৭০ এর দশকে প্রখ্যাত নারীবাদী অর্থনীতিবিদ ইস্থারবোসেরাপ (Esther Boserup) এর সাড়া জাগানো গ্রন্থ 'অর্থনৈতিক উন্নয়নে নারীর ভূমিকা' (Women's Role in Economic Development) প্রকাশ পায়। এই গ্রন্থে তিনি অর্থনীতিতে নারীদের অবদান তুলে ধরে তথ্য সহ প্রমাণ করেন যে, কৃষি অর্থনীতিতে নারীর পর্যাপ্ত অবদান সত্বেও তা নারীর গৃহকর্মের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে পড়ে। তিনি দেখান যে, কৃষি উৎপাদন কাজ পুরুষ করলেও খাদ্য উৎপাদনে নারী যে শ্রম দেয় তা সীমাহীন। তিনি স্পষ্ট ভাবে তুলে ধরেন যে, উন্নয়নের সাথে নারীর সম্পৃক্ততা সত্বেও তার অবদান বিবেচিত হয়েছে খুবই কম। এই গ্রন্থে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায়

[২২].পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮০।

নারীকে সরাসরি সম্পৃক্ত করার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়।[২৩] অর্থাৎ ৬০ - ৭০ দশকে উন্নয়নের যত সুফল তার অধিকাংশই গিয়েছে পুরুষের পক্ষে বরং অর্থনীতিতে অবদান সত্বেও নারীদের অবস্থা খারাপই হয়েছে। এই গ্রন্থে তাঁর প্রদত্ত নারী উন্নয়নের সূত্র ধরেই 'উন্নয়নে নারী' নামক নারী উন্নয়ন তত্বের উদ্ভব।

উন্নয়নে নারী (women in development - WID) এ্যাপ্রোচ নারীকে সরাসরি উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সঙ্গে তথা অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে নারীর সমস্যাগুলো পুরুষের সমস্যা থেকে আলাদা করে দেখার এবং নারীর যে উৎপাদন ক্ষমতা রয়েছে তা স্পষ্ট করার উপর গুরুত্বারোপ করে। এই এপ্রোচ বিদ্যমান আইন ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা অনুকুল না হলে প্রয়োজনে আইনগত এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থা পরিবর্তনেরও কথা বলে।

উন্নয়নে নারী বিষয়টি পরবর্তীতে মার্কিন নারী উন্নয়নবিদরা গ্রহণ করায় সমগ্র উন্নয়নশীল বিশ্বে এটি ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করে। ফলে উন্নয়নে নারী (Women in Development -WID) নীতি হিসেবে স্বীকৃতি পায় এবং এর নিম্নরূপ কর্মকৌশল ও নির্ধারিত হয় -

- উন্নয়ন মূলক কাজে নারীদের যুৎসই ভাবে কাজে লাগানো;
- শুধু কাজে লাগানো নয় তাদেরকে উপার্জনমূলক কর্মকান্ডে যুক্ত করে আয় করার সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করা;
- শিক্ষা ও কর্মক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমান অংশ গ্রহনের ব্যবস্থা রাখা;
- নারীরাও যাতে প্রযুক্তি ব্যবহার করতে পারে সে ধরনের সুযোগ সৃষ্টি করা;
- নারীর কাজের বোঝা হাল্কা করার জন্য তাদের কাজের সমস্যাবলী নির্ধারণ এবং উপশম করা, এ ক্ষেত্রে প্রয়োজনে লাগসই প্রযুক্তিরও ব্যবহার করা;
- নারীদের ঋণ প্রদান ও ঋণ সেবা কার্যক্রমের সুযোগ সুবিধা প্রসারিত করা;
- নারীদের স্বাস্থ্য, পুষ্টি এবং তাদের শিশুদের পরিচর্যার দিক সমূহের উন্নয়ন সাধন।[২৪]

নির্ধারিত এসব কর্মকৌশল সত্বেও এই এ্যাপ্রোচ নারীর ক্ষমতায়নে যথেষ্ট হয়ে ওঠেনি। এই সম্পর্কে সেলিনা হোসেন বলেন, "WID এ্যাপ্রোচ উন্নয়নে নারীর পরিবর্তন করেছে কিন্তু ক্ষমতা প্রয়োগে পিছিয়ে থেকেছে"।[২৫]

সেই কারণেই সূত্রপাত হয় নারী এবং উন্নয়ন ইস্যুর।

---

[২৩]. সেলিনা হোসেনঃ উন্নয়নে নারী, জেন্ডার ও উন্নয়ন কোষ, পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ৮২২।

[২৪]. শাহীন রহমান ঃ জেন্ডার প্রসংগ, পূর্বোক্ত পৃ ঃ ২২-২৩ এবং মহিলা বিষয়ক মন্ত্রনালয়ও মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত রিপোর্ট - জেন্ডার সমতা ও মূলধারাকরণ, ২০১০, পৃ ঃ ১৮।

[২৫]. সেলিনা হোসেন ঃ উন্নয়নে নারী (প্রবন্ধ), (সেলিনা হোসেন সম্পাদিতঃ জেন্ডার ও উন্নয়ন কোষ), পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ৮২২।

২. নারী এবং উন্নয়ন (Women And Development-WAD)

'উন্নয়নে নারী' ইস্যু নারীকে নিষ্ক্রিয় সুফলভোগী করে রাখার ফলে পরিবর্তনের ধারাটি বড় ধরনের সুফল সৃষ্টিতে ব্যর্থ হয়েছে মর্মে অনুধাবনের কারণে ১৯৭০ এর দশকের মাঝামাঝিতে কেরোলিং মোজারের 'আধুনিকায়ন তত্ত্ব ও উন্নয়নে নারী' তত্ত্বের সমালোচনার ধারায় নারী এবং উন্নয়ন **(Women And Development-WAD)** ধারণার সূত্রপাত ঘটে। মালেকা বেগম বলেন,"নির্ভরশীলতা তত্বের (Dependency) আলোকে উদ্ভাবিত এই তত্ত্বে নারীকে গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক কর্মী হিসেবে বিবেচনা করা হয়"।[২৬]

এই তত্ত্বের ধারণা সমূহ হ'ল -

- নারীরা মূলতঃ উৎপাদন প্রক্রিয়ারই অংশ তাই নতুন করে নারীকে উন্নয়নে সংযুক্ত করার প্রয়োজন নেই;
- এই প্রক্রিয়ায় নারী সমস্যাকে বিচ্ছিন্ন করে দেখার সমালোচনা করা হয় এবং পুরুষরাও যে শোষিত হয়;
- তা স্বীকার করে নিয়ে নারী - পুরুষ উভয়ের পশ্চাদপদতাকে শ্রেণী ও পূঁজির উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা আন্তর্জাতিক কাঠামোর প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণ করা হয়;
- এই ক্ষেত্রে উন্নয়নে নারীর অংশগ্রহণের চাইতে নারী ও উন্নয়ন প্রক্রিয়ার মধ্যকার সম্পর্কের উপর আলোকপাত করা হয়;
- এখানে নারীর উপার্জনক্ষম কর্মকান্ডের উপর জোর দেয়া হয়;
- নারীর আইনগত অধিকার, সামাজিক প্রথা, রীতি - নীতির ক্ষেত্রে সংস্কারের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়।[২৭]

নারী এবং উন্নয়ন **(WAD)** পদ্ধতিরও কিছু সমালোচনা রয়েছে । তা হ'ল -

- এটি পিতৃতন্ত্র, ভিন্ন ভিন্ন উৎপাদন পদ্ধতি, নারীর শোষণ ও অবদমনের মধ্যকার সম্পর্ক নির্ণয়ে ব্যর্থ;
- অসম ও শোষণমূলক বিশ্ব ব্যবস্থা দ্বারা নারী জীবনের বেশ কিছু বিষয় ব্যাখ্যা করা গেলেও পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক যুক্ত নারী প্রশ্নের অনেক ব্যাখ্যাই পাওয়া যায়না।[২৮]

উন্নয়নে নারী (women in development - WID) এবং নারী এবং উন্নয়ন (Women And Development-WAD) ধারণার মধ্যে পূর্বে উল্লেখিত এ্যাপ্রোচ সমূহের তথা নারীর কল্যান সাধন, দারিদ্র দূরীকরণ, দক্ষতা বৃদ্ধি, নারী-পুরুষের মধ্যকার অসমতা দূরীকরণ এবং নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে

---

২৬. মালেকা বেগম ঃ উন্নয়নে জেন্ডার ইস্যু (প্রবন্ধ), জেন্ডার ও উন্নয়ন কোষ) , পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ৫৩০।

২৭.ফারজানা নাজ ঃ জেন্ডার শব্দকোষ, পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ১৪।

২৮. মালেকা বেগম ঃ উন্নয়নে জেন্ডার ইস্যু (প্রবন্ধ) , জেন্ডার ও উন্নয়ন কোষ, পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ৫৩০-৫৩১।

উন্নয়নের ক্ষেত্রে নারীর অবস্থার পরিবর্তনের কথা স্বীকার করা হলেও নারীর ক্ষমতা প্রয়োগের বিষয়টি জোরদার হয়নি।

ফলে পরবর্তীতে আবির্ভুত হয় **জেন্ডার** ধারণার। **জেন্ডার** ধারণার মাধ্যমে নারীর উন্নয়নের সাথে ক্ষমতায়নের বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়ে নারী মুক্তির ধারণাকে আরও জোরদার করে তোলে।

২.৪ জেন্ডার এবং তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়াদি

নারী মুক্তির লক্ষ্যে পূর্বে বর্ণিত এ্যাপ্রোচ এবং নারী উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম সমূহ দেশে দেশে পরিচালনার পরিপ্রেক্ষিতে অর্জিত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে দেখা গেছে যে, পরিবারের সকলের স্বার্থ এক ও অভিন্ন নয়। একটি পরিবারের একজন নারীর চাহিদা বা স্বার্থ সেই পরিবারের এক জন পুরুষের সাথে এক হতে পারে আবার সম্পূর্ণ ভিন্নও হতে পারে। সেজন্যই উন্নয়ন কর্মকান্ডে নারী ও পুরুষ উভয়েরই সামাজিক ভূমিকা চিহ্নিত করে সেভাবে তা কার্যকর করার সুবিধার্থে 'জেন্ডার' শব্দটি ব্যবহারে এসেছে। দেখা যাক জেন্ডার কি এবং কেন আর জেন্ডার সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি কিরূপ?

২.৪.১ জেন্ডার কি?

'জেন্ডার(Gender)' শব্দটির আভিধানিক অর্থ হচ্ছে লিঙ্গ(Sex)। ইংরাজি এবং বাংলা সকল ভাষার গ্রামারেই 'জেন্ডার' শব্দটি ব্যবহৃত হয় লিঙ্গ (Sex) চিহ্নিত করার জন্য। যেমনঃ পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ, ক্লিবলিঙ্গ, উভয়লিঙ্গ ইত্যাদি। দীর্ঘ সময় ধরে এভাবে জেন্ডার - সেক্স বা লিঙ্গ অর্থে ব্যবহৃত হয়ে এলেও সাম্প্রতিকালে উন্নয়ন সাহিত্যে জেন্ডার ভিন্ন ও ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হতে শুরু হয়েছে। উন্নয়ন কর্মকান্ডে বর্তমানে জেন্ডার এবং সেক্স- এর মধ্যে সুনির্দিষ্ট পার্থক্য টানা হয়েছে।

এই প্রার্থক্য প্রথমে সুনির্দিষ্ট ভাবে তুলে ধরেছেন এ্যান ওকলে (Anne Oakley)ও জন সুনিতাদে(John Sunitada)। তাঁরা তাদের রচনায় সেক্স ও জেন্ডারের মধ্যকার মৌলিক ধারণাগত পার্থক্য তুলে ধরেছেন।

নিম্নের সারণী -২ এবং সারণী -৩ এ সেক্স ও জেন্ডার এর ধারণাগতএর পার্থক্য তুলে ধরা হ'ল -

সারণী - ২
সেক্স এবং জেন্ডার

সেক্স বা জৈবলিঙ্গ	জেন্ডার বা সামাজিক লিঙ্গ
নারী ও পুরুষের জৈবিক বিশেষত্ব (Biological) যা শরীরের গঠনগত ভাবে নির্ধারিত;	সামাজিকভাবে আরোপিত এবং গঠিত;
প্রাকৃতিক ভাবে নির্ধারিত যা ব্যক্তি জন্মগত ভাবে লাভ করে ও শরীরবৃত্তীয়;	বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান যেমন পরিবার, সরকার, জনগোষ্ঠী, স্কুল, মিডিয়া ইত্যাদি কর্তৃক আরোপিত;
জৈবিক লিঙ্গ স্থান কাল নির্বিশেষে অপরিবর্তিত থাকে যা সর্বজনীন ও অপরিবর্তনীয়।	পরিবর্তনশীল, সময়ান্তরে বদলায়।[২৯]

[২৯]. মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের প্লাজ-২ প্রকল্প কর্তৃক প্রকাশিতঃ জেন্ডার শব্দকোষ, ২০০৭, পৃঃ ১১।

অর্থাৎ নারী ও পুরুষের মধ্যকার শারীরিক বৈশিষ্ট্যের ভিন্নতা হলো – সেক্স, আর বিভিন্ন সমাজ কর্তৃক নারী ও পুরুষের মধ্যে সামাজিক ও মনস্তাত্বিক ভাবে আরোপিত ভিন্নতা হলো – জেন্ডার। অর্থাৎ সেক্স হলো জৈবলিঙ্গ যা অপরিবর্তনীয় আর জেন্ডার হলো সমাজ ও সংস্কৃতি ভেদে আরোপিত তথা সামাজিক লিঙ্গ যা পরিবর্তনীয়।[৩০]

সেক্স এবং জেন্ডার এ দু'টোর ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ ভেদে প্রাকৃতিক ও সমাজ কর্তৃক আরোপিত ভিন্নতা নিম্নরূপ–

সারণী - ৩

সেক্স এবং জেন্ডার ভিত্তিক নারী ও পুরুষের মধ্যকার ভিন্নতা

সেক্স (প্রাকৃতিক পার্থক্য)		জেন্ডার (আরোপিত পার্থক্য)	
নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ
প্রাইমারী ও সেকেন্ডারী যৌন অঙ্গ সমূহ;	প্রাইমারীও সেকেন্ডারী যৌন অঙ্গ সমূহ;	পুরুষের চেয়ে হীন, দূর্বল ও অক্ষম;	নারীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ সবল ও সক্ষম;
প্রজনন অঙ্গ/প্রত্যঙ্গ; ঋতু চক্র;	প্রজনন অঙ্গ; গোঁফ, দাড়ি, বুকে লোম;	নারীরা কোমল স্বভাবের; নারী কেবল গৃহে আবদ্ধ থাকবে।	পুরুষেরা কঠোর স্বভাবের; পুরুষেরা ঘরের বাইরে যাবে।
গর্ভধারণ এবং সন্তান প্রসব; সন্তানের মাতৃদুগ্ধ প্রদান;	পেশী বহুল পুরুষ	সংসারিক দায়-দায়িত্ব পালন করবে;	আয় উপার্জনের কাজ করবে;
সাধারণত চিকন কণ্ঠস্বর;	সাধারনতঃমোটা কণ্ঠস্বর	সন্তান লালন-পালন ও পরিবারের অন্যান্যের সেবা করা নারীদের কর্তব্য ইত্যাদি।	পুরুষেরা রাষ্ট্র সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি নিয়ে মাথা ঘামাবে ইত্যাদি[৩১]

নারী ও পুরুষের মধ্যে প্রাকৃতিক পার্থক্যকে গুরুত্বারোপ না করে যথেষ্ট পার্থক্য সামাজিক ভাবে আরোপ করা হয়ে থাকে যা উপরের ছকে দেখানো হলো। যা নারীকে অযৌক্তিক ভাবে দূর্বল ও হীন করে রাখে। যা - মোটেও সঠিক নয়।

শাহীন রহমান , নারী ও পুরুষের মধ্যে আরোপিতএসব পার্থক্য সমূহ সম্পর্কে বলেন, "উল্লেখ্য যে নারী ও পুরুষ সম্পর্কিত এ সকল আরোপিত ধারণা সামাজিক ভাবে প্রতিষ্ঠিত হলেও বৈজ্ঞানিক ভাবে তা আদৌ সত্য নয়"। [৩২]

[৩০].ফারহানা নাজঃ জেন্ডার শব্দকোষ, পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ৩৭।

[৩১].শাহীন রহমান ঃ জেন্ডার প্রসংগ, পূর্বোক্ত পৃঃ ৩৯।

[৩২].পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ৪০।

Dhaka University Institutional Repository

মূলতঃ এই কারণেই সেক্স শব্দটির জৈবিক বা শারীরিক (Biological) প্রকাশ থেকে সমাজ কর্তৃক আরোপিত পার্থক্যের বিষয় তুলে ধরে নারীদের অবস্থার পরিবর্তনের স্বার্থে 'জেন্ডার' শব্দটি প্রথম মনোবিজ্ঞানী এবং তারপর নারীবাদীদের দ্বারা ব্যবহৃত হতে শুরু করেছে। ফলে নারী-উন্নয়নের পরিবর্তে 'জেন্ডার এবং উন্নয়ন' শব্দ সমূহ ব্যবহৃত হচ্ছে ।

২.৪.২ নারী উন্নয়ন/ নারী এবং উন্নয়ন (Women in Development / Women and Development) এর বদলে কেন 'জেন্ডার এবং উন্নয়ন'(Gender & Development)

জেন্ডার শব্দটি নারী উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার কারণেই যে প্রশ্নটির উদ্ভব হয়েছে তাহলো, ' উন্নয়নে-নারী' এবং 'নারী এবং উন্নয়ন' কার্যক্রম বিদ্যমান থাকা অবস্থাতেই 'জেন্ডার এবং উন্নয়ন' এর কথা বলা হচ্ছে কেন? এর উত্তর হলো দীর্ঘ সময় ধরে নারীদের উন্নয়নের জন্য যত ব্যবস্থা বা পদক্ষেপই গৃহীত হয়েছে তার বেশীর ভাগই খুব বেশী ফলপ্রসূ হয়নি - নারী -পুরুষের মধ্যে বিদ্যমান প্রাকৃতিক পার্থক্যের উপর সমাজ র্কৃতক আরোপিত বেশ কিছু পার্থক্যের কারণে। 'নারী - পুরুষের' মধ্যে লিঙ্গ ভিত্তিক কিছু বিভাজন প্রাকৃতিক ভাবেই বিদ্যমান। কিন্তু দুঃখজনক হলো এর বাইরে, যুগ যুগ ধরে নারীদের উপর সমাজ কর্তৃক আরোপিত বেশ কিছু বিভাজন এমনভাবে শিকড় গেঁড়ে বসেছে, যার বাইরে সমাজ, নারীদের কথা চিন্তাই করতে পারেনা। ফলে নারীদের নিয়ে সকল কর্ম প্রচেষ্টাই সীমিত গন্ডির মধ্যে চলে আসে। যা নারী উন্নয়ন এর ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। নারীর প্রাকৃতিক লিঙ্গভিত্তিক শ্রমবিভাজন (sexual division of labour) হলো, তার গর্ভধারণ, সন্তান জন্মদান, মাতৃদুগ্ধ প্রদান - এ ক্ষেত্রে নারীর উপর কিছুটা শ্রমবিভাগ করতেই হবে এবং তা অন্যায় কিছু নয়। কিন্তু নারীরা যখন সমাজ কর্তৃক আরোপিত শ্রম বিভাগের আওতায় পড়ে তখন সমাজে তাদের ভূমিকার যথাযথ মূল্যায়ন হতে দেখা যায়না। তখন দেখা যায় -

- শ্রেণী- বর্ণ- ধর্ম- সংস্কৃতি ভেদে নারীদের অবস্থা বিশ্লেষণ না করে একটি স্বতন্ত্র বা বিচ্ছিন্ন গ্রুপ হিসেবে তাদেরকে বিবেচনা করে চাহিদা পূরণের চেষ্টা করা হয়;
- নারীর গার্হস্থ্য কাজ ও পুনুরুৎপাদন মূলক কাজের দায়িত্বভার লাঘবের কোন কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় না;
- এ ক্ষেত্রে ধরে নেয়া হয় যে নারীর সম্পদ, দক্ষতা ও সুযোগের অভাবের কারণে উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সাথে সম্পৃক্ত হতে পারেনা;
- এরূপ ধারণা করা হয় যে, নারী, উন্নয়ন কর্মকান্ডের অংশীদার হলে বিদ্যমান অসম বা বৈষম্য মূলক সম্পর্ক আপনা আপনি পরিবর্তিত হবে (Tricle Down Benefit) ।

ফলে নারী উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় নারীদের উন্নয়ন একেবারে ধীর ও শ্লথ গতিতে চলতে থাকে। ফলশ্রুতিতে নারীদের শ্রম ও অবদান মূল্যহীন হতে তো থাকেই কখনও তা দৃষ্টিগ্রাহ্যহীন (invisible) ও হয়ে পড়ে। অন্যদিকে পুরুষের কাজই শ্রেষ্ঠ বলে সীলমোহর পেতে থাকে। এর কারণেই নারী উন্নয়নের স্থলে 'জেন্ডার এবং উন্নয়ন' এর আবির্ভাব।[৩৩] 'জেন্ডার এবং উন্নয়ন' এর সাথে সম্পৃক্ত বিষয় হলো জেন্ডার ভূমিকা এবং জেন্ডার চাহিদা -

[৩৩].শাহীন রহমান ঃ জেন্ডার প্রসংগ, পূর্বোক্ত পৃঃ ৮০ এবং উদিসা ইসলাম ঃ উন্নয়ন ইস্যু হিসেবে জেন্ডার,(সেলিনা হোসেন সম্পাদিতঃ জেন্ডার ও উন্নয়ন কোষ) , ১ম খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ৮১৭-৮১৮।

২.৪.৩ জেন্ডার ভূমিকা (Gender Role)

এ যাবৎ জেন্ডার ভূমিকাকে তিন ধরনের কার্যক্রমের আওতায় চিহ্নিত করা হয়েছে-

১. পুনঃরুৎপাদনমূলক ভূমিকা (Reproductive Role)
২. উৎপাদনমূলক ভূমিকা (productive Role)
৩. সামাজিক ভূমিকা (Community Role)

ভূমিকা সমূহের উপর নিম্নে বিস্তারিত আলোকপাত করা হ'ল-

১. পুনঃরুৎপাদন মূলক ভূমিকা/ কাজ (Reproductive Role)

এই বিষয়ে মালেকা বেগম বলেন," প্রজনন কার্যক্রম, সন্তান ধারণ, লালন পালন আর ঘর গৃহস্থালী হলো পুনরুৎপাদন এর আওতাভুক্ত"।[৩৪] অর্থাৎ সন্তান গর্ভে ধারণ, জন্মদান ও লালন-পালন - এগুলোই হলো পুনরুৎপাদনমূলক কাজ বা ভূমিকা। এককভাবে নারীরাই এই ভূমিকার অন্তর্ভুক্ত। আবার সন্তান এর সাথে সম্পৃক্ত বেশ কিছু দায়িত্ব স্বাভাবিক ভাবেই নারীদের উপর বর্তায় সেগুলো হল পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের দেখাশুনা, খাবার তৈরী তথা রান্না বান্না করা, ধোয়া-মোছা, মাজা-ঘষা, ঘর- দরজা পরিস্কার করা, পানি এবং খড়ি সংগ্রহ, শিশুদের এবং মুরব্বীদের সেবা যত্ন করা সহ গৃহস্থালীর যাবতীয় কাজকর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে যে ভূমিকা পালিত হয় সে সবই পুনঃরুৎপাদন মূলক কাজের অন্তর্ভুক্ত। যেহেতু এসব কাজের কোন পারিশ্রমিক বা বিনিময় মূল্য নেই তাই তা স্বীকৃতিহীন। অর্থাৎ সংসার/ পরিবারে, সমাজে এবং বাজার ব্যবস্থাপনায় যে সব কাজের কোন বিনিময় মূল্য, পারিশ্রমিক বা যথাযথ স্বীকৃতি নেই অথচ পৃথিবীতে মানব - প্রজন্মের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা, জীবন – ধারণ ও বিকাশের জন্য যা অত্যন্ত প্রয়োজন সেগুলোই পুনঃরুৎপাদনমূলক কাজ/ভূমিকা (Reproductive Role)[৩৫]।

(প্রামাণ্য চিত্র - ১ দ্রষ্টব্য। যেখানে দেখানো হয়েছে দশ হাতে কাজ করে ঘর ও সন্তানদের সামলিয়েও নারীর ঘরের কাজের কোন স্বীকৃতি নেই)।

২. উৎপাদন মূলক ভূমিকা/ কাজ (Productive Role)

পরিবার বা সংসারে যে সব কাজের বিনিময় মূল্য আছে অর্থাৎ সকল ধরনের আয় উপার্জন মূলক কাজের দ্বারা যে ভূমিকা পালন করা হয় তাকে বলে উৎপাদনমূলক ভূমিকা (Productive Role)। কৃষি, শিল্প, ব্যবসা-বানিজ্য, সরকারী-বেসরকারী চাকুরী এ সব কিছুই অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বা উৎপাদনমূলক কর্মকান্ড বলে বিবেচিত। সাধারনণতঃ বেশীরভাগ সমাজে পুরুষরাই এই ভূমিকা পালন করে থাকে। অন্যদিক নারীর অনেক উৎপাদনমূলক ভূমিকা, পুনরুৎপাদননমূলক ভূমিকার অন্তরালে হারিয়ে যায় বা ঢাকা পড়ে। যেমন বাড়িতে রান্না-বান্না করা, কৃষি কাজে সহায়তা করা, কাঁথা সেলাই, হাঁস-মুরগী, গরু ছাগল পালন, ইত্যাদি। অথচ এই কাজগুলো কেউ কোন অর্থ বা দ্রব্যের বিনিময়ে করলে তো হয় উৎপাদনমূলক ভূমিকা; যেমন হোটেলে রান্না করা, রাস্তায় পানি বিক্রি করা ইত্যাদি।[৩৬]

---

[৩৪].মালেকা বেগম ঃ উৎপাদন, পুনরুৎপাদন ও উন্নয়ন(প্রবন্ধ), (সেলিনা হোসেন সম্পাদিত ঃ জেন্ডার ও উন্নয়ন কোষ), ১ম খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ৮১৭-৮১৮।

[৩৫].প্রামাণ্য চিত্র - ১ এ রক্ষিত নারীর দশ হাতে কাজ করেও কোন স্বীকৃতি নেই মর্মে চিত্রটি দ্রষ্টব্য।

[৩৬].শাহীন রহমান ঃ জেন্ডার প্রসংগ, পূর্বোক্ত পৃঃ ৪৩-৪৪ এবং উদিসা ইসলাম ঃ উন্নয়ন ইস্যু হিসেবে জেন্ডার (প্রবন্ধ), সেলিনা হোসেন সম্পাদিত ঃ জেন্ডার ও উন্নয়ন কোষ) , ১ম খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫৭ -৫৯।

৩. সামাজিক ভূমিকা/ কাজ (Community Role)

উৎপাদন মূলক ও পুনঃরুৎপাদন মূলক কাজের বাইরে মানুষ সমাজের কল্যাণে, নি:স্বার্থ ভাবে কোন বিনিময় মূল্য, অর্থ বা পারিশ্রমিক ছাড়াই কিছু কাজ করে থাকে সেগুলোকে বলা হয়- সামাজিক ভূমিকা। এই ভূমিকা মূলত দু'ধরনের হয়ে থাকে -

(ক) সামাজিক ব্যবস্থাপনা ভূমিকা/ কাজ (Community Managing Role)
(খ) সামাজিক রাজনৈতিক ভূমিকা/ কাজ (Community Politics Role)

(ক) সামাজিক ব্যবস্থাপনা ভূমিকা/ কাজ (Community Managing Role)

অর্থ বা পারিশ্রমিক ব্যতিরেকে সমাজ বা সম্প্রদায়ের বৃহত্তর স্বার্থে, কোন একটি নির্দিষ্ট এলাকা বা জনগোষ্ঠীর কল্যাণে, নিঃস্বার্থ যে সব দায়িত্ব বা ভূমিকা পালন করা হয় তা হ'ল সামাজিক ব্যবস্থাপনা ভূমিকা। যেমন- গ্রামের সকলে বা কয়েকজন অথবা কেউ একাই পুরাতন সাকো ও রাস্তা মেরামত করা, বাঁধ নির্মাণ করা, মৃতের সৎকার, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবা প্রদান, বিবাহ ও মৃত্যুবার্ষিকী ইত্যাদি সামাজিক অনুষ্ঠানে সাহায্য-সহযোগীতা করা। নারী-পুরুষ উভয়েই এই ভূমিকা পালন করে থাকে।

(খ) সামাজিক রাজনৈতিক ভূমিকা/ কাজ (CommunityPolitics Role)

সামাজিক ব্যবস্থাপনা ভূমিকা পালনের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা। আর এটিই হচ্ছে সামাজিক রাজনৈতিক ভূমিকা। এর মাধ্যমে অর্থ বা পারিশ্রমিক ব্যতিরেকে, নি:স্বার্থভাবে, এলাকার জনগণের কল্যাণে কোন দায়িত্ব পালনের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে কাজ করা হয়। যেমন, নির্বাচনে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে ব্যক্তি নির্ধারণ, তাকে নির্বাচনে সহায়তা প্রদান, এলাকার কোথায় স্কুল হবে বা কোথায় নলকূপ বসবে তার সিদ্ধান্ত প্রদান, বিচার সালিসের বিচারক হওয়া ইত্যাদি। লক্ষ্যনীয় যে, এই ভূমিকাটির মূল উদ্দেশ্য জনসেবা বা সমাজের কল্যাণ সাধন হলেও এখানে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, নেতৃত্ব ও মর্যাদার বিষয়টি জড়িত।[৩৭]

প্রধানতঃ পুরুষেরাই দুই ধরনের ভুমিকা - উৎপাদনমূলক ও সামাজিক (ব্যবস্থাপনাপনা ও রাজনৈতিক) ভূমিকা বেশী পালন করে থাকে। আর নারীরা দীর্ঘ সময় ধরে কেবল পুনঃরুৎপাদনমূলক কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত ছিল ও সামান্য ব্যতিক্রম ছাড়া এখনও আছে। যার কারণে সমাজে নারীদের মূল্যায়ন করা হয় কম। এ সম্পর্কে মালেকা বেগম যথার্থই বলেছেন, "অনাদিকাল থেকে পুনরুৎপাদনী কার্যক্রমকে নারীর একমাত্র ভবিতব্য বলে গণ্য করা হয়েছে এবং একইভাবে তাকে উৎপাদনী কার্যক্রম থেকে দূরে সরিয়ে রেখে গৃহকোনে বন্দি করে রাখা হয়েছে। অর্থনৈতিক কর্মকান্ড থেকে দূরে সরিয়ে রাখার ফলে নারীর মর্যাদাও ভূলুণ্ঠিত হয়েছে। ভরণপোষণের জন্য তাকে পুরুষের মুখাপেক্ষি হতে হয়েছে। যার ফলে নারীর মর্যাদা নির্ধারিত হয়েছে 'দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক' হিসেবে। নারীর গৃহস্থালী বা পুনরুৎপাদনী কার্যক্রমকে অর্থনৈতিক ভাবে মূল্যায়ন করা তো দূরের কথা, এসব কাজকে কাজ বলে গণ্য করার মানসিকতাই এখনো সমাজে গড়ে ওঠেনি। যার ফলে ঘরের বাইরে উৎপাদনমুখী কার্যক্রমে অংশ না নিলেও গৃহীনি হিসেবে কাজ করে

[৩৭].শাহীন রহমান ঃ জেন্ডার প্রসঙ্গ, পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ৪৩-৪৪।

পরিবারের যে পরিমাণ অর্থ একজন নারী বাঁচিয়ে দেন তারও কোন সুনির্দিষ্ট পরিসংখ্যান কোথাও নেই" ।[৩৮] আর সেজন্যই জেন্ডার চাহিদা মূলক ধারণার উদ্ভব।

২.৪.৩ জেন্ডার চাহিদা (Gender need)

নারীদের আর পুনঃরুৎপাদন মূলক কাজে সীমাবদ্ধ না রেখে তাদের উন্নয়নের মূল স্রোত ধারায় আনয়নের লক্ষ্যে সমাজবিজ্ঞানীদের উদ্ভাবিত কর্মপদ্ধতিই জেন্ডার চাহিদা (Gender need) হিসেবে স্বীকৃত। সমাজ বিজ্ঞানী ম্যাক্সিম মলিনেক্স (Maxime Molyneux) জেন্ডার এর সাথে নারী উন্নয়নে নারীর স্বার্থ এবং কৌশলের সমন্বয় করে প্রথম 'নারীর স্বার্থ' (Women's Interest) এবং 'নারীর কৌশলগত জেন্ডার স্বার্থ' (Strategic Gender interest) বিষয়টিকে উন্নয়নের ধারায় নিয়ে আসেন। পরবর্তীতে ক্যারোলিন মোজার একে আরও বিকশিত করেন।

তাঁদের উদ্ভাবিত কর্মপদ্ধতির মাধ্যমেই জেন্ডার চাহিদাকে দু'ধরনের দেখতে পাওয়া যায় -

১. **বাস্তবমুখী জেন্ডার চাহিদা** (practical Gender need)

২. **কৌশলগত জেন্ডার চাহিদ** (Strategic Gender Needs)

১. বাস্তবমুখী জেন্ডার চাহিদা (practical Gender need)

নারীর প্রাত্যাহিক জীবনযাপন ও তার কাজকর্ম সম্পাদনের বাস্তব সমস্যাদি সহজ করে দেয়ার উদ্দেশ্যে গৃহীত কার্যক্রমই হল বাস্তবমুখী জেন্ডার চাহিদা(practical Gender need)। যা নারীদের পক্ষে সনাক্ত করা এবং সহজে পুরণ করা সম্ভব। যা পুরণের মাধ্যমে নারীর অবস্থার (Condition) ক্ষেত্রে কিছুটা সুযোগ সুবিধার সৃষ্টি হয়। যেমন-

- যা সুবিধাজনক স্থানে ধান ভাঙ্গানোর কল, উন্নত চুলা ,বাড়ীর কাছে টিউবওয়েল বসিয়ে দিয়ে নারীদের কাজের বোঝা হালকা করা;
- প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র, পরিবার পরিকল্পনার পদ্ধতির উপর শিক্ষা প্রদান, বিশুদ্ধ খাবার পানির বিষয়ে সচেতন করার মাধ্যমে স্বাস্থ্য সেবার উন্নয়ন;
- ঋণ গ্রহণ ও তা ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি করে কর্ম দক্ষতার প্রশিক্ষণ, বাজারে প্রবেশের সুযোগ সৃষ্টি করণ;
- প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন, পরিবহন ব্যবস্থা আধুনিকী করণ, বাসস্থান সুবিধা উন্নত করে পড়াশুনা ও অন্যান্য কাজের সুবিধাদি উন্নত করণ ইত্যাদি।[৩৯]

---

[৩৮].মালেকা বেগম ঃ উৎপাদন- পুনরুৎপাদন ও উন্নয়ন(প্রবন্ধ),(সেলিনা হোসেন সম্পাদিত ঃ জেন্ডার ও উন্নয়ন কোষ), ১ম খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ৮১৬-৮১৭।

[৩৯]. শাহীন রহমান ঃ জেন্ডার প্রসঙ্গ, পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ৪৪-৪৫।

Dhaka University Institutional Repository

২. কৌশলগত জেন্ডার চাহিদ (Strategic Gender Needs)

কৌশল গত জেন্ডার চাহিদা হলো সমাজে নারী এবং পুরুষের মধ্যে বিদ্যমান বিভিন্ন অসমতা থেকে নারীর অধঃস্তন অবস্থান যা জেন্ডার শ্রমবিভাগ নামে পরিচিত তাকে চেলেঞ্জ করা। এ ক্ষেত্রে প্রচলিত জেন্ডার শ্রম বিভাগকে চ্যালেঞ্জ করে পুরুষের তুলনায় নারীর অধঃস্থন অবস্থাকে বিশ্লেষণ করা হয়। এই বিশ্লেষণ ক্ষমতা, অধিকার, মর্যাদা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, পছন্দ, নিয়ন্ত্রন, সুযোগ ইত্যাদি সব ক্ষেত্রেই বিদ্যমান। বিশ্লেষণ পূর্বক এ সব ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের মধ্যে বিদ্যমান অসমতা বা বৈষম্য দূর করার লক্ষ্যে যে ব্যবস্থাদি গ্রহণ প্রয়োজন হয়ে পড়ে তাকেই বলে কৌশল গত জেন্ডার চাহিদা (Strategic Gender Needs) ।[৪০]

সেলিনা হোসেন বলেন,"কৌশলগত জেন্ডার চাহিদা হলো, সমাজের সঙ্গে নারীর অবস্থানগত পরিমাপ। নারীর আইনগত অধিকার, সমান মজুরী ইত্যাদি যে পরিবর্তনের ধারা সূচনা করে তা দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন হিসেবে বিবেচিত। কৌশলগত জেন্ডার চাহিদা দ্বারা সামাজিক-সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ সূচিত হয়। এর দ্বারা গুণগত পরিবর্তন সাধিত হওয়ার ফলে সমাজের ক্রমান্বয় বদল নারীর দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়নকে টেকসই করে"।[৪১]

তবে বাস্তবমুখী জেন্ডারচাহিদা ও কৌশলগত জেন্ডার চাহিদা একে অন্যের পরিপূরক এরূপ মন্তব্যই পাওয়া যায় শাহীন রহমানের বক্তব্যে। তিনি বলেন, " বাস্তবমুখী জেন্ডার চাহিদা (practical Gender needs) পূরণের মাধ্যমে নারীর অবস্থার (Condition) উন্নয়ন ঘটলেও তা সাধারণ সমাজে নারীর মর্যাদা বৃদ্ধি করেনা। অর্থাৎ নারী পুরুষের মধ্যকার বিদ্যমান অসমতা, নারীর অধঃস্তন অবস্থান বা প্রচলিত জেন্ডার শ্রমবিভাগকে চ্যালেঞ্জ করেনা .. .. কিন্তু বাস্তবমুখী জেন্ডার চাহিদা পূরণের উপকরণ বা উপায়গুলো প্রত্যাহার করে নিলে নারীর অবস্থা আবার পূর্বের মত হয়ে পড়ে। তবে বাস্তবমুখী জেন্ডার চাহিদা পূরণের মাধ্যমে কৌশলগত জেন্ডার চাহিদা পূরণের পথ প্রশস্ত হয়"।[৪২]

এতক্ষনের আলোচনা থেকে এ সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব যে, নারী মুক্তির লক্ষ্যে বাস্তবমুখী জেন্ডার চাহিদা এবং কৌশলগত জেন্ডার চাহিদা দু'টোই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং একে অপরের পরিপূরক। সারণী -৪ থেকে তা স্পষ্ট হবে -

সারণী ৪

বাস্তবমুখী জেন্ডার চাহিদা ও কৌশলগত জেন্ডার চাহিদা

বাস্তবমুখী জেন্ডার চাহিদা	কৌশলগত জেন্ডার চাহিদা
বিদ্যমান জেন্ডার ভূমিকাকে চেলেঞ্জ করেনা তবে জীবন যাপনের মান উন্নত করে, দৈনন্দিন কাজের বোঝা লাঘব করে;	বিদ্যমান জেন্ডার ভূমিকায় পরিবর্তন আনে। নারীর মর্যাদা, অধিকার, নিয়ন্ত্রণ, ক্ষমতা, পছন্দ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করে;
তাৎক্ষনিক প্রয়োজনীয়, স্বল্পমেয়াদী ও অবিলম্বে পূরণীয়;	দীর্ঘমেয়াদী, অবিলম্বে পূরণ করা দূরহ;

[৪০]. পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ৪৫।

[৪১]. সেলিনা হোসেন ঃ বাস্তব সম্মত জেন্ডার চাহিদা এবং কৌশলগত জেন্ডার স্বার্থ (প্রবন্ধ), (সেলিনা হোসেন সম্পাদিত ঃ জেন্ডার ও উন্নয়ন কোষ), ১ম খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ৯১৭-৯১৮ ।

[৪২].শাহীন রহমান ঃ জেন্ডার প্রসঙ্গ, পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ৪৫-৪৬।

ভিন্ন ভিন্ন নারীর জন্য বিভিন্ন রকম;	সকল নারীর ক্ষেত্রে প্রায় একই;
দৈনন্দিন চাহিদার স্বার্থে সম্পর্কিত। যেমন - খাদ্য, পুষ্টি, স্বাস্থ্য, বাসস্থান, জ্বালানী , পানীয় জল, নিরাপদ মাতৃত্ব ইত্যাদি;	নারীর অধঃস্তন অবস্থার সঙ্গে সম্পর্কিত, যেমন - নারীর মর্যাদা, অধিকার, নিয়ন্ত্রন, ক্ষমতাহীনতা ইত্যাদি;
নারীদের পক্ষে সহজেই চিহ্নিত করা সম্ভব;	সাধারনতঃ নারীরা সহজেই চিহ্নিত করতে পারেনা;
নারীদের উপকারভোগী হিসেবে দেখা হয়;	নারীদের পরিবর্তনের প্রতিনিধি বা চালিকা শক্তি হিসেবে দেখা হয়;
নারীদের অবস্থার (Condition) **উন্নয়ন করে;**	নারীদের অবস্থানের (Position) উন্নয়ন ঘটায়;
নারীদের প্রতি প্রচলিত ভূ ভূমিকা(জেন্ডার ভূমিকা) বা সমাজে নারীর অবস্থার পরিবর্তন করে না;	নারীদের প্রচলিত ভূমিকা পরিবর্তন করে, তাদের ক্ষমতায়নে সাহায্য করে;
নারী-পুরুষের মধ্যকার জেন্ডার সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটায়না;	নারী ও পুরুষের মধ্যকার জেন্ডার সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটায়;
প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও পরিসেবা যোগানোর মাধ্যমে এই চাহিদা পূরণ সম্ভব, যেমন - খাদ্য ও পুষ্টি সাহায্য, নলকুপ ও পাকা পায়খানা স্থাপন, উন্নত চুলা সরবরাহ, স্বাস্থ্যসেবা প্রদান ইত্যাদি;	শিক্ষা, সচেতনতা বৃদ্ধি, সংগঠনে উদ্বুদ্ধকরণ, রাজনীতিতে অংশগ্রহণ, আত্মনির্ভরশীলতা ইত্যাদি ক্ষেত্রে লাগাতার প্রচেষ্টা গ্রহনের মাধ্যমে এই চাহিদা পূরণ সম্ভব;
এই চাহিদা পুরণের উপায়, উপকরণ, শর্তাবলী প্রত্যাহার করলে নারীর অবস্থা পূর্বেকার অবস্থায় ফিরে যায়;	একবার এই চাহিদা পুরণ বা অর্জন হলে তা প্রত্যাহার করা সম্ভব নয়।[৪৩]

উপরের আলোচনা এবং পর্যালোচনা থেকে এটি দেখা যাচ্ছে যে, পূর্বে উল্লেখিত কল্যানমূলক, দারিদ্র বিমোচন এবং দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক এ্যাপ্রোচ সমূহ এখানে তথা বাস্তবমুখী জেন্ডার চাহিদা এবং কৌশলগত জেন্ডার চাহিদার সাথে একীভূত হয়েছে।

২.৫ জেন্ডার এবং উন্নয়ন (গ্যাড) কার্যক্রম (Gender And Development- GAD) এবং তা বাস্তবায়ন সম্পৃক্ত বিষয়াদি

১৯৮০- এর দশকে উন্নয়নে নারী(WID, নারী এবং উন্নয়ন(WAD) ইত্যাদি নীতিমালার বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার প্রেক্ষিতে জেন্ডার এবং উন্নয়ন কার্যক্রম (Gender And Development Approach-GAD) গ্যাড নামক উন্নয়ন ধারার উদ্ভব ঘটে। এটি মূলতঃ একটি উন্নয়ন দর্শন- যা সমাজতান্ত্রিক নারীবাদ থেকে উৎসারিত।

এই এ্যাপ্রোচের মূল লক্ষ্য হচ্ছে - নারীর ক্ষমতায়ন। যার মাধ্যমে এমন একটি সমাজ প্রতিষ্ঠা করা যেখানে

ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণী বা লিঙ্গ বিবেচনায় নয় বরং সেটি হবে এমন একটি সমাজ যেখানে নারী ও পুরুষ সাম্যতার ভিত্তিতে

[৪৩] . শাহীন রহমানঃ জেন্ডার প্রসঙ্গ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৫-৪৬,এবং ফারহানা নাজঃ জেন্ডার শব্দকোষ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৯-৪৫।

কাজ করবে। লিঙ্গ বিবেচনায় নয় বরং শ্রম বিভাগ গড়ে উঠবে সামর্থের ভিত্তিতে। এটি –

- নারীর অধঃস্তনতার ভিত্তি স্বরূপ বিদ্যমান পুরুষতান্ত্রিক সমাজ কাঠামোকে চ্যালেঞ্জ করে - তার অবসান চায়;

- নারী - পুরুষের মধ্যে বিদ্যমান অসমতা নিরসন পূর্বক, নারী - পুরুষের সম্পর্ক উন্নয়নে মনোযোগ দেয়;
- জেন্ডার সমতা অর্জনের জন্য পুরুষের অংশ গ্রহণ ও অবদান গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে;
- পুরুষের সাথে সমতার ও সাম্যের ভিত্তিতে নারীকে উন্নয়নে সম্পৃক্ত করে;
- নারীকে সমস্যা নয় সমাধানের কারক রূপে মূল্যায়ন করে;
- পরিবার ও পরিবারের বাইরে নারী - পুরুষের সকল পারিশ্রমিক বিহীন এবং পুনঃরুৎপাদনমূলক কার্যক্রম ও অবদানের মূল্যায়ন ও স্বীকৃতি প্রদান করে;
- বৈষম্য নিরসনে রাষ্ট্রিয় হস্তক্ষেপ বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেয়;
- অনেকাংশে রাজনৈতিক দৃষ্টি ভঙ্গি বা দৃঢ় অঙ্গিকার দাবি করে;
- নারীর তিনধরনের ভূমিকাকেই (পুন:রুৎপাদনমূলক, উৎপাদনমূলক এবং সামাজিক ব্যবস্থাপনা ও রাজনৈতিক ভুমিকাকে স্বীকৃতি দেয়া এবং এদের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে তৎপর হয়;
- নারীর অন্যান্য সমস্যার কথা বিবেচনা করে পরিকল্পিত পরিকল্পনার কথা বলে;
- নারীর বাস্তবমুখী ও কৌশলগত উভয় ধরনের জেন্ডার চাহিদা পূরণ করে;
- নারীদের অনগ্রসরতার পেছনে বিদ্যমান সমস্যার স্বরূপ চিহ্নিত করে সমাধানের উপায় ঠিক করে;
- নারীর অধঃস্তন অবস্থাকে বৈষম্যমূলক সামাজিক প্রক্রিয়ার ফলস্বরূপ দেখে;
- নারী - পুরুষের মধ্যে প্রচলিত কাজের বরাদ্দ এবং দায় - দায়িত্ব প্রদানের সময় সমাজ কর্তৃক আরোপিত জেন্ডার ভিত্তিক শ্রম বিভাজনের বিলুপ্তি দাবী করে। [৪৪]

জেন্ডার এবং উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বেশ কিছু বিষয়াদি সম্পৃক্ত রয়েছে। সে সব বিষয়াদি বাস্তবায়িত হলেই মূলতঃ জেন্ডার এবং উন্নয়ন বাস্তবায়ন হয়েছে বলে ধরে নেওয়া যায়। তন্মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি হ'ল-

১. <u>নারীদের অবস্থা এবং অবস্থানের উন্নয়ন (Improvement of Womens Condition and Position)</u>

সাধারণতঃ অবস্থা (Condition) এবং অবস্থান (Position) শব্দ দু'টিকে একই অর্থে বুঝা হয়ে থাকে। যদিও এই দু'টি শব্দের মধ্যে সুনির্দিষ্ট পার্থক্য রয়েছে। তা হলো - নারীর অবস্থা বলতে বোঝায় নারীর বস্তুগত অবস্থা। যেমন - নারীর পুষ্টি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও আয় - উপার্জন ইত্যাদি। নারীর অবস্থার উন্নয়ন হল নারীর

এসব বস্তুগত অবস্থা বা জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন। নারীর 'অবস্থা' মূলতঃ বাস্তবমুখী জেন্ডার চাহিদার সাথে

---

[৪৪]. শাহীন রহমান ঃ জেন্ডার প্রসঙ্গ, পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ২৭-৩০, মালেকা বেগম ঃ উন্নয়নে জেন্ডার ইস্যু, জেন্ডার ও উন্নয়ন কোষ, পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ৫৩০-৫৩১, সেলিনা হোসেন ঃ জেন্ডার ও উন্নয়ন, জেন্ডার ও উন্নয়ন কোষ, পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ৮৪৫ এবং মহিলা বিষয়ক মন্ত্রনালয় ও মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত রিপোর্ট ঃ জেন্ডার সমতা ও মূলধারাকরণ সংক্রান্ত হ্যান্ডআউট, ২০১০, পৃ ঃ ২০ -২১ ।

সম্পর্কিত। অন্যদিকে 'অবস্থান' হল নারীর মর্যাদা, সম্পদ থাকা, সরাসরি কিছু বিষয় নিয়ন্ত্রনের ক্ষমতা এবং অধিকার থাকা, তার পছন্দ - অপছন্দের মর্যাদা থাকা ইত্যাদি। আর নারীদের উন্নয়নের জন্য ই প্রয়োজন নারীর অবস্থা এবং অবস্থানের উন্নয়ন।

২. ক্ষমতায়ন (Empowerment)

১৯৮০- র দশকের মাঝামাঝি থেকে ক্ষমতায়ন (empowerment) শব্দটি একটি জনপ্রিয় পরিভাষা হয়ে ওঠে এবং তা কল্যান, উন্নয়ন, অংশগ্রহণ দারিদ্র বিমোচনের মত শব্দ সমূহের স্থলাভিষিক্ত হয়। ক্ষমতায়ন উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, এটি একটি প্রক্রিয়া যা দ্বারা মানুষ কাজে নিজ নিয়ন্ত্রন প্রতিষ্ঠা করে এবং বাধাবিপত্তি প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করতে সচেষ্ট হয়। অর্থাৎ ক্ষমতায়ন মানে পুলিশী ক্ষমতায়ন নয় বরং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় এবং তা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ এবং প্রভাবিত করার অধিকার, সক্ষমতা ও সুযোগ অর্জন। এর জন্য দরকার জ্ঞান, আত্মসম্মান এবং আত্মবিশ্বাস।

৩. নারীর ক্ষমতায়ন (Empowerment of women)

নারী যখন নিজ সিদ্ধান্তের মাধ্যমে সমস্যা সমাধান করে কাজে এগিয়ে যেতে পারে তা - ই হলো নারীর ক্ষমতায়ন। নারীর ক্ষমতায়ন তিন ধরনের - অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ।

অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের মূলধারায় নারীর পূর্ণ অংশগ্রহণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণে, বাস্তবায়নে, অভিগম্যতায়, নিয়ন্ত্রনে এবং সমতার ভিত্তিতে সুফল ভোগে নারীর পূর্ণ মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হওয়াই হলো নারীর **অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন**।

পরিবারে এবং সমাজে নারীর অধিকার ভোগের বিষয়টি ই হলো নারীর **সামাজিক ক্ষমতায়ন**। সেখানে নারী কি ধরনের ভূমিকা পালন করতে পারে এবং সে ভূমিকা পালনে তার ক্ষমতার চর্চা কতটা গুরুত্বপূর্ণ সে বিষয়টি বোঝায়। রাজনীতি চর্চায় নারীর পূর্ণ অংশগ্রহনের নিশ্চয়তা অর্জনই হলো নারীর **রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন**। যেমন ভোট প্রদান, নির্বাচনে অংশ গ্রহণ, রাজনৈতিক দলে সমান জায়গা অর্জন ইত্যাদি।[৪৫]

মূলতঃ নারীর ক্ষমতায়ন সমতা ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থার প্রধান দিক এবং নারীর ক্ষমতায়ন শুধু নারীর ইস্যু- ই নয় - তা সামাজিক ইস্যু ও বটে। কেননা নারীর ক্ষমতায়নের সুফল পুরুষকেও আর্থিক ও মানষিক চাপ থেকে মুক্তি প্রদান করে যা তারও ক্ষমতা বৃদ্ধি করে । আবার পুরুষকে প্রথাগত নিপীড়ন কারক ভূমিকা থেকেও মুক্ত করে।

৪. নারীর ক্ষমতায়ন কাঠামো (Women's Empowerment Framework)

নারীর ক্ষমতায়নে উন্নয়ন কার্যক্রম কতটুকু সহায়তা করছে তা গুরুত্ব সহকারে পরিমাপ করা হয় যেই কাঠামোর ভিত্তিতে সেটিই হলো নারীর ক্ষমতায়ন কাঠামো। নারীর ক্ষমতায়নের স্তর পরিমাপের মাপকাঠি স্বরূপ এই ফ্রেইমওয়ার্ক সমতার ৫টি বিভিন্ন স্তরকে ভিত্তি হিসেবে বিচার করে। এই ৫টি স্তর হলো - নিয়ন্ত্রন, অংশগ্রহণ, সচেতনতা, সুযোগ সুবিধা প্রাপ্তির অধিকার এবং কল্যান সাধন। নারীরা ক্রমশ সমতার একটি স্তর থেকে পরবর্তী স্তরে উন্নীত হলে তাদের ক্ষমতায়নও সেই মাত্রায় বৃদ্ধি পেল বলে এখানে ধারণা করা হয়।

---

[৪৫].সেলিনা হোসেনঃ ক্ষমতায়ন (প্রবন্ধ), জেন্ডার ও উন্নয়ন কোষ , ১ম খন্ড (সেলিনা হোসেন সম্পাদিত), পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫৯৯-৬০০ ।

৫. জেন্ডার সমতা (Gender Equality)

জেন্ডার সমতা (Equality) হ'ল জেন্ডার ইস্যুর মূল বিষয়। এ ক্ষেত্রে সামাজিক ও ব্যক্তি জীবনের সকল ক্ষেত্রে যে বিষয় সমূহ প্রাধান্য পেয়ে থাকে সেগুলো হ'ল - নারী ও পুরুষের সমান অধিকার , সমান সুযোগ-সুবিধা, সমান অবস্থা ও অবস্থান, সমান আচার-আচরণ, সমান দৃশ্যমান হওয়া, সমান অংশগ্রহণ এবং সমান ক্ষমতায়ন। তবে এখানে পুরুষ ও নারীর প্রাকৃতিক ভিন্নতাকেও স্বীকৃতি দেয়া হয়। যেমন নারী মা হিসেবে সন্তান জন্ম দেয় এবং পুরুষ হয় বাবা। তবে এর জন্য নারীর উপর কোনরূপ নেতিবাচক প্রভাব যাতে না পড়ে, কোনরূপ বৈষম্য সৃষ্টি না হয়, সমান সুয়োগ থেকে বঞ্চিত না হয় ইত্যাদির উপর গুরুত্ব প্রদান করে জেন্ডার ইস্যু।

অর্থাৎ নারীর দীর্ঘ সময়ের সামাজিক ও ঐতিহাসিক বঞ্চনার ক্ষতিপূরণ করাই হলো জেন্ডার সমতা (Gender Equality)। অর্থাৎ জেন্ডার সমতা হলো পুরুষ ও নারীর সমতা অর্জনের একটি প্রক্রিয়া যা সমাজের অসমতাা সৃষ্টিকারী বা বৃদ্ধিকারী দিকগুলোর সংশোধন বা বিলোপকারী নীতিমালা প্রয়োগ করে এবং সমতা বৃদ্ধিকারী দিকগুলোর উপর জোর দেয়। জেন্ডার সমতার মূল বিষয় হলো জেন্ডার ন্যায়পরায়নতা।

৬. জেন্ডার সাম্য ও সমতা (Gender Equity and Equality)

নারী ও পুরুষকে ন্যায় ভিত্তিক সমান মর্যাদায় অভিষিক্ত করাই হলো জেন্ডার সাম্য। এ সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে হলে প্রয়োজন নারীর দীর্ঘ সময়ের সামাজিক, পারিবারিক, ঐতিহাসিক বঞ্চনার ক্ষতিপূরণ করা। জেন্ডার সমতা হ'ল নারী ও পুরুষের মধ্যে সমান সুযোগের অধিকার নিশ্চিত করা। তাই জেন্ডার সাম্য হ'ল জেন্ডার সমতা অর্জনের একটি প্রক্রিয়া।

৭. মূল ধারায় নারী এবং মূল ধারায় জেন্ডার (Mainstreaming women and Mainstreaming Gender)

মূলধারায় নারী বা মেইনস্ট্রিমিং উইমেন (Mainstreaming women) হ'ল রাষ্ট্রের মূল ধারার কার্যক্রমে তথা সিদ্ধান্ত গ্রহণের মূলধারায় নারীকে নিয়ে আসা। যেমন রাজনীতি, নেতৃত্ব ও গভর্নেন্সে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। আবার সামগ্রিক ভাবে আয়-উপার্জন এবং সম্পদ ও সুযোগের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের মধ্যকার বিদ্যমান বৈষম্য দূর করার ব্যবস্থাই হলো মূল ধারায় জেন্ডার (Mainstreaming Gender)। মূলধারায় নারীকে আনয়নের লক্ষ্যে নারী পুরুষের মধ্যকার বিদ্যমান বৈষম্য কমানো এবং অংশীদারিত্ব ও সকল পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর অংশ গ্রহণের সুযোগ থাকা অবশ্যম্ভাবী ।[৪৬]

৮. জেন্ডার বিশ্লেষণ (Gender Analysis)

পরিবার থেকে সমাজ এবং রাষ্ট্র ব্যবস্থা পর্যন্ত ক্ষমতার পরিধিতে নারী-পুরুষের মধ্যকার ভিন্নতা ও বৈষম্য পরীক্ষা-নীরিক্ষা করার পদ্ধতিকে বলা হয় জেন্ডার বিশ্লেষণ(Gender analysis)। এটি এমন এক ধরনের বিশ্লেষণ, যা সমাজে নারী ও পুরুষের মধ্যকার সম্পর্ককে এবং এই সম্পর্কের অসমতা বা বৈষম্যকে বিশদভাবে অনুসন্ধান করে এবং তা তুলে ধরে। এ ক্ষেত্রে কতিপয় প্রশ্ন - যেমন কে কি করে, কার কি আছে, কে সিদ্ধান্ত নেয় ও কিভাবে নেয়, কে লাভবান হয়, কার ক্ষতি হয় - ইত্যাদির মাধমে তথ্য সংগ্রহ করা হয় এবং বিদ্যমান পরিস্থিতির আলোকে বিশ্লেষণ করা হয়।

৯. জেন্ডার পক্ষপাত দুষ্ট (Gender Bias)

কোন রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের বিভিন্ন স্তরে, অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রীয়, পারিবারিক ক্ষেত্রে কোন একটি পক্ষকে

---

[৪৬].শাহীন রহমান ঃ জেন্ডার প্রসঙ্গ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫৬-৫৭।

বঞ্চিত করার এবং অন্য পক্ষের সুবিধা প্রাপ্তির ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার প্রবণতাকেই বলা হয় জেন্ডার পক্ষপাত দুষ্ট। সমাজের অধিকাংশ ক্ষেত্রে নারীদের বঞ্চিত করা বা বাদ দেয়া এবং পুরুষের ক্ষেত্রে সুবিধা ভোগের ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার প্রবণতা লক্ষ্যনীয় হয়ে ওঠে।

১০. <u>জেন্ডার অন্ধত্ব (Gender Blind)</u>

নারী -পুরুষের শ্রম বিভাজন, নারীর প্রতি নিম্ন ধারণা বিস্তার, পুরুষের প্রতি অধিক প্রাধান্য মূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ইত্যাদি হলো জেন্ডার অন্ধত্ব(Gender blind)।

১১. <u>জেন্ডার অনুগত (Gender Bound)</u>

যখন ধারণা করা হয় যে, সমাজের বর্তমান লিঙ্গভিত্তিক শ্রম বিভাজন ও তার থেকে উদ্ভূত নারীর স্বাভাবিক অধঃস্তনতা হল অপরিবর্তনীয় এবং এটা সর্বজন স্বীকৃত, যৌক্তিক ও বৈধ তখনই তা জেন্ডার অনুগত(Gender bound) দৃষ্টিভঙ্গি|

১২. <u>নারী পুরুষের বিভাজিত উপাত্ত (Gender Disaggregated Data)</u>

সাধারণ ভাবে কোন তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে সাধারণ বা সামষ্টিক দিকের প্রতি গুরুত্ব দেয়া হয় এবং বিশেষ দিককে উপেক্ষা করা হয়। যেমন দেশের ৭০ ভাগ মানুষ দরিদ্র কিন্তু ৭০ ভাগের কত ভাগ নারী এবং কত ভাগ পুরুষ তা সহজে নির্ণয় করা হয়না । ফলে কোন ক্ষেত্রে উন্নয়ন কার্যক্রমে গুরুত্ব দিতে হবে তা নির্ণয় কঠিন হয়। সেজন্যই নারী ও পুরুষের অবস্থানকে সাধারণ ভাবে বা গড়পরতা হিসাব না করে ভিন্ন এবং সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশ করার উপর গুরুত্ব দেয়া হয়। ভিন্ন ভিন্ন করে সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশ করাই হ'ল - 'নারী পুরুষের বিভাজিত উপাত্ত' বা জেন্ডার ডিসএগ্রিগেটেড ডাটা (Gender disaggregated data) বা । এর ফলে কোথায় জেন্ডার বৈষম্য তা নিরুপম করা সহজ হয়| জেন্ডার ডিসএগ্রিগেটেড ডাটা বা বিভাজিত জেন্ডার উপাত্ত বিদ্যমান থাকলে সকলের অবস্থান প্রকাশ করা সহজ হয়| যার মাধ্যমে উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণও সহজ হয়।

১৩. <u>জেন্ডার পরিকল্পনা (Gender planning)</u>

জেন্ডার পরিকল্পনা হলো নারী ও পুরুষকে সমান বা সমশর্তে উন্নয়নের কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করানো যাতে করে উন্নয়নের চালিকা শক্তি এবং উপকারভোগী এই উভয় ক্ষেত্রের কোনটিতেই নারী বাদ না যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখা। যেহেতু বহুকালব্যাপী বিদ্যমান জেন্ডার শ্রমবিভাগের ফলে সকল সমাজেই নারীদের সম্পদ, ক্ষমতা অর্জন এবং তাদের নিজেদের জীবনের উপর নিয়ন্ত্রন প্রতিষ্ঠার সুযোগ ছিল সীমিত। আর সেজন্যই এই বাস্তবতাকে পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজন হয় জেন্ডার পরিকল্পনা।

১৪. <u>জেন্ডার পরিবীক্ষণ (Gender Monitoring)</u>

জেন্ডারের আলোকে প্রণীত প্রকল্প / কর্মসূচি যথাযথভাবে বাস্তবায়ন হচ্ছে কিনা, তার ঘোষিত নীতিমালা, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জিত হচ্ছে কিনা তা তদারকি করাটাই হলো জেন্ডার পরিবীক্ষণ বা মনিটরিং। প্রকল্প/ কর্মসূচি বাস্তবায়ন কালে তার ত্রুটি বিচ্যুতি দূর করার উদ্যোগ গ্রহনে জেন্ডার পরিবীক্ষণ বা মনিটরিং সহায়ক হয়ে থাকে।[৪৭]

---

[৪৭].শাহীন রহমান ঃ জেন্ডার প্রসঙ্গ, পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ৪০-এবং ১৯১-২০৪ , সেলিনা হোসেন ঃ জেন্ডার ও উন্নয়ন, জেন্ডার ও উন্নয়ন কোষ, (১মখন্ড),পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ৮০৭-৯৪৬, ফারজানা নাজ ঃ জেন্ডার শব্দকোষ, পূবোক্ত, পৃ ঃ ৪২ অবলম্বনে জেন্ডার সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি গ্রহণ করা হয়েছে।

১৫. জেন্ডার রেসপনসিব বাজেট (Gender Renponsive Budget)

জেন্ডার রেসপনসিব হচ্ছে সমাজে নারী ও পুরুষের ভূমিকা ও দায়িত্ব পালনে যে ভিন্নতা আছে তাকে স্বীকার করে নারী - পুরুষের মধ্যে ব্যবধান কমিয়ে আনার জন্য বিশেষ ভাবে কাজ করা। আর বাজেট হলো সম্ভাব্য আর্থিক খরচ পরিকল্পনা যা সরকারের আর্থ - সামাজিক অগ্রাধিকার নির্দেশ করে এবং এর মাধ্যমে কতগুলো সুনির্দিষ্ট নীতি ও কর্মসূচি বাস্তবায়নে সরকারের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার অঙ্গীকার ব্যক্ত করে।

আর জেন্ডার রেসপনসিভ বাজেট হলো বিদ্যমান জাতীয় বাজেটে জেন্ডার পরিপ্রেক্ষিত অন্তর্ভুক্ত করা। এই প্রক্রিয়ায় নিশ্চিত করা হয় যে, এটি জেন্ডার রেসপনসিভ। এর মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন নাগরিক তথা নারী ও পুরুষের বিভিন্ন চাহিদা ও স্বার্থ সমূহকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়। কারণ বাজেট জেন্ডার রেসপনসিভ না হলে পিছিয়ে পড়া নারীদের উন্নয়ন আর সমতা করনের সকল প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হবে। এই সম্পর্কে বলা হয় "Gender responsive budget refers to the analysis of the impact of actual government expenditure and revenue on women and girls as compared to man and boys". অর্থাৎ "লিঙ্গ প্রতিক্রিয়াশীল বাজেট বলতে পুরুষ এবং ছেলেদের তুলনায় নারী এবং কন্যাদের উপর প্রকৃত সরকারী ব্যয় এবং রাজস্বের প্রভাব বিশ্লেষণ কে বোঝায়" ।[৪৮]

বর্তমানে বিশ্বের ৫০টিরও বেশী দেশে বিভিন্ন পর্যায়ে জেন্ডার বাজেট প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।[৪৯] বাংলাদেশেও জেন্ডার ভিত্তিক বাজেট প্রণয়ন করা হচ্ছে।(যা গবেষণার ৪র্থ অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে)।

২.৬ নারীবাদ (Feminism) এবং নারীবাদের উন্মেষ এবং বিকাশ

নারী মুক্তির লক্ষ্যে নারী এবং উন্নয়ন এবং জেন্ডার এবং উন্নয়ন এর পাশাপাশি আবির্ভাব হয়েছে নারীবাদ এবং নারীবাদের বিভিন্ন ধরণ। এখন নারীবাদ কি এবং নারীবাদের উন্মেষ এবং বিকাশ, এর ধরণ- ধারণ সম্পর্কে আলোকপাত করা হ'ল।

২.৬.১ নারীবাদ (Feminism)

ফরাসী শব্দ ফেমিনিজম যা বাংলায় নারীবাদ হিসেবে পরিচিত। এই শব্দটি প্রথম প্রচলন ও ব্যবহার করেন কাল্পনিক (Utopio) সমাজতন্ত্রী চার্লস ফুয়েরার। আভিধানিক অর্থে নারীবাদ(Feminism) হলো একটি আন্দোলন যা - 'পুরুষদের মত নারীদের সমান অধিকারের দাবী করে'। কমলা ভাসিন এবং নিঘাত সায়িদ খান বলেন, æUnlike many other æisms" Feminism does not derive its theoretical or conceptual base from any single theoretical formulation. There is also no single person (like Marx, Mao or Ghandi) who has defined feminism for all of us, for all time to come. There is therefore no specific abstract definition of feminism applicable to all women at all times". অর্থাৎ অন্যান্য অনেক ইজম এর মত নারীবাদ কোন একক ধারণাগত গঠন থেকে নিজস্ব তাত্বিক বা ধারণার উদ্ভব করেনি। কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তিত্বের (মার্কস, মাও অথবা গান্ধিজির মত) মাধ্যমেও সর্বযুগের সকল

---

[৪৮]. www.idrc.ca/en/env

[৪৯].আশরাফ সিদ্দিকী ঃ জেন্ডার বাজেট, জেন্ডার ও উন্নয়ন কোষ, (১মখন্ড), পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ৬১৭।

সময়ের জন্য নারীবাদের কোন সংজ্ঞার উদ্ভব ঘটেনি। সেজন্য সকল সময়ের নারীদের জন্য প্রযোজ্য নারীবাদের কোন নির্দিষ্ট বিমূর্ত সংজ্ঞা নেই"।[৫০]

তথাপিও তাঁরা দু'টি সংজ্ঞা উল্লেখ করেন। একটি হলো , " An awareness of women's oppression and exploitation in society , at the place of work and within the family and conscious action to change the situation" – অর্থাৎ"পরিবার, কর্মক্ষেত্র ও সমাজে নারীর হীনমর্যাদা সম্পর্কে সচেতনতা অর্জন এবং এই অবস্থা পরিবর্তনে সচেতন সক্রিয় উদ্যোগ"। [৫১]

অন্যটি হলো, " Feminism is an awareness of patriarchal control, exploitation and oppression at the material and ideological levels of women's labour, fertility and sexuality in the family, at the place of work and in society in general, and conscious action by women and men to transform the present situation'' - অর্থাৎ নারীবাদ হলো নারীকে বশ্য, অধীনস্থ ও হীন করে রাখার বিরাজমান পিতৃতান্ত্রিক ক্ষমতা কাঠামোর বিরুদ্ধে সচেতনতা এবং এই অবস্থা বদলানোর লক্ষ্যে নারী এবং পুরুষের সচেতন প্রয়াস। [৫২]

শাহীন রহমান বলেন, "একজন মানুষ হিসেবে নারীর পূর্ণ অধিকারের দাবী হলো নারীবাদ। .. .. বিশ্বজুড়ে যে বিদ্যমান শ্রমবিভাগ পুরুষের উপর রাজনীতি,অর্থনীতি, সংস্কৃতি এ সব সামাজিক পরিমন্ডলের দায়িত্ব অর্পণ করে এবং নারীকে গোটা সংসারের বোঝা বহনকারী বিনা মজুরীর বাদিগীরির দিকে ঠেলে দেয় তাকে চ্যালেঞ্জ করে নারীবাদ। .. .. নারীবাদ বিরাজমান ক্ষমতা কাঠামো, আইন - কানুন, রীতি-নীতি যা নারীকে বশ্য, অধীনস্থ ও হীন করে রাখে - তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। নারীবাদ হলো একটি সামাজিক আন্দোলন যা নারীর গৎবাধা ভূমিকা ও ভাবমূর্তির পরিবর্তন, জেন্ডার বৈষম্য বিলোপ এবং পুরুষের মতো নারীর সমান অধিকার অর্জনের প্রয়াসী। .. .. নারীবাদ (Feminism) তাই নারীদের আন্দোলন নয় বরং নারীদের জন্য আন্দোলন, নারী ও পুরুষের মধ্যে সাম্য প্রতিষ্ঠার আন্দোলন।[৫৩]

আবার মাসুদুজ্জামান এর বক্তব্যও এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ, " নারীবাদের প্রধান গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয় হচ্ছে ক্ষমতাকাঠামো, যে কাঠামোতে পুরুষেরই প্রাধান্য, নারী তার অধস্তন, পুরুষই সবকিছুর নিয়ন্ত্রক। নারীবাদীরা এই তুলনা সূত্রটি গ্রহণ করে নারীর সামগ্রীক উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন ধরনের পুরুষতান্ত্রিক আধিপত্যের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেন। ফলে তত্ত্ব ও আন্দোলন এই দুইয়ের সম্মিলন ঘটেছে নারীবাদে। নারীবাদীরা সামাজিক, আঞ্চলিক, ও বৈশ্বিকভাবে নারীবাদকে ছড়িয়ে দিয়েছেন। বিশ্বজনীনভাবে এভাবেই নারী ও পুরুষের মধ্যে বৈষম্য নিরসনের কাজ শুরু হয়, ঘটতে থাকে নারী উন্নয়ন। তত্ত্বগত দিক থেকে নারীবাদের রয়েছে বিভিন্ন শাখা - উদারনৈতিক, মার্কসবাদী ,আমূল, সমাজতান্ত্রিক, বৈশ্বিক নারীবাদ ইত্যাদি । নারীবাদ সমতা ও সমানাধিকারের উপর প্রতিষ্ঠিত বলে নারী পুরুষের উন্নয়নের সঙ্গে নারীবাদের সম্পর্ক গভীর"।[৫৪]

---

[৫০]. Kamla Bhasin & Nighat Said Khan ঃ Some questions on Feminism and its Relevance in South Asia., Kali For Women, K - 92 , Ist floor,H ouse Khas Enclave, New Delhi – 110016, 1986, P . 2.

[৫১]. পূর্বোক্ত, পৃঃ ০৩।

[৫২]. পূর্বোক্ত, পৃঃ ০৩।

[৫৩].শাহীন রহমান ঃ পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ৮৭।

[৫৪]. মাসুদুজ্জামান ঃ নারীবাদ, (সেলিনা হোসেন সম্পাদিত ঃ জেন্ডার ও উন্নয়নকোষ, ১মখন্ড), পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ৮৮৪ - ৮৮৫ ।

২.৬.২.নারীবাদের উন্মেষ এবং বিকাশ

নারীবাদের উন্মেষের কোন নির্দিষ্ট সময়সীমা উল্লেখ করা সম্ভব নয়। তথাপিও এটিই বলা হয়ে থাকে যে, যখন থেকে নারীরা তাদের অবস্থা এবং অবস্থানের উন্নয়নের জন্য বৃহৎ পরিসরে এবং কার্যকর ভাবে সংগঠিত হতে শুরু করেছে, তখন থেকেই নারীবাদের(Feminism) যাত্রা শুরু। নারীর পরাধীনতা ও অসম অধিকারের বিষয়টি বিধৃত করে ১৬৬২ সালে ওলন্দাজ নারী মার্গারেট লুকাস রচনা করেন 'নারী ভাষণ'(FemaleOorations) যা বিশ্বের এ যাবত জ্ঞাত ইতিহাসে প্রথম নারীবাদী সাহিত্য হিসেবে পরিচিত। এটি ছিল সাহিত্য। তবে প্রথম পুরুষদের বিরূদ্ধে অত্যন্ত সত্য এবং কঠিন অভিযোগ উত্থাপিত হয় যার মাধ্যমে তিনি হলেন সতের শতকের ফরাসী নারী ' পলেইন ডি লা ব্যারে'। তাঁর অভিযোগ হলো, 'নারীদের বিষয়ে পুরুষ একই সঙ্গে অভিযোগকারী এবং বিচারকের আসনে আসীন'। তাই নারীবাদের ইতিহাসে নারীবাদী হিসেবে তার নাম উল্লেখ হয় জোরালো ভাবে।

আবার ১৭৮৯ এ ফরাসী নারীবাদী ওল্যাম্প দ্যু গুৎজু জোরালো এক প্রশ্ন উত্থাপন করেন, তাহলো 'নারীদের যদি ফাঁসী কাষ্ঠে যাবার অধিকার থাকে, তবে পার্লামেন্টে নয় কেন? দুঃখজনক যে ফরাসী সরকার কর্তৃক পরে এই মহান সত্য উত্থাপক নারীবাদীকে সত্যি সত্যিই ফাঁসী দেওয়া হয়েছিল।

তথাপিও থেমে যায়নি নারীদের কলম। 'নারীরা কোনো ভোগের সামগ্রী বা যৌন জীব নয়, তারা ও বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ – তাই তাদের স্বাধীকার দিতে হবে' – এই মূল বক্তব্য প্রদান করে 'নারীর অধিকারের ন্যায্যতা (Vindication of right of women)' গ্রন্থের মাধ্যমে ইংল্যান্ডের মেরী ওলষ্টোনক্রাফট ১৭৯২ সালে নারীবাদকে প্রথম সংগঠিত আকারে উপস্থাপন করেন। খ্রীষ্ট ধর্মের বিধানের নামে প্রচলিত নারীর অধিনস্ততাকে চ্যালেঞ্জ করে ১৮৯১ সালে এলিজাবেথ কেডি স্ট্যান্টন আরও ২৩ জন নারী সহ মিলিত ভাবে রচনা করেন 'নারীর বাইবেল'(Women Bible)"।

নারীদের নিয়ে এই যে নারীবাদী আন্দোলন তাতে যে কেবল নারীরাই সম্পৃক্ত তা কিন্তু নয়, বিভিন্ন সময়ে সামিল হয়েছেন যুক্তিবাদী পুরুষেরাও । ১৮২৫ সালে ইংল্যান্ডে নারীর অধিকারের পক্ষে প্রথম পুরুষ দার্শনিক উইলিয়াম টমসন স্বোচ্চার হন তাঁর ' মানব জাতির অর্ধেক রূপে নারী জাতির আবেদন, মানব জাতির অপর অর্ধেক পুরুষের দুরহঙ্কারের বিরুদ্ধে'(The half portion of mankind women's appeal to the rest portion against male chauvinism) প্রকাশের মাধ্যমে। আবার মার্কস - এঙ্গেলস রচিত বিশ্বখ্যাত 'কমিউনিষ্ট ইশতেহার' (১৮৮৪) সহ এঙ্গেলসের ' পরিবার, ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উদ্ভব'(১৮৮৪), অগাষ্ট বেবেল - এর 'নারী ঃ অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত' এবং 'নারী ও সমাজতন্ত্র' এসব গ্রন্থ নারীমুক্তি আন্দোলনের অন্যতম দিকদর্শন। ইংল্যান্ডের পার্লামেন্ট সদস্য হওয়ার পর ১৮৬৬ সালে দার্শনিক ও আইনজ্ঞ জন ষ্টুয়ার্ট মিল পার্লামেন্টে নারীর ভোটাধিকারের পক্ষে জোরালো যুক্তি তুলে ধরেন এবং পরবর্তিতে তিনিই ১৮৬৯ সালে 'নারীর অধীনতা'(The Subjection of Women) নামীয় গ্রন্থ রচনা করেন যাতে ভোটাধিকার সহ নারীর অধিকারের পক্ষে বক্তব্য জোরদার হয়ে ওঠে।

আবার আধুনিক নারীবাদের জ্ঞান ভান্ডারকে সাহিত্য কর্মের মাধ্যমে সমৃদ্ধ করেছেন যারা, তাঁদের মধ্যে বিখ্যাত হলেন- ভার্জিনিয়া উলফ। এ ছাড়া সিমোন দ্য বোভোয়ার তাঁর কালজয়ী রচনা সেকেন্ডসেক্স (Second sex) ও সেক্সুয়াল পলিটিক্স (Sexual politics), ১৯৯৬ সালে বেটি ফ্রাইডান রচিত দি ফেমিনিন মিষ্টিক (The Feminine Mystic), ১৯৭০ সালে জার্মেইন গ্রিয়ার এর ফিমেল ইউনাক (The female Eunac), শুলাস্মিথ ফায়ার ষ্টোন- এর ডায়ালেকটিকস অব সেক্স (Dialectics of sex), আলেকজান্দ্রা কোলনতাই এর সেক্সুয়াল রিলেশনস এ্যান্ড স্ট্রাগল (Sexual Relation and Struggle), এরিকা ইয়ং রচিত ফিয়ার ফর ফ্লাইং (Fear for Flying), কেটি রোইফে – এর বিউটি মিথ (Beauty myth) ও ফায়ার উইথ ফায়ার (Fire with Fire) প্রভৃতি বিখ্যাত গ্রন্থের মাধ্যমে।

এই নারী-বাদী আন্দোলনে বসে থাকেনি পাকভারত উপমহাদেশও। উনবিংশ শতাব্দির গোড়ার দিকে তৎকালীন ভারতবর্ষে নারীর শোচনীয় দূরাবস্থার বিরুদ্ধে এবং নারীর অধিকারের স্বপক্ষে স্বোচ্চার হন যে নারীবাদী তিনি একজন পুরুষ - রাজা রাম মোহন রায় । ১৮১৮ সালে তিনি কলিকাতায় সহমরণ বা সতীদাহ প্রথা বিলোপের উদ্যোগ নেন। যার ফলে ১৮২৯ সালে লর্ড বেন্টিঙ্ক সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ করে আইন পাশ করেন। শুধু সতীদাহ ই নয় একই সাথে তাঁর আন্দোলন চলেছে বহুবিবাহ বন্ধ, উপপত্নী বর্জন, জাতিভেদ প্রথা বিলোপ, নারীর শিক্ষা এবং অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য।

অন্যদিকে নারীকে ধর্মশাস্ত্রের অপব্যাখ্যার উৎপীড়ন থেকে রক্ষা করতে সচেষ্ট হন – ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তিনি প্রথম নারীর শিক্ষার অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ইংরেজ নারী মেরী ককের সাথে মিলে ৪৩ টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তিনিই ১৮৫০-৫৫ এই সময়ে বিধবা বিবাহের স্বপক্ষে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলেন এবং স্বয়ং ৬০টি বিধবা বিবাহের আয়োজন করেন। তিনি একই সাথে বাল্যবিবাহ বন্ধ, নারী শিক্ষার প্রচলন, বহুবিবাহ বন্ধ ইত্যাদি বিষয়কে কেন্দ্র করে নারীমুক্তি আন্দোলন চালাতে থাকেন।

আবার এই বিষয়ে লেখালেখির মাধ্যমে উনবিংশ শতাব্দির দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই প্রথম সাহিত্য জগতে ঝড় তোলেন কৃষ্ণভামিনী দাসী, কামিনী সুন্দরী, বামা সুন্দরী দেবী, মোক্ষদা দায়িনী প্রমুখ নারীরা। প্রায় একই সময়ে পূর্ব বঙ্গের (বর্তমান বাংলাদেশের কুমিল্লা জেলার লাকসাম উপজেলার) স্বনামখ্যাত এক নারী জমিদার নবাব ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী যিনি 'রূপজালাল' নামীয় গ্রন্থে একই সাথে গদ্য - কবিতা - গানের সংমিশ্রনে বই লিখে খ্যাতি লাভ করেন। তিনি পূর্ববাংলার মেয়েদের শিক্ষিত করার প্রয়াসে ১৮৭৩ সালে কুমিল্লায় প্রথম 'বালিকা বিদ্যালয়' (বর্তমানে যা নবাব ফয়জুন্নেছা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় নামে পরিচালিত হচ্ছে ও হাজার হাজার মেয়েদের লেখা পড়ার পথ সুগম হয়েছে), চিকিৎসা বিহীন মৃত্যুর প্রহর গোনা নারীদের চিকিৎসার জন্য ১৮৯৩ সালে কুমিল্লায় একটি 'জেনানা হাসপাতাল' প্রতিষ্ঠা করেন।(বর্তমানে যা কুমিল্লা সরকারী হাসপাতালের সঙ্গে ফয়জুন্নেছা মহিলা ওয়ার্ড নামে পরিচালিত হচ্ছে) ।

বাংলার প্রথম নারীবাদী সংগঠন 'সখি সমিতি' প্রতিষ্ঠা করেন স্বর্ণকুমারী দেবী ১৮৮৫ সালে এবং তিনি লাঠিখেলা ও অস্ত্র-চালনা প্রশিক্ষনের মাধ্যমে তরুন-তরুনীর মধ্যে দেশপ্রেম সঞ্চারিত করার চেষ্টা করেন। পূর্ব বাংলার ওই নারী জমিদার নবাব ফয়জুন্নেছা চৌধুরানীও 'সখী সমিতি'র সদস্য ছিলেন। ১৯৯০ সালে সর্বভারতীয় নারী সংগঠন 'ভারত স্ত্রী মহামন্ডল' প্রতিষ্ঠা করে বাংলার প্রথম নারীবাদী রূপে খ্যাতি লাভ করেন সরলা দেবী চৌধুরানী।

Dhaka University Institutional Repository

বিংশ শতাব্দির শুরুতেই তৎকালীন পূর্ব বাংলায় (বর্তমান বাংলাদেশের রংপুর জেলার) যে এক অনন্য অসাধারণ নারীবাদী প্রবক্তার উত্থান ঘটে, তিনি হলেন বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন। তাঁর সমগ্র জীবন ধরে যাবতীয় কর্মে ও লেখনীর মাধ্যমে বাংলায় আধুনিক নারীবাদের ভিত্তি স্থাপন করেন তিনি। তাঁর লেখা 'স্ত্রী জাতির অবনতি' বাংলার প্রথম নারীবাদী প্রবন্ধ' যেখানে নারীদের অধিকার আদায়ের জন্য বিদ্যমান ছিল তীব্র তীক্ষ্ণ লেখনির কশাঘাত যা বেগবান করে তুলেছিল বাংলায় নারীবাদী আন্দোলনকে। শুধু একটি প্রবন্ধেই নয়, তাঁর সমস্ত লেখার মধ্যেই নারীবাদী আন্দোলন বেগবান হয়ে উঠেছিল। নারী শিক্ষার জন্য তিনি প্রতিষ্ঠা করেন 'সাখাওয়াতমেমোরিয়াল গার্লস স্কুল', আবার আশ্রয়হীন নারীদের আশ্রয় প্রদান ও স্বাবলম্বী করার সুযোগ করে দেয় তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'আঞ্জুমানে খাওয়াতীনে ইসলাম '।

এই বিষয়ে পিছিয়ে নেই আরব বিশ্বের মুসলিম নারীরাও। নারীবাদীদের মধ্যে মরক্কোর ফাতিমা মারনিসি তাঁর 'মুসলমানের অবচেতনায় নারী' এবং মিসরের নওএল সাদাওয়ির 'আরব বিশ্বে নারী' ও 'হাওয়ায় লুকানো মুখ' আধুনিক নারীবাদী চেতনার প্রকাশ ঘটিয়ে প্রচন্ড আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন।

এখানে উল্লেখ করতেই হয় যে নারীবাদী চেতনার বিকাশকে ত্বরান্বিত করেছে নিউইয়র্কের সেলাই কারখানার নারী শ্রমিকেরা তাদের লড়াই এবং সংগ্রাম এর মাধ্যমে। ১৮৫৭ সালের ৮ই মার্চ থেকে নিউইয়র্কের সেলাই কারখানার নারী শ্রমিকরা উন্নত ভোটাধিকার, কর্মপরিবেশ, শ্রম সময় হ্রাস ও ট্রেড ইউনিয়নের অধিকারের দাবীতে এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের সূচনা করে। তাঁরা প্রতিবাদ করে রাস্তায় নেমে এসেছিলেন। তাঁদের উপর নেমে এসেছিল পুলিশি নির্যাতন ও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা কর্মীদের প্রহার। যার ফলে তাঁদের মধ্যকার অনেক নিবেদিতপ্রাণ কর্মী প্রাণ হারিয়েছিলো।এরই ফলশ্রুতিতে ১৮৬০ সালের ৮ মার্চ নিউইয়র্ক শহরের কারখানার নারী শ্রমিকরা তাদের দাবী আদায়ের লক্ষ্যে নিজস্ব ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করে। পরবর্তীতে ১৯১০ সালে জার্মান কমিউনিষ্ট নেত্রী ক্লারা জেটকিন জার্মানির স্টুটগার্ট শহরে শ্রমজীবি নারীদের নিয়ে একটি ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন পরিচালনা করেন। ১৯১০ সালে ডেনমার্কে সমাজতন্ত্রী নারীদের দ্বিতীয় সম্মেলনে ৮মার্চকে 'আন্তর্জাতিক নারী দিবস' হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত হয়। অবশ্য এর পর থেকে দিবসটি বিশ্বব্যাপি কেবল কমিউনিষ্ট ও সমাজতন্ত্রের আদর্শে বিশ্বাসীরাই পালন করত। ১৯৮৫ সালে জাতিসংঘ ৮ মার্চকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেয়ায় বর্তমানে এ দিবসটি সার্বজনীন ভাবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নারী পর্যায়ে 'নারী দিবস' হিসেবে পালিত হচ্ছে।[৫৫]

২.৭. নারীবাদের বিভিন্ন ধরণ

উল্লেখিত কার্যক্রমের মাধ্যমেই ইতিমধ্যে গড়ে উঠেছে নারীবাদের বিভিন্ন ধারা বা ধরণ। সেগুলো নিম্নরূপ –

(১) উদার বা ব্যক্তি স্বাতন্ত্রবাদী নারীবাদ (liberal Feminism)

এই মতবাদের উদ্ভব ঘটে মেরি ওলস্টোন ক্র্যাফটের ভিন্ডিকেশন অফ দি রাইটস অফ ওম্যান- এ (১৭৯২), এবং পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে জন ষ্টুয়ার্টমিলের দি সাবজেকশন অফ ওম্যান (১৮৬৯) - এ। বেটি ফ্রাইডান সহ পাকভারত উপমহাদেশের রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখেরাও উদারনৈতিক নারীবাদের প্রবক্তা। এই

[৫৫]. শাহীন রহমান ঃ জেন্ডার প্রসঙ্গ পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ৮৭- ৯২ এবং মালেকা বেগমঃ নারী আন্দোলন ও উন্নয়ন, (সেলিনা হোসেন সম্পাদিত জেন্ডার ও উন্নয়ন কোষ, ১ম খন্ড), পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ৪৬৭- ৪৬৯ ৭০. ফারজানা নাজ ঃ জেন্ডার শব্দকোষ , পূর্বোক্ত পৃ ঃ ৭৩-৭৫।

মতবাদটিই বর্তমানে প্রচলিত প্রধান নারীবাদী ধারা। এটি পশ্চিমের গণতান্ত্রিক বিশ্বাসের সাথে অনেকটা সঙ্গতিপূর্ণ। বিশের দশক পর্যন্ত এই ধারণাটিই ইউরোপের প্রধান নারীবাদী ধারা রূপে বিকশিত হয়। ব্যক্তিগত অধিকার, ভোটের অধিকার, বাক স্বাধীনতা, নির্বাচন ও রাজনীতির ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক ভাবে পুরুষের সমান সুযোগ লাভ, রাষ্ট্রীয় ভাবে নারীর অধিকার সমতার ভিত্তিতে উন্নীত করাই হলো উদার নৈতিক নারীবাদের মূল দাবী।[৫৬]

পরবর্তীতে উদার বা ব্যক্তি স্বাতন্ত্র বাদী নারীবাদীগণ উপরে উল্লেখিত বিষয় সমূহের অতিরিক্ত জম্মনিয়ন্ত্রন ও গর্ভপাতের স্বাধীনতারও প্রত্যাশী হন। তাঁরা মনে করেন শিশু পালন শুধু নারীর কাজ নয়, তা পুরুষেরও কাজ, তাই পুরুষকেও তাতে অংশ নিতে হবে। নারী পুরুষের কোনো বৈষম্যকে তাঁরা প্রাকৃতিক বলে মনে করেননা, মনে করেন সমাজের সৃষ্টি। তারা মনে করেন নারী মুক্তি শুধু নারীরই মুক্তি ঘটাবেনা, ঘটাবে পুরুষেরও মুক্তি, এতে পুরুষের কিছু অবৈধ সুবিধা কমলেও পুরুষের মুক্তি পাবে সংসারের ভরণ পোষণ ও দেশ রক্ষার দায়িত্ব থেকে।[৫৭]

(২) মার্ক্সীয় নারীবাদ (Marxist Feminism)

মার্ক্সীয় মতাদর্শ হতেই মাক্সীয়নারীবাদের উৎপত্তি – যা ব্যক্তি মালিকানা ভিত্তিক শ্রেণীবিভক্ত সমাজকেই নারীর পরাধীনতার মূল কারণ রূপে চিহ্নিত করে। মার্ক্স, এঙ্গেলস, লেনিন, অগাষ্ট বেবেল, ক্লারা জেটকিন, আলেকজান্ডার কোলনতাই প্রমুখ এই মার্কসীয় নারীবাদের ভিত্তি নির্মাণ করেছেন। মার্ক্সীয় নারীবাদীদের কাছে নারী মুক্তি আন্দোলন পুরুষের বিরুদ্ধে নয়, পুঁজিবাদী ব্যবস্থা এবং পুরুষতান্ত্রিক পুঁজিবাদী সামাজিক সম্পর্কের বিরুদ্ধে।[৫৮]

মাক্সীয় নারীবাদীরা নারী শোষণকে ব্যক্তি মালিকানার ফল হিসেবে চিহ্নিত করেন। তাঁদের মতে ব্যক্তিমালিকানা বিলুপ্তি, এবং সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নারীকে মুক্ত করা সম্ভব। মার্ক্সীয় নারীবাদের উদ্ভব ঘটে এঙ্গেলসের পরিবার, ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি সন্দর্ভে (১৮৮৪)। মার্ক্সবাদ অনুসারে শ্রেণী বিভক্ত সমাজে অধিকাংশ মানুষই শোষিত। কেননা সেখানে উৎপাদনের উপকরনগুলো থাকে মালিক শ্রেণীর অধিকারে। যারা আধিপত্য করে শ্রমিক শ্রেণীর ওপর, যারা বেঁচে থাকার জন্য সস্তায় বেচে দিতে বাধ্য হয় তাদের শ্রমশক্তি। যেহেতু নারীও শ্রমিকের মতই একই রকমে শোষিত তাই তাঁদের মতে নারী ও শ্রমিকের স্বার্থ একই, তবে নারী পুরুষের তুলনায় আরো অধিক শোষণের শিকার হয়।

এর কারণ প্রথাগত পরিবার। মার্ক্সবাদ অনুসারে নারী হচ্ছে পারিবারিক দাসী, সে বাইরের কোন উৎপাদনমুখি কাজে অংশ নিতে পারেনা। তাঁদের মতে পরিবার গঠিত হয়েছিলো শ্রেনীবিভক্ত সমাজে পুরুষাধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য। পুরুষই পরিবারে সার্বভৌম। এঙ্গেলসের (১৮৮৪) মতে এক পতি-পত্নি বিয়ে নির্ভর আধুনিক ব্যক্তিগত পরিবারে স্ত্রীলোকেরা প্রকাশ্য অথবা গোপন গার্হস্থ্য দাসত্বের ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে। তবে এই বিয়ে নামমাত্র একপতি পত্নি বিয়ে, এতে নারীকেই থাকতে হয় সতী, কিন্তু পুরুষের কাছে যৌন সততা চাওয়া হয়না।

তাঁদের মতে পুজিবাদ আর পুরুষাধিপত্যবাদ অবিচ্ছেদ্য, একটি শক্তিশালী করে আরেকটিকে। এঙ্গেলস আরও বলেন, 'সামাজিক উৎপাদনের ক্ষেত্র থেকে বহিস্কৃত হয়ে স্ত্রীই হলো প্রথম ঘরোয়া ঝি, এবং সামাজিক উৎপাদনের মধ্যে গোটা স্ত্রী জাতিকে আবার নিয়ে আসাই হচ্ছে তাদের মুক্তির প্রথম শর্ত'। তখন নারী আর স্বামীর ওপর ভরণপোষণের জন্য নির্ভর করবেনা, নারী স্বাধীন হবে, তবে এর জন্য দরকার সমাজের মৌলিক রূপান্তর। নারী আজ

---

[৫৬]. শাহীন রহমান ঃ জেন্ডার প্রসংগ (প্রথম প্রকাশ), ১৯৯৮, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৯৭ - ৯৮।

[৫৭]. হুমায়ুন আজাদ ঃ নারী, ২য় সংস্করণ, ৩য় মুদ্রন, আগাম প্রকাশনী, ৩৬ বাংলাবাজার,ঢাকা, ১৯৯৩. পৃঃ ৩২৮-৩২৯।

[৫৮]. শাহীন রহমান ঃ জেন্ডার প্রসংগ (প্রথম প্রকাশ), ১৯৯৮, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৯৭ - ৯৮।

যে সকল কাজ করে- ঘর কন্যা, শিশু পালন, সব কিছুকে নিয়ে আসতে হবে সামাজিক উৎপাদনের ক্ষেত্রে। তাঁরা মনে করেন নারী মুক্তির জন্য দরকার পরিবার সংগঠনটির মৌলিক পরিবর্তন। এর জন্য পরিবারের আর্থিক কাজগুলো পালন করতে হবে রাষ্ট্রকে; রাষ্ট্রই বহন করবে পরিবারের ভার। পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় তা সম্ভব নয়। এ ভার নিতে পারে শুধু সাম্যবাদ। তাই শুধু সাম্যবাদের মধ্যেই নারী পেতে পারে প্রকৃত মুক্তি। সেখানে পরিবারের মধ্যে স্বামীটি থাকবেনা বুর্জোয়া, আর স্ত্রীটি প্রলেতারিয়েত। সাম্যবাদে ধ্বংস হয়ে যাবে আর্থ একক রূপে বিরাজমান একপতি - পত্নিক পরিবার, তবে তা টিকে থাকবে সামাজিক একক রূপে। সাম্যবাদেও বিয়ে থাকবে, তবে তাতে এখনকার মতো আর্থ চুক্তি থাকবেনা, তখনও পরিবার থাকবে, তবে তা গড়ে উঠবে নারী - পুরুষের পরস্পরের আকর্ষণে। তখন নারী ও পুরুষ হবে প্রকৃতই মুক্ত।[৫৯]

(৩) আমূল/ রেডিক্যাল নারীবাদ(Radical Feminism)

বিংশ শতাব্দীর ৬০ - এর দশকে এই নারীবাদী ধারার উদ্ভব ঘটে পাশ্চাত্যে। এই জাতীয় নারীবাদী ভাবনার উন্মেষ ঘটান বেভোয়ার, মিলেট, গ্রিয়ার ও আরো অনেকে, তবে তা প্রবল রূপ পায় টাইগ্রেস অ্যাটকিনসন ও শূলামিথ ফায়ার ষ্টোনের লেখায়। আমুল/ রেডিক্যাল নারীবাদীরা নারীপীড়নের সমস্ত দিক ব্যাখ্যা করে স্থির করেছেন যে, নারী শোষণের মূল কারণ হচ্ছে লৈঙ্গিক পীড়ন। তাঁরা মনে করেন নারীর সমস্ত দূরবস্থার মূল কারণ জৈবিক। গর্ভ ধারণ করতে গিয়েই নারী মেনে নিতে বাধ্য হয় পুরুষের অধীনতা। তাঁদের মতে পরিবারের উৎপত্তি ঘটেছে জৈবিক কারণে, পরিবার একটি জৈবিক সংগঠন। তাঁরা মনে করেন ঐতিহাসিক ভাবে সবচেয়ে আদি ও মৌলিক পীড়ন হচ্ছে পুরুষ কর্তৃক শারীরিক ভাবে নারীকে নিজের অধীনে নিয়ে আসা। পুরুষেরা যেনো মনে করেন যে, দেহই নারীর নিয়তি, তাই নারীকে মুক্তি পেতে হবে- এ নিয়তি থেকে।

নারী মুক্তির লক্ষ্যে মূল লড়াই তাই লিঙ্গবাদের বিরুদ্ধে। নারী মুক্তির জন্য দরকার জৈবিক বিপ্লব। তাঁরা মনে করেন উন্নত প্রযুক্তির সাহায্যে নারীকে মুক্ত করা সম্ভব সন্তান ধারণ ও পালনের মৌলিক অসাম্য থেকে। গর্ভ ধারণ নারীর জন্য অবধারিত নয়, মানব প্রজাতিকে টিকিয়ে রাখার দায়িত্ব নারীর নয়, যদি মানব প্রজাতিকে টিকিয়ে রাখতে হয়, তবে তার দায়িত্ব পালন করতে হবে পুরুষকেও। নারী আর গর্ভ ধারণ করবে না, কৃত্রিম উপায়ে জন্ম দিতে হবে সন্তান। আর সমাজ বহন করবে তার দায়িত্ব। এই মৌলিক পরিবর্তনের সাথে রাজনৈতিক, সামাজিক, আর্থনৈতিক প্রভৃতি গৌণ ব্যাপারেও বদল ঘটাতে হবে, নারীকে দিতে হবে আত্মনিয়ন্ত্রনের সম্পূর্ণ অধিকার।

তাঁরা মনে করেন, সমাজের সমস্ত কাজে নারীকে সম্পূর্ণরূপে জড়িত করতে হবে এবং দিতে হবে যৌন স্বাধীনতা। তাঁদের মতে প্রযুক্তি শুধু নারীকে গর্ভ ধারনের দায় থেকে মুক্তি দেবে না, পরিশেষে তা মুক্তি দেবে পুরুষকেও। তাঁদের মতে জৈবিক পরিবার বিলুপ্ত হলে যৌনপীড়নও লোপ পাবে। তখন কে কার সাথে, কোন ধরনের যৌন সম্পর্কে জড়িত হবে, তা স্থির করার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে প্রতিটি নরনারীর। তখন সমকাম (Homosexual) - পুরুষের সাথে পুরুষের, নারীর সাথে নারীর- নিন্দিত থাকবেনা, বিকল্প বলেও গণ্য হবেনা। যে যার রুচিমত বেছে নেবে বিশেষ ধরনের যৌন সম্পর্ক।

আমূল নারীবাদের আরও একটি ধারা হচ্ছে নারী সমকামী স্বাতন্ত্রবাদ। তাঁদের মতে পুরুষাধিপত্য বিলুপ্ত করার উপায় হচ্ছে পুরুষের সাথে কোনো সম্পর্কে না আসা। তাই পুরুষাধিপত্য প্রতিরোধ করার জন্য নারী পুরুষকে প্রত্যাখ্যান করে যৌনসঙ্গী হিসেবে বেছে নেবে নারীকে। কারণ বিষম সম্পর্কের ভেতরই গোপন রয়েছে পুরুষের প্রভূত্বের ধারণা।[৬০]

---

[৫৯]. হুমায়ুন আজাদ ঃ নারী, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩২৯-৩৩০।

[৬০]. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৩০-৩৩১।

(৪) সমাজতান্ত্রিক নারীবাদ(Social Feminism)

সমাজতান্ত্রিক নারীবাদ হলো রেডিক্যাল/ আমুল এবং মার্ক্সীয় নারীবাদের এক ধরনের মিলিত রূপ। সমাজতান্ত্রিকরা মনে করেন নারী - পুরুষের মধ্যে জৈবিক যে পার্থক্য সেটি বড় কথা নয়, বরং নারী পুরুষের মধ্যে গড়ে ওঠা সামাজিক সম্পর্কই মূলতঃ নারীর মর্যাদাহীনতার জন্য দায়ী যা পিতৃতন্ত্রকেই পাকাপোক্ত করেছে। তাই পিতৃতন্ত্রের বিলুপ্তি এবং নারীর অর্থনৈতিক মুক্তি - এ দু'টির মাধ্যমেই কেবল নারী মুক্তি সম্ভব। তাদের যুক্তিহলো একটি নতুন সমাজ গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজন নারী ও পুরুষের মধ্যে সমতা ও সহযোগিতা। এবং যতদিন পর্যন্ত না সমাজে নারীদের প্রতি সকল ধরনের অশুভ দমন নিপীড়ন বিলোপ হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত কোন ধরনের সমতা অর্জন সম্ভব নয়। সেই সঙ্গে সমাজের সকল স্তরের নারীদের মধ্যে ঐক্য ও সহযোগিতা প্রয়োজন। নারীদের মধ্যে ঐক্য ও সহযোগিতা হলেই সব ধরনের অন্যায় অবিচার দূর করা সম্ভব। তাদের মতে, নারীর প্রকৃত স্বাধীনতাই সমাজের সমতা অর্জন নিশ্চিত করতে পারে। সমাজতান্ত্রিক নারীবাদকে অনেকে সামাজিক নারীবাদ (Social Feminism) রূপেও নামকরণ করে থাকে।[৬১]

(৫) সাংস্কৃতিক নারীবাদ (Cultural Feminism)

সাংস্কৃতিক নারীবাদ সংস্কৃতি ও ভাবাদর্শের উপর জোর দেয়। এরা মাতৃত্বকে অবমূল্যায়ন এবং নারীসূলভ গুণাবলীকে ধ্বংস করার পক্ষপাতি নয়। যদিও এরা পুরুষকে তাদের শত্রুরূপে বিবেচনা করে। সাংস্কৃতিক নারীবাদীরা, শারীরিক বাস্তবতা (biology)জনিত কারণে যে সব নারীবাদী বৈশিষ্ট্য বা সংস্কৃতি নারীকে সমৃদ্ধ করে তা বর্জনের পক্ষপাতি নয়। সেগুলো হলোঃ অপরের জন্য ভাবনা, সহনশীলতা, মমতাময়ী, আত্মনির্ভরশীলতা, নমনীয়তা, প্রতিযোগিতাহীন মনোভাব, সহযোগিতা, মাতৃত্ব ইত্যাদি। আর যেহেতু এইসব নারীবাদী সংস্কৃতি সমাজের কল্যানের জন্য কাঙ্খিত বিষয় তাই তাদের মতে এই সংস্কৃতিকে উর্ধ্বে তুলে ধরতে হবে।[৬২]

(৬) ইকো ফেমিনিজম বা পরিবেশ নারীবাদ(EcoFeminism)

পরিবেশ নারীবাদের অন্যতম প্রবক্তা হলেন ভারতের বন্দনা শিবা, মারিয়ামিজ প্রমুখ। তাদের মূল বক্তব্য হলো নারী ও প্রকৃতি উভয়কেই শতাব্দির পর শতাব্দি ধরে বিদ্যমান পিতৃতন্ত্র শোষণ করে চলছে এবং হাজার বছর ধরে অব্যাহত ভাবে নারী ও প্রকৃতির উপর প্রাধান্য বিস্তার করে এসেছে। তাই নারী ও প্রকৃতির উপর সমান্তরাল ভাবে বিদ্যমান পুরুষ প্রাধান্যের অবসান দাবী করে এই নারীবাদ।[৬৩]

(৭) বৈশ্বিক নারীবাদ (Global Feminism)

নারীর অবস্থানকে বৈশ্বিক ভাবে দেখার দিক - নির্দেশনা থেকেই **বৈশ্বিক নারীবাদ** (Global Feminism)এর উদ্ভব। তাদের যুক্তি হলো কেবল নির্দিষ্ট একটি দেশেই নয়, নারীরা দুনিয়ার সর্বত্রই শোষিত, ফলে দরিদ্র। সকল পিতৃতান্ত্রিক সমাজের পুরুষেরা নানাভাবে নারীর অর্থনৈতিক ও পুনঃ উৎপাদন মূলক শ্রমকে আত্মসাৎ করে। সে জন্য তাদের অভিমত হলো, 'লিঙ্গ বৈষম্যহীন সমাজ নির্মানের কর্মকৌশল হিসেবে এমন একটি বৈশ্বিক সাপোর্ট নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা যেখানে প্রতিটি সমাজের নারীরা তাদের সমস্যাবলীকে যথাযথভাবে চিহ্নিত করতে এবং তা দূর করতে

[৬১].শাহীন রহমান ঃ জেন্ডার প্রসঙ্গ (প্রথম প্রকাশ), ১৯৯৮, পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ৯৮-৯৯ ।

[৬২]. পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ৯৯-১০০।

[৬৩].পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ১০০।

সক্ষম হয়'।[৬৪]

এতক্ষণ পর্যন্ত নারী মুক্তির লক্ষ্যে উদ্ভাবিত বিভিন্ন ইস্যু বা বাদ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। আলোচনায় যে বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে তা হলো, নারী উন্নয়নে বিভিন্ন এ্যপ্রোচ, নারী এবং উন্নয়ন(WID), জেন্ডার এবং উন্নয়ন(GAD) আর নারীবাদ(Feminism) - যাই বলা হউক না কেন, সকল ইস্যুই একে অপরের পরিপুরক এবং সবগুলো ইস্যুর ই মূল লক্ষ্য একটি, তা হলো - নারী মুক্তি।

তবে আলোচনায় যে বিষয়টি লক্ষ্যনীয় হয়েছে ,তা হলো - এই ইস্যু সমুহের মাধ্যমে নারী মুক্তির লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ কিছুটা কঠিন এবং জটিল। তা এই কারণে যে, একদিকে বিভিন্ন ইস্যু, বাদ বা তত্ত্ব , অপরদিকে সেগুলোর বিস্তৃতি, বিভিন্ন আকার -প্রকারে আত্মপ্রকাশ এবং প্রতিটি ক্ষেত্রেই বিস্তর ভাবধারার উদ্ভব। ফলে কোনটি থেকে কোনটি নিয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে সে সিদ্ধান্ত সহজ হয়না। যেমন নারীদের অবস্থার উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন এ্যপ্রোচ নিয়ে কার্যক্রম চলা অবস্থায় যখন সমদর্শী কার্যক্রম(Equity approach) এবং ক্ষমতায়ন কার্যক্রম(empowerment approach) এলো তখনই এলো - 'উন্নয়নে নারী' এবং 'নারী এবং উন্নয়ন'।

এসবের মাধ্যমে কার্যক্রম চলা অবস্থাতেই এলো 'জেন্ডার'। তখন আবার বুঝতে হলো জেন্ডার কি ও কেন, জেন্ডার চাহিদা, জেন্ডার এবং উন্নয়ন। আবার জেন্ডার এবং উন্নয়নে এসে উন্নয়ন, ক্ষমতায়ন, সমতা - সাম্য, মূলধারা ইত্যাদি বিস্তর বিষয়াদির উদ্ভব ঘটল। এতসব বিষযাদির আঙ্গিকে কার্যক্রম গ্রহণ সাধারণ নারীদের পক্ষে এক দুর্বোধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়ালো। বিষয়টি একেবারে এই বিষয়ে অভিজ্ঞ, শিক্ষিত তথা বিজ্ঞ সমাজের বিষয় হয়ে পড়ল। এতদসংশ্লিষ্ট সরকারী কর্মকর্তা কর্মচারি কিংবা এনজিও কর্মকর্তা কর্মচারী যারা দেশে বিদেশে এই সব বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত তারা ব্যতিরেকে জেন্ডার সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম গ্রহণ সাধারণ মানুষের জন্য সহজ হয়নি। এরই মধ্যে এলো 'নারীবাদ'।

নারীবাদ এসে প্রাথমিক অবস্থায় কিছুটা উদ্দীপনার সৃষ্টি করলেও যখন তারা বিবাহ ও পরিবার প্রথা ভেঙ্গে সন্তান ধারনের বিষয়টি নারীর উপর বিদ্যমান রেখেই যৌনতাকে অবাধ ও উন্মুক্ত করার কথা বলল, এতে নারীরমুক্তির বিষয়টি প্রশ্নের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ল।

দেখা যায় নারী মুক্তির লক্ষ্যে উদ্ভাবিত হয়েছে বিভিন্ন ইস্যু বা বাদ। এসব ইস্যু কিংবা বাদ অবলম্বনে সঠিক কার্যক্রম গ্রহণের বিষয়টি অনেকটাই জটিল হয়ে পড়ে - কোনটি ছেড়ে কোনটির অবলম্বনে কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে - সে বিবেচনায়। এরূপ অবস্থাতেই জেন্ডার ইস্যু এবং নারীবাদ বাস্তবায়নের কর্মপন্থা নির্ধারণ করে দিক- নির্দেশনা দিয়েছে স্বয়ং জাতিসংঘ। তখনই বরং নারী উন্নয়নে জেন্ডার ইস্যুর উপর কার্যক্রম গ্রহণ সহজ হয়েছে।

এ লক্ষ্যেই পরবর্তী অধ্যায়ে জাতিসংঘ এবং আন্তর্জাতিক সংস্থা সমূহ কর্তৃক নারী জাতির অবস্থার উন্নয়ন এবং মুক্তির লক্ষ্যে সদস্য রাষ্ট্র সমুহের জন্য জেন্ডার ইস্যু এবং নারীবাদের বাস্তবায়ন সংক্রান্ত দিক নির্দেশনা সমূহের উপর অলোকপাত করা হয়েছে।

[৬৪].পূর্বোক্ত, পৃঃ ১০০ ।

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

নারী মুক্তির লক্ষ্যে জেন্ডার ইস্যু বাস্তবায়নে আন্তর্জাতিক দিক নির্দেশনা

বর্তমান গবেষণার দ্বিতীয় অধ্যায়ে নারী মুক্তির লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক ভাবে গৃহীত নারী জাতির উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন এ্যপ্রোচ, নারী উন্নয়ন তত্ব , জেন্ডার ইস্যু এবং নারীবাদ সংক্রান্ত মতামত ইত্যাদি তাত্বিক বিষয়াদির পরিচয় বিধৃত হয়েছে। দেখা গেছে এই সব এ্যপ্রোচ, তত্ব, ইস্যু এবং বাদ ইত্যাদি জেন্ডার ইস্যুর সাথে সম্পৃক্ত হয়ে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে । এসব তত্ব, বাদ এবং ইস্যু সমূহের আলোকে জাতিসংঘ, সদস্য রাষ্ট্র সমূহের জন্য গ্রহণ করেছে বাস্তব সব উদ্যোগ এবং প্রদান করেছে বাস্তবায়ন সংক্রান্ত দিকনির্দেশনা। নারীদের অবস্থার উন্নয়নের জন্য এবং নারীদের নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য জাতিসংঘ সহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থা সমূহ যখন একের পর এক উদ্যোগ গ্রহণ করে সদস্য রাষ্ট্র সমুহের জন্য দিক নির্দেশনা প্রদান করতে থাকে মূলতঃ তখনই জেন্ডার ইস্যু সংশ্লিষ্ট মতবাদ সমূহের আলোকে বিশ্বব্যাপী নারী মুক্তির লক্ষ্যে বাস্তব সম্মত কার্যক্রম শুরু হয়।

জাতিসংঘের গৃহীত উদ্যোগ সমূহের মধ্যে প্রাথমিক পর্যায়ে উন্নয়ন দশক, নারীবর্ষ, নারী-দশক ইত্যাদি সহ বিভিন্ন নারী দিবস উদযাপন অতঃপর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি ও সনদ রয়েছে। এছাড়া নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ (CEDAW) সনদ, জেন্ডার ইস্যুর আলোকে বেইজিং প্লাটফরম অব এ্যাকশন এ নির্ধারিত ১২ টি গুরুত্বপূর্ণ দিক (12 Critical areas of BPFA) এবং মিলিনিয়ম ডেভেলপমেন্ট গোল (MDG) ইত্যাদি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত নির্দেশনা উল্লেখযোগ্য। আবার বিশ্বব্যাংক/আই এম এফ এর উদ্যোগে প্রণীত দারিদ্র হ্রাসকরণ কৌশলপত্র যা সংক্ষেপে পি আর এস পি(PRSP)নামে পরিচিত, সেটিও নারী মুক্তির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ।

উল্লেখ্য যে, জাতিসংঘের এসব দিক নির্দেশনার আলোকে নারী মুক্তির বিষয়টি বিশ্বজুড়ে আলোড়নের সৃষ্টি করেছে। বাংলাদেশেও নারীমুক্তির লক্ষ্যে এসব উদ্যোগ স্বীকৃত এবং গৃহীত। বাংলাদেশে নারীমুক্তির লক্ষ্যে জেন্ডার ইস্যুর আলোকে পরিচালিত কার্যক্রমের উপর বিস্তারিত আলোকপাতের পূর্বে জেন্ডার ইস্যুর প্রেক্ষিতে জাতিসংঘের দিকনির্দেশনা সমূহের উপর সম্যক ধারণা আবশ্যক। বর্তমানে নারী মুক্তির লক্ষ্যে জেন্ডার ইস্যু বাস্তবায়ন সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক উদ্যোগ এবং প্রদত্ত দিকনির্দেশনা সমূহ তুলে ধরা হলো।

৩.২ উন্নয়ন দশক, নারী বর্ষ, নারী দশক, নারী দিবস এবং সম্মেলন উদযাপন

৩.২.১ উন্নয়ন দশক ঘোষণা (Development Decade)

জাতিসংঘ প্রথম তার অতীতের উন্নয়ন কর্মকান্ড মূল্যায়ন শুরু করে দশকওয়ারী বিভিন্ন উন্নয়ন দশক ঘোষণার মাধ্যমে। ১৯৬০-৭০ দশক হলো জাতিসংঘের প্রথম উন্নয়ন দশক। যদিও এ সময়ে নারীদের মূলতঃ দেখা হয়েছে শুধু মাত্র মা ও গৃহবধূ রূপে। সেখানে নারীর জন্য কল্যানকর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি দেখানো হয়েছে। তখন জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনায় নারীদের তেমন বিশেষ বিবেচনায় আনা হয়নি।

৩.২.২ নারী বর্ষ এবং নারী দশক উদযাপন (International Women year & UN International Women Decade)

জাতিসংঘ ১৯৭৫ সালকে নারীবর্ষ (IWY) এবং ১৯৭৬-৮৫ দশককে আন্তর্জাতিক নারীদশক (UN Internationational Women Decade) হিসেবে ঘোষণা করে। এই সময় থেকে নারী ইস্যুটি মানবাধিকারের প্রেক্ষাপটে এবং সামাজিক উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে বিবেচিত হতে থাকে। যার ফলে এ সময়ের মধ্যে জাতিসংঘ, বিশ্বব্যাংক ও বিভিন্ন দাতা সংস্থায় উন্নয়নে নারী বিভাগ (WID unit) প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯৭৫ সালে মেক্সিকোতে অনুষ্ঠিত হয় জাতিসংঘ কর্তৃক আয়োজিত প্রথম বিশ্ব নারী সম্মেলন। 'সমতা উন্নয়ন ও শান্তি' ছিল এই সম্মেলনের স্লোগান। ১৩৩ টি দেশের ১২০০ প্রতিনিধি এতে যোগ দেয়, যার ৭৩ শতাংশই ছিল নারী। ১ম বিশ্ব নারী সম্মেলনটি বিশ্ব জুড়ে ব্যাপক আলোড়নের সৃষ্টি করে। এই সম্মেলনে গৃহিত হয় নারী উন্নয়নের একটি 'বিশ্ব কর্ম পরিকল্পনা' (WPA)।

এই পরিকল্পনার আওতায় নির্ধারিত উদ্দেশ্য সমূহ হ'ল-

- নারীর শিক্ষার জন্য বিদ্যমান পরিস্থিতির উন্নয়ন করা;
- উপযুক্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা;
- রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের মধ্যে সমতা আনয়ন;
- নারী জন্য কল্যানমূলক পরিসেবা বৃদ্ধি করা;
- প্রতিটি দেশের নারী স্বার্থ সংরক্ষনে জাতীয় মেশিনারী (National Mechinery) প্রতিষ্ঠা করা;
- সরকারী নীতিমালায় নারীদের আরো জায়গা করে দেয়ার জন্য বিভিন্ন সংস্থায় নারী ইউনিট (Women's Unit) গড়ে তোলা।

এই সম্মেলনেই নারীর মজুরী বিহীন শ্রমের স্বীকৃতি প্রদান, তাদের ভূমিকার পুনর্মূল্যায়নের দাবি উত্থাপিত হয়। এর ফলে দেখা যায় যে, প্রথম নারী দশকের (১৯৭৬-৮৫) শেষে ক্রমবর্ধমান হারে বিভিন্ন দেশের সরকার, নারী ব্যুরো বা নারী মন্ত্রনালয় প্রতিষ্ঠা করতে শুরু করে।

৩.২.৩ দ্বিতীয় উন্নয়ন দশক (Second Development Decade)

নারী ১৯৭০-৮০ হ'ল জাতিসংঘের দ্বিতীয় উন্নয়ন দশক। এই দশকে-

- প্রথম নারী ইস্যু এবং উন্নয়নের মধ্যে ধারণাগত সংযোগ স্থাপিত হয়;
- উন্নয়নে নারী (WID) আন্দোলনটিও দ্রুত বিকশিত হতে থাকে;
- পারিবারিক অর্থনীতি এবং কল্যানের ক্ষেত্রে নারীর অবদান প্রশংসিত হয়;
- নারীরা উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ চালিকা শক্তি সত্বেও অবহেলিত উপকারভোগী সত্যটি সামনে উঠে আসে;

- নারীর অর্থনৈতিক চালিকাশক্তি হওয়ার প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি গুরুত্ব পায় ;
- কেবল মাত্র মা ও গৃহবধূ হয়ে থাকার অবস্থা থেকে নারীরা উন্নীত হয় উৎপাদক এবং পরিসেবা প্রদান কারীর অবস্থানে;
- নারী ইস্যু উন্নয়নের নীতিমালায় ঠাঁই পায়।

নারী ও পুরুষের মধ্যে বিদ্যমান সকল প্রকার বৈষম্য দূর করে তাদের মধ্যে সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৭৯ সালের ১৮ই ডিসেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে সর্বসম্মতি ক্রমে নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদটি গৃহীত হয়। যা ইংরেজীতে Convention on the elemination of all forms of discrimination againest Women,(CEDAW) নামে পরিচিত। (বর্তমান অধ্যায়ের অনুচ্ছেদ ৩.৪(১) এ, CEDAW সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে)।

আবার ১৯৮০ সালে নারী প্রগতির জন্য আন্তর্জাতিক গবেষণা ও প্রশিক্ষন প্রতিষ্ঠান (INSTRAW) জাতিসংঘ কাঠামোর মধ্যে স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা রূপে চালু হয়।

৩.২.৪ তৃতীয় উন্নয়ন দশক (১৯৮০-৮৯) এবং দ্বিতীয় বিশ্ব নারী সম্মেলন (Third Development Decade(1980 -89) and Second women Association)

জাতি সংঘের তৃতীয় উন্নয়ন দশকের সাথে দ্বিতীয় বিশ্ব নারী সম্মেলন সম্পৃক্ত। জাতি সংঘের তৃতীয় উন্নয়ন দশকের শুরুতেই ১৯৮০ সালে কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিত হয় দ্বিতীয় বিশ্ব নারী সম্মেলন। ১৪৫ টি দেশের প্রায় ১৫০০ সরকারি-বেসরকারী প্রতিনিধি এতে যোগ দেয়। এই সম্মেলনে নারীর কর্মসংস্থান, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ইত্যাদি বিষয়গুলো উথাপিত হয়। ১৯৭৫ সালের প্রথম বিশ্ব নারী সম্মোলনে গৃহীত বিশ্ব কর্মপরিকল্পনার জাতীয় পর্যায়ে অগ্রগতি ও প্রতিবন্ধকতা পর্যালোচনা করা হয় এই সম্মেলনে। বিশ্বজুড়ে সাংগঠনিক কর্মকান্ডের মাধ্যমে নিজেদের সমস্যা নিজেদের হাতে সমাধানের জন্য নারীর ইচ্ছা ও সক্ষমতার সুউচ্চতা প্রকাশ পায়। এ সময়েই জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ম্যান্ডেট অনুযায়ী জাতিসংঘ উন্নয়ন তহবিল বা ইউনিফেম (UNIFEM) প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং জাতিসংঘ উন্নয়ন কার্যক্রম (UNDP) সংশ্লিষ্ট একটি স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠা পায়।

৩.২.৫ তৃতীয় বিশ্ব নারী সম্মেলন

একই দশকে ১৯৮৫ সালে নাইরোবিতে অনুষ্ঠিত হয় তৃতীয় বিশ্ব নারী সম্মোলন। এই সম্মেলনে নারী উন্নয়নের জন্য নিম্নে উল্লেখিত উন্নয়ন কৌশল সমূহ গৃহীত হয়-

- নারী- পুরুষের সমতা;
- নারীর স্বাতন্ত্রতা ও ক্ষমতা;
- নারীর মজুরী বিহীন কাজের স্বীকৃতি;
- নারীর কর্মসংস্থানের উৎকর্ষতা সাধন;
- স্বাস্থ্যসেবা ও পরিবার- পরিকল্পনা;
- অধিকতর উন্নত শিক্ষা লাভের সুযোগ ইত্যাদি।

৩.২.৬ জাতিসংঘ পরিবেশ ও উন্নয়ন সম্মেলন

পরবর্তীতে ১৯৯২ সালে জাতিসংঘ কর্তৃক পরিবেশ ও উন্নয়ন সম্মোলনে (UNICED) পরিবেশ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় নারীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার স্বীকৃতি প্রদান করা হয়।

৩.২.৭ আন্তর্জাতিক জনসংখ্যা ও উন্নয়ন সম্মেলন

কায়রোতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক জনসংখ্যা ও উন্নয়ন সম্মেলনে (১৯৯৪) প্রথম নারীর ক্ষমতায়ন এবং উন্নয়নের অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে চিহ্নিত হয় এবং সামাজিক উন্নয়ন শীর্ষ সম্মোলনে (১৯৯৫) নারীদের সমস্যার পুরো বিষয়টি উত্থাপনের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশ কর্তৃক নারী-পুরুষের সমতা নিশ্চিতকরণের প্রতিশ্রুতি ঘোষিত হয়। [১]

৩.২.৮ নারী মুক্তির লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক দিবস সমূহ-

১. আন্তর্জাতিক নারী দিবস (International Day for Women)

বিশ্বজুড়ে নারীদের অধিকার কতটুকু অর্জিত হয়েছে এবং তারা কি কি বৈষম্য ও বাধার সম্মুখীন তা মূল্যায়ন ও তুলে ধরার লক্ষ্যে ১৯১০ খ্রিষ্টাব্দের ৮মার্চে ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেনে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলনে ৮ মার্চকে **আন্তর্জাতিক নারী দিবস** হিসেবে পালনের ঘোষণা করা হয়। ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দের ৮ মার্চ আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরে একটি সূচ কারখানায় মহিলা শ্রমিকগণ কারখানার মানবেতর পরিবেশ, অসম মজুরী ও ১২ ঘন্টা কর্মদিবসের বিরুদ্ধে উত্থাপিত তীব্র প্রতিবাদ ও পুলিশি অত্যাচারের প্রেক্ষাপটে এই দিবসের সূচনা।[২]

২. আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ দিবস (International Day for the Elimination of Violence Against Women)

১৯৬০ সালের ২৫ নভেম্বর ল্যাটিন আমেরিকার ডমিনিক্যাল রিপাবলিকের স্বৈরাচারী শাসকের বিরুদ্ধে ন্যায়সংগত বিদ্রোহ করায় এটিকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করে প্যাট্রিয়া, মারিয়া তেরেসা, ও মিনার্ভামিরাবেল নামের তিন বোনকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। এ ঘটনার স্মরণেই আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ দিবসের সূচনা।

নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে ১৯৮১ সালে লাতিন আমেরিকায় নারীদের এক সম্মেলনে ২৫ নভেম্বর কে আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ দিবস হিসেবে ঘোষণা দেওয়া হয়। ১৯৯৩ সালে ভিয়েনায় বিশ্ব মানবাধিকার সম্মেলন দিবসটিকে স্বীকৃতি দেয়। ১৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দের ১৭ই নভেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৫৪ তম সভায় প্রতি বছরের ২৫ শে নভেম্বরকে আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন বিলোপ দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয়।[৩]

---

[১]. শাহীন রহমান ঃ জেন্ডার প্রসংঙ্গ (দ্বিতীয় প্রকাশ), পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৭-২১ এবং
Roushan Jahan (edited) ঃ Empowerment of Women, Nairobi to Beijing (1985- 1995), Women for women, Dhaka, Bangladesh, 1995, p ঃ.75 - 95।

[২]. ফরিদা আখতার (সম্পাদনা) ঃ আটই মার্চ - আন্তর্জাতিক নারী দিবস, নারী গ্রন্থ প্রবর্তনা, ২/৮ স্যার সৈয়দ রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭, ২০০৪, পুণ ঃ মুদ্রণ-২০০৯, পৃ ঃ ৪ ।

[৩]. প্রথম আলো, ২৫ নভেম্বর এবং ২৬ নভেম্বর ২০১৩।

জাতিসংঘে এই মর্মে সিদ্ধান্ত হয় যে, সদস্য রাষ্ট্রের সরকার সমূহ নারী নির্যাতন সংক্রান্ত সমস্যা সমূহ নির্ধারণ করে সে সবের উপর জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক সংস্থা ও এনজিওদের নিয়ে কাজ করবে।[৪]

উল্লেখ্য যে, উন্নয়ন দশক, নারী বর্ষ, নারী দশক, নারী দিবস, নারী নির্যাতন দিবস সহ বিভিন্ন সম্মেলন ইত্যাদি সর্বত্রই বাংলাদেশ অংশ গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশে সেসব যথাযথ ভাবে উদযাপিত হয়ে থাকে।

৩.৩. নারী মুক্তির লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক ঘোষণা পত্র ও সনদ ইত্যাদি

নিম্নে উল্লেখিত আন্তর্জাতিক ঘোষণা পত্র, সনদ ও সম্মেলনে জাতিসংঘ কর্তৃক নারীর অধিকার ঘোষিত হয়-

(১) জাতিসংঘ 'মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণা পত্র';
(২) আন্তর্জাতিক শিশু অধিকার সনদ;
(৩) ভিয়েনা মানবাধিকার সম্মেলন;
(৪) নারীর প্রতি সহিংসতা নির্মুল ঘোষণা বা ডিক্লারেশন অন দি এলিমিনেশন অফ ভায়োলেন্স এগেইনষ্ট ওম্যান (১৯৯৩)।

৩.৩.১. জাতিসংঘের 'মানবাধিকার সর্বজনীন ঘোষণা পত্র'

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর 'মানবাধিকার সর্বজনীন ঘোষণা পত্র' গ্রহণ করে। ৩০টি অনুচ্ছেদের এই ঘোষণায় নারী - পুরুষ নির্বিশেষে সবার অধিকার রক্ষার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। মানবাধিকার সম্পর্কে এই ঘোষণা পত্রে বলা হয়েছে –

- কারো প্রতি নিষ্ঠুর, অমানবিক বা অবমাননাকর আচরণ করা যাবেনা কিংবা কাউকে নির্যাতন বা শাস্তিভোগ করতে বাধ্য করা চলবেনা;
- কারো ব্যক্তিগত গোপনীয়তা, পরিবার, বসতবাড়ী বা চিঠিপত্রে খেয়ালখুশি মতো হস্তক্ষেপ করা চলবেনা; কারো সম্মান ও সুনামের ওপরও ইচ্ছামত আক্রমন করা চলবেনা;
- প্রত্যেকেরই একা বা অপরের সহযোগিতায় সম্পত্তির মালিক হওয়ার অধিকার আছে;
- কাউকে তার সম্পত্তি থেকে খেয়াল খুশিমত বঞ্চিত করা চলবেনা;
- প্রত্যেকেরই মতামত পোষণ করা ও প্রকাশের অধিকার রয়েছে;
- সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত করতে হবে;
- প্রত্যেকেরই বিশ্রাম, অবসর ও বিনোদনের অধিকার আছে;
- খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা ও প্রয়োজনীয় সামাজিক সেবামূলক কাজের সুবিধা লাভের অধিকার প্রত্যেকেরই আছে;
- মাতৃত্ব ও শৈশব অবস্থায় প্রত্যেকে বিশেষ যত্ন ও সহায়তা লাভের অধিকারী।[৫]

---

[৪]. মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয়ঃ জেন্ডার সাম্য ও সমতা, বাংলাদেশে নারী সম্পর্কিত আইন ও প্রাসঙ্গিক বিষয় (ম্যানুয়েল)- ২০০৮, পৃঃ ৪৯১।

জাতিসংঘের 'মানবাধিকার সর্বজনীন ঘোষণা পত্রে'র উপরে উল্লেখিত ঘোষণা সমূহের মধ্যে সর্বশেষ ঘোষণাটি ব্যতীত বাকিগুলোতে যদিও নারীর বিষয়ে আলাদা করে কিছু উল্লেখ নেই তথাপিও প্রত্যেক ঘোষণা মানুষ হিসেবে নারীদের অনুকুলে ব্যবহার সম্ভব সত্বেও যে ক্রোমোজমের কারণে সমাজ নারীকে তার মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত করে আসছে এবং সৃষ্টি করছে নানা প্রতিবন্ধকতা সে কারনেই আজ দাবী উঠেছে নারীর জন্য স্বতন্ত্র মানবাধিকার সনদের।[৬]

৩.৩.২ আন্তর্জাতিক শিশু অধিকার সনদ (১৯৮৯)

আন্তর্জাতিক শিশু অধিকার সনদ(১৯৮৯) – এ লিঙ্গীয় পরিচয় ভেদাভেদ নিষিদ্ধকরণ, যৌন শোষণ, যৌন নিপীড়ন ও অশ্লীল চিত্র ব্যবহার করা থেকে শিশুদেরকে রক্ষা করার অঙ্গীকার ঘোষণা করা হয়েছে।[৭]

৩.৩.৩ ভিয়েনা মানবাধিকার সম্মেলন (১৯৯৩)

১৯৯৩ সালে ভিয়েনা বিশ্ব মানবাধিকার সম্মেলনে নারীর অধিকারকে মানবাধিকার রূপে স্বীকৃতি ও ঘোষনা করা হয়।এই সম্মেলনে নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা এবং নারীর অন্যান্য মানবাধিকার জনিত সমস্যাকে জাতিসংঘের সার্বিক মানবাধিকার কর্মসূচি ও কর্মকান্ডের সঙ্গে একীভূত করা হয়। নারী নির্যাতন সংক্রান্ত একজন বিশেষ যোগাযোগ রক্ষাকারী কর্মকর্তা নিয়োগের সুপারিশ সহ সাধারণ পরিষদ কর্তৃক নারীর প্রতি সহিংসতা দূরীকরণ সম্পর্কিত ঘোষণা অনুমোদন করা হয়।[৮]

৩.৩.৪ জাতিসংঘের নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা নির্মূল ঘোষণা পত্র (১৯৯৩)

এই ঘোষণা পত্রে নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতার সংজ্ঞা দেয় হয়েছে এভাবে -æViolance against women is a manifestation of historically unequal power relations between men and women, which have led to domination over and discrimination against women by men and to the prevention of the full advancement of women, and that violence against women is one of the crucial social mechanisms by which women are forced into a subordinate position compared with men"। অর্থাৎ " নারীর প্রতি সহিংসতা হলো নারী পুরুষের ক্ষমতা কেন্দ্রিক ঐতিহাসিক বৈষম্য, যা নারীর উপর পুরুষের আধিপত্য বিস্তার এবং বৈষম্য সৃষ্টিকে উৎসাহিত করে এবং যা নারীর পরিপূর্ণ অগ্র যাত্রাকে ব্যাহত করে এবং নারীর প্রতি সহিংসতা এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক হাতিয়ার যার দ্বারা নারীর উপর বল প্রয়োগ করে তাকে পুরুষের অধিনস্থ থাকতে বাধ্য করা হয়"।[৯]

এই ঘোষণায় সদস্য রাষ্ট্র সমূহকে নারীদের প্রতি ঝুকিপূর্ণ সহিংসতা প্রতিরোধে পদক্ষেপ নেয়ার লক্ষ্যে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা দেয়া হয়, "To adopt measures directed towards the eliminations of violence against women who are especially vulnerable to violence".[১০]

---

[৫]. খাদিজা লীনা এবং চিররঞ্জন সরকার ঃ নির্যাতিত নারী, উপেক্ষিত মানবাধিকার , পূর্বোক্ত, পৃঃ ১১৩ -১১৪।

[৬]. শাহীন রহমান ঃ জেন্ডার প্রসঙ্গ, দ্বিতীয় প্রকাশ ২০০৭, পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ১৬৩-১৭২।

[৭].পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ১১৪।

[৮].শাহীন রহমান ঃ জেন্ডার প্রসঙ্গ, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৮, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৪ -১৬।

[৯]. United Nations General Assembly resulation 48/104 on Declaration on the Elemination of Violence against women, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয়(কর্তৃক সংগ্রহ ও সম্পাদনা) ঃ বাংলাদেশে নারীনির্যাতন প্রতিরোধে প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ, ২০০৭, পূণর্মুদ্রণ ঃ ২০১০, পৃঃ ২১৫- ২১৬।

[১০].পূর্বোক্ত, ২১৫-২১৬

একই ঘোষনায় পারিবারিক নির্যাতন বা পরিবারে নারী নির্যাতন এর সংজ্ঞাও দেওয়া হয়েছে। সে সম্পর্কে বলা হয়েছে- "গৃহে স্বামী কিংবা পরিবারের অন্য কোন সদস্য দ্বারা সংঘটিত বিভিন্ন শোষণ ও বৈষম্যমূলক আচরণ, শারীরিক নির্যাতন, মেয়েশিশুর উপর যৌন নিপীড়ন, যৌতুকের জন্য নির্যাতন, স্বামী কর্তৃক ধর্ষণ, স্ত্রীর অঙ্গচ্ছেদ সহ নারীর জন্য ক্ষতিকর অন্যান্য প্রচলিত কর্মকান্ড সমূহ, যা শারীরিক, যৌন ও মানষিক নিপীড়নের পর্যায়ে পড়ে সেগুলোকে পারিবারিক নির্যাতন বা নারী নির্যাতন বলা হয়। এই ঘোষণার ২(এ) ধারায় বলা হয়েছে পরিবারে নারীর শারীরিক, যৌন এবং মনস্তাত্বিক নির্যাতন মুক্ত হয়ে বসবাস করার অধিকার রয়েছে।[১১]

বাংলাদেশ জাতিসংঘের মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণা পত্র, আন্তর্জাতিক শিশু অধিকার সনদ, ভিয়েনা মানবাধিকার সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্ত এবং নারীর প্রতি সহিংসতা নির্মুল ঘোষণা বা ডিক্লারেশন অন দি এলিমিনেশন অফ ভায়োলেন্স এগেইনষ্ট ওম্যান (১৯৯৩) এর উপর শ্রদ্ধাশীল এবং তা বাস্তবায়নেও বাংলাদেশে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গৃহীত হচ্ছে।

৩.৪. নারী মুক্তির লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক কর্মপরিকল্পনা এবং সনদ সূত্র

বিশ্বজুড়ে অবহেলিত, পশ্চাদপদ নারীদের আর্থিক, সামাজিক, পারিবারিক অবস্থার উন্নয়ন সহ নারীদের নির্যাতন- নিপীড়ন থেকে মুক্তির লক্ষ্যে জাতিসংঘের এবং আন্তর্জাতিক সংস্থা সমূহ কর্তৃক যুগান্তকারী এবং অনবদ্য উদ্যোগ সমূহ হ'ল -

১. নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ (CEDAW)
২. জাতি সংঘের চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলন(১৯৯৫) - এর ঘোষণা ও কর্মপরিকল্পনা (PFA);
৩. মিলিনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল(এমডিজি/ MDG);
৪. বিশ্বব্যাংক/ আই এম এফ কর্তৃক প্রণীত দারিদ্র হ্রাসকরণ কৌশলপত্র বা পিআরএসপি (PRSP)|

এই সনদ এবং কর্মপরিকল্পনা সমুহই মূলতঃ একদিকে জেন্ডার ইস্যু বাস্তবায়নের জন্য দিক নির্দেশনা প্রদান করে অন্যদিকে বিশ্বজুড়ে নারীমুক্তির ক্ষেত্রে বিশাল আলোড়নও সৃষ্টি করে। সেগুলোর পরিচিতি, বাস্তবায়ন সংক্রান্ত দিক নির্দেশনা নিম্নরূপ -

[১১]. পূর্বোক্ত, পৃঃ ২১৫ -২১৬।

৩.৪.১ নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ (Convention on the elemination of all forms of discrimination against Women, (CEDAW)

নারী ও পুরুষের মধ্যে বিদ্যমান সকল প্রকার বৈষম্য দূর করে তাদের মধ্যে সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৭৯ সালের ১৮ ই ডিসেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে সর্বসম্মতি ক্রমে নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ Convention on the elemination of all forms of discrimination against Women, (CEDAW) গৃহীত হয়। ১৯৮০ সালের ১লা মার্চ থেকে এই সনদে স্বাক্ষর শুরু হয় এবং ১৯৮১ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর থেকে সনদটি কার্যকর হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে ৭০ টি দেশ এতে অনুমোদন দেয় ও স্বাক্ষর করে ফলে সিডও সনদ এর ৩০টি ধারা সহ কার্যকারিতা লাভ করে।

১৯৯৯ সালের ৩১ শে ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট ১৬৫টি রাষ্ট্র এই সনদ অনুমোদন ও স্বাক্ষর করেছে। এই সনদে স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্র সমূহ সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও নাগরিক নির্বিশেষে সকল ক্ষেত্রে নারী - পুরুষের মধ্যে সমতা প্রতিষ্ঠার জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ - যা জেন্ডার ইস্যুর মূল লক্ষ্য।

এতে রয়েছে মোট ৩০টি ধারা। তন্মধ্যে ১ -১৬ ধারা নারীর মানবাধিকার, ১৭ থেকে ২২ ধারা সিডওর কর্মপন্থা ও দায়িত্ব এবং ২৩ থেকে ৩০ ধারা সিডওর প্রশাসন সংক্রান্ত। নারী মুক্তির লক্ষ্যে সিডও সনদের মূল রূপ রেখা হলো - এর ১ থেকে ১৬ পর্যন্ত নারীর মানবাধিকার সংক্রান্ত ১৬টি ধারা। সেগুলো নিম্নরূপ –

অনুচ্ছেদ- ১. নারীর প্রতি বৈষম্য বলতে কি বোঝায়

এই সনদে ‘নারীর প্রতি বৈষম্য’ বলতে বোঝায় নারী পুরুষ ভেদে কোন প্রকারের বিভেদ সৃষ্টি করা। এর ফলশ্রুতিতে নারীকে পুরুষের তুলনায় অধঃস্তন বা ছোট করে দেখা হয় এবং সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তার মানবাধিকার লংঘন করা হয়।

অনুচ্ছেদ- ২. বৈষম্য বিলোপ নীতি

- রাষ্ট্র সমূহ সংবিধান ও সংশ্লিষ্ট আইন সমূহে নারী - পুরুষের সমতার নীতি অন্তর্ভুক্তি ও তার বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবে;
- নারীর প্রতি বৈষম্য দূর করার লক্ষ্যে আইনগত ও অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;
- জাতীয় আদালত এবং অন্যান্য আইন, বিচার বিভাগীয় ও সরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের মাধ্যমে নারীর সম অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং তা সুরক্ষার ব্যবস্থা করবে;
- সরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহ যেন নারীর প্রতি সমতার নীতি অনুযায়ী কাজ করে তা নিশ্চিত করবে:
- ব্যক্তি এবং বেসরকারী সংগঠন বা প্রতিষ্ঠান সমূহ নারীর প্রতি সমতার নীতি অনুযায়ী কাজ করে তা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনে উপযুক্ত ব্যবস্থা করবে;
- যে সকল আইন, বিধি, প্রথা ও অভ্যাস নারীর প্রতি বৈষম্য সৃষ্টি করে রাষ্ট্র সমূহ সেগুলো সংশোধন বা বাতিল করবে এবং প্রয়োজনে নতুন আইন প্রণয়ন সহ সকল উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

(এই ধারাগুলো অদ্যাবধি বাংলাদেশ কর্তৃক গ্রহণ করা হয়নি। বর্তমান গবেষণার ৪র্থ এবং ৭ম অধ্যায়ে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে)

অনুচ্ছেদ- ৩. নারীর মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতা নিশ্চিত করণ এবং তা সংরক্ষণ

- নারী - পুরুষের সমতার ভিত্তিতে মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে;
- সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সহ সকল ক্ষেত্রে নারীর সার্বিক উন্নয়ন ও অগ্রগতি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সনদে স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রসমূহ আইন প্রণয়ন সহ সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

অনুচ্ছেদ- ৪. নারী - পুরুষের সমতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সাময়িক বিশেষ ব্যবস্থা / আইনের বিধান করা

- পুরুষ ও নারীর মধ্যে প্রকৃত প্রস্তাবে সমতা ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে শরীক রাষ্ট্র সমূহ কিছু বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে;
- রাষ্ট্র এ ধরনের কোন ব্যবস্থা নিলে তা বৈষম্য বলে বিবেচিত হবেনা।

অনুচ্ছেদ- ৫. নারী পুরুষের লিঙ্গভিত্তিক ভূমিকা ও গতানুগতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রথার তথা সামাজিক কুসংস্কার সমূহের ইতিবাচক পরিবর্তন

- পুরুষ ও নারীর মধ্যে কেউ উৎকৃষ্ট অথবা কেউ নিকৃষ্ট, এই ধারণার ভিত্তিতে কিংবা পুরুষ ও নারীর চিরাচরিত ভূমিকার ভিত্তিতে যে সব কুসংস্কার প্রথা ও অভ্যাস গড়ে উঠেছে, যে সব প্রথা নারী - পুরুষের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি করে, সেগুলো দূর করার লক্ষ্যে পুরুষ ও নারীর ভূমিকা ও আচরণের ধরনে পরিবর্তন আনতে হবে;
- মাতৃত্বকে একটি সামাজিক কাজ হিসেবে যথাযথভাবে বিবেচনা এবং সকল ক্ষেত্রে শিশুদের স্বার্থই মূল বিবেচ্য বিষয় - এ কথা স্মরণ রেখে সন্তান - সন্ততির লালন-পালন ও উন্নয়নে পুরুষ ও নারীর অভিন্ন দায়িত্বের স্বীকৃতির বিষয় যাতে পারিবারিক শিক্ষায় অন্তর্ভুক্ত করা , তা নিশ্চিত করা।

(মাতৃত্বকে একটি সামাজিক কাজ মাত্র গণ্য করা এবং সন্তান লালন-পালনে পুরুষ ও নারীর অভিন্ন দায়িত্বের বিষয়ে গবেষণার ৪র্থ, ৭ম এবং ৮ম অধ্যায়ে বাংলাদেশ প্রেক্ষিতে বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়েছে)।

অনুচ্ছেদ-৬. পতিতা ও দেহ ব্যবসা রোধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ

- নারীদের নিয়ে পতিতাবৃত্তি, পাচার, ক্রয় - বিক্রয় বা অন্য কোন অবৈধ ব্যবসা বন্ধ করার জন্য রাষ্ট্র সমূহ আইন প্রণয়ন সহ সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

অনুচ্ছেদ- ৭. নারীর রাজনৈতিক জীবনধারা ও অধিকার

- সকল নির্বাচন ও গণভোটে ভোটাধিকার এবং জনগণের দ্বারা নির্বাচিত সংস্থা সমূহের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নারীর অংশ গ্রহণের অধিকার;
- সরকারের বিভিন্ন নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে নারীর অংশগ্রহণ এবং সকল পর্যায়ে সরকারী চাকুরী পাওয়ার অধিকার;
- সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত বেসরকারী সংস্থা ও সমিতিতে নারীর অংশ গ্রহণের অধিকার নিশ্চিত করা।

অনুচ্ছেদ- ৮.আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নারীর সমান অংশ গ্রহণের ব্যবস্থা

- রাষ্ট্রসমূহ পুরুষের সঙ্গে সমান শর্তে এবং কোন রকম বৈষম্য ছাড়াই নারীর জন্য আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিজ নিজ সরকারের প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ এবং আন্তর্জাতিক সংস্থা সমূহের কাজ-কর্মে অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করতে সকল উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

অনুচ্ছেদ- ৯. নারীর জাতীয়তা ও নাগরিকত্ব

- রাষ্ট্রসমূহ জাতীয়তা অর্জন, পরিবর্তন অথবা তা বজায় রাখতে নারীকে পুরুষের মতই সমান অধিকার প্রদান করবে;
- রাষ্ট্রসমূহ বিশেষ করে নিশ্চিত করবে যে একজন বিদেশীর সঙ্গে বিবাহ অথবা বিবাহ চলাকালে স্বামীর জাতীয়তা পরিবর্তনের ফলে স্বাভাবিক পরিণতি হিসাবেস্ত্রীর জাতীয়তা পরিবর্তিত হবেনা, তাকে জাতীয়তাহীন করবেনা অথবা স্বামীর জাতীয়তা গ্রহণে তাঁকে বাধ্য করা হবেনা;
- রাষ্ট্রসমূহ নারীকে তাঁর সন্তান-সন্ততির জাতীয়তার ক্ষেত্রে পুরুষের মতই সমান অধিকার প্রদান করবে।

অনুচ্ছেদ- ১০. শিক্ষা ক্ষেত্রে সমান অধিকার

শিক্ষা ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের সমান অধিকার নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে, বিশেষ করে পুরুষ ও নারীর প্রতি বৈষম্য দূরীকরণের জন্য সকল উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে –

- কর্মজীবন ও বৃত্তিমুলক নির্দেশনা, পল্লী ও শহরাঞ্চলে সকল ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা গ্রহণ ও ডিপ্লোমা লাভের সুযোগের জন্য একই শর্তাবলী; স্কুল - পূর্ব, সাধারণ, কারিগরী, পেশাগত ও উচ্চতর কারিগরী শিক্ষা, সেই সাথে সকল ধরনের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষনে একই সমতা নিশ্চিত করা;
- একই পাঠ্যক্রম, একই পরীক্ষা, একই মানের যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক এবং একই মানের বিদ্যালয় চত্বর ও সরঞ্জামাদি লাভের সুযোগ প্রদান;
- সহশিক্ষা লাভে পুরুষ এবং নারীর ভূমিকা সম্পর্কিত চিরাচরিত ধারণা দূরীকরনের লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক অন্য ধরনের শিক্ষা উৎসাহিত করার মাধ্যমে বিশেষ করে পাঠ্যপুস্তক ও বিদ্যালয় কর্মসূচি সংশোধন এবং উপযুক্ত শিক্ষা পদ্ধতি গ্রহনের মাধ্যমে সকল পর্যায়ে সকল ধরনের শিক্ষায় পুরুষ ও নারীর ভূমিকা সম্পর্কিত চিরাচরিত যে কোন ধারণা দূরীকরণ;
- বৃত্তি ও অন্যান্য শিক্ষা মঞ্জুরী থেকে লাভবান হওয়ার সুযোগ প্রদান;
- বয়স্ক ও কর্মমূলক শিক্ষা কর্মসূচি সহ শিক্ষা অব্যাহত রাখার কর্মসূচি গ্রহণ। বিশেষ করে পুরুষ ও নারীদের মধ্যে শিক্ষা ক্ষেত্রে বিরাজমান যে কোন দূরত্ব যথাসম্ভব স্বল্পতম সময়ের মধ্যে কমিয়ে আনার লক্ষ্যে প্রণীত কর্মসূচি সমূহে সুযোগ লাভের একই সুবিধা প্রদান;
- ছাত্রীদের বিদ্যালয় ত্যাগের হার কমানো এবং যে সব নারী ও বালিকা নির্দিষ্ট সময়ের আগেই বিদ্যালয় ত্যাগ করেছেন, তাদের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন;
- খেলাধূলা ও শারীরিক শিক্ষায় সক্রিয় ভাবে অংশগ্রহনের জন্য একই সুযোগ প্রদান;
- পরিবারের স্বাস্থ্য ও কল্যান নিশ্চিত করতে সহায়তা করার উদ্দেশ্যে পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কিত তথ্য ও পরামর্শ সহ নির্দিষ্ট শিক্ষামূলক তথ্য পাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি।

অনুচ্ছেদ- ১১. কর্মক্ষেত্রে সমান অধিকার

নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদে কর্মক্ষেত্রে সমান অধিকারের ক্ষেত্রে তিনটি বিষয়ের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে । সেগুলো হ'ল-

১. পুরুষ ও নারীর সমতার ভিত্তিতে তাদের একই অধিকার, বিশেষ করে নিচে বর্ণিত অধিকার সমূহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সর্বপ্রকার নিয়োগ দানের ক্ষেত্রে শরীক রাষ্ট্র সমূহ নারীর প্রতি বৈষম্য দূরীকরনের জন্য উপযুক্ত সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করবে -

- সকল মানুষের কর্মসংস্থানের সমান অধিকার;
- কর্মে নিয়োগের ক্ষেত্রে একই বাছাই মান ও একই নিয়োগ সুবিধা পাওয়ার অধিকার;
- পেশা ও চাকুরী স্বাধীনভাবে বেছে নেয়ার অধিকার;
- পদোন্নতি, চাকরির নিরাপত্তা এবং চাকুরির সকল সুবিধা ও শর্ত ভোগ করার অধিকার;
- শিক্ষানবীশ হিসাবে প্রশিক্ষন, উচ্চতর বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষন এবং পুনঃ প্রশিক্ষন গ্রহনের অধিকার; বিভিন্ন সুযোগ সুবিধার সমান পারিশ্রমিক, একই মানের কাজের ক্ষেত্রে একই আচরণ এবং কাজের মান মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সমান আচরণ পাওয়ার অধিকার; বিশেষ করে অবসর গ্রহণ, বেকারত্ব, অসুস্থতা, অক্ষমতা, বার্ধক্য এবং কাজ করার অন্যান্য ক্ষমতার ক্ষেত্রে সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার এবং সেই সাথে সবেতনে ছুটি ভোগের অধিকার;
- সন্তান জন্মদান প্রক্রিয়া নিরাপদ রাখা সহ স্বাস্থ্যরক্ষা এবং কাজের পরিবেশে নিরাপত্তার অধিকার।

২. বিবাহ অথবা মাতৃত্বের কারণে নারীর প্রতি বৈষম্য রোধ এবং তাদের কাজ করার কার্যকর অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শরীক রাষ্ট্র সমূহ যে সকল বিষয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে সেগুলো নিম্নরূপ -

- গর্ভধারণ অথবা মাতৃত্ব সংক্রান্ত কারণে বরখাস্থ এবং বৈবাহিক অবস্থার ভিত্তিতে বরখাস্থ করার ক্ষেত্রে বৈষম্য নিষিদ্ধ করা;
- বেতনসহ ছুটি অথবা পূর্বের চাকুরী, জ্যেষ্ঠতা, সামাজিক ভাতাদি না হারিয়ে তুলনাযোগ্য সামাজিক সুবিধা সহ মাতৃত্ব সংক্রান্ত ছুটি প্রবর্তন করা;
- বিশেষ করে একটি শিশু পরিচর্যা সুবিধা নেট্ওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়নের মাধ্যমে পিতা-মাতাদেরকে তাদের কাজের দায়িত্বের সঙ্গে পারিবারিক দায়িত্ব সংযুক্ত করে নাগরিক জীবনে অংশগ্রহনে সক্ষম করে তোলার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সহায়ক সামাজিক সার্ভিসেস ব্যবস্থা উৎসাহিত করা;
- গর্ভাবস্থায় যে ধরনের কাজ নারীর জন্য ক্ষতিকর বলে প্রমাণিত; গর্ভকালে তাদেরকে সে ধরনের কাজ থেকে বিশেষভাবে রক্ষার ব্যবস্থা করা।

৩. এই ধারায় বর্ণিত বিষয়াদি সম্পর্কে রক্ষামূলক আইন, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত জ্ঞানের আলোকে নিয়মিত পর্যালোচনা করতে হবে এবং প্রয়োজনমত সংশোধন, বাতিল অথবা সম্প্রসারণ করা হবে।

অনুচ্ছেদ- ১২. স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও পরিবার পরিকল্পনা

- পুরুষ ও নারীর সমতার ভিত্তিতে, পরিবার পরিকল্পনা সেবা সহ স্বাস্থ্য পরিচর্যা মূলক সেবা পাওয়ার সুবিধা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শরীক রাষ্ট্র সমূহ, স্বাস্থ্য সেবার ক্ষেত্রে নারীর প্রতি বৈষম্য দূর করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;
- শরীক রাষ্ট্র সমূহ প্রয়োজনে বিনামূল্যে সার্ভিস প্রদান করে সেই সাথে গর্ভাবস্থায় এবং শিশুকে মায়ের দুগ্ধদান চলা কালে পর্যাপ্ত পুষ্টির ব্যবস্থা করবে;

- গর্ভকালে সন্তান জন্মদানের ঠিক আগে এবং সন্তান জন্মদানের পরে মহিলাদের উপযুক্ত সার্ভিস প্রদান নিশ্চিত করবে।

অনুচ্ছেদ- ১৩.অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুযোগ সুবিধা ভোগে সমান অধিকার

শরীক রাষ্ট্র সমূহ পুরুষ ও নারীর সমতার ভিত্তিতে, একই অধিকার, বিশেষ করে নিম্নের অধিকার সমূহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনের অপরাপর ক্ষেত্রে নারীর প্রতি বৈষম্য দূর করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে–

- পারিবারিক কল্যানের অধিকার;
- ব্যাংক ঋণ, বন্ধক ও অন্যান্য আর্থিক ঋণ গ্রহনের অধিকার;
- বিনোদন মূলক কর্মকান্ড, খেলাধূলা ও সাংস্কৃতিক জীবনের সকল বিষয়ে অংশ গ্রহনের অধিকার।

অনুচ্ছেদ- ১৪. গ্রামীন নারীদের বিশেষ সমস্যা

১.শরীক রাষ্ট্র সমূহ পল্লী এলাকার নারী যে সব বিশেষ সমস্যার সম্মুখীন হন, সেগুলো এবং দৈনন্দিন জীবনে তাদের যে সব কাজ উপার্জন হিসেবে গণ্য করা হয়না সেসব কাজ এবং পরিবারের অর্থনৈতিক কার্যক্রমে তারা গুরুত্বপূর্ণ যে সব ভূমিকা পালন করেন, সেগুলো বিবেচনা করবে এবং পল্লী নারীদের জন্য এই সনদের বিধান প্রয়োগ নিশ্চিত করতে সকল উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

২.শরীক রাষ্ট্র সমূহ উন্নয়ন কর্মকান্ডে নারীর অংশগ্রহণ এ অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করতে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ সমূহ গ্রহণ করবে-

- সকল পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরী ও তার বাস্তবায়নে নারীর অংশ গ্রহণ;
- নারীর জন্য পর্যাপ্ত স্বাস্থ্য সেবা সহ পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে তথ্য, পরামর্শ ও সেবা লাভের সুযোগ সৃষ্টি;
- নারীর জন্য সকল প্রকার সামাজিক নিরাপত্তা মূলক কর্মসূচি থেকে সরাসরি সুবিধা লাভের সুযোগ সৃষ্টি;
- আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক সব ধরনের শিক্ষা লাভের সুযোগ ও বিভিন্ন প্রশিক্ষনের মাধ্যমে নারীর কারিগরী দক্ষতা বৃদ্ধি;

- আত্মকর্মসংস্থান এর মাধ্যমে উপার্জন সুবিধা লাভের জন্য নারীকে সংগঠন বা সমিতি করার সুযোগ প্রদান;
- সকল প্রকার সামাজিক কাজে নারীর অংশ গ্রহনের সুযোগ প্রদান। যেমন, বিচার-সালিশ বা সভাসমিতিতে নারীর অংশ গ্রহণ;
- সকল প্রকার ঋণ, কৃষিকর্ম, উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করণ ও উপযুক্ত প্রযুক্তি সুবিধা এবং ভূমি ও কৃষি সংস্কার ও পূনর্বন্টনে নারীর সমান অধিকার লাভ;
- গৃহায়ন, পয়:নিস্কাষণ, বিদুৎ পানি সরবরাহ, পরিবহন ও যোগাযোগ ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত বসবাস সুবিধা সৃষ্টি।

অনুচ্ছেদ- ১৫. <u>নারীর আইনগত ও নাগরিক অধিকার</u>

- শরীক রাষ্ট্র সমূহ আইনের দৃষ্টিতে নারী ও পুরুষের সমান অধিকার নিশ্চিত করবে;
- শরীক রাষ্ট্র সমূহ বিভিন্ন নাগরিক বিষয়ে নারীকে পুরুষের বৈধ ক্ষমতার অনুরুপ ক্ষমতা প্রদান করবে এবং সেই ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য একই সুযোগ দেবে;
- বিশেষ করে রাষ্ট্র সমূহ নারীকে চুক্তি সম্পাদনে ও সম্পত্তি দেখাশুনার সমান অধিকার দেবে এবং আদালত ও ট্রাইবুনাল কার্যক্রমের সকল স্তরে তাদের সাথে সমান আচরণ করবে;
- শরীক রাষ্ট্র সমূহ নারীর আইনগত অধিকার সীমিত করে এমন ধরনের সকল চুক্তি বা ব্যক্তিগত দলিল বাতিল করবে;
- শরীক রাষ্ট্র সমূহ স্বাধীনভাবে চলাচল ও বসতি স্থাপনের স্থান বেছে নেয়ার ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষকে সমান অধিকার দিবে।

অনুচ্ছেদ- ১৬. <u>বিবাহ ও পারিবারিক আইনে সমতা</u>

১.এই ক্ষেত্রে রাষ্ট্র সমূহ নারী- পুরুষের সমতার ভিত্তিতে নিন্মলিখিত বিষয়সমূহ নিশ্চিত করবে-

- বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার একই অধিকার ;
- স্বাধীনভাবে স্বামী বা স্ত্রী বেছে নেওয়ার এবং উভয়ের পূর্ণ সম্মতিতে বিবাধ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার অধিকার;
- বিবাহ ও বিবাহ বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রীর সমান অধিকার ও দায়িত্ব; (এই ধারাটি অদ্যাবধি বাংলাদেশ কর্তৃক গ্রহণ করা হয়নি। এ বিষয়ে বর্তমান গবেষণার ৪র্থ এ ৭ম অধ্যায়ে বিস্তারিত বলা হয়েছে)
- সন্তানের ব্যাপারে (বিবাহিত ও বিবাহ বিচ্ছেদ অবস্থায়) পিতা-মাতার সমান অধিকারও দায়িত্ব;
- সন্তানের ব্যাপারে যে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে শিশুর মঙ্গল ও কল্যানই প্রধান বিষয় বলে বিবেচিত হবে;
- সন্তান গর্ভধারনে ও জন্মদানে নারীর সিদ্ধান্ত গ্রহনের অধিকার এবং নারীর জন্য এ সংক্রান্ত তথ্য ও শিক্ষা লাভের সুযোগ সৃষ্টি;
- অভিবাবকত্ব, দত্তক গ্রহণ, ট্রাষ্টশিপ ইত্যাদি ক্ষেত্রে নারী- পুরুষের অধিকার ও দায়িত্ব সমান, তবে এসব ব্যাপারে শিশুর স্বার্থই হবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ;

- পারিবারিক নাম ও পেশা পছন্দ করার ক্ষেত্রে উভয়ের সমান অধিকার;
- বিনামূল্যে অথবা মূল্যের বিনিময়ে সম্পত্তির মালিকানা অর্জন, ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা, ভোগ ও নিষ্পত্তির ব্যাপারে স্বামী স্ত্রী উভয়ের একই অধিকার।

২. শিশুকালে বাগদান ও বাল্যবিবাহের কোন আইনগত কার্যকারিতা থাকবে না। রাষ্ট্রসমূহ বিবাহের সর্বনিম্ন বয়স ঠিক করবে এবং সরকারী রেজিষ্টার বইতে বিবাহ রেজিষ্টেশন বাধ্যতামূলক করবে।[১২]

সিডো সনদের উল্লেখিত ধারা সমূহ পর্যালোচনায় যে বিষয়াদি স্পষ্ট হয়, তাহলো - এতে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও নাগরিক নির্বিশেষে সকল ক্ষেত্রে নারী পুরুষের মধ্যে সমতা প্রতিষ্ঠার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়েছে - যা জেন্ডার ইস্যুর মূল লক্ষ্য।(তবে এই সনদের অনুচ্ছেদ - ২ এর বৈষম্য বিলোপ নীতি সমূহ অদ্যাবধি বাংলাদেশ কর্তৃক গৃহীত না হওয়ার বিষয়ে এবং অনুচ্ছেদ- ৫ এর ২য় ধারায় মাতৃত্বকে একটি সামাজিক কাজ মাত্র গণ্য করার বিষয়ে বর্তমান গবেষণার ৪র্থ, ৭ম এবং ৮ম অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়েছে)।

৩.৪.২. চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলন এবং বেইজিং প্ল্যাটফরম ফর অ্যাকশন (BPFA)

১৯৯৫ সালে (৪-১৫ সেপ্টেম্বর) অনুষ্ঠিত হয় জাতিসংঘের চতুর্থ বিশ্ব নারী (বেইজিং) সম্মেলন। এটি বিশ্বব্যাপী নারী আন্দোলনের পক্ষে এ যাবত কালের সর্ববৃহৎ সমাবেশ। বাংলাদেশ সহ ১৮৯ টি রাষ্ট্র এই সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করে। এই সম্মেলনে বিশ্বব্যাপী নারী উন্নয়নের সামগ্রীক রূপরেখা স্বরূপ ফ্লাটফরম ফর অ্যাকশন(PFA) সর্বসম্মতি ক্রমে গৃহীত হয়। যা বেইজিং ফ্লাটফরম অ্যাকশন (BPFA) নামেই পরিচিতি লাভ করে। সমতা, উন্নয়ন এবং শান্তির লক্ষ্যে নারীর সম-অধিকার নিশ্চিত করতে একটি সম্মিলিত কর্মসূচী গ্রহনের জন্য এতে সমগ্র বিশ্বের ঐক্যমত্য প্রতিফলিত হয়।

নারীর ক্ষমতায়নের জন্য প্ল্যাটফরম ফর অ্যাকশন (PFA) এর মূল লক্ষ্য হলো, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নীতি নির্ধারণ, সিদ্ধান্ত গ্রহনে পূর্ণ ও সমান অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তিগত জীবনের সকল পরিমন্ডলে নারীর সক্রিয় অংশ গ্রহনের পথে সকল বাধা দূর করা। সেই সঙ্গে গৃহ, কর্মক্ষেত্র ও জাতীয় আন্তর্জাতিক সকল পরিসরে নারী পুরুষের মধ্যে সমতা এবং দায়- দায়িত্ব ভাগাভাগির নীতি প্রতিষ্ঠা করা। নারীর অধিকারকে মানবাধিকার হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান। শিক্ষা, স্বাস্থ্য সেবা, সম্পত্তি, উত্তরাধিকার, মেধা, প্রজনন ইত্যাদি ক্ষেত্রে নারীর অধিকার নিশ্চিত করণ। বিশ্বের ১৮৯ টি দেশ নারী উন্নয়নের বৈশ্বিক রুপরেখা হিসাবে এই প্লাটফরম ফর অ্যাকশন অনুমোদন করে এর আলোক শরীক রাষ্ট সমূহ নিজ নিজ দেশের জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা প্রণয়ন করে তা জাতীয় কর্ম পরিকল্পনায় অর্ন্তভুক্ত করার অঙ্গীকার ঘোষণা করে।

বেইজিং প্ল্যাটফরম ফর অ্যাকশন (BPFA) এ নারী সমাজের অগ্রগতির পথে প্রতিবন্ধকতা স্বরুপ গুরুত্বপূর্ণ ১২টি বিবেচ্য বিষয় (12 critical areas of concern) চিহ্নিত করা হয় এবং এ ক্ষেত্রে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সরকার, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ও বেসরকারী সংস্থা সমূহের কি করণীয় তা তুলে ধরা হয়।
এগুলো হ'ল-

[১২]. জাতিসংঘ শিশু তহবিল (ইউনিসেফ) কর্তৃক প্রকাশিত ঃ নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিরোপ সনদ(সিডো) ১৯৭৯, বাড়ি নং- ৭১, রোড নং: ৫-এ, ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা, বাংলাদেশ, পৃ ঃ ০১-২৯ এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয় কর্তৃক প্রকাশিত ঃ নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণ সনদের তৃতীয় ও চতুর্থ পর্যায়ের সম্মিলিত প্রতিবেদন, ১৯৯৭,পৃ ০১-৫৬।

১. নারী ও দারিদ্র; ২. নারী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, ৩. নারী ও স্বাস্থ্য, ৪. নারী নির্যাতন, ৫. নারী ও সশস্ত্র সংঘাত, ৬. নারী ও অর্থনীতি, ৭. ক্ষমতা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারী, ৮. নারী উন্নয়নে প্রাতিষ্ঠানিক কার্যসাধন পদ্ধতি, ৯. নারীর মানবাধিকার, ১০. নারী ও গণমাধ্যম, ১১. নারী ও পরিবেশ, ১২. কন্যা শিশু।

এ গুলো নারীর জন্য বিশেষ সুবিধা প্রদানের বিষয় নয়, বরং মানুষ হিসাবে তাদের প্রাপ্য মৌলিক অধিকার - এ ধারণাটিকেই সমগ্র বেইজিং প্ল্যাটফরম ফর অ্যাকশন (BPFA) এ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রতিটি বিষয়ে গ্রহণযোগ্যতার উপর কৌশলগত লক্ষ্যও জাতিসংঘ কর্তৃক স্থির করে দেওয়া হয়েছে। জাতিসংঘ কেবল মাত্র জেন্ডার সমতা, উন্নয়ন ও শান্তির লক্ষ্যে ইস্যু নির্ধারণ করেই ক্ষান্ত নয় বরং রীতিমত তার বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও পর্যবেক্ষণ করছে। যার জন্য শরীক রাষ্ট্রসমূহকে সেসব বাস্তবায়নের উপর গুরুত্ব দিতেই হচ্ছে।

বেইজিং প্লাটফরম ফর অ্যাকশন (BPFA) এ সদস্য রাষ্ট্রগুলোর জন্য ১২ টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বাস্তবায়নের জন্য নির্দেশিত কৌশলগত লক্ষ্য বা কর্মপরিকল্পনা ও দিয়ে দেওয়া হয়েছে ।

সেগুলো হ'ল -

১. নারী এবং দারিদ্রতা

- দরিদ্র পীড়িত নারীর চাহিদা ও উদ্যোগের সমর্থনে জাতীয় পর্যায়ে বিদ্যমান সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতিমালা এবং উন্নয়ন কৌশলগুলো পুণর্মূল্যায়ন পূর্বক সময়োপযোগী করে অনুমোদন এবং অনুসরণ করা;
- সকল ধরনের সম্পদ, চাকুরী ও ব্যবসা - বানিজ্যে মহিলাদের সম অংশ গ্রহনের সুযোগ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে আইন এবং প্রশাসনিক কার্যক্রম পুনঃ পরিক্ষা করা;
- সঞ্চয় ও ঋণ প্রক্রিয়া কর্মসূচিতে এবং এই জাতীয় সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোতে মহিলাদের প্রবেশাধিকারের সুযোগ সৃষ্টি করা;
- দারিদ্রের নারীকরণ রোধে জেন্ডার ভিত্তিক কর্মপদ্ধতির উন্নয়ন ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা।

২. নারী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ

- শিক্ষার সমান সুযোগ নিশ্চিত করা;
- নারীর নিরক্ষরতা দূর করা;
- বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং অব্যাহত শিক্ষা ক্ষেত্রে নারীর সুযোগ বৃদ্ধি করা;
- বৈষম্যহীন শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ গ্রহনের সুযোগ বৃদ্ধি করা;
- বিদ্যমান শিক্ষা কর্মসূচির সংস্কার সাধন, তা বাস্তবায়ন ও মনিটরিং এর জন্য পর্যাপ্ত সম্পদ বরাদ্দ করা;
- কন্যা সন্তান ও নারীদের জন্য আজীবন শিক্ষা ও প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা ও ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন।

৩. নারী ও স্বাস্থ্য

- নারীর জন্য যথাযথ, সহজসাধ্য ও মানসম্পন্ন স্বাস্থ্য পরিচর্যার ব্যবস্থা করা ;
- সংশ্লিষ্ট সেবা সমূহে জীবনচক্রব্যাপী প্রবেশাধিকারের সুযোগ বৃদ্ধি করা;
- নারীর স্বাস্থ্যোন্নয়নে রোগ প্রতিরোধ মূলক কর্মসূচি জোরদার করা;
- যৌন মাধ্যমে পরিবাহিত রোগ সমূহ, এইচআইভি/ এইডস রোধ এবং যৌন প্রজনন ইস্যুতে জেন্ডার সচেতন উদ্যোগ গ্রহন করা;
- নারীর স্বাস্থ্য বিষয়ক গবেষণা কার্যক্রমের উন্নয়ন সাধন এবং তথ্য প্রচার বিস্তার/ সম্প্রসারিত করা;
- নারীর স্বাস্থ্য সুরক্ষার ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত সম্পদ প্রদান এবং তার অনুকুলে গৃহীত পদক্ষেপের উপর প্রয়োজনীয় মনিটরিং এবং ফলোআপের ব্যবস্থা রাখা।

৪. নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা দূরীকরণ

যে সব আচরণ নারীর শারীরিক, যৌন ও মনস্তাত্বিক ক্ষতি বা বিপর্যয় ঘটায় বা ঘটানোর সম্ভাবনা থাকে একই সঙ্গে থাকে দমন-পীড়ন বা অবাধ স্বাধীনতা হরণের হুমকি - যা জনজীবন বা ব্যক্তিজীবন যে কোন ক্ষেত্রেই সৃষ্টি করা হয় বা সৃষ্টি করা হতে পারে তাকেই নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা বোঝানো হয়েছে। নারীর বিরুদ্ধে যাবতীয় সহিংসতা দূরীকরনার্থে -

- নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা রোধ এবং বন্ধের জন্য সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা;
- নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতার কারণ ও পরিণতির কার্যকারিতা বিশ্লেষণ পূর্বক প্রতিরোধের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ;
- নারী পাচার বন্ধ করা এবং বেশ্যাবৃত্তি ও পাচারের কারণে সৃষ্ট সহিংসতায় ক্ষতিগ্রস্থদের সাহায্য করা।

৫. নারী এবং সশস্ত্র সংঘাত

সশস্ত্র সংঘাত কালীন এবং পরে নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করনার্থে -

- সংঘাত নিরসনে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা ;
- সংঘাতময় পরিস্থিতিতে অথবা বিদেশী দখলের মধ্যে বসবাসরত নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;
- মাত্রাতিরিক্ত সামরিক ব্যায় হ্রাস এবং অস্ত্র - শস্ত্রের সহজলভ্যতা নিয়ন্ত্রণ করা;
- সংঘাত নিরসনে অহিংস পদ্ধতি চালু করা এবং সংঘাতকালীন পরিস্থিতিতে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা কমানো ;
- শান্তির সংস্কৃতি বিকাশে নারীর অবদানের উন্নয়ন;
- আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা প্রত্যাশী শরনার্থী ও অন্যান্য উদ্বাস্তু নারী এবং অভ্যন্তরীণ ভাবে বাস্তুচ্যুত নারীর জন্য নিরাপত্তা, সহায়তা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;
- উপনিবেশ এবং স্ব-শাসিত নয় এমন অঞ্চলের নারীদের জন্য সাহায্যের ব্যবস্থা করা।

৬. নারী ও অর্থনীতি

- কর্মসংস্থান, কাজের উপযুক্ত পরিবেশ এবং অর্থনৈতিক সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রনের সুযোগ লাভের ব্যবস্থা সহ নারীর অর্থনৈতিক অধিকারগুলো নিশ্চিতকরণ ও ক্ষমতায়ন;
- সম্পদ অর্জন, কর্মসংস্থান, বাজার ও ব্যবসা -বানিজ্যে নারীর সমান সুযোগ সহজতর করা;
- নারীর জন্য বিশেষ করে নিম্ন আয়ের নারীর জন্য ব্যবসা, প্রশিক্ষন, বাজার, তথ্য প্রযুক্তি সুযোগ লাভের ব্যবস্থা করা;
- নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতা ও বানিজ্যিক নেট্ওয়ার্ক শক্তিশালী করা;
- নারী -পুরুষের পৃথক পেশার ধারণা দূর করা এবং চাকুরির ক্ষেত্রে সব ধরনের বৈষম্য বিলোপ করা;
- নারী -পুরুষের কাজ ও পারিবারিক দায়িত্বেও সমন্বয় সাধন করা।

৭. ক্ষমতায় অংশ গ্রহণ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহনে নারী

- ক্ষমতা কাঠামো এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর সমান সুযোগ ও পূর্ণ অংশ গ্রহনের নিশ্চয়তা প্রদান;
- সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও নেতৃত্বে অংশ গ্রহণে নারীর যোগ্যতা বৃদ্ধি করা।

৮. নারীর জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

- জাতীয় বিধিব্যবস্থা এবং সরকারী সংস্থা প্রতিষ্ঠা বা শক্তিশালী করা:
- আইন, সরকারী নীতি, কর্মসূচি এবং প্রকল্প সমূহে জেন্ডার প্রেক্ষাপট সমন্বিত করা;
- গৃহীত ব্যবস্থা সংক্রান্ত পরিকল্পনা গ্রহণ এবং বাস্তবায়নের জন্য জেন্ডার ভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ, গ্রন্থনা ও প্রচার করা।

৯. নারীর মানবাধিকার

- সকল মানবাধিকার ব্যবস্থা উন্নয়ন, বিশেষভাবে নারীর বিরুদ্ধে সব ধরনের বৈষম্য বিলোপ সংক্রান্ত কনভেনশনের পূর্ণ বাস্তবায়নের মাধ্যমে নারীর মানবাধিকার উন্নত ও সুরক্ষা করা;
- আইনগতভাবে এবং বাস্তবে সমতা ও বৈষম্যহীনতা নিশ্চিত করা;
- আইনী শিক্ষা অর্জন।

১০. নারী এবং প্রচার মাধ্যম

- গণমাধ্যমের সকল কার্যক্রমে মেয়েদের সমান অংশগ্রহণের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা;
- মিডিয়া নেট্ওয়ার্কে মেয়েদের অন্তর্ভুক্তিকে উৎসাহিত করা এবং সেগুলোকে স্বীকৃতি দেয়া;
- প্রচার মাধ্যম ও যোগাযোগের নতুন প্রযুক্তির মাধ্যমে মত প্রকাশের এবং সিদ্ধান্ত গ্রহনের ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ ও সুযোগ বৃদ্ধি করা;

- গণমাধ্যমের সকল পর্যায়ে নিয়োগের ক্ষেত্রে জেন্ডার ব্যালান্স কার্যকর করা;
- নারীদের চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তা নিশ্চিত করে এরূপ প্রোগ্রাম পরিচালনা করা;
- গণমাধমে মেয়েদের সুষম চিত্রায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি তথ্য ভিত্তিক কর্মকৌশল স্থির ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা;
- মিডিয়ায় মেয়েদের সুষম ও বহুমুখী প্রতিফলন ঘটানো;
- তথ্য প্রযুক্তির বৃহত্তর ব্যবহারের জন্য মেয়েদের প্রশিক্ষণ দান।

১১. নারী এবং পরিবেশ

- পরিবেশ বিষয়ক প্রকল্পের পরিকল্পনা, ব্যবস্থাপনা, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন সহ পরিবেশগত সিদ্ধান্ত গ্রহণের সকল স্তরে নারীকে সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত করা;
- টেকসই উন্নয়ন নীতি ও কর্মসূচিতে জেন্ডার প্রেক্ষাপট সম্পৃক্ত করা;
- নারীর উপর উন্নয়ন ও পরিবেশগত নীতিমালার প্রতিক্রিয়া নিরুপনের জন্য জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক স্তরে ব্যবস্থাবলী শক্তিশালী বা প্রতিষ্ঠা করা।

১২. মেয়ে শিশু

- মেয়ে শিশুর বিরুদ্ধে সব ধরনের বৈষম্য বিলোপ করা;
- মেয়েদের বিরুদ্ধে নেতিবাচক সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি ও তৎপরতা বিলোপ করা;
- মেয়ে শিশুদের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও নিরাপত্তা দান এবং তাদের চাহিদা ও সম্ভাবনা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা;
- শিক্ষা, দক্ষতা বিকাশ ও উন্নয়নে এবং প্রশিক্ষনে মেয়েদের প্রতি বৈষম্য বিলোপ করা;
- স্বাস্থ্য ও পুষ্টির ক্ষেত্রে মেয়েদের প্রতি বৈষম্য বিলোপ করা;
- শিশু শ্রম ভিত্তিক অর্থনৈতিক শোষণ দূর করা এবং কর্মজীবি তরুনিদের নিরাপত্তা দেয়া;
- মেয়ে শিশুর বিরুদ্ধে সহিংসতা নির্মূল করা;
- সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কে মেয়ে শিশুদের সচেতনতা বৃদ্ধি এবং
- এসব ক্ষেত্রে তাদেরকে সক্রিয় অংশ গ্রহনে উদ্বুদ্ধ করা।[১৩]

---

[১৩].Report of the United Nations Fourth World Conference on women, Beijing, Chaina 4-15 September, United Nations, 1995, p.21-121, মালেকা বেগম (অনুদিত)ঃ জাতি সংঘ চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলন, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৭, রাজকীয় ডেনমার্ক দূতাবাস, ঢাকা, পৃ ঃ ৩৯-২৪৬, শামীম আরাঃ জেন্ডার ইস্যু এবং জেনারেশন পিপিএ, ১৮০ ফকিরাপুল ঢাকা -১০০, পৃঃ ১১৮- ১২৭। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয় এর প্রতিবেদনঃ প্লাটফরম ফর অ্যাকশন, সন এবং তারিখ নেই, পৃঃ ৩-১১।

৩.৪.৩ মিলিনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল বা এমডিজি (Millenium Development Goal or MDG)

১. মিলিনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল বা এমডিজি কী

বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও দারিদ্র নিরসন কর্মসূচিকে গতিশীল করার লক্ষ্যে ২০০০ সালের ৬ - ৮ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত সহস্রাব্দ শীর্ষ বৈঠকে কয়েকটি লক্ষ্য স্থির করা হয়- যা 'সহস্রাব্দ উন্নয়ন কৌশল (মিলিনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোলস) বা **MDG**- নামে পরিচিত। ২০১৫ সালের মধ্যে বিশ্ব থেকে ক্ষুধা - দারিদ্র দূরীকরণ সহ শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের উন্নয়ন এবং জেন্ডার সমতা অর্জন ই হ'ল মিলিনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল এর মূল লক্ষ্য।

সে সময়ে বিশ্বের ১৪৭ টি দেশের রাষ্ট্র ও সরকার প্রধান সহ মোট ১৮৯টি দেশের প্রতিনিধি জাতিসংঘের সদর দপ্তরে মিলিত হয়েছিল। সকলের সম্মতিতে ৮টি লক্ষ্য (Goal) স্থির করা হয়। বৈশ্বিক ঐক্যমত্য স্বরূপ এই গোল সমূহ নতুন শতাব্দির প্রাক্কালে ঘোষিত হয় যা 'সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্য(MDG)' নামে পরিচিত। পৃথিবীর সকল দেশ থেকে ক্ষুধা, দারিদ্র, অশিক্ষা, নারী ও শিশুর প্রতি বৈষম্য, পরিবেশ বিপর্যয়, ঝুকিপূর্ণ রোগ বিস্তার ইত্যাদি সমস্যা দূর করা এবং এসবের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিশ্ব জুড়ে পারস্পরিক সহযোগিতা নিশ্চিত করাই এর লক্ষ্য।

মিলিনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল এর মোট ৮টি গোল পরস্পর সম্পর্কযুক্ত এবং একটি অন্যটির পরিপূরক। তন্মধ্যে ৭টি গোল বা লক্ষ্য দরিদ্র এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোতে মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ সংক্রান্ত। আর ৮ নং গোলটি হলো প্রথম ৭টি গোল অর্জনের জন্য ধনী ও উন্নত দেশগুলোর দায়-দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন সংক্রান্ত। প্রতিটি গোল বা লক্ষ্যের আবার রয়েছে এক বা একাধিক টার্গেট বা লক্ষ্যমাত্রা। আর এই সব টার্গেট কতটুকু অর্জিত হলো তা পরিমাপের জন্য আছে বেশ কিছু নির্দেশক বা সূচক (Indicator) ।

এই ভাবে ১৮টি টার্গেট এবং ৪৮টি নির্দেশক বা সূচক এর সমন্বয়ে মিলিনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল এর ৮টি গোল। মিলিনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল এর এই ৮টি গোল বা টার্গেট হ'ল -

১নং গোল বা লক্ষ্যঃ চরম দারিদ্র ও ক্ষুধা দূরীকরণ

টার্গেট - ১ঃ দৈনিক ১ ডলারের কম আয় উপার্জনকারী মানুষের সংখ্যা ২০১৫ সালের মধ্যে অর্ধেকে নামিয়ে আনা;

টার্গেট - ২ঃ ২০১৫ সালের মধ্যে ক্ষুধার্থ মানুষের সংখ্যা কমিয়ে অর্ধেক করা।

২নং গোল বা লক্ষ্য: সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন

টার্গেট -৩ঃ ২০১৫ সালের মধ্যে বালক বালিকা নির্বিশেষে সকল শিশুদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পুরো কোর্স সম্পন্ন নিশ্চিত করণ।

এর ইন্ডিকেটর বা সূচক হ'ল-

- প্রাথমিক শিক্ষায় মোট ভর্তির অনুপাত বের করা;
- ১ম শ্রেণী থেকে পড়া শুরু করা ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ক'জন ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত পৌঁচাচ্ছে তার সংখ্যা নির্ধারণ;
- ১৫ থেকে ২৪ বছর বয়সীদের স্বাক্ষরতার হার নির্ধারণ।

৩নং গোল বা লক্ষ্যঃ <u>জেন্ডার সমতা ত্বরান্বিত করণ এবং নারীর ক্ষমতায়ন</u>

টার্গেট -৪ ঃ ২০০৫ সালের মধ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক এবং ২০১৫ সালের মধ্যে সকল স্তরের শিক্ষায় জেন্ডার বৈষম্য দূরীকরা। এর ইন্ডিকেটর বা সূচক হ'ল –

- প্রাথমিক ও মাধ্যমিক এবং তৎপরবর্তী শিক্ষায় ছেলে-মেয়ের অনুপাত নির্ধারণ;
- ১৫ থেকে ২৪ বছর বয়েসী নারী-পুরুষের স্বাক্ষরতার অনুপাত নির্ধারণ;
- অ - কৃষিজাত খাতে মজুরী ভিত্তিক কর্মসংস্থানে নারীর অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করা;
- জাতীয় সংসদে নারী সদস্যদের অনুপাত নির্ধারণ এবং তা বৃদ্ধি করা।

৪নং গোল বা লক্ষ্যঃ <u>শিশু মৃত্যু হার হ্রাস করণ</u>

টার্গেট -৫ঃ ১৯৯০ থেকে ২০১৫ সালের মধ্যে ৫ বছরের কম বয়সী শিশু মৃত্যু হার দুই তৃতীয়াংশ হ্রাস করা।

৫নং গোল বা লক্ষ্যঃ <u>মাতৃস্বাস্থ্য উন্নয়ন</u>

টার্গেট -৬ঃ ১৯৯০ থেকে ২০১৫ সালের মধ্যে মাতৃ মৃত্যুহার ৪ ভাগের ৩ ভাগ কমানো। এর ইন্ডিকেটর বা সূচক হ'ল-

- মাতৃমৃত্যু হারের অনুপাত তিন চতুর্থাংশ হ্রাস করা;
- প্রসবকালে দক্ষ স্বাস্থ্য কর্মীর উপস্থিতি নিশ্চিত করা।

৬নং গোল বা লক্ষ্য ঃ <u>এইচআইভি/এইডস, ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য গুরুতর রোগের সংক্রমণ বন্ধ করা এবং এর বিস্তার পুরোপুরি রোধ করা</u>

টার্গেট -৭ঃ ২০১৫ সালের মধ্যে এইচআইভি/ এইডস এর সংক্রমণ বন্ধ করা এবং এর বিস্তার পুরোপুরি নিরোধ করা ;

টার্গেট -৮ঃ ২০১৫ সাল নাগাদ ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য গুরুতর রোগের সংক্রমণ বন্ধ করা এবং এদের বিস্তার রোধ করা।

৭নং গোল বা লক্ষ্যঃ <u>পরিবেশগত স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা</u>

টার্গেট -৯ঃ প্রতিটি দেশে নীতিমালা ও কর্মসূচি সমূহে টেকসই উন্নয়নের নীতি সংযুক্ত করণ এবং পরিবেশগত সম্পদের ধ্বংস রোধ করা;

টার্গেট -১০ঃ ২০১৫ সালের মধ্যে বিশুদ্ধ পানীয় জলের সুযোগ বঞ্চিত মানুষের সংখ্যা অর্ধেকে কমিয়ে আনা;

টার্গেট -১১ঃ ২০২০ সাল নাগাদ অন্ততঃ পক্ষে ১০০ মিলিয়ন (১০ কোটি) বস্তিবাসীর জীবনমানের তাৎপর্যপূর্ণ উন্নয়ন সাধন।

৮নং গোল বা লক্ষ্যঃ <u>উন্নয়নের জন্য বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব বা গ্লোবাল পার্টনারশীপ গড়ে তোলা</u>

টার্গেট -১২ঃ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সুশাসন, উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচন অঙ্গীকার সহ একটি অবাধ, নিয়মনীতি ভিত্তিক, অনুমানযোগ্য, বৈষম্যহীন বানিজ্য ও আর্থিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা;

টার্গেট -১৩ঃ স্বল্পোন্নত দেশ সমূহের রপ্তানী পণ্যের জন্য শুল্ক ও কোটামুক্ত সুবিধা প্রদান সহ তাদের বিশেষ চাহিদার প্রতি নজর দেওয়া, অতিরিক্ত ঋণ গ্রস্থ দরিদ্র দেশগুলোর ঋণ মওকুফ, দ্বিপাক্ষিক ঋণ বাতিল এবং দারিদ্র হ্রাস করণে অঙ্গীকারাবদ্ধ দেশগুলোর জন্য পর্যাপ্ত বৈদেশিক সাহায্য প্রদান;

টার্গেট -১৪ঃ ভূবেষ্টিত তথা দূর্গম এবং ছোট দ্বীপের মতো উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলোর জন্য বিশেষ চাহিদার প্রতি মনোযোগ স্থাপন;

টার্গেট -১৫ঃ উন্নয়নশীল দেশগুলোর ঋণ সমস্যাকে সামগ্রিকভাবে মুকাবিলা করার লক্ষ্যে দীর্ঘ মেয়াদী ঋণকে অব্যাহত রাখার জন্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উদ্যোগ গ্রহণ;

টার্গেট - ১৬ঃ উন্নয়নশীল দেশগুলোর সহযোগীতায় তরুণদের জন্য সুন্দর এবং উৎপাদনশীল কাজের সুযোগ সৃষ্টি ও তা বাস্তবায়ন;

টার্গেট - ১৭ঃ ওষুধ কোম্পানীগুলোর সহযোগীতায় উন্নয়নশীল দেশগুলোকে তাদের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে প্রয়োজনীয় ওষুধ প্রাপ্তির সুযোগ প্রদান;

টার্গেট - ১৮ঃ বেসরকারী / ব্যক্তিগত খাতের সহায়তায় নতুন প্রযুক্তির - বিশেষ করে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সুফল প্রাপ্তি সহজলভ্য করা।

২. <u>মিলিনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল - এর জেন্ডার গোল, টার্গেট ও ইন্ডিকেটর</u>

মিলিনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল (২০০০) একটি বৈশ্বিক উন্নয়ন লক্ষ্য। এখানে বৈশ্বিক উন্নয়নকে জেন্ডার সংবেদনশীল করার অঙ্গীকারের প্রতিফলন ঘটেছে। এর ৩ নং গোলটি সরাসরি জেন্ডার সমতা এবং নারীর ক্ষমতায়ন সংক্রান্ত হলেও আরও দু'টি সম্পুরক গোল বা লক্ষ্য এখানে রয়েছে। এগুলো হল - বালক-বালিকাদের সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন (২নং গোল) এবং মাতৃস্বাস্থ্য উন্নয়ন (৫নং গোল)।

এছাড়া অন্যান্য লক্ষ্য বা গোলের অভ্যন্তরে সুনির্দিষ্ট টার্গেট ও ইন্ডিকেটর সমূহে কোন না কোন ভাবে নারী উন্নয়ন ও জেন্ডার সমতা অর্জনের বিষয়াদি সম্পৃক্ত রয়েছে।[১৪]

নারীর ক্ষমতায়ন এবং সরাসরি জেন্ডার সমতা সংক্রান্ত গোল সমূহ নিম্নে পুনঃ উল্লেখ করা হ'ল –

- প্রাথমিক ও মাধ্যমিক এবং তৎপরবর্তী শিক্ষায় ছেলে -মেয়ের অনুপাত নির্ধারণ;
- ১৫ থেকে ২৪ বছর বয়েসী নারী -পুরুষের স্বাক্ষরতার অনুপাত নির্ধারণ;
- অকৃষিজাত মজুরীভিত্তিক কর্মসংস্থানে নারীর অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করা;
- জাতীয় সংসদে নারী সদস্যদের অনুপাত নির্ধারণ এবং তা বৃদ্ধি করা।

আবার ২ ও ৫ নং গোল দু'টিতেও নারী উন্নয়ন ও জেন্ডার সমতার বিষয় লক্ষ্যনীয় –

- প্রাথমিক শিক্ষায় মোট ভর্তির অনুপাত বের করা;
- ১ম শ্রেণী থেকে পড়া শুরু করা ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ক'জন ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত পৌঁচাচ্ছে তার সংখ্যা নির্ধারণ;
- ১৫ থেকে ২৪ বছর বয়সীদের স্বাক্ষরতার হার নির্ধারণ।

৫নং গোল বা লক্ষ্য ঃ মাতৃস্বাস্থ্য উন্নয়ন

টার্গেট -৬ঃ ১৯৯০ থেকে ২০১৫ সালের মধ্যে মাতৃমৃত্যু ৪ভাগের ৩ ভাগ কমানো।

- মাতৃমৃত্যু হারের অনুপাত তিন চতুর্থাংশ হ্রাস করা;
- প্রসবকালে দক্ষ স্বাস্থ্য কর্মীর উপস্থিতি নিশ্চিত করা।

মিলিনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল (২০০০) এর অন্যান্য লক্ষ্য বা গোলের অভ্যন্তরে সুনির্দিষ্ট টার্গেট ও ইন্ডিকেটর সমূহে কোন না কোন ভাবে জেন্ডার এর সম্পৃক্ততা রয়েছে। শুধু হেডলাইন থেকেই তা স্পষ্ট হবে-

১নং গোল বা লক্ষ্যঃ চরম দারিদ্র ও ক্ষুধা দূরীকরণ;
৪নং গোল বা লক্ষ্যঃ শিশু মৃত্যু হার হ্রাস করণ;
৬নং গোল বা লক্ষ্যঃ এইচআইভি/লক্ষ্যঃ পরিবেশগত স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা ;
৭নং গোল বা লক্ষ্যঃ পরিবেশ গত স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা ।

এসব গোলের আলোকে বাংলাদেশে গৃহীত হচ্ছে বিস্তর কার্যক্রম।(চতুর্থ অধ্যায়ে সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়েছে)।

[১৪]. Government of the People's Republic of Bangladesh.ঃ Millennium Development Goals, Mid- term Bangladesh Progress Report 2007, General Economics Division, Planning Commission, পৃঃ ০৩-৪১। শাহীন রহমানঃ জেন্ডার প্রসঙ্গ, রচনা, গ্রন্থনা ও সম্পাদনা, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৯৫-১০২।

৩.৪.৪. দারিদ্র হ্রাসকরণ কৌশলপত্র (Poverty Reduction Strategy Paper - PRSP) এর জেন্ডার প্রেক্ষিত

অতি দরিদ্র ও ঋণগ্রস্থ দেশগুলোর জন্য বৈদেশিক ঋণ সাহায্য প্রাপ্তির পূর্ব শর্ত হিসেবে বিশ্বব্যাংক/ আই এম এফ প্রচলন করেছে দারিদ্র হ্রাসকরণ কৌশলপত্র(Poverty Reduction Strategy Paper) যা সংক্ষেপে পিআরএসপি (PRSP) নামে অধিক পরিচিত। কার্যতঃ পিআরএসপি (PRSP) এখন বিভিন্ন দেশের জাতীয় উন্নয়নের দিকনির্দেশনা প্রদানকারী দলিল বা নীতি কৌশল হিসেবেই স্বীকৃত। ইতিমধ্যে প্রায় ৫০টি দেশ অন্তর্বর্তী কালীন পি আর এস পি এবং ২৫টি দেশ পূর্ণাঙ্গ পিআরএসপি (PRSP)প্রণয়ন সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছে। বাংলাদেশ ২০০৫ এ পূর্ণাঙ্গ পিআরএসপি (PRSP) প্রণয়নের কাজ সমাপ্ত করেছে।[১৫] যদিও ভারত পৃথক ভাবে পিআরএসপি প্রণয়নে আগ্রহী হয়নি। ভারতের অভিমত হলো তাদের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাই তাদের পিআরএসপি।[১৬] দারিদ্র হ্রাসকরণ কৌশলপত্র বা পিআরএসপি (PRSP) বিশ্বব্যাংক/ আই এম এফ সহ দাতা গণের চিহ্নিত রোডম্যাপ অনুযায়ী প্রস্তুতকৃত দরিদ্র দেশগুলোর জন্য একটি দলিল বা নীতি কৌশল। এটি এখন বিভিন্ন দেশের জাতীয় উন্নয়নের দিক নির্দেশনাও বটে।

বাংলাদেশে পূর্ণাঙ্গ পিআর এসপি সম্পন্ন হবার পর এর নামকরণ করা হয় – " সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করণঃ দ্রুত দারিদ্র হ্রাস করার জাতীয় কৌশল"(Unlocking the potential National Strategy for Accelerated Poverty Reduction)। এই দ্রুত দারিদ্র হ্রাস করণ করার জাতীয় কৌশলপত্রে ১৯ টি নীতিগত রূপরেখা (Policy Matrix) নির্ধারণ করা হয়েছে। মূলতঃ এমডিজি র লক্ষ্য সমূহ পূরণই পি আর এস পি নীতিমালার অন্যতম লক্ষ্য।

এম ডি জির লক্ষ্য সমূহ পূরণের জন্য পি আর এস পি জেন্ডার সংশ্লিষ্ট কৌশলও নির্ধারণ করেছে। তন্মধ্যে নারীদের অবস্থার উন্নয়ন এবং অধিকার সংরক্ষণ সংক্রান্ত নীতিগত রূপরেখা - ১৬ যা পলিসি ম্যাট্রিক্স ১৬ (Policy Matrix 16 – women`s Advancement and Right) নামে পরিচিত। সেটি নারীদের অবস্থার উন্নয়ন সংক্রান্ত।এখানে নারীদের উন্নয়ন এবং অধিকার সংক্রান্ত ৮টি কৌশলগত লক্ষ্য(Strategic Goal) স্থির করে সেগুলোর বাস্তবয়নের জন্য ১৩টি (Key Targets) সীমারেখা ও স্থির করা হয়েছে।

৮টি কৌশলগত লক্ষ্য হ'ল -

- নারীর কর্মসংস্থানের পরিপূর্ণ ব্যবস্থা গ্রহণ;
- তথ্য প্রযুক্তিতে নারীর অংশগ্রহণ (Access) নিশ্চিত করা;

---

[১৫]. শাহীন রহমান ঃ জেন্ডার প্রসঙ্গ, ২য় প্রকাশ, পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ১০৫।

[১৬].আতিউর রহমান ঃ পিআরএসপি (প্রবন্ধ) (সেলিনা হোসেন সম্পাদিত- জেন্ডার ও উন্নয়ন কোষ, ১ম খন্ড), পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ৫৭৯।

- অর্থায়ন ও ব্যংক-ঋণ ব্যবস্থা সহজ করা ;
- অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে বাধাবিপত্তির ক্ষেত্রে সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ;
- গৃহায়ন ও আশ্রয়ন সুবিধা নিশ্চিত করা ;
- নারী নির্যাতন এবং নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধ করা ;
- নারীর রাজনীতিতে অংশগ্রহণ এবং রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা ;
- সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণ এবং ক্ষমতায়ন।

৮টি কৌশলগত লক্ষ্য (Strategic Goal) বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত ১৩টি মূলসীমারেখা (Key targets) স্থির করা হয়েছে। তা হ'ল-

- নারীদের বিরুদ্ধে বিদ্যমান সকল সামাজিক প্রতিবন্ধকতা দূর করা ;
- ২০১৫ সালের মধ্যে নারীদের দারিদ্রতা ৫০% কমানো;
- নারীদের তথ্য প্রযুক্তিতে অংশগ্রহণ (Access) ৫০% নিশ্চিত করা ;
- নারীদেরকে ৫% ব্যাঙ্ক ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা;
- নারীদের ক্ষুদ্রঋণ প্রদানের ব্যবস্থা বৃদ্ধি করা ;
- নারীদের গৃহায়ন সুবিধা প্রদানে ক্ষেত্রে ৫০% সুবিধা নিশ্চিত করা ;
- প্রত্যেকটি জেলায় কর্মজীবি মহিলাদের জন্য হোস্টেল সুবিধা নিশ্চিত করা ;
- নারী নির্যাতন বন্ধের জন্য ১০০% তথ্য সংগ্রহ নিশ্চিত করা ;
- পারিবারিক সহিংসতাসহ যাবতীয় নারী নির্যাতন অন্ততঃ ৫০% হ্রাস করা ;
- সংসদ নির্বাচন এবং স্থানীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের নির্বাচনে নারীদের সমান অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা ;
- সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণ ও নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা;
- জাতীয় সংসদের নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা ;
- স্থানীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের নির্বাচনে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা। [১৭] (পলিসি ম্যাট্রিক্স ১৬ - পরিশিষ্ট -১ এ সংযুক্ত)।[১৮]

নীতিগত রূপরেখা (Policy Matrix) - ১৬ এ শুধুমাত্র নারীদের অধিকার ও উন্নয়ন সংক্রান্ত নীতি নির্ধারিত থাকলেও অন্য ১৮ টি নীতিগত রূপরেখায় (Policy Matrix) ও জেন্ডার সংশ্লিষ্ট মিশন/ ভিশন সমূহ রয়েছে।

[১৭].Unlocking the potential, national Strategy for accelerated poverty reduction ঃ General Economic Division, Planning Commission, Government of the People's Republic Republic of Bangladesh, ২০০৫, পৃ ঃ ১৪৬- ১৪৮ ।

[১৮]. পলিসি ম্যাট্রিক্স ১৬, পরিশিষ্ট - ১ এ সংযুক্ত।

অন্য ১৮ টি রূপরেখায় নারীর উন্নয়ন সংক্রান্ত উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলো হ'ল-

- নারীর সম-অধিকার অর্জনের জন্য নীতিমালা প্রণয়ন এবং আইনী অবকাঠামো প্রতিষ্ঠা; (এ ক্ষেত্রে সংবিধানের লক্ষ্য সমূহকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে);
- তথ্য প্রযুক্তিতে নারীর অংশগ্রহণ (Access) নিশ্চিত করা;
- অসহায়ত্ব ও ঝুকি থেকে নারীকে রক্ষার জন্য সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;
- অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের মূল ধারায় পূর্ণমাত্রায় নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য অর্থায়ন ও ঋণ ব্যবস্থা সহজ করা;
- আইনগত, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সকল ক্ষেত্রে নারীর প্রতি বৈষম্য ও বঞ্চনা দূরীকরণ;
- জেন্ডার সংবেদনশীল/ জেন্ডার রেসপনসিভ পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং জেন্ডার রেসপনসিভ বাজেট (Gender Responsive Budget - GRB) প্রণয়নে সক্ষমতা বৃদ্ধি করা;
- লিঙ্গবিভাজিত উপাত্ত (Gender Disaggregated Data) তৈরী, প্রচার এবং ব্যবহার নিশ্চিতকরা;
- জেন্ডার রেসপনসিভ এবং মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামো (MTBF) এর ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন।
- গৃহস্থলী কাজে ও পুণঃ উৎপাদনমূলক ভূমিকায় নারীর দক্ষতা বৃদ্ধি;
- ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা এবং নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন;
- কৃষি খাতে নারীকে অন্তর্ভুক্তকরা;
- নারী, শিশু, বৃদ্ধ, প্রতিবন্ধি ও অন্যান্য দুর্দশা গ্রস্থদের নাজুকতা বা অসহায়ত্ব এবং ঝুকি (খাদ্য নিরাপত্তা) মুকাবিলায় সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ;
- প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চতর শিক্ষায় জেন্ডার বৈষম্য দূরকরা ;
- কিশোর- কিশোরী, তরুণ-তরুনী এবং নারী ও পুরুষের জন্য টেকনিক্যাল ও ভোকেশনাল শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ চালু ও তা সম্প্রসারণ করা ;
- শিশু, কিশোরী, গর্ভবতী ও স্তন্যদানকারী নারী সহ সকলের জন্য পুষ্টি প্রদান ;
- মাতৃদুগ্ধদানের হার অনেক বৃদ্ধি করা।[১৯]

উল্লেখিত জেন্ডার সংক্রান্ত কৌশলগত লক্ষ্য সমূহের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পদক্ষেপ, টার্গেট বা লক্ষ্যমাত্রা, ভবিষ্যৎ অগ্রাধিকার এবং এসব ক্ষেত্রে কার দায়-দায়িত্ব ইত্যাদি বিষয়ও তুলে ধরা হয়েছে পিআরএসপি পলিসি-ম্যাট্রিক্স - এ।

বর্তমান অধ্যায়ে নারী মুক্তির লক্ষ্যে নারী এবং উন্নয়ন, জেন্ডার এবং উন্নয়ন, নারীবাদ ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জাতিসংঘ এবং আন্তর্জাতিক সংস্থা সমূহ কর্তৃক গৃহীত উন্নয়ন দশক, নারীবর্ষ এবং নারী দশক, নারী দিবস, সম্মেলন, মানবাধিকার সনদ, নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ, বেইজিং প্লাট-ফরম ফর এ্যাকশন এ চিহ্নিত ১২ টি Cretical Areas এবং মিলিনিয়াম ডেভেলপমেন্ট

[১৯].Unlocking the Potential, National Strategy for Accelerated Poverty reduction ঃ General Economic Division,planning Commission, Government of the People's Republic of Bangladesh, p ঃ.34, 54, 145-148, 201-349, মহিলা বিষয়ক মন্ত্রনালয় ও মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের সহায়তায় পলিসি লিডারশীপ অ্যান্ড অ্যাডভোকেসী ফর জেন্ডার ইক্যুয়ালিটি প্রকল্পের আওতায় প্রণীত ঃ জেন্ডার সমতা ও মূলধারাকরণ সংক্রান্ত হ্যান্ডআউট, ২০১০, পৃ ঃ ৬৬-৬৮।

গোল, পিআরএসপি (PRSP) সহ আন্তর্জাতিক আরও বিভিন্ন পদক্ষেপ সমূহে শরীক রাষ্ট্র সমুহের জন্য যে দিক নির্দেশনা স্থির করা হয়েছে সেগুলোর উপর আলোকপাত করা হয়েছে।

প্রদর্শিত এ সব দিকনির্দেশনা সমূহে জেন্ডার ইস্যু সংশ্লিষ্ট নারী পুরুষের মধ্যে সমতা আনয়ন এবং নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে নারীর দারিদ্র দূরীকরণ থেকে শুরু করে নারীর শিক্ষা, স্বাস্থ্যের উন্নয়ন, কর্মসংস্থান, রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জন পর্যন্ত প্রতিটি ক্ষেত্রেই করণীয় বিষয় সমূহ স্থির করা হয়েছে। এই দিক নির্দেশনা সমূহ অনুসরণের মাধ্যমে জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্র সমূহের পক্ষে নিজস্ব সমাজ ও সংস্কৃতির পরিমন্ডলের আওতায় নারী এবং উন্নয়ন (WID), জেন্ডার এবং উন্নয়ন(GAD) ইস্যুর প্রতিফলন ঘটানো সম্ভব হয়েছে। বাংলাদেশেও এইসব দিক নির্দেশনার আলোকে গৃহীত হচ্ছে প্রচুর কার্যক্রম।

গবেষণার পরবর্তী অধ্যায়ে বাংলাদেশে নারী মুক্তির লক্ষ্যে এসব বিষয়াদির উপর গৃহীত কার্যক্রম এবং সেসবের বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার উপর বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়
বাংলাদেশে নারী মুক্তির লক্ষ্যে জেন্ডার ভিত্তিক কার্যক্রম

চিত্র -১
মানচিত্রে বাংলাদেশ

এই হলো ৫৬, ৯৭৭ স্কয়ার মাইল অর্থাৎ ১৪৭,৫৭০(এক লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার পাঁচশত সত্তর) বর্গকিলোমিটার আয়তনের বাংলাদেশ। এই বাংলাদেশে রয়েছে ৭টি বিভাগ, ৬৪টি জেলা এবং ৪৫৬ টি উপজেলা।[১] বাংলাদেশের রাজধানী - ঢাকা। যার উত্তরে ব্রক্ষ্মপুত্র নদ, দক্ষিনে বঙ্গোপসাগর, পূর্বে এবং পশ্চিমে ভারত।

১.www.bbs.gov.bd .

৪.২ বাংলাদেশে নারীদের সাংবিধানিক অধিকার, জেন্ডার ভিত্তিক অবস্থান এবং জেন্ডার ভিত্তিক আন্তর্জাতিক কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ততা

৪.২. ১ সাংবিধানিক অধিকার

১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর দীর্ঘ নয় মাস ব্যাপী মহান মুক্তি যুদ্ধের মাধ্যমে পাকিস্তানের হাত থেকে স্বাধীনতা অর্জনের পর থেকেই স্বাধীন বাংলাদেশে অন্যান্য উন্নয়ন মূলক কার্যক্রমের সাথে নারীদের অবস্থার উন্নয়ন এবং ক্ষমতায়নের উন্মেষ ঘটতে শুরু হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়ন করা হয় ১৯৭২ সালে। এই সংবিধানেই নারীর মৌলিক স্বাধীনতা ও মানবাধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। সংবিধানের প্রস্তাবনার অঙ্গীকার হলো, "এই সংবিধান এমন একটা দেশ ও সমাজ প্রতিষ্ঠা করবে যেখানে প্রত্যেক নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত হবে"।[২] সংবিধানে নাগরিক বলতে ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে বাংলাদেশে জন্ম গ্রহণকারী এবং আইনানুগ নাগরিকত্ব প্রাপ্ত সকল নারী এবং পুরুষকে বুঝানো হয়েছে।

বাংলাদেশের সংবিধানে নারীদের জন্য বেশ কিছু অধিকার ও সংবিধিবদ্ধ করা হয়েছে। সেগুলো হ'ল -

অনুচ্ছেদ ১৭(ক) – একই পদ্ধতির গণমুখী ও সর্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক- বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে;

অনুচ্ছেদ ১৮ (২) - গণিকাবৃত্তি ও জুয়াখেলা নিরোধের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে;

অনুচ্ছেদ ১৯ (১) - সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত করিতে রাষ্ট্র সচেষ্ট হইবে; (২) মানুষে মানুষে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসাম্য বিলোপ করিবার জন্য প্রজাতন্ত্রের সর্বত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমান স্তর অর্জনের উদ্দেশ্যে সুষম সুযোগ-সুবিধা দান নিশ্চিত করিবার জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে; (৩) জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণও সুযোগের সমতা রাষ্ট্র নিশ্চিত করিবেন।

অনুচ্ছেদ ২৭ – সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী ;

অনুচ্ছেদ ২৮ - (১) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী - পুরুষ ভেদে বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবেনা;

(২) রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী ও পুরুষ সমান অধিকার লাভ করিবে;
(৩) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী পুরুষ ভেদ বা জন্মস্থানের কারণে জনসাধারনের কোন বিনোদন বা বিশ্রামের স্থানে প্রবেশের কিংবা কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির বিষয়ে কোন নাগরিককে কোনরূপ অক্ষমতা, বাধ্যবাধকতা, বাধা বা শর্তের অধীন করা যাইবেনা;
(৪) নারী ও শিশুদের অনুকূলে কিংবা নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান প্রণয়ন হইতে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবেনা;

[২] .গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান এর প্রস্তাবনা অংশের অনুচ্ছেদ - ৩, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, আইন , বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রনালয়, অক্টোবর, ২০১১ (এ পর্যন্ত সংশোধনী সহ)।

অনুচ্ছেদ ২৯ – (১) প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদলাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা থাকিবে।

(২) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারীপুরুষ ভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিক প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদলাভের অযোগ্য হইবেননা, কিংবা সেই ক্ষেত্রে তাঁহার প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন করা যাইবেনা;

(৩) এই অনুচ্ছেদের কোনো কিছুই - (ক) নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশ যাহাতে প্রজাতন্ত্রের কর্মে উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব লাভ করিতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে তাঁহাদের অনুকুলে বিশেষ বিধান প্রণয়ন করা হইতে, (খ) কোনো ধর্মীয় বা উপসম্প্রদায়গত প্রতিষ্ঠানে উক্ত ধর্মাবলম্বী বা উপসম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিদের জন্য নিয়োগ সংরক্ষণের বিধান- সংবলিত যে কোন আইন কার্যকর করা হইতে, (গ) যে শ্রেণীর কর্মের বিশেষ প্রকৃতির জন্য তাহা নারী বা পুরুষের পক্ষে অনুপযোগী বিবেচিত হয়, সেইরূপ যে কোন শ্রেণীর নিয়োগ বা পদ যথাক্রমে পুরুষ বা নারীর জন্য সংরক্ষণ করা হইতে – রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না;

অনুচ্ছেদ ৩১ - .. .. আইন অনুযায়ী ব্যতীত এমন কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে না, যাহাতে কোন ব্যক্তির জীবন, স্বাধীনতা, দেহ, সুনাম বা সম্পত্তির হানি ঘটে;

অনুচ্ছেদ ৩২ - আইন অনুযায়ী ব্যতীত জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতা হতে কোন ব্যক্তিকে বঞ্চিত করা যাইবেনা ;

অনুচ্ছেদ ৬৫(৩) - অনুচ্ছেদে নারীর জন্য জাতীয় সংসদে প্রথমে ৩০টি আসন সংরক্ষিত রাখা হয় পরবর্তীতে সংশোধনীর মাধ্যমে এর সংখ্যা বাড়িয়ে একবার ৪৫টি করা হয় অতঃপর ৫০ জন করা হয়। আরও উল্লেখ করা হয়, "তবে শর্ত থাকে যে, এই দফার কোন কিছুই এই অনুচেছদের (২) দফার অধীন কোন আসনে কোন মহিলার নির্বাচন নিবৃত্ত করিবেনা"। [৩]

এসকল অধিকার বাংলাদেশের নারীদের সাংবিধানিক অধিকার। একই সাথে বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে, সাংবিধানিক অন্যান্য সকল অধিকার সমূহ পুরুষের সাথে নারীরাও ভোগ করার অধিকারী।

৪.২. ২ বাংলাদেশের জনগণের জেন্ডার ভিত্তিক অবস্থান

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। আদম শুমারী ও গৃহগণনা - ২০১১- এর চূড়ান্ত ফলাফল ২০১২ অনুসারে বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যা ১৫ কোটি ২৫ লক্ষ ১৮ হাজার ১৫ জন। মোট জনসংখ্যার মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ৭ কোটি ৬৩ লক্ষ ৫০ হাজার ৫শত ১৮ জন(৫০%) । আর নারীর সংখ্যা ৭ কোটি ৬১ লক্ষ ৬৭ হাজার ৪শত ৯৭ জন(৪৯.৯%)।[৪] (পরিশিষ্ট - ২)। যদিও নারীরা বাংলাদেশের অর্ধেক জনসংখ্যার প্রায় সমান কিন্তু প্রচলিত বিভিন্ন সামাজিক কুসংস্কার, ধর্মীয় অপব্যাখ্যা, অজ্ঞতা এবং অপসংস্কৃতির কারণে পুরুষের তুলনায় নারীদেরকে যথেষ্ট প্রতিকুল অবস্থার মুকাবিলা করতে হচ্ছে।

---

[৩].গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, আইন ,বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রনালয়, ধারা- ১৭(ক), ১৮(২), ১৯(১), ২৭, ২৮(১,২,৩,৪), ২৯,(১,২,৩), ৩১, ৩২, ৬৫(৩), গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, আইন , বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রনালয়, অক্টোবর, ২০১১ (এ পর্যন্ত সংশোধনী সহ)।

[৪]. www.bbs.gov.bd ।এবং পরিশিষ্ট - ২ দ্রষ্টব্য।

আদম শুমারী ও গৃহগণনা - ২০১১- এর চূড়ান্ত ফলাফল ২০১২ অনুসারে বাংলাদেশে বিদ্যমান জনগণের ৮৯% ইসলাম ধর্মাবলম্বী, অবশিষ্ট ৪% হিন্দু , ১% বৌদ্ধ এবং ০.৫% খ্রীষ্টান।[৫] মুসলমান, হিন্দু , বৌদ্ধ এবং খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বী সকল পরিবারের বেশীর ভাগেরই প্রধান পুরুষ - কারণ পুরুষই পরিবারের প্রধান - এই ধারণা বাংলাদেশে বদ্ধমূল।

জাতিসংঘের এক হিসাব মতে বাংলাদেশে "৯২% পরিবারের প্রধান হচ্ছে পুরুষ আর অবশিষ্ট ৮% পরিবারের প্রধান নারী"।[৬] এই হিসাব কিছু পুরোনো হলেও (১৯৯৫ সনের) এ পর্যন্ত এ অবস্থার খুব যে পরিবর্তন হয়েছে তা নয়। ফলে নারীদের কর্মসংস্থানের বিষয়টি গুরুত্ব পাচ্ছেনা। আবার কর্মসংস্থানের কিছু ব্যবস্থা হলেও নারীদের উপার্জনের উপর তাদের তেমন কোন নিয়ন্ত্রন থাকছেনা। বেশীর ভাগ কর্মজীবি নারীর উপার্জনের অর্থ কোন না কোন ভাবে পুরুষের হাতে চলে যায়।

উপার্জন না করলেও যে কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে নারীরা সংসার পরিচালনা করে তার কোন স্বীকৃতিও নারীদের অনুকুলে নেই। বাংলাদেশের পরিবারের প্রধান পুরুষ বিবেচনায়, উপার্জনে সক্ষম নারীর উপার্জনও পুরুষের হাতে যাওয়ার প্রবনতা থাকায়, নারীরা আর্থিক সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়। পরিবারে তাদের সিদ্ধান্ত গুরুত্ব পায়না। ফলে তারা আর্থিক ভাবে স্বচ্ছল হয়েও থাকে দরিদ্র। এরই সুযোগে আর্থিক ভাবে স্বচ্ছল - অসচ্ছল নারীদের উপর চলে বিভিন্ন শারীরিক এবং মানষিক নির্যাতন।

যে সমস্ত পরিবারের পুরুষ নিখোঁজ, মৃত বা তালাক প্রাপ্ত নারী, সেখানেই স্বাভাবিক ভাবে পরিবারের প্রধান হয়ে পড়েন নারীরা। পূর্বে উল্লেখিত জাতিসংঘের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এই ধরনের শতকরা আটভাগ পরিবারের প্রধান হচ্ছে নারীরা। নারী প্রধান এ সব পরিবারের অধিকাংশই দারিদ্র সীমার নীচে বসবাস করছে।

বাংলাদেশের অর্থনীতি প্রধানতঃ কৃষিনির্ভর। কৃষি কাজে মেয়েরা প্রচুর পরিশ্রম করেও কোন স্বীকৃতি পাচ্ছেনা। আবার নারীরাই হচ্ছে দরিদ্রদের মধ্যে দরিদ্রতম। বাংলাদেশে জেন্ডার কার্যক্রমের অবস্থান এবং নারীদের অবস্থা বর্ণিত প্রখ্যাত লেখিকা সেলিনা হোসেন সম্পাদিত 'জেন্ডার ও উন্নয়ন কোষ' নামীয় বিশাল গ্রন্থে জনাব আবুল বারকাত তাঁর 'নারী ও উন্নয়ন' প্রবন্ধে জানান, ''বাংলাদেশের ৬ কোটি ২০ লাখ দরিদ্র বিত্তহীন প্রান্তিক নারী, যারা দেশের মোট নারীর ৮৫% আর দেশের মোট জনসংখ্যার ৪১%"।[৭] জনাব আবুল বারকাত আরো বলেন, "এদেশের নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন নিয়ে কথা বললে অগ্রাধিকার দিতে হবে ৬ কোটি ২০ লাখ দরিদ্র নারীকে"।[৮]

বাংলাদেশ সরকার কর্তৃকও এটি স্বীকৃত যে, "আমাদের দেশের জনসংখ্যার অর্ধেকই নারী এবং দরিদ্রদের মধ্যে দরিদ্রতম হচ্ছে নারী। দারিদ্রসীমার নীচে যে সকল পরিবার রয়েছে সেগুলোর বেশীরভাগের প্রধান হিসেবেও রয়েছে নারী। অধিকন্তু নারীরা দারিদ্রের বহুমুখি অভিঘাত মোকাবিলার ক্ষেত্রে গভীর ও আরও জটিল প্রকৃতির

---

[৫]. www.bbs.gov.bd।

[৬].Women in Bangladesh , A country Profile, United Nations, Newyork. 1995,

[৭].আবুল বারকাত ঃ নারী ও উন্নয়ন, জেন্ডার ও উন্নয়ন কোষ, ১ম খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫৬৪।

[৮].আবুল বারকাত ঃ বঞ্চনা ও ক্ষমতায়ন, জেন্ডার ও উন্নয়ন কোষ, ১ম খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ৬৩৬।

বাধার সম্মুখীন হয়। অর্থনৈতিক সম্পদ(যেমন-ভূমি এবং ঋণ) এবং মানব সম্পদ(যেমন-স্বাস্থ্য, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং তথ্য) প্রাপ্তির ক্ষেত্রে নারীরা পিছিয়ে রয়েছে"।[৯]

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০১০ অনুসারে এখানে মাথাপিছু আয় ৬৮৪ মার্কিন ডলার। UNDP কর্তৃক প্রণীত ২০১০ এর Human Development Index (HDI) অনুযায়ী বাংলাদেশের অবস্থান ১৬৪টি দেশের মধ্যে ১২৯ তম। আর Gender Inequality Index (GII) অনুসারে বাংলাদেশের অবস্থান ১৩৮টি দেশের মধ্যে ১১৬ তম। এ সব প্রতিবেদন দৃষ্টে বাংলাদেশ সরকারেরই অভিমত হলো - " এটি পরিস্কার যে মানব সম্পদ (নারী - পুরুষ উভয়ের) উন্নয়নে বাংলাদেশকে অনেক স্বল্পোন্নত দেশের চাইতেও বেশী পথ অতিক্রম করতে হবে" এবং সে লক্ষ্য অর্জনের জন্য নারীদের অবস্থার আরও উন্নয়ন করতে হবে কারণ "নারীদের প্রতি বৈষম্য এবং দারিদ্রের মধ্যে একটা যোগসূত্র রয়েছে", এ ছাড়া," নারী - পুরুষের মধ্যে সমতা বিধানের উদ্দেশ্যের সাথে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন এবং দারিদ্র নিরসনের উদ্দেশ্য সামঞ্জস্যপূর্ণ "।[১০]

৪.২.৩ জেন্ডার ভিত্তিক আন্তর্জাতিক কার্যক্রমের সাথে বাংলাদেশের সম্পৃক্ততা

বাংলাদেশ, নারী - পুরুষের মধ্যে সমতা বিধানের উদ্দেশ্যে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন এবং দারিদ্র নিরসন পূর্বক নারী মুক্তির লক্ষ্যে পরিচালিত ২য় অধ্যায়ে বর্ণিত সকল আন্তর্জাতিক কার্যক্রমের সাথে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করে থাকে। সেসবের ভিত্তিতে বাংলাদেশে সরকারী / বেসরকারী পর্যায়ে নিজস্ব কার্যক্রমও পরিচালনা করে থাকে। জাতিসংঘের ঘোষিত উন্নয়ন দশক ঘোষণা (Development Decade) এ সক্রিয় অংশ গ্রহণ, নারী বর্ষ এবং নারী দশক উদযাপন (International Women year & UN International Women Decade), বিশ্ব নারী সম্মেলন সমূহে স্বতঃস্ফূর্ত অংশ গ্রহণ, নারীমুক্তির লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক নারী দিবস, আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ দিবস সমূহ যথাযথ ভাবে উদযাপন করে থাকে।

দরিদ্র এবং অসহায় নারীদের অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে নারী মুক্তির লক্ষ্যে উদ্ভাবিত প্রাথমিক পর্যায়ের যে সব কার্যক্রম বা এপ্রোচ সমূহ রয়েছে বাংলাদেশে এখনও পল্লী অঞ্চলে এবং অনুন্নত শহর এলাকায় সেসব কার্যক্রম মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয়, সমাজ কল্যান মন্ত্রনালয় ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে থাকে। সেগুলো হ'ল -

- কল্যাণ মূলক কার্যক্রম (Welfare approach)
- দারিদ্র বিমোচন কার্যক্রম (Anty poverty approach)
- দক্ষতা বৃদ্ধি কার্যক্রম (Efficiency approach)
- সমদর্শী কার্যক্রম (Equity approach)
- ক্ষমতায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম (Empowerment approach)

উন্নয়নে নারী (Women in development -WID) এবং নারী এবং উন্নয়ন (Women and

---

[৯].জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদন, ২০১১-১২,অর্থবিভাগ, অর্থ মন্ত্রনালয়, গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, পৃঃ ১।

[১০]. জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদন ২০১১-১২, অর্থবিভাগ, অর্থমন্ত্রনালয়, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১।

development - WAD) তত্ত্বের মাধ্যমেও মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয়, সমাজ কল্যান, মন্ত্রনালয় সহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রনালয় সমূহের মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশজুড়ে কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

আবার জেন্ডার সংশ্লিষ্ট যাবতীয় কার্যক্রম তথা বাস্তবমুখী জেন্ডার চাহিদা এবং কৌশলগত জেন্ডার চাহিদা জেন্ডার এবং উন্নয়ন কার্যক্রম (Gender And Development Approach-GAD) নামক উন্নয়ন ধারার সাথে সম্পৃক্ত হয়ে বাংলাদেশের প্রায় সকল মন্ত্রনালয়েই পরিচালিত হচ্ছে বিভিন্ন কার্যক্রম। জেন্ডার এবং উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশে নারীদের অবস্থা এবং অবস্থানের উন্নয়ন, নারীর অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন, জেন্ডার সাম্য(Gender Equity) ও জেন্ডার সমতা (Gender Equality) স্থাপন, মেইনস্ট্রিমিং উইমেন বা মূলধারায় নারীর (Mainstreaming women) মাধ্যমে রাষ্ট্রের মূল ধারার কার্যক্রমে তথা সিদ্ধান্ত গ্রহণের মূলধারায় নারীকে নিয়ে আসা হচ্ছে। যেমন রাজনীতি, নেতৃত্ব ও গভর্নেন্সে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হচ্ছে।

সামগ্রিক ভাবে আয়-উপার্জন এবং সম্পদ ও সুযোগের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের মধ্যকার বিদ্যমান বৈষম্য দূর করার ব্যবস্থাই হলো মূল ধারায় জেন্ডার (Mainstreaming Gender)। মূলধারায় নারীকে আনয়নের লক্ষ্যে নারী পুরুষের মধ্যকার বিদ্যমান বৈষম্য কমানো এবং অংশীদারিত্ব ও সকল পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর অংশ গ্রহণের সুযোগ থাকা অবশ্যম্ভাবী ।[১১] আবার নারীকে অবহেলা, তুচ্ছ ও বঞ্চিত করে এবং পুরুষের ক্ষেত্রে সুবিধা ভোগের এবং প্রাধান্য প্রদান ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার মাধ্যমে জেন্ডার পক্ষপাত দুষ্টতা, জেন্ডার অন্ধত, জেন্ডার অনুগত প্রবণতা লক্ষ্যনীয় হয়ে ওঠে। এসব থেকে উত্তরণের জন্য ও বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে যার মাধ্যমে জেন্ডার পরিকল্পনা, জেন্ডার পরিবীক্ষণ বা মনিটরিং কার্যক্রম পরিচালিত হয়। সর্বোপরি বাংলাদেশে জেন্ডার রেসপনসিভ বাজেট প্রণয়ন তথা জেন্ডার বাজেট প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে।

আবার নারীবাদের মধ্যে উদার বা ব্যক্তি স্বাতন্ত্রবাদী নারীবাদ (liberal Feminism) ই বাংলাদেশে অধিক গ্রহণ যোগ্য। মার্ক্সীয় নারীবাদ (Marxist Feminism), আমূল/ রেডিক্যাল নারীবাদ(Radical Feminism), সমাজতান্ত্রিক নারীবাদ, (Social Feminism) বাংলাদেশে খুব বেশী গ্রহণ যোগ্য হয়ে ওঠেনি। তবে সাংস্কৃতিক নারীবাদ(Cultural Feminism), ইকো ফেমিনিজম বা পরিবেশ নারীবাদ (EcoFeminism), বৈশ্বিক নারীবাদ (Global Feminism) ইত্যাদি যথাক্রমে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রনালয়, পরিবেশ বিষয়ক মন্ত্রনালয় সমূহের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে।

আবার বাংলাদেশের অবহেলিত, পশ্চাদপদ নারীদের আর্থিক, সামাজিক, পারিবারিক অবস্থার উন্নয়ন সহ নারীদের নির্যাতন- নিপীড়ন থেকে মুক্তির লক্ষ্যে জাতিসংঘের এবং আন্তর্জাতিক সংস্থা সমূহ কর্তৃক যুগান্তকারী এবং অনবদ্য উদ্যোগ সমূহ যথা নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ (CEDAW), জাতি সংঘের চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলন (১৯৯৫) - এর ঘোষণা ও কর্মপরিকল্পনা (PFA),

---

[১১].শাহীন রহমান ঃ জেন্ডার প্রসঙ্গ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫৬ - ৫৭।

মিলিনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল(এমডিজি/ MDG), বিশ্বব্যাংক/ আই এম এফ কর্তৃক প্রণীত দারিদ্র হ্রাসকরণ কৌশলপত্র বা পিআরএসপি(PRSP) অনুসারে সিডো সনদে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও নাগরিক নির্বিশেষে সকল ক্ষেত্রে নারী - পুরুষের মধ্যে সমতা প্রতিষ্ঠার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়েছে - যা জেন্ডার ইস্যুরও মূল লক্ষ্য।

বাংলাদেশ এই দলিল অনুমোদন করে স্বাক্ষর করেছে ১৯৮৪ সালের ৬ নভেম্বর। নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ অনুমোদন কালে বাংলাদেশ সরকার ২, ১৩(ক) এবং ১৬.১(গ) ও (চ) অনুচ্ছেদগুলো আপত্তি সহ স্বাক্ষর করেছিল। এ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এই ধারাগুলো পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ্‌র উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা শরিয়া আইনের পরিপন্থি। পরবর্তীতে আপত্তিগুলো প্রত্যাহার করার ব্যাপারে জাতীয় পর্যায়ে গঠিত রিভিউ কমিটির (আইন কমিশন) সুপারিশ ক্রমে ১৯৯৭ সালের ২৪ জুলাই ১৩(ক) এবং ১৬.১(চ) অনুচ্ছেদ থেকে বাংলাদেশ আপত্তি প্রত্যাহার করে নিয়েছে। রিভিউ কমিটি বা আইন কমিশনের মতামত ছিল এরূপ, "দেশের সংবিধান কিংবা বিদ্যমান কোন আইন বা বিধির সঙ্গে ধারা দু'টির কোন অসঙ্গতি নেই। বরং ধারা দু'টিতে আপত্তি বহাল রাখলে তা হবে বাংলাদেশের সংবিধানের ২৯ অনুচ্ছেদে বর্ণিত নারী-পুরুষের সমতা শীর্ষক বিধানের বিরোধী।[১২]

তবে অনুচ্ছেদ ২ এবং ১৬.১(গ) থেকে আপত্তি প্রত্যাহার করেনি বাংলাদেশ। **রিত ম অধ্যায়ে বিস্তা৫ এ বিষয়ে) ।(আলোচনা করা হয়েছে** বাকি বিষয়গুলোর উপর বাংলাদেশ গুরুত্ব প্রদান করে নারী উন্নয়ন নীতিমালার অন্তর্ভুক্ত করে নিয়ে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে।

বাংলাদেশ বেইজিং প্লাটফরম ফর অ্যাকশন (BPFA) অনুমোদনকারী দেশ। ১৯৯৫ সালে (৪-১৫ সেপ্টেম্বর) অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনে (বেইজিং এ অনুষ্ঠিত) বাংলাদেশের সক্রিয় অংশ গ্রহণ এবং কোন প্রকার শর্ত ছাড়াই PFA অনুমোদন এবং PFA - র বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার জন্য প্রতিশ্রুতি প্রদান করে। শুধু তাই নয় সংশ্লিষ্ট সকল অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে আসছে। বেইজিং প্ল্যাটফরম ফর অ্যাকশন (BPFA) এ নারী সমাজের অগ্রগতির পথে প্রতিবন্ধকতা স্বরূপ গুরুত্ব বলে চিহ্নিত ১২ টি বিবেচ্য বিষয় সম্পর্কে জাতিসংঘ কর্তৃক শরীক রাষ্ট্র সমূহের গৃহীত কার্যক্রমের উপর নিয়মিত ফলোআপ করা হচ্ছে। বাংলাদেশও তার অগ্রগতির ফলোআপ দিয়ে যাচ্ছে।

ইতিমধ্যে জাতিসংঘের PFA কর্মসূচির ৫ বছর পূর্তি উলক্ষে বেইজিং কর্মপরিকল্পনার মূল্যায়নের জন্য বিগত ২ - ৯ জুন নিউইয়র্কে 'নারী ২০০০ ঃ একবিংশ শতাব্দির জন্য জেন্ডার সমতা, উন্নয়ন ও শান্তি' (Women ২০০০ ঃ Gender Equality, Development and Peace for the Twenty first century) নামীয় মূল্যায়ন সভায় ১৭৮ টি দেশের প্রায় ২৩০০ জন প্রতিনিধির সাথে বাংলাদেশ ও অন্তর্ভূক্ত ছিল। এই সম্মেলন বেইজিং +৫ নামে পরিচিত। আবার PFA কর্মসূচির ১০ বছর পূর্তি উপলক্ষে ২০০৫ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারী থেকে ১১ মার্চ পর্যন্ত জাতিসংঘের মর্যাদা বিষয়ক কমিশন (CSW) PFA - এর কার্যক্রম মূল্যায়ন সভার আয়োজন করে। বেইজিং কর্মসূচি গ্রহণের দশ বছর অতিক্রমের পর দশ বছরের গৃহীত কার্যক্রমের মূল্যায়ন করা হয়। যার কারণে এটি বেইজিং + ১০ নামে পরিচিত। এই সভায় জাতি সংঘের ১৬৫ টি সদস্য রাষ্ট্রের পক্ষে ১,৮০০ জন সরকারী প্রতিনিধি ও ২,৬০০ জন বেসরকারী প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন

[১২].প্রথম আলো, ২০ জুলাই ১৯৯৭।

এবং বিভিন্ন দেশের ৮০ জন মন্ত্রী অংশ গ্রহণ করেন।[১৩] এখানেও বাংলাদেশের সরকারী বেসরকারী পর্যায়ে প্রতিনিধি সহ সক্রিয় অংশগ্রহণ বিদ্যমান ছিল। বাংলাদেশ রীতিমত জাতিসংঘে-র PFA -এর বাস্তবায়ন অগ্রগতি দিয়ে যাচ্ছে।

বাংলাদেশে মিলিনিয়ম ডেভেলপমেন্ট গোল এর সকল বিষযাদির উপরও বিস্তর কার্যক্রম চলছে। বাংলাদেশ ২০১৫ সালের মধ্যে এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সচেষ্ট। মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো (২০১২-১৩ হতে ২০১৬-১৭) তে এমডিজির কার্যক্রমের অগ্রগতির উপর এভাবে বলা হচ্ছে, "জাতিসংঘ ঘোষিত 'সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (২০০০)' শীর্ষক সনদে স্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ২০১৫ সালের মধ্যে অর্জনে বদ্ধপরিকর। .. .. দারিদ্রের হার ২০১৫ এবং ২০২১ সালের মধ্যে যথাক্রমে ২২ এবং ১৫ শতাংশে নামিয়ে আনা সরকারের অন্যতম লক্ষ্য। বিভিন্ন উদ্ভাবনীমূলক কর্মসূচির মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাসের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। ২০১৫ সালের মধ্যে দারিদ্র হ্রাসে এমডিজি নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ইতিমধ্যে বাংলাদেশে দারিদ্র ব্যবধান হ্রাস পেয়ে ৬.৫- এ দাঁড়িয়েছে। দারিদ্র হ্রাসের হার ১.৪৪ হয়েছে যেখানে এমডিজি অনুযায়ী ২০১৫ এর মধ্যে এ হারের লক্ষ্য মাত্রা ১.২৩ নির্ধারিত আছে। কতিপয় সামাজিক চালকের (শিশু মাতৃ, মৃত্যুহার হ্রাস, প্রত্যাশিত গড় আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি, মেয়েদের স্কুলে গমন, জেন্ডার বৈষম্য হ্রাস ইত্যাদি) ক্ষেত্রে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য সমূহ (MDGs) অর্জনের পথে বাংলাদেশের অগ্রগতি প্রশংসনীয়। তাছাড়া, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসার, ম্যলেরিয়া, যক্ষা রোগের প্রাদুর্ভাব হ্রাস, বনায়ন, নিরাপদ পানি ও স্বাস্থ্য সম্মত ল্যাট্রিন ব্যবহারে বাংলাদেশ অভূত পূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে এবং নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই এসব ক্ষেত্রে নির্ধারিত লক্ষ্য মাত্রা অর্জন করা সম্ভব হবে মর্মে প্রতীয়মান হয়"।[১৪]

বিশেষ ভাবে নারীর ক্ষমতায়ন সম্পর্কে মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোয় বলা হচ্ছে, " World Economic Forum কর্তৃক প্রকাশিত The Global Gender Gap Report, 2011 অনুযায়ী Political Empowerment of women সূচকে ১৩৫টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের স্থান ১১ তম। এই অর্জন সরকারের নারী উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি বড় সাফল্য। .. .. জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি - ২০১১ প্রণয়ন করা হয়েছে। কর্মজীবি নারী এবং তার নবজাতকের স্বাস্থ্য নিরাপত্তা বিবেচনায় মাতৃত্ব জনিত ছুটি ৪ মাস থেকে ৬ মাসে উন্নীত করা হয়েছে। জাতীয় উন্নয়নে সম্পৃক্ত করার উদ্দেশ্যে নারী শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। দেশের আর্থ -সামাজিক উন্নয়নে ও দারিদ্র বিমোচনে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা, নারীকে সচেতন ও প্রত্যয়ী করা এবং সম- অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি সহ দেশ পরিচালনায় সকল পর্যায়ে নারীকে উদ্ধুদ্ধ ও দক্ষ করে তোলা হচ্ছে"।[১৫] (পরিশিষ্ট - ৩, এক নজরে সহস্রাব্দ উন্নয়ন(এমডিজি) এর লক্ষ্যসমূহ অর্জনের অগ্রগতি)।[১৬]
আবার বাংলাদেশ দারিদ্র হ্রাসকরণ কৌশলপত্র বা পিআরএসপি(PRSP) ও বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে, যা মূলতঃ সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (এমডিজি) র সাথে সম্পৃক্ত।

---

[১৩].নারী ২০০০ ঃ বেইজিং প্লাস ফাইভ বিশেষ অধিবেশনের ফলাফল ও বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে করনীয়, বেইজিং প্লাস ফাইভ সংক্রান্ত এনজিও কমিটি,বাংলাদেশ (এনসিবিপি), শুক্রাবাদ,ঢাকা -১২০৭, পৃ ঃ ৯-১০ এবং বাংলাদেশে নারী উন্নয়ন ঃ সমস্যা ও সম্ভাবনাঃ বেইজিং +১০ সংক্রান্ত এনজিও প্রতিবেদন, সিড্ও ও বেইজিং কর্মপরিকল্পনা সংক্রান্ত এনজিও কোয়ালিশন(এনসিবিপি), উইমেন ফর উইমেন, শুক্রাবাদ, ঢাকা - ১২০৭, পৃঃ ৩-৪।

[১৪].মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো (২০১২-১৩ হতে ২০১৬-১৭) ঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রনালয়, গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, পৃঃ ৪।

[১৫].পূর্বোক্ত,পৃঃ ৪-৬।

[১৬].পরিশিষ্ট – ৩।

Dhaka University Institutional Repository

সবশেষে বাংলাদেশে এমডিজি বাস্তবায়নে কিছু দূর্বলতা স্বীকার করে বাংলাদেশ সরকার দীর্ঘ মেয়াদী ও নির্ভরযোগ্য কিছু উন্নয়ন লক্ষ্য এবং ২০১৫ এর পরবর্তী গৃহতব্য বিষয়াদি নির্ধারণ করে Sustainable Development Goals (SDG) and the post 2015 Agenda জাতিসংঘের অনুমোদনের জন্য পেশ করেছে। এখানে বাংলাদেশ স্বয়ং নিজেদের সমস্যা চিহ্নিত করে সমাধানের পথ নির্ধারণ পূর্বক প্রস্তাব সহ জাতিসংঘের অনুমোদনের জন্য পেশ করেছে।

অন্যদিকে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক 'নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ (CEDAW)', 'জাতি সংঘের চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলন (১৯৯৫) - এর ঘোষণা ও কর্মপরিকল্পনা (PFA)', 'মিলিনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল(এমডিজি/ MDG)', 'দারিদ্র হ্রাসকরণ কৌশলপত্র বা পিআরএসপি(PRSP)' সমূহের আলোকে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে প্রণীত হয়েছে 'জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা'।

তাই 'জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা' বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনার মাধ্যমেই বাংলাদেশে জেন্ডার সংশ্লিষ্ট উল্লেখিত আন্তর্জাতিক দিক নির্দেশনা সমূহের যাবতীয় কার্যক্রমের অগ্রগতির বিস্তারিত অবস্থা দেখা সম্ভব।

৪.৩ নারী মুক্তির লক্ষ্যে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতির মাধ্যমে - জেন্ডার ভিত্তিক কার্যক্রম

জেন্ডার সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক ইস্যু সমূহ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ স্থির করেছে নিজস্ব লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। সেই লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য নিয়েই প্রণীত হয়েছে বাংলাদেশের **"জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি"।** তাই বলা যায় বাংলাদেশের **"জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি"** 'র বাস্তবায়ন অগ্রগতিই মূলতঃ একদিকে সংবিধানে নারী সংশ্লিষ্ট নীতি সমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি, একই সাথে জেন্ডার ইস্যু বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জাতিসংঘ কর্তৃক নির্দেশিত সিডও সনদ, বিপিএফএ, মানবাধিকার ঘোষণা, এমডিজি, এবং পিআরএসপি-র বাস্তবায়ন তথা জেন্ডার ভিত্তিক কার্যক্রম বাস্তবায়ন অগ্রগতি।

যদিও বাংলাদেশের **"জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি"** মালা'টি বারবার পরিবর্তনের শিকার। ১৯৯৭ সালের ৮ ই মার্চ আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রথম ঘোষণা করা হয় **"জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি"**। নীতিমালাটিতে ২০০৪, ২০০৮ এবং ২০১১ এ কিছু কিছু বিষয় পরিবর্তন করা হলেও প্রতিবারই পুরো নীতিমালাটিই নতুন করে জারি করা হয়েছে। (জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালার বিভিন্ন সংশোধন সংক্রান্ত তথ্য সপ্তম অধ্যায়ে বিস্তারিত পর্যালোচনা করা হয়েছে)।

২০১১ এ সর্বশেষ সংশোধিত **"জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি"** মালায় সিডও সনদ, বিপিএফএ - র ১২ টি গোল, মানবাধিকার ঘোষণা, মিলিনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল (এমডিজি), পি.আর.এস.পি ইত্যাদির আলোকে স্থিরকৃত জেন্ডার ভিত্তিক কার্যক্রমের উল্লেখযোগ্য লক্ষ্য সমূহ হ'ল -

১. নারী উন্নয়নে সাংগঠনিক ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা দৃঢ় করণ;
২. কর্মপরিকল্পনা ও কর্মসূচি গত কৌশল প্রণয়ন;
৩. নারীর দারিদ্র দূরীকরণ;

৪. শিক্ষা- প্রশিক্ষণ ক্ষেত্রে নারীদের জন্য পুরুষের সমান অংশ গ্রহনের সুযোগ সৃষ্টি করণ;
৫. কর্ম ক্ষেত্রে নারীর সমান অধিকার নিশ্চিত করে নারীর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা দৃঢ় করণ;
৬. জাতীয় অর্থনীতির সকল কর্মকান্ডে নারীর সক্রিয় ও সমঅধিকার নিশ্চিত করণ পূর্বক নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ ;
৭. নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন;
৮. নারীর প্রশাসনিক ক্ষমতায়ন;
৯. নারীর স্বাস্থ্য ও পুষ্টি উন্নয়ন;
১০. জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট প্রণয়ন;
১১. নারী উন্নয়নে এনজিও এবং সামাজিক সংগঠনের সাথে সহযোগিতা করণ
১২. নারীর মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ
১৩. নারী ও মিডিয়া
১৪. নারীর প্রতি সকল প্রকারের নির্যাতন/সহিংসতা দূরীকরণ;
১৫. মেয়েশিশু।[১৭]

উল্লেখিত লক্ষ্য সমূহের আলোকেই বাংলাদেশে নারী উন্নয়নের জন্য গৃহীত কার্যক্রম পর্যালোচনা করা যেতে পারে।

৪.৩.১ নারী উন্নয়নে সাংগঠনিক ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা

সিডো সনদের ২(গ,ঘ,ঙ) অনুচ্ছেদ এবং বেইজিং প্লাট ফরম ফর এ্যাকশন (পিএফএ) এর ৮ নং লক্ষ্যে নারী উন্নয়নে সাংগঠনিক ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা দৃঢ় করণের কথা বলা হয়েছে। মূলতঃ নারী মুক্তির লক্ষ্যে নারী পুরুষের সমতা, নারী- উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে তথা জেন্ডার ভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বাংলাদেশে রয়েছে সুপ্রতিষ্ঠিত একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয়ই হলো সেই কাঠামোর নেতৃত্ব প্রদানকারী মন্ত্রনালয়। এর আওতায় রয়েছে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর এবং জাতীয় মহিলা সংস্থা। জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ে রয়েছে মন্ত্রনালয়, অধিদপ্তর এবং মহিলা সংস্থার কার্যক্রম। একেবারে গ্রামীন পর্যায়ে তথা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের আওতায়ও রয়েছে নারী নির্যাতন প্রতিরোধ মূলক কার্যক্রম । এভাবে সারা দেশে বিদ্যমান রয়েছে একটি সুনির্দিষ্ট জাতীয় অবকাঠামো।

আবার জাতিসংঘের দিকনির্দেশনা মাফিক জেন্ডার এর আলোকে প্ল্যাট ফরম ফর অ্যাকশন (PFA) বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশের জাতীয় পরিকল্পনা (NPFA) বাস্তবায়নের জন্য বিদ্যমান রয়েছে আরও একটি বিশেষ সাংগঠনিক ব্যবস্থা । এছাড়া স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয়, আইন ও বিচার বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান, সমাজ কল্যান মন্ত্রনালয় স্থানীয় সরকার বিভাগ এবং পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ স্ব স্ব অবকাঠামোর মাধ্যমে নারী মুক্তির লক্ষ্যে কেন্দ্র থেকে মাঠপর্যায় পর্যন্ত কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। বাংলাদেশে নারী উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো এবং সেসবের মাধ্যমে পরিচালিত কার্যক্রম সমূহ হ'ল -

---

[১৭] . জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয়, গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, মার্চ ২০১১, পৃ ঃ ১-৬১।

(১) মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের মাধ্যমে পরিচালিত জাতীয় সাংগঠনিক ব্যবস্থা

স্বাধীনতা অর্জনের পর থেকেই বাংলাদেশে নারীদের অনুকুলে কল্যানমূলক কার্যক্রম শুরু হয়। ১৯৭২ সালে গঠিত হয় নারী পুনর্বাসন কল্যান ফাউন্ডেশন, ১৯৭৬ সালে জাতীয় মহিলা সংস্থা এবং ১৯৭৮ সনে মহিলা বিষয়ক মন্ত্রনালয়। ১৯৮৪ সনে মহিলা বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের অধীনে গঠিত হয় মহিলা বিষয়ক পরিদপ্তর। ১৯৯০ সালে পরিদপ্তরকে অধিদপ্তরে উন্নীত করা হয়। ১৯৯৪ সালে শিশু বিষয়ক কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করে মহিলা বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের নামকরণ করা হয় "মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয়"। মহিলা বিষয়ক মন্ত্রনালয় গঠিত হওয়ার পর থেকে নারী পুনর্বাসন কল্যান ফাউন্ডেশন, জাতীয় মহিলা সংস্থা এবং মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর এই মন্ত্রনালয়ের আওতায় পরিচালিত হতে থাকে। অর্থাৎ বাংলাদেশে নারীদের বিষয়ে যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নেতৃত্ব প্রদানকারী মন্ত্রনালয় (Lead Ministry) হচ্ছে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয়। মহিলা বিষয়ক মন্ত্রনালয় কর্তৃক নিম্নে উল্লেখিত কার্যক্রম সমূহ কেন্দ্র থেকে মাঠ পর্যায় পর্যন্ত সরাসরি, আবার মহিলা অধিদপ্তর এবং জাতীয় মহিলা সংস্থার মাধ্যমেও পরিচালিত হয়ে থাকে।

(ক) জাতীয় মহিলা ও শিশু উন্নয়ন পরিষদ (NCWD)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর সভাপতিত্বে ১৯ টি মন্ত্রনালয়ের মন্ত্রী /প্রতিমন্ত্রী, মন্ত্রী পরিষদ সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্য সচিব, ৬ জন সংসদ সদস্য, মন্ত্রনালয়গুলোর সচিব, মহাপরিচালক মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, চেয়ারম্যান/পরিচালক বাংলাদেশ শিশু একাডেমী, ৭ জন বিশিষ্ট মহিলা সহ মোট ৫০ সদস্যের সমন্বয়ে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের দায়িত্বের আওতায় রয়েছে এতদসংশ্লিষ্ট 'জাতীয় মহিলা ও শিশু উন্নয়ন পরিষদ'।

এই পরিষদ নিম্নের কার্যক্রম সমূহ পরিচালনা করে থাকে -

- আর্থ - সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে মহিলাদের অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন মন্ত্রনালয়, বিভাগ ও সংস্থার উন্নয়নমূলক কার্যক্রম সংক্রান্ত নীতি প্রণয়ন ও কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন;
- শিশুর স্বার্থ ও অধিকার রক্ষা এবং শিশু কল্যানের নিমিত্ত সার্বিক নীতি নির্ধারণ ও অধিকার সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনবোধে নতুন আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন এবং বিদ্যমান আইন সমূহের সময়োপযোগী সংশোধন ও পরিবর্তনের জন্য সুপারিশ প্রণয়ন;
- নারী ও শিশু উন্নয়নের জন্য প্রণীত কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন।
- নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ (সিডো) ও শিশু অধিকার সনদের বাস্তবায়ন, পর্যবেক্ষন ও পরিবীক্ষণ;
- মহিলাদের আইনগত অধিকার, মহিলা উন্নয়ন এবং মহিলাদের নির্যাতন প্রতিরোধ সংক্রান্ত বিষয়াবলী সম্বন্ধে নীতি প্রণয়ন;
- সকল কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের স্বার্থ সংরক্ষণ, অংশগ্রহণ ও তাহাদের ভাগ্যোন্নয়ন সম্পর্কে গৃহীত পদক্ষেপ বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ;পরিষদ ৬ (ছয়) মাস অন্তর সভায় মিলিত হবে।[১৮] (পরিশিষ্ট -৪)

(খ) মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি

---

[১৮].বাংলা দেশ গেজেট, অতিরিক্ত সংখ্যা, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, মন্ত্রীপরিষদ বিভাগ, ফেব্রুয়ারী ৮, ২০০৯ ও জুলাই ৯, ২০০৯ (পরিশিষ্ট - ৪) এবং জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয় - ২০১১, পৃঃ ২৪।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয়, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, জাতীয় মহিলা সংস্থা সহ অন্যান্য মন্ত্রনালয়, দপ্তর, সংস্থার নারী উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম, সমস্যাবলী, নারী উন্নয়ন কর্মসূচি পর্যালোচনা করে নারী জাতির অগ্রগতির লক্ষ্যে সরকারকে সুনির্দিষ্ট উদ্যোগ গ্রহণ করার পরামর্শ প্রদান করে থাকে ১০ জন সংসদ সদস্য নিয়ে গঠিত মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি ।[১৯] (পরিশিষ্ট - ৫) ।

(গ) নারী ও শিশু উন্নয়ন বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন কমিটি

চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনে গৃহীত প্ল্যাটফরম ফর এ্যাকশন (PFA)এর আলোকে প্রণীত নারী উন্নয়নে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণে এবং জাতীয় মহিলা ও শিশু উন্নয়ন পরিষদ(NCWCD)কে কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করা সহ আরও কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর সভাপতিত্বে এবং নারী উন্নয়নে চিহ্নিত ফোকাল পয়েন্ট, মন্ত্রনালয় ও সরকারী - বেসরকারী নারী উন্নয়ন সংস্থার প্রতিনিধিদের নিয়ে মোট ৩৫ জন সদস্য নিয়ে গঠিত হয়েছে 'নারী উন্নয়ন বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন কমিটি'।[২০] (পরিশিষ্ট - ৬)

(ঘ) নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ এবং যৌতুক বিরোধী জাতীয় কার্যক্রম পরিচালনা সংক্রান্ত আন্তঃমন্ত্রনালয় সমন্বয় কমিটি

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রীর নেতৃত্বে ৩২(বত্রিশ) সদস্য বিশিষ্ট একটি নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ এবং যৌতুক বিরোধী জাতীয় কার্যক্রম পরিচালনার জন্য রয়েছে একটি আন্তঃমন্ত্রনালয় সমন্বয় কমিটি । [২১] (পরিশিষ্ট - ৭) ।

(ঙ) আন্তঃমন্ত্রনালয় সমন্বয় কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে - ষ্টিয়ারিং কমিটি

নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ এবং যৌতুক বিরোধী জাতীয় কার্যক্রম পরিচালনা সংক্রান্ত আন্তঃ মন্ত্রনালয় সমন্বয় কমিটি কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন ও কার্যক্রম মনিটরিং এর জন্য সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয় এর সভাপতিত্বে ১০ সদস্য বিশিষ্ট একটি ''ষ্টিয়ারিং কমিটি'' রয়েছে ।[২২] (পরিশিষ্ট-৮) ।

(চ) জেলা এবং উপজেলা মহিলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটি

মহিলাদের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে জেলা প্রশাসক এবং উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার সভাপতিত্বে বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, এনজিও, মহিলা সমাজকর্মী ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে সরকারের ঘোষিত জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি, ২০১১ এবং জাতীয় কর্মপরিকল্পনা ও বিষয় মূল পর্যায়ে পৌঁছিয়ে দেওয়া এবং জেলা / উপজেলা পর্যায়ে সরকারের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে গৃহীত নারী উন্নয়ন মূলক কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করার লক্ষ্যে রয়েছে জেলা মহিলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটি এবং উপজেলা মহিলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটি ।[২৩](পরিশিষ্ট - ৯) ।

---

[১৯].www. parliament.gov.bd. থেকে সংগৃহীত (পরিশিষ্ট - ৫)

[২০].মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রনালয়ের প্রজ্ঞাপন নং মশিবিম/ প্রঃ- ২/২৪/৯৭-৪৫৭ তাং ১২/০১/২০১০ (পরিশিষ্ট -৬)।

[২১] মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের প্রজ্ঞাপন নং মশিবিম/ শা - সেল/যৌঃবিঃজাঃকমিটি-৯/০৪/২০৩ ৪/ ০৬/২০০৯ (পরিশিষ্ট - ৭) ।

[২২]. মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের প্রজ্ঞাপন নং মশিবিম/ শা - সেল/ যৌঃ বিঃ জাঃ কমিটি - ৯/০৪/২৭২ তাং ১১/ ০২/২০১০ (পরিশিষ্ট - ৮) ।

[২৩]. মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের প্রজ্ঞাপন নং মশিবিম/ শা - সেল/NCWD - ৬ /১২/২৮৬ তাং ৫/ ০৬/২০১৩ (পরিশিষ্ট - ৯) ।

(ছ) জেলা নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটি

মহিলা বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের সরাসরি নিয়ন্ত্রনে পরিচালিত দেশের ৬৪টি জেলায় জেলা প্রশাসকগণের সভাপতিত্বে রয়েছে জেলা নারী নির্যাতন নিরোধ কমিটি। এখানে জাতীয় মহিলা সংস্থার জেলা পর্যায়ের প্রতিনিধি, জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সহ জেলা সিভিলসার্জন, পুলিশ সুপার, জেলা বার কাউন্সিলের প্রতিনিধিগণ সদস্য হিসেবে রয়েছেন। কমিটি জেলা পর্যায়ে নারী নির্যাতনের ঘটনার পরিসংখ্যান সংগ্রহ করে নারী নির্যাতন প্রতিরোধে/সমাধানের জন্য জরুরী পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। কমিটি গৃহীত কার্যক্রমের অগ্রগতি প্রতিমাসে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয়ে এবং মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরে প্রেরণ করবে।[২৪] (পরিশিষ্ট - ১০) ।

(জ) উপজেলা নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটি

মহিলা বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের সরাসরি নিয়ন্ত্রনে পরিচালিত দেশের প্রতিটি উপজেলায় উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সভাপতিত্বে রয়েছে উপজেলা নারী নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটি। এখানে জাতীয় মহিলা সংস্থার উপজেলা পর্যায়ের প্রতিনিধি, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, থানার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তা, সমাজসেবা কর্মকর্তা, জাতীয় মহিলা সংস্থার প্রতিনিধি, প্রেসক্লাবের সভাপতি সদস্য হিসেবে রয়েছেন। উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা এই সেলের সদস্য সচিব। কমিটি উপজেলা পর্যায়ে নারী নির্যাতনের ঘটনার পরিসংখ্যান সংগ্রহ করে নারী নির্যাতন প্রতিরোধে/সমাধানের জন্য জরুরী পদক্ষেপ গ্রহণ করে এবং গৃহীত কার্যক্রমের অগ্রগতি প্রতিমাসে জেলা প্রশাসকের নিকট প্রেরণ করে।[২৫] (পরিশিষ্ট - ১১) ।

(ঝ) ইউনিয়ন পর্যায়ে নারী নির্যাতন নিরোধ সংক্রান্ত কার্যক্রম

দেশের প্রতিটি ইউনিয়নে ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রমের আওতায় রয়েছে - ‘ নারীর বিরুদ্ধে সংগঠিত সকল প্রকার সহিংসতা, সন্ত্রাস, সকল প্রকারের অপরাধের বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে উদ্যোগ গ্রহণ করা ও আইন -শৃঙ্খলা রক্ষায় প্রশাসনের সাথে সহযোগিতা করা” ।[২৬]

তৎপ্রেক্ষিতে সকল ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নিজে প্রধান দায়িত্বে থেকে সংশ্লিষ্ট মহিলা সদস্য এবং এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সমন্বয়ে এ সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা করে থাকেন। ইউনিয়ন পরিষদ স্থানীয় সরকার মন্ত্রনালয়ের আওতায় হলেও ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক পরিচালিত এই কার্যক্রমে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে কর্মরত মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তাগণ সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে থাকেন এবং মহিলা বিষয়ক মন্ত্রনালয়ে তথ্য এসে পৌঁছে থাকে।

(২) মহিলা বিষয়ক মন্ত্রনালয় কর্তৃক সরাসরি পরিচালিত মাল্টিসেক্টরাল প্রোগ্রাম/প্রজেক্ট

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের নেতৃত্বে বাংলাদেশ ও ডানিডা সরকারের যৌথ উদ্যোগে আরও নয়টি মন্ত্রনালয় সহ মোট দশটি মন্ত্রনালয়ের সমন্বয়ে বাংলাদেশে নারী নির্যাতন প্রতিরোধ ও প্রতিকার মূলক ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধনের লক্ষ্যে ২০০০ সাল থেকে পরিচালিত হচ্ছে - ‘ নারী নির্যাতন প্রতিরোধ কল্পে মাল্টিসেক্টরাল প্রোগ্রাম’। অন্য নয়টি মন্ত্রনালয় হচ্ছে ঃ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান, স্বরাষ্ট্র, সমাজকল্যান, তথ্য, আইন বিচার ও

---

[২৪]. মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের প্রজ্ঞাপন নং মশিবিম/ শা - সেল/ - ১৬/৯৯/ ১৩৫৯ তাং ২০/ ১২/২০১০ (পরিশিষ্ট ১০)।

[২৫]. মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের প্রজ্ঞাপন নং মশিবিম/ শা - সেল/ - ১৬/৯৯/ ১৩৬০ তাং ২০/ ১২/২০১০ (পরিশিষ্ট ১১) ।

[২৬]. ইউনিয়ন পরিষদ প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল ঃ ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রম, জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট(এনআইএলজি) ২৯, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭, পৃঃ ২৯৬।

সংসদ বিষয়ক, শিক্ষা, ধর্ম, যুব ও ক্রীড়া এবং স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয়। এর মূল অফিসটি বাংলাদেশ মহিলা অধিদপ্তরে স্থাপিত।

এই প্রোগ্রামের কাঠামোর আওতায় পরিচালিত কার্যক্রম সমূহ হ'ল -

(ক) ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার (ওসিসি)

ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার (ওসিসি) মাল্টি সেক্টরাল প্রোগ্রাম/ প্রকল্পের একটি মুখ্য কর্মসূচী। উল্লেখ্য যে, ওসিসি - ধারণাটি মালয়েশিয়া থেকে অনুসৃত। কিন্তু বাংলাদেশ প্রেক্ষাপটে বাস্তবায়ন পর্যায়ে ওসিসি ধারণাটি পরিবর্তন ও পরিমার্জন করা হয়েছে। নির্যাতিত নারীদের সকল প্রয়োজনীয় সেবা এক স্থল থেকে প্রদান করার ধারণার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার (ওসিসি)। তাদের স্বাস্থ্য সহায়তা, পুলিশী সহায়তা, সামাজিক সেবা সমূহ, আইনী সহায়তা, মানসিক কাউন্সেলিং এবং আশ্রয় সেবা সমূহ ওসিসির মাধ্যমে প্রদান করা হয়। এর মধ্যে ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, সিলেট, খুলনা, বরিশাল, ফরিদপুর এবং রংপুর, সহ মোট আটটি বিভাগীয় মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ওয়ান ষ্টপ ক্রাইসিস সেল (ওসিসি) স্থাপিত হয়েছে। এ ছাড়া ৪০টি জেলা সদর হাসপাতালে এবং ২০ টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের অভ্যন্তরে ওয়ান ষ্টপ ক্রাইসিস সেল স্থাপন করা হয়েছে। ওসিসির মাধ্যমে প্রধানত দৈহিক, যৌন এবং এসিড কিংবা আগুনে দগ্ধ করে নির্যাতিত নারীদের চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়ে থাকে। প্রতিষ্ঠা সন ২০০০ থেকে ২০১৪ সনের জুন মাস পর্যন্ত মোট ১৯,৮৭২ জন নির্যাতিত নারী ও শিশুকে ও.সি.সি হতে চিকিৎসা সেবা সহ অন্যান্য সেবা প্রদান করা হয়েছে। ওসিসিতে আগত ভিকটিম/রোগীদের আইনী সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে আইনজীবি, পুলিশবিভাগ, পাবলিক প্রসিকিউটর, বিচার বিভাগ ও অন্যান্য আইন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ ও সহযোগিতা করা হয়। ২০১৪ সনের জুসমাস পর্যন্ত ওসিসি থেকে মোট ৪,৫০৫টি মামলাও পরিচালনা করা হয়েছে, তন্মধ্যে রায় হয়েছে ৬৯১টির, সাজা হয়েছে ৯৬ টি মামলার।[২৭] এখান থেকে নির্যাতিত নারীদের অবস্থান, শিক্ষা, দক্ষতা বৃদ্ধি মূলক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং সমাজে পুনর্বাসন সুবিধা ও প্রদান করা হয়ে থাকে।

(খ) ন্যাশনাল ফরেনসিক ডিএনএ প্রোফাইলিং ল্যাবরেটরী

মামলা তদন্তের সময়ে উপযুক্ত আলামতের অভাবে অনেক ক্ষেত্রে যৌন নির্যাতনের ঘটনার সুষ্ঠু বিচার করা যায়না। ডিএনএ একটি আধুনিক প্রযুক্তি যার মাধ্যমে প্রকৃত অপরাধীকে দ্রুত চিহ্নিত করা সম্ভব। এই লক্ষ্যে এই প্রকল্পের আওতায় ঢাকা মেডিকেল কলেজের ফরেনসিক মেডিসিন বিভাগে দেশের প্রথম ন্যাশনাল ফরেনসিক ডিএনএ প্রোফাইলিং ল্যাবরেটরী স্থাপিত হয়েছে। দেশব্যাপী নির্যাতিতদের সহায়তা করার জন্য ঢাকা, সিলেট, বরিশাল, রাজশাহী, খুলনা এবং চট্টগ্রামে বিভাগীয় মেডিকেল কলেজের ফরেনসিক বিভাগের তদারকিতে পাঁচটি বিভাগীয় মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ও ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ডি.এন.এ. স্ক্রিনিং ল্যাবরেটরী সহ ডিএনএ পরীক্ষার জন্য বিভাগীয় ডিএনএ স্ক্রিনিং ল্যাবরেটরী প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ২০০৬ সন থেকে ২০১৪ সনের জুন পর্যন্ত মোট ২,৬৪৯ টি মামলার সংক্রান্ত নমুনার ডি.এন.এ.পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে।[২৮]

---

[২৭]. নারী নির্যাতন প্রতিরোধ কল্পে মাল্টি-সেক্টরাল প্রোগ্রাম সংশ্লিষ্ট দপ্তর এবং নিউজলেটার, ভলিউম - ৮, ইস্যু -৩, জুলাই ২০১৪, পৃ ঃ ১- ৫ থেকে সংগৃহীত তথ্য মতে ।

[২৮]. পূর্বোক্ত।

(গ) ন্যাশনাল ট্রমা কাউন্সিলিং সেন্টার (NTCC)

এই প্রকল্পের আওতায় মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরে একটি ন্যাশনাল ট্রমা কাউন্সেলিং সেন্টার(NTCC) স্থাপন করা হয়েছে। এই সেন্টার থেকে নির্যাতিত নারী ও শিশুদের মনো-সামাজিক কাউন্সেলিং প্রদান করা হয়। ২০০৯ হতে ২০১৪ সনের জুন পর্যন্ত মোট ১০৫৯ জন নারীও শিশুকে মনো-সামাজিক কাউন্সিলিং প্রদান করা হয়েছে।[২৯]

(৩) মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মাধ্যমে পরিচালিত কার্যক্রম

মহিলা বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের আওতায় রয়েছে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর। বাংলাদেশে নারীদের উন্নয়ন মূলক কার্যক্রমের অধিকাংশই পরিচালিত হয় মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মাধ্যমে এবং এর তত্বাবধানে। অধিদপ্তর বিভাগীয় শহরের কার্যক্রম সরাসরি নিয়ন্ত্রন করে এবং জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে নারীদের বিষয়ে পরিচালিত কার্যক্রম তদারকি করে যা মাঠ পর্যায়ে ৬৪টি জেলায় এবং ৪৮৫ টি উপজেলায় বিস্তারিত।[৩০] অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত কার্যক্রম সমূহ নিম্নরূপ -

- মানব সম্পদ উন্নয়ন ও আত্ম - কর্মসংস্থান সৃষ্টি মূলক ব্যবস্থাদি গ্রহণ;
- দারিদ্র বিমোচন ও আত্ম -কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা;
- নারীদের আর্থ - সামাজিক উন্নয়ন ও সামাজিক সুরক্ষা প্রদান কার্যক্রম পরিচালনা;
- নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ মূলক ব্যবস্থাদি গ্রহণ;
- মহিলা সহায়তা/ পুনর্বাসন কেন্দ্র পরিচালনা;
- প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধাদি ও সেবা প্রদান কার্যক্রম পরিচালনা, যেমন - কর্মজীবি মহিলা হোষ্টেল, কর্মজীবি মহিলাদের শিশুদের জন্য শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র, দুঃস্থ মহিলা ও শিশু সাহায্য তহবিল;
- জেন্ডার সংবেদনশীল ও সতেনতা বৃদ্ধি মূলক কার্যক্রম পরিচালনা।[৩১]

অতঃপর অধিদপ্তর, জেলা এবং উপজেলা মহিলা বিষয়ক দপ্তরের কার্যক্রম ও তত্বাবধান করে থাকে। সেসব কার্যক্রম নিম্নরূপ-

(ক) মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের আওতায় জেলা মহিলা বিষয়ক কার্যালয় ও এর কর্মপরিধি

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের আওতায় দেশের ৬৪টি জেলায় রয়েছে জেলা মহিলা বিষয়ক কার্যালয়। প্রশাসনিক বিভিন্ন কার্যক্রমের সাথে জেন্ডার সম্পৃক্ত নিম্নের কার্যক্রম সমূহ জেলা পর্যায়ে পরিচালিত হয়ে থাকে জেলা মহিলা বিষয়ক কার্যালয়ের মাধ্যমে-

- নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কল্পে জেলা নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটির সদস্য সচিব এবং জেলা আইন শৃঙ্খলা কমিটিতে সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন এবং কমিটির নির্দেশনা অনুযায়ী

---

[২৯]. পূর্বোক্ত ।

[৩০]. মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১১ - ২০১২, ৩৭/৩, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা, পৃঃ ৫৪ - ৭৭।

[৩১]. পূর্বোক্ত পৃঃ ০৬ - ৪৩

Dhaka University Institutional Repository

জেলাধীন নারী ও শিশু নির্যাতন সংক্রান্ত অভিযোগ সমূহ গ্রহণ, পরামর্শদান ও মীমাংসার ব্যবস্থা করণ;

- জেলার মহিলা ও শিশুদের বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিত করণ এবং স্থানীয় প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধিদের সহায়তায় তা সমাধানের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং প্রয়োজনে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ;
- দুস্থ, বিধবা,স্বামী পরিত্যাক্তা মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের চালু প্রশিক্ষনে সম্পৃক্তকরনের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- দরিদ্র অসহায় ও নির্যাতিত মহিলাদের আইনগত সহায়তা প্রদান, প্রয়োজনে জেলা আইন-সহায়ক কমিটির সদস্য হিসেবে ঐ কমিটির সহায়তা গ্রহন;
- নারী ও শিশু নির্যাতনের লোমহর্ষক ঘটনা এবং বিভিন্ন কর্মসূচি/ প্রতিষ্ঠানের দূর্ঘটনার সংবাদ সাথে সাথে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর সহ মন্ত্রনালয়কে অবহিত করণ;
- যৌতুক নিরোধ কার্যক্রম, নারী ও শিশু পাচার রোধ এবং নারীর প্রতি বৈষম্য সহ সকল প্রকার সহিংসতা বন্ধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ;
- মাল্টিসেক্টরাল প্রজেক্ট/প্রোগ্রাম এর OCC হতে সেবা প্রাপ্ত নারী ও শিশুরা যাতে পুনরায় নিগৃহীত না হয় সেদিকে নজরদারী করণ।[৩২]

(খ) উপজেলা মহিলা বিষয়ক কার্যালয় ও এর কর্মপরিধি

জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার নিয়ন্ত্রনে দেশের ৪৮৫ উপজেলায়, উপজেলার মহিলা কর্মকর্তাদের মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গৃহীত নারী উন্নয়ন কার্যক্রম উপজেলা তথা মাঠ পর্যায়ে পরিচালনা করা হয়ে থাকে। উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তাদের কার্যালয় থেকে যাবতীয় প্রশাসনিক কার্যক্রম সহ, নারী নির্যাতন প্রতিরোধ কল্পে নির্ধারিত দায়িত্ব পালন করা হয়ে থাকে। পূর্বে উল্লেখিত জেলা কর্মকর্তাদের যাবতীয় দায়িত্ব ই উপজেলা কর্মকর্তা গণ, উপজেলা পর্যায়ে পালন করে থাকেন।[৩৩]

৪. জাতীয় মহিলা সংস্থা এবং এর কর্ম পরিধি

মহিলা বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের তত্বাবধানে বাংলাদেশের মহিলাদের সার্বিক কল্যানকল্পে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ৪ মে ১৯৯১ এর বাংলাদেশ গেজেট প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে জাতীয় মহিলা সংস্থা নামে একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়। যার কার্যক্রম একটি পরিচালনা পরিষদ এবং একটি নির্বাহী কমিটির মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে থাকে। পরিষদের চেয়ারম্যান ই নির্বাহী কমিটির চেয়ারম্যান। মূলতঃ নির্বাহী কমিটিই পরিষদের যাবতীয় সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য দায়ী।[৩৪] (পরিশিষ্ট- ১২)। জাতীয় মহিলা সংস্থা বাংলাদেশের ৬৪টি জেলায় জেলা কমিটি, ৫০টি উপজেলায় উপজেলা কমিটির মাধ্যমে দেশব্যাপি নারীদের অবস্থার উন্নয়ন এবং নির্যাতন প্রতিরোধ কল্পে কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

জাতীয় মহিলা সংস্থার কার্যক্রম

- সারা দেশে অবস্থিত এই সংস্থার প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে নিরক্ষর নারীদের অক্ষর জ্ঞান দান করা;

---

[৩২].পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৪- ৪৬।

[৩৩].পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ৪৬- ৪৮।

[৩৪].বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত সংখ্যা, ৪ মে ১৯৯১। (পরিশিষ্ট ১২)।

- জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে মহিলাদের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রচলিত আইনকানুন এবং নারীদের অধিকার ও স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে নারীদের সম্মেলন, সেমিনার, কর্মশালা এবং উঠান বৈঠকের মাধ্যমে কাজ করা;
- স্বাস্থ্য, পুষ্টি, পরিবারকল্যান, পরিবেশ সংরক্ষণ, নৈতিক ও সামাজিক বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান;
- অনগ্রসর, অবহেলিত, বেকার নারীদের দর্জিজ্ঞান, এমব্রয়ডারী, ব্লক-বাটিক, চামড়াজাত শিল্প, খাদ্য প্রস্তুত ও প্রক্রিয়াজাত করণ এবং কম্পিউটার প্রশিক্ষনের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা;
- মহিলাদের আইনগত অধিকার রক্ষার্থে সাহায্য সহযোগিতা করা;
- পরিবার কল্যানমূলক ব্যবস্থাদি গ্রহণে নারীদের উদ্বুদ্ধ করা;
- জাতীয় উন্নয়ন কর্মকান্ডে নারীদের সম্পৃক্ত করার জন্য উদ্যোগ নেয়া;
- সমবায় সমিতি গঠন ও কুটির শিল্প স্থাপনে নারীদের উৎসাহিত করা;
- ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহনে সুযোগ সৃষ্টি করা।[৩৫]

এই সংস্থার কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে রয়েছে একটি 'নারী নির্যাতন প্রতিরোধ সেল' যার মাধ্যমে নির্যাতিত নারীরা বিনা খরচে আইনগত সহায়তা পেয়ে থাকেন।[৩৬]

(ক) জাতীয় মহিলা সংস্থার আওতায় জেলা কমিটি ও এর কার্যক্রম

প্রত্যেক জেলায় মহিলা সংস্থার একটি করে জেলা কমিটি রয়েছে, যেখানে জেলা পরিষদের মহিলা সদস্যগণ, জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, উপজেলা কমিটির চেয়ারম্যান, জেলায় কর্মরত শিক্ষিকাগনের এবং জেলায় সমাজ সেবায় রত মহিলাগনের মধ্য হতে মনোনীত সদস্য, জেলায় মহিলা কল্যানে নিয়োজিত সরকার কর্তৃক বেসরকারী সংগঠনে সদস্যগণের মধ্য হতে নির্বাচিত দুইজন সদস্য - জেলা কমিটির সদস্য। জেলা কমিটির সদস্যগণের মধ্য হতে সরকার কর্তৃক মনোনীত একজন সদস্য উহার চেয়ারম্যান হিসেবে মনোনীত হন। এই কমিটি উপরে উল্লেখিত জাতীয় মহিলা সংস্থার কার্যক্রম/দায়িত্বাবলী জেলা পর্যায়ে সম্পাদন করে থাকে।[৩৭]

(খ) জাতীয় মহিলা সংস্থার আওতায় উপজেলা কমিটি ও এর কার্যক্রম

প্রত্যেক উপজেলায় মহিলা সংস্থার একটি করে উপজেলা কমিটি রয়েছে, যেখানে উপজেলা পরিষদের মহিলা সদস্যগণ, উপজেলার ইউনিয়ন পরিষদের মহিলা সদস্যগনের মধ্য হতে মনোনীত ছয়জন সদস্য,উপজেলায় কর্মরত শিক্ষিকাগণের মধ্য হতে মনোনীত একজন, উপজেলায় সমাজ সেবায় রত মহিলাগণের মধ্য হতে মনোনীত একজন, উপজেলায় মহিলা কল্যানে নিয়োজিত সরকার কর্তৃক স্বীকৃত বেসরকারী সংগঠনে সদস্যগণের মধ্য হতে নির্বাচিত একজন, উপজেলার বিশিষ্ট মহিলাগণের মধ্য হতে মনোনীত তিনজন - উপজেলা কমিটির সদস্য। উপজেলা কমিটির সদস্যগণের মধ্য হতে সরকার কর্তৃক মনোনীত একজন সদস্য

---

[৩৫].জাতীয় মহিলা সংস্থার কেন্দ্রীয় কার্যালয়, ১৪৫, নিউ বেইলি রোড, ঢাকা থেকে সংগৃহীত তথ্য মতে।

[৩৬]. পূর্বোক্ত।

[৩৭].বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত সংখ্যা, ৪ মে, ১৯৯১। পরিশিষ্ট ১২।

উহার চেয়ারম্যান হিসেবে মনোনীত হন।এই কমিটি ও উপরে উল্লেখিত জাতীয় মহিলা সংস্থার কার্যক্রম/ দায়িত্বাবলী উপজেলা পর্যায়ে সম্পাদন করে থাকে।[৩৮]

৫. বর্ণিত সাংগঠনিক ব্যবস্থার অতিরিক্ত জাতিসংঘের প্ল্যাটফরম ফর অ্যাকশন (PFA) বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশের জাতীয় কর্মপরিকল্পনা (NAP) প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে বিশেষ আরেকটি সাংগঠনিক ব্যবস্থা

পূর্বে উল্লেখিত সাংগঠনিক ব্যবস্থাদি জাতিসংঘের চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনে নারী উন্নয়ন এবং জেন্ডার নীতিমালা, মানবাধিকার বাস্তবায়নে কার্যক্রম গ্রহণ করে যাচ্ছে তথাপিও জাতিসংঘের নির্দেশিত প্ল্যাট ফরম ফর এ্যাকশান এর উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ প্রদানের কারণে বাংলাদেশে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রনালয় সমূহের কার্যক্রমের ভিত্তিতে প্রণীত হয়েছে পৃথক পৃথক 'জাতীয় কর্মপরিকল্পনা'। জাতীয় পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য বিশেষ সাংগঠনিক ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হয়েছে।

নারীর অধিকারকে মানবাধিকার হিসেবে গণ্য করে প্লাটফরম ফর অ্যাকশন (PFA) এর ১২ টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার সংশ্লিষ্ট ১৫টি মন্ত্রনালয়/ বিভাগ সুনির্দিষ্ট করে PFA - এর সুপারিশগুলো তাদের কার্যক্রমের সাথে সন্নিবেশ করে সে গুলোর মাধ্যমে বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া পরিচালনা করছে।

এই মন্ত্রনালয়/ বিভাগগুলো হ'ল-

১. মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয়
২.পরিকল্পনা মন্ত্রনালয়
৩. সমাজ কল্যান মন্ত্রনালয়
৪.শিক্ষা মন্ত্রনালয়
৫. প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ
৬. স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয়
৭. আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রনালয়
৮. শিল্প মন্ত্রনালয়
৯. কৃষি মন্ত্রনালয়
১০ পরিবেশ ও বন মন্ত্রনালয়
১১. মৎস ও পশু সম্পদ মন্ত্রনালয়
১২. শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রনালয়
১৩. স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয়
১৪. স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান মন্ত্রনালয়
১৫. তথ্য মন্ত্রনালয়।

একই সাথে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা(NPFA) বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের সাথে সরকারী - বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, নারী সংগঠন, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে নারী উন্নয়ন বিষয়ক কার্যক্রম বাস্তবায়নের দায়িত্বও বন্টন করা হয়েছে। [৩৯]

---

[৩৮]. বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত সংখ্যা, ৪ মে, ১৯৯১ এবং জাতীয় মহিলা সংস্থার কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে সংগৃহীত তথ্য।

(পরিশিষ্ট ১৩ এ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের জন্য পিএফএ বাস্তবায়নে জাতীয় পরিকল্পনাটি নমুনা হিসেবে এবং পরিশিষ্ট ১৪ এ সাধারণ কর্ম পরিকল্পনাটি নমুনা হিসেবে সংযুক্ত)

জাতীয় কর্মপরিকল্পনা (NPFA) বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম

- সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয়। জাতীয় মহিলা উন্নয়ন পরিষদ (NCWD) সময় সময় তা পর্যালোচনা করবে; বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত আন্তঃমন্ত্রনালয় কমিটি নিয়মিত ভাবে তা পর্যালোচনা করবে;

- উন্নয়ন পরিকল্পনা ও কার্যক্রমে জেন্ডার ইস্যু যুক্ত করার জন্য প্রতিটি সেক্টরাল মন্ত্রনালয়ের যুগ্ম সচিব/ যুগ্ম প্রধান পর্যায়ের কর্মকর্তার নেতৃত্বে গঠিত হয় উইড ফোকাল পয়েন্ট (WID Focal Point)।

- মেকানিজম শক্তিশালী করতে ১৪টি লাইন মন্ত্রনালয়ের জন্য জাতীয় নারী উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন মেট্রিক্স ঠিক করা হয়;৫

- সংশ্লিষ্ট মন্ত্রনালয়ের পলিসি, পরিকল্পনা এবং কার্যক্রমের মধ্যে জেন্ডার সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি সম্পৃক্ত করে কার্যক্রম পরিচালনাই হলো উইড ফোকাল পয়েন্টদের দায়িত্ব;
- উইড ফোকাল পয়েন্ট (Women in Development - WID) কে কার্যক্রমে সহযোগিতা করার জন্য একই মন্ত্রনালয়ের উপসচিব/ উপপ্রধানকে Associate Wid Focal point এবং সহকারী সচিব/ সহকারী প্রধানকে Sub wid focal point হিসেবে নির্ধারণ করা হয়;

- WID ফোকাল পয়েন্টদের দায়িত্ব হলো তাদের নিজস্ব সেক্টোরাল পরিকল্পনায় WID বিষয়াদিকে অন্তর্ভুক্ত করা। সেক্টর নির্দিষ্ট ও যৌথ বিষয়াদির সাথে যে সমস্ত WID কর্মকান্ড সম্পৃক্ত সে সমস্ত কর্মকান্ডের বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ এবং সমন্বয়সাধন ও WID ফোকাল পয়েন্টদের দায়িত্ব ও কর্তব্য। নারী উন্নয়ন কার্যক্রম সমন্বয় সাধনের জন্য সকল জেলা উপজেলায় WID coordination Committee গঠন করা হয়;
- জেলা/ উপজেলা WID coordination Committee বা উইড সমন্বয় কমিটি ও প্রকল্প সমূহের কার্যক্রম পরিবীক্ষনের জন্য মনিটরিং মেকানিজম ফরমেট করা হয়;

- স্থির হয় যে, জাতীয় কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়নকে সমর্থন প্রদান করার জন্য এনজিও, নারী সংগঠন, মানবাধিকার এবং আইনসহায়ক প্রতিষ্ঠান সমূহ এ পরিকল্পনার বিভিন্ন কর্মকান্ডে, আলোচনা সভায় অংশ গ্রহণ করবে;

- কর্মপরিকল্পনার বিভিন্ন কর্মকান্ড কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জনমত সংগঠিত করবে। তারা কারিগরী, আইনগত এবং প্রশিক্ষণ সহায়তাও প্রদান করবে এবং মাঠ পর্যায়ে সহায়ক সেবা প্রদান করবে এবং কর্মসূচির বিস্তার ঘটাবে;

---

[৩৯]. নারী উন্নয়নে জাতীয় পরিকল্পনা, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০০০ (২য় সং), পৃঃ ৫- ১২ ।(পরিশিষ্ট ১৩ এবং ১৪)।

- আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগীগণ ও কর্ম পরিকল্পনার বাস্তবায়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। চিহ্নিত অগ্রাধিকার অনুযায়ী তারা আর্থিক এবং কারিগরী সহায়তা প্রদান করবে।[৪০]

এভাবে বাংলাদেশে নারী মুক্তি এবং নারীদের অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে মহিলা বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের মাধ্যমে দেশ জুড়ে বিদ্যমান রয়েছে উপরে বর্ণিত মতে শক্তিশালী সাংগঠনিক কাঠামো সমূহ। কাঠামোটির ধরণ নিম্নরূপ -

প্রামাণ্য চিত্র ২

নারীমুক্তি ও অগ্রগতি কার্যক্রম পরিচালনা সংক্রান্ত বিদ্যমান প্রাতিষ্ঠানিক সেটআপ

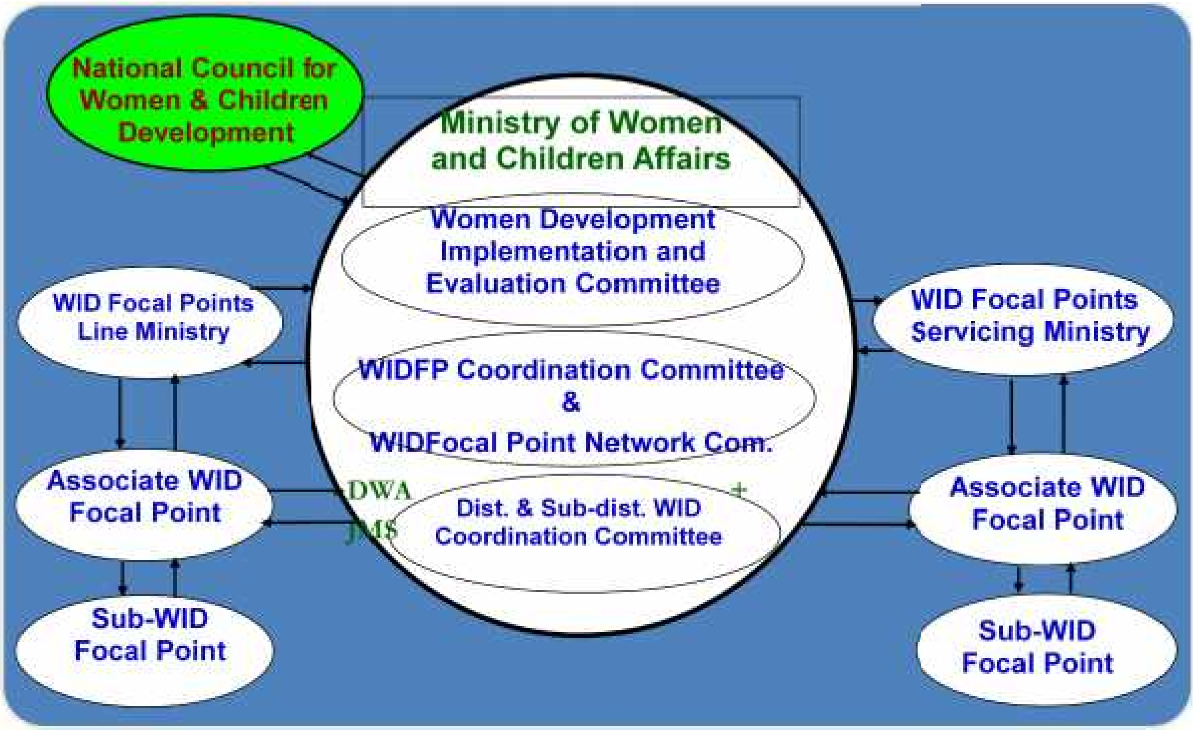

চিত্রটিতে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের সাথে বর্ণিত ফোকাল পয়েন্ট সমুহের সম্পৃক্ততা দেখানো হয়েছে। (পরিশিষ্ট ১৫ এ আরও বিস্তারিত ভাবে সেটআপটি দেখানো হয়েছে)।

বাংলাদেশে নারী মুক্তি এবং নারীদের অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে দেশ জুড়ে বিদ্যমান রয়েছে বর্ণিত শক্তিশালী সাংগঠনিক কাঠামো একই সাথে রয়েছে কর্ম পরিকলাপনা এবং কর্মসূচি। এতক্ষন পর্যন্ত সাংগঠনিক কাঠামোর উপর আলোকপাত করা হয়েছে, বর্তমানে কর্মপরিকল্পনা এবং কর্মসূচিগত কৌশলের উপর আলোকপাত করা হচ্ছে ।

৪.৩.২ কর্মপরিকল্পনা এবং কর্মসূচিগত কৌশল প্রণয়ন

[৪০] .পূর্বোক্ত, পৃঃ ১২ - ২২।

বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জনের পর থেকেই বিভিন্ন পরিকল্পনার মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে যা পরবর্তীতে সিডো সনদ, বেইজিং প্লাট ফরম ফর এ্যাকশন (পিএফএ), এমডিজি সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সহায়ক হয়েছে । জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ এ এতদসংক্রান্ত উল্লেখযোগ্য নীতি হ'ল -

- মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয় সহ অন্যান্য মন্ত্রনালয় /বিভাগ/সংস্থা এবং জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের সরকারী -বেসরকারী সংগঠনসমূহ নারী উন্নয়নের জন্য কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করবে;
- সকল মন্ত্রনালয়/ বিভাগ/ সংস্থার নিজ নিজ কর্ম পরিকল্পনায় জেন্ডার প্রেক্ষিতের প্রতিফলন ঘটানো হবে [৪১] ।

বাংলাদেশ সরকারের বিদ্যমান এবং বর্তমান সময় পর্যন্ত প্রণীত বিভিন্ন পরিকল্পনা এবং কার্যক্রম উল্লেখিত নীতি বাস্তবায়নে সহায়ক হচ্ছে। সে গুলো হলো- **পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং উন্নয়ন** কর্মসূচিতে জেন্ডার ভিত্তিক কার্যক্রম।

বাংলাদেশে এ যাবত উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনার সুবিধার্থে ছয়টি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সমুহের কোনকোনটির মধ্যে রয়েছে দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনা, ত্রিবার্ষিক আবর্তক পরিকল্পনা ও বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি অতঃপর দীর্ঘমেয়াদী প্রেক্ষিত পরিকল্পনা। - এসব পরিকল্পনায় নারীদের উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহিত জেন্ডার সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম সমূহ নিম্নরূপ-

১. প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৭৩ -৭৮)

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭৩ - ৭৮ সনের জন্য প্রণয়ন করা হয় বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পপনা। এখানে নারীদের বিষয়ে প্রধানতঃ জোর দেয়া হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্থ এবং ছিন্নমূল নারীদের পুনর্বাসনের উপর। এর আগে ১৯৭২ সনে সরকার একটি 'বাংলাদেশ নারী পুণর্বাসন বোর্ড' প্রতিষ্ঠা করেছিল। বোর্ডের প্রধান কার্যক্রম ছিল –

- স্বাধীনতা যুদ্ধে নির্যাতিত নারী ও শিশুর সঠিক তথ্য আহরনের জন্য জরিপ কাজ পরিচালনা করা এবং তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা;
- যুদ্ধে নির্যাতিত নারীদের বিভিন্ন বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা;
- পারিবারিক ও সামাজিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ অধিকাংশ মেয়ের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা; এবং
- মুক্তিযুদ্ধে নিহত মুক্তিযোদ্ধাদের পরিবারের কর্মক্ষম নারীদের প্রশিক্ষণও চাকুরী প্রদান করা।[৪২]

অতঃপর ১৯৭৪ সনে এই 'বাংলাদেশ নারী পুণর্বাসন বোর্ড'কে বৃহত্তর কলেবরে পুনর্গঠিত করে 'নারী পুনর্বাসন ও কল্যান ফাউন্ডেশনে' রূপান্তর করা হয়। ফাউন্ডেশনের বহুবিধ কার্যক্রমের মধ্যে অন্যতম ছিল - দেশের সকল জেলা ও মহকুমায় নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে ভৌত অবকাঠামো গড়ে তোলা এবং তার মাধ্যমে -

---

[৪১]. জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয়,গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, পৃঃ ২৬।

[৪২]. জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬-১১, এবং বার্ষিক প্রতিবেদন (২০১১-১২) মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয়, পৃঃ ১।

- নারীদের ব্যাপক কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে বৃত্তিমুলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা;
- নারীদেরকে উৎপাদনমুখী কর্মকান্ডে নিয়োজিত করে প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন করা;

- উৎপাদন ও প্রশিক্ষনের কাজে নিয়োজিত নারীর জন্য দিবাযত্ন সুবিধা প্রদান করা;
- যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্থ নারীদের চিকিৎসা প্রদান করা;
- মুক্তি যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্থ নারীদের ছেলে মেয়েদের লেখাপড়ার জন্য বৃত্তি প্রথা চালু করা। - যা বর্তমানে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের আওতায় দুস্থ মহিলা ও শিশু কল্যান তহবিল নামে পরিচালিত হচ্ছে।[৪৩]

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় উপরে'উল্লেখিত অর্থকরী কাজে নারীদের নিয়োজিত করার জন্য সর্বপ্রথম আন্তঃখাত উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। সমাজ কল্যান মন্ত্রনালয় নারীদের জন্য বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি (গ্রামীন মহিলা ক্লাব) চালু করে। স্থানীয় সরকার - পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয় গণশিক্ষা কার্যক্রম চালু করে। পরবর্তীতে এই কর্মসূচি বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় নারী সমবায় কর্মসূচিতে রূপান্তরিত হয়। ১৯৭৩ সনে সাভারে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের ৩৩ বিঘা জমির উপর প্রতিষ্ঠিত ' গ্রামীন মহিলাদের জন্য কৃষিভিত্তিক কর্মসূচির' কাজও শুরু হয় যা অদ্যাবধি বিদ্যমান।[৪৪]

দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৭৮-১৯৮০)

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণীত না হওয়ার অন্তবর্তি সময়ের মধ্যে একটি দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। এখানে নারী বিষয়ক কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিবেচনায় আনা হয়। তা হলো- নারীদের কর্মসংস্থান ও দক্ষতা বৃদ্ধি কর্মসূচি। প্রথমবারের মত এখানেই নারী বিষয়টি কল্যানের সঙ্গে উন্নয়নের পর্যায়ভুক্ত করা হয়। কারণ এ সময়ে কিছু আন্তর্জাতিক বিষয়াদি বাংলাদেশে প্রভাব বিস্তার করেছিলো। সেগুলো হ'ল-

- ১৯৭৫ সালে মেক্সিকোতে অনুষ্ঠিত হয় জাতিসংঘ কর্তৃক আয়োজিত প্রথম বিশ্ব নারী সম্মেলন। 'সমতা উন্নয়ন ও শান্তি' ছিল যেই সম্মেলনের স্লোগান;
- এই সম্মেলনে গৃহীত হয় নারী উন্নয়নের একটি 'বিশ্ব কর্ম পরিকল্পনা' (WPA)। ১৩৩টি দেশের ১২০০ প্রতিনিধি এতে যোগ দেয় যার ৭৩% ই ছিল নারী;
- জাতিসংঘ কর্তৃক ১৯৭৫ সালকে নারীবর্ষ (TWY) এবং ১৯৭৬ -৮৫ দশককে আন্তর্জাতিক নারী দশক (UN Internationational Women Decade) হিসেবে ঘোষণা;
- এ সময়ের মধ্যেই জাতিসংঘ, বিশ্বব্যাংক ও বিভিন্ন দাতা সংস্থায় উন্নয়নে নারী বিভাগ (WID Unit) প্রতিষ্ঠিত হয়;
- জাতিসংঘের সিডো কনভেনশনটিও গৃহীত হয় ১৯৭৮ সনে যা বাংলাদেশ কর্তৃক গৃহীত হয় ১৯৮৪ সনে।[৪৫]

---

[৪৩]. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১ এবং ৬ - ১১ ।

[৪৪]. প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৭৩ -৭৮), পরিকল্পনা কমিশন, পরিকল্পনা মন্ত্রনালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা, ১৯৭৩, পৃঃ ৪৭৯, ৪৮৪, ৫৩৭, এবং জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১, পৃঃ ৬-১১।

[৪৫]. দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনা(১৯৭৮-১৯৮০), পরিকল্পনা কমিশন, পরিকল্পনা মন্ত্রনালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ঢাকা, ১৯৭৮,পৃঃ ২৯৯ এবং

আন্তর্জাতিক এসব উদ্যোগের পরিপ্রেক্ষিতে এই সময় থেকেই নারী ইস্যুটি বাংলাদেশেও মানবাধিকারের প্রেক্ষাপটে এবং সামাজিক উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বিবেচিত হতে থাকে। ১৯৭৬ সনে প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ 'জাতীয় মহিলা সংস্থা' যা ১৯৭৮ এর পরে কার্যকর হয়। ১৯৭৮ এ-ই নারী উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয় ' মহিলা বিষয়ক মন্ত্রনালয়'। ১৯৭৬ সনে নারীদের চাকুরী ক্ষেত্রে ১০% কোটা নির্ধারণ করা হয়, নারীদের সরকারী চাকুরী ক্ষেত্রে বয়স সীমা ২৭ থেকে ৩০ এ উত্তীর্ণ করা হয়। নারীদের জন্য পার্লামেন্টে ৩০টি সীট রিজার্ভ করা হয়।[৪৬] যা দ্বি-বার্ষিক এই পরিকল্পনার নারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি মূলক কর্মসূচির সাথে সম্পৃক্ত। এসবের আঙ্গিকেই প্রণীত হয় দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা।

২. দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা(১৯৮০ -৮৫)

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় মহিলাদের বিষয়টি স্পষ্ট ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। পূর্বে উল্লেখিত দ্বিবার্ষিক কর্মসূচির আওতায় গৃহীত কর্মসূচি এখানেও বিদ্যমান থাকে, তবে এখানে নারীদের উন্নয়নের সাথে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি কার্যক্রমের উপরও অধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়। যেমন-

- দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষনের মাধ্যমে মহিলাদের আয়বর্দ্ধক কার্যক্রমে নিয়ে এসে দারিদ্র দূরীকরণের উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়;
- মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে প্রশিক্ষন শেষে, ক্ষুদ্রঋণ প্রদান কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়;
- মহিলাদের উন্নয়নের মূলস্রোতধারায় নিয়ে আসা এবং Public Sector এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ স্তরে নারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি করার বিষয়ে গুরুত্ব প্রদান করা হয়;
- নারী-পুরুষের শিক্ষিতের হার বৃদ্ধি করণ এবং নারীদের স্বাস্থ্য এবং পুষ্টির অগ্রগতি সাধনের উপরও গুরুত্ব প্রদান করা হয়।
- সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো ১৯৮৪ সনে নারীর অবস্থার উন্নয়ন একই সাথে ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে সিডো সনদ রেটিফিকেশন করা হয়।[৪৭]

৩. তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা(১৯৮৫ - ৯০)

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কার্যক্রম সমাপনের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। এখানে প্রথম বারের মত জেন্ডার অসাম্যকে দূরীকরণের জন্য নারী ও শিশু কল্যান কার্যকমের(Welfare to women and children) স্থলে উন্নয়নে-নারী (Women in development - WID) কার্যক্রমের উপর গুরুত্বারোপ করা হয় এবং মহিলাদের আইনী অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রম গ্রহণ করা

Salma Khan (Member, Women for Women and Former Division Chief Planning commission, Government of Bangladesh) ঃ Review Paper on Women's Issues In the National Five years plans –Assesment and Suggested future Strategies – on Behalf of NCBP, 01-08।

[৪৬]. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৯৮, এবং ১-৮।

[৪৭].দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৮০-৮৫),পরিকল্পনা কমিশন, পরিকল্পনা মন্ত্রনালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা, ১৯৮০, পৃ ঃ ৯৫, ৩৫৪, ৩৬৪-৩৬৬।

Dhaka University Institutional Repository

হয়।[৪৮] এই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন পর্যায়ে নারী উন্নয়ন মন্ত্রনালয়ের নামকরণ করা হয় 'নারীও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয়'।

৪. চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা(১৯৯০ - ৯৫)

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নারী উন্নয়নকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের অংশ হিসেবে চিহ্নিত করে উন্নয়নের মূল ধারায় সম্পৃক্ত করণের লক্ষ্যে গৃহিত হয় আন্ত:খাত উদ্যোগ । এখানে নারী পুরুষের বৈষম্য দূর করার উপর ও গুরুত্ব দেয়া হয়। এই পরিকল্পনায় গৃহিত বিষয় সমূহ হল-

- বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন, এবং গণ নিরক্ষরতা হ্রাস;
- শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, শিল্পবানিজ্য, সেবা ও অন্যান্য খাতে নারীর বর্ধিত অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা;
- দারিদ্র দূর করা, দক্ষতা বৃদ্ধি করা, স্ব-কর্মসংস্থান ও ঋণ সুবিধা বৃদ্ধি করা;
- জেন্ডার সম্পর্কিত সচেতনতা বৃদ্ধি করা ;
- নারীর জন্য সহায়ক সুবিধা বৃদ্ধি করা যেমন কর্মজীবি নারীদের জন্য হোষ্টেল, শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন এবং আইনী সহায়তা প্রদান ইত্যাদি।[৪৯]

ত্রিবার্ষিক আবর্তক পরিকল্পনা ও বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (১৯৯৫-৯৮)

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং পঞ্চম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার মধ্যবর্তী সময়ে প্রণীত হয় ত্রিবার্ষিক আবর্তক পরিকল্পনা ও বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি। এ দু'টো পরিকল্পনায় নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে যে বিষয়াদির উপর গুরুত্বারোপ করা হয় তা হলো - স্ব - কর্মসংস্থান, নারী নির্যাতন প্রতিরোধ, অনানুষ্ঠানিক ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন, নারী সহায়তা কর্মসূচী, কর্মজীবি মহিলা হোষ্টল স্থাপন, দুস্থ নারীর জন্য খাদ্য - সহায়তা কর্মসূচি, খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা কর্মসূচী, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা, পল্লী অঞ্চলে মাধ্যমিক পর্যায়ে মেয়েদের অবৈতনিক শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা এবং টিকাদান কর্মসূচি গ্রহণ।[৫০]

৫. পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা(১৯৯৭ - ২০০২)

পঞ্চম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনায় নারীকে উন্নয়নের মূল ধারায় সম্পৃক্ত করনের প্রচেষ্টাকে জোরদার করা হয়। এখানে 'নারী-পুরুষের সমান অধিকারের উপর সংবিধান সম্মত দিক নির্দেশনা বাস্তবায়নের' উপর গুরুত্বারোপ

---

[৪৮].তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৮৫-৯০), পরিকল্পনা কমিশন, পরিকল্পনা মন্ত্রনালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা, ১৯৮৬, পৃঃ ১৭, ৮১, ৮৫।

[৪৯].চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা(১৯৯০-৯৫), পরিকল্পনা কমিশন, পরিকল্পনা মন্ত্রনালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ঢাকা, ১৯৯০,পৃ ঃ ১৫- ১৮, জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১, পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ১১-১২ এবং Salma Khan(Member, Women for Women and Former Division Chief Planning commission, Government of Bangladesh) ঃ Review Paper on Women's Issues In the National Five years plans – Assesment and Suggested future Strategies – on Behalf of NCBP, p ঃ 01-08।

[৫০] . ত্রিবার্ষিক আবর্তক পরিকল্পনা (১৯৯৫- ১৯৯৭ ঃ পরিকল্পনা কমিশন, পরিকল্পনা মন্ত্রনালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ঢাকা, ১৯৯৭ পৃ ঃ ১২-১৫ এবং Salma Khan(Member, Women for Women and Former Division Chief Planning commission, Government of Bangladesh) ঃ Review Paper on Women's Issues In the National Five years plans – Assesment and Suggested future Strategies – on Behalf of NCBP, 01-08। এবং জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১, পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ১২।

করা হয় এবং একই সাথে নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণ সনদ, বেইজিং প্লাটফরম ফর এ্যাকশন, নারী উন্নয়নে জাতীয় পরিকল্পনা বাস্তবায়নে দৃঢ় অঙ্গিকার ব্যক্ত করা হয়।[৫১]

দীর্ঘমেয়াদী প্রেক্ষিত পরিকল্পনা(২০১০- ২০২১)

বর্তমান গবেষণার তৃতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে দারিদ্র বিমোচন কৌশল পত্র (Poverty Reduction Streategy Paper) সম্পর্কে। এই কৌশলপত্রের সাথে সংগতিপূর্ণ ভাবে ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার লক্ষ্যকে সামনে রেখে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক মধ্যমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য নির্ধারণ করে Perspective Plan of Bangladesh 2010-2021: Making Vision 2021- A reality নামে একটি প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০১০-২০২১) অনুমোদন করা হয়েছে। এই পরিকল্পনায় বিশেষ ভাবে জেন্ডার বৈষম্য দূরীকরণ পূর্বক নারীদের অবস্থার উন্নয়নের জন্য জেন্ডার প্রেক্ষিত পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়েছে।[৫২] (জেন্ডার সংশ্লিষ্ট দীর্ঘ মেয়াদী প্রেক্ষিত পরিকল্পনার সংশ্লিষ্ট অংশ পরিশিষ্ট ১৬ এ সংযুক্ত)।

পরিকল্পনার অন্য প্রধান কয়েকটি বৈশিষ্ট্য হ'ল -

১. মাথাপিছু আয়ের পরিমান ২,০০০ ডলারে উন্নীত করা;

২. জিডিপির মোট ৩৯ শতাংশ জাতীয় সঞ্চয় ও ৩৮ শতাংশ পর্যন্ত অভ্যন্তরীণ বিনিয়োগ বাড়ানো;

৩. মাথাপিছু দরিদ্রতার হার ১৩.৫ শতাংশ হ্রাস করা।[৫৩]

যাতে নারীরা স্বাভাবিক ভাবেই উপকৃত হবে।

৬. ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা(২০১১ - ২০১৫)

উল্লেখিত দীর্ঘমেয়াদী প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০১০-২০২১) যা Perspective Plan of Bangladesh 2010-2021ঃ Making Vision 2021- A reality - র , পরিকল্পনাকে সামনে রেখে তা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকার ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে, যা বাস্তবায়িত হচ্ছে ২০১০ এর জুলাই হতে।এই পরিকল্পনায় জেন্ডার সমতা নিশ্চিত কল্পে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা, প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা, পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি নির্বাচন ও গ্রহণের ক্ষেত্রে নারীর প্রজনন অধিকার নিশ্চিত করণ, প্রজনন স্বাস্থ্যের উন্নয়ন, বুকের দুগ্ধ প্রদানকারী মা ও বয়োঃসন্ধিকালীন কিশোরীদের পুষ্টি চাহিদা পূরণ, যৌন রোগের বিষয়ে নারীর সচেতনতা

---

[৫১]. পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা(১৯৯৭-২০০২) ঃ পরিকল্পনা কমিশন, পরিকল্পনা মন্ত্রনালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ঢাকা, ১৯৯৮ পৃঃ ১৭৩, ১৭৫, ৪৮৯ এবং Salma Khan(Member, Women for Women and Former Division Chief Planning commission, Government of Bangladesh: Review Paper on Women's Issues In the National Five years plans – Assesment and Suggested future Strategies – on Behalf of NCBP, 01-08 এবং জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১, পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ১২।

[৫২].Out line perspective plan of Bangladesh 2010 – 2021 Making Vision 2021 A Reality. General Economics Division , Planning Commission, Government of the People's Republic of Bangladesh, June 2010. P. 0 7. (পরিশিষ্ট -১৬)।

[৫৩].মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামো, (২০১২-১৩ হতে ২০১৬-১৭) : অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রনালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, পৃঃ ৩।

বৃদ্ধি, নারীবান্ধব হাসপাতাল সৃষ্টি, স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণে নারীর সুযোগ, প্রসব পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সেবা সহ প্রয়োজনীয় প্রসূতি সেবা নিশ্চিত করণ এবং লিঙ্গ সমতা কৌশল পুণঃ মূল্যায়ন ও সংস্কারের উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।[৫৪]

উপরে বর্ণিত সাংগঠনিক কাঠামো সমূহের আওতায়ই পরিচালিত হয়ে থাকে বাংলাদেশের নারী মুক্তি সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম। নিম্নের আলোচ্য বিষয়াদি থেকে তা স্পষ্ট হবে।

৪.৩.৩ নারীর দারিদ্র দূরীকরণ

বেইজিং প্লাটফরম ফর এ্যাকশন এর প্রথম সিদ্ধান্তটি-ই হলো নারী এবং দারিদ্র আর সিডো সনদের অনুচ্ছেদ -১৪ এ গ্রামীন নারীদের বিশেষ সমস্যা এবং মিলিনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল এ দারিদ্র ও ক্ষুধা দূরীকরণকে প্রধান লক্ষ্য হিসেবে ধরা হয়েছে। যদিও মিলিনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল এর এই লক্ষ্যে নারী-পুরুষ উভয়ের দারিদ্র বিমোচনকে মূল লক্ষ্য হিসেবে ধরা হয়েছে তবে বর্তমান আলোচনা নারীদের নিয়ে।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস), বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (ডব্লিওএফপি), বিশ্বব্যাংক যৌথভাবে পরিচালিত এক জরিপ চালিয়ে প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছেন যে, বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ১৭ দশমিক ৬ শতাংশ মানুষ দারিদ্র সীমার নীচে বসবাস করছে।[৫৫] জনাব ফখরুল আহ্সান তাঁর 'Sixth five year plan (2011-15) as the tool of accelerating growth and reducing poverty' প্রবন্ধে উল্লেখ করেন যে, বাংলাদেশে শতকরা ৪০ ভাগ দরিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর মধ্যে দুই তৃতীয়াংশ নারী এবং এর মাঝে নারী প্রধান পরিবারের সংখ্যা অধিক।[৫৬]

তবে সরকারী ভাবে House hold income and expendiure survey 2010 অনুসারে উচ্চতর দারিদ্রসীমা এবং নিম্নতর দারিদ্র সীমা অনুসারে বাংলাদেশের দারিদ্রের পরিমাপ নিম্নের সারণী ৫ এ দেখানো হ'ল-

সারণী - ৫

বাংলাদেশের দারিদ্রের পরিমাপ

	২০১০			২০০৫		
নিম্নতর দারিদ্র সীমা	জাতীয় পর্যায়ে	পল্লী এলাকা	শহরএলাকা	জাতীয়পর্যায়ে	পল্লী এলাকা	শহরএলাকা

---

[৫৪]. ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা(২০১১ - ২০১৫)ঃ পরিকল্পনা কমিশন, পরিকল্পনা মন্ত্রনালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার. ঢাকা, ২০১১ পৃ: ৯, ১০.১১, ১৩ ও ২১-২৩ এবং ফখরুল আহ্সান ঃ Sixth five year plan (2011-15) as the tool of accelerating growth and reducing poverty. 6th June, 2011. P. 6-9।

[৫৫].যুগান্তর, ২৭ আগষ্ট ২০১৪ ।

[৫৬].ফখরুল আহ্সান ঃ Sixth five year plan (2011-15) as the tool of accelerating growth and reducing poverty. পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ১২।

পুরুষ	১৭.৯	২১.৫	৭.৯	২৫.৪	২৯.০	১৪.৫
মহিলা	১৪.৬	১৭.৩	৫.৫	২১.৯	২৩.৬	১৬.২
উচ্চতর দারিদ্র সীমা						
পুরুষ	৩২.১	৩৫.৯	২১.৭	৪০.৮	৪৪.৯	২৮.৭
মহিলা	২৬.৬	২৯.৩	১৭.৫	২৯.৫	৩১.০	২৪.৪ [৫৭]

সারণী ৫ দৃষ্টে ২০০৫ থেকে ২০১০ এ যদিও দারিদ্র সীমা কমেছে, কিন্তু পল্লী এলাকা, শহর এলাকা এবং মোট মিলিয়ে জাতীয় পর্যায়ে তথা সব ক্ষেত্রেই পুরুষের তুলনায় নারীরা অধিকতর দরিদ্র। যদিও পুরুষের তুলনায় নারীদের দারিদ্রের এই সীমা অতিক্রমের প্রচেষ্টাও অব্যাহত আছে।

বিদ্যমান সীমা অতিক্রমের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক নারীর দারিদ্র দূরীকরণের লক্ষ্য অর্জনের জন্য বাংলাদেশের জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালায় নিম্নের কৌশল সমূহ গ্রহণ করা হয়েছে–

- হত দরিদ্র নারীদের সামাজিক নিরাপত্তা বলয়ে অন্তর্ভুক্ত করা, বিধবা ও দুস্থ মহিলা ভাতা প্রণয়ন, বয়স্ক, প্রতিবন্ধী, ও মাতৃত্বকালীন ভাতা প্রণয়ন ও বিত্তহীন মহিলাদের খাদ্য নিরাপত্তা কর্মসূচী (ভিজিডি) অব্যাহত রাখা;
- দরিদ্র নারী শ্রমশক্তির দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে তাদের সংগঠিত করা ও প্রশিক্ষনের মাধ্যমে নতুন এবং বিকল্প অর্থনৈতিকও সামাজিক সুযোগ সৃষ্টি করা;
- দরিদ্র নারীকে উৎপাদনশীল কাজে এবং অর্থনৈতিক মূলধারায় সম্পৃক্ত করা;
- অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষা সহ নারীর সকল চাহিদা পূরনের লক্ষ্যে জাতীয় বাজেট বৃদ্ধি করা;
- জাতিসংঘের সংশ্লিষ্ট সংস্থা, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলোকে নারীর দারিদ্র দূরীকরনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনে সহায়তা দান ও অনুপ্রাণিত করা।[৫৮]

এই লক্ষ্যে বাংলাদেশ নিম্নে বর্ণিত বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় সরাসরি দরিদ্র জনগণের উপকারে আসে এমন বাস্তব জেন্ডার চাহিদা ভিত্তিক এবং কর্ম সংস্থানের সুযোগ সহ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন সংক্রান্ত কৌশলগত জেন্ডার চাহিদা ভিত্তিক কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে দারিদ্র নিরসনের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে-

১. <u>আশ্রয়ন প্রকল্প</u>

প্রধান মন্ত্রীর কার্যালয় থেকে পরিচালিত আশ্রয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে প্রান্তিক পরিবারের জন্য জমি, বাসস্থান, প্রশিক্ষণ, ঋণ, স্বাস্থ্য সেবা, পরিবার পরিকল্পনা, আয়বর্ধক কার্যক্রম ইত্যাদির মাধ্যমে প্রায় ৫৯,০০০ ভূমিহীন, গৃহহীন, ছিন্নমূল ও প্রান্তিক পরিবার পুনর্বাসিত হয়েছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রীর যৌথ নামে সম্পদ ও সেবা প্রদান করা হয় বলে এর মাধ্যমে উপকারভোগীর অর্ধেকই নারী। নারীর অনুকুলে সম্পদ বরাদ্দের সুবিধা

[৫৭].Bangladesh Burue of Statistics (BBS) ঃ Household Income and Expenditure Survey 2010 .

[৫৮]. পূর্বোক্ত,পৃঃ ১৮।

থাকায় এর কার্যক্রম নারীর নিরাপত্তা, মর্যাদা, ক্ষমতায়ন এবং কর্মসংস্থানের সহায়ক।[৫৯] সমাজ সেবা অধিদপ্তর কর্তৃক এই প্রকল্পের ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকে।[৬০]

২. দরিদ্র মা'র জন্য মাতৃত্বকাল ভাতা

পল্লী অঞ্চলের দরিদ্র, গর্ভবতী মায়েদের অসহায়ত্বের বিষয়টি বিবেচনা করে তাদের দুঃখ দুর্দশা লাঘবের জন্য 'দরিদ্র মা-র জন্য মাতৃত্বকালভাতা' কর্মসূচি একটি উল্লেখ যোগ্য কর্মসূচি। ২০০৭-৮ অর্থবছর থেকে শুরু করে এই কার্যক্রম অদ্যাবধী চলছে। এ কর্মসূচির উদ্দেশ্য হলো দরিদ্র মা ও শিশু মৃত্যু হার হ্রাস এবং মাতৃদুগ্ধ পানের হার বৃদ্ধি করা। নির্বাচিত ভাতা ভোগীদের গর্ভকালীন সময় থেকে বাচ্চা প্রসবের পর ২(দুই) বৎসর সময় কাল পর্যন্ত এই ভাতা প্রদান করা হয়। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের আওতায় পল্লী অঞ্চলের দরিদ্র মানচিত্র অনুযায়ী মোট ৪,৫৪৩ টি ইউনিয়নের মধ্যে প্রতিটি ইউনিয়নের প্রত্যেকটিতে কম পক্ষে ৪৭ থেকে ৪৮ জন করে মোট ১,১৬,৩৮০ জন দরিদ্র গর্ভবতি মা'য়েদের প্রত্যেককে মাসিক ৩৫০ টাকা হারে দুই বছরের জন্য অনুদান প্রদান করা হয়েছে। এই অর্থবছরে মোট ৪৮,৮৭,৯৬,০০০(আটচল্লিশ কোটি সাতাশি লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। আর ২০১৪ - ১৫ অর্থবছরের জন্য জন প্রতি ৫০০ টাকা করে মোট ২ লক্ষ ২০ হাজার দরিদ্র মা'য়েদের মাসিক ৫০০ টাকা হারে মোট ১৪২,৬২,৬০,০০০ (একশত বিয়াল্লিশ কোটি ৬২ লক্ষ ৬০ হাজার) টাকা ভাতা প্রদান করা হয়েছে। ।[৬১] (২০১৩-১৪ এবং ২০১৪-১৫ অর্থবছরে দরিদ্র মা'র জন্য মাতৃত্বকালভাতা' কর্মসূচির বাজেট বরাদ্দের অনুলিপি পরিশিষ্ট ১৭ এবং পরিশিষ্ট ১৮ এ সংযুক্ত)।

৩. শহর এলাকার কর্মজীবি দুগ্ধদাত্রী মায়েদের জন্য অনুদান

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের আওতায় এই প্রোগ্রামের বেশীর ভাগ উপকারভোগী হ'ল শহর এলাকায় গার্মেন্টস এর নারী শ্রমিকেরা। সরকারের এই প্রোগ্রামের সঙ্গে বাংলাদেশ নীটওয়ার ম্যানুফেকার্স এন্ড এক্সপোর্টস এ্যাসোসিয়েশন (BKMEA) এবং বাংলাদেশ গার্মেন্টস ম্যানুফেকচারিং এক্সপোর্টস এ্যাসোসিয়েশন (BGMEA) সম্পৃক্ত রয়েছে। বছরে ২ কিস্তিতে ৬ মাস পর পর এই ভাতা প্রদান করা হয়ে থাকে। মাথা পিছু ৩৫০ টাকা করে ২০১০ অর্থবছর থেকে সরকার কর্তৃক ৩০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয় । শহর এলাকার সদ্য জন্ম দেয়া শিশুদের কর্মজীবি দুগ্ধদাত্রী মায়েদের এই অনুদান প্রদান করা হয়। ২০১২-১৩ অর্থবছরে ৭৭,৬০০ জন কর্মজীবি ল্যাকটেটিং মা'দের এই ভাতা **(Lactating Mother Allowance)** প্রদান করা হয়েছে।[৬২]

---

[৫৯]. মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো (২০১২-১৩ হতে ২০১৬-১৭) : অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রনালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, পৃঃ ১৩২।

[৬০].সমাজ সেবা দপ্তরের বার্ষিক প্রতিবেদন - জাতীয় সমাজ সেবা দিবস-২০১৩, সমাজ সেবা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা -১২০৭, পৃঃ ০৬।

[৬১].মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১১ - ২০১২, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১২১ এবং মহিলা অধিদপ্তরের ভাতা প্রদান সংক্রান্ত শাখা থেকে সংগৃহিত তথ্য মতে। (পরিশিষ্ট ১৭, ১৮ এ দরিদ্র মা'র জন্য মাতৃত্বকালভাতা' কর্মসূচির বাজেট বরাদ্দের অনুলিপি।)

[৬২]. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১২১ -১২২ এবং মহিলা অধিদপ্তরের ভাতা প্রদান সংক্রান্ত শাখা থেকে সংগৃহিত তথ্য মতে।

২০১৩ -১৪ অর্থবছরে ৮৫,৮০২ জনকে এবং ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ১০,০০০০(দশলক্ষ) জনকে এই অনুদান প্রদান করা হয়। বর্তমানে এই অনুদানের পরিমান মাথাপিছু ৫০০ টাকা করা হয়েছে।[৬৩]

(পরিশিষ্ট ১৯ এবং ১৯(ক), পরিশিষ্ট ২০ এবং ২০(ক) এ কর্মজীবি ল্যাকটেটিং মা'দের বাজেট বরাদ্দ সংক্রান্ত এবং বরাদ্দ প্রাপ্ত কার্ডধারী উপকারভোগীর সংখ্যার তালিকার অনুলিপি)।

৪. বিত্তহীন মহিলাদের খাদ্য নিরাপত্তা কর্মসূচি (Vulnerable group development) তথা ভিজিডি (VGD) কার্যক্রম

বিত্তহীন মহিলাদের খাদ্য নিরাপত্তা কর্মসূচি তথা ভিজিডি কার্যক্রমটি বাংলাদেশ সরকারের একটি সর্ববৃহৎ সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি (Safety net programme)। মহিলা বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের সহায়তায় পল্লী বাংলার হত দরিদ্র নারীদেও (যারা পরিবার প্রধান, বিধবা অথবা স্বামীর নিকট হতে বিচ্ছিন্ন, স্বামী পরিত্যাক্তা, তালাকপ্রাপ্ত, কিংবা অসুস্থ কর্মক্ষমতাহীন পঙ্গু স্বামীর স্ত্রী, ভুমিহীন বা ০.১৫ একরের চেয়ে কম জমির মালিক, কোন রকম পারিবারিক আয়ের উৎস নেই, দিনমজুর এবং ১৮ থেকে ৪৫ বৎসর বয়সের), তাদেরকে খাদ্য সহায়তা প্রদানের জন্য এটি একটি জাতীয় কর্মসূচি, যার ব্যাপ্তি সমগ্র বাংলাদেশ।

এই কর্মসূচির মাধ্যমে ২৪ মাসের প্রতি চক্রের জন্য ৭, ৫০,০০০(সাতলক্ষ পঞ্চাশ হাজার) দুঃস্থ মহিলাকে প্রতিমাসে ৩০ কেজী করে চাল/গম বিতরণ করা হয়। ৩টি পার্বত্য জেলার ২৫টি উপজেলায় মাথাপিছু ৩০ কেজী করে আতপ চাল বিতরণ করা হয়। পরিশিষ্ট ২১এ ২০১৩ -১৪ এবং ২০১৪ -১৫ অর্থ বছরে ২৭৫০০০ মেট্রিকটন করে খাদ্য সাহায্যের অনুকূলে যথা ক্রমে ৮৩৬ কোটি ৭৭ লক্ষ০২হাজার হাজার টাকা এবং ৮৮৬ কোটি ৯২ লক্ষ ২২ হাজার টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়।[৬৪] (পরিশিষ্ট ২১ - ভিজিডি কার্যক্রমের আওতায় বাজেট বরাদ্দের অনুলিপি)।

ভিজিডি কার্যক্রমের আওতায় সংশ্লিষ্টদের Reproductive Health, আত্ম কর্মসংস্থান এবং আয় বর্ধন মূলক কার্যক্রমে অংশ গ্রহনের লক্ষ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এনজিও নির্বাচন করা হয়।[৬৫] বর্তমানে ২৭৭টি এনজিও প্রতিষ্ঠান এই কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে।[৬৬] এনজিও প্রতিষ্ঠান স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তায় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকেন। একই সাথে প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের প্রতিমাসে ৪০/- টাকা করে ব্যক্তিগত সঞ্চয় হিসেবে সঞ্চয় করানো হয়। যে সঞ্চয় দিয়ে বছর শেষে তাদেরকে হাঁস- মুরগী, ছাগল ইত্যাদি কিনে দেয়া হয় কিংবা সেলাই কাজের সুবিধা করে দিয়ে আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য বিভিন্ন আয়বর্ধক কাজের ব্যবস্থা করে দেয়া হয়।

৫. দারিদ্র নিরসনের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম

[৬৩].পূর্বোক্ত, পৃঃ ১২১ -১২২ এবং মহিলা অধিদপ্তরের ভাতা প্রদান সংক্রান্ত শাখা থেকে সংগৃহিত তথ্য মতে। (পরিশিষ্ট ১৯, ১৯ (ক) এবং ২০, ২০(ক) কর্মজীবি ল্যাকটেটিং মা'দের অনুদান প্রদান সংক্রান্ত বাজেট বরাদ্দ এবং বরাদ্দপ্রাপ্তদের সংখ্যা সংক্রান্ত তালিকার অনুলিপি সংযুক্ত)

[৬৪].মহিলা অধিদপ্তরের ভাতা প্রদান সংক্রান্ত শাখা থেকে সংগৃহিত তথ্য। পরিশিষ্ট ২১ - ভিজিডি কার্যক্রমের আওতায় বাজেট বরাদ্দের অনুলিপি।

[৬৫].পূর্বোক্ত পৃঃ ১২১ -১২২ এবং মহিলা অধিদপ্তরের ভাতা প্রদান সংক্রান্ত শাখা থেকে সংগৃহিত তথ্য মতে।

[৬৬].মহিলা অধিদপ্তরের ভাতা প্রদান সংক্রান্ত শাখা থেকে সংগৃহিত।

দরিদ্র ও অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি দারিদ্র বিমোচনের কৌশল হিসেবে (PRS) হিসেবে স্বীকৃত। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের ৬৪ টি জেলার আওতাধীন ঋণ কর্মসূচির মাধ্যমে বিভিন্ন কর্মসূচি যেমন সেলাই মেশিন ক্রয়, গরু-ছাগল ও হাঁস-মুরগী পালন, ক্ষুদ্র ব্যবসা, মৎস চাষ, নার্সারী ইত্যাদি বিষয়ে সহায়তা প্রদান করা হয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ৫ ধরনের ঋণ কার্যক্রম হলো -মহিলাদের আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি, দু:স্থ মহিলাদের পুনর্বাসন ও কল্যানের জন্য প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ তহবিল, উৎপাদনমুখী কর্মকান্ডে মহিলাদের সম্পৃক্তকরণের লক্ষ্যে ঘূর্ণায়মান ঋণ, জনসংখ্যা কার্যক্রম শীর্ষক সমাপ্ত

উন্নয়ন প্রকল্পের (আইডিএ) ঋণ, গ্রামীন মহিলাদের কর্মসংস্থান ও অব্যাহত উন্নয়নের জন্য প্রযুক্তি প্রকল্পের ঋণ। এই ঋণ থেকে মহিলারা ক্ষুদ্র ব্যবসা, গরু ছাগল প্রতিপালন ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।[৬৭]
(পরিশিষ্ট ২২, ২২(ক,খ) ক্ষুদ্র ঋণ এর আওতায় পরিচালিত কার্যক্রম এবং আর্থিক সংশ্লিষ্টতার বিবরণ সংযুক্ত)।

৬. বিধবা এবং স্বামী পরিত্যাক্তা মহিলাদের ভাতা

সমাজ সেবা অধিদপ্তরের আওতায় এ প্রোগ্রামের অধীনে উপকারভোগীর সংখ্যা ৯ লক্ষ ২০ হাজার জন। এ প্রোগ্রামের আওতায় অগ্রাধিকার প্রাপ্তরা হলেন- দুঃস্থ ও বয়স্ক মহিলা, দু'সন্তানের মা ও দুঃস্থ মহিলা, বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তা, অক্ষম ও তালাকপ্রাপ্ত মহিলা।এর আওতাধীন উপকারভোগীরা প্রতি মাসে ৩০০ টাকা হারে ভাতা পেয়ে থাকেন।

বাংলাদেশে এই কার্যক্রমটি শুরু হয় ১৯৯৮ -৯৯ অর্থবছরে সমাজকল্যান মন্ত্রনালয়ের আওতায়।২০০৩ - ০৪ অর্থ বছরে এটি মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের অধীন মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের আওতায় পরিচালিত হতে থাকলেও ২০১০ -১১ অর্থবছরে পুনঃ সমাজকল্যান মন্ত্রনালয় বিষয়টি গ্রহণ করে। এটি একটি চলমান কার্যক্রম। এই পোগ্রামের আওতায় উপকার ভোগীর সংখ্যা বাড়িয়ে ২০১২-১৩ অর্থবছর থেকে ২০১৩-১৪ এ ১০ লক্ষ ১৫ হাজার জনে এবং ২০১৪-১৫ এ ১২ লক্ষ ৭৫ হাজার জনে উত্তীর্ন করা হয়েছে।[৬৮]

৭. বয়স্ক ভাতা

সমাজ সেবা অধিদপ্তরের বয়স্ক ভাতা কর্মসূচির আওতায় ২৪.৭৫ লক্ষ বয়স্ক ব্যক্তি ৩০০ টাকা হারে আর্থিক সহায়তা পেয়ে থাকেন এর মধ্যে ৫০% ভাগ উপকার ভোগী নারী। একটি পৌরসভা বা ইউনিয়নের জনসংখ্যার আনুপাতিক হারে এই পোগ্রামের উপকারভোগী নির্বাচন করা হয়। সাধারনত ৬৫ বছরের উর্ধ্ব বয়সীদের অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়। এছাড়া বয়স্ক ভূমিহীন, দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী ও মানসিকভাবে প্রতিবন্ধী নারী-পুরুষ এ প্রোগ্রামের আওতায় বিশেষভাবে বিবেচিত হন।[৬৯]

৮. অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা

সমাজ সেবা অধিদপ্তরের এ প্রোগ্রামের আওতায় বর্তমানে ২.৮৬ লক্ষ উপকারভোগী রয়েছে। দরিদ্র ও প্রতিবন্ধী যাদের বার্ষিক আয় ৬,০০০ টাকার নিচে এবং বয়স ৩০ বছরের উপরের নারী/পুরুষ এর আওতায় ভাতা প্রাপ্য হন।[৭০]

---

[৬৭].পূর্বোক্ত পৃঃ ১২১। (পরিশিষ্ট ২২, ২২(ক,খ) এ এই ক্ষেত্রে পরিচালিত কার্যক্রম এবং আর্থিক সংশ্লিষ্টতার বিবরণ সংযুক্ত)।

[৬৮].জাতীয় সমাজ সেবা দিবস-২০১৩ (বার্ষিক প্রতিবেদন), সমাজ সেবা অধিদপ্তর, পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ৮, মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো (২০১২-১৩ হতে ২০১৬-১৭) ঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রনালয়,পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ৪৬১ ।

[৬৯].পূর্বোক্ত, পৃঃ ৯ এবং ৪৬২।

[৭০]. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৯ এবং ৪৬৩

Dhaka University Institutional Repository

৯. সরকারী বেসরকারী এতিমখানায় বসবাসরতদের বিশেষ অনুদান

সমাজ সেবা অধিদপ্তরের আওতায় সরকারি শিশু পরিবার এবং অন্যান বেসরকারি এতিমখানায় বসবাসরত এতিম ছেলে মেয়েরা এই অনুদান পেয়ে থাকে মোট ৬৪,০০০ এতিম এ কর্মসূচি উপকার ভোগী দরিদ্র পরিবারের ৬ থেকে ৯ বছর বয়সী এতিম মাসে ১,৫০০ টাকা করে অনুদান পেয়ে থাকে।[৭১]

১০. ভূমি মন্ত্রনালয়েয় কর্তৃক হত দরিদ্র নারীদের সামাজিক সুরক্ষার জন্য কার্যক্রম

ভূমি মন্ত্রণালয় ব্যয়ের অগ্রাধিকার ও পরিমাণ বিবেচনায় নারী উন্নয়নের উপর কয়েকটি খাতকে অগ্রাধিকার খাত হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ২০১১-১২ অর্থবছরে অগ্রাধিকার প্রাপ্ত ব্যয়ের ক্ষেত্র সমূহ ও নারী উন্নয়নের উপর উক্ত খাতসমূহের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব সারণী - ৬ এ দেখানো হ'ল-

সারণী - ৬

ভূমি মন্ত্রনালয় সংশ্লিষ্ট বাজেটে সর্বোচ্চ বরাদ্দকৃত নারীবান্ধব কার্যক্রমসমূহ

অগ্রাধিকার সম্পন্ন ব্যয় খাত/কর্মসূচি সমূহ	নারী উন্নয়নের উপর প্রভাব (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ)
১.ভূমি রেকর্ড কম্পিউটারাইজেনঃ সনাতন পদ্ধতিতে ভূমি রেকর্ড প্রণয়ন ও সংরক্ষণ করার অস্বচ্ছতা এবং জটিলতা দূরীকরণ এবং ভূমি ব্যবস্থাপনা আধুনিকায়ন করার জন্য ভূমি রেকর্ড কম্পিটারাইজড করাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে।	ভূমি রেকর্ড আধুনিকায়নের ফলে মালিকানা রেকর্ডে মহিলাদের নাম অন্তর্ভুক্ত হবে এবং সম্পত্তির উপর নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে। এতে নারী আর্থিক ভাবে উপকৃত হবে এবং তাদের সামাজিক নিরাপত্তা বৃদ্ধি পাবে।
২.খাস জমি বন্দোবস্ত প্রদানঃ দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচি বিধায় অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে।	প্রতিটি পরিবারের স্বামী এবং স্ত্রীর নামে বা পুত্র ও মায়ের নামে কৃষি জমি বন্দোবস্ত প্রদান পূর্বক তাদের নামে কবুলিয়ত রেজিষ্ট্রি করা হয়। ২০০৯-১০ অর্থবছরে এরূপ ৪৫৪৬৭টি পরিবারকে কৃষি জমি বন্দোবস্ত প্রদান করা হয়েছে। এভাবে সম সংখ্যক দরিদ্র নারী খাসজমির মালিক হয়েছে।
৩.গৃহ ও ফ্ল্যাট প্রদানঃ দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচি বিধায় অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে।	গুচ্ছগ্রাম(সি.ভি.আর.পি)প্রকল্পের অধীনে স্বামীও স্ত্রীর নামে গৃহ নির্মাণ সহ জমির কবুলিয়ত দলিল প্রদান করা হয়। এই প্রকল্পের অধীনে ১৮৪৫জন মহিলাকে গৃহ নির্মাণ সহ জমির কবুলিয়ত সম্পাদন করে দেয়া হয়েছে। পিপিপি-র আওতায় ঢাকা মহানগরীর ছিন্নমূল, বস্তিবাসী ও নিম্নবিত্ত পরিবারের পুনর্বাসনের জন্য সরকারী জমিতে ১২৫০টি ফ্ল্যাট এর জন্য ৬৫০টি আবেদন সঠিক পাওয়া গেছে, যার মধ্যে ৩৫০ জন মহিলা অর্থাত মোট ফ্ল্যাটের বরাদ্দের ৫০% এর ও বেশী মহিলারা বরাদ্দ পাচ্ছেন। ছিন্নমূল, ভূমিহীনও বস্তিবাসী অতিদরিদ্র পরিবারকে বন্দোবস্তকৃত গৃহ ও জমির দলিলে স্বামী ও স্ত্রী দুজনেরই নাম থাকায় সম্পত্তির উপর নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় এবং নারীদের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়।[৭২]

[৭১].পূর্বোক্ত, পৃঃ ১০ এবং ৪৬৪।

[৭২]. জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদন ২০১১-১২, পৃঃ ৮১।

উপরে বর্ণিত বিশাল কার্যক্রমের ফলে বাংলাদেশে দারিদ্রসীমা সহনীয় পর্যায়ে রয়েছে। তবে দারিদ্রতার হাত থেকে বাংলাদেশের নারীদের মুক্তি ঘটেছে তা এখনও বলা যায়না। কারণ বাংলাদেশে দারিদ্রতা পর্যবেক্ষণ ও নীরিক্ষণ সংক্রান্ত কার্যক্রম এখনও নারী-পুরুষ ভিত্তিক করা সম্ভব হয়নি। সামাজিক এবং অর্থনৈতিক নীতির ভিত্তিতে মহিলাদের উপর কোন ধরনের প্রভাব/ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে, তা নির্ধারণের জন্য কোন নিরীক্ষণ প্রক্রিয়াও অদ্যাবধি তৈরী হয়নি। আবার সম্পদ ও জমির উপর মালিকানা ও নিয়ন্ত্রন এখনও প্রধানতঃ পুরুষের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত। সীমিত জ্ঞান ও সম্পদের কারণে এবং তথ্য সংগ্রহ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে অপরিণামদর্শীতার কারণে এখনও প্রত্যন্ত এলাকায় নারীরা যথেষ্ট অনগ্রসর এবং তারা দারিদ্র সীমার মধ্যেই বিদ্যমান।[৭৩]

৪.৩.৪ শিক্ষা - ক্ষেত্রে নারীদের জন্য পুরুষের সমান সুযোগ সৃষ্টি

সিডও সনদের অনুচ্ছেদ - ১০ এ শিক্ষাক্ষেত্রে সমান অধিকার, বেইজিং ঘোষণার ২নং ঘোষণায় নারী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের এবং এমডিজির ২ নং গোল এ সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা হিসেবে কার্যক্রম গ্রহণের প্রস্তাব রয়েছে। এ সব প্রস্তাবকে লক্ষ্য রেখেই বাংলাদেশের 'জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি মালা' য় নিম্নোক্ত কৌশল সমূহ নির্ধারণ করা হয়েছে-

- নারী শিক্ষা বৃদ্ধি, নারী পুরুষের মধ্যে শিক্ষার হার ও সুযোগের বৈষম্য দূর করা এবং উন্নয়নের মূল ধারায় নারীকে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে শিক্ষা নীতি ২০১০ অনুসরণ করা;
- নারীর নিরক্ষরতা দূর করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা, বিশেষতঃ কন্যা শিশু ও নারী সমাজকে কারিগরী, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সহ সকল বিষয়ে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদানের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা;
- কন্যা শিশুদের শিক্ষায় অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উপবৃত্তি প্রদান অব্যাহত রাখা;
- মেয়েদের জন্য স্নাতক পর্যন্ত পর্যন্ত শিক্ষা অবৈতনিক করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা।[৭৪]

তদনুসারে বাংলাদেশে বর্তমানে শিক্ষা ক্ষেত্রে মেয়েদের অংশ গ্রহণের উপর যথেষ্ট উদ্যোগ পরিলক্ষিত হচ্ছে। ফলে এ ক্ষেত্রে নিম্নের অগ্রগতিও সাধিত হয়েছে ।

১. প্রাথমিক শিক্ষা

বাংলাদেশ সংবিধানের ১৭ অনুচ্ছেদে আইন দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদান এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করার উদ্দেশ্যে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহনের উল্লেখ রয়েছে। তৎপ্রেক্ষিতে ১৯৯০ সালের প্রাথমিক শিক্ষা (বাধ্যতামূলক করণ) আইনের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। প্রাথমিক ও গণ শিক্ষা মন্ত্রনালয় ২০১১ সালের মধ্যে ভর্তি উপযোগী সকল

[৭৩].Bangadesh Report ঃ The implementation of the Beijing Declaration and Platform for action (1995) and the outcomes of the Twinty- third special Session of the General Assembly(2000) , Ministry of Women and Children Affairs , Govt.of the peoples Republic of Bangladesh, May,2014 . P.17.

[৭৪].জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৭।

শিশুকে স্কুলে ভর্তি নিশ্চিতকরণ ও মিলিনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল এর আলোকে ২০১৫ সালের মধ্যে জাতীয়ভাবে নিম্নবর্ণিত জেন্ডার গোল বা লক্ষ্য সমূহ অর্জনের অঙ্গীকার ঘোষণা করেছে-

- প্রাথমিক স্কুলে যাবার বয়েসী সকল বালক - বালিকার জন্য সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করণ;
- প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় জেন্ডার বৈষম্য দূরীকরণ।[৭৫]

বাংলাদেশ তার জাতীয় প্রেক্ষিতের বিবেচনায় শিক্ষানীতি - ২০১০ এর ২য় ও ৩য় অধ্যায়ে প্রাক - প্রাথমিক শিক্ষা ও প্রাথমিক শিক্ষা এবং বয়স্ক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার ক্ষেত্রে অনুসৃতব্য নীতি ও কৌশল স্থির করেছে। এ নীতির উল্লেখযোগ্য নারী বান্ধব বৈশিষ্ট্য সমূহ হ'ল-

- দেশের সকল শিশুর জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টি করা;
- প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা সার্বজনীন, বাধ্যতামূলক, অবৈতনিক এবং
- সকলের জন্য একই মানের করা;
- দরিদ্র ছেলেমেয়েদের জন্য উপবৃত্তির আওতা সম্প্রসারণ করা;
- ছেলে ও মেয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য মানসম্মত পৃথক টয়লেটের ব্যবস্থা করা;
- পিছিয়ে পড়া এলাকা সহ গ্রামীন সকল বিদ্যালয়ে দূপুরে খাওয়ার ব্যবস্থা পর্যায়ক্রমে চালু করা;
- মেয়ে শিশুরা যাতে ঝরে না পড়ে সে দিকে বিশেষ নজর দেয়া;
- মেয়ে শিক্ষার্থীরা যেন বিদ্যালয়ে কোনভাবে উত্যক্ত না হয় তা নিশ্চিত করা;
- শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে মহিলা শিক্ষকদের প্রাধান্য দেয়া;
- বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা সহ প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিদ্যালয় স্থাপন করা।[৭৬]

উল্লেখিত নীতি সমূহ বাস্তবায়নের ফলে প্রাথমিক স্তরে ছাত্রী ভর্তির হার বাড়ছে।

নিম্নের সারণী ৭ ও ৮ এ প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে ছাত্র ছাত্রী ভর্তি ও সমাপ্তির অবস্থান দেখানো হ'ল - সর্বমোট এবং শতকরা হার সহ-

সারণী ৭

শিক্ষা স্তরে ভর্তির সুবিধা প্রাপ্ত ছাত্রীর সংখ্যা ২০১০-২০১১

	২০১০			২০১১		
	সর্বমোট	ছাত্রীর সংখ্যা	শতকরা হার	সর্বমোট	ছাত্রীর সংখ্যা	শতকরা হার

[৭৫]. জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদন(২০১১-১২) ঃ অর্থবিভাগ, অর্থ মন্ত্রনালয়, পূর্বোক্ত,পৃ ঃ ৭- ১৩।

[৭৬].পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ০৭-০৮

সরকারীপ্রাথমিক বিদ্যালয়	৯৮৮৫৬৯৭	৫০৬১১৬৫	৫১.২	১০৬৮৭৩৪৯	৫৪৫০৬৩৮	৫১.০
রেজিস্টার্ড বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৬৪৩৯২৫	১৮৩৬৭৯৬	৫০.৪	৩৮৩৮৯৩৯	১৯৩৬১১৫	৫০.৪
নন রেজিষ্টার্ড বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১০২৯২১	৬৫০৯৭৫	৪৯.৫	২২৩২৯৫	১১১৪৭৯	৪৯.৯
পরীক্ষামূলক স্কুল	৯০৮০	৪৫৫৬	৫০.২	১০০৭২	৪৯৩৪	৪৯.০
কমিউনিটি স্কুল	৪৬০৫৩৩	২৩২৪০৬	৫০.৫		২৩৩৬৮৮	৫০.৫
কিন্ডারগার্টেন স্কুল	৫১৫৯৯২	২২৭৯২৩	৪৪.২	১২২৭২৩৯	৫৪৫৯৭৭	৪৪.৫
এনজিও স্কুল	৪১১০৬	২০৭০৭	৫০.৪	১৪২৬১৮	৭৫৪৪০	৫২.৯
এবতেদায়ী মাদ্রাসা	২৪৩২১২	১২৬৩৬৬	৫২.০	৩০৯৪৭৯	১৫২৫৫৭	৪৯.৩
এবতেদায়ী মাদ্রাসায় প্রাথমিক সেকশন	১৭১৯২২৮	৮৩০১৯৪	৪৮.৩	৭৪৭৩২১	৩৬৫৮৫৬	৪৯.০
উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রাথমিক সেকশন	২৮২৮৫৩	১৪৫৪৯৮	৫১.৪	৫০৬১৮৩	২৫৫৫৩৬	৫০.৫
ব্রাক সেন্টার	–	-	-	১৪৯৮৫২	৯৩৩৩৯	৬২.৩
রস্ক	-	-	-	৭৩৫৬৬	৩৭২৭৬	৫০.৭
শিশু কল্যান	-	-	-	৭৭৩১	৪২৪৬	৫৪.৯
সর্বমোট	১৬৯০৪৫৪৭	৮৫৩৬৫৮৬	৪৯.৮	১৮৪৩২৪৯৯	৯২৯৩৩১৯	৫০.৪[৭৭]

সারণী
প্রাথমিক শিক্ষাস্তর সমাপ্তকারী ছাত্রছাত্রীর হার

[৭৭].Bangladesh Bureau of Statistics (BBS) ঃ (Bangladesh Bureau of Educational Information and Statistics (BANBEIS) - ২০০৯ - ২০১২, Ministry of education, পৃ ঃ ২১, ২২এবং জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদন (২০১৩ -১৪), অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রনালয়, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৮।

বছর	ছাত্র	ছাত্রী
২০০৫-০৬	৫১.৭	৫৬.৭
২০০৬-০৭	৪৭.১	৫৩.৩
২০০৭-০৮	৪৮.৯	৫৪.৯
২০০৮-০৯	৫২.৯	৫৭.০
২০০৯- ১০	৫৭.১	৬২.২
২০১০-১১	৫৯.৭	৬০.২
২০১১ -১২	৬৭.৬	৭৩.০[৭৮]

বালক বালিকাদের প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণ সংক্রান্ত এমডিজির শর্তের উপর গুরুত্বারোপ পূর্বক বিগত দশকে সরকারী বেসরকারী ভাবে বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। দেখা যাচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষায় ৫০.৪% কন্যা শিশু শিক্ষা লাভ করছে (সারণী-৭)। আরও দেখা যাচ্ছে ২০১১-১২ তে এসে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেছে ৭৩.০% ছাত্রী (৮ - সারণী) । এটিও একটি অগ্রগতি।

এই অগ্রগতি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৬০% মহিলা শিক্ষক নিয়োগের ফলশ্রুতি বলে প্রতীয়মান হয়। কারণ শিশু বালিকারা সম্ভবতঃ স্কুলে মায়ের মত শিক্ষক দেখে সহজেই স্কুলে যেতে আগ্রহী হয়ে থাকে। এছাড়া বেতন দিতে না হওয়া, নাস্তা খেতে পাওয়া, বিনামূল্যে বই-খাতা বিতরণ ইত্যাদিও প্রাইমারী পর্যায়ে ছাত্রী সংখ্যা বাড়ানোর পেছনে কাজ করছে বলে প্রতীয়মান হয়। ফলে এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে।

তবে প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে ভর্তি এবং সমাপ্তির হার থেকে দেখা যায় যে, ২০১০ এ ঝরে পড়েছে ৪০.৩% ছাত্র এবং ৩৯.৩% ছাত্রী ।[৭৯] আর পঞ্চম শ্রেণীতে টিকে গেছে ২০১০-১১ এবং ১১-১২ এ যথা ক্রমে ৬৫.৯% , ৭৭.০% ছাত্র এবং ৬৮.৬% এবং ৮২.১% ছাত্রী। প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে ছাত্রীদের টিকে থাকার হার বাড়ছে। কিন্তু ঝরে পড়া বন্ধ হচ্ছে না। অর্থাৎ শিক্ষা ক্ষেত্রে নারী বান্ধব নীতি গ্রহণ করার পরও প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পেলেও ঝরে পড়া বন্ধ হয়নি।

২. মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, কারিগরি, উচ্চশিক্ষা

[৭৮]. জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদন (২০১১-১২) ঃ পূর্বোক্ত এর প্রাথমিক ও গণ শিক্ষা মন্ত্রনালয় সংক্রান্ত তথ্য থেকে, পৃ ঃ ৭-১৩।

[৭৯]. Bangladesh Bureau of Statistics (BBS) ঃ (Bangladesh Bureau of Educational Information and Statistics(BANBEIS) - ২০১১ Ministry of education, পৃঃ ২৩।

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষার ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়া মেয়েদের এগিয়ে এনে জেন্ডার সমতা অর্জনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক যে কৌশলগত লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে, তা হ'ল -

- কারিগরী, বৃত্তিমূলক, উচ্চ ও পেশাগত শিক্ষার ক্ষেত্রে ন্যয্যতা ও সমতা (Equity & equality) নিশ্চিতকরণ;

উক্ত কৌশলগত লক্ষ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক মাধ্যমিক এবং উচ্চতর পর্যায়ে মেয়েদের শিক্ষার জন্য গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রম হ'ল –

- মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষায় মেয়েদের অনুপ্রবেশ বৃদ্ধি এবং সুবিধাভোগীদের পরিবারে দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে সরকার মাধ্যমিক পর্যায়ে প্রতিবছর প্রায় ৩৯ লক্ষ ছাত্রীকে উপবৃত্তি এবং ৪.৮৩ লক্ষ (বেসরকারী) মহিলা শিক্ষককে এমপিও খাতে বেতন প্রদান করছে;
- মহিলাদের কারিগরী শিক্ষায় আকৃষ্ট করার জন্য তিনটি মহিলা কারিগরী পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট স্থাপন করা হয়েছে ;
- চট্টগামে 'এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উইমেন' শীর্ষক একটি আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করে একাডেমিক কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে;
- ক্রীড়া ক্ষেত্রে কিশোরী, যুবতীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি এবং নারীদের জন্য কম্পিউটার প্রশিক্ষন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে;
- সকল বেসরকারী শিক্ষক যাতে যোগ্য শিক্ষক হিসেবে নিবন্ধিত ও প্রত্যায়িত হতে পারে, সে লক্ষ্যে একটি বেসরকারী নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন সংস্থা (এনটিআরসিএ) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে;
- মাধ্যমিক পর্যায়ে নারী শিক্ষার উন্নয়ন ও নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধিতে সেকেন্ডারী এডুকেশন সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম(এসইএসডিপি) সহ বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে;
- সকল উপবৃত্তি কার্যক্রম সুবিধাভোগীর পরিমান ও উপবৃত্তির হার বৃদ্ধি করা হয়েছে।[৮০]

এই সব কার্যক্রম/ সুযোগ সুবিধার ফলেই বর্তমানে মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, কারিগরী ও উচ্চ শিক্ষার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বিদ্যমান মোট শিক্ষার্থীর প্রায় ৫০.১৮% মেয়ে শিক্ষার্থী ।[৮১]

সারণী ৯ এ মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক স্তরে ছেলে এবং মেয়েদের সমাপ্তির হার দেখানো হ'ল -

সারণী - ৯

শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে সমাপ্তকারী শিক্ষার্থীর শতকরা হার (২০১১)

শিক্ষার স্তর ও ধরণ	মোট শিক্ষার্থী	ছাত্র	ছাত্রী

৮০. জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদন (২০১১-১২) ঃ পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ১৬- ১৭।

৮১. জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদন (২০১৩-১৪) ঃ পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ১৪।

মাধ্যমিক স্তর স্কুল	৪৩.৭৫	৪৭.৭৮	৪০.১৬
মাধ্যমিক স্তর দাখিল	৫১.৫৭	৫৮.৭৫	৪৪.৩৩
উচ্চ মাধ্যমিক স্তর কলেজ/মাদ্রাসা	৭৪.৯২৩	৭৩ .৬৬	৭৪.৯৩[৮২]

সারণী ৯ এর মাধ্যমে লক্ষ্যনীয় যে মাধ্যমিক স্তরে মেয়েদের শিক্ষা সমাপ্তির হার ছেলেদের তুলনায় কম। তবে কেবলমাত্র উচ্চমাধ্যমিক স্তরে সমাপ্তির হার ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের সংখ্যা কিছু বেশী হলেও প্রায় কাছাকাছি।

নিম্নে সারণী -১০ এ শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে ঝরে পড়া শিক্ষার্থীর শতকরা হার (২০১১) দেখানো হ'ল -

সারণী -১০

শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে ঝরে পড়া শিক্ষার্থীর শতকরা হার (২০১১)

শিক্ষার স্তর ও ধরণ	মোট শিক্ষার্থী	ছাত্র	ছাত্রী
মাধ্যমিক স্তর স্কুল	৫৬,২৫	৫২.২২	৫৯.৮৪
মাধ্যমিক স্তর দাখিল	৪৮.৪৩	৪১.২৫	৫৫.৬৭
উচ্চ মাধ্যমিক স্তর কলেজ মাদ্রাসা	২৫.৭৭	২৬.৩৪	২৫.০৭ [৮৩]

এই সারণী দৃষ্টে মাধ্যমিক স্তরের স্কুল পর্যায়ে ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের ঝরে পড়ার হার অধিক। মাধ্যমিক স্তরেও মেয়েদের ঝরে পড়ার হার অধিক। কেবল মাত্র উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ - মাদ্রাসা স্তরে ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের ঝরে পড়ার হার কম হলেও তা প্রায় কাছাকাছি। তবে ঝরে পড়া তা ছেলে হোক কিংবা মেয়েরা হউক তা প্রতিরোধ হওয়া বাঞ্ছনীয়। আর সেজন্যই সরকার অক্ষম ছাত্র ছাত্রীদের জন্য শিক্ষামূলক বৃত্তিরও ব্যবস্থা করেছে । ২০১২ সালে মোট ২০,৯৬,৫৪৬ জন ছাত্রী এবং ৭,৬১, ৮৬৪ ছাত্র মাধ্যমিক পর্যায়ে উপবৃত্তি পেয়েছে।[৮৪]

৩. **সরকারী এবং বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা** নিচের ছকে ২০১২ সনে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং ভর্তি হওয়া ছাত্র -ছাত্রীর অবস্থান দেখানো হ'ল-

সারণী - ১১

[৮২].পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ২০।

[৮৩].পূর্বোক্ত, পৃঃ ২০।

[৮৪]. Bangadesh Report ঃ The implementation of the Beijing Declaration and Platform for action (1995) and the outcomes of the Twinty- third special Session of the General Assembly (2000), May, 2014, পূর্বোক্ত,.P.18.

সরকারী এবং বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০১২ সনের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা

বিশ্ববিদ্যালয়ের ধরণ এবং সংখ্যা	শিক্ষকের সংখ্যা				ভর্তি হওয়া ছাত্র ছাত্রী			
	সর্বমোট	শিক্ষিকা	শিক্ষক	% শিক্ষিকাদের	সর্বমোট	ছাত্রী	ছাত্র	% ছাত্রীদের
পাবলিক (৩৪)	৯৯৬২	১৯৩১	৮০৩১	১৯.৩৮	৩১৬৩৩১	১০৮৩৭৭	২০৭৯৫৪	৩৪.২৬
প্রাইভেট(৫২)	১০৬৮৩	২৭৮৪	৭৮৯৯	২৬.০৬	২৮০৮২২	৭০৯৭৭	২০৯৮৪৫	২৫.২৭
সর্বমোট (৮৬)	২০৬৪৫	৪৭১৫	১৫৯৩০	২২.৮৪	৫৯৭১৫৩	১৭৯৩৫৪	৪১৭৭৯৯	৩০.০৩ [৮৫]

দেখা যাচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষিকাদের তুলনায় শিক্ষকের সংখ্যা ২০ গুন বেশী আবার বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া ছাত্রের সংখ্যা ছাত্রীদের তুলনায় প্রায় দ্বিগুন বেশী । কবে কখন কিভাবে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে নারী পুরুষের সংখ্যা সমান হবে তা অনুমান করা কঠিন।

৪. অক্ষম ছাত্র/ছাত্রীদের শিক্ষামূলক বৃত্তি

মেধাবী ছাত্র ছাত্রীদের ৫ম, ৮ম. এসএসসি, এইচএসসি, অনার্স, মাষ্টার্স পর্যায়ে বৃত্তির বাইরেও সরকারী/বেসরকারী বিভিন্ন পর্যায়ে শিক্ষামূলক আরও বিভিন্ন রকমের বৃত্তির ব্যবস্থা রয়েছে। সমাজ সেবা অধিদপ্তরের আওতায় সকল পর্যায়ের অক্ষম /প্রতিবন্ধী ও দরিদ্র ছাত্রছাত্রীর জন্য বৃত্তিমূলক কর্মসূচির মাধ্যমে মাসিক প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যায়ে ২০০ টাকা, মাধ্যমিক পর্যায়ে ৩০০ টাকা, উচ্চ মাধ্যমিক ৪০০ টাকা এবং বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ছাত্রছাত্রীদের জন্য মাসিক ৬০০ টাকা হারে বৃত্তি প্রদান করা হয়।[৮৬] আবার ডাচ বাংলা ব্যাংক ও দরিদ্র মেধাবী ছাত্র ছাত্রীদের বৃত্তি প্রদান করে থাকে।

৫. সাম্প্রতিক সময়ে (২০১১) নারী শিক্ষার্থী এবং নারী সুবিধা ভোগীদের সংক্ষিপ্ত একটি চিত্র

- স্কুল পর্যায়ে মোট ভর্তিকৃত শিক্ষার্থী ৭৫,১০,২১৮ জন তন্মধ্যে মেয়েদের সংখ্যা ৪০,২৬,৩৭৪ জন (৫৩.৬১%)।
- কলেজ পর্যায়ে মোট ভর্তিকৃত শিক্ষার্থী ২৯,১৫,৮৫১ জন তন্মধ্যে মেয়েদের সংখ্যা ১৩,৮৩,৩৩৪ জন (৪৭.৪৭%)।
- মাদ্রাসা সমূহে মোট ভর্তিকৃত শিক্ষার্থী ২১,৯৭,৮৭৭ জন তন্মধ্যে মেয়েদের সংখ্যা ১১,৬৯,৯৪৪ জন (৫৩.২৩%);
- কারিগরি বৃত্তিমূলক পর্যায়ে মোট ভর্তিকৃত শিক্ষার্থী ৫,০৬,৫৫৬ জন তন্মধ্যে মেয়েদের সংখ্যা ১,৩৬,৮৫৩ জন (২৭.০২%);
- শিক্ষক শিক্ষনে মোট ৩৮,৬৯১ জন শিক্ষক-শিক্ষিকার মধ্যে শিক্ষিকার সংখ্যা ১৩,৮০২ জন (৩৫.৬৭%);
- পেশাগত শিক্ষায় মোট ৭০,৯৯৮ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ২৫,৮৫৬ জন (৩৬.৪২%) নারী শিক্ষার্থী;

---

[৮৫]. BANBEIS, Basic Education Statistics-2012

[৮৬]. জাতীয় সমাজ সেবা দিবস-২০১৩ (বার্ষিক প্রতিবেদন), সমাজ সেবা অধিদপ্তর, পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ৬-১২ এবং জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদন ২০১১-১২, পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ৩৩-৩৭।

- সরকারী বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে অধ্যয়নরত মোট ৫,৫৪,৬৭১ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে নারী শিক্ষার্থী ১,৬৬,২৭৭ জন(৩০%) [৮৭]।

বাংলাদেশের সরকার কর্তৃকই এটি স্বীকৃত যে, প্রত্যন্ত এলাকার অধিবাসীদের একটি বড়সংখ্যক ছাত্রছাত্রী পড়ালেখা শেখার পদ্ধতির বাইরে অবস্থান করছে, ঝরে পড়া এবং উচ্চহারে পুনরাবৃত্তির প্রক্রিয়ার একটি বিশাল হার প্রাথমিক এবং উচ্চতর পর্যায়ে শিক্ষার লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে একটি প্রধান বাধা, প্রাথমিক এবং উচ্চতর পর্যায়ে শিক্ষার মান একটি বড় চ্যালেঞ্জ, বিজ্ঞান গ্রুপে ছাত্র হ্রাস পাচ্ছে এবং মেয়েরা সেখানে সংখ্যায় কমে যাচ্ছে, ইংরাজী মাধ্যমে পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং অনিবন্ধিত ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে পরিসংখ্যান সংগ্রহ কঠিন কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে।[৮৮]

সার্বিক অবস্থা পর্যালোচনায় দেখা যাচ্ছে স্কুল তথা মাধ্যমিক স্তরে ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের ভর্তির হার অধিক তবে উচ্চ মাধ্যমিক (কলেজ) স্তরে তার বিপরীত। অর্ধেকের চেয়েও কম। মাদ্রাসা শিক্ষায় ছাত্রী ভর্তির হার বেড়েছে। অপর দিকে কারিগরী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় নারী ভর্তির হ্রাসমান হারের কারণে নারীরা দক্ষতা উন্নয়নে সক্ষম হচ্ছেনা। শিক্ষক শিক্ষনে এবং পেশাগত শিক্ষায় শিক্ষিকা এবং নারীশিক্ষার্থীর সংখ্যা পুরুষ শিক্ষক এবং নারী শিক্ষার্থীর সংখ্যা কম। একই সাথে উচ্চতর স্তরে বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষায় অধ্যয়ন ছাত্রীদের ভর্তির হার ছাত্রদের তুলনায় অনেক কম। আবার প্রত্যন্ত এলাকার অধিবাসীদের একটি বড়সংখ্যক ছাত্রছাত্রী পড়ালেখা শেখার পদ্ধতির বাইরে অবস্থান করছে।

তাহলে সার্বিক অবস্থা পর্যালোচনায় নারী শিক্ষার অবস্থা যথেষ্ট ভালো তা বলা সম্ভব নয়।

৪.৩.৫ কর্মক্ষেত্রে নারীর সমান অধিকার নিশ্চিত করে নারীর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা দৃঢ়করণ

সিডও সনদের অনুচ্ছেদ - ১৩ এর অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুযোগ সুবিধা ভোগে সমান অধিকার এবং বেইজিং ঘোষণা ও কর্মপরিকল্পনার ৪নং কৌশলগত লক্ষ্য হলো জাতীয় অর্থনীতির সকল কর্মকান্ডে নারীর সক্রিয় ও সমঅধিকার নিশ্চিত করা। বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ীও চাকরীর সুযোগ সৃষ্টি ও দারিদ্র দূরীকরণ রাষ্ট্রের মৌলিক দায়িত্ব। এই লক্ষ্য সমূহ অর্জনের জন্য জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ এ নারীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির নিম্নের কৌশল সমূহ স্থির করা হয়েছে -

- নারী শ্রমশক্তির শিক্ষিত ও নিরক্ষর উভয় অংশের কর্মসংস্থানের জন্য সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করা;

- চাকুরীর ক্ষেত্রে নারীর বর্ধিত নিয়োগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রবেশ পর্যায় সহ সকল ক্ষেত্রে কোটা বৃদ্ধি এবং কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা;

---

[৮৭].জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদন (২০১৩-১৪) ঃ পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ১৬-১৭।

[৮৮]. Bangadesh Report ঃ The implementation of the Beijing Declaration and Platform for action (1995) and the outcomes of the Twinty- third special Session of the General Assembly (2000), May, 2014, পূর্বোক্ত,.P.20..

- সকল নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানকে সরকার অনুসৃত কোটা ও কর্মসংস্থান নীতির আওতায় নারীকে সকল প্রকার সম-সুযোগ প্রদানের জন্য উদ্বুদ্ধ করা;

- নারী উদ্যোক্তা শ্রেণী গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিশেষ প্রশিক্ষণ ও ঋণ দান কর্মসূচি গ্রহণ করা;

- নারীর বর্ধিত হারে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ, অবস্থান ও অনগ্রসরতা বজায় রাখার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পরিবেশ গড়ে তোলা;

- নারীর ব্যাপক কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকল আইন, বিধি ও নীতির প্রয়োজনীয় সংস্কার করা।[৮৯]

এই কৌশল সমূহের আলোকে কর্মক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমান কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করার লক্ষ্যে নিম্নের কার্যক্রম সমূহ গৃহীত হয় -

১. **<u>নারীদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা দৃঢ় করার লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রম</u>**

- মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর কার্যালয় থেকে অন্যান্য কার্যক্রমের সাথে এন.জি.ও. এ্যাফেয়ার্স ব্যুরো, রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ এলাকা (E.P.Z) সংক্রান্ত কার্যাবলী সম্পাদন করা হয়। এনজিওদের বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচী বাস্তবায়নে সহায়তার মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন, পুষ্টি, শিক্ষা, প্রশিক্ষন, ঋণ প্রাপ্তি, সহিংসতা ও নির্যাতন রোধ ইত্যাদি কার্যকর্মের সাথে সহায়তা করা হয়। আবার ই.পি.জেড. সমূহে বর্তমানে কর্মরত শ্রমিকদের ৬৪% নারী, দেশের শ্রমবাজার এবং আয়বর্ধক কার্যক্রমে নারীর অংশ গ্রহণ, ক্ষমতায়ন, এবং তাদের সামাজিক নিরাপত্তা বৃদ্ধিতে ব্যাপক ভুমিকা রাখছে;[৯০]

- মহিলা বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের আওতায় মহিলা অধিদপ্তরের মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত এলাকার মেয়েরা শহরে চাকুরী করতে এসে কর্মস্থলে আবাসন সংকটের সমস্যার প্রতি লক্ষ্য রেখে দেশে মোট ৭টি কর্মজীবি মহিলা হোস্টেল অতি অল্প খরচে পরিচালনা করা হয়। ঢাকার আশুলিয়ায় গার্মেন্টস কর্মীদের নিরাপদ আবাসনের জন্য আরেকটি মহিলা হোস্টেলও নির্মান করা হয়েছে;

- মহিলা অধিদপ্তরের মাধ্যমে আবার কর্মজীবি মায়েদের সন্তানদের ছয় বছর বয়স পর্যন্ত অত্যন্ত স্বল্প খরচে নিরাপদ অবস্থান এবং থাকা খাওয়া এবং প্রাথমিক ও ফ্রি স্কুল শিক্ষার জন্য দেশব্যাপী ৩২ টি দিবাযত্ন কেন্দ্র পরিচালিত হয়;

- মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরে একটি চাকুরি বিনিয়োগ তথ্য কেন্দ্র ও রয়েছে।এ কেন্দ্রের মাধ্যমে চাকুরীদাতা সরকারী/ বেসরকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ স্থাপন করে নিবন্ধীকৃত মহিলাদের চাকুরী প্রাপ্তিতে সুযোগ সৃষ্টি ও তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে সহায়তা প্রদান করা হয়ে থাকে;

---

[৮৯].জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১, পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ১৮।

[৯০].মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো (২০১২-১৩ হতে ২০১৬-১৭), পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ১৩২।

Dhaka University Institutional Repository

- নারী উন্নয়ন সংক্রান্ত কর্মকান্ডকে তৃণমূল পর্যায়ে পৌঁছে দেয়ার জন্য মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের রেজিষ্ট্রেশন ও জনসংযোগ শাখায় স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান নিবন্ধী করণ করে এবং সমিতি সমূহকে অর্থ অনুদান সহ মহিলাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়;[৯১]

- ২০১০ এর শ্রম শক্তি জরিপ অনুসারে **দেখা গেছে যে, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রনালয়ে** বাংলাদেশে বর্তমানে ১৫বছরের উর্ধ্বে অর্থনৈতিকভাবে কর্মক্ষম শ্রমশক্তির সংখ্যা ৫.৬৭ কোটি, তারমধ্যে ৫.৪১কোটি শ্রমশক্তি বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত। কর্মরত শ্রম শক্তির মধ্যে ১.৬২ কোটি মহিলা, যা মোট কর্মরত শ্রম শক্তির ৩০ শতাংশ।[৯২]

২. নারী শ্রমিকদের প্রদত্ত সুযোগ সুবিধা

দেশের নারী শ্রমিকদের প্রাপ্ত সুযোগ সুবিধার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কতিপয় হ'ল –

- বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ এ নারী শ্রমিকদের প্রসূতি কল্যান সুবিধা নিশ্চিত করার এবং কর্মজীবি মহিলাদের প্রতি যুক্তিসংগত আচরণের বিধান রাখা হয়েছে;

- দেশে তৈরী পোষাক শিল্পের কর্মরত শ্রমিকদের মধ্যে প্রায় ৮০ শতাংশ মহিলা। তাদের জীবন যাত্রার মানোন্নয়নের উদ্দেশ্যে মজুরী বৃদ্ধি ও প্রচেষ্টা চলছে। শ্রমের বাজার ধরে রাখা এবং নতুন শ্রম-বাজার সৃষ্টির লক্ষ্যে নারী শ্রমিকদের বিদেশে প্রেরণের পূর্বে সংশ্লিষ্ট দেশের শ্রম মানদন্ড অনুযায়ী প্রশিক্ষন প্রদানের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে;

- শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রনালয়ের অধীনে ২৬টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের (TTC) মধ্যে ৫টি বিভাগীয় শহরে মহিলাদের জন্য ৫টি পৃথক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে। এই ৫টি কেন্দ্রে মহিলাদের পৃথক প্রশিক্ষণ প্রদান সহ অন্যান্য কেন্দ্র সমূহেও দক্ষতা উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষনের ক্ষেত্রে মহিলাদের সমান সুযোগ রয়েছে;

- আইএলও কনভেনশন অনুযায়ী শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রনালয় কর্তৃক গৃহকর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট বৃহৎ শ্রম গোষ্ঠীকে শ্রমিক হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান এবং তাদের সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি ২০১০ এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে ;[৯৩]
- শহরাঞ্চলে উৎপাদনমুখী কারখানায়, রপ্তানীমুখী শিল্পে, পোষাক শিল্পে (২৮ লাখ, প্রকান্তরে ৪০ লাখ), চিংড়ি প্রক্রিয়াকরণ শিল্পে, খাদ্য ও কোমল পানীয় তৈরীর কারখানায় - বিরাট সংখ্যক নারী কর্মরত রয়েছে। প্রতিবছর ৪৫ হাজার পোষাক শ্রমিককে সাধারণ স্বাস্থ্য ও প্রজনন সেবা বিষয়ে সচেতন করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে শ্রম ও কল্যানমূলক কেন্দ্র সমূহ

[৯১]. মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের বার্ষিক প্রতিবেদন, ২০১১ -১২, পূর্বোক্ত, পৃঃ১৪২-১৪৫।

[৯২].জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদন (২০১৩-১৪) ঃ পূর্বোক্ত, পৃঃ ২১১।

[৯৩]. পূর্বোক্ত, পৃঃ ২১১-২১৭।

থেকে। প্রশিক্ষণ ওয়ার্কশপের মাধ্যমে কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের যৌন ও অন্যান্য হয়রানি কমানোর কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। [৯৪]

- **স্বাস্থ্য সেবায় সেবিকা পদে –** বিশাল আকারে নিয়োগ সুবিধা নারীদের অনুকুলেই বিদ্যমান। ঐতিহ্যগতভাবেই নারীরা এই সুবিধা পেয়ে থাকেন। নার্সদের কর্মক্ষেত্র সহজ করার লক্ষ্যে তাদের সুয়োগ সুবিধা প্রদানের জন্য সাস্থ্য ও পরিবার কল্যান মন্ত্রনালয়ের আওতায় রয়েছে একটি সেবা পরিদপ্তর। এই পরিদপ্তরের আওতায় নার্সদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১২টি নার্সিং ইনস্টিটিউট রয়েছে। তন্মধ্যে ০৭টিকে (ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, সিলেট,বরিশাল ও রংপুর) কে নার্সিং কলেজে উন্নীত করা হয়েছে;[৯৫]
- ৬০%কোটা প্রাইমারী স্কুল শিক্ষকদের ক্ষেত্রে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত। বাংলাদেশে প্রায় সকল এলাকাতেই সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাশাপাশি বেসরকারী সংস্থার উদ্যোগে প্রচুর প্রাথমিক ও মৌলিক শিক্ষা পরিচালিত হয়ে থাকে। এই সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও কর্মরত শিক্ষকদের ৯৫% ই নারী; [৯৬]
- চাকুরী ক্ষেত্রে সমান সুবিধা প্রদানের পরও নারীর অংশ গ্রহণ কম বিধায় কোটা প্রথায় নারীর জন্য কর্মকর্তা পর্যায়ে শতকরা ১০ ভাগ এবং কর্মচারী পর্যায়ে শতকরা ১৫ ভাগ আসন সংরক্ষিত রাখা হয়েছে। এটি মেধার ভিত্তিতে প্রাপ্ত চাকুরীর অতিরিক্ত;
- সরকারী চাকুরীতে পুরুষের বয়সসীমা ৩০ বছর এবং নারীর বয়সসীমা ৩২ বছর করা হয়েছে; বাড়ি ভাড়া, চিকিৎসা ভাতা ইত্যাদি সহ নারীদের বেতন পুরুষের সমান করা হয়েছে;
- অসুস্থতার জন্য প্রাপ্ত ছুটি এবং অবসরভাতা পেনশন সুবিধা নারী পুরুষের জন্য সমান। মাতৃত্বকালীন ছুটি ছয় মাস করা হয়েছে;[৯৭]
- নারীদের প্রবাসী কল্যান ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রনালয় থেকে নভেম্বর ২০১০ পর্যন্ত ১,৪৯,১১১ জন নারী বিদেশে কর্মসংস্থানের সুবিধা পেয়েছে ।

সুবিধাপ্রাপ্ত এই নারীদের অবস্থান নিম্নের ছকে দেখানো হ'ল-

সারণী - ১২

প্রবাসী কল্যান ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রনালয়ের নারী ও পুরুষ সুবিধাভোগী

[৯৪].মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামো (২০১২ -১৩ হতে ২০১৬ -১৭), পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ৪৯০ - ৪৯২এবং পূর্বোক্ত, পৃঃ ২১১-২১৭।
[৯৫].মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামো (২০১২ -১৩ হতে ২০১৬ -১৭) ঃ পূর্বোক্ত,পৃঃ ৪৩৯।

[৯৬].শফি আহমদ ঃ নারী ও সরকারী চাকরী, জেন্ডার ও উন্নয়ন কোষ, পূর্বোক্ত, পৃ: ৬২১।
[৯৭]. জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ ঃ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয়, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১২ এবং সংস্থাপন মন্ত্রনালয়ের থেকে সংগৃহিত তথ্য।

মন্ত্রনালয়	মোট (সংখায়)	নারী (সংখ্যায়)	নারী (%)
জনশক্তি রফতানী	৭১,১৪,৪১০(ডিসেম্বর ২০১০ পর্যন্ত)	১,৪৯,১১১(নভেম্বর ২০১০ পর্যন্ত)	২.১০% [৯৮]

- কোনো নারী যদি নিজ নামে কোনো ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের পরিচালনায় থাকেন, তখন তাকে নারী উদ্যোক্তা বলা হয়। কোনো প্রতিষ্ঠানের নারী উদ্যোক্তার মালিকানার অংশ ৫০% এর বেশী হলে ওই প্রতিষ্ঠানকে নারী উদ্যোক্তা পরিচালিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে গণ্য করে বিশেষ সুবিধার আওতায় ঋণ দেওয়া হয়।
- বাংলাদেশে বর্তমানে উদ্যোক্তাদের সংখ্যা বাড়ছে। একই সাথে তাদের ব্যবসা-বিনিয়োগে ও বৈচিত্র দেখা যাচ্ছে; ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা (SME) ফাউন্ডেশনের সার্বিক ও আর্থিক সহায়তায় 'উইমেন এন্ট্রাপ্রেনিউরস ইন এসএমই ঃ বাংলাদেশ পারস্পেকটিভ' শীর্ষক এক গবেষণা জরিপে এক হাজার ৩৫ জন নারী উদ্যোক্তার উপর পরিচালিত জরিপ অনুসারে ৪৮ শতাংশের বেশী নারী উদ্যোক্তা হাতের কাজ, টেইলারিং, ব্লক,বাটিক, ক্যাটারিং সার্ভিস ,খাদ্য তৈরী, বিউটি পারলার, ফিটনেস ক্লাব, নির্মান শিল্প, প্রিন্টিং এ্যান্ড পাবলিশিংয়ের সংগে জড়িত। ২৭ শতাংশ ডিজাইন ১২শতাংশের বেশী নিট্ওয়্যার ও পোষাক শিল্পের সঙ্গে জড়িত; ১০ শতাংশের বেশী কৃষিভিত্তিক ব্যবসা, ৬ শতাংশ ওষুধ প্রস্তুত ও প্রসাধন, ৩ শতাংশের বেশী সেবা ও রোগনির্ণয় সংক্রান্ত ব্যবসার সঙ্গে জড়িত। এ ছাড়া সংখ্যায় কম হলেও শিক্ষাসংক্রান্ত সেবা, ইলেক্ট্রিকস, হালকা প্রকৌশলশিল্প, ধাতবও চামড়াজাত পণ্য ব্যবসায় আছেন নারী; [৯৯]
- আবার ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ফাউন্ডেশনের তথ্য মতে দেশের মোট ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের ৩৫ শতাংশই নারী উদ্যোক্তা। দেশের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের প্রধান উৎস পোষাক শিল্প, হিমায়িত চিংড়ি, চামড়া, হস্তশিল্পজাত দ্রব্য, চা শিল্প সহ অন্যান্য পণ্য উৎপাদনের সঙ্গে সরাসরি নারী জড়িত। এসব শিল্পের প্রধান কাজগুলো নারীরাই করেন;[১০০]
- গ্রামাঞ্চলে নারী কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশে এনজিওরা প্রচুর কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে। প্রায় ১৮০০০ এনজিও বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কাজ করছে।[১০১]

---

[৯৮].জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদন (২০১১ -১২) ঃ অর্থবিভাগ, অর্থমন্ত্রনালয়, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১০৫।

[৯৯]. মানসুরা হোসাইন ঃ 'বৈচিত্র্য আসছে নারী উদ্যোক্তাদের মধ্যে' ,প্রথম আলো, ১৪ এপ্রিল ২০১২, পৃঃ ১২ ।

[১০০]. প্রথম আলো, ৮ মার্চ ২০১৩।

[১০১]. এনজিও কার্যক্রমের উপর এই অধ্যায়ে পরবর্তীতে বিস্তারিত বলা হয়েছে।

- এনজিওদের প্রধান কার্যক্রম হলো ক্ষুদ্র ঋণের আওতায়। ক্ষুদ্র ঋণ নিয়ন্ত্রক সংস্থার সর্বশেষ হিসাব অনুযায়ী, ২০১০ সালের জুনে এ দেশে ক্ষুদ্র ঋণের গ্রাহকের সংখ্যা ছিলো দুই কোটি ৫২ লাখ ৮০ হাজার। এর মধ্যে ৯০%ই নারী গ্রাহক;[১০২]

- নারীদের কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে পোষাক শিল্প বিশাল অবদান রাখছে। দেশে ছোট বড় মিলিয়ে প্রায় সাড়ে চার হাজার তৈরী পোষাক কারখানা আছে। এই খাত থেকে বাংলাদেশ বছরে প্রায় ২৪ হাজার কোটি ডলার (২৪ বিলিয়ন ডলার) আয় করে। বাংলাদেশ এখন বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম তৈরী পোষাক প্রস্তুতকারী দেশ।এই শিল্পে ৪০ লাখের মতো শ্রমিক কাজ করেন, যার ৯০ শতাংশ নারী।[১০৩]

- বিশ্ব বানিজ্য সংস্থার ঘোষণা অনুযায়ী, বাংলাদেশ পোষাক শিল্প রপ্তানীতে দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশ হিসেবে যে সম্মান পেয়েছে, তারও অংশীদার পোষাক কারখানার নারী শ্রমিকেরা।[১০৪]

- শুধু তাই নয় দরিদ্র পরিবারের এই মেয়েরা তাদের ক্ষুদ্র আয় থেকেই এখন নিজেদের সন্তানদের স্কুলে পাঠাচ্ছে।

(তারপরও নারী শ্রমিকদের রয়েছে বিস্তর দুঃখ যন্ত্রনা। তন্মধ্যে নারী পোষাক শ্রমিকদের দুঃখ যন্ত্রনার বিষয়ে ৭ম অধ্যায়ে বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে।)

৪.৩.৬ জাতীয় অর্থনীতির সকল কর্মকান্ডে নারীর সক্রিয় ও সমঅধিকার নিশ্চিত করণ এবং নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ

সিডও সনদের অনুচ্ছেদ - ১৩ এর অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুযোগ সুবিধা ভোগে সমান অধিকার এবং বেইজিং ঘোষণা ও কর্মপরিকল্পনার ৪নং কৌশলগত লক্ষ্য - জাতীয় অর্থনীতির সকল কর্মকান্ডে নারীর সক্রিয় ও সমঅধিকার নিশ্চিত করার সাথে সম্পৃক্ত।

'জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১' এ - জাতীয় অর্থনীতির সকল কর্মকান্ডে নারীর সক্রিয় ও সমঅধিকার নিশ্চিত করণ, নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন সহ নারীকে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় আনয়ন, সংক্রান্ত নিম্নরূপ লক্ষ্য সমূহ নির্ধারণ করা হয়েছে -

- অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান সমূহের সিদ্ধান্ত গ্রহণ পর্যায়ে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি এবং নারী পুরুষের মধ্যে বিরাজমান পার্থক্য দূর করা;

---

[১০২]. প্রথম আলো, ৮ মার্চ ২০১৩।

[১০৩]. আবদুল মান্নানঃ তৈরী পোষাক শিল্প, সাভার ট্রাজেডি সবার চোখ খুলে দিক, প্রথম আলো, মে ২০১৩, পৃঃ ১৩।

[১০৪]. প্রথম আলো, ৮ মার্চ ২০১৩।

Dhaka University Institutional Repository

- অর্থনৈতিক নীতি (বাণিজ্যনীতি, মুদ্রানীতি, করনীতি প্রভৃতি) প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে নারীর সমান অধিকার নিশ্চিত করা;
- নারীর ক্ষমতায়নের প্রতি লক্ষ্য রেখে সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতি প্রণয়নে ও কর্মসূচিতে নারীর চাহিদা ও স্বার্থ বিবেচনায় রাখা;
- সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতির প্রয়োগে বিরূপ প্রতিক্রিয়া প্রতিহত করার লক্ষ্যে নারীর অনুকুলে সামাজিক নিরাপত্তা বলয় (Safety nets) গড়ে তোলা;
- *সম্পদ, কর্মসংস্থান, বাজার ও ব্যবসায় নারীকে সমান সুযোগ ও অংশীদারিত্ব দেয়া;
- শিক্ষা পাঠ্যক্রম, বিভিন্ন পুস্তকাদিতে নারীর অবমূল্যায়ন দূরীভূত করা এবং নারীর ইতিবাচক ভাবমূর্তি তুলে ধরা;
- নারী-পুরুষ শ্রমিকের সমান মজুরী, শ্রমবাজারে নারীর বর্ধিত অংশগ্রহণ ও কর্মস্থলে সমসুযোগ ও নিরাপত্তা নিশ্চিত এবং চাকুরী ক্ষেত্রে বৈষম্য দূর করা;
- নারীর অংশগ্রহণ প্রাতিষ্ঠানিকী করণের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে আর্থ - সামাজিক উন্নয়নে নারীর অবদানের স্বীকৃতি দেয়া;
- জাতীয় অর্থনীতিতে নারীর অবদান প্রতিফলনের জন্য বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো সহ সকল প্রতিষ্ঠানে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
- সরকারের জাতীয় হিসাব সমূহে, জাতীয় উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে কৃষি ও গার্হস্থ্য শ্রমসহ সকল নারী শ্রমের সঠিক প্রতিফলন ও মূল্যায়ন নিশ্চিত করা;
- নারী যেখানে অধিক সংখ্যায় কর্মরত আছেন, সেখানে যাতায়াত ব্যবস্থা, বাসস্থান, বিশ্রামাগার, পৃথক প্রক্ষালনকক্ষ এবং দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপনসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।[১০৫]

(* চিহ্নিত লক্ষ্যটিতে সম্পদ সংক্রান্ত সমান সুযোগ ও অংশীদারিত্ব নিয়ে উত্থাপিত বিতর্ক নিয়ে পরবর্তীতে ৭নং অনুচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে)।

এই লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নিম্নের ব্যবস্থাদি গৃহীত হচ্ছে -

১. মহিলা সমিতি নিবন্ধন, নিয়ন্ত্রন ও অনুদান বিতরণ

বাংলাদেশে এ পর্যন্ত মহিলা অধিদপ্তরের আওতায় নিবন্ধিত মহিলা সমিতির সংখ্যা ১৫৩৯৮টি। শুধু মাত্র মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত এই সমিতি সমুহকে সমিতির সময় ও কার্যক্রমের শ্রেণী বিন্যাস অনুসারে সাধারণ, বিশেষ এবং স্বেচ্ছাধীন নামীয় তিন ধরনের আওতায় ৫(পাঁচ) কোটি টাকা অনুদান সরকার কর্তৃক প্রদান করা হয়। সমিতিগুলো সেলাই কর্মসূচী. নকশীকাঁথা, হাস মুরগী, গরুছাগল প্রতিপালন, নারীদের স্বাস্থ্য সেবা, শিশু প্রতিপালন, নারী-অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা মুলক উঠান-বৈঠক পরিচালনা করে থাকে।[১০৬]

২. নারী সংগঠন ও উদ্যোক্তা নারীদের সুবিধা প্রদান

---

[১০৫]. জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১, পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ১৭।

[১০৬]. মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের বার্ষিক প্রতিবেদন (২০১১- ২০১২), পূর্বোক্ত পৃঃ ১১৭।

নারী সংগঠনও উদ্যোক্তা নারীদের উৎপাদিত হস্তশিল্প ও বিভিন্ন দ্রব্যাদি বাজারজাত করণে সহায়তার জন্য ধানমন্ডিস্থ রাপা প্লাজার ৪র্থ ও ৫ম তলায় জয়িতা নামের একটি বিক্রয়ও প্রদর্শনী কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এখানে ১৩৯ টি ষ্টল ১৮০টি সমিতির মধ্যে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের নিবন্ধিত সমিতির নারী সদস্যগণ জয়িতার সাথে সম্পৃক্ত হচ্ছেন। জয়িতার কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে ঋণ সুবিধা তো রয়েছেই একই সাথে উৎকৃষ্ট কার্যক্রম পরিচালনাকারীদের সুদমুক্ত ঋণ (Collateral free loan) ও প্রদান করা হয়। জয়িতা বাস্তবায়নে বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমান ৭০৫.৭০ লক্ষ টাকা ।[১০৭] ধীরে ধীরে দেশব্যাপী জয়িতার কার্যক্রম বিস্তৃত হচ্ছে।

৩. গ্রামীন ভৌত অবকাঠামো নির্মান রক্ষণাবেক্ষণ ও বৃক্ষরোপনের মাধ্যমে নারীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি

স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতায় দুঃস্থ মহিলাদের একত্রিত করে ইউনিয়ন ও উপজেলা সড়ক নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ, রাস্তার পাশে বৃক্ষরোপন ও পরিচর্যা করণ, অবকাঠামো উন্নয়ন যেমন - গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন, মার্কেট শেড, পাইপ কালভার্ট, ইউ - ড্রেন নির্মান, বসতভিটা উঁচকরণ, মজা পুকুর খনন, বাঁধ, নালা সংস্কার ইত্যাদি কাজে নারীদের সম্পৃক্ত করে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা হচ্ছে।

গ্রামীণ অবকাঠামো নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষনে নারী শ্রমিকদের নিয়োগের সুনির্দিষ্ট বিধান করার ফলে শ্রম বাজারে নারীর অংশ গ্রহণ উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১১-১২ অর্থবছরে তিনটি সেক্টরের (পল্লী অবকাঠামো, নগর অবকাঠামো, অন্যান্য) বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামীন ভৌত অবকাঠামো নির্মান, রক্ষণাবেক্ষণ ও বৃক্ষরোপণে ১৪,৩২,৩৮৩ জন নারীর কর্মসংস্থান হয়েছে। এর মধ্যে পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন সেক্টরে ১১,৪৮,৬১৩ জন, নগর অবকাঠামো উন্নয়ন সেক্টরে ১,৯৯,৮৯৭ জন এবং পানি সম্পদ সেক্টরে ৮৩,৮৭৩ জনের কর্মসংস্থান হয়েছে।[১০৮]

৪. অবকাঠামো উন্নয়ন (মাটির কাজ), গ্রামীন সড়ক রক্ষণাবেক্ষণে চুক্তি ভিত্তিক শ্রমিক নিয়োগ

স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতায় মাটির রাস্তা তৈরীর কাজে, গ্রামীন সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ এবং বৃক্ষরোপন ও পরিচর্যায় প্রধানতঃ চুক্তি ভিত্তিক শ্রমিকদের নিয়োগ করা হয়ে থাকে। চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক দলের (LCS) সাথে একক চুক্তিমূল্যে (সীমা ১ লক্ষ টাকা) কাজ করানো হয়ে থাকে। গ্রামীন সড়ক ও হাটবাজার সংযোগ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পে (পটুয়াখালি,বরগুনা, নোয়াখালী ও লক্ষীপুর শীর্ষক প্রকল্পে) ২০১১ -১২ অর্থবছরে অবকাঠামো উন্নয়ন কাজের মাধ্যমে ৮,৭৫০ জন চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক, কাজে অংশ গ্রহণ করে সর্বমোট ৫,২২,১৩০ কর্ম দিবস কাজ করেছে। বর্ণিত কর্মদিবসের শতকরা ৯০ ভাগই মহিলা শ্রমিক দ্বারা সংগঠিত। 'চর অঞ্চলে বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামের হাট- বাজার, রাস্তা ও ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণে অদক্ষ শ্রমিক ৩১,০৭৩ জন মহিলার স্বল্পকালীন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।[১০৯]

৫. একটি বাড়ি একটি খামার, সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি, চর (নদী ভাঙ্গা এলাকার) লোকজনের জীবিকায়ন কর্মসূচি, ইকনমিক এমপাওয়ারমেন্ট অবদি পুওরেষ্ট ইন বাংলাদেশ এবং দরিদ্র মহিলাদেও জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান প্রকল্প

---

[১০৭] .পূর্বোক্ত, পৃঃ ১১৩- ১১৫।

[১০৮] .স্থানীয় সরকার বিভাগের বার্ষিক প্রতিবেদন(২০১১-১২) , গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ, পৃ ঃ ১০৪।

[১০৯] .পূর্বোক্ত, পৃঃ ১০৬।

Dhaka University Institutional Repository

উল্লেখিত প্রকল্প সমূহের মধ্যে পল্লীউন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের আওতায় ৯০০কোটি টাকার তহবিল এবং ১৭ হাজার গ্রাম সমিতির মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প (২য়পর্যায়)। এর মাধ্যমে প্রায় ৬ লক্ষ ৮০ হাজার নারীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের কার্যক্রম চলছে। দেশের প্রতিটি গ্রাম থেকে ৬০টি দরিদ্র পরিবার বাছাই করে গ্রাম উন্নয়ন সমিতি গঠন করা হয়েছে। এই দরিদ্র পরিবার গুলোকে সঞ্চয়মুখী করতে তাদের নিজস্ব সঞ্চয়ের বিপরীতে মাসে ২০০ টাকা করে সরকারী অনুদান দেওয়া হচ্ছে। এ যাবত তৈরী হওয়া ৯০০ কোটি টাকার মধ্যে ৬০০ কোটি টাকা সমিতির সদস্যরা ঋণ নিয়ে মৎস চাষ, মুরগীর খামার, পশুপালন সহ নানা উদ্যোগ নিচ্ছে।

আবার সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি- ২য় পর্যায় প্রকল্পের মাধ্যমে প্রায় ১.৫ লক্ষ নারীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা হচ্ছে। এই প্রকল্পে মাধ্যমে ও উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও আয়বর্ধক কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে নারীর অংশ গ্রহণকে অগ্রাধিকার দিয়ে প্রশিক্ষণ, উদ্বুদ্ধকরণ ও ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানের মাধ্যমে নারীদের আত্মকর্মসংস্থানের সৃষ্টি হচ্ছে।

চর (নদী ভাঙ্গা এলাকার) লোকজনের জীবিকায়ন কর্মসূচিটি বাস্তবায়িত হচ্ছে ব্রক্ষপুত্র - যমুনা নদ-নদী বেষ্টিত চর এলাকার ৭ লক্ষ নারী এবং ইকনমিক এমপাওয়ারমেন্ট অবদি পুওরেষ্ট ইন বাংলাদেশ প্রকল্পের মাধ্যমে চর, হাওড়, জলাবদ্ধ এলাকায়, সমুদ্র উপকুলবর্তী ঘূর্ণিঝড় প্রবন এলাকা, মঙ্গা পীড়িত ও দারিদ্র পীড়িত

পার্বত্যাঞ্চলের প্রায় ৮৫ হাজার নারীকে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে ক্ষমতায়ন, এবং ক্ষুদ্র ঋণ ও প্রশিক্ষন প্রদানকে নারীবান্ধব করার মাধ্যমে উৎপাদনমুখী কাজে সম্পৃক্ত করার প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে।

আবার দেশ জুড়ে দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান প্রকল্প এবং পল্লী দারিদ্র বিমোচন ফাউন্ডেশন কার্যক্রমের মাধ্যমে যথাক্রমে ৭৬,২৫০ এবং ২০, ৫,০০০ জন দরিদ্র মহিলার দারিদ্র বিমোচন এবং জীবন-যাত্রার মানোন্নয়ন সম্ভব হচ্ছে।[১১০]

৬. সমবায় ভিত্তিক বাজার ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি

সমবায় অধিদপ্তর, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড(BRDB), এবং বার্ড, কুমিল্লা ও আরডিএ, বগুড়ার সমবায় সমিতি সমূহের মাধ্যমে দেশ জুড়ে মহিলাদের ঋণ কার্যক্রমের আওতায় দারিদ্র দূরীকরণের বিশাল কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে। সমবায়ভিত্তিক এই বিভাগের আওতায় সমবায় অধিদপ্তরের মাধ্যমে গত তিন বছরে (২০০৮-৯, ২০০৯-১০, ২০১০-১১) মোট ৩০,০৬১ টি নতুন সমবায় সমিতি গঠন করা হয়েছে, ৬.৮০ লক্ষ জন সমবায়ীকে সদস্যভুক্ত করা হয়েছে এবং ১,২৫, ৪৩৩ জনের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বাংলাদেশ পল্লীউন্নয়ন বোর্ড (BRDB) এর আওতায় উল্লেখিত তিন বছরে মোট ৮,২৯৮টি আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক দল গঠন করা হয়েছে এবং ২.৭০ জন সদস্যকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, ১.৪৮ লক্ষ জনকে বিভিন্ন আয়বর্ধক, দক্ষতা ও মানবিক উন্নয়ন এবং ট্রেড ভিত্তিক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। এই তিন বছরে মোট ১০.৭৪ লক্ষ জন সদস্যের মধ্যে মোট ২১০১.৪৩ কোটি টাকার ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড), কুমিল্লায় বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে ৩৯,৫১২ জনের আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে ৩৯,২১০ জনকে আত্ম কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আর.ডি.এ) বগুড়া,কর্তৃক

[১১০] .মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামো ২০১২- ১৩ হতে ২০১৬- ১৭ঃ অর্থ বিভাগ, অর্থমন্ত্রনালয়, পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ৬২০ এবং জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদন(২০১৩- ১৪) ঃ অর্থবিভাগ, অর্থ মন্ত্রনালয় ,গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার পৃ ঃ ৫৪-৫৬ এবং প্রথম আলো, ১২ মে ২০১৩।

বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে ৬৩৪২ জন গ্রামীন নারীও পুরুষের কর্মসংস্থান হয়েছে। উল্লেখ্য যে, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের আওতায় বাস্তবায়িত বিভিন্ন প্রকল্পের ৬০-৭০% সদস্যই নারী।[১১১]

এভাবে উপরে বর্ণিত বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রমের মাধ্যমে দেশব্যাপী নারীদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের ব্যবস্থা গৃহীত হচ্ছে।

৪.৩.৭ নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন

সিডো সনদের ৭ নং ধারা এবং বেইজিং ঘোষণা ও কর্মপরিকল্পনার ও ৭নং কৌশলগত লক্ষ্য অনুসারে 'জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১' এ - নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন নারীর সক্রিয় ও সমঅধিকার নিশ্চিত করণ, নারীর ক্ষমতায়ন সহ নারীকে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় আনয়ন সংক্রান্ত নিম্নরূপ কৌশল সমূহ নির্ধারণ করা হয়েছে-

- রাজনীতিতে অধিকহারে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য প্রচার মাধ্যম সহ রাজনৈতিক দলসমূহকে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা;
- নারীর রাজনৈতিক অধিকার অর্জন ও প্রয়োগ এবং এর সুফল সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা ;
- রাজনৈতিক দলের অভ্যন্তরে পর্যায়ক্রমে ৩৩ শতাংশ নারী প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা;
- নির্বাচনে অধিক হারে প্রার্থী মনোনয়ন দেয়ার জন্য রাজনৈতিক দলগুলোকে অনুপ্রাণিত করা;
- নারীর রাজনৈতিক অধিকার আদায় ও প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ভোটাধিকার প্রয়োগে সচেতন করা এবং তৃণমূল পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত ভোটার প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা;
- রাজনীতিতে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণের তাগিদ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে নারী সংগঠন সহ বেসরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহকে প্রচার অভিযান গ্রহণ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা ;
- জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত মহিলা আসনের সংখ্যা ৩৩ শতাংশে উন্নীত করা ও বর্ধিত সংরক্ষিত আসনে প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচনের উদ্যোগ গ্রহণ করা;
- স্থানীয় সরকার পদ্ধতির সকল পর্যায়ে বর্ধিত সংরক্ষিত আসনে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করা;
- সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার উচ্চ পর্যায়ে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী নিয়োগ করা।[১১২]

উল্লেখিত নীতিমালা সমূহের আলোকে বাংলাদেশে রাজনীতিতে নারীদের অংশ গ্রহণের অগ্রগতি নিম্নরূপ-

১. সংসদে নারী সদস্য

সকল বাধাবিপত্তি ডিঙ্গিয়ে গত দুই দশক ধরে বাংলাদেশে রাজনীতিতে নারীদের অবস্থান লক্ষ্যনীয় হয়ে উঠেছে। গত ১৮ বছর ধরে দেশটি পরিচালিত হচ্ছে নারী প্রধানমন্ত্রী এবং নারী বিরোধী দলের নেত্রীর

---

[১১১].জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদন(২০১১-১২) ঃ পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ৫৪-৫৬ এবং মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামো (২০১২- ১৩ হতে ২০১৬- ১৭), পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ৬২০।

[১১২].জাতীয় নারী উন্নয়ন ২০১১, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪২।

মাধ্যমে। এটি উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশে নির্বাচনের ক্ষেত্রে নারী নেতৃত্বই প্রাধান্য পেয়ে আছে। ১৯৮৬ সনে শেখ হাসিনা নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে মাননীয় বিরোধী দলীয় নেতৃত্ব পেয়েছিলেন যদিও বছর দু'য়েক পরে পদত্যাগ করেছিলেন। আবার ১৯৯১ সনের নির্বাচনে বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করে সরকার গঠন করে, মাননীয় প্রধান মন্ত্রী হিসেবে বেগম খালেদা জিয়া পাঁচ বছর সরকার পরিচালনা করেছিলেন। সেসময়ে মাননীয় নেতৃ শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ বিরোধী দল পরিচালনা করেন।

পরবর্তীতে ১৯৯৬ এর একটি নির্বাচনে বিএনপির জয়যুক্ত হলেও তাতে দুই মাসের (১৫ ফেব্রুয়ারী নির্বাচনের পর মার্চ এর শেষ পর্যন্ত) জন্য সরকার পরিচালনার পর পুনঃ অনুষ্ঠিত নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নির্বাচনে সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করে ২০০০ পর্যন্ত মাননীয় প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকার পরিচালনা করেন। ২০০১ এর নির্বাচনে আবার খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করে এবং মাননীয় প্রধান মন্ত্রী হিসেবে বেগম খালেদা জিয়া সরকার পরিচালনা করেন। তখন মাননীয় বিরোধী দলীয় নেতা হিসেবে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ছিলেন আওয়ামী লীগ।

২০০৬ এর অক্টোবর থেকে ২০০৮ এর ডিসেম্বরে পর্যন্ত অনির্বাচিত কেয়ার টেকার সরকার ছিলো, নির্বাচিত জনসমর্থিত রাজনৈতিক দল ছিলোনা। ২০০৯ এর জানুয়ারীতে নির্বাচন দেয়া হয় যাতে আওয়ামী লীগ জয় যুক্ত হয়ে মাননীয় প্রধান মন্ত্রী হিসেবে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকার গঠন করে। ২০১৩ পর্যন্ত আওয়ামী লীগ সরকার পরিচালনা করে। অতঃপর ২০১৪ এর ৫ জানুয়ারী পুনঃ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নির্বাচিত হয়ে মাননীয় প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকার পরিচালনা করে যাচ্ছে।

নির্বাচনে বারবার নারী নেতৃত্বে এটি লক্ষ্যনীয় যে, বাংলাদেশের জনগণ বার বারই নারী নেতৃত্বকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে গ্রহণ করে যাচ্ছে। এছাড়া ১৯৮৮ সন ব্যতীত প্রতিবারই নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন রয়েছে। ২০০৮ সন থেকে সংসদের ৩৫০টি আসনের মধ্যে ৫০টি আসন নারীদের জন্য সংরক্ষণ করা হয়েছে। সংসদে নির্বাচিত প্রতিনিধিবৃন্দ এই ৫০টি আসনে মহিলা সাংসদ নির্বাচন করে থাকেন। আবার সংরক্ষিত এই ৫০টি আসনের বাইরে ৩০০টি আসনেও নারীরা পুরুষের সমান প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেন।

নিম্নে সারণী ১৩ এ সংসদে সংসদ সদস্য হিসেবে নারীদের অবস্থা দেখানো হ'ল -

সারণী-১৩

বিভিন্ন সংসদে নারী সদস্যদের সংখ্যা ও শতকরা হার (১৯৭৩ - ২০১৪)

নির্বাচনের বছর	ন্যারী প্রার্থীর শতকরা হার	নির্বাচনে সরাসরি নির্বাচিত নারীর সংখ্যা	সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত নারীর সংখ্যা
১৯৭৩	০.৩	০	১৫
১৯৭৯	০.৯	২	৩০
১৯৮৬	১.৩	৫	৩০
১৯৮৮*	০.৭	৪	-

১৯৯১	১.৫	৫	৩০
১৯৯৬	১.৩৯	৭	৩০
২০০১	১.৯	৬	৪৫
২০০৮	৩.৮৬	১৯	৪৫+৫=৫০
২০১৪	১৯.৭%	২০	৫০ [১১৩]

**১৯৮৮ এ মহিলাদের জন্য কোন সংরক্ষিত আসন রাখা হয় নাই।*

সারণী - ১৩ এ ১৯৭৩ থেকে ২০১৪ পর্যন্ত সংসদ নির্বাচনে নারীদের অবস্থান দেখানো হয়েছে। দেখা যাচ্ছে ধীরে ধীরে সংসদে সদস্য হিসেবে নারীদের সংখ্যা বাড়ছে। তবে ১৯৮৮ সনে নারীদের জন্য কোন সংরক্ষিত আসন রাখা হয়নি। সরাসরি এসেছেন ৪ জন নারী। তারপর থেকে নারীদের সংখ্যা বেড়েই চলছে। ২০০৮ সনের নির্বাচনে নারী প্রতিদ্বন্ধীদের অংশগ্রহণ পূর্বের সকল রেকর্ড অতিক্রম করেছে।

উক্ত নির্বাচনে ১৯ জন নারীই সরাসরি নির্বাচনে জিতেছেন (উক্ত নির্বাচনে ৬৩ জন মহিলা প্রার্থী সরাসরি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্ধিতা করেছিলেন)। সংরক্ষিত আসনে প্রথমে ৪৫ জন, পরবর্তীতে এর সংখ্যা বাড়িয়ে আরও ৫ জন নেওয়া হয়েছে। মোট ৫০জন নারী সংরক্ষিত আসনে সংসদ সদস্য হয়েছেন। গত সংসদে মোট নারীর সংখ্যা ৬৯ জন যা প্রায় ১৯% ।[১১৪]

গত সরকারের আমলে মন্ত্রী সভায় ৬ জন নারী ছিলেন। সংসদের হুইপ, স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান এবং স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্যদেরও নারীদের থেকে নেওয়া হয়েছে।[১১৫]

বর্তমান সংসদেও (২০১৪) ৫০ জন নারী সদস্য সংরক্ষিত মহিলা আসনে সংসদ সদস্য হয়েছেন। নির্বাচিত হয়ে এসেছেন ২০ জন। মোট নারী সংসদ সদস্য ৭০ জন। ২জন মন্ত্রী ও ১ জন প্রতিমন্ত্রী নারী সংসদ সদস্যদের থেকে রয়েছেন।[১১৬]

একই ভাবে স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান এবং স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্যদেরও নারীদের থেকে নেওয়া হয়েছে। মাননীয় প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনা সহ বিরোধী দলীয় নেত্রী (বেগম রওশন এরশাদ), স্পিকার, উপনেতা নারী। সবশেষে মাননীয় স্পিকার হিসেবেও একজন নারীকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। তিনি ড. শিরীন শারমীন চৌধুরী। যা নারীর ক্ষমতায়নের বিষয়টিকে আশাব্যঞ্জক করেছে।

তথাপিও সংরক্ষিত মহিলা আসনে সংসদ সদস্য হওয়ার বিষয়টি নির্বাচনের মাধ্যমে হওয়া বাঞ্ছনীয়। তা এখনও হচ্ছেনা।

---

[১১৩]. www.bangladeshparliament.gov.bd.

[১১৪].www.bangladeshparliament.gov.bd.

[১১৫].www.bangladeshparliament.gov.bd.

[১১৬].Bangladesh Report ঃ The Implementation of the Beijing Declaration and Platform for Acion (1995) and the outcomes of the Twenty- third Special Session of the General Assembly(2000), পূর্বোক্ত, P.36 ।

২. স্থানীয় সরকারে নারী সদস্য

নারীর রাজনীতিতে অংশগ্রহনের আরেকটি ক্ষেত্র হচ্ছে স্থানীয় সরকার কাঠামো। সকল সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, উপজেলা ও ইউনিয়নের স্থানীয় সরকার কাঠামোয় নারীর জন্য সংরক্ষিত আসন রয়েছে। তার বর্তমান অবস্থা নিম্নরূপ-

(ক) ইউনিয়ন পরিষদ

বর্তমানে বাংলাদেশে মোট ৪৫৪৬টি ইউনিয়ন পরিষদ রয়েছে। সরকার কর্তৃক (ইউনিয়ন পরিষদ) অর্ডিন্যান্স ১৯৮৩ সংশোধন করে ১৯৯৭ সালে প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদে সরাসরি নির্বাচনের জন্য ৩ জন নারী সদস্যের আসন সংরক্ষণ করা হয়েছে। সংরক্ষিত আসনে প্রতি তিনটি ওয়ার্ড থেকে ১ জন করে ৯টি ওয়ার্ডে ৩ জন মহিলা সদস্য নির্বাচিত হয়ে থাকেন। এভাবে প্রতিটি ইউনিয়নে সংরক্ষিত ৩টি আসনে প্রত্যক্ষ

ভোটে নির্বাচিত হচ্ছেন মোট ১৩,৬৩৮ জন মহিলা। এই সংরক্ষিত পদের বাইরে মহিলারা চেয়ারম্যান সহ বাকি ৯টি পদেও নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে পারে।[১১৭]

(খ) উপজেলা পরিষদ

বাংলাদেশে মোট ৪৮৫ টি উপজেলায় উপজেলা পরিষদের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালিত হয়। বাংলাদেশের ৪৮৫ টি উপজেলায় উপজেলা নির্বাচনের জন্য জন প্রতিনিধিত্ব (সংশোধিত) অর্ডিন্যান্স ২০০৮ অনুসারে উপজেলা পরিষদে দুইজন নির্বাচিত ভাইস চেয়ারম্যানের এর স্থলে একজন মহিলা রাখা হয়েছে। ২২ জানুয়ারী ২০০৯ এ অনুষ্ঠিত নির্বাচনে ৪৮০টি উপজেলায় ৪৮০ জন মহিলা উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন। যাতে প্রতিদ্বন্ধি ছিলেন ১,৯৩৬ জন মহিলা। আবার ২০১৪ সনের উপজেলা নির্বাচনে ৪৫৮টি উপজেলায় ১৫০৯ জন মহিলা প্রতিদ্বন্ধির মধ্যে ৪৫৮ জন উপজেলা ভাইস য়োরম্যান নির্বাচিত হয়েছেন। প্রত্যেক উপজেলার এলাকাভুক্ত ইউনিয়ন পরিষদ, এবং পৌরসভা যদি থাকে, এর মোট সংখ্যার এক তৃতীয়াংশের সম সংখ্যক সদস্য আসনও মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়েছে। তবে মহিলারা সংরক্ষিত আসন বহির্ভুত আসনেও সরাসরি নির্বাচন করতে পারেন।[১১৮]

(গ) জেলা পরিষদ

বাংলাদেশে ৬৪টি জেলায় জেলা পরিষদ বিদ্যমান । তবে এ যাবত জেলা পরিষদে নির্বাচন হয়নাই। সাধারণ সদস্য নির্বাচন এবং সংরক্ষিত আসনে নির্বাচন হবে মর্মে আইন সংশোধন করা হয়েছে। তাতে নারীরা

---

[১১৭]. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৬ -৩৭ এবং স্থানীয় সরকার বিভাগের বার্ষিক প্রতিবেদন (২০১১ -১২), পৃঃ ৯- ১৭ এবং ইউনিয়ন পরিষদ প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয়, পৃঃ ২৬৭ ৩২২,

[১১৮]. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৬ -৩৭ এবং জনপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধিত) অর্ডিন্যান্স ২০০৮, উপধারা -৪।

চেয়ারম্যান এবং সাধারণ সদস্য নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে পারবেন। এবং সংরক্ষিত ৫ টি আসনে মহিলারাই নির্বাচন করবেন।[১১৯]

(ঘ) পৌর সভা

বর্তমানে বাংলাদেশে 'ক' শ্রেনী, 'খ' শ্রেনী, এবং গ শ্রেণী মিলিয়ে মেটি মোট ৩১৩ টি পৌরসভা রয়েছে। ১৯৯৮ স্যালে পৌরসভা অধ্যাদেশের মাধ্যমে ওয়ার্ড সংখ্যার ১/৩ অংশ নারীদের জন্য সংরক্ষিত করা হয় এবং তারা সরাসরি নির্বাচনেও অংশগ্রহণ করতে পারেন। এ যাবত পৌরসভা নির্বাচনে প্রতি ৩টি ওয়ার্ড হতে একজন মহিলা কমিশনার নির্বাচিত হয়েছেন। বর্তমানে ৫৮১ জন মহিলা কমিশনার রয়েছেন। [১২০]

(ঙ) সিটি কর্পোরেশন

বাংলাদেশে গত ৬ জুলাই ২০১৩ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে মোট ১১ টি সিটি কর্পোরেশন করা হয়েছে। সিটি কর্পোরেশনের মেয়র পদে পুরুষ নারী উভয়েই প্রতিদ্বন্ধিতা করতে পারেন। তবে এ যাবত নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনে একজন নারী প্রথম মেয়র হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি ডা. সেলিনা হায়াৎ আইভি। বর্তমানে মোট ১১টি সিটি কর্পোরেশনে ৩৯৫টি সাধারণ ওয়ার্ড এবং নারীদের জন্য ১৩২টি সংরক্ষিত ওয়ার্ড রয়েছে কাউন্সিলর নির্বাচনের জন্যে তা ধীরে ধীরে কার্যকরও হচ্ছে।[১২১]

তৃণমূল পর্যায়ে নারীর অবস্থান .নারীর ক্ষমতায়নের একটি উজ্জল দৃষ্টান্ত - যা জাতীয় পর্যায়ে নারীর ক্ষমতায়নের অগ্রগতির সহায়ক। তথাপিও বাস্তবে উপরে উল্লেখিত সংরক্ষিত আসনে নারীরা নির্বাচিত হয়ে আসলেও সাধারণ আসনে নির্বাচনে অংশগ্রহণ খুবই কম বিধায় এবং নির্বাচিত হয়ে আসার চিত্র খুব একটা আশাব্যাঞ্জক নয়।

৪.৩.৮ নারীর প্রশাসনিক ক্ষমতায়ন

'জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১' এ - জাতীয় অর্থনীতির সকল কর্মকান্ডে নারীর সক্রিয় ও সমঅধিকার নিশ্চিত করণ, নারীর ক্ষমতায়ন সহ নারীকে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় আনয়ন, সংক্রান্ত নিম্নরূপ কৌশল সমূহ নির্ধারণ করা হয়েছে -

---

[১১৯]. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৬ -৩৭ এবং মোহাম্মদ ফিরোজ মিয়াঃ স্থানীয় সরকার বিধানাবলী, স্থানীয় সরকার (জেলা পরিষদ) আইন, ১৯৮৮, ১৯৮৮ সনের ২৯ নং আইন, রোদ্দুর প্রকাশনী, ৫০২, পশ্চিম নাখাল পাড়া, ঢাকা -১৯৯০, পৃঃ ৩০৫-৩০৬ এবং বার্ষিক প্রতিবেদন (২০১১ -১২), স্থানীয় সরকার বিভাগ,পৃঃ ৩২৫- ৩২৬।

[১২০]. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৬ -৩৭ এবং বার্ষিক প্রতিবেদন (২০১১ -১২), স্থানীয় সরকার বিভাগ,পৃঃ ৩২৭-৩২৮।

[১২১]. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৬ -৩৭, এবং বার্ষিক প্রতিবেদন (২০১১ -১২), স্থানীয় সরকার বিভাগ,পৃঃ ১৩৪ - ২২২ ।

- প্রশাসনিক, নীতি নির্ধারণী ও সাংবিধানিক পদে অধিকহারে নারীদের নিয়োগ প্রদান করা;
- জাতিসংঘের বিভিন্ন শাখা ও অঙ্গসংগঠনে এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংগঠনে রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধি বা প্রার্থী হিসেবে নারীকে নিয়োগ /মনোনয়ন দেয়া;
- নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে প্রবেশ পর্যায় সহ সকল পর্যায়ে, গেজেটেড্ ও নন- গেজেটেড পদে কোটা বৃদ্ধি করা;
- সকল ক্ষেত্রে নারীর জন্য নির্ধারিত কোটা পূরণ সাপেক্ষে কোটা পদ্ধতি চালু করা;
- কোটার এই পদ্ধতি স্বায়ত্বশাসিত ও বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানে প্রযোজ্য করা এবং বেসরকারী ও স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান সমূহকেও এই নীতি অনুসরণের জন্য উৎসাহিত করা;
- জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের সুপারিশ অনুসারে সরকারের নীতি নির্ধারণী পদসহ সিদ্ধান্ত গ্রহণের সকল স্তরে নারীর সম ও পূর্ণ অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শতকরা ৩০ভাগ পদে নারী নিয়োগের উদ্দেশ্যে সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করা।[১২২]

উল্লেখিত নীতিমালা সমূহের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশে প্রশাসনিক ক্ষমতায়নে নারীদের অংশ গ্রহণের অবস্থা-

১. পাবলিক সার্ভিসে নারী

সরকারী গেজেটেড পদ সমূহে শতকরা ১০ ভাগ এবং নন-গেজেটেড পদে শতকরা ১৫ ভাগ নারী নিয়োগের কোটা রয়েছে। সরকারের সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণে অন্যতম সহায়ক কর্মকর্তাগণ হলেন বিভিন্ন মন্ত্রনালয়ের সচিব, অতিরিক্ত সচিব, যুগ্ম সচিবগণ, উপ সচিব, সিনিয়র সহকারী সচিব, সহকারী সচিব, বিভাগীয় কমিশনার, অতিরিক্ত বিভাগীয় কশিনার, জেলা প্রশাসক, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ। গত ৬/১২/২০১৩ এর তথ্য অনুসারে বিভিন্ন মন্ত্রনালয়ে এবং অন্য দপ্তরে সচিবদের সমতুল্য পদ সহ সচিবদের মোট ৭১টি পদের মধ্যে মাত্র ৪ জন নারী, ২৩৯ জন অতিরিক্ত সচিবের মধ্যে ১৫ জন নারী, ১০১৯ জন যুগ্ম-সচিবের মধ্যে ১৩০ জন নারী, ১৩১৭ জন উপ-সচিবের মধ্যে ১৬৫ জন নারী, ১৪৩৮ জন সিনিয়র সহকারী সচিব এর মধ্যে ৩০৮ জন নারী, ১০৭৯ জন সহকারী সচিবের মধ্যে ২৮৫ জন নারী রয়েছেন। আবার এই সময়ে ৬ টি বিভাগের ৬ জন বিভাগীয় কমিশনারগণের মধ্যে, ১৭ জন অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনারের মধ্যে এবং ৬৪টি জেলার জেলা প্রশাসকগণের মধ্যে কোন নারী কর্মকর্তা নেই।

তবে মোট ১৯১ জন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকের মধ্যে ২৪ জন নারী এবং ৪১৩ জন উপজেলা নির্বাহী অফিসারের মধ্যে ৬৪ জন নারী নির্বাহী অফিসার রয়েছেন।[১২৩]

এর বাইরে পাবলিক সার্ভিসে অন্যান্য স্তরে ও পুরুষদের পাশাপাশি মহিলারা চাকুরী করছেন। নিম্নের সারণীতে ১ম, ২য়, ৩য় শ্রেণীতে ২০১১ সনের পাবলিক সার্ভিসে পুরুষ ও নারীর অবস্থান তুলে ধরা হয়েছে --

---

[১২২]. জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি- ২০১১, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৩।

[১২৩]. www.mopa .gov.bd (Last Update List of 6/12/13 of Public Administration computer Centre (PACC).

সারণী-১৪

২০১১ সনে পাবলিক সেক্টর/ সরকারী চাকরীর বিভিন্ন শ্রেনীতে নারীও পুরুষ

চাকরীর ধরণ	মন্ত্রলয়/বিভাগ (সচিবালয়)			ডিপার্টমেন্ট এবং ডাইরেক্টরেট			স্বায়ত্ব সাশিত সংস্থা এবং কর্পোরেশন			বিভাগ এবং জেলা পর্যায়ে		
	নারী	পুরুষ	মোট	নারী	পুরুষ	মোট	নারী	পুরুষ	মোট	নারী	পুরুষ	মোট
প্রথম শ্রেণী	৪৭৩	১৯৩২	২৪০৫	১০৩৯২	৪৩৪২৯	৫৪০২১	৬৪৯২	৪৬৭৯২	৫৩২৮৪	২৫৯	১৩২	৩৯১
দ্বিতীয় শ্রেণী	৩১০	১৬৫৭	১৯৬৭	৩৮৪০	১৮২৯৩	২২১৩৩	২৮৫২	২৬৮২৬	২৯৬৭৮	১	২৬৪	২৬৫
তৃতীয় শ্রেণী	৩৩৪	২১২১	২৪৫৫	১৭৩১০৪	৪৪৫৫৬২	৬১৮৬৬৬	৬৮৮৮	৭৭৬৩৭	৮৯৫২৫	৯৯৮	১১৩৯৬	১২৩৯৪
চতুর্থ শ্রেণী	৩৪৮	২২৬৩	২৬১১	৩৯৪৯০	১১০৪২৫	১৪৯৯১৫	৩৩০৪	৬২৫৪৫	৬৫৮৪৯	১১১৪	১৩০৫৮	১৪১৭২
সকল শ্রেণী	১৪৬৫	৭৯৭৩	৯৪৩৮	২২৬৮২৬	৬১৭৭০৯	২৮৭৯৩৫	১৯৫৩৬	২১৩৮০০	২৩৮৩৩৬	২৩৭২	২৪৮৫০	২৭২২২[১২৪]

উল্লেখিত সারণী ১৪ দৃষ্টে মোট কর্মরত নারীদের সংখ্যা হিসাবে আনা হলে সারা দেশে জন প্রশাসনের আওতায় সরকারী পর্যায়ে কর্মরত- মোট নারীর সংখ্যা (১৪৬৫+২২৬৮২৬+১৯৫৩৬+২৩৭২)= ২,৫০,১৯৯ জন আর পুরুষের সংখ্যা (৭৯৭৩+৬১৭৭০৯+২১৩৮০০+২৪৮৫০) = ৮,৬৪,৩৩২ জন।

তাহলে নারীদের অবস্থান পুরুষের কাছাকাছি তো নয়ই বরং পুরুষের অবস্থান নারীদের চেয়ে তিনগুনেরও বেশী। এই অবস্থান থেকে নারীদের পুরুষের সমান পর্যায়ে যেতে আরো দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন।

২. পুলিশ বাহিনীতে নারী

দেশে ১৯৭৪ সালে পুলিশ বাহিনীতে প্রথম নারী সদস্যদের নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হয়। ১৯৮৬ সালে ৬ষ্ঠ বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (বিসিএস) পরিক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে প্রথম নারী ফাতিমা বেগম এ্যাসিস্টেন্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট অফ পুলিশ হিসেবে যোগদান করেন। এর দুই বছর পর ১৯৮৮ সালে ৭ম বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (বিসিএস) পরিক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে চার জন নারী কর্মকর্তা যোগদান করেন। পরবর্তীতে দশ বছর সিভির সার্ভিস পরিক্ষায় কোন নারী কর্মকর্তাদের নে্ওয়া হয়নি। অতঃপর ১৮ তম বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (বিসিএস) পরিক্ষায় ৮ জন মহিলা

---

[১২৪] Statistics of civil officers and Staff,2011ঃ Ministry of Public Administration, 2011, Government of the Peoples Republic of Bangladesh, Statistics and Research cell, P.134 -175.

কর্মকর্তা নেওয়া হয়। বর্তমানে বিভিন্ন পর্যায়ে মহিলা পুলিশদের স্বাভাবিক ভাবেই নেওয়া হচ্ছে। বর্তমানে ২২৪০ জন নারী পুলিশ, পুলিশ বাহিনীর বিভিন্ন শাখায় কর্মরত আছেন। পুলিশের উপমহাপরিদর্শক, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, জ্যেষ্ঠ সহকারী পুলিশ সুপার পদ সহ কনষ্টেবল পর্যন্ত নারীরা দায়িত্ব পালন করছেন।[১২৫] ২ জন নারী পুলিশ সুপারেন্টেন্ডেন্ট পদে নিয়োগ লাভ করে। জাতি সংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশের সম্পূর্ণ নারী সংগঠিত পুলিশ ইউনিট (ফিমেল ফর্মড পুলিশ ইউনিট, এফপিইউ) প্রথমবারের মত হাইতিতে দায়িত্ব পালন করছে।[১২৬]

৩. সেনা বাহিনীতে নারী

স্বাধীনতা লাভের পর থেকেই বাংলাদেশের আর্মি মেডিক্যাল কোরে নারী ডাক্তার ও নার্সরা যোগদান করে আসছেন। আর বাহিনীর অন্যান্য কোরে নারীদের যোগদান শুরু হয় ২০০১ সাল থেকে। বর্তমানে সেনাবাহিনীতে মেজর, ক্যাপ্টেনসহ বিভিন্ন পর্যায়ের প্রায় ১ হাজার নারী কর্মকর্তা রয়েছেন। এাড়া ১৩শ'নারী সৈনিক প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন। তাঁরাও প্রশিক্ষণ শেষে নিয়মিত বাহিনীতে যোগদান করবেন। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রথম নারী প্যারাট্রুপার (প্যারাস্যুট জাম্পার) ক্যাপ্টেন জান্নাতুল ফেরদৌস জান্নাত ২০০৭ সালে সেনা বাহিনীতে যোগদান করেন। ২০০৮ সালের ২৪ ডিসেম্বর তিনি কমিশন লাভ করেন। সেনাবাহিনীর দ্বিতীয় নারী প্যারাট্রুপার ক্যাপ্টেন নুসরাত। [১২৭] সামরিক বাহিনীতে ব্রিগেডিয়ার পদেও ১ জন নারী রয়েছেন।[১২৮]

অর্থাৎ বাংলাদেশ সেনা বাহিনীতে বাংলাদেশের নারীরা নিজেদের যোগ্যতা প্রদর্শনে পিছিয়ে নেই। তাঁদের মধ্যে দক্ষ কয়েকজনের নাম নিম্নে উল্লেখ করা হ'ল -

<u>সেনাবাহিনী ঃ</u> মেজর মিশকাত বেগম (অর্ডন্যান্স কোর) এবং লেফটেন্যান্ট সুতফা জামান(আর্মি সার্ভিস কোর)।

<u>বিমান বাহিনীঃ</u> স্কোয়াড্রন লিডার রুমানা আকতার, বিমানবাহিনীর যে কোর্সে প্রথম নারী নেওয়া হয় তিনি সেই দলে ছিলেন বর্তমানে বিএফ শাহীন ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের (সেমস) অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মুনিরা হক, বিমান প্রকৌশলী।

<u>নৌবাহিনী ঃ</u> নৌবাহিনীর দুই চৌকস কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার(এলবিএন) তানিয়া সওগাত, এবং সাবলেফটেন্যান্ট সেহলিনা নাবিলা। নারী বলে সমুদ্রের হাতছানি থেকে কোন কিছুই তাদের দূরে সরিয়ে রাখতে

---

[১২৫].Wikipedia.org/wiki/Bangladesh_ police এবং প্রথম আলো, ৮ মার্চ ২০১৩।
[১২৬].জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১২।
[১২৭].দৈনিক ইত্তেফাক, ৭মার্চ ২০১৪।
[১২৮]. www.mofa .gov.bd

পারেনি।[১২৯]

এ প্রসঙ্গে জনাব আনসার আলী মল্লিক রাজ বলেন, "সামরিক বাহিনীতে কাজ করার সুয়োগ লাভ নারীর জন্য একটি বড় অর্জন। স্বনির্ভর (অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে) হবার ক্ষেত্রে, দেশের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। নারী অসহায়, দূর্বল, যুদ্ধের মত কঠিন কাজ নারীর জন্য নয় - এমন সব নেতিবাচক ভাবনার প্রতি এটি একটি চ্যালেঞ্জ। বিশ্বজুড়ে সামরিক বাহিনীতে নারী সফলতার সাথে দায়িত্ব পালন করছে এবং নারীর অংশ গ্রহণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে বাংলাদেশসহ বহুদেশে সামরিক বাহিনীতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী সদস্য নিয়োজিত আছেন এবং দক্ষতার সাথে তাদের দায়িত্ব পালন করছেন"।[১৩০] (সেনাবাহিনী, বিমান বাহিনী এবং নৌবাহিনীর দুই জন কর্মকর্তা করে ছয়জন কর্মকর্তার ছবি চিত্র ২(ক,খ, গ এ সংযুক্ত)।

৪. কুটনৈতিক পেশায় নারী

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নারীর প্রতিনিধিত্বের প্রয়োজনীয়তার কথা সর্বজন স্বীকৃত। বাংলাদেশে পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয় কর্তৃক কুটনৈতিক বিষয়টি পরিচালিত হয়। পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের কর্মকর্তাগণই কুটনীতিক হিসেবে বিদেশে নিয়োগ প্রাপ্ত হয়ে থাকেন। বর্তমানে পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ে ১৪৩ জন কর্মকর্তা কর্মরত তার মধ্যে ২৪ জন নারী কর্মকর্তা রয়েছেন। বিদেশে মোট ৫২ টি দেশে বাংলাদেশ মিশন কাজ করছে। তার মধ্যে ৫২ জন রাষ্ট্রদূতের মধ্যে রাষ্ট্রদূত পদে ২ জন নারী এবং মিশনগুলোতে ২৫ জন নারী বিভিন্ন পদে কর্মরত আছেন। অর্থাৎ ২ জন রাষ্ট্রদূত সহ বর্তমানে কুটনৈতিক পেশায় মোট ২৫ জন নারী রয়েছেন।[১৩১] দেশে এবং বিদেশে মিলিয়ে মোট ৪৯ জন নারী কর্মকর্তা কর্মরত। (বর্তমানে কর্মরত ৪৯ জন নারী কর্মকর্তাগণের একটি তালিকা পরিশিষ্ট ২৩ এ সংযুক্ত।

৫. জুডিশিয়ারীতে নারী

দেশের সর্বোচ্চ আদালত বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগে কর্মরত ৮ জন বিচার পতির মধ্যে ১ জন মহিলা বিচারপতি রয়েছেন। তিনি বিচারপতি নাজমুনআরা সুলতানা। তিনি গত ২৩ ফেব্রুয়ারী ২০১১ এ আপীলেট ডিভিশনে যোগদান করেন। বলা যায় বাংলাদেশে সর্বপ্রথম এই প্রথম একজন নারী বিচারপতি সর্বোচ্চ আদালতে নিয়োগ পেয়েছেন। আর সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশনে মোট ৮৬ জন বিচার পতির মধ্যে ৫ জন নারী বিচারপতি পদে রয়েছেন।

হাইকোর্টের অতিরিক্ত দুই জন বিচারপতির মধ্যে ১জন নারী বিচারপতি রয়েছেন। দেশে জেলা ও দায়রা জজ হিসেবে মোট ২০৪ বিচার পতির মধ্যে ২২ নারী, অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ (চীফ জুডিশিয়াল

---

[১২৯]. প্রথম আলো, ৮ মার্চ ২০১৩(আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০১৩ সংক্রান্ত বিশেষ পাতা)। (সেনাবাহিনী, বিমান বাহিনী এবং নৌবাহিনীর দুই জন করে ছয়জন কর্মকর্তার ছবি (চিত্র -২(ক,খ,গ) দ্রষ্টব্য ।

[১৩০]. আনসার আলি মল্লিক রাজ ঃ সামরিক বাহিনীতে নারী, জেন্ডার ও উন্নয়ন কোষ, ১ম খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ৬৪৭-৬৪৮।

[১৩১]. পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয় এবং www.mofa .gov.bd থেকে ২০১৩-১২-১২ তারিখ পর্যন্ত সংগৃহীত তথ্য থেকে।
(বর্তমানে কর্মরত ৪৯ জন নারী কর্মকর্তাগণের একটি তালিকা পরিশিষ্ট - ২৩ এ সংযুক্ত)।

ম্যাজিষ্ট্রেট)হিসেবে মোট ২১৫ জনের মধ্যে ২৩ জন নারী , যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ (অতিরিক্ত চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট) হিসেবে মোট ২৬৫ জনের মধ্যে ৪৬ জন নারী, সিনিয়র সহকারী জজ (সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট) হিসেবে মোট প্রায় ৪ শতাধিক এর মধ্যে ১৪৬ নারী এবং সহকারী জজ (জুডিশিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট) হিসেবে মোট প্রায় ৪শতাধিক জনের মধ্যে ৭৬ জন নারী বিচারপতি কর্মরত আছেন। অর্থাৎ মোট প্রায় ১৫৮০ জনের অধিক বিচার পতির মধ্যে মোট ৩২০ জন নারী বিচারপতি কাজ করছেন।[১৩২]

এতক্ষনের আলোচনায় প্রশাসনিক বিভিন্ন পর্যায়ে নারীদের অবস্থান দেখা যাচ্ছে। কখনও কখনও তা আশাপ্রদও বটে। কিন্তু নারী -পুরুষের সংখ্যা তুলনা করতে গেলে দেখা যায় পুরুষের তুলনায় নারীর সংখ্যা সমান তো নয়ই অর্ধেকের চেয়েও অনেক কম। এই বিষয়ে দুঃখ প্রকাশ করে জনাব শফি আহমদ বলেন," সরকারী পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ অথবা সুদূর প্রসারী ফলদায়ক কোনো নীতিমালা প্রণয়নে পদস্থ সরকারী অফিসার হিসেবে নারীর নিয়োগ উদ্বেগজনকভাবে কম" ।[১৩৩]

৪.৩.৯ নারীর স্বাস্থ্য ও পুষ্টি উন্নয়ন

সিডো সনদের ১২ নং ধারা , বি পিএফএ এর ৩ নং অনুচ্ছেদের প্রেক্ষিতে এবং মিলিনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল এর ৪, ৫, ৬, এর আলোকে বাংলাদেশ সরকার নারীর স্বাস্থ্য ও পুষ্টির উন্নয়নে সতর্ক। ২০১৫ সালের মধ্যে জাতীয়ভাবে জেন্ডার গোল বা লক্ষ্য সমূহ অর্জনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ এ স্বাস্থ্য ও পুষ্টির ক্ষেত্রে নিম্নের লক্ষ্যে সমূহ নির্ধারণ করা হয়েছে -

- নারীর জীবন চক্রের সকল পর্যায়ে যথা, শৈশব, কৈশোর, যৌবন, গর্ভকালীন সময়, এবং বৃদ্ধ বয়সে পুষ্টি, সর্বোচ্চ মানের শারিরীক ও মানসিক স্বাস্থ্য লাভের অধিকার নিশ্চিত করা;
- নারীর জন্য প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা শক্তিশালী করা;
- মাতৃ-মৃত্যু ও শিশু মৃত্যুও হার হ্রাস করা;
- এইডস রোগসহ সকল ঘাতক ব্যাধি প্রতিরোধ করা বিশেষতঃ গর্ভকালীন স্বাস্থ্যসহ নারীর স্বাস্থ্য সম্পর্কিত গবেষণা করা এবং স্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্যের প্রচার ও সচেতনতা বৃদ্ধি করা;
- নারীর পুষ্টি বিষয়ক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা;
- জনসংখ্যা পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নারীর প্রজনন স্বাস্থ্য ও প্রজনন অধিকারের বিষয়টি বিবেচনায় রাখা;
- বিশুদ্ধ নিরাপদ পানীয় জল ও পয়ঃনিস্কাশন ব্যবস্থায় নারীর প্রয়োজনের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া;
- উল্লেখিত সকল সেবার পরিকল্পনা, বিতরণ এবং সংরক্ষণে নারীর অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করা;

---

[১৩২]. আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রনালয়, আইন ও বিচার বিভাগ, মতামত শাখা, বাংলাদেশ সচিবালয়, থেকে সংগৃহিত তথ্য।

[১৩৩]. শফি আহমদ ॥ নারী ও সরকারী চাকরী, জেন্ডার ও উন্নয়ন কোষ, পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ৬২১।

- পরিবার পরিকল্পনা ও সন্তান গ্রহণের সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে পুরুষ ও নারীর সমান অধিকার নিশ্চিত করা;
- নারীর স্বাস্থ্য, শিশুর শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধি, জন্ম-নিয়ন্ত্রণে সাহায্য, কর্মস্থলে মা'র কর্মক্ষমতা বাড়ানো ও মাতৃবান্ধব কর্ম পরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মায়ের বুকের দুধের উপকারিতার পক্ষে যথোপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা;
- মায়ের দুধ শিশুর অধিকার, এই অধিকার (ছয় মাস শুধুমাত্র বুকের দুধ) নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শিশু প্রসবের সময় থেকে পরবর্তী ছয় মাস ছুটি ভোগের জন্য আইন ও বাস্তবায়ন করা এবং মাতৃত্বজনিত প্রয়োজনীয় ছুটি প্রদান করা।[১৩৪]

নীতিমালায় নির্ধারিত লক্ষ্য সমূহ বাস্তবায়ন অগ্রগতি হ'ল-

১. <u>স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান মন্ত্রনালয়ের কার্যক্রম</u>

স্বাস্থ্য ও পুষ্টির ক্ষেত্রে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ এর লক্ষ্য সমূহের আলোকে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান মন্ত্রনালয় কর্তৃক ব্যবস্থা গৃহিত হয় কারণ স্বাস্থ্যের সাথে দারিদ্র বিমোচনের এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সরাসরি যোগসূত্র রয়েছে। অসুস্থ্যতা দারিদ্রের ঝুকি বাড়ায় এবং দারিদ্র, মানুষের রোগব্যাধি ও অক্ষমতা বাড়ায়। অসুস্থতা ও দারিদ্রের এই দুষ্ট চক্র (Vicious Circle) সামগ্রিক অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। এ কারণে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে স্বাস্থ্য সেবা প্রাপ্তিকে প্রজাতন্ত্রের সকল নাগরিকের মৌলিক অধিকার হিসেবে গ্রহণ করেছে।

সে লক্ষ্যে নিম্নরূপ নারী - বান্ধব নীতি প্রধান জাতীয় স্বাস্থ্য নীতির কার্যাবলী স্থির করেছে -

- জাতীয় স্বাস্থ্য নীতিতে জেন্ডার সমতাভিত্তিক সেবা প্রতিষ্ঠাকল্পে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা, মাতৃমৃত্যুহার হ্রাস সহ নারীর জন্য প্রাথমিক প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করণ, গর্ভবতী নারীর পুষ্টি চাহিদা পূরণ ও প্রসূতি সেবা প্রদান, এইচ.আই.ভি/এইডস সহ যৌন রোগ হতে নারীকে সুরক্ষা, সকল স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে নারী বান্ধব কাঠামো নির্মাণ ইত্যাদির উপর গুরুত্ব দেয়া;
- জেন্ডার সমতা নিশ্চিত কল্পে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা, প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা, পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি নির্বাচন ও গ্রহণের ক্ষেত্রে নারীর প্রজনন অধিকার নিশ্চিত করণ, প্রজনন স্বাস্থ্যে ও উন্নয়ন, বুকের দুগ্ধ প্রদানকারী মা ও বয়ো:সন্ধিকালীন কিশোরীদের পুষ্টি চাহিদা পূরণ, যৌন রোগের বিষয়ে নারীর সচেতনতা বৃদ্ধি, নারীবান্ধব হাসপাতাল সৃষ্টি, স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণে নারীর সুযোগ, প্রসব পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সেবা সহ প্রয়োজনীয় প্রসূতি সেবা নিশ্চিত করণ এবং লিঙ্গ সমতা কৌশল পুণ:মূল্যায়ন ও সংস্কারের উপর গুরুত্ব দেয়া।
- স্বাস্থ্য সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত ও সহজলভ্য করার জন্য ২০১১-১৬ মেয়াদে স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাত উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ ;
- মাতৃ মৃত্যু হার ২০১০ এর ১.৯৪ থেকে ২০১৬ এ ১.৪৩ এ কমিয়ে আনা সহ বাড়ী বাড়ী পরিদর্শনের মাধ্যমে মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা প্রদান, কমিউনিটি পর্যায়ে দক্ষ ধাত্রী নিয়োগের মাধ্যমে নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিতকরণ, জরুরী প্রসূতি সেবা ও বয়:সন্ধি প্রাপ্তদের প্রজনন সেবা প্রদান ইত্যাদি।

[১৩৪].জাতীয় নারী উন্নয়ন ২০১১, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৪।

একই সাথে নিম্নোক্ত কার্যক্রমও চলছে-

- মাতৃ মৃত্যু রোধ সহ নারীদের প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার নিশ্চিতকরণ কল্পে ইতোমধ্যে ১০,৭২৩ টি কমিউনিটি ক্লিনিক চালু হয়েছে;
- গরীব, দুস্থ ও জটিল গর্ভবতী নারীদের উপজেলা পর্যায়ে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ৭৩টি উপজেলায় মাতৃস্বাস্থ্য ভাউচার স্কীম কার্যক্রম সম্প্রসারিত করা হচ্ছে। যার মাধ্যমে ২ লক্ষ ৮০ হাজার নারী উপকৃত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে;
- নাারীদের অপুষ্টিজনিত সমস্যা নিরসনে ১৭৩ টি উপজেলায় জাতীয় পুষ্টি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এর ফলে ০২ কোটি ৫০ লক্ষ মহিলা ও কিশোরীর অপুষ্টি জনীত সমস্যা রোধ করা যাবে;
- ৩৫টি জেলা হাসপাতাল ও ১৫টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে নারী বান্ধব হাসপাতাল ইনিশিয়েটিভ কর্মসূচির আওতায় আনা হচ্ছে; [১৩৫]
- মহিলা অধিদপ্তরের মাধ্যমে পল্লী অঞ্চলের দরিদ্র মা'দের গর্ভকালীন সময় থেকে বাচ্চা প্রসবের পর ২(দুই) বৎসর সময় কাল পর্যন্ত এবং শহর এলাকার গার্মেন্টস এর নারী শ্রমিকদের তথা কর্মজীবি দুগ্ধদাত্রী মায়েদের **(Lactating Mother Allowance)** অনুদান প্রদান করা হয়। (পূর্বে ৪.৫ অনুচ্ছেদে বিস্তারিত বলা হয়েছে)।

২. মা ও শিশু পরিচর্যা

বাংলাদেশে বিশেষ করে স্বাস্থ্য সুবিধাদি বঞ্চিত গ্রামীন জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে নানামুখী নীতি ও কার্যক্রম গ্রহণের ফলে স্বাস্থ্য পরিস্থিতির ইতিবাচক উন্নতি হয়েছে। থানা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ৩৪৯টি মা ও শিশু পরিচর্যা ইউনিট, ৯০টি শিশু কল্যান কেন্দ্র, ৩০০০ পরিবার কল্যান কেন্দ্র এবং ৩০,০০০ স্যাটেলাইট ক্লিনিক (প্রতিমাসে) কাজ করছে। প্রতি স্যাটেলাইট ক্লিনিকে ৭ থেকে ৮ হাজার লোকের সেবা প্রদান করা হয়ে থাকে। প্রায় ৪০০ এনজিও কর্তৃক ১২০০০ কর্মচারীর মাধ্যমে পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদান করে থাকে।[১৩৬]

এ ছাড়া স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান মন্ত্রনালয়ের আওতায় জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রন ও প্রজনন স্বাস্থ্যের উন্নয়ন কার্যক্রমের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদান, প্রয়োজনীয় ওষধ পত্র সরবরাহ, মাঠ কর্মীদের ডোর টু ডোর ভিজিট, চাহিদা অনুযায়ী উপযোগী প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়ে থাকে।[১৩৭]

আবার স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতায় ৬টি সিটি কর্পোরেশন এবং ৫টি বড় পৌর সভায়, ১৬৭টি প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র ও ২৮টি মাতৃসদনের মাধ্যমে প্রায় ৯০ লক্ষ দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে বিশেষ করে নারী ও শিশুকে প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হচ্ছে। দরিদ্র নারীদের উন্নত স্বাস্থ্য সেবা প্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টি হওয়ায় তাদের

[১৩৫]. জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদন, ২০১১-২০১২, পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ২৮-২৯।

[১৩৬].Bangladesh – Health and population Sector Strategy ,স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রনালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, পৃঃ ১০০

[১৩৭].জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদন, ২০১১-২০১২, পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ২৮-২৯।

Dhaka University Institutional Repository

জীবন যাত্রার মান বৃদ্ধি পাবে এবং অর্থনৈতিক কর্মে অংশ গ্রহণ বাড়বে।[১৩৮]

গত দুই দশকে স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা সম্পর্কিত সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (এম.ডি.জি) কারণে উল্লেখযোগ্য পর্যায়ে বিশেষতঃ নবজাতকের ও শিশুমৃত্যু হার হ্রাস পেয়ে ২০০৭ সালে প্রতিহাজারে নবজাতকের মৃত্যু হার ৩৭ এবং ৫ বছরের নীচে শিশু মৃত্যু হার ৬৫ এ দাঁড়িয়েছে। শিশু মৃত্যু হার হ্রাসের ক্ষেত্রে সাফল্যের কারণে বাংলাদেশ ২০১০সালে United Nations M.D.G Award-এ ভূষিত হয়েছে। এ ছাড়া মাতৃমৃত্যু হার ২০০৮ সালের ৩৪৮ (প্রতি লক্ষ জীবিত জন্মে) থেকে ২০১০ এ ১৯৪ এ হ্রাস পেয়েছে, যা প্রত্যাশিত হ্রাসের চেয়ে ৪০ পয়েন্ট কম।

এ ছাড়া মোট প্রজনন হার (টি.এফ.আর) ১৯৭০-৭৫ এর ৬.৩ হতে ২০০৭ এ ২.৭ এ নেমে এসেছে- যা বিশ্বের অন্যতম দ্রুত হ্রাসের হার হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে।[১৩৯]

৪.৩.১০ জেন্ডার বাজেট তথা জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট প্রণয়ন

'জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১' এ - জেন্ডার বাজেট তথা জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট প্রণয়নে জাতীয় অর্থনীতির সকল কর্মকান্ডে নারীর সক্রিয় ও সমঅধিকার নিশ্চিত করণ, নারীর ক্ষমতায়ন সহ নারীকে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় আনয়ন সংক্রান্ত নিম্নে উল্লেখিত লক্ষ্য সমূহ নির্ধারণ করা হয়েছে -

- নারী উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট প্রণয়ন কার্যক্রম অব্যাহত রাখা;
- জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা এবং মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামোর আওতায় তথা রাষ্ট্রীয় বাজেট প্রণয়নের ক্ষেত্রে জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট প্রক্রিয়া (Gender Responsive Budgeting, GRB) অনুসরণ অব্যাহত রাখা।
- বাজেটকৃত অর্থের সর্বোত্তম ও যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ করার কাঠামো শক্তিশালী করা;
- জেন্ডার ভিত্তিক পৃথক তথ্য/ উপাত্ত সংগ্রহ, সন্নিবেশ এবং নিয়মিত প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
- সরকারী ও বেসরকারী গবেষণা কেন্দ্র, ব্যুরো অব স্ট্যাসিটিকস এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রাথমিক তথ্য/ উপাত্ত সংগ্রহকারী অঙ্গসমূহ নারীর অবস্থান ও ভূমিকা সম্বলিত জেন্ডার বিভাজিত ডাটাবেইজ গড়ে তুলবে;
- সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রনালয়/ দপ্তর, কর্পোরেশন, ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্টান সকল কাজের জন্য জেন্ডার

---

[১৩৮].বার্ষিক প্রতিবেদন(২০১১-২০১২), স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, পৃঃ ১০৪ এবং জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদন(২০১১-১২), অর্থবিভাগ, অর্থমন্ত্রনালয়, ২০১১-১২,পৃ: ৫০ এবং প্রথম আলো, ১০ জুন ২০১৩।

[১৩৯]. জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদন,২০১১-২০১২, পৃ ঃ ২৭-২৯।

ভিত্তিক তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং প্রকাশনার ব্যবস্থা করা।[১৪০]

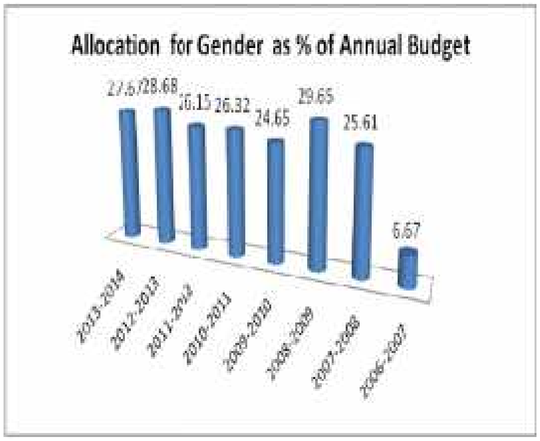

বাংলাদেশের জেন্ডার সংবেদনশীল জাতীয় বাজেট দলিল

বাজেট হলো সরকারের আর্থিক নীতির প্রতিফলন সম্পন্ন এক বছর মেয়াদি একটি দলিল। প্রচলিত বাজেটে জেন্ডার সংবেদনশীল বিশ্লেষণ ঘটিয়ে প্রণয়ন করা হয় জেন্ডার বাজেট। গত চার বছর যাবত বাংলাদেশ সরকার জাতীয় বাজেট দলিলের পাশাপাশি জেন্ডার বাজেট সংক্রান্তপৃথক একটি দলিল ও প্রণয়ন করছে। প্রথম বছরে ৪টি, দ্বিতীয় বছরে ১০টি এবং তৃতীয় বছরে ২০টি এবং চতুর্থ বছরে প্রায় সব ক'টি মন্ত্রনালয় / বিভাগকে অন্তর্ভুক্ত করে নারী উন্নয়ন ও অধিকারকে গুরুত্বারোপ করে প্রণীত হয়েছে জেন্ডার বাজেট। অর্থাৎ জেন্ডার সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে জেন্ডার বাজেট প্রণয়নেও বাংলাদেশ কার্যক্রম গ্রহণ করছে।

এ বিষয়ে সরকারের দৃঢ় অভিমত হলো - " একটি সমন্বিত মূল্যবোধ সম্পন্ন এবং টেকসই আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে সমাজের সর্বস্তরে বিদ্যমান জেন্ডার বৈষম্য হ্রাস, ও বঞ্চনার অবসান, নারীর কল্যান ও সাম্য নিশ্চিত করা" ।[১৪১] দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ও দারিদ্র বিমোচনে নারীর অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করা, নারীদের সচেতন ও প্রত্যয়ী করা এবং সমঅধিকার সম্পর্কে নারীদের উদ্বুদ্ধ ও দক্ষ করে তোলার প্রতিই মূল লক্ষ্য স্থির করেছে - জেন্ডার বাজেট। এই লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশেই প্রণীত হচ্ছে জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদন।

প্রদর্শিত প্রামান্য চিত্র ২ এ ২০০৬ -২০০৭ থেকে ২০১৩-২০১৪ পর্যন্ত বছর ভিত্তিক জেন্ডার বাজেট বরাদ্দ দেখানো হয়েছে।[১৪২] চিত্রটি থেকে এটি স্পষ্ট যে, ২০০৬-২০০৭ থেকে ২০১৩ - ২০১৪ পর্যন্ত জেন্ডার ভিত্তিক বাজেট কমেনি বরং বেড়েই চলেছে। বাজেট বৃদ্ধির কারণ এখানেও যে প্রতি বছরই মন্ত্রনালয়ের সংখ্যা বেড়েছে। অল্প কয়েকটি মন্ত্রনালয় নিয়ে শুরু হয়ে ২০১০- ১১ এ মাত্র ৫টি, ২০১১ -২০১২ এ ২০টি এবং ২০১২ -২০১৩ ও ২০১৩ -২০১৪ এ মোট ৫৬ টি মন্ত্রনালয়, দপ্তর সংস্থার অনুকুলে জেন্ডার ভিত্তিক বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে।

প্রামান্য চিত্র ২

উল্লেখিত বাজেট প্রদানের মাধ্যমে বর্তমানে বাংলাদেশ সরকারের আওতাধীন কেবল মাত্র সরকারী কর্মকমিশন ব্যতীত সকল মন্ত্রনালয়, বিভাগ, আদালত, সংস্থা- সংগঠন জেন্ডার বাজেট প্রাপ্তির আওতায় চলে এসেছে। সরকারী কর্মকমিশনে নারী উন্নয়নে সরাসরি কোন প্রভাব নেই উল্লেখ পূর্বক কোন বরাদ্দ প্রদান করা হয়নি।[১৪৩]

---

[১৪০].জাতীয় নারী উন্নয়ন ২০১১, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৯।

[১৪১]. **জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদন ২০১১-১২, পূর্বোক্ত, পৃ: ০৪।**

[১৪২].অর্থমন্ত্রনালয় সংক্রান্ত Website(www.mof.gov.bd) থেকে সংগৃহীত।

[১৪৩]. **মধ্য মেয়াদী বাজেট কাঠামো, ২০১২-১৩ হতে ২০১৬-১৭, পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ১৮৮।**

৪.৩.১১ নারীর প্রতি সকল প্রকারের নির্যাতন/সহিংসতা দূরীকরণ

সিডো সনদের ৬নং অনুচ্ছেদ এবং বেইজিং পিএফএর ৪নং লক্ষ্যে এবং মিলিনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল এর ৩নং গোল এর আলোকে বাংলাদেশ তার জাতীয় প্রেক্ষিতের বিবেচনায় ২০১৫ সালের মধ্যে জাতীয় ভাবে নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা দূরীকরনে বিশেষ করে নারী ও শিশু নির্যাতন যদি পুরোপুরি বন্ধ করা নাও য়ায়, তা হলে তা উল্লেখযোগ্য ভাবে হ্রাস করার অঙ্গীকার ঘোষণা করেছে। এ লক্ষ্যে প্রণীত' জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিতে' (২০১১) নারী নির্যাতন সম্পর্কে স্থিরকৃত লক্ষ্য / কৌশল সমূহ হ'ল-

- নারীর প্রতি সকল প্রকার নির্যাতন দূরীকরণ;
- পারিবারিক ও সামাজিক পর্যায়ে এবং কর্মক্ষেত্রে নারীর প্রতি শারীরিক, মানষিক,যৌন নিপীড়ন, ধর্ষণ, পতিতাবৃত্তিতে নিয়োগ, যৌতুক ও নারীর প্রতি সহিংসতা দূর করা:
- নারী নির্যাতন প্রতিরোধ সম্পর্কিত প্রচলিত আইন যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে সংশোধন এবং নতুন আইন প্রণয়ন করা;
- নির্যাতিত নারীকে আইনগত সহায়তা দেওয়া;
- হিসেবে নারীর প্রতি নির্যাতন দূরীকরণ এবং এ ক্ষেত্রে আইনের যথাযথ প্রয়োগের জন্য বিচার ব্যবস্থায় এবং পুলিশ বাহিনীর সর্বস্তরে বর্ধিত হারে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা;
- বিচার বিভাগ ও পুলিশ বিভাগকে নারীর অধিকার সংশ্লিষ্ট আইন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া ও জেন্ডার সংবেদনশীল করা;
- নারী ও মেয়ে শিশু নির্যাতন ও পাচার সম্পর্কীয় অপরাধের বিচার ছয় মাসের মধ্যে নিষ্পন্ন করার লক্ষ্যে বিচার পদ্ধতি সহজতর করা। [১৪৪]

এই লক্ষ্য সমূহ অর্জনের জন্য বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক সকল প্রকার নির্যাতন দূরীকরনের লক্ষ্যে বাংলাদেশে আইনী বিধিব্যবস্থার কোন অভাব নেই। বিদ্যমান আইন- বিধি ব্যবস্থা সমূহ হ'ল -

১. দন্ডবিধি ১৮৬০(The Penal Code 1860)
২. বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ১৯২৯/ বাল্য বিবাহ নিরোধ আইন ২০১৪।
৩ .মাতৃকল্যান আইন,১৯৩৯
৪. ফ্যাক্টরী আইন, ১৯৫৬
৫.বাংলাদেশ শ্রম আইন - ২০০৬ এর সংশোধন আইন বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধন) আইন, ২০১৩
৬. মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ,১৯৬১
৭. পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ,১৯৮৫(সংশোধনী ১৯৮৯)
৮. পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১০

---

[১৪৪] .জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি, ২০১১, পৃ ঃ ১৬।

৯. মুসলিম বিবাহ রেজিষ্ট্রেশন আইন,১৯৭৪
১০. যৌতুক নিরোধ আইন, ১৯৮০(সংশোধনী ১৯৮৬)
১১. নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০(সংশোধনী ২০০৩)
১২. মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন ২০১২
১৩. এসিড অপরাধ দমন আইন,২০০২
১৪. জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন আইন, ২০০৪
১৫. যৌন হয়রানি/ ইভটিজিং রোধে বিদ্যমান আইন এবং মহামান্য হাইকোর্টের ঐতিহাসিক রায়
১৬. ভ্রাম্যমান আদালত আইন -২০০৯
১৭.ফতোয়ার বিরুদ্ধে দেওয়া মহামান্য হাইকোর্টের ঐতিহাসিক রায়
১৮.নাগরিকত্ব আইন (সংশোধিত), ২০০৯
১৯. গৃহকর্মী নির্যাতন প্রতিরোধে নীতিমালা

নিম্নে এক এক করে উল্লেখিত আইন এবং বিধিবিধান সমূহের উপর আলোকপাত করা হ'ল-

১. দন্ডবিধি ১৮৬০ (The Penal Code 1860)

দন্ডবিধিতে শুধু মাত্র নারী ও শিশু নির্যাতন সংক্রান্ত অপরাধ ও অপরাধের সাজা সংশ্লিষ্ট ধারা সমূহ নিম্নরূপ-

সারণী-১৪

দন্ডবিধিতে শুধু মাত্র নারী ও শিশু নির্যাতন সংক্রান্ত অপরাধ ও অপরাধের সাজা এবং সংশ্লিষ্ট ধারা

নারী ও শিশু নির্যাতন সংক্রান্ত অপরাধ	সাজার পরিমান	ধারা
কোন গর্ভবতী নারীর জীবনরক্ষার উদ্দেশ্য ব্যতীত গর্ভপাত করানো হলে,এবং গর্ভস্থ শিশু গর্ভে সচল হয়ে ওঠার পর গর্ভপাত করানো হলে,	যে কোন বর্ণনার কারাদন্ড মেয়াদ তিন বৎসর হতে পারে বা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ড এবং যে কোন বর্ণনার কারাদন্ড মেয়াদ সাত বৎসর হতে পারে বা অর্থ দন্ডে দন্ডিত হবে;	৩১২
নারীর সম্মতি ব্যতিরেকে গর্ভপাত করানো হলে,	যাবজ্জীবন কারাদন্ড অথবা দশ বৎসর পর্যন্ত যে কোন মেয়াদের কারাদন্ড এবং অর্থদন্ডে দন্ডিত হবে;	৩১৩
গর্ভপাত করাতে গিয়ে গর্ভিনী নারীর মৃতু ঘটালে,	দশ বৎসর পর্যন্ত যে কোন মেয়াদের কারাদন্ড বা অর্থদন্ডেবা উভয় দন্ডেদন্ডিত হবে;	৩১৪
গর্ভস্থ শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্বে বা পরে শিশুর মৃত্যু ঘটাবার উদ্দেশে কার্যক্রম গৃহীত হলে,	অনুর্ধ দশ বৎসর কারাদন্ড এবং অর্থদন্ডে দন্ডিত হবে;	৩১৫
জীবন্ত অজ্ঞাত শিশুর মৃত্যু ঘটানো হলে	অনুর্ধ দশ বৎসর কারাদন্ড এবং অর্থদন্ডে দন্ডিত হবে;	৩১৬

কোন শিশুকে, যার বয়স বার বছরের কম তাকে তার বাবা, মাতা কিংবা তত্বাবধায়ক কর্তৃক পরিত্যাগ করা হলে ;	অনুর্ধ সাত বৎসর কারাদন্ড বা অর্থদন্ডে দন্ডিত হবে;	৩১৭
শিশুর জন্ম গোপন করার উদ্দেশ্যে মৃত ভূমিষ্ঠ শিশু কিংবা ভূমিষ্ঠের পর মৃত শিশুর মৃতদেহ কবর বা অন্য ব্যবস্থা করে ইচ্ছাকৃতভাবে শিশুর জন্ম গোপন করে বা গোপনের চেষ্টা করলে,	দুই বৎসর পর্যন্ত যে কোন মেয়াদের কারাদন্ড বা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হবে;	৩১৮
কোন নারীকে বিবাহ বা যৌন সংসর্গে বাধ্য করবার নিমিত্তে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে অপহরণ বা হরণ করা হলে,	অনুর্ধ দশ বৎসর কারাদন্ড এবং অর্থদন্ডে দন্ডিত হবে;	৩৬৬
কোন ব্যক্তি এইরূপ অভিপ্রায়ে কোন উপায়ে ১৮ বছরের কম বয়সের অপ্রাপ্ত বয়স্কা বালিকাকে অন্য কোন ব্যক্তির সাথে অবৈধ যৌন সহবাস করতে বাধ্য বা প্রলুব্ধ করবার প্রচেষ্টা গ্রহণ করলে;	অনুর্ধ দশ বৎসর কারাদন্ড এবং অর্থদন্ডে দন্ডিত হবে;	৩৬৬(ক)
২১ বছরের কম বয়সের কোন বালিকাকে অন্য কোন ব্যক্তির সাথে অবৈধ যৌন সহবাস করতে বাধ্য বা প্রলুব্ধ করার অভিপ্রায়ে বাংলাদেশের বহির্ভূত কোন দেশ থেকে বাংলাদেশে আমদানী করলে,	অনুর্ধ দশ বৎসর কারাদন্ড এবং অর্থদন্ডে দন্ডিত হবে;	৩৬৬(খ)
বেশ্যাবৃত্তি ইত্যাদির উদ্দেশ্যে অপ্রাপ্ত বয়স্ক মেয়েকে বিক্রয় করলে ,	অনুর্ধ দশ বৎসর কারাদন্ড এবং অর্থদন্ডে দন্ডিত হবে;	৩৭২
বেশ্যাবৃত্তি ইত্যাদির উদ্দেশ্যে অপ্রাপ্ত বয়স্ক মেয়েকে ক্রয়,	অনুর্ধ দশ বৎসর কারাদন্ড এবং অর্থদন্ডে দন্ডিত হবে;	৩৭৩
নারী ধর্ষণ,	যাবজ্জীবন কারাদন্ড বা দশ বছরের মধ্যে যে কোন মেয়াদেও কারাদন্ড এবং অর্থদন্ডে বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হবে;	৩৭৬
প্রতারণামূলক ভাবে আইনানুগ বিবাহের বিশ্বাসে প্ররোচিত করে কোন ব্যক্তি কর্তৃক কোন নারীকে স্বামী -স্ত্রী রূপে সহবাস করলে,	অনুর্ধ দশ বৎসর কারাদন্ড এবং অর্থদন্ডে দন্ডিত হবে;	৪৯৩
স্বামী বা স্ত্রীর জীবদ্দশায় পুনরায় বিবাহকরণ,	অনুর্ধ সাত বৎসর কারাদন্ড এবং অর্থদন্ডে দন্ডিত হবে;	৪৯৪
পূর্ববর্তী বিয়ের কথা গোপন করে পরবর্তী বিয়ের চুক্তি করা হলে,	অনুর্ধ দশ বৎসর কারাদন্ড এবং অর্থদন্ডে দন্ডিত হবে;	৪৯৫

আইন সঙ্গত বিয়ে সম্পাদন ব্যতিরেকে প্রতারণামূলক ভাবে বিবাহ অনুষ্ঠান উদযাপন করা হলে,	অনুর্ধ সাত বৎসর কারাদন্ড এবং অর্থদন্ডে দন্ডিত হবে;	৪৯৬
ব্যভিচার করা হলে,	অনুর্ধ পাঁচ বৎসর কারাদন্ড বা অর্থদন্ডে বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হবে;	৪৯৭
[কোন বিবাহিতা নারীকে অপরাধমূলক উদ্দেশ্যে প্রলুব্ধকরণ বা অপহরণ বা আটককরণ এর জন্য,	অনুর্ধ দুই বৎসর কারাদন্ড এবং অর্থদন্ডে দন্ডিত হবে	৪৯৮
কোন নারীর শালীনতার অমর্যাদার উদ্দেশ্যে কোন মন্তব্য, অঙ্গভঙ্গি বা কোন কাজ করা হলে,	অনুর্ধ এক বৎসর বিনাশ্রম কারাদন্ড বা অর্থদন্ডে বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হবে	৫০৯[১৪৫]

উল্লেখ্য যে দন্ডবিধির অন্যান্য ধারা সমূহ থেকেও নারীরা বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে আইনের আশ্রয় নেওয়ার অধিকারী।

২. বাল্য বিবাহ নিরোধ আইন ১৯২৯ এবং বাল্য বিবাহ নিরোধ আইন ২০১৪ (The Child Marriage Restraint Act 1929 and 2014)

বাল্য বিবাহ নিরোধ আইন ১৯২৯এর ২(খ) ধারায় 'বাল্য বিয়ে' বলতে সেই বিয়েকে বলা হয়েছে যাতে সম্পর্ক স্থাপনকারী পক্ষদ্বয়ের যে কোন একজন নাবালক হবে। ২(ক) ধারায় বলা হয়েছে 'শিশু' বলতে তাকেই বোঝাবে যার বয়স পুরুষ হলে ২১ বৎসরের কম এবং নারী হলে ১৮ বৎসরের কম এবং 'নাবালক' বলতে পুরুষের বেলায় ২১ বছরের কম এবং নারীর বেলায় ১৮ বছরের কম যে কোন ব্যক্তিকে বোঝাবে।

আইনের ৬(২) ধারায় বলা হয়েছে "এই আইনে শাস্তি প্রদানের উদ্দেশে, যতক্ষন পর্যন্ত বিপরীত কিছু প্রমাণিত না হয়, ধরে নেওয়া হবে যে, যেখানে কোন নাবালক বাল্য বিয়ে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছে সেখানে উক্ত নাবালকের উপর কর্তৃত্ব করার ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তির বিয়েটি বন্ধ করার ব্যাপারে গাফিলতির দরুন তা অনুষ্ঠিত হয়েছে"।

এই আইনের বিধি অনুসারে বাল্য বিয়ের জন্য শাস্তির বিধান খুবই কম। তা হ'ল একমাস অবধি বিনাশ্রম কারাদন্ড কিংবা ১০০০ টাকা অবধি জরিমানা বা উভয় দন্ড।

যা নিম্নে সারণী ১৬ এ দেখানো হ'ল-

[১৪৫]. গাজী শামছুর রহমান ঃ দন্ডবিধির ভাষ্য, ৪র্থ সংস্করণ খোশরোজ কিতাব মহল, ঢাকা, ১৯৯২,পৃঃ ১০৫৪-১০৬৮, ১১৬৮ -১১৭৬, ১১৮৩-১১৮৬, ১১৯৩, ১৪৬১ -১৪৭৩ এবং ১৫৩১ -১৫৩২।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী - ১৬

বাল্য বিয়ের জন্য শাস্তি (বাল্য বিবাহ নিরোধ আইন ১৯২৯)

বাল্য বিয়ে জনিত সংগঠিত অপরাধ	সাজার পরিমান	ধারা
কোন পুরুষ কিংবা নারী নাবালক পুরুষ কিংবা নারীকে বিয়ে করার চুক্তি করলে	একমাস অবধি বিনাশ্রম কারাদন্ড কিংবা ১০০০ টাকা অবধি জরিমানা বা উভয় দন্ড	৪
যিনি বাল্য বিয়ে অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা বা পরিচালনা করবেন	একমাস অবধি বিনাশ্রম কারাদন্ড কিংবা ১০০০ টাকা অবধি জরিমানা বা উভয় দন্ড	৫
বাল্য বিয়ে সংশ্লিষ্ট পিতা-মাতা/অভিবাবক	একমাস অবধি বিনাশ্রম কারাদন্ড কিংবা ১০০০ টাকা অবধি জরিমানা বা উভয় দন্ড তবে কোন মহিলাকে কারাদন্ডে দন্ডিত করা যাবেনা	৬(১)[১৪৬]

বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ২০১৪

বাল্য বিয়ে নিরোধ আইন, ১৯২৯ শাস্তির যে বিধান দেখানো হলো সম্ভবতঃ সে কারণেই বিদ্যমান আইনটির বাস্তবায়ন নেই বললেই চলে। সে জন্যই বর্তমানে যুগোপযোগী করে বাল্য বিবাহ নিরোধ আইন, ২০১৪ এর সেপ্টেম্বর মাসে জরিমানা ও সাজার মেয়াদ বাড়িয়ে একটি আইন প্রণীত হয়েছে। যা বর্তমানে আইন মন্ত্রনালয়ে ভেটিং এর জন্য প্রেরীত হয়েছে। তবে বিয়ের বয়স ১৮ রেখেও ১৬ এর একটি সুযোগ রাখা হচ্ছে।[১৪৭] আইনের কিছু ধারা প্রথমআলো, ২৮ জানুয়ারী এবং ১১ ফেব্রুয়ারী ২০১৪ এ প্রকাশিত হয়েছে। তা নিম্নরূপ-

- বিয়ের সময় মেয়র বয়স ১৮ বছরের কম এবং ছেলের বয়স ২১ বছরের কম হলে তা বাল্য বিবাহ হবে;
- আদালত এই আইনের অধীনে সংশ্লিষ্ট যে কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে সেই বিয়ে অনুষ্ঠানে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে পারবেন;
- এ ধরনের নিষেধাজ্ঞা থাকার পরও কোনো ব্যক্তি তা অমান্য করলে সর্বোচ্চ ২ বছরের বিনাশ্রম কারাদন্ড বা ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ড বা উভয়দন্ডে দন্ডনীয় হবেন;
- শিশু বা নাবালকের বিয়ের সম্পর্ক স্থাপনের চুক্তিকারী দুই বছর পর্যন্ত বিনাশ্রম কারাদন্ড বা ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হবেন;
- বাল্যবিবাহ অনুষ্ঠান বা পরিচালনাকারী এবং বিয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত বাবা-মা অথবা অভিবাবকদেরও

[১৪৬]. জেন্ডার সাম্য ও সমতা - (বাংলাদেশে নারী সম্পর্কিত আইন ও প্রাসঙ্গিক বিষয় - বাল্য বিবাহ নিরোধ আইন) ঃ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয় , ২০০৮, পৃঃ ১১৩ -১১৫।

[১৪৭]. মহিলাও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয় থেকে প্রাপ্ত তথ্য।

একই শাস্তি হবে;

- স্বেচ্ছায় বাল্যবিবাহ অনুষ্ঠান বা আয়োজনে সহায়তাকারী নিকাহ রেজিষ্টারের নিবন্ধন বাতিল করা হবে;
- বিয়ের বয়স প্রমাণের জন্য বিয়ে পরিচালনাকারীর কাছে জন্মনিবন্ধন বা জাতীয় পরিচয়পত্র বা পাসপোর্ট বা এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষার সনদ দেখাতে হবে।

কোন বাল্য বিয়ের ক্ষেত্রে আদালতের নিষেধাজ্ঞা থাকলে ও বিয়ে সংগঠিত হলে আদালত তা বাতিলের আদেশ দিতে পারবেন। জালিয়াতি, প্রতারণা, জোরপূর্বক বা পাচারের মাধ্যমে ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়ে এবং ধর্ষণ, পরে ধর্ষকের সঙ্গে বিয়েতে বাধ্য করা হলে সে বিয়েও বাতিল হবে। এ ধরনের বিয়ের ফলে জন্ম গ্রহণকারী শিশুর নিরাপত্তা, হেফাজতও ভরণ-পোষণের দায়িত্ব আদালত নির্ধারণ করবেন।[১৪৮] আইনটি একেবারে সাম্প্রতিক সময়ের। আইন মন্ত্রনালয়ে ভেটিং শেষে খুব শীঘ্রই প্রচলিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

৩. মাতৃকল্যান আইন, ১৯৩৯/(Maternal Welfare Act,1939)

সন্তান প্রসবের পূর্বে ও পরে কিছুদিনের জন্য নারীদের চাকুরিতে কিছু সুযোগ সুবিধা প্রদান এবং মাতৃত্বকল্যান ভাতা প্রদান কল্পে প্রণীত হয় ‘মাতৃকল্যান আইন, ১৯৩৯। ১৯৪০ সালের ১ জানুয়ারী থেকে এ আইন কার্যকর হয়।

মোট ১৫টি ধারা ও কিছু উপধারা সম্পৃক্ত এই আইনের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ধারা হ’ল-

ধারা ৩ থেকে ৫ নং ধারায় - মহিলা শ্রমিক তার সন্তান প্রসবের আগে ও পরে ছুটি পাবার এবং মাতৃত্ব ভাতা প্রাপ্তির বিধান বর্ণিত হয়েছে। ৮, ৯ ও ১০ ধারায় অন্তঃসত্ত্বা কাজে অনুপস্থিতির জন্য মালিকের অনুমতি পাওয়া সত্বেও কোন মহিলা শ্রমিক মজুরীর বিনিময়ে কাজ করলে অনধিক ২৫ টাকা জরিমানা হবে। মালিকও এ আইনের বিধান ভঙ্গ করলে ৫০ টাকা জরিমানা হবে। ১৫ নং ধারা অনুযায়ী মহিলারা কর্মরত আছে এরূপ প্রতিষ্ঠানে প্রকাশ্যে এই আইনের বিধান প্রদর্শন করে রাখতে হবে।[১৪৯]

এই আইনটি নারী শ্রমিকদের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় আইন। যদিও আইনটি সম্পর্কে যথেষ্ট প্রচার নেই এবং নারী শ্রমিকদের এ সম্পর্কে জানাও নেই। ফলে সহজেই নারী শ্রমিকরা বৈষম্যের শিকার হয়ে থাকে।

৪. ফ্যাক্টরী আইন, ১৯৫৬ (Factory Law 1956)_

১৯৫৬ সালে পাশ হয় ফ্যাক্টরী আইন। নারী শ্রমিকদের অনুকূলে এই আইনের উল্লেখযোগ্য ধারা সমূহ হলো-

ধারা ৩৬ - দৈহিক ক্ষতি হতে পারে এধরনের ভারী কাজ নারী শ্রমিকদের দ্বারা করানো যাবেনা। নারী শ্রমিকরা ১২ সপ্তাহের অনধিক মাতৃত্বকালীন ছুটি পাবে;

ধারা ৪৩ - প্রত্যেক ফ্যাক্টরীতে পুরুষও নারী শ্রমিকদের জন্য পৃথক ভাবে ধৌতকরণ ব্যবস্থা রাখতে হবে;

---

[১৪৮].বাল্য বিবাহ নিরোধ আইন, ২০১৪। প্রথমআলো, ২৮ জানুয়ারী এবং ১১ ফেব্রুয়ারী ২০১৪।

[১৪৯].শেখ মেহেদী হাসান ঃ মাতৃকল্যান আইন ১৯৩৯, জেন্ডার ও উন্নয়ন কোষ, পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ২৩৩, ২৩৪।

ধারা ৪৪- ফ্যাক্টরীর প্রত্যেক বিভাগে ১৫০ জন শ্রমিকের জন্য প্রাথমিক চিকিৎসায় প্রশিক্ষন প্রাপ্ত একজন ব্যক্তিসহ উপযুক্ত সরঞ্জামাদী বিদ্যমান থাকতে হবে;

ধারা ৪৫-৪৬ -আড়াইশতাাধিক ব্যাক্তি ফ্যাক্টরীতে কর্মরত থাকলে তাদের খাবারের জন্য ক্যান্টিনের ব্যবস্থা থাকতে হবে। ক্যান্টিনের ব্যবস্থা করা না গেলে তাদের জন্য একটি বিশ্রাম কক্ষ ও স্বাস্থ্য সম্মত আহারের কক্ষ থাককেত হবে যাতে তারা তাদের আনা খাবার খেতে পারে;

ধারা ৪৭- ফ্যাক্টরীতে ৫০ জনের বেশী নারী শ্রমিক নিয়োজিত থাকলে তাদের ছয় বছরের অনধিক শিশু সন্তানের জন্য উপযুক্ত ডে কেয়ার সেন্টার থাকতে হবে;

ধারা ৬৫- নারী শ্রমিকদের দৈনিক ৯ ঘন্টার বেশী এবং নৈশ শিফ্‌টে কাজ করানো যাবেনা। বিশেষ কোন প্রয়োজনে এই সময় সীমা সকাল ৮টা থেকে রাত ৮-৩০ পর্যন্ত করা যায়;

ফ্যাক্টরী আইনের ৯৩ ধারায় আইনের বিধান লজ্ঘন কারীদের শাস্তির বিধান বর্ণিত হয়েছে। তাহলো 'এই আইনের বিধান লজ্ঘিত হলে ফ্যাক্টরী মালিক ও ম্যানেজার প্রত্যেকে এক হাজার টাকা করে জরিমানা দন্ডে দন্ডিত হবেন। অপরাধ অব্যাহত থাকলে তখন প্রতিদিনের জন্য ৭৫ টাকা করে জরিমানা দন্ড। একবার শাস্তি ভোগের পর পুনরায় একই অপরাধ সংগঠিত হলে পরবর্তী অপরাধের জন্য ছয় মাসের জন্য কারাদন্ড, অথবা ১০০০ টাকা জরিমানা অথবা উভয় দন্ডে দন্ডিত হবেন।[১৫০]

এই আইনটিও নারী শ্রমিকদের জন্য বিশেষ করে গার্মেন্টস কর্মীদের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় আইন। যদিও এই আইনটি সম্পর্কে ও যথেষ্ট প্রচার নেই এবং নারী শ্রমিকদের এ সম্পর্কে জানাও নেই। ফলে আইন বিদ্যমান থাকা সত্বেও সহজেই নারী শ্রমিকরা বৈষম্যের শিকার হয়ে থাকে। মাতৃত্ব ছুটিও তারা পায়না।

৫. <u>বাংলাদেশ শ্রম আইন - ২০০৬ এর সংশোধন আইন বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধন) আইন, ২০১৩</u>

বাংলাদেশ শ্রম আইন - ২০০৬ এর ধারা ৪৫(১,২,৩), ৪৬(১,২,), ৪৭(১,২,৩,৪,৫), ৪৮(১,২), ৪৯(১,২) এবং ধারা ৫০ সমূহ শুধু মাত্র মহিলাদের ক্ষেত্রে প্রজোয্য। যেখানে প্রসূতি কল্যান সুবিধা জনিত বিধান রয়েছে। সেগুলো হ'ল -

ধারা ৪৫- কতিপয় ক্ষেত্রে মহিলা শ্রমিকের কর্মে নিয়োগ নিষেধ-

(১) অনুসারে -কোন মালিক তার প্রতিষ্ঠানে সজ্ঞানে কোন মহিলাকে তার সন্তান প্রসবের অব্যবহিত পরবর্তী আট সপ্তাহের মধ্যে কোন কাজ করাতে পারবেননা;

(২) কোন মহিলাও কোন প্রতিষ্ঠানে তার সন্তান প্রসবের অব্যবহিত পরবর্তী আট সপ্তাহের মধ্যে কোন কাজ করতে পারবেননা;

---

[১৫০]. রীতা ভৌমিক ঃ ফ্যাক্টরী আইন, জেন্ডার ও উন্নয়ন কোষ(১ম খন্ড), পূর্বোক্ত, পৃ:২২৪-২২৫।(বর্তমানে শ্রমিকদের কল্যানে একটি আইন প্রণীত হচ্ছে)।

(৩) কোন মালিক কোন মহিলাকে এমন কোন কাজ করার জন্য নিয়োগ করতে পারবেননা যা দুষ্কর বা শ্রম-সাধ্য অথবা যাহার জন্য দীর্ঘক্ষন দাঁড়াইয়া থাকিতে হয় অথবা যা তার জন্য গর্ভস্থ সন্তান হানির সম্ভাবনা থাকে, যদি

(ক) তার এই বিশ্বাস করার কারণ থাকে, অথবা যদি মহিলা তাকে অবহিত করে থাকেন যে, দশ সপ্তাহের মধ্যে তার সন্তান প্রসব করার সম্ভাবনা আছে; (খ) মালিকের জানামতে মহিলা পূর্ববর্তী দশ সপ্তাহের মধ্যে সন্তান প্রসব করিয়াছেন;

তবে শর্ত থাকে যে, চা - বাগান শ্রমিকের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট চা-বাগানের চিকিৎসক কর্তৃক যতদিন পর্যন্ত সন্তান গর্ভস্থ থাকার সার্টিফিকেট পাওয়া যাবে ততদিন পর্যন্ত উক্ত শ্রমিক হাল্কা ধরনের কাজ করতে পারবেন এবং অনুরূপ কাজ যতদিন তিনি করবেন ততদিন তিনি উক্ত কাজের জন্য প্রচলিত আইন অনুসারে নির্ধারিত হারে মজুরী পাইবেন, যাহা প্রসূতি কল্যান ভাতার অতিরিক্ত হিসেবে প্রদেয় হইবে।

ধারা ৪৬ - প্রসূতি কল্যাণ সুবিধা প্রাপ্তির অধিকার এবং প্রদানের দায়িত্ব

(১) প্রত্যেক মহিলা শ্রমিক তার মালিকের নিকট হতে তার সন্তান প্রসবের সম্ভাব্য তারিখের অব্যবহিত পূর্ববর্তী আট সপ্তাহ এবং সন্তান প্রসবের পরবর্তী আট সপ্তাহের জন্য প্রসূতি কল্যান সুবিধা পাইবার অধিকারী হবেন এবং তার মালিক এই সুবিধা প্রদান করতে বাধ্য থাকবেন। তবে শর্ত থাকে যে, কোন মহিলা উক্তরূপ সুবিধা পাবেননা যদিনা তিনি তার মালিকের অধীন তার সন্তান প্রসবের অব্যবহিত পূর্বে অন্যুন্য ছয় মাস কাজ করিয়া থাকেন। (২) কোন মহিলাকে উক্তরূপ সুবিধা প্রদান করা হবেনা যদি তার সন্তান প্রসবের সময় তার দুই বা ততোধিক সন্তান জীবিত থাকে, তবে এ ক্ষেত্রে তিনি কোন সুবিধা পাবার অধিকারী হলে তা পাবেন।

ধারা ৪৭ - প্রসূতি কল্যাণ সুবিধা পরিশোধ সংক্রান্ত পদ্ধতি

(১) কোন অন্তঃসত্বা মহিলা এই আইনের অধীন প্রসূতি কল্যান সুবিধা পাইবার অধিকারী হইলে তিনি যে কোন দিন মালিককে লিখিত বা মৌখিক ভাবে এই মর্মে নোটিশ দিবেন যে, নোশের আট সপ্তাহের মধ্যে তাহার সন্তান প্রসবের সম্ভাবনা আছে, এবং উক্ত নোটিশে তাহার মৃত্যুর ক্ষেত্রে এই সুবিধা যিনি গ্রহণ করবেন তার নাম্‌ও উল্লেখ থাকবে।

(২) কোন মহিলা উক্তরূপ কোন নোটিশ প্রদান না করে থাকলে তার সন্তান প্রসবের সাত দিনের মধ্যে তিনি উক্তরূপ নোটিশ প্রদান করে তার সন্তান প্রসব সম্পর্কে মালিককে অবহিত করবেন।

(৩) উপধারা (১) অথবা (২) এ উল্লিখিত নোটিশ প্রাপ্তির পর মালিক সংশ্লিষ্ট মহিলাকে -

(ক) উপধারা (১)এর অধীন নোটিশের ক্ষেত্রে , উহা প্রদানের তারিখের পরের দিন হইতে ;
(খ) উপধঅরা (২) এর অধীন নোশের ক্ষেত্রে সন্তান প্রসবের তারিখ হইতে, সন্তান প্রসবের পরবর্তী আট সপ্তাহ পর্যন্ত কাজে অনুপস্থিত থাহার জন্য অনুমতি দেবেন।

Dhaka University Institutional Repository

(৪) কোন মালিক সংশ্লিষ্ট মহিলার ইচ্ছানুযায়ী নিম্নলিখিত যে কোন পন্থায় প্রসূতি কল্যান সুবিধা প্রদান করবেন-

(ক) যে ক্ষেত্রে কোন রেজিষ্টার্ড চিকিৎসকের নিকট হতে প্রত্যয়ন পত্র পেশ করা হয় যে, মহিলা আট সপ্তাহের মধ্যে সন্তান প্রসবের সম্ভাবনা আছে, সে ক্ষেত্রে প্রত্যয়ন পত্র পেশ করার পরবর্তী তিন কর্ম দিবসের মধ্যে প্রষব পূর্ববর্তী আট সপ্তাহের জন্য প্রদেয় প্রসতি কল্যান সুবিধা প্রদান করবেন এবং মহিলার সন্তান প্রসবের প্রমাণ পেশ করার তারিখ হইতে পরবর্তী তিন কর্ম দিবসের মধ্যে অবশিষ্ট সময়ের জন্য প্রদেয় উক্তরূপ সুবিধা প্রদান করবেন,

অথবা

(খ) মালিকের নিকট সন্তান প্রসবের প্রমান পেশ করার পরবর্তী তিন কর্ম দিবসের মধ্যে সন্তান প্রসবের তারিখ সহ উহার পূর্ববর্তী আট সপ্তাহের জন্য প্রসূতি কল্যান সুবিধা প্রদান করবেনএবং উক্ত প্রমাণ পেশের পরবর্তী আট সপ্তাহের মধ্যে অবশিষ্ট মেয়াদের সুবিধা প্রদান করবেন; অথবা

(গ) সন্তান প্রসবের প্রমাণ পেশ করার পরবর্তী তিন কর্ম দিবসের মধ্যে উক্ত সম্পূর্ণ সময়ের জন্য প্রদেয় প্রসূতি কল্যাণ সুবিধা প্রদান করবেন; তবে শর্ত থাকে যে, এই উপধারার অধীনে যে প্রসূতি কল্যাণ বা উহার কোন অংশ প্রদান সন্তান প্রসবের প্রমাণ পেশের উপর নির্ভরশীল, সেরূপ কোন প্রমাণ কোন মহিলা তাহার সন্তান প্রসবের তিন মাসের মধ্যে পেশ না করিলে তিনি এই সুবিধা পাইবার অধিকারী হইবেননা।

(৫) উপধারা (৪) এর অধীনে যে প্রমাণ পেশ করিতে হইবে, উক্ত প্রমাণ জন্ম ও মৃর্ত্যু নিবন্ধন আইন, ২০০৪(২০০৪ এর ২৯ নং আইন) এর অধীনে প্রদত্ত জন্ম রেজিষআরের সত্যায়িত উদ্ধৃতি অথবা কোন রেজিষ্টার্ড চিকিৎসকের প্রত্যয়ন পত্র অথবা মালিকের নিকট গ্রহণযোগ্য অন্য কোন প্রমাণ হইতে পারিবে।

ধারা ৪৮ - প্রসূতি কল্যাণ সুবিধার পরিমান

(১) এই আইনের অধীনে যে প্রসূতি কল্যান সুবিধা প্রদেয় হইবে উহা উপধারা (২) এ উল্লেখিত পন্থায় গণনা করিয়া দৈনিক , সাপ্তাহিক বা মাসিক যে ক্ষেত্রে যাহা প্রযোজ্য গড় মজুরী হারে সম্পূর্ণ নগদে প্রদান করিতে হইবে।

(২) উপধারা (১) এর প্রয়োজনে দৈনিক, সাপ্তাহিক বা মাসিক গড় মঞ্জুরী গণনার জন্য সংশ্লিষ্ট মহিলা কর্তৃক এই অধ্যায়ের অধীনে নোটিশ প্রদানের অব্যবহিত পূর্ববর্তি তিন মাসে তাহার প্রাপ্ত মোট মঞ্জুরীকে উক্ত সময়ে তাহার মোট প্রকৃত কাজের দিনগুলি দ্বারা ভাগ করতে হবে।

(৩) ধারা ৪৯ -মহিলার মৃত্যুর ক্ষেত্রে প্রসূতি কল্যান সুবিধা প্রদান

(১)এই অধ্যায়ের অধীন প্রসূতি কল্যান সুবিধা পাওয়ার অধিকারী কোন মহিলা সন্তান প্রসব কালে অথবা উহার পরবর্তী আট সপ্তাহের মধ্যে মৃত্যু বরণ করলে, শিশু সন্তানটি যদি বাঁচিয়া থাকে , যে ব্যক্তি শিশুর তত্বাবধানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন তাহাকে এবং যদি শিশু সন্তান জীবিত না থাকে , তাহা হইলে এই অধ্যায়ের অধীনমহিলার মনোনীত ব্যক্তিকে অথবা কোন মনোনীত ব্যক্তি না থাকিলে মৃত মহিলার আইনগত প্রতিনিধিকে উক্তরূপ সুবিধা প্রদান করিবেন।

(২) যদি উক্তরূপ কোন মহিলা প্রসূতি কল্যান সুবিধা পাওয়ার অধিকারী হওয়ার সময়সীমার মধ্যে কিন্তু সন্তান

Dhaka University Institutional Repository

প্রসবের পূর্বে মারা যান, তাহা হলে মালিক উক্ত মহিলার মৃত্যুর তারিখসহ তৎপূর্ববর্তী সময়ের জন্য উক্তরূপ সুবিধা প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন, তবে ইতিমধ্যে প্রদত্ত উক্তরূপ সুবিধা যদি প্রদেয় সুবিধা হইতে বেশী হয় , তাহাহলে উহা আর ফেরত লইতে পারিবেননা এবং মহিলার মৃত্যুর সময় পর্যন্ত যদি মালিকের নিকট এই বাবদ কিছু পাওনা থাকে, তাহা হইলে তিনি এই অধ্যায়ের অধীন মহিলার কোন মনোনীত ব্যক্তিকে অথবা মনোনীত ব্যক্তি না থাকিলে তাহার আইনগত প্রতিনিধিকে উহা প্রদান করিবেন।

ধারা ৫০- কতিপয় ক্ষেত্রে মহিলার চাকুরীর অবসানে বাধা
যদি কোন মহিলার সন্তান প্রসবের পূর্ববর্তী ছয়মাস এবং সন্তান প্রসবের পরবর্তী আট সপ্তাহ মেয়াদের মধ্যে তাহাকে চাকুরী হইতে ডিসার্জ, বরখাস্থ বা অপসারণ করার জন্য অথবা তাহার চাকুরী অন্যভাবে অবসানের জন্য মালিক কোন নোটিশ বা আদেশ প্রদান করেন এবং উক্তরূপ নোটিশ বা আদেশের যদি যথেষ্ট কোন কারণ না থাকে তাহা হইলে, এই নোটিশ বা আদেশ প্রদান না করা হইলে এই অধ্যায়ের অধীন সংশ্লিষ্ট মহিলা যে প্রসূতি কল্যান সুবিধা পাইবার অধিকারী হইতেন উহা হইতে তিনি বঞ্চিত হইবেননা।

৬ . <u>মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ ১৯৬১(The Muslim Family Laws Ordinance, 1961)</u>

এই আইনের কার্যক্রম প্রধানতঃ পরিচালিত হয় 'সালিশি পরিষদ' এর মাধ্যমে। 'সালিশি পরিষদ' বলতে পরিষদের চেয়ারম্যান এবং পক্ষ সমূহের প্রত্যেকের একজন করে প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত পরিষদকে বোঝায় এবং চেয়ারম্যান বলতে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বা দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তি, পৌরসভার চেয়ারম্যান বা দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তি, মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের মেয়র বা প্রশাসক বা দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তিকে বোঝায়। সালিশী পরিষদে বিরোধ ফয়সলা সম্ভব না হলে বিষয়টি অধিক্ষেত্র সম্পন্ন আদালতে যাবে।

'সালিশি পরিষদ' আলাপ আলোচনার মাধ্যমে নিম্নোক্ত বিষয়াদি নিস্পত্তি করবেন -

১. সম্পত্তির উত্তরাধিকার নির্ধারণ;
২. বহুবিবাহ সংক্রান্ত জটিলতা নিরসন;
৩. তালাক সংক্রান্ত জটিলতা নিরসন;
৪. খোরপোষ প্রদান সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তি;
৫.দেনমোহর প্রদান সংক্রান্ত বিরোধ নিস্পত্তি।

<u>মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশের আওতায় সাজার বিধান</u>

সালিশী পরিষদে বিরোধ ফয়সলা সম্ভব না হলে বিষয়টি অধিক্ষেত্র সম্পন্ন আদালতে যাবে এবং{ধারা ১১(ক)} অনুসারে - অধিক্ষেত্র সম্পন্ন আদালত হলো-

(ক) অপরাধটি যেখানে সংগঠিত হয়েছে অথবা

(খ) অভিযোগকারী বা অভিযুক্ত ব্যক্তি যেখানে বসবাস করেন বা করেছেন সেখানকার আদালত।

আইন অনুসারে নিম্নরূপ অপরাধীগণ অতঃপর নিম্নে উল্লেখিত সাজা প্রাপ্ত হবেন-

<u>ধারা ৬- বহুবিবাহ</u>
ধারা ৬(৫) - যে পুরুষ সালিশি পরিষদের অনুমতি ব্যতীত আরও একটি বিবাহ করবে, তাকে -

(ক) অবিলম্বে তার বর্তমান স্ত্রী বা স্ত্রীগণকে দেনমোহরের যাবতীয় টাকা পরিশোধ করতে হবে এবং উক্ত অর্থ

পরিশোধ করা না হলে তা বকেয়া রাজস্ব আদায়ের অনুরূপ আদায়যোগ্য হবে,

(খ) অভিযোগ ক্রমে অভিযুক্ত হলে, এক বছর পর্যন্ত বিনাশ্রম কারাদন্ড অথবা দশ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা অথবা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হবে।

ধারা ৭, তালাক

ধারা ৭(১) - কোন পুরুষ স্ত্রীকে তালাক দিতে চাইলে তিনি যে কোন পদ্ধতির তালাক ঘোষণার পর যথাশীঘ্র সম্ভব চেয়ারম্যানকে লিখিতভাবে তালাকের নোটিশ দিবেন এবং স্ত্রীকে উক্ত নোটিশের নকল প্রদান করবেন;

ধারা ৭(২) - কোন ব্যক্তি (১) উপধারার বিধান লজ্ঘন করলে, এক বছর পর্যন্ত বিনাশ্রম কারাদন্ড অথবা দশহাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা অথবা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হবেন;

৭(৩) ধারায় চেয়ারম্যান নোটিশ প্রাপ্তির ৯০ দিন পরে তালাক কার্যকর হবে; ৯০দিন অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত বলবৎ হবেনা।

৭(৪) ধারায় চেয়ারম্যান নোটিশ পা্ওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে সালিশী পরিষদ (আরব্রিট্রেশন কাউন্সিল) গঠন করবেন। সালিশী পরিষদের (আরব্রিট্রেশন কাউন্সিল) পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে দুই পক্ষকে বিবাহবিচ্ছেদ হতে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করবেন;

৭(৫) ধারায় গর্ভাবস্থায় তালাক হবেনা তবে তালাক প্রদান করা হলে তা সন্তান জন্মের ৯০ দিন পর তালাক কার্যকর হবে;

৭(৬) ধারায় তালাক প্রদানের পর নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে আবার বিয়ে করতে পারবেন। তবে কেউ একই স্ত্রীকে ৩য় দফায় তালাক দেয়ার পর যদি আবার বিবাহ করতে চায় তাহলে ঐ স্ত্রীকে অন্য ব্যক্তির নিকট বিয়ে দিয়ে এবং আইন সম্মতভাবে তালাক করিয়ে তারপর বিয়ে করতে হবে;

৮ ধারায় কাবিনে স্ত্রীকে তালাক প্রদানের ক্ষমতা দেয়া থাকলে স্ত্রী স্বামীকে তালাক দিতে পারবেন।

ধারা ৯ ভরণ পোষণ

৯(১) ধারা অনুযায়ী, স্বামী স্ত্রীকে ভরণপোষণ না দিলে বা ব্যর্থ হলে স্ত্রী স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের কাছে ভরন-পোষণ চেয়ে আবেদন করতে পারেন; চেয়ারম্যান সালিশি পরিষদ গঠন করে ভরণ-পোষণ নির্ধারণ করবেন এবং স্বামীকে ভরণপোষণ দিতে একটি সার্টিফিকেট প্রদান করবেন;

৯(২) ধারায় নির্দিষ্ট পরিমান ফি দিয়ে ধার্যকৃত ভরণপোষণ মুনসেফ আদালতে রিভিউ করা যায়;

৯(৩) ধারায় এরপরও স্বামী ভরণপোষণ না দিলে স্ত্রী বকেয়া ভুমি রাজস্ব আদায়ের ন্যায় ভরণপোষণ আদায় করতে পারবেন।

ধারা ১০ দেনমোহর

১০ ধারায় যেখানে বিয়ের দেনমোহর কিভাবে আদায় হবে তা নিকাহনামায় বিস্তারিত উল্লেখ নেই সে ক্ষেত্রে চাহিবা মাত্র প্রদান করতে হবে।[১৫১]

৭. **পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ ১৯৮৫, (সংশোধনী ১৯৮৯) (The Family Courts Ordinance,**

[১৫১]. সুলতানা আকতার রুবি ঃ মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ, ১৯৬১, জেন্ডার ও উন্নয়ন কোষ, ১ম খন্ড, পূর্বোক্ত, ২০০৯, পৃ ঃ ২৩৬- ২৩৮ এবং জেন্ডার সাম্য ও সমতা - (বাংলাদেশে নারী সম্পর্কিত আইন ও প্রাসঙ্গিক বিষয়), মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ, পূর্বোক্ত, ২০০৮, পৃ ঃ ৯০ - ৯৪।

1985, Correction 1989)

এই আইনটি ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশের বিধানাবলী সাপেক্ষে প্রণীত হয়েছে। ১৯৮৫ সনের ১৮ নং অধ্যাদেশ অনুযায়ী পারিবারিক আদালত হচ্ছে স্থানীয় সহকারী জজের আদালত। এখানে কোন সাজার বিধান নেই। তবে এই আদালত অভিযোগকারীগণের অভিযোগের প্রেক্ষিতে উভয় পক্ষকে শুনে কাগজ পত্র পর্যালোচনা করে নিম্নোক্ত বিষয়াদির ফয়সলা দিয়ে থাকেন –

- বিবাহ সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তি
- দাম্পত্য সম্পর্ক পুনরুদ্ধার
- মোহরানা আদায়
- ভরণপোষণ বা খোরপোষ
- শিশুদের অভিভাবকত্ব নির্ধারণ[১৫২]

উল্লেখিত বিষয় সমূহের উপর অভিযোগের প্রেক্ষিতে আদালত সকল পক্ষেও সাক্ষ্য গ্রহণ করবেন সাক্ষ্য গ্রহণ শেষ হ্ওয়ার পর পারিবারিক আদালত পক্ষগণের মধ্যে আপোষ বা পুনর্মিলন ঘটানোর জন্য চেষ্টা করবেন ধারা ১৩(১)। যদি আপোষ বা পুনর্মিলন সম্ভব না হয় তা হলে আদালত রায় প্রদান করবেন। উক্ত রায়ের প্রেক্ষিতে ডিক্রি প্রদান করা হবে (ধারা ১৩(২)। যদি বিরোধ আপোষ এবং মীমাংসার মাধ্যমে নিষ্পত্তি হয়, সে ক্ষেত্রে আদালত পক্ষগণের মধ্যে সম্মত আপোস বা মীমাংসার শর্তাবলীতে ডিক্রী প্রদান করবেন।[১৫৩]

৮. পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১০

পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ এবং পারিবারিক সহিংসতা হতে নারী ও শিশুর সুরক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রণীত হয়েছে পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন ২০১০। এই আইনে পারিবারিক সহিংসতা বলতে বোঝানো হয়েছে ‘ পারিবারিক সহিংসতা বলতে পারিবারিক সম্পর্ক রয়েছে এমন কোন ব্যক্তি কর্তৃক পরিবারের অপর কোন নারী বা শিশু সদস্যের উপর শারীরিক নির্যাতন, মানসিক নির্যাতন, যৌন নির্যাতন অথবা আর্থিক ক্ষতি করা”(ধারা ৩)।

আইনে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি ও প্রতিপক্ষকে শুনানীর সুযোগ প্রদান করে আদালত যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, পারিবারিক সহিংসতা ঘটেছে বা ঘটবার সম্ভাবনা রয়েছে, তা হলে এই আইনের সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির পক্ষে সুরক্ষা, নিরাপদ বসবাস, ক্ষতিপূরণ, নিরাপদ হেফাজত মূলক আদেশ প্রদান করতে পারবে (ধারা ১৪, ১৫, ১৬, ১৭)। প্রতিপক্ষ কর্তৃক আদালতে সুরক্ষা মূলক আদেশ বা উহার কোন শর্ত লজ্ঘন করা হলে উহা অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে এবং তজ্জন্য এই আইনের ৩০ ধারা অনুযায়ী সে ব্যক্তি অনধিক ৬(ছয়) মাস কারাদন্ড বা অনধিক ১০(দশ) হাজার টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হবেন এবং অপরাধ পুনরাবৃত্তির ক্ষেত্রে তিনি অনধিক ২(দুই) বৎসর কারাদন্ড বা অনধিক ১(এক) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হবেন।

তবে ধারা ৩১ (১) অনুসারে আদালতের নিকট উপযুক্ত বলে বিবেচিত হলে প্রতিপক্ষকে ধারা ৩০ এর অধীন

---

[১৫২]. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬৮ - ৮০।

[১৫৩]. প্রফেসর ড. এবি সিদ্দিক, এড বাহাউদ্দিন, অধ্যক্ষ এএএম মনিরুজ্জামান ঃ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ও প্রাসঙ্গিক আইন সমূহ,(সর্বশেষ সংশোধন সহ), সামছ পাবলিকেশন, ঢাকা, ২০১৩, পৃঃ ৩৬৭-৩৭৮ এবং সুলতানা আকতার রুবি ঃ ভরণপোষণ বা খোরপোষ/জেন্ডার ও উন্নয়ন কোষ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২২৯- ২৩০।

শাস্তি প্রদান না করে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিভিন্ন ধরনের সমাজকল্যানমূলক কাজে সেবা প্রদানের জন্য আদেশ দিতে পারবে এবং উক্তরূপ সেবা প্রদানের বিষয়টি তত্বাবধানের জন্য যে কোন প্রতিষ্ঠান বা সংস্থাকে দায়িত্ব প্রদান করা যাবে। ৩১(২) ধারা অনুযায়ী সমাজকল্যানমূলক কাজের সেবা প্রদানের জন্য প্রতিপক্ষ কর্তৃক উপার্জিত আয়ের মধ্য হতে আদালত যেরূপ উপযুক্ত বিবেচনা করবে সেরূপ পরিমান অর্থ সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি এবং ক্ষেত্রমত, তার সন্তান বা তার উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিকে প্রদানের আদেশ দিতে পারবে।[১৫৪] (ধারা ৩(২)এর উপর অধ্যায় - ৬ এ আলোচনা করা হয়েছে)

৯. মুসলিম বিবাহ ও তালাক রেজিষ্ট্রেশন আইন, ১৯৭৪ (Muslim Marriage Registration Law, 1974)

১৯৭৪ সালের মুসলিম বিবাহ ও তালাক রেজিষ্ট্রেশন আইন অনুযায়ী বিয়ে রেজিষ্ট্রেশন করা হয়। ২০০৫ সালে এই আইনের ৫ ধারা সংশোধন করে বলা হয়েছে, যদি বিবাহ রেজিষ্টার নিজে বিবাহ সম্পাদন করান তা হলে তৎক্ষনাৎ, আর কেউ নিজেই বিবাহ সম্পাদন করলে ১ মাসের মধ্যে, আর রেজিষ্টার অবহিত হলে তৎক্ষনাৎ বিয়ে রেজিষ্ট্রেশন করবেন। এই আইন অমান্যকারীর ২ বছর বিনাশ্রম কারাদন্ড ও ৩০০০(তিন হাজার) টাকা জরিমানা বা উভয় দন্ড হতে পারে।[১৫৫] মুসলিম বিবাহ রেজিষ্ট্রেশন আইনে মহিলাদের স্বার্থই অধিক রক্ষিত হয়েছে। এটি অনুসরণ করা হলে বাল্য বিয়ে প্রতিরোধ সম্ভব, এখানে সুস্থ মস্তিস্কের দু'জন সাক্ষী আবশ্যক বিধায় পরবর্তীতে বিয়ে নিয়ে যে কোন প্রতারণা প্রতিরোধ সম্ভব আবার দেনমোহর ধার্য হয় বিধায় তা আদায়ের বিষয়টিও সহজ হয়। আর এই আইনের ৬(১) ধারায় তালাক সম্পর্কে বলা হয়েছে।

১০. যৌতুক নিরোধ আইন, ১৯৮০(সংশোধনী ১৯৮৬) (Dowry Prohibition Act, 1980 , Correction 1986)

এই আইনের ধারা ৩ অনুসারে যৌতুক গ্রহন এমনকি দাবী করণকেও দন্ডনীয় অপরাধ হিসেবে বিবেচনায় নেয়া হয়েছে এবং ৪ ধারা অনুসারে যৌতুক দাবি, আদান - প্রদান বা গ্রহণের জন্য সর্বাধিক ৫ বৎসর বা এক বৎসরের নীচে নহে মেয়াদের কারাদন্ডে বা জরিমানা অথবা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হবার বিধান রয়েছে।[১৫৬] এই আইনটি বিদ্যমান থাকা স্বত্বেও নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে যৌতুক সংক্রান্ত বিধান রাখা হয়েছে।

১১. নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০(সংশোধনী ২০০৩) Correction 2003

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০, (সংশোধনী ২০০৩) এ নারী নির্যাতন জনিত কয়েকটি বড় ধরনের অপরাধ ও সাজার পরিমাণ নিম্নরূপ-

(ক) ধর্ষণ জনিত অপরাধ ও সাজা

'নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০, (সংশোধনী ২০০৩)' এর ৯(১-৫), ৯(ক), এবং ১০ নং ধারা অনুসারে ধর্ষণ জনিত অপরাধ প্রমাণিত হলে নিম্নরূপ সাজার বিধান রয়েছে-

সারণী-১৭

[১৫৪]. পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৫৮ নং আইন) ঃ বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত সংখ্যা, অক্টোবর ১২, ২০১০, পৃ ঃ ৯৩৭৮ - ৯৩৮৯।

[১৫৫]. সুলতানা আকতার রুবি ঃ মুসলিম বিবাহ রেজিস্ট্রেশন আইন ১৯৭৪, জেন্ডার ও উন্নয়ন কোষ, ১ম খন্ড, পূর্বোক্ত পৃ ঃ ২৩৮ ।

[১৫৬]. ড. আবুল হোসেন(সংগ্রহ ও সম্পাদনা) ঃ বাংলাদেশে নারী নির্যাতন প্রতিরোধে প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ, যৌতুক নিরোধ আইন, ১৯৮০, (১৯৮০ সনের ৩৫ নং আইন), মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয়, ২০১০ পৃ ঃ ১১৭।

ধর্ষণ জনিত অপরাধ ও সাজা

ধর্ষণ জনিত অপরাধ	সাজার পরিমান	ধারা
ধর্ষণ	যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদন্ড এবং অর্থদন্ড	৯(১)
ধর্ষণ জনিত কারণে মৃত্যু	মৃত্যু দন্ড বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদন্ড এবং অর্থদন্ড	৯(২)
গণ ধর্ষণএবং গণ ধর্ষণের কারণে মৃত্যু	মৃত্যু দন্ড বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদন্ড এবং অর্থদন্ড	৯(৩)
ধর্ষনের পর হত্যা বা আহত করার চেষ্টা	যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদন্ড এবং অর্থদন্ড	৯(৪ ক)
ধর্ষনের চেষ্টা	অনধিক ১০ বছর কিন্তু ৫ বছর সশ্রম কারাদন্ড এবং অর্থদন্ড	৯(৪খ)
পুলিশ হেফাজতে থাকাকালীন ধর্ষণ	অনধিক ১০ বছর কিন্তু ৫ বছর সশ্রম কারাদন্ড এবং অর্থদন্ড	৯(৫)
সম্ভ্রমহানীর কারণে নারীর আত্মহত্যা (সংশোধনী ২০০৩ অনুসারে সন্নিবেশিত)	অনধিক ১০ বছর কিন্তু ৫ বছর সশ্রম কারাদন্ড এবং অর্থদন্ড	৯(ক)[১৫৭]

(খ) দহনকারী ইত্যাদি পদার্থ দ্বারা সংগঠিত অপরাধ এবং সাজা

'নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০, (সংশোধনী ২০০৩)' এর ৪(১, ২-(অ,আ), ৪(৩) ধারা অনুসারে দহনকারী ইত্যাদি পদার্থ দ্বারা সংগঠিত অপরাধ প্রমাণিত হলে নিম্নরূপ সাজার বিধান রয়েছে-

সারণী-১৮
দহনকারী পদার্থ দ্বারা সংগঠিত অপরাধ এবং সাজা

দহনকারী ইত্যাদি পদার্থ দ্বারা সংগঠিত অপরাধ	সাজারপরিমান	ধারা (নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০, সংশোধনী ২০০৩)
মৃত্যু ঘটানো বা মৃত্যু ঘটানোর চেষ্টা	মৃত্যু দন্ড/যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদন্ড এবং অনুর্ধ এক লক্ষ টাকা অর্থদন্ড	৪(১)

[১৫৭]. ড. আবুল হোসেন(সংগ্রহ ও সম্পাদনা) ঃ বাংলাদেশে নারী নির্যাতন প্রতিরোধে প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন- ২০০০, পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ৬৬ -৬৭।

দৃষ্টিশক্তি বা শ্রবনশক্তি নষ্ট বা মুখমন্ডল, স্তন বা যৌনাঙ্গ বিকৃত বা নষ্ট করা হলে	মৃত্যু দন্ড/যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদন্ড এবং অনুর্ধ এক লক্ষ টাকা অর্থদন্ড	৪(২- ক
শরীরের অঙ্গহানী, বিকৃত বা নষ্ট হলে দহনকারী বিষাক্ত পদার্থ নিক্ষেপ করা	অনধিক ১৪ বছর কিন্তু অন্যূন ৭বছর সশ্রম কারাদন্ড এবং অনুর্ধ্ব পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদন্ড	৪(২-খা)
দহনকারী বিষাক্ত পদার্থ নিক্ষেপ করা, করার চেষ্টা(তাতে কোন ক্ষতি না হলেও)	অনধিক ৭ বছর কিন্তু অন্যূন ৩ বছর সশ্রম কারাদন্ড এবং অনুর্ধ্ব পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদন্ড	৪(৩)[১৫৮]

(গ) যৌতুকের জন্য সংগঠিত অপরাধ এবং সাজা

'নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০, (সংশোধনী ২০০৩)' এর ১১(১) ধারা অনুসারে - যদি কোন নারীর স্বামী অথবা স্বামীর পিতা, মাতা, অভিভাবক, আত্মীয় বা স্বামীর পক্ষে অন্য কোন ব্যাক্তি যৌতুকের জন্য উক্ত নারীর মৃত্যু ঘটান বা মুত্যু ঘটানোর চেষ্টা করেন,{কিংবা উক্ত নারীকে মারাত্মক জখম বা সাধারণ জখম করেন (সংশোধন ২০০৩ এর ৩০ নং আইন অনুসারে) } তাহলে উক্ত স্বামী, স্বামীর পিতা, মাতা, অভিভাবক, আত্মীয় বা ব্যাক্তি একই আইনের ১১(ক, খ, গ) নং ধারা অনুসারে নিম্নরূপ সাজা প্রাপ্ত হবেন-

সারণী-১৯

যৌতুকের জন্য সংগঠিত অপরাধ এবং সাজা

যৌতুকের জন্য সংগঠিত অপরাধ	সাজার পরিমাণ	ধারা (নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০, সংশোধনী ২০০৩)
মৃত্যু ঘটানো	মৃত্যু দন্ড এবং অর্থদন্ড	১১(ক)
মৃত্যু ঘটানোর চেষ্টা	যাবজ্জীবন কারাদন্ড এবং অর্থদন্ড	১১(ক)
মারাত্মক জখম করা	যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদন্ড বা অনধিক ১২ বছর কিন্তু অন্যূন ৫ বছর সশ্রম কারাদন্ড এবং অর্থদন্ড	১১(খ) (সংশোধনী ২০০৩ এর ৩০ নং আইন।)'

[১৫৮] পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬৪-৬৫।

Dhaka University Institutional Repository

সাধারণ জখম	অনধিক তিন বছর কিন্তু অন্যুন ১ বছর সশ্রম কারাদন্ড এবং অর্থদন্ড	১১(গ)[১৫৯]

এখানে উল্লেখ্য যে, যৌতুক নিরোধ আইন, ১৯৮০ (সংশোধনী ১৯৮৬) এ যৌতুক নেওয়া এবং যৌতুক দাবী করার কে অপরাধ হিসেবে গন্য করে তার জন্য সাজার বিধান দেওয়া হয়েছে, আর 'নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০' (সংশোধনী ২০০৩) আইন এর ১১(ক,খ,গ) নং ধারা অনুসারে যৌতুকের জন্য সংগঠিত অপরাধের সাজার বিধান করা হয়েছে। দুটি বিষয় একই আইনের আওতায় রাখা হলে মানুষের জন্য তার উপর আইনের আশ্রয়ে যাওয়া সহজ হতো।

(ঘ) যৌন পীড়ন সংক্রান্ত অপরাধ এবং সাজা

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০, (সংশোধনী ২০০৩)' এর ১০ নং ধারা অনুসারে যৌনপীড়ন সংক্রান্ত অপরাধের সাজার বিধান হলোঃ " যদি কোন ব্যক্তি অবৈধ ভাবে তাহার যৌন কামনা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে তাহার শরীরের যে কোন অঙ্গ বা কোন বস্তু দ্বারা কোন নারী বা শিশুর যৌনঅঙ্গ বা অন্য কোন অঙ্গ স্পর্শ করে বা কোন নারীর শ্লীলতাহানী করে তাহা হইলে তাহার এই কাজ হইবে যৌনপীড়ন এবং তজ্জন্য উক্ত ব্যক্তি অনধিক দশ বৎসর কিন্তু অন্যূন তিন বৎসর সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন"।[১৬০]

(ঙ) নারী পাচার সংক্রান্ত অপরাধ এবং সাজা

'নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০, (সংশোধনী ২০০৩)' এর ৫(১-৩) এবং ৭, ৮ ধারা অনুসারে নারী পাচার সংক্রান্ত অপরাধ প্রমাণিত হলে নিম্নরূপ সাজার বিধান রয়েছে-

সারণী-২০

নারী পাচার সংক্রান্ত অপরাধ এবং সাজা

নারী পাচার সংক্রান্ত অপরাধ	সাজার পরিমাণ	ধারা
পতিতাবৃত্তি বা নীতিবিগর্হিত কাজের উদ্দেশ্যে কোন নারীকে আনয়ন, পাচার, দখলে রাখা;	মৃত্যু দন্ড বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদন্ড বা অনধিক ২০ বছর কিন্তু অন্যুন দশ বছর সশ্রম কারাদন্ড এবং অর্থদন্ড;	৫(১)
কোন নারীকে পতিতা বা পতিতালয়ের ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত ব্যক্তির নিকট বিক্রয়, ভাড়া বা হস্তান্তর করা হলে;	মৃত্যু দন্ড বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদন্ড বা অনধিক ২০ বছর কিন্তু অন্যুন দশ বছর সশ্রম কারাদন্ড এবং অর্থদন্ড;	৫(২)
কোন নারীকে পতিতালয়ের ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত ব্যক্তি ক্রয়, ভাড়া বা দখলে নিলে;	মৃত্যু দন্ড বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদন্ড বা অনধিক ২০ বছর কিন্তু অন্যুন দশ বছর সশ্রম	৫(৩)

[১৫৯]. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬৭

[১৬০]. পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ৬৭।

	কারাদন্ড এবং অর্থদন্ড;	
বেআইনী ও নীতি বিগর্হিত উদ্দেশ্যে কোন শিশুকে বিদেশ থেকে আনয়ন বা বিদেশে প্রেরণ বা পাচার করা;	মৃত্যুদন্ড বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদন্ড এবং অর্থদন্ড;	৬(১)
কোন নবজাতক শিশুকে হাসপাতাল, শিশু বা মাতৃসদন, নার্সিংহোম, ক্লিনিক, ইত্যাদি থেকে কিংবা অভিভাবকের হেফাজত হতে চুরি করা;	মৃত্যুদন্ড বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদন্ড এবং অর্থদন্ড;	৬(২)
উল্লেখিত কারণ ছাড়া অন্য কোন কারণে নারী বা শিশুকে অপহরণ করা;	যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদন্ড বা অন্যূন ১৪ বছর সশ্রম কারাদন্ড এবং অর্থদন্ড;	৭
মুক্তিপণ আদায়ের উদ্ধেশ্যে কোন নারী বা শিশুকে আটক করা।	মৃত্যু দন্ড বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদন্ড এবং অর্থদন্ড।	৮ [১৬১]

১২. মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন ২০১২

'নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০, (সংশোধনী ২০০৩)' এর ৫(১-৩) এবং ৬ ধারা রহিত করে এবং ৭ ও ৮ ধারা এবং দন্ডবিধির ৩৬৬,৩৬৬(খ), ৩৭২, ৩৭৩ ইত্যাদি ধারায় নারী পাচার সংক্রান্ত অপরাধের জন্য প্রদত্ত সাজার পরিমান কমিয়ে নতুন কিছু বিষয় সংযোজনের মাধ্যমে প্রণীত হয়েছে - 'মানব পাচার প্রতিরোধ দমন আ্াইন ২০১২' ।এই আইনের ৪ ধারায় আইনের প্রধান্য এবং ফৌজদারী কার্যবিধি ১৮৯৮ ইত্যাদির প্রযোজ্যতা সম্পর্কে বলা হয়েছে যে," (১)আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধানাবলী কার্যকন হবেঃ তবে শর্ত থাকে যে, প্রচলিত অন্য কোন আইনে ভিকটিম এবং সাক্ষীর সুরক্ষা বিষয়ক শ্যেয় মানদন্ডের বিধান থাকলে সেই সকল বিধান সমূহ এই আইনের সঙ্গে অসামন্জস্যপূর্ণ না হ্ওয়া সাপেক্ষে প্রযোজ্য হবে।আইনের ৪৭ ধারায় Suppression of Immoral Traffic Act, 1933(Aci N0. V1 of 1993) এবং নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৫ও ৬ এতদ্বারা রহিত করা হয়। এ আইনে পাচারের শিকার ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিদের উদ্ধার, পুনর্বাসন ও তাদের অধিকার সুরক্ষায় ক্ষতিপূরণ আদায় সহ বিশেষ সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। আবার মিথ্যা অভিযোগ কারীকেও শাস্তির আওতায় আনা হয়েছে। প্রস্তাবিত আইনে মানব পাচারের বিষয়টিকে সংজ্ঞায়িত করে এ ধরনের অপরাধের জন্য নিম্নোক্ত শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে।

আইনে কোন ব্যক্তি কর্তৃক মানব পাচারের অপরাধ সংগঠনের জন্য যাবজ্জীবন কারাদন্ড তবে ৫ বছরের কম নয় কারাদন্ড এবং ৫০ হাজার টাকা জরিমানা দন্ডে দন্ডিত হবে{ধারা ৬ (১,২)}। আর্থিক বা অন্য কোন ভাবে লাভবান হওয়ার লক্ষ্যে সংঘবদ্ধ ভাবে পাচারের অপরাধ সংগঠনের জন্য মৃত্যু দন্ড অথবা যাবজ্জীবন কারাদন্ড কোন অবস্থাতেই সাত বছরের কম নয় এবং ৫লাখ টাকা জরিমানা দন্ডে দন্ডিত হবেন। পাচারে প্ররোচনা দেয়া বা পাচারের কাজে ষড়যন্ত্রের জন্য সর্বোচ্চ ৭ বছরের কারাদন্ড কোন অবস্থাতেই তিন বছরের কম নয় এবং ২০

[১৬১]. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬৫।

লক্ষ টাকা জরিমানা দন্ডে দন্ডিত হবেন।

জবরদস্তি মূলক শ্রম বা দাসত্বমূলক শ্রমের জন্য সর্বোচ্চ ১২ বছরের কারাদন্ড কোন অবস্থাতেই ৫বছরের কম নয়, একই সাথে ৫০ লক্ষটাকা জরিমানা, পাচারের উদ্দেশ্যে অপহরণ, চুরি বা আটকের জন্য কম পক্ষে ১০ বছরের কারাদন্ড কোন অবস্থাতেই ৫ বছরের কম নয় এবং ২০ হাজার টাকা জরিমানা দন্ড, পাচারের উদ্দেশ্যে হাসপাতাল থেকে নবজাত শিশু চুরিবা ছিনতাই করা হলে সর্বোচ্চ যাবজ্জীব কারাদন্ড যা কোন অবস্তাতেই ৫ বছরের কম নয় এবং ৫০ হাজার টাকা জরিমানার সাজার বিধান রাখা হয়েছে।

একইভাবে পতিতাবৃত্তি বা যৌন নির্যাতনের জন্য সর্বোচ্চ ৭ বছর, ৫ বছরের কম নয় কারাদন্ড একই সাথে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা দন্ডে দন্ড প্রদানের বিধান রাখা হয়েছে এবং পতিতালয় পরিচালনার অনুমতি দেওয়ার জন্য সর্বোচ্চ ৫ বছরের কারাদন্ড(৩ বছরের কম নয়) ও ২০ হাজার টাকা জরিমানার বিধান রাখা হয়েছে। এ সব ক্ষেত্রে মিথ্যা অভিযোগকারীকেও দন্ডের মুখোমুখি হতে হবে। এ জন্য কমপক্ষে ৫ বছরের কারাদন্ড (৩ বছরের কম নয়) এবং ২০ হাজার টাকা জরিমানার সাজার বিধান রয়েছে।[১৬২]

১৩. <u>এসিড অপরাধ দমন আইন ২০০২ (Prevention of Acid Crime Act 2002)</u>

'নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০, (সংশোধনী ২০০৩)' এর ৪(১, ২ - অ, আ) এবং ৪(৩) ধারা অনুসারে দহনকারী ইত্যাদি পদার্থ দ্বারা সংগঠিত অপরাধের জন্য সাজার যে বিধান পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে সেই ধারা সমূহের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ভাবেই **এসিড অপরাধ দমন আইন ২০০২ এর ৪, ৫(ক, খ)** ধারায় অপরাধ এবং ৬নং ধারায় বর্ণিত শাস্তি সমূহ হুবহু আরোপ করা হয়েছে। **এসিড অপরাধ দমন আইন ২০০২ এর** ৭নং ধারায় এই অপরাধ সংগঠনে সহায়তা প্রদানকারীকেও একই সাজার আওতায় রাখা হয়েছে।[১৬৩] কেবল পূর্বের আইনে এসিডের স্থলে দহনকারী পদার্থ বলা হয়েছে। কিন্তু পূর্বেরটি রহিত হয়নি।

১৪. <u>জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন আইন ২০০৪, (সংশোধনী ২০১৩)</u> <u>(The Birth and Death Registration Act 2004, **Correction** 2013)</u>

১৮৭৩ সালের এই আইন ২০০৪ সালে সংশোধনের মাধ্যমে অনুমোদন করা হয়। পরবর্তীতে ডিজিটাল নিবন্ধন, ব্যক্তিগত পরিচিতি নম্বর , প্রবাসীদের জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন সংযুক্ত করে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন (সংশোধন) আইন, ২০১৩ অনুমোদন করা হয়। এটি হলো সেই দলিল যা রাষ্ট্রের নাগরিকের বয়স এবং পরিচয় নিশ্চিত করে। এই আইনের ৪(১৮) ধারায় বলা হয়েছে- ১. আদালত বা স্কুল-কলেজ বা সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে এই আইনের আওতায় প্রদত্ত জন্মও মৃত্যু সনদ সাক্ষ্য হিসেবে বিবেচিত হবে। ২. পাসপোর্ট, বিবাহ-নিবন্ধন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি, সরকারী-বেসরকারী বা স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ প্রদান, ড্রাইভিং লাইসেন্স ইস্যু, ভোটার তালিকা প্রণয়ন, জমিরেজিস্ট্রেশন, ইত্যাদি ক্ষেত্রে বয়স প্রমাণের ক্ষেত্রে জন্ম সনদ ব্যবহৃত হবে।

এছাড়া নারী ও শিশু নির্যাতন হ্রাস করার ক্ষেত্রে বিশেষতঃ বাল্য বিয়ে প্রতিরোধে এই আইনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ জন্মের পরপরই জন্ম নিবন্ধন না হওয়ার জন্য বয়স বেশী দেখিয়ে বাল্য বিয়ে প্রদান সহজ

---

[১৬২]. The Prevention and Suppression of Human Trfficking Act,2012 (Act No. 3 of 2012), আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রনালয় , লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ ,বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত সংখ্যা, আগষ্ট ৪, ২০১৩, পৃ ঃ ৬৮০০-৬৮০২।

[১৬৩].পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ১৬

Dhaka University Institutional Repository

হয়। এই আইনে শিশুর জন্মের ৪৫ দিনের মধ্যে জন্ম সংক্রান্ত তথ্য নিবন্ধন করতে হবে। কোনো ব্যক্তির মৃত্যুর পর ৩০ দিনের মধ্যে মৃত্যু সংক্রান্ত তথ্য নিবন্ধন করতে হবে। নিবন্ধন না করলে এতদসংশ্লিষ্টদের ৫০০ টাকা জরিমানা বা দুই মাস জেল অথবা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হবে। জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনের ক্ষেত্রে ভুল তথ্য দিলে সর্বোচ্চ পাঁচহাজার টাকা জরিমানা বা এক বছরের কারাদন্ডের বা উভয় শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে।[১৬৪]

জন্ম - নিবন্ধন তথ্যের সঠিকতা বজায় রাখার লক্ষ্যে ৩ জুলাই ২০১৪ তারিখে জন্ম নিবন্ধন দিবসের প্রতিপাদ্য হলো - 'জন্ম একবার - নিবন্ধন ও একবার' (Born once Register birth once) । এর লক্ষ্য হলো জন্ম নিবন্ধন যেন কেউ একাধিকবার না করে। একাধিকবার জন্ম নিবন্ধনের অর্থ হলো জন্ম তারিখের ''শাশ্বত সত্যকে গোপন করা , শাশ্বত সত্যের স্থলে মিথ্যার আশ্রয় নেয়া" ।[১৬৫]

১৫. যৌন হয়রানী / ইভটিজিং রোধে বিদ্যমান আইন

যৌন হয়রানী / ইভটিজিং রোধে দেশে বেশ কিছু আইন বিদ্যমান রয়েছে। সেগুলো হ'ল-

(ক) ঢাকা মহানগর পুলিশ অধ্যাদেশ , ১৯৭৬

যদি কেহ কোন রাস্তায় বা সাধারনের ব্যবহার্য স্থানে বা সেখান হতে দৃষ্টি গোচরে স্বেচ্ছায় এবং অশালিন ভাবে নিজ দেহ এমন ভাবে প্রদর্শন করে, যা কোন গৃহ বা দালানের ভিতর হতে হউক বা না হউক, কোন মহিলা দেখতে পায় অথবা স্বেচ্ছায় কোন রাস্তায় বা সাধারনের ব্যবহার্য স্থানে কোন মহিলাকে পীড়ন করে বা তাহার পথ রোধ করে, অথবা কোন রাস্তায় বা সাধারণের ব্যবহার্য স্থানে অশালীন ভাষা ব্যবহার করে অশ্লীল আওয়াজ, অঙ্গভঙ্গি বা মন্তব্য করিয়া কোন মহিলাকে অপমান বা বিরক্ত করে, সেই ব্যক্তি ১ বছর পর্যন্ত অথবা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হবে। (ধারা ৭৬) ।[১৬৬]

(খ) নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ এর ১০ নং ধারা

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ এর ১০ নং ধারায় যৌন হয়রানির সাজা সম্পর্কে বলা হয়েছে "যদি কোন ব্যক্তি অবৈধভাবে তার যৌন কামনার চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে তার শরীরের কোন অঙ্গ বা বস্তু দ্বারা কোন নারী বা শিশুর যৌনাঙ্গ বা অন্য কোন অঙ্গ স্পর্শ করে বা কোন নারীর শ্লীলতাহানী করে, তা হলে তার এই কাজ হবে যৌনপীড়ন এবং তজ্জন্য উক্ত ব্যক্তি অনধিক ১০ বছর কিন্তু অন্যূন তিন বছর পর্যন্ত সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডনীয় হবে এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থ দন্ডেও দন্ডিত হবেন" ।[১৬৭] - আইনের এই ধারাটি বলে ঘটনা সংঘটিত না হওয়া পর্যন্ত তা অপরাধ হিসেবে গণ্য হওয়ার কোন সুযোগ নেই।

আবার দন্ডবিধি ১৮৬০ এর ৫০৯ ধারায়ও যৌন হয়রানীর সাজা বর্ণিত হয়েছে যা বর্তমান অনুচ্ছেদের প্রথমে দেখানো হয়েছে। [১৬৮]

(গ) "ইভটিজিং" নয় " যৌন হয়রানী" - মহামান্য হাইকোর্টের যুগান্তকারী রায়

---

[১৬৪]. রীতা ভৌমিক ঃ জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন আইন ২০০৪, জেন্ডার ও উন্নয়ন কোষ, ১ম খন্ড, পূর্বোক্ত; পৃঃ ২১০ এবং প্রথম আলো, ১৯ ফেব্রুয়ারী ২০১৩।

[১৬৫].যুগান্তর, ৩ জুলাই ২০১৪ এ আকম সাইফুল ইসলাম চৌধূরী, জন্ম মৃত্যু নিবন্ধন প্রকল্প পরিালক (অতিঃসচিব) এর 'জন্ম নিবন্ধন দিবস ২০১৪ঃ তথ্যের শুদ্ধতা ও আমাদের করণীয়' প্রবন্ধে উল্লেখিত।

[১৬৬].ঢাকা মহানগর পুলিশ অধ্যাদেশ, ১৯৭৬, ধারা - ৭৬।

[১৬৭] .এই বিষয়ে পৃঃ ১৫৪ -১৫৫ এ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ এ দেখানো হয়েছে।

[১৬৮].এই বিষয়ে পূর্বে দন্ডবিধির অপরাধ ও সাজা প্রদর্শনের অংশে দেখানো হয়েছে।

সম্প্রতি দেশে ইভটিজিং শব্দটি বেশ ব্যবহৃত হচ্ছে। কারণ ইভটিজিংয়ের বেশ কিছু ঘটনার প্রেক্ষিতে যৌন হয়রানির মাধ্যমে নারীকে যৌন নির্যাতন অতঃপর হত্যা এবং কোনরূপ প্রতিকার না পেয়ে নারী/মেয়েদের আত্মহত্যার মত ঘটনা ঘটেই চলছে। এ অবস্থায় প্রতিটি ঘটনাকে ইভটিজিং আখ্যা দিয়ে এর গুরুত্ব কমানো হচ্ছে উল্লেখ পূর্বক ইভটিজিং সম্পর্কে মহামান্য হাইকোর্ট গত ১৪ই মে ২০১০, এক যুগান্তকারী রায় ঘোষণা করেন যা যৌন হয়রানী থেকে মুক্তির সহায়ক। রায়ে প্রদত্ত নির্দেশনা সমূহ হ'ল-

- ইভটিজিং এখন যৌন হয়রানি মূলক অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে;
- নারী ও শিশু নির্যাতন আইনের ১০(ক) ধারায় কিছু পরিবর্তন এনে এতে স্টকিং টু গার্লচ অ্যান্ড উইমেন্সের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে;
- সব ধরনের যানবাহন , বাসা-বাড়ি ও দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে যৌন হয়রানির ব্যাপারে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে সংশ্লিষ্ট কতৃপক্ষকে;
- যৌন হয়রানির ব্যাপারে প্রতিটি থানায় একটি আলাদা সেল গঠন করতে হবে, যারা প্রতিমাসে সংশ্লিষ্ট এসপি ও পুলিশ কমিশনারের কাছে রিপোর্ট করবেন;
- প্রতি জেলায় এ সংক্রান্ত একটি ডেভেলপমেন্ট কমিটি গঠন করতে হবে। যার সদস্য হবেন মানবাধিকার কর্মী, সাংবাদিক, আইনশৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী, সিভিল সোসাইটি এবং মহিলা ও শিশুদের নিয়ে কাজ করে এমন এনজিওর সদস্যরা।[১৬৯]

১৬. ভ্রাম্যমান আদালত আইন, ২০০৯

ইতিমধ্যে সরকার কর্তৃক মেয়েদের উত্যক্ত করা ও যৌন হয়রানী প্রতিরোধে ভ্রাম্যমান আদালত আইনের তফসীলে দন্ডবিধি আইনের ৫০৯ ধারা সংযুক্ত করার মাধ্যমে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটকে ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে।[১৭০]

১৭. ফতোয়া – মহামান্য হাইকোর্টের এবং আপীল বিভাগের রায়/ রুল

[১৬৯].আমাদেরসময়, ২৭ জানুয়ারী ২০১১।

[১৭০].জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১০।

ফতোয়া বাংলাদেশে দীর্ঘ সময় ধরে নারী নির্যাতনের একটি হাতিয়ার হিসেবেই ব্যবহৃত হচ্ছে। এতদসংক্রান্তে ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে ফতোয়াকে কিভাবে নারী নির্যাতনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে তা এবং মূলতঃ ফতোয়া দেয়া হয় ধর্মের নামে তাই ৭ম অধ্যায়ে এ ক্ষেত্রে কিভাবে মূলতঃ ধর্মের বিরুদ্ধাচরণ করা হয় সে বিষয়ে বিস্তারিত বলা হয়েছে। ফতোয়াকে ফতোয়াবাজিতে পরিণত করে সংগঠিত অপরাধের বিষয়ে নির্দিষ্ট কোন আইন বাংলাদেশে নেই। তবে এই বিষয়ে সাম্প্রতিক সময়ে মহামান্য হাইকোর্টের এবং সুপ্রিম কোর্টের রায়/ রুল অপরাধ দমনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছে।

(ক) ফতোয়ার নামে শাস্তি দেওয়া অবৈধ ঘোষণা করে মহামান্য হাইকোর্টের রুল

ফতোয়ার বিধান নিষিদ্ধ, অবৈধ ও আইনগত কর্তৃত্ব বহির্ভূত করে ২০০১ সালের ১ জানুয়ারী মহামান্য হাইকোর্ট থেকে হিল্লা বিয়ে সংক্রান্ত ফতোয়ার ব্যাপারে এক যুগান্তকারী রায় দেয়া হয়। এ রায়ে হাইকোর্ট থেকে হিল্লা বিয়ে সংক্রান্ত ফতোয়ার ব্যাপারে রায় দেয়া হয়। এই রায়ে নিম্নরূপ আদেশ সমূহ প্রদান করা হয় -

- বাংলাদেশের একমাত্র আদালতই মুসলিম বা অন্য কোন আইন অনুযায়ী আইন সংক্রান্ত কোন প্রশ্নের মতামত দিতে পারে, কেউ ফতোয়া দিলে তা ফৌজদারী কার্যবিধির ১৯০ ধারা অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য হবে।
- ফতোয়াবাজিকে ইসলামী শরীয়ত ও মুসলিম পারিবারিক আইন অনুযায়ী বেআইনী এবং যারা এ কাজ করে ও একাজ সমর্থন করে তাদের কাজও বেআইনী ঘোষণা করা হয়;
- ফতোয়াকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য করে সংসদে আইন প্রণয়নের সুপারিশ করা হয়;
- ফতোয়াবাজির ঘটনাকে দ্রুত আমলে নিতে ম্যজিস্ট্রেট ও পুলিশের প্রতি নির্দেশ প্রদান করা হয়;
- স্বল্প মেয়াদী বিষয় হিসেবে সব স্কুল ও মাদ্রাসায় মুসলিম পারিবারিক আইন পাঠ আবশ্যিক ভাবে চালু করা এবং জুমার দিনে এই আইনটি আলোচনা করার জন্য মসজিদের ঈমামদের প্রতি নির্দেশ পাঠাতে বলা হয়;
- দীর্ঘমেয়াদী ব্যবস্থা হিসেবে অভিন্ন শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা এবং আইন, জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতা সাপেক্ষে সংবিধানের ৪১০ অনুচ্ছেদের আলোকে ধর্মীয় স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রিত থাকে এমন আইন প্রণয়ন;
- দীর্ঘমেয়াদী এ সব পর্যবেক্ষন ও সিদ্ধান্ত সম্পর্কে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয়, আইন মন্ত্রনালয়, আইন মন্ত্রনালয়, শিক্ষা মন্ত্রনালয় ও ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রনালয়কে রায়ের অনুলিপি পাঠানোর নির্দেশ প্রদান করা হয়।

এই রায়ের বিরুদ্ধে আপীল বিভাগে আপীল করা হয় যা দশ বছর ধরে নিস্পত্তির অপেক্ষায় ছিল। ফলে দীর্ঘ সময় ধরে এ রায় কার্যকর হয়নি। অতঃপর ফতোয়ার নামে বিচার বহির্ভূত কার্যক্রম ও শাস্তি অবৈধ ঘোষণা

করে মহামান্য হাইকোর্টের অপর ব্রাঞ্চ থেকে আপীল বিভাগ থেকে গত ৮ জুলাই, ২০১০ আরেকটি রায় দেওয়া হয়। এই রায়ের বিরুদ্ধেও আপীল হয়।

(খ) ফতোয়া সংশ্লিষ্ট আপীল বিভাগের রায়

২০০১ সালে হাইকোর্টে ফতোয়া বিরোধী রায়ের বিরুদ্ধে আপীলের ওপর ২০১১ সালের ১মার্চ শুনানী শুরু হয়। নয় কার্যদিবস শুনানি শেষে ৪ এপ্রিল আদালতে বিষয়টি রায়ের জন্য অপেক্ষমান থাকে। এরপর ১২ মে ২০১১ রায় দেওয়া হয়।

মহামান্য হাইকোর্ট সব রকম ফতোয়া অবৈধ ঘোষণা করে যে রায় দিয়েছিলেন এর বিরুদ্ধে করা দু'টি আপীল আংশিকভাবে মঞ্জুর করা হয়েছে। আপীল বিভাগ বলেছেন-

- ধর্মীয় ব্যাপারে ফতোয়া দেয়া যাবে। কিন্তু এটা মানার বিষয়ে কারও ওপর কোন ধরনের জবরদস্তি করা যাবেনা। হাইকোর্ট বিভাগ এ ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট ফতোয়ার ঘটনাকে অবৈধ ঘোষণা করে যে রায় দিয়েছেন , তা সঠিক।
- রায়ে বলা হয় হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে করা দু'টি আপীল সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামতের ভিত্তিতে আংশিকভাবে মঞ্জুর করা হল। শুধু যথাযথ শিক্ষিত ব্যক্তিরা ধর্মীয় বিষয়ে ফতোয়া দিতে পারবেন। এটা ব্যক্তির স্বেচ্ছায় গ্রহণের উপর নির্ভরশীল। এ ক্ষেত্রে কোন ধরনের প্রভাব বা বল প্রয়োগ করা যাবেনা।
- রাষ্ট্রের প্রচলিত আইনে ব্যক্তির সাংবিধানিক অধিকার ও মর্যাদা ক্ষুণ্ন করে, এমন কোন ধরনের ফতোয়া দেয়া যাবেনা।
- যে ফতোয়ার ঘটনাটি অবৈধ বলে হাইকোর্ট রায় দিয়েছিলেন, তা সঠিক। অর্থাৎ ধর্মীয় বিষয়ে ফতোয়া দেওয়া যেতে পারে। যথাযথ শিক্ষিত ব্যক্তিরা ফতোয়া দিতে পারেন। তবে তা মানতে বাধ্য করা যাবেনা। শারীরিক ও মানসিক কোন ধরনের শাস্তি ও দেওয়া যাবেনা।[১৭১]

১৮. নাগরিকত্ব আইন(সংশোধিত), ২০০৯

মহান জাতীয় সংসদ কর্তৃক ২০০৯ সালে নাগরিকত্ব আইন সংশোধনের মাধ্যমে মা কর্তৃক সন্তানকে নাগরিকত্ব প্রদানের বিধান সন্নিবেশিত করা হয়েছে।[১৭২]

১৯. গৃহকর্মী নির্যাতন প্রতিরোধে আইন/ নীতিমালা

বাংলাদেশে শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠায় আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) - র সনদে স্বাক্ষর করেছে । সেখানে শিশুদের ঝুঁকিপূর্ণ শ্রম বন্ধ করার কথা বলা হয়েছে। ২০০৬ সালে দেশে শ্রম আইন পাশ হয়েছে এবং ঝুঁকিপূর্ণ বিভিন্ন শ্রম এ আইনের আওতায় থাকলেও গৃহকর্মীদের শ্রমকে 'শ্রম' হিসেবে ধরা হয়নি। যদিও গৃহকর্মীদের নির্যাতন প্রতিরোধ কল্পে সরকারী - বেসরকারী বিভিন্ন সংগঠন কাজ করছে। এবং বিষয়টি একেবারে আইন বহির্ভুতও নয়। কারণ দন্ডবিধিতে এবিষয়ে যথাযথ ধারা রয়েছে। বেত্রাঘাত, গরমখুনতি, লোহা, ইস্ত্রিরছ্যাঁকা, গরমপানি ঢেলে দেওয়া, ইত্যাদি অপরাধের জন্য শাস্তির বিধান রয়েছে। আবার হত্যা করা হলে দন্ডবিধির ৩০২, ৩২৩, ৩২৪, ৩২৫, ৩২৬ ধারায় মামলা করা যায়। যদিও এ বিষয় সমূহ নারী

[১৭১]. প্রথম আলো, ১৩ মে ২০১১।

[১৭২]. জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১০।

পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আবার গৃহকর্মীরা অভাব গ্রস্থ /দরিদ্র বিধায় মামলা হয় খুবই কম। হলেও রায় পর্যন্ত গড়ায় না অধিকাংশ ক্ষেত্রে মাঝ পথেই মীমাংসা হয়ে যায়।

গত ৩০ শে এপ্রিল ২০১১, শনিবার জাতীয় প্রেসক্লাব মিলনায়তনে গৃহশ্রমিক অধিকার প্রতিষ্ঠা নেট্ওয়ার্কের উদ্যোগে আয়োজিত সমাবেশে, আবার গত ১৫ ডিসেম্বও,২০১৩ শনিবার কার্ওয়ান বাজারে প্রথম আলো কার্যালয়ে 'গৃহকর্মীর সুরক্ষা ও কল্যান নীতিমালা' অনুমোদন সংক্রান্ত গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় । উভয় বৈঠকেই বক্তারা শ্রমিকদের মধ্যে গৃহশ্রমিকেরা সবচেয়ে অবহেলিত, তারা এখনও শ্রমিকের মর্যাদাই পায়নি বরং তারা ধর্ষন, ধর্ষনের পর হত্যা ও নানারূপ নির্যাতনের শিকার হচ্ছে জানিয়ে বক্তারা এ সবের যথাযথ বিচার ও শাস্তি দাবী করে 'গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যান নীতিমালা' চূড়ান্ত করনের দাবী করেন।[১৭৩] বিষয়টি সরকার কর্তৃক গ্রহণ পূর্বক আইন প্রণয়ন ব্যবস্থা নেওয়ার কিছু কার্যক্রম চলছে।(বর্ণিত আইন সমূহের সীমাবদ্ধতা ৭ম অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে)।

৪.৩.১২ নারী মুক্তির লক্ষ্যে এনজিও এবং তাদের পরিচালিত কার্যক্রম

বেইজিং প্ল্যাট ফরম ফর এ্যাকশান এবং সিডো সনদ এমডিজি সর্বত্রই এনজিওদের সম্পৃক্ত রেখে সরকারী কার্যক্রম পরিচালনার অভিমত রয়েছে । বাংলাদেশে ও নারী মুক্তির লক্ষ্যে বিভিন্ন সামাজিক - সাংস্কৃতিক ও মানবাধিকার সংগঠন তথা বেসরকারী সংস্থা ও দেশব্যাপি তাদের সংগঠন সমূহকে বিস্তারিত ভাবে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশে এনজিও ব্যুরো কর্তৃক ২০০৮- ২০০৯ পর্যন্ত নিবন্ধিত মোট ২১২৯ টি দেশী এনজিও এবং ২১১টি বিদেশী এনজিও তথা মোট ২৩৪০ টি এনজিও সংস্থা বাংলাদেশে কাজ করছে যাদের প্রধান কাজই হলো নারীদের উন্নয়ন।[১৭৪] বেসরকারী হিসাবে বাংলাদেশে ছোট বড় মিলিয়ে প্রায় ৫০,০০০ এনজিও বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক কার্যক্রমে নিয়োজিত আছে। ১৯94 সালের এডাব বাংলাদেশের এক হিসাব অনুসারে এদেশের ৫০% গ্রামের ৩৫ লক্ষ পরিবার এনজিও দ্বারা উপকৃত হয়ে আসছে।[১৭৫] সরকারের মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরে নিবন্ধনকৃত ১২০০টি নারী সংগঠন নারীদের আর্থিক এবং সামাজিক এবং পারিবারিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে।[১৭৬] এই এনজিও সমূহ ঢাকা এবং দেশের অন্যান্য বিভাগীয় শহরগুলো থেকে শুরু করে জেলা উপজেলা এবং ইউনিয়ন পর্যায়েও এনজিও প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নারী নির্যাতন প্রতিরোধে এবং নারীদের আর্থিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য কাজ করছে। বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত এনজিও গুলোর মধ্যে অক্সফাম - বাংলাদেশ, এ্যাকশন-এইড, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন, কেয়ার বাংলাদেশ, ব্রাক, পল্লীকর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন, আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক), বাংলাদেশ মহিলা আইনজীবি সমিতি, কর্মজীবি নারী, স্টেপস টুয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট প্রধান।

উল্লেখযোগ্য আরও কয়েকটি এনজিও হ'ল-

- বাংলাদেশ মহিলা সমিতি
- বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ
- এসিড সারভাইভারস ফাউন্ডেশন

[১৭৩].প্রথম আলো, ২ মে ২০১১ এবং প্রথম আলো , ১৫ ডিসেম্বর, ২০১৩।

[১৭৪].এনজিও বিষয়ক ব্যুরো ঃ এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর ১৮ বছর, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা ২০০৮,পৃ ঃ ২৪৩।

[১৭৫].মালেকা বেগম ঃ এনজিও, (জেন্ডার ও উন্নয়ন কোষ), পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ৫৪৪।

[১৭৬].মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর থেকে সংগৃহিত তথ্য।

- গ্রামীন ব্যাংক
- এডাব
- প্রশিকা
- নারী প্রগতি সংঘ
- ঠেঙ্গামারা মহিলা সবুজ সংঘ(টি এমএসএস)
- নারীপক্ষ
- উইমেন ফর উইমেন
- আশা[১৭৭]

এনজিওদের কার্যক্রম তত্বাবধান করা হয় সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে। এনজিওদের প্রধান কাজই হলো ঋণ দান কর্মসূচি। বাংলাদেশের এনজিওরা প্রধানতঃ ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্পের মাধ্যমে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকেন। এই ঋণ কার্যক্রমের আওতায় ঋণ গ্রহীতাদের অধিকাংশই নারী। জনাব আতিউর রহমান বলেন,'ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহণকারীদের মধ্যে প্রায় ৯০ শতাংশই নারী'।[১৭৮] ক্ষুদ্র ঋণ নিয়ন্ত্রক সংস্থার সর্বশেষ হিসাব অনুযায়ী, ২০১০ সালের জুনে এ দেশে ক্ষুদ্র ঋণের গ্রাহকের সংখ্যা ছিল দুই কোটি ৫২ লাখ ৮০ হাজার। এর মধ্যে ৯০ শতাংশই নারী গ্রাহক"।[১৭৯] এই ঋণ কার্যক্রমের আওতায় তারা হাঁস মুরগী, গবাদী পশু, মৌমাছি পালন, রেশম উৎপাদন, মৎসচাষ, সেলাইকাজ, ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।[১৮০] এছাড়া তারা এ্যাডভোকেসী মূলক কর্মসূচিও পালন করে থাকে। যেমন-

- নারী নির্যাতনের উপর গবেষণা/ জরিপ চালিয়ে, কেস ষ্টাডি সংগ্রহ করে তার ভিত্তিতে বই -জার্নাল-পোষ্টার-পুস্তিকা প্রকাশ , ভিডিও চিত্র নির্মাণ, প্রতিবেদন প্রকাশ, আলোচনা অনুষ্ঠান, মত বিনিময় সভা, কর্মশালা কর্মসূচি ইত্যাদি পরিচালনা;
- নির্যাতিতা নারীদের আইন ও পুনর্বাসন সহায়তা প্রদান;
- বিভিন্ন সময়ে আইন প্রণয়নে সরকারকে ও সহযোগিতা প্রদান এবং নারী নির্যাতন প্রতিরোধে সরকারের নিকট বিভিন্ন দাবী-দাওয়া পেশ;
- নারীদেরকে বিদ্যমান আইনকানুন এবং তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করার লক্ষ্যে কার্যক্রম পরিচালনা ;

[১৭৭]. ফারজানা নাজ ঃ জেন্ডার শব্দকোষ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৭, ৮৯-৯৫।

[১৭৮]. আতিউর রহমান ঃ ক্ষুদ্রঋণ ও নারীর ক্ষমতায়ন, জেন্ডার ও উন্নয়ন কোষ, পূর্বোক্ত,পৃ ঃ ৬০৯।

[১৭৯]. প্রথম আলো, ৮ মার্চ ২০১৩।

[১৮০].মালেকা বেগম ঃ এনজিও, জেন্ডার ও উন্নয়ন কোষ, পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ৫৪৫।

- পারিবারিক নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রচারণা মূলক কর্মসূচি চালানো। অক্সফাম- বাংলাদেশ এবং স্টেপস টুয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট এই ধরনের কাজে অগ্রনী ভূমিকা পালন করছে । একই সাথে সারা দেশে বেশ কিছু এনজিও তাদের পার্টনার সংগঠন হিসেবে এই কার্যক্রমে সহযোগিতা করছে;
- যৌতুক, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ রোধ, নারীর ক্ষমতায়ন, নারী-পুরুষ সমতা, শিশু অধিকার সংরক্ষন ইত্যাদি বিষয়েও বিভিন্ন প্রকারের ভূমিকা পালন করছে;
- নারীর ক্ষমতায়নের একটি অন্যতম পূর্বশর্ত হচ্ছে নারীর অর্থনৈতিক স্বাধিকার। আর এখানটাতেই এনজিও গুলো নারীকে এগিয়ে নিয়ে গেছে অনেকখানি। ফলে বাংলাদেশে জেন্ডার উন্নয়নে যুক্ত হয়েছে একটি নতুন মাত্রা;[১৮১]
- এসিড সারভাইভারস ফাউন্ডেশন গত ১০/১২ বছর ধরে সরকারের সহযোগিতা নিয়ে এসিড আক্রান্তদের চিকিৎসা, পুনর্বাসন এবং আইনী সহায়তা প্রদান করে যাচ্ছে। এই সংগঠন নারীদের প্রতি এসিড সহিংসতা প্রতিরোধ ও প্রতিকারের লক্ষ্যে এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধি করনের ক্ষেত্রেও প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।[১৮২]

এ্যাডভোকেসী মূলক কর্মসূচি পালন করার জন্য এনজিও গুলো আরও যে সব দায়িত্ব পালন করে থাকে সেগুলো হ'ল –

- গ্রুপ তৈরী ও মোবিলাইজ
- উপলব্ধি ও সচেতনতা বাড়ানো
- নেতৃত্ব বিকাশ
- পরিকল্পনায় ও ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা বৃদ্ধি
- পেশাগত দক্ষতা প্রশিক্ষন
- কর্মসংস্থান
- আত্ম কর্মসংস্থানের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধি ও এন্টার প্রাইজ উন্নয়ন
- ঋণ দান কর্মসূচি
- উৎপাদনমুখী সম্পদ তৈরী
- নারীর উন্নয়ন
- রাজনৈতিক অংশগ্রহনের মাধ্যমে ক্ষমতায়নে উদ্বুদ্ধ করণ
- অনানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষায় সহায়তা
- স্বাস্থ্যও পুষ্টি রক্ষায় শিক্ষা প্রদান এবং সেবা প্রদানে উৎসাহিত করণ
- EPI MCH শিক্ষা এ সেবা প্রদান

---

[১৮১]. মালেকা বেগম ঃ এনজিও , পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ৫৪৪ ।

[১৮২].খাদিজা লীনা, চিররঞ্জন সরকার ঃ নির্যাতিত নারী উপেক্ষিত মানবাধিকার, পূর্বোক্ত, পৃঃ ঃ ৯৯ , ১০০।

- পানিও স্যানিটেশন সুবিধা প্রদানে সহায়তা প্রদান
- সরকারী চাকুরীতে প্রবেশের ক্ষেত্রে নারীর ক্ষমতায়নে সহযোগীতা প্রদান
- স্থানীয় সংগঠন কার্যকর করা
- আবাস এবং আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা।[১৮৩]

নারী উন্নয়ন এবং নারী মুক্তির মত ব্যাপক কাজে সরকারী এবং বেসরকারী উদ্যোগের মধ্যে সমন্বয় অত্যন্ত জরুরী বিবেচনায় তৃণমূল পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত সরকারী এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সহযোগিতার যোগসূত্র গড়ে তোলার লক্ষ্যে সরকারের পক্ষ থেকেই বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান সমূহকে যথোপযুক্ত এবং সময়োপযোগী সহায়তা প্রদান করা হয়ে থাকে। সরকারী - বেসরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের মধ্যে নিয়মিত যোগাযোগ, বৈঠক/কর্মশালা ইত্যাদির মাধ্যমে এই আদান প্রদানকে গুরুত্বারোপ করা হয়। ক্ষেত্র বিশেষে সরকারী - বেসরকারী যৌথ উদ্যোগে নারী উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয় এবং আর্থিক সহায়তা ও করা হয়।[১৮৪]

৪.৩.১৩ নারীর মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করণ

১০ ডিসেম্বর, বিশ্ব মানবাধিকার দিবস। ১৯৪৮ সালের এই দিনে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র গৃহীত হয়। ১৯৫০ সালে জাতিসংঘ এই দিনটিকে বিশ্ব মানবাধিকার দিবস হিসেবে ঘোষণা দেয়। তার পর থেকেই বিশ্ব জুড়ে এই দিনটি মানবাধিকার দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে।

বেইজিং প্ল্যাটফরম ফর এ্যাকশান এর আলোকে বাংলাদেশে 'জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১' এ - নারীর মানবাধিকারের বিষয়টি ভিন্ন ভাবে নিশ্চিত করণ, নারীর ক্ষমতায়ন সহ নারীকে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় আনয়ন, সংক্রান্ত নিম্নরূপ কৌশল নির্ধারণ করা হয়েছে -

- মানবাধিকার এবং মৌলিক স্বাধীনতার সকল ক্ষেত্রে, যেমন, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইত্যাদি ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ যে সমঅধিকারী, তার স্বীকৃতি স্বরূপ নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ করা;
- নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ(সিডও) এর প্রচার ও বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা;
- নারীর মানবাধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিদ্যমান আইন সংশোধন ও প্রয়োজনীয় নতুন আইন প্রণয়ন করা;
- বিদ্যমান সকল বৈষম্যমূলক আইন বিলোপ করা এবং আইন প্রণয়ন ও সংস্কারের লক্ষ্যে গঠিত কমিশন বা কমিটিতে নারী আইনজ্ঞদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা;
- স্থানীয় ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কোন ধর্মের, কোন অনুশাসনের ভুল ব্যাখ্যার ভিত্তিতে নারী স্বার্থের পরিপন্থী এবং প্রচলিত আইন বিরোধী কোন বক্তব্য প্রদান বা অনুরূপ কাজ বা কোন উদ্যোগ গ্রহণ না করা;
- বৈষম্যমূলক কোন আইন প্রণয়ন না করা বা বৈষম্যমূলক কোন সামাজিক প্রথার উন্মেষ ঘটতে না দেয়া;

[১৮৩].খাদিজা লীনা, চিররঞ্জন সরকার ঃ নির্যাতিত নারী উপেক্ষিত মানবাধিকার, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৯৯ - ১০০।

[১৮৪]. জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১, পৃ ঃ ২৮।

- গুণগত শিক্ষার সকল পর্যায়ে, চাকুরীতে, কারিগরী প্রশিক্ষণে, সমপারিতোষিকের ক্ষেত্রে, কর্মরত অবস্থায় স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা, সামাজিক নিরাপত্তা, এবং স্বাস্থ্য পরিচর্যায় নারীর সমান অধিকার নিশ্চিত করা;
- মানবাধিকার ও নারী বিষয়ক আইন সম্পর্কে শিক্ষা প্রদান এ সংবেদনশীলতা বৃদ্ধি করা;
- পিতা ও মাতা উভয়ের পরিচয়ে সন্তানের পরিচিতির ব্যবস্থা করা, যেমন জন্মনিবন্ধীকরণ, সকল সনদপত্র, ভোটার তালিকা, ফরম, চাকুরির আবেদনপত্র, পাসপোর্ট ইত্যাদিতে ব্যক্তির নাম প্রদানের সময় পিতা ও মাতার নাম উল্লেখ করা।[১৮৫]

নারীর মানবাধিকার এবং মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশে সরকারী এবং বেসরকারী পর্যায়ে যথেষ্ট কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

বাংলাদেশে রয়েছে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন ২০০৯। এই আইন বলে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন (এনএইচআরসি) মানবাধিকার লঙ্ঘনের যে কোন অভিযোগ তদন্ত করতে পারে। আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, এবং অন্যান্য পাবলিক কর্তৃপক্ষ কোন বিষয়ে ব্যাখ্যা তলব করতে পারে। জেলখানা, হাজতখানা, অথবা সংশোধন কেন্দ্র পরিদর্শন করা এবং হাইকোর্ট ডিভিশনে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তির পক্ষে রীট পিটিশন দায়ের করতে পারে এবং কোন তদন্ত পরিচালনার সময় সিভিল কোর্টের ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে।

দূর্নীতি দমন কমিশন দূর্নীতি সংক্রান্ত অপরাধ তদন্ত এবং বিচার করার জন্য স্বাধীন প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করার বিধান রয়েছে।

আইন কমিশন একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা যা মানুষের মৌলিক অধিকার এবং সামাজিক মূল্যবোধ রক্ষার স্বার্থে আইনও বিধিবিধান সংশোধন প্রস্তাবের /আদেশ প্রদানের ক্ষমতা রাখে। ২০০৯ সাল থেকে এই কমিশন মানবাধিকার স্থাপন, শারীরিক শাস্তি প্রতিরোধ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও কর্মস্থলে যৌন হয়রানি প্রতিরোধ, নারীদের বিরুদ্ধে সহিংসতা প্রতিরোধ, ভিকটিম, গুরুতর অপরাধের সাক্ষী ও ভিকটিমদের রক্ষা করা, দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার দ্রুত নিস্পত্তি নিশ্চিতকরণ এবং হিন্দু পারিবারিক আইন সংস্কারের রিপোর্ট প্রস্তুত করছে।

তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ (রিআ) এর অধীনে তথ্য কমিশন (আইসি) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে পাবলিক এবং প্রাইভেট ডোমেইন থেকে তথ্য সংগ্রহের বিষয়ে নাগরিকদের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার জন্য।

দেশের দরিদ্র নাগরিকদের বিচার পাওয়ার অধিকার নিশ্চিত এবং সহজতর করার লক্ষ্যে সরকার লিগ্যাল এইড আইন, ২০১০ এর মাধ্যমে দেশে প্রথম আইনী সহায়তা প্রতিষ্ঠান ন্যাশনাল লিগ্যাল এইড সার্ভিসেস অর্গানাইজেশন (NLASO) স্থাপন করেছে । মানুষের প্রবেশ সহজ করার জন্য এখানে একটি হট লাইন

রয়েছে, সব জেলায় এর আওতায় জেলা লিগ্যাল এইড কমিটি রয়েছে। প্রতিটি জেলা লিগ্যাল এইড কমিটি সরকার প্রদত্ত অর্থে একটি আইনি সাহায্য তহবিল ও রয়েছে।[১৮৬]

---

[১৮৫]. জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১, পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ৩০-৩১।

[১৮৬]. Bangadesh Report ঃ The implementation of the Beijing Declaration and Platform for action (1995) and the outcomes of the Twinty- third special Session of the General Assembly (2000) , May 2014, P.44 - 45.

এছাড়া বেসরকারী পর্যায়ে রয়েছে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, অ্যাসোসিয়েশন ফর ল রিসার্চ অ্যান্ড হিউম্যান রাইটস (অ্যালার্ট), বাংলাদেশ হিউম্যান রাইটস ডেভেলপমেন্ট কমিশন এবং বিভিন্ন এনজিও যেমন ব্রাক, ব্লাস্ট, বিএনডব্লিওএলএ, আস্ক, আরডিআর এস, সহ আরও অনেক এনজিও কর্তৃক ব্যাপক মানবাধিকার সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে। যেমন আইনী সহায়তা প্রদান, মানবাধিকার সংক্রান্ত শিক্ষা, সংখ্যালঘু নির্যাতন, নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে তারা বিভিন্ন প্রোগ্রাম/ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকেন।

তবে এসব কার্যক্রমের মাধ্যমে যে বাংলাদেশে মানবাধিকার পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা বলা যায়না। বাংলাদেশে মানবাধিকার বিশেষতঃ নারীদের মানবাধিকার বিষয়টি হতাশামূলক। (পরবর্তী অধ্যায়ে নারী নির্যাতনের চিত্র দেখলে তা স্পষ্ট হবে। এবং এ বিষয়ে ৭ম অধ্যায়ে কিছু তথ্য বর্ণিত হয়েছে)।

৪.৩.১৪ মেয়েশিশু

বেইজিং প্ল্যাটফরম ফর এ্যাকশান এর ২৫৯ থেকে ২৮৫ নং অনুচ্ছেদে মেয়ে শিশুদের প্রতি বিভিন্ন নির্যাতন চিহ্নিত করে সেসব সমাধানের দিক নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।[১৮৭] - যা বর্তমান গবেষনার তৃতীয় অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে। আবার ১৯৮৯ সালের ২০ নভেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ৫৪টি অনুচ্ছেদ সমন্বয়ে গঠিত ঐতিহাসিক শিশু অধিকার সনদ গৃহীত হয়েছে । এই সনদে শিশুদের প্রতি পিতামাতা ও অভিভাবকদের সহ রাষ্ট্রের দায়িত্ব কর্তব্য নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। যদিও বাংলাদেশে ১৯৭৪ সালেই প্রণীত হয়েছে শিশু অধিকার আইন। আবার বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ‘জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১’ এ মেয়েশিশুর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সাধন করার লক্ষ্যে নিম্নের নীতিমালা সমূহ নির্ধারণ করা হয়েছে -

- বাল্য বিবাহ , মেয়ে শিশু ধর্ষণ, নিপীড়ন, পাচার এবং পতিতা বৃত্তির বিরুদ্ধে আইনের কঠোর প্রয়োগ করা;
- পরিবারের মধ্যে এবং বাইরে মেয়ে শিশুর প্রতি বৈষম্যহীন আচরণ করা এবং মেয়ে শিশুর ইতিবাচক চিত্র তুলে ধরা;
- মেয়ে শিশুর চাহিদা যেমন, খাদ্য, পুষ্টি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, ক্রীড়া, সংস্কৃতি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষনের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা;
- শিশুশ্রম বিশেষ করে মেয়ে শিশু শ্রম দূরীকরণ কর্মসূচি বাস্তবায়নের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া।[১৮৮]

এসব নীতিমালা সমূহ বিভিন্ন মন্ত্রনালয়ের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে। বর্তমান অধ্যায়ে পূর্বে মেয়েদের শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য প্রদান কালে দেখানো হয়েছে যে-

- প্রাথমিক শিক্ষা (বাধ্যতামূলক করণ) আইনের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষাকে মেয়েদের জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়েছে;

---

[১৮৭]. জাতিসংঘ, চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলন, বেইজিং ঘোষণা ও কর্মপরিকল্পনা, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২২২ -২৩৯।

[১৮৮]. জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি , পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮।

- প্রাথমিক ও গণ শিক্ষা মন্ত্রনালয় ২০১১ সালের মধ্যে ভর্তি উপযোগী সকল শিশুকে স্কুলে ভর্তি নিশ্চিতকরণ ও মিলিনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল এর আলোকে ২০১৫ সালের মধ্যে জাতীয়ভাবে জেন্ডার গোল বা লক্ষ্য সমূহ অর্জনের অঙ্গীকার ঘোষণা করেছে।[১৮৯]
- সে লক্ষেই -প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা সার্বজনীন, বাধ্যতামূলক, অবৈতনিক এবং সকলের জন্য একই মানের করা;
- দরিদ্র ছেলেমেয়েদের জন্য উপবৃত্তির আওতা সম্প্রসারণ করা;
- মেয়ে শিশুরা যাতে ঝরে না পড়ে সে দিকে বিশেষ নজর দেয়ার লক্ষ্যে বিশেষ ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে;
- সমাজকল্যান মন্ত্রনালয়ের মাধ্যমে শারীরিক, মানসিক প্রতিবন্ধী এবং অটিস্টিক শিশুদের উন্নয়নের জন্য পরিচালিত হচ্ছে নানা কার্যক্রম;
- আইন মন্ত্রনালয়ের মাধ্যমে মেয়ে শিশুদের বাল্য বিবাহ রোধে যুগোপযোগী করে আইন সংশোধন করা হচ্ছে;
- স্বাস্থ্য মন্ত্রনালয়ের উদ্যোগে বাংলাদেশে গত ১২ বছরে শিশু মৃত্যুর হার কমেছে ৭২ শতাংশ;
- বিভিন্ন এনজিও প্রতিষ্ঠান থেকেও শিশুদের উন্নয়নের লক্ষ্যে কার্যক্রম পরিচালিত হয়;
- অটিষ্টিক শিশুদের জন্য ও বিভিন্ন এনজিও কার্যক্রম রয়েছে। [১৯০]

আবার মহিলা ও শিশু মন্ত্রনালয়ের আওতায় শিশু একাডেমী কর্তৃক পরিচালিত হচ্ছে নিম্নোক্ত কার্যক্রম-

১. সারাদেশে ৬টি শিশু বিকাশকেন্দ্র পরিচালিত হচ্ছে, যেখানে দুস্থ ও ছিন্নমূল শিশুদের পুনর্বাসন, খাদ্য-পুষ্টি-শিক্ষা ও নিরাপদ আবাসন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হচ্ছে;
২. ঢাকায় কেন্দ্রীয় কার্যালয় সহ ৬৪টি জেলায় রয়েছে শিশু একাডেমীর শাখা। যেখানে গ্রামীন পর্যায় থেকে কেন্দ্র পর্যন্ত শিশুদের সাংস্কৃতিক দিক থেকে বিকশিত করা হচ্ছে;
৩. রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়ন কার্যক্রমের আওতায় ব্যাপকভাবে চলছে শিশুদের উপযোগী বই প্রকাশনা কার্যক্রম, লাইব্রেরী ও শিশু যাদুঘর।[১৯১]

আবার শিশু মৃত্যু হার হ্রাস সহ শিশুর পুষ্টি অবস্থার উন্নয়নে বাংলাদেশ যথেষ্ট সফলতা অর্জন করেছে। ১৯৯০ সালে প্রতিহাজারে ১৪৬ শিশুর মৃত্যু হলে্ও ২০০৯এ এসে প্রতি হাজারে শিশু মৃত্যু ৫০ -এ দাঁড়িয়েছে।[১৯২] শিশু মৃত্যুর হার হ্রাসের ক্ষেত্রে সাফল্যের কারণে বাংলাদেশ ২০১০ সালে United Nations M.D.G Award – এ ভূষিত হয়েছে।[১৯৩]

---

[১৮৯]. জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদন(২০১১-১২) ঃ অর্থবিভাগ, অর্থ মন্ত্রনালয়, পূর্বোক্ত,পৃ ঃ ৭- ১৩।

[১৯০]. উল্লেখিত মন্ত্রনালয় সমূহ থেকে সংগৃহীত তথ্য মতে।

[১৯১]. মোশাররফ হোসেন (পরিচালক, বাংলাদেশ শিশু একাডেমী) ঃ শিশু অধিকারের মূল কথা চাই শিশুর নিরাপত্তা (প্রবন্ধ) আমাদের সময় , সোমবার ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৪ এর বিশেষ ক্রোড়পত্রে প্রকাশিত 'বিশ্ব শিশুদিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ - উপলক্ষে প্রকাশিত।

[১৯২]. প্রথম আলো, ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৪ (বিশ্ব শিশু দিবস উপলক্ষ্যে বিশেষ ক্রোড়পত্র।

[১৯৩] . জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদন ২০১১-১২, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৭ ।

বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে বাংলাদেশ সমন্বিত পুষ্টি পরিকল্পনা (বিআইএনপি) বাস্তবায়ন শুরু হয় ১৯৯৫ সালে। শেষ হয় ২০০২ সালে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০০২ থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত ১৭৬ টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হয় জাতীয় পুষ্টি কার্যক্রম(এনএনপি)। এনএনপি বাস্তবায়িত হয়েছে যেখানে এমন উপজেলা গুলোতে পুষ্টি - পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে, শিশু মৃত্যু হার কমেছে, জন্মের পর থেকে প্রথম ছয় মাস সন্তানকে মায়ের দুধ খাওয়ানোর হারও বেড়েছিল।[১৯৪] এই সাফল্যই বাংলাদেশকে ২০১০ সালে United Nations M.D.G Award – প্রাপ্তির সহায়ক হয়েছিল।

উপরের দীর্ঘ আলোচনা থেকে একটি বিষয় সুস্পষ্ট যে নারী মুক্তির লক্ষ্যে, নারীদের অবস্থার উন্নয়নের জন্য এবং নারীদের নানা ধরনের নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য বাংলাদেশ স্বাধীনতার ঊষালগ্ন থেকেই সচেষ্ট। আবার জেন্ডার ইস্যু এবং জেন্ডার ইস্যু সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক সকল পদক্ষেপের সাথে বাংলাদেশ পরিপূর্ণ ভাবে সম্পৃক্ত হয়ে নারীমুক্তির লক্ষ্যে পরিচালনা করে যাচ্ছে বিশাল কার্যক্রম। বাংলাদেশের সংবিধান, বিভিন্ন পরিকল্পনা, বিদ্যমান আইনকানুন বিধিব্যবস্থার সাথে প্রয়োজনে নতুন নতুন আইন-কানুন প্রণয়ন করে তা বাস্তবায়নের জন্যও গৃহীত হচ্ছে বিভিন্ন পদক্ষেপ যা বর্তমান অধ্যায়ের দীর্ঘ আলোচনা থেকে সুস্পষ্ট। এতসব পদক্ষেপ যে বিফলে যাচ্ছে তা নয় ।

এ সম্পর্কে গত ২১ নভেম্বর ২০১৩ 'আমাদের সময়' পত্রিকার উপসম্পাদকীয় কলামে জনাব রামেন্দ্র চৌধূরী তাঁর 'বাংলাদেশে নারী অগ্রগতির সুখবর ' প্রবন্ধে 'ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম - ডব্লিওইএফ ' নামের আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের এক জরিফের ফলাফল সম্পর্কে বলেন, "বাংলাদেশের সমাজে - অর্থনীতিতে নারীদের অবস্থান - অবদানের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হচ্ছে। নারী-পুরুষ সমতার বিচারে এ বছর বাংলাদেশ ১১ ধাপ অগ্রগতি অর্জন করেছে। যে সব সূচকের ভিত্তিতে 'ডব্লিউইএফ' নারীদের অবস্থানের বিচার করে তাতে রয়েছে - রাজনীতিতে অংশগ্রহণ, অর্থনৈতিক সমতা, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা ইত্যাদি। .. .. বাংলাদেশে এখন প্রধানমন্ত্রী, জাতীয় সংসদে সরকারী দলের উপনেতা , বিরোধীদলীয় নেতা এবং স্পীকার -৪ জনই নারী। নানা ক্ষেত্রেই পুরুষ প্রার্থীদের বিপরীতে প্রত্যক্ষ নির্বাচন করেই নারীরা সংসদ সদস্য, মেয়রও নির্বাচিত হয়েছেন। শিক্ষক, চিকিৎসক, আইনজীবি, সেনাবাহিনী, পুলিশ ও করপোরেট প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ পদেও মহিলারা স্বকীয় প্রতিভার স্বীকৃতি অর্জন করেছেন। দুনিয়ার সবিশেষ দুঃসাধ্য কর্ম - হিমালয় - শিখরে আরোহণ, দুজন বাঙালী নারী নিশাত মজুমদার এবং ওয়াসফিয়া নাজনীন গত ২০১২ সনের মে মাসে একই সপ্তাহের এমাথা - ও মাথায় তাও করতে পেরেছেন"।[১৯৫] গত ৪ জানুয়ারী ২০১৩ ভিনসন সময় বিকাল ৪ টায় অ্যান্টার্কটিকার সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ
ভিনসন ম্যাসিফের চূড়ায় অবরোহন করেন এবং সেখানে বাংলাদেশের পতাকা ওড়ান (চিত্র ৩- ক,খ,গ অ্যান্টার্কটিকা সর্বোচ্চ শৃঙ্গে ওয়াসপিয়া নাজনীন)। এভারেষ্ট এবং অ্যান্টার্কটিকা বিজয়ী ওয়াসপিয়া নাজনীন ইতিমধ্যে এই দু'টি সহ বিশ্বের সাতটি মহাদেশের মধ্যে ছয়টির সর্বোচ্চ পর্বত শৃঙ্গে উঠেছেন।[১৯৬]

---

[১৯৪]. শিশির মোড়ল ঃ অপুষ্টির চক্রে বাংলাদেশ, প্রথম আলো (শিশু সংক্রান্ত বিশেষ প্রতিবেদন), ২৯ জুলাই ২০১২।

[১৯৫].আমাদের সময়, ২১ নভেম্বর ২০১৩।

[১৯৬].আমাদের সময়,৪ নভেম্বর ২০১৪।

এখানেই প্রশ্ন বাংলাদেশের নারীরা পারে এবং সরকারী বেসরকারী যাবতীয় সুযোগ সুবিধা সবই আছে কিন্তু তথাপিও বাংলাদেশের নারীরা পিছিয়ে কেন? আসল সমস্যা টি কোথায়?

'ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম - ডব্লিওইএফ ' কর্তৃক বাংলাদেশের নারীদের অবস্থান - অবদানের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি এবং নারী-পুরুষ সমতার বিচারে বর্তমান বছরে বাংলাদেশের ১১ ধাপ অগ্রগতি বলতে কি বোঝাচ্ছেন তা সুস্পষ্ট নয়। ১১ ধাপ অগ্রগতি কি পুরুষের চেয়ে ১১ধাপ অধিক নাকি ০ থেকে ১১ ধাপ অগ্রগতি উন্নতি? নারীদের ০% থেকে ১১% হলে তা ঠিক আছে। বাংলাশে নারীদের মাত্র ১১ধাপ অগ্রগতি হিসেবে ধরে নেওয়া যেতে পারে - যা পুরুষের তুলনায় ৮৯ ধাপ কম। এটিকে অবশ্যই নারীর কিছু অগ্রগতি বলা গেলেও পরিপূর্ণ অগ্রগতি বলা যায়না।

গত ৩ আগষ্ট থেকে ৭ আগষ্ট ২০১৪ পর্যন্ত ইরান থেকে বাংলাদেশে আগত ছয় সদস্যের (সব সদস্যই নারী) একটি সংসদীয় প্রতিনিধি দল বাংলাদেশের নারীদের অবস্থা পর্যবেক্ষণে আসেন। গত ৭ আগষ্ট ২০১৪ তারিখ যুগান্তর পত্রিকা ইরানি উক্ত দলের নারী সংসদ ডা.শাহলা মিরবিগিউলয় বায়াত এর একটি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন। সাক্ষাৎকারে ডা. বায়াত বাংলাদেশের নারীদের উন্নয়নের প্রচেষ্টাকে প্রশংসা করেন। তিনি ইরানে নারী এবং বাংলাদেশের নারীদের বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা করতে গিয়ে বলেন, "বাংলাদেশের নারী সমাজের প্রকৃত উন্নয়নের বিষয়টি এখনও শুরুর পর্যায়ে রয়েছে। ইরান কিন্তু এ পর্যায়টি বেশ কয়েক বছর আগে পেরিয়ে গেছে"।[১৯৭]

বর্তমান অধ্যায়ে বাংলাদেশের নারীদের উন্নয়নের প্রচেষ্টার যে বিশাল চিত্র তুলে ধরা হয়েছে তার থেকেও কিন্তু বাংলাদেশের নারী উন্নয়নের প্রাথমিক অবস্থাই ফুটে উঠেছে। কারণ বর্তমান অধ্যায়ে বর্ণিত নারীদের অগ্রগতির জন্য দেশ জুড়ে এত বিশাল আয়োজনের পরও পুরো বিষয়টি পর্যালোচনায় দেখা যায় কেবল মাত্র শিক্ষা – তথা প্রাথমিক শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য ও পুষ্টির ক্ষেত্রে সামান্য কিছু অগ্রগতি ব্যতিরেকে আজ পর্যন্ত বাংলাদেশে নারীদের অবস্থার তেমন পরিবর্তন হয়নি। রাজনীতি, অর্থনীতি, প্রশাসনিক উচ্চতর পর্যায়ে, বিচার, কুটনৈতিক পর্যায়ে নারীরা অংশ গ্রহণের সুযোগ পাচ্ছে বটে কিন্তু পুরুষের সমান তো নয়ই কাছাকাছিও যেতে পারছেনা। দেখা যায় বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী, বিরোধীদলের নেত্রী, স্পিকার, সংসদ উপনেতা নারী, কিন্তু তথাপিও গত সংসদে ৩৫০ জন সদস্যের মধ্যে মাত্র ১৯ জন নির্বাচিত নারী সদস্য রয়েছেন। বাকি ৫০ জন সংরক্ষিত আসনে গৃহীত।

আবার দেশের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের প্রধান উৎস পোষাক শিল্প, হিমায়িত চিংড়ি, চামড়া, হস্তশিল্পজাত দ্রব্য, চা শিল্প সহ অন্যান্য পণ্য উৎপাদনের সরাসরি বিশাল ভাবে নারীরা জড়িত। কিন্তু পরিবারে সমাজে এবং দেশে তাদের কোন সম্মান জনক অবস্থান নির্দিষ্ট হয়নি। এখনও ৮১% নারী বেকার জীবন যাপনে কিংবা গৃহ বধূ হিসেবে স্বামীদের উপর নির্ভরশীল।[১৯৮]

আর সেজন্যই 'ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম - ডব্লিওইএফ ' ১১ ধাপ অগ্রগতিকে সমাজের প্রাগ্রসর অংশের অগ্রগতি বলে উল্লেখ করে জনাব রামেন্দ্র চৌধূরী তাঁর ' বাংলাদেশের নারী অগ্রগতির সুখবর ' প্রবন্ধে বলেন, " এ সত্যও অনস্বীকার্য যে, তারা প্রায় সবাই সমাজের প্রাগ্রসর অংশের প্রতিনিধিত্বকারী। তাদের অবদানে সমাজ আলোকিত হতে পারে, কিন্তু লাখো-কোটি সাধারণ নারী পশ্চাৎপদ অবস্থানে আটকে থাকলে অর্থনৈতিক

[১৯৭]. যুগান্তর ,৭ আগষ্ট, ২০১৪।

[১৯৮]. শাশ্বতি ঘোষ ঃ গৃহশ্রম, জেন্ডার ও উন্নয়ন কোষ, (১মখন্ড) ,পূর্বোক্ত,পৃঃ ১১৫-১১৮।

স্বাবলম্বিতা অর্জন করতে না পারলে, সামগ্রিক অবস্থানকে বৃহত্তর নারী সমাজের অগ্রগতি বলে চিহ্নিত করা চলবেনা কিছুতেই"। .. .. এখনও এক শ্রেণীর মানুষ কখনও ধর্মের নামে, কখনও বা ধর্মভিত্তিক রাজনীতির আড়ালে বাধাগ্রস্থ করে চলেছে। এখনও কেউ নারীদের অক্ষমতা - অযোগ্যতার কথা বলেন, কেউবা সামাজিক শৃঙ্খলার দোহাই দেন। এখনও কন্যা শিশুর বিবাহ এবং অপ্রাপ্ত বয়সী মাতৃত্ব নারীর স্বাধীন বিকাশ বাধাগ্রস্থ করছে, স্বাস্থ্যহানি ঘটাচ্ছে, কখনও বা অকাল মৃত্যুও। এমন পরিস্থিতির সফল মোকাবিলা করতে না পারলে নারীদের অধিকতর অগ্রগতি দূর -অস্ত"।[১৯৯]

গত ৮মার্চ ২০১৩ এর প্রথম আলো পত্রিকায় মানসুরা হোসাইন কর্তৃক প্রদত্ত 'অগ্রগতির চাকা ঘোরাচ্ছেন নারী' শিরোনামে প্রদত্ত তথ্যে নারীর অগ্রগতির বেশ কিছু তথ্য প্রদান করেও একথা বলতে বাধ্য হচ্ছেন " নারী নির্যাতন বন্ধ করা, নারীর প্রতি বৈষম্য কমানো সহ কিছু ক্ষেত্রে নজর দেওয়া হলে নারীর অগ্রগতি আরও বাড়বে"।[২০০]

কিন্তু প্রশ্ন হলো কিভাবে বন্ধ হবে নারী নির্যাতন? বর্তমান গবেষণার পরবর্তী অধ্যায়ে বাংলাদেশে বিদ্যমান নারী নির্যাতনের যে বিশাল চিত্র অঙ্কিত হয়েছে তাতে বাংলাদেশে নারী মুক্তির বিষয়টি প্রশ্নবিদ্ধই থেকে যাচ্ছে।

---

[১৯৯] .আমাদের সময়, ২১ নভেম্বর ২০১৩।

[২০০] .প্রথম আলো, ৮ মার্চ ২০১৩।

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়
বাংলাদেশে নারী নির্যাতনের স্বরূপ

বাংলাদেশে নারী নির্যাতন যেনো নিত্যদিনের ঘটনা। অনাদিকাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত পাকভারত উপমহাদেশে, পাকিস্তান আমলে এবং স্বাধীন বাংলাদেশেও নারীদের উপর অত্যাচার, নিপীড়ন, নির্যাতন যে তিমিরে ছিল সে তিমিরেই রয়ে গেছে। শুধু তা-ই নয় বরং তার পরিমান, পরিমন্ডল দিন দিন বেড়েই চলছে। পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতিটি স্তরে নারী নির্যাতন কতটা ভয়াবহ ও প্রকট হয়ে উঠেছে তা প্রতিদিনকার পত্রিকার পাতা খুললেই দেখা যায়।

বাংলাদেশে নারীরা প্রতিনিয়ত ধর্ষণ, গণধর্ষণ, এ্যাসিড নিক্ষেপ, শারীরিক নির্যাতন, যৌন হয়রানী এবং হত্যার শিকার হচ্ছে। ধর্ষনের পরও তাদেরকে হত্যা করা হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে শিশু, বৃদ্ধা, যুবতী কেউই রেহাই পাচ্ছেনা। আবার আইনের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার কৌশল হিসেবে হত্যাকে আত্মহত্যা হিসেবে চালানোর ব্যবস্থাও করা হচ্ছে। চলছে ব্যাপক মাত্রায় পারিবারিক নির্যাতন।

জাতিসংঘের সূত্র মতে প্রাপ্তবয়স্ক নারীর উপর তার পুরুষ সঙ্গীর শারীরিক নির্যাতনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের স্থান বিশ্বে দ্বিতীয়, যা শতকরা ৪৭%। স্বামীর হাতে মারা যায় ৬০% নারী, আর যৌন হয়রানির শিকার হয় ২০% নারী, মানষিক নিপীড়নের শিকার হয় ৬৭% নারী।[১] বাংলাদেশ জনমিতি ও স্বাস্থ্য জরিপ ২০১১ -এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, এ দেশের ৮৭% নারী ও কন্যাশিশু সহিংসতা ও নির্যাতনের শিকার হন। লিঙ্গভিত্তিক অসমতার ১৮৬টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১৪৬।[২] চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের মতে 'নির্যাতনের শিকার নারীরা হৃদরোগ, আন্ত্রিক ও যৌনরোগ, মাথা ও মেরুদন্ডেব্যথা, গর্ভধারণে জটিলতা, গর্ভস্থ শিশুর মৃত্যু, চরম বিষণ্নতা সহ ইনফ্লুয়েঞ্জার মতো রোগেও ভোগেন।[৩] শুধু শারীরিক রোগ নয় একই সাথে তারা মানসিক রোগেও ভুগতে থাকেন। যার ফলশ্রুতিতে সংসারে সন্তানেরা পায়না মায়ের যথাযথ তদারকি। মানুষ হওয়ার সঠিক পথের দিশা না পেয়ে তারা হতে থাকে চোর, ডাকাত এবং সন্ত্রাসী ইত্যাদি। তাই নারী নির্যাতনে শুধু নারীরাই ভোগেন তা নয় ভোগান্তি হয় পরিবারের, সমাজের এবং রাষ্ট্রের।

অনেক সময় নির্যাতিতরা খুঁজে পায়না কোন সহায়তা। বরং তারা বোঝা হয়ে দাঁড়ায় পরিবারের। কারণ সমাজ মুখ ফিরিয়ে নেয় তাদের দিক থেকে। ফলে নির্যাতিত অনেককেই মানসিক ভারসাম্যহীন হয়ে পড়তে দেখা যায় । একদিকে তার উপর সংগঠিত হয় ভয়াবহতা, অন্যদিকে লোকলজ্জার ভয় এবং নিরাপত্তাহীনতার কারণে অনেকে আত্ম-হনন এর পথও বেছে নিতে বাধ্য হয়।

---

[১].উন্নয়ন পদক্ষেপ (মাসিক পত্রিকা) ঃ ষ্টেপস টুওয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট (প্রকাশক) , ৩/৪, ব্লক ডি, লালমাটিয়া, ঢাকা-১২০৭, ৫ তম সংখ্যা, অক্টোবর ২০০৪, পৃ ঃ ১৩।

[২]. Bangladesh Demographic and health Survey (বাংলাদেশ জনমিতি ও স্বাস্থ্য জরিপ ২০১১) অনুসারে প্রথমআলো, ২৭ নভেম্বর ২০১৩।

[৩]. প্রথম আলো, বিশেষ প্রতিবেদন, ২ জুন ২০১১।

৫.২ নারী নির্যাতনের ধরণ, অবস্থান এবং বয়সসীমা

৫.২.১ নির্যাতনের ধরণ

ধর্ষণ, গণধর্ষণ, ধর্ষণের পর হত্যা, এ্যাসিড নিক্ষেপ, শারীরিক নির্যাতন, যৌনহয়রানি সহ বাংলাদেশের নারীরা আরও সব বিচিত্র ধরনের ব্যাপক নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। নারীকে নির্যাতনের জন্য নির্যাতনকারীদের নির্যাতনের পদ্ধতি উদ্ভাবনের যেন শেষ নেই । প্রতি নিয়তই নির্যাতনের নতুন খবর পাওয়া যায়। কাজেই নারী নির্যাতন কত প্রকার ও কী কী এ জাতীয় প্রশ্নের সর্বজনগ্রাহ্য কোন সদুত্তর পাওয়া কঠিন । তবে প্রচলিত নির্যাতনের ধরণগুলো বিশ্লেষণ করে খাদিজা লীনা এবং চিররঞ্জন সরকার কর্তৃক অতি সম্প্রতি প্রকাশিত 'নির্যাতিত নারী উপেক্ষিত মানবাধিকার ' গ্রন্থে নারী নির্যাতনকে প্রধানতঃ চারটি পর্যায়ভুক্ত করে দেখানো হয়েছে। সেগুলো হল দৈহিক তথা শারীরিক, মানসিক, যৌন এবং অর্থনৈতিক নির্যাতন । প্রতিটি পর্যায়ে রয়েছে বিচিত্র ধরনের সব ঘটনা যা নিচের ছকে তুলে ধরা হ'ল-

সারণী-২১

নারী নির্যাতনের ধরণ

শারীরিক নির্যাতন	মানসিক নির্যাতন	যৌন নির্যাতন	অর্থনৈতিক নির্যাতন
মারধর করা; মারধরের মাধ্যমে কখনও সামান্য কখনও গুরুতর জখম করা।	অপবাদ ও খোটা দেওয়া, চরিত্র খারাপের দূর্ণাম দেওয়া; আত্ম হত্যার প্ররোচনা দেয়া, প্রেমের নামে প্রতারনা করা।	ধর্ষণের প্রচেষ্টা, বলপূর্বক ধর্ষণ করা।	যৌতুক আদায়; নারীর নিজেস্ব আয়ে নিয়ন্ত্রন প্রতিষ্ঠায় বাধা দেয়া।
অ্যাসিড নিক্ষেপ এর মাধ্যমে মারাত্মক ভাবে জ্বালানো।	সব সময় শ্বশুর বাড়ীর লোকজনের নজরদারি, খবরদারি ও জবাব দিহিতার মধ্যে রাখা।	যৌন হয়রানি, ধর্ষনের হুমকি, ধর্ষণ।	স্বামীর বা অন্য কারো উপর নির্ভরশীল করে রাখা ।
গায়ে আগুন ধরিয়ে দেওয়া।	তার বাবার বাড়ীর লোকজনকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা।	কর্মক্ষেত্রে হয়রানি, অশ্লীল ছবি তোলা।	আর্থিক ভাবে বঞ্চিত করা ।
হত্যা-খুন-গুম করা।	পুরুষের করা যাবতীয় অপকর্মের জন্য অপকর্মের শিকার নারীকেই দোষারোপ করা।	অশ্লীল সিডি নির্মাণকরা, প্রেমের নামে প্রতারণা।	তার স্বামী সহ সংসারকে নিজ সংসার বিবেচনায় বাধা দেয়া।

শ্বাসরোধ করে হত্যা করা।	সারাক্ষণ খুঁত ধরা, সন্দেহ করা, বাবার বাড়ী যেতে না দেয়া।	হিল্যা বিয়েতে বাধ্য করা।	কর্মস্থলে নারীদের মজুরী কম দেয়া।
মা হিসাবে তার যথাযথ সম্মান না দেওয়া।	নারীকে শুশুর বাড়ীর নির্দিষ্ট গন্ডিতে আটকে রেখে তাকে তার আত্মীয় স্বজনের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করা।	অপহরণ ও অপহরণ চেষ্টা, পাচার করা, পাচারের চেষ্টা করা ।	নারীকে যুক্তিসংগত আকাঙ্খিত কাজ করতে বাধা দেওয়া।
ফতোয়াবাজির মাধ্যমে বেত্রাঘাত বা দোররা নিক্ষেপ এবং হত্যা করা ।	যৌতুকের জন্য প্রতিনিয়ত চাপ সৃষ্টি করা; ফতোয়াবজির মাধ্যমে অন্যায় শাস্তি মেনে নিতে বাধ্য করা।	প্রথম বিয়ের কথা গোপণ করে কোন মেয়েকে দ্বিতীয় স্ত্রী হিসাবে বিয়ে করা।	সন্তানদের আটকে রেখে নারীকে বাপের বাড়িতে চলে যেতে বাধ্য করা।
মারধরের মাধ্যমে কখনও সামান্য কখনও গুরচতর জখম।	যুক্তিসংগত স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা, তুচ্ছ- তাচ্ছিল্য করা, নারীকে মায়ের মর্যাদা, সম্মান ও স্বীকৃতি না দেয়া, মতামত প্রকাশের অধিকার না দেয়া;	বিয়েতে রাজি না হলে অপহরণের চেষ্টা করা;	তার সম্পদ বা উপার্জন কেড়ে নেয়া;
স্বামীর বহুবিয়েতে জোর পূর্বক সম্মতি আদায়ের কৌশল করা,	কম খেতে দেওয়া, নিজের যুক্তি সংগত পছন্দ ও সিদ্ধান্ত স্বত্বেও সে মাফিক কাজ করতে না দেয়া;	ই-মেইল ও মোবাইল ফোনে অশ্লীল মেসেজ পাঠানো;	ভরন পোষণের খরচ না দেয়া
তুচ্ছ-তাচ্ছিল করা, মারধর করা।	মারধর, বাবার বাড়িতে তাড়িয়ে দেয়া এমন কি হত্যার হুমকি দেয়া ; আত্মহত্যার প্ররোচনা দেওয়া , যৌন বৃত্তিতে বাধ্য করা।	পুরুষের করা যাবতীয় অপকর্মের জন্য অপকর্মের শিকার নারীকেই দোষারোপ করা; যার মাধ্যমে সেই নারীকে আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে বাধ্য করা।	নিজ বৃত্তি নির্বাচনে স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা।[৪]

চার ধরনের আওতায় এনে বিচিত্র সব নির্যাতনের যে চিত্র উপরের ছকে দেখানো হয়েছে তাতে মানসিক নির্যাতনকে পৃথক ভাবে দেখানো হলেও মূলতঃ সেগুলো সহ উল্লেখিত শারীরিক, যৌন এবং অর্থনৈতিক নির্যাতনের তথা প্রতিটি নির্যাতনের সাথেই নারীর মানসিক নির্যাতন সম্পৃক্ত।

[৪]. খাদিজা লীনা এবং চিররঞ্জন সরকার ঃ নির্যাতিত নারী উপেক্ষিত মানবাধিকার,পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৫-১৬।

৫.২.২ নারী নির্যাতনের অবস্থান

নারীনির্যাতনের কোন স্থান নির্ধারিত নেই। ঘরের ভিতর, বাহির, কর্মক্ষেত্র কোথাও নারীরা রেহাই পায়না নির্যাতন থেকে। সে চিত্র নিম্নরূপ-

সারণী-২২

নারী নির্যাতনের অবস্থান

গৃহের ভিতরে	গৃহের ভিতরে ও বাহিরে	গৃহের বাহিরে
গৃহের ভেতরে মারপিট করা, খোঁটা দেয়া, অপবাদ দেয়া, কম খেতে দেয়া, অকথ্য গালিগালাজ।	খুন, খুনের হুমকি, লাঞ্চিতকরণ, এ্যাসিড নিক্ষেপ, শারীরিক নির্যাতন, ধর্ষণ ও ধর্ষণচেষ্টা ।	ফতোয়া, ইভটিজিং ইত্যাদির মাধ্যমে হেনস্থা করা।
স্বামী কর্তৃক ভরণপোষণের খরচ না - দেওয়া।	যুক্তিসংগত ব্যক্তি স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা।	যৌন হয়রানি, ধর্ষনের হুমকি, ধর্ষণ।
স্বামীর করা যাবতীয় অপকর্মের জন্য অপকর্মের শিকার স্ত্রীকে দোষারোপ করা, যার জন্য সেই স্ত্রীকে আত্মহত্যার পথও বেছে নিতে হয়।	পুরুষের করা যাবতীয় অপকর্মের জন্য অপকর্মের শিকার নারীকেই/স্ত্রীকেই দোষারোপ করা। যার জন্য সেই নারীকে/স্ত্রীকে আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে বাধ্য করা।	কর্মক্ষেত্রে হয়রানি, অশ্লীল ছবি তোলা, অশ্লীল সিডি নির্মাণকরা, প্রেমের নামে প্রতারণা।
মোহরানা না দিয়ে যৌতুক আদায়, ঝিয়ের মত খাটানো, বাপের বাড়িতে যেতে না দেয়া, বাইরে বেরোতে না দেয়া।	মতের মূল্যায়ন না করা, দমিয়ে রাখার চেষ্টা করা, সিদ্ধান্ত গ্রহণে মূল্যায়ন না করা।	হিল্যা বিয়েতে বাধ্য করা, অপহরণ ও অপহরণ চেষ্টা, পাচার করা, পাচারের চেষ্টা করা ।
অন্যায় ভাবে তালাক দেয়া, মিথ্যা চারিত্রিক অপবাদ দেওয়া। গায়ে আগুন ধরিয়ে দেয়া।	গর্ভধারনে স্ত্রীর মতামতকে উপেক্ষা করা; গর্ভধারণ হলে সন্তান না রাখার জন্য ও চাপ সৃষ্টি করা।	প্রথম বিয়ের কথা গোপণ করে কোন মেয়েকে দ্বিতীয় স্ত্রী হিসাবে বিয়ে করা, রাজি না হলে অপহরণের চেষ্টা করা;
স্বামীর বহুবিয়েতে জোর পূর্বক সম্মতি আদায়ের কৌশল করা।	স্বামীর বহু বিবাহ মেনে নিতে বাধ্য করা।	ই-মেইল ও মোবাইল ফোনে অশ্লীল মেসেজ পাানো।
তুচ্ছ-তাচ্ছিল করা, মা হিসাবে তার যথাযথ সম্মান না দেওয়া।	আত্মহত্যার প্ররোচনা, যৌনবৃত্তিতে বাধ্য করা।	পুরুষের করা যাবতীয় অপকর্মের জন্য অপকর্মের শিকার নারীকেই দোষারোপ করা- যার জন্য সেই নারীকে আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে বাধ্য করা। [৫]

সারণী ২২ এ নারী নির্যাতনের অবস্থান দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। এতে এটি স্পষ্ট যে, ঘরের ভেতর, বাহির সর্বত্রই নির্যাতনের শিকার হচ্ছে নারীগণ। তার পরিপ্রেক্ষিতে যে প্রশ্নটি ভেসে ওঠে তা হলো এই নির্যাতনের প্রতিকারের সুযোগ কোথায় নারী জাতির ?

[৫] . খাদিজা লীনা এবং চিরঞ্জন সরকারঃ নির্যাতিত নারী উপেক্ষিত মানবাধিকার, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৭-১৮।

৫.২.৩ নারী নির্যাতনের সময় বা বয়স সীমা

নারী নির্যাতনের কোন সময় বা বয়সসীমা পর্যন্ত নির্ধারিত নেই । সেই ভ্রনাবস্থা থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত দেখা যায় নির্যাতনের বিভিন্ন রূপ। তারও একটি চিত্র নিম্নরূপ-

সারণী-২৩

ভ্রুনাবস্থা থেকে প্রাপ্ত বয়স্ক এমনকি বার্ধক্য পর্যন্ত নারী নির্যাতনের বিভিন্ন রূপ

ভ্রুনাবস্থা	প্রথম শৈশব	কৈশোর	বয়সন্ধি	প্রজনন কাল	বার্ধক্য এবং প্রতিবন্ধী অবস্থায়
মেয়েশিশুর ভ্রুণহত্যা।	নবজাতক মেয়ে শিশু হত্যা।	বাল্যবিবাহ।	বিয়ে বা প্রেমের নামে প্রতারনা করে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন ও গর্ভপাতে বাধ্য করা।	ঘনিষ্ঠ পুরুষ সঙ্গী দ্বারা নিপীড়ন বা দুর্ব্যবহার।	বিধবাদের উপর নিপীড়ন; পুত্র, পুত্র বধু কর্তৃক শাশুড়ীদের মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন
গর্ভকালে মারধর।	মানসিক ও শারীরিক নিপীড়ন এবং দুর্ব্যবহার।	পরিবার বা আশেপাশের লোকজনের দ্বারা যৌন নিপীড়ন।	প্রেমিকার প্রতি- হিংসার শিকার হওয়া। প্রতিবন্ধী মেয়েদের নির্যাতন।	বিবাহিত জীবনে স্বামী কর্তৃক ধর্ষণ; স্বামী বা ঘনিষ্ট মানুষ কর্তৃক মারধর।	স্বল্প খাদ্য প্রদান, শারিরিক, মানসিক নির্যাতনে অসুস্থ হয়ে পড়লে চিকিৎসার ক্ষেত্রেও অবহেলা;
গর্ভধারনে বাধ্য করা।	নবজাতক মেয়ে শিশুকে অবহেলা , তুচছ তাচ্ছিল্য করা।	খাদ্য ও শিক্ষাসহ নানা পর্যায়ে বৈষম্য প্রদশর্ন।	অর্থের বিনিময়ে জোর করে যৌন কর্মে লিপ্ত করানো।	যৌতুকের জন্য শারিরীক, মানসিক নির্যাতন, হত্যা এবং খুন।	বৃদ্ধ মায়ের সম্পদ/ অর্থ আত্মসাতের প্রচেষ্টা।

গর্ভধারণ না করতে বাধ্য করা।	নবজাতক মেয়ে শিশুকে খাদ্য ও চিকিৎসা প্রদানে বৈষম্য।	মেয়ে শিশুকে খাদ্য ও চিকিৎসা প্রদানে বৈষম্য।	মেয়ে শিশুকে দিয়ে পতিতাবৃত্তি; মেয়ে শিশু পাচার।	কর্মস্থলে যৌন নিপীড়ন, যৌন হয়রানী ও ধর্ষণ।	আরো বৃদ্ধ বয়সে নিপীড়ন, বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়া।[৬]

সারণী ২৩ এ প্রদর্শিত নির্যাতনের সময়সীমা পর্যালোচনায় আবার যে প্রশ্নটি ভেসে ওঠে তা হলো নারীদের নির্যাতিত না হওয়ার বয়স কিংবা সময়সীমা কোনটি এবং কখন? এর কোন উত্তর পাওয়া কঠিন।

৫.৩ নারী নির্যাতনের প্রকার ভেদ এবং বিস্তারিত বিবরণ

বাংলাদেশে নিম্নের ভয়াবহ নির্যাতন সমূহ নারীদের উপর সংগঠিত হয়ে থাকে -

১.ধর্ষণ, ২. অ্যাসিড নিক্ষেপ, ৩. যৌতুক জনিত নিষ্ঠুরতা, ৪. বাল্য বিয়ে, ৫. ইভটিজিং বা যৌন হয়রানী, ৬. ফতোয়াবাজী, ৭. নারী ও শিশুপাচার, ৮. গৃহ পরিচালিকা নির্যাতন, ৯. পারিবারিক নির্যাতন, ১০. হত্যা বা আত্মহত্যা প্রধান। এছাড়াও ১১. হত্যাকে আত্মহত্যা বলে প্রচারের ব্যবস্থা , ১২. মুঠোফোনে আপত্তিকর ভিডিও ধারণের মাধ্যমে আর্থিক, শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন।

আবার এমন কিছু নির্যাতনও হচ্ছে, যা কোন নামকরণের আওতায় আনা সম্ভব নয়। সেগুলোর কিছু উদাহরণ অনুচ্ছেদ ১৩. এ বিবিধ হিসেবে দেখানো হয়েছে।

নিম্নে এক এক করে বিদ্যমান নির্যাতন সমূহের বিস্তারিত চিত্র তুলে ধরা হ'ল। প্রতিটি নির্যাতনের ক্ষেত্রে সংগঠিত ঘটনা দেখাতে গিয়ে উদাহরণ হিসেবে বাস্তব কিছু চিত্রও তুলে ধরা হয়েছে, যদিও গবেষণা চলাকালীন বাস্তব ঘটনা তার চেয়ে অনেক অনেক বেশী ছিল ।

১. ধর্ষণ

ধর্ষণ হলো নারী নির্যাতনের ভয়ংকর এক হাতিয়ার। এটা নারীর শরীর, স্বাতন্ত্র্যবোধ, আত্মসম্মানবোধ ও ব্যক্তিসত্ত্বার ওপর প্রচন্ড আঘাত । তথাপি ও হরহামেশাই বাংলাদেশের নারীদের অন্যায় ভাবে এই অপরাধের শিকার হতে হচ্ছে । জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ভাবে ধর্ষণকে মানবতার বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড়ো অপরাধ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বাংলাদেশে বিদ্যামান আইনে ধর্ষণের শাস্তি ও রাখা হয়েছে সর্বোচ্চ । কিন্তু তারপর ও দেশে ধর্ষণের ঘটনা ঘটেই চলছে, প্রতিরোধ করা যাচ্ছে না।

[৬].পূর্বোক্ত পৃঃ ১৮ এবং পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত তথ্য থেকে।

ধর্ষণ সহিংসতার কারণ

সাধারণতঃ অসুস্থ, বিকারগ্রস্থ এক শ্রেণীর নরপশুর বিকৃত যৌনলালসা চরিতার্থ করাই ধর্ষণের প্রধান কারণ। অশ্লীল বইপত্র পড়ে, পর্নোগ্রফি ও কুরুচিপূর্ণ সিনেমা দেখে তাদের মধ্যে ধর্ষণস্পৃহা জাগ্রত হয়। ধর্ষণের শিকার মেয়ের সামাজিক স্বীকৃতি বজার রাখার প্রয়োজনে অধিকাংশ সময়েই ধর্ষণের ঘটনা গোপন রাখা হয়। যা ধর্ষণের ঘটনাকে প্রতিরোধ না করে বরং ঘটনার ব্যাপ্তি ঘটনোয় সহায়ক হয়। আবার ধর্ষণের চিত্র মুঠোফোনে ধারণ করে তা প্রকাশ করার ভয় দেখিয়ে একদিকে মেয়েটিকে বার বার ধর্ষণে বাধ্য করা হয় অন্য দিকে মেয়েটির পিতামাতার কাছ থেকে অর্থ আদায়ের কৌশল হিসেবেও তা ব্যবহার করা হয়।

ধর্ষণ সহিংসতার প্রতিক্রিয়া

বিকারগ্রস্ত্র এই নরপশুদের অন্যায়ের শিকার হয় নারীরা। নারীর উপর এ ধরণের মারাত্মক অপরাধ সংগঠিত হওয়ার পর আমাদের সমাজ এর জন্য নারীকেই দোষী করে এবং সামাজিক ও পারিবারিক ভাবে সে অগ্রহণযোগ্য হয়ে পড়ে। তার পরই লেপন করা হয় সামাজিক কলংক।

এসবের প্রতিকার হিসাবে অধিকাংশ সময়েই ধর্ষণের ঘটনা গোপন করে যাওয়া হয়। যা ধর্ষণের ঘটনাকে প্রতিরোধ না করে বরং ঘটনার ব্যাপ্তি ঘটায়। শুধু তাই নয়, এই সুযোগে অপরাধীদের সাহস বেড়ে ধর্ষণ ও গণধর্ষন এবং ধর্ষণের পর হত্যার পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছে। আর ধর্ষণের শিকার নারী পারিবারিক এবং সামাজিক ভাবে সহায়তা না পেয়ে বরং দোষী সাব্যস্ত হওয়ার কারণে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়।

ধর্ষণ সহিংসতার পরিসংখ্যান

২০০৩-২০০৯ পর্যন্ত সাত বছরে সংঘটিত বিভিন্ন ধরনের ধর্ষণ, গণধর্ষণ, ধর্ষণের পর হত্যা সংক্রান্ত নারী নির্যাতনের একটি পরিসংখ্যান নিম্নরূপ-

সারণী-২৪

ধর্ষণ জনিত নির্যাতনের সংখ্যা (২০০৩ -২০০৯)

ক্রম	ধরণ	২০০৩	২০০৪	২০০৫	২০০৬	২০০৭	২০০৮	২০০৯	মোট
১.	ধর্ষণ	৯৬১	৫৮৮	৪৯১	৫৪৯	৪৫৮	৩০৭	৩৬৫	৩৭২৩
২.	গণধর্ষণ	৩৭৬	৩৩৮	২৭১	২৪৮	২০১	১৩২	১৫০	১৬৭১
৩.	ধর্ষণচেষ্টা	২২৯	৬৫	১৪২	১৪১	১১৪	১১১	---	৮০২
৪.	ধর্ষণের পর হত্যা	১৭৫	১৪৮	১৪২	১৭০	১২৬	১১৪	১২৫	১০০০

	মোট	১৭৪১	১১৩৯	১০৪৬	১১০৮	৮৯৯	৬৮৮	৬৩০	৭১৯৬[৭]

উপরের ছকে প্রদত্ত পরিসংখ্যান থেকে দেখা যাচ্ছে ২০০৩ থেকে ২০০৯ পর্যন্ত ৭ (সাত) বছরে মোট ৭১৯৬ জন নারী ধর্ষণের শিকার হয়েছেন। এর চাইতে দুঃখ জনক ঘটনা আর কি হতে পারে?

২০১০ সালে ধর্ষণ জনিত নির্যাতনের সংখ্যা

শধুমাত্র ২০১০ সালেই বিভিন্ন বয়সের নারীর উপর ধর্ষণ, গণধর্ষণ, ধর্ষণের পর হত্যা, ধর্ষণের পর আত্মহত্যা ঘটনা এবং ঘটনা জনিত মামলার একটি পরিসংখ্যার নিম্নরূপঃ

সারণী-২৫

ধর্ষণ ২০১০											
ধরণ	বয়স এবং সংখ্যা	বয়স এবং সংখ্যা	বয়স এবং সংখ্যা	হত্যা বয়স এবং সংখ্যা	আত্ম হত্যা বয়স এবং সংখ্যা	মামলা					
	০ - ৬	৭-১২	১৩-১৮	১৯-২৪	২৫-৩০	৩০+	বয়স উল্লেখ নেই	মোট	হত্যা	আত্ম হত্যা	মামলা
ধর্ষণের চেষ্টা	৬	১১	৩	৫	৪	৬	৫৬	৯১	১		৪৪
একক ধর্ষণ	৩৪	৬০	৪৩	১৫	৩	৪	১৩১	২৯০	১১	৪	১৭০
গণধর্ষণ	৩	১০	৩২	১২	১০	৭	১৪৫	২১৯	৪৪	৩	১০২
ধর্ষণের ধরণ উল্লেখ নেই	১	৪	১	২		১	১৬	২৬	২৩		৭

[৭]. খাদিজা লীনা এবং চিররনবজন সরকার ঃ নির্যাতিত নারী উপেক্ষিত মানবাধিকার , পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৯-২০।

মোট	৪৪	৮৫	৭৯	৩৫	১৭	১৮	৩৪৮	৬২৬	৭৯		৩২৩
ধর্ষণের পরবর্তী হত্যা	৫	৭	১৩	৯	৪	৭	৩৪	0	৭৯		২৯
ধর্ষণের কারণে আত্মহত্যা		১	৩	১			২			৭	৫ [৮]

২০১০ এর বর্ণিত চিত্র লক্ষ্য করলে প্রতীয়মান হয় যে, এটি কি মারাত্মক দুঃখ জনক ঘটনা।

<u>২০১২- ২০১৩ এবং ২০১৪ সালে ধর্ষণ জনিত ঘটনা</u>

মানবাধিকার সংগঠন আইন ও সালিশ কেন্দ্রের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২০১২ সালে সারা দেশে ১ হাজার ১৪৯টি ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। ২০১৩ সালে এর সংখ্যা কিছুটা কমে দাঁড়ায় ৯৯৮টি। আর ২০১৪ এর জানুয়ারী থেকে জুন পর্যন্ত ৩০৯টি ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। এর মধ্যে ৯৮ জন গণধর্ষণের, ধর্ষণ পরবর্তী সময়ে হত্যা করা হয়েছে ২৯ জনকে। ধর্ষণের কারণে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছেন ৭জন।[৯] আবার আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রাতরোধ দিবস উপলক্ষ্যে ২৫ নভেম্বর ২০১৪ তারিখে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ যে তথ্য পেশ করেন সে অনুযায়ী, দেশে জানুয়ারী থেকে অক্টোবর ২০১৪ পর্যন্ত ১০ মাসে ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে ৭৭২টি। তন্মধ্যে ধর্ষণের শিকার হয়েছেন ৫৪৪ জন। গণধর্ষণের শিকার ১৫০ জন। ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে ৭৮ জনকে । এর অতিরিক্ত ৯৩ জনকে ধর্ষণের চেষ্টা চালানো হয়েছে।[১০]

আর আইন ও সালিশ কেন্দ্রের নির্বাহী পরিচালক সুলতানা কামাল ২০১৪ সালের ধর্ষণ জনিত ঘটনা সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, " এ বছর সবচেয়ে বেশী উদ্বেগজনক ছিল ধর্ষণের ঘটনা। ২০১৪ সালে ৭০৭ জন নারী ও শিশু ধর্ষণের শিকার হন। এর মধ্যে ধর্ষণের পর ৬৮ জনকে হত্যা করা হয়। আর ধর্ষণের পর আত্মহত্যা করেন ১৩ জন"। [১১]

অর্থাৎ উদ্বেগজনক ধর্ষণের এসব ঘটনা বাংলাদেশে ঘটেই চলছে। এর শেষ নেই।

<u>সাম্প্রতিক সময়ে সংঘটিত ধর্ষণ জনিত কয়েকটি মারাত্মক ঘটনা</u> –

<u>(১) মুখ ও হাত বেঁধে ছাত্রীকে পাশবিক নির্যাতন</u>

বর্তমান সময়ের আলোড়ন সৃষ্টিকারী ধর্ষণের ঘটনাটি ঘটেছে ভিকারুন্নিসা স্কুল এন্ড কলেজের বসুন্ধরা দিবা শাখার দশম শ্রেনীর এক ছাত্রীকে ঐ কলেজের শিক্ষক পরিমল জয়ধর কর্তৃক ধর্ষণ করা। ছাত্রীটির মুখ ও হাত বেঁধে বিবস্ত্র করে পাশবিক নির্যাতনের অভিযোগ করেছে নির্যাতিতা ছাত্রী। সে ১০ জনের একটি ব্যাচে

---

[৮]. আইন ও সালিশকেন্দ্র, ৭/১৭ ব্লক বি, লালমাটিয়া, ঢাকা- ১২০৭।

[৯].আমাদের সময়, ১৬ আগষ্ট ২০১৪ ।

[১০].প্রথম আলো , ২৫ নভেম্বর ২০১৪।

[১১]. প্রথম আলো , ১ জানুয়ারী ২০১৫।

শিক্ষক পরিমল জয়ধরের নিকট বাংলা বিষয়ে কোচিং করতো। একদিন কোচিং ক্লাশে পড়তে যেতে একটু বিলম্ব হয়। দেরিতে কোচিংয়ে যওয়ায় পরিমল তাকে পড়া বুঝিয়ে দেবে আশ্বাস দিয়ে অপেক্ষা করতে বলে। সবাই চলে গেলে পরিমল মূল দরজা বন্ধ করে ভিতরের দরজাও বন্ধ করে দেয়। কোন কিছু বুঝার আগেই ছাত্রীটির ওড়না দিয়ে মুখ ও হাত বেধেঁ ফেলে পরিমল । কিছুই বলতে পারেনি সে। উপর্যুপরি পাশবিক নির্যাতনে ঐ ছাত্রী মানসিক ভাবে ভেঙ্গে পড়ে । এ সময় পরিমল মুঠোফোনে ছবি তোলে। ঘটনার শেষে বাঁধন খুলে দিয়ে ছাত্রীকে হুশিয়ার করে দিয়ে পরিমল বলেন, কাউকে বললে ইন্টারনেটে ছবি ছেড়ে দেয়া হবে। এরপর পরিমলের কাছে আবার ও পড়তে যায় সে। সেদিন ও ঐ মেয়েকে আটকিয়ে পাশবিক নির্যাতন চালায় পরিমল।

প্রতিবাদ করলে পরিমল মেয়েটিকে জানিয়ে দেয়, তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করলে মেরে ফেলা হবে। এ বিষয়ে প্রথম সহপাঠিদের কাছে মুখ খুলে ছাত্রীটি । তাদের পরামর্শে স্কুল কর্তৃপক্ষকে বিষটি বলা হয়। কিন্তু স্কুল কর্তৃপক্ষ কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। সম্ভবত তারা বিষয়টি গোপন করারই প্রচেষ্টা নিয়েছিলেন। বাংলাদেশে সাধারনতঃ এ ধরনের ঘটনা ধামাচাপাই দেয়া হয়। কিন্তু মেয়েটির বাবা সাহসী ভূমিকা নিয়ে বাদী হয়ে বাড্ডা থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলা করেন। বিষটি নিয়ে ছাত্রী এবং ছাত্রীদের অভিভাবকগণ ও তীব্র আন্দোলন পরিচালনা করেন। আন্দোলন এবং পত্রপত্রিকায় গুরুত্বের সাথে বিষয়টি প্রকাশের ফলে মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশের প্রেক্ষিতে অতঃপর মামলার পলাতক আসামী পরিমল জয়ধর গ্রেফতার হয়। সে পুলিশের কাছে দোষও স্বীকার করে এবং ধর্ষণের কথা স্বীকার করে আদালতেও সে জবানবন্দী দেয়। ধর্ষনের শিকার মেয়েটিও আদালতে জবানবন্দী দিয়েছে।[১২] আদালতে এই ঘটনার বিচার কার্যক্রম চলছে।

(২) চলন্ত বাসে তরুণীকে ধর্ষণ

গত ১৬ ডিসেম্বর ২০১২ ভারতের নয়াদিল্লীতে চলন্ত বাসে মেডিকেল ছাত্রীকে ধর্ষণের ঘটনায় পুরো ভারত ব্যাপি যে আন্দোলনের ঝড় উঠেছিল, সে ঘটনাকে ঘিরে গত ১৪ ফেব্রুয়ারী, বৃহস্পতিবার সিডনি, সিঙ্গাপুর ও ম্যানিলা সহ বিশ্বের ২০০টি দেশে সমাবেশ শোভাযাত্রা সহ নানা কর্মসূচি পালন করা হয়।[১৩] এটি আশ্চর্য যে, এর পরপরই একই ঘটনা ঘটে বাংলাদেশেও।

মেয়েটির (১৮) গ্রামের বাড়ী রাজবাড়ীর পাংশায়। তিনি ঢাকার আশুলিয়ার একটি পোষাক কারখানায় চাকুরী করেন। গ্রামে যাওয়ার জন্য পাটুরিয়া ঘাটের উদ্দেশ্যে ২৪ জানুয়ারী ২০১৩ বৃহস্পতিবার বেলা একটার দিকে নবীনগর বাসস্ট্যান্ড থেকে শুভযাত্রা পরিবহনের একটি যাত্রীবাহী বাসে ওঠেন তিনি। মানিকগঞ্জ বাসস্ট্যান্ডে বাসের অন্য যাত্রীরা নেমে যান। এ সময়ে ভাংতি নেই বলে ভাড়ার সময় দেয়া বাড়তি টাকার অবশিষ্ট না দিয়ে তাকে বাসে তুলে কৌশলে ওই তরুণীকে নিয়ে বাসচালক ও তাঁর সহকারী পাটুরিয়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেন। বাসটি মানিকগঞ্জ বাসষ্ট্যান্ড অতিক্রম করার পর বাসচালকের সহকারী কাশেম মিয়া বাস চালাতে থাকেন। আর বাসচালক দীপুমিয়া তরুণীকে ধর্ষণের চেষ্টা করে। পরে বাসচালক বাস চালাতে থাকে, সহকারী কাসেম মেয়েটিকে ধর্ষণ করে। বাসের দরজা জ্বানালা বন্ধ ছিল। তারা মানিকগঞ্জের বাসস্ট্যান্ডের অদূরে মহাসড়কের মানরা সেতুর কাছে ওই বাস থামিয়ে তরুণীকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়।

---

[১২]. আমাদের সময়, ৫- ৮ জুলাই ২০১১ এবং প্রথম আলো, ১৯ জুলাই ২০১১।

[১৩].প্রথম আলো , ১৫ ফেব্রুয়ারী ২০১৩ (সারাবিশ্ব)।

মানিকগঞ্জের পৌর এলাকার এক সব্জী ও বাদাম বিক্রেতা আঃ হান্নান মিয়া সেতুর কাছে ফেলে দেয়া মেয়েটিকে উদ্ধার এবং আসামীদের পুলিশে ধরিয়ে দিতে সহায়তা করেন।[১৪]

মেয়েটি নিজে বাদী হয়ে থানায় মামলা করে। ঐ দুই আসামীও গ্রেফতার হয়। পুলিশের কাছে সহকারী কাসেম ধর্ষনের কথা শিকার করে। সে জানায় মেয়েটিকে প্রথমে বাস চালক দীপু এবং পরে সে ধর্ষণ করে।[১৫] উল্লেখ্য যে আদালতে ঘটনাটি সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত হওয়ায় ১৩ ফেব্রুয়ারী ২০১৪ বৃহস্পতিবার মাননীয় আদালত এই মামলার রায় প্রদান করেন। রায়ে চালক এবং হেলপারকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদন্ড ও ৫০ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও ৩ মাসের কারাদন্ডের আদেশ দিয়েছেন মাননীয় আদালত।[১৬] -যথা সময়ে প্রদত্ত এ রায় প্রশংসনীয়।

(৩) ধর্ষণের পর আত্মহত্যা

ধর্ষণের শিকার সিরাপিনার আত্মহত্যা একটি বড় ধরনের প্রতিবাদ। নয় যুবক কর্তৃক ধর্ষণের পরও সে বাঁচতে চেয়েছিল বিচার প্রার্থী হয়ে। কিন্তু গির্জার ফাদার তাকে বাঁচতে দেয়নি। ঘটনাটি ঘটেছে রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী উপজেলার রিশিকুল ইউনিয়নের আমতুলিপাড়া গ্রামে। এই গ্রামের সাঁওতাল পল্লীর কর্ণেলিউস মার্ডির মেয়ে পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রী সিরাপিনা মার্ডি (১৪) । তাকে ২০১০ সালের ৪ এপ্রিল ধর্ষণ করে একই গ্রামের নয়জন আদিবাসী যুবক। এ ব্যাপারে সাহস নিয়ে সিরাপিনা নিজে বাদী হয়ে মামলা করলে পুলিশ ঘটনার সত্যতা পেয়ে আসামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ পত্র দেয়। অর্থৎ তদন্তে ঘটনা প্রমাণিত হয়। কিন্তু আসামীদের রক্ষা করতে গির্জার ফাদার বার্নাড টুডু সহ স্থানীয় ব্যক্তিরা সিরাপিনার বাবাকে গির্জায় ডেকে ভয়ভীতি দেখিয়ে মামলাটি আপোষ- মীমাংসা করে নিতে বাধ্য করেন। সিরাপিনা এই গ্লানি সহ্য করতে না পেরে গত ১৭ ফেব্রুয়ারী ২০১১ তারিখে নিজের গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন লাগায় । চিকিৎসাধীন অবস্থায় সে কয়েকদিনের মধ্যেই সে মারা যায়।[১৭]

যদিও গত ২৩ ফেব্রুয়ারী ২০১১ গোদাগাড়ীর কাকনহাট পুলিশ - তদন্ত কেন্দ্রের এস আই বাদী হয়ে ফাদার বার্নাড টুডু সহ ১৩ জনকে আসামী করে আত্মহত্যা- প্ররোচনার অভিযোগ করে মামলা করেন । পরে সিরাপিনার মা সুসানা সরেন বাদী হয়ে ধর্ষণের অভিযোগে ৯(নয়) যুবককে আসামী করে অপর এক মামলা করেন। মামলাটি আগের মামলার সঙ্গে সংযুক্ত করার জন্য রাজশাহী নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইবুনাল আদালতে আবেদন করেন তিনি। আদালত আবেদনটি আমলে নিয়ে পুলিশকে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ দেন।[১৮] কিন্তু কে বলতে পারে যথাযথ ভাবে ঘটনার উপযুক্ত সাক্ষী প্রমান সিরাপিনার বাবা মা শেষ পর্যন্ত পাবেন কিনা?

---

[১৪] .প্রথম আলো, ২৫ জানুয়ারী ২০১৩, ২৭ জানুয়ারী ২০১৩, ২৮ জানুয়ারী ২০১৩, ১১ ফেব্রুয়ারী ২০১৩, এবং ১৫ ফেব্রুয়ারী ২০১৩।

[১৫] . প্রথম আলো, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮ জানুয়ারী ২০১৩, ১১ ফেব্রুয়ারী ২০১৩, ১৫ ফেব্রুয়ারী ২০১৩, আমাদের সময়, ২৫ জানুয়ারী ২০১৩।

[১৬] . আমাদের সময়, ১৪ ফেব্রুয়ারী ২০১৪।

[১৭] . প্রথম আলো, ৩ জুন ২০১১।

[১৮] .প্রথম আলো, ৩ জুন ২০১১।

এ বিষয়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনবিভাগ এর অধ্যাপক জনাব আনিসুজ্জামান মানিক এর বক্তব্য প্রনিধানযোগ্য । তিনি প্রথম আলো, ২৬ ফেব্রুয়ারী, ২০১১ তে লিখেন, ' আসুন, সিরাপিনার আত্মার কাছে ক্ষমা চাই'। তিনি বলেন, "শিরাপিনা মাত্র ১৪ বছর বয়সে জীবনের সবচেয়ে মুল্যবান সম্পদ হারিয়েছে, সমাজপতিরা এই সম্পদের মূল্য নির্ধারণ করেছে টাকার অঙ্কে। শিরাপিনা মেনে নিতে পারেনি। মৃত্যুর আগে টাকা নিতে নিষেধ করেছিল। সে বিচার চেয়েছিল, সে বিচার চায়। হিংস্র দানবদের বিচার চায়। যারা পালাক্রমে তাকে অপমান করেছে, তাদের বিচার চায়। সিরাপিনা টাকাকে ঘৃণা করলেও তার দিন মজুর বাবা স্থানীয় চার্চের ফাদারের নির্দেশের বাইরে যাওয়ার ক্ষমতা রাখেন না। কিন্তু সিরাপিনা রাখে। সে গায়ে আগুন দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে, ইজ্জতের চেয়ে, আত্মসম্মানের চেয়ে এই পৃথিবীতে মূল্যবান কোন ধন নেই...... শিরাপিনা রক্তের উত্তরাধিকারকে শ্রদ্ধার সঙ্গে সম্মান করে জানান দিয়েছে, সে রাসমণির বংশধর । ইলা মিত্রের মাটির সন্তান সে। চার্চের তথাকথিত মীমাংসাকে মেনে নেয়নি। স্থানীয় চার্চের শাসনকে বৃদ্ধাঙ্গুল দেখিয়েছে।"

তিনি আরও বলেন," খ্রিষ্ট ধর্ম অনুসারে ভার্জিনিটি বেষ্ট। এটা সত্য হলে চার্চের ফাদার কী করে ধর্ষণের মত ভয়ংকর অপরাধকে টাকার মাধ্যমে সমঝোতা করেন"?[১৯]

৪. ভালোবাসার খেসারত - গণধর্ষন

ভালোবাসার টানে প্রেমিক নাঈমের ডাকে প্রতিদিন ছুটে আসত মেয়েটি। কখনও সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে, কখনও চন্দ্রিমায় আবার কখনওবা ধানমন্ডি লেকে সকাল থেকে রাত অবদি আড্ডা দিত দু'জন। মাত্র ১৫ দিনের পরিচয়ে মেয়েটি গভীরভাবে ভালোবেসে ফেলে নাঈমকে। সেই ভালোবাসার টানে প্রেমিকের ডাকে এসে গত ১২ মে ২০১৪ সোমবার রাত ১১টার দিকে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে নাঈম ও তার চার বন্ধুর গণধর্ষণের শিকার হয়ে পাগলপ্রায় মেয়েটি। এ ঘটনায় শাহবাগ থানায় একটি মামলা করেছে ধর্ষিতা।[২০]

এরূপ ঘটনার মামলায় আসামী ধরা পড়ুক বা না পড়ুক তার বিচার হউক বা না হউক, যে ক্ষতি মেয়েটির হয়ে গেল তা পূরণ হওয়ার উপায় কি বা কোথায়?

৫.মা - বাবাকে বেঁধে রেখে দুই মেয়েকে ধর্ষণ

সিলেটের বিয়ানী বাজারের চারখাই ইউনিয়নের গত ২৫ মে ২০১৪ রোববার সিঁধ কেটে ঘরে ঢুকে মা বাবাকে বেঁধে দুই মেয়েকে ধর্ষণ করেছে দুর্বৃত্তরা। দুই বোন ২০১৪ সনের এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। মেয়েটির দিনমজুর বাবা মুঠো ফোনে কেঁদে কেঁদে সাংবাদিকদের বলেন, 'আমরার হাত-পাও বান্ধি (বেঁধে) গলাত (গলায়) রামদা রাখছিল। চউখের সামনে ঘটনা দেখে চউখ মুজি কানছি(কাঁদা) আর আল্লারে ডাকছি। ... কত মিনতি করছি ... হুনলনা পাষান্ডরা'। ঘটনার প্রেক্ষিতে বিয়ানীবাজার থানায় মামলা হয়েছে। পুলিশের নিকট এটি পরিকল্পিত ঘটনা বলে প্রতীয়মান হয়েছে।[২১]

[১৯] .প্রথম আলো, ২৬ ফেব্রুয়ারী ,২০১১।

[২০] .আমাদের সময়, ১৪ মে ২০১৪।

[২১] .প্রথম আলো, সোমবার, ২৬ মে ২০১৪

৬. সন্তানকে গলাটিপে হত্যা করে মাকে গণধর্ষণ

গত ২০ মে ২০১৪ তারিখের ঘটনা। ঘরে সেদিন কোন খাবার ছিলনা। রাতটি ছিল ঝড়ের। স্বামী গিয়েছিলেন বাজারে চাল কিনতে। ঝড়ের কবল থেকে আশ্রয় পেতে স্ত্রী শিশু সন্তানটিকে কোলে চেপে নিজ বাড়ি থেকে পাশ্ববর্তী বাবার বাড়িতে যাচ্ছিলেন । পথেই একদল পাষন্ড কোলের সন্তানকে গলাটিপে হত্যা করে পুকুরে ফেলে দিয়ে মায়ের উপর চালায় গণধর্ষণের এক নৃশংস ঘটনা। আরও নৃশংস হলো থানায় মামলা হলেও পুলিশ কর্তৃক তারিখ এবং ঘটনা পরিবর্তন করা। ঘটনা স্থলে গিয়ে পরিদর্শন শেষে আইনও সালিশ কেন্দ্রের নির্বাহী পরিচালক সুলতানা কামাল বলেন, "মা যখন বাচ্চাকে বুকে চেপে রাখে, তখন তার কোল থেকে বাচ্চাকে নিয়ে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়। এর চেয়ে নিষ্ঠুরতা আর কি হতে পারে'? তিনি আরও বলেন, 'গঙ্গাচড়ার এ ঘটনায় অপরাধীদের দ্রুত বিচার ও মামলার অসঙ্গতি দূর করতেই আমাদের ঘটনাস্থল পরিদর্শন'। অসঙ্গতি সম্পর্কে তিনি বলেন,'ঘটনা ঘটেছে মে মাসের ২০ তারিখ। এজাহারে মামলা রুজু দেখানো হয়েছে, ২০ জানুয়ারিতে। এর চেয়ে বড় অসঙ্গতি আর কি হতে পারে? এ ছাড়া গণধর্ষণের ঘটনা ঘটলেও মামলায় উল্লেখ করা হয়েছে ধর্ষণচেষ্টার কথা'।[২২]

পুলিশ কর্তৃপক্ষ ঘটনার তারিখ ও বিষয় পরিবর্তনের বিষয়টি ভুল বললেও আইনও সালিশ কেন্দ্রের নির্বাহী পরিচালক কর্তৃক তা সনাক্ত করা না হলে সে ভুল সংশোধন হতো কিনা তাতে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে যাতে বিচার কালীন ঘটনা প্রমান করা বাদী পক্ষের জন্য কষ্টকর হতো যা মূলতঃ আসামীদের খালাশ পাওয়ার পথকেই প্রশস্ত করেছিল।

৭. শিশুদের ধর্ষণ এবং ধর্ষণের পর হত্যা যেন নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার

ধর্ষণকারীদের হাত থেকে শিশুরাও নিস্তার পাচেছনা। সাম্প্রতিক সময়ের সংগঠিত কয়েকটি শিশু ধর্ষনের ঘটনা হ'ল-

১. রাজবাড়িতে ৫ বছরের শিশু ব্রাক স্কুলের শিশু শ্রেণীর ছাত্রী কে ধর্ষণচেষ্টার মামলায় জামিন পাওয়া তরুন একই শিশুকে গত ১৩ জানুয়ারী ২০১৩ স্কুল থেকে বাড়ি আসার পথে তাকে পাশের একটা বাঁশ বাগানে নিয়ে ধর্ষণের পর হত্যা করে।[২৩]

২. নিখোঁজ থাকার পাঁচদিন পর রাজধানীর একটি বহুতল ভবনের শৌচাগার থেকে ১৯ জানুয়ারী ২০১৩ শনিবার ১০ বছরের শিশু রিতু আক্তারের রক্তাক্ত ও অর্ধগলিত লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। রিতুর লাশের সুরত হাল প্রতিবেদনে বলা হয় ১৪ জানুয়ারী ২০১৩ দিবাগত রাতের যে কোন সময়ে অজ্ঞাত লোকেরা রিতুকে হত্যা বা ধর্ষণ করে হত্যা করে বাথরুমে ফেলে রেখেছে।[২৪] (চিত্র ৪, লাশ উদ্ধারের পর রিতুর লাশ নিয়ে প্রতিবাদ ও মিছিল)।

৩. কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার আড়িয়া গ্রামে ২৫ জানুয়ারী ২০১৩ শুক্রবার হাসি খাতুন নামের একটি শিশুকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে। ওই দিন বিকেলে একটি পুকুর থেকে তার লাশ

---

[২২]. প্রথম আলো, ৩১ মে ২০১৪।

[২৩]. প্রথম আলো, ১৪ জানুয়ারী , ২০১৩।

[২৪].আমাদের সময়, ২০ জানুয়ারী ২০১৩।(চিত্র ৪, লাশ উদ্ধারের পর রিতুর লাশ নিয়ে প্রতিবাদ ও মিছিল)।

উদ্ধার করে পুলিশ। কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের আবাসিক চিকিৎসক তাপস কুমার সরকার জানান, হাসিকে ধর্ষণের পর গলাটিপে হত্যা করা হয়েছে। তার শরীরে ধর্ষণের আলামত পাওয়া গেছে।[২৫]

৪. গত ৬ ফেব্রুয়ারী ২০১৩ বুধবার ইমরান সহ কয়েকজন ঢাকার আশুলিয়া থেকে এক শিশুকে অপহরণ করে এক আত্মীয়ের বাসায় আটকে রেখে ধর্ষণ করে এবং মুক্তিপণ দাবী করে । মুক্তি পণের টাকা আনতে গিয়ে ৮ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার আশুলিয়ার জিরানী এলাকা থেকে সে গ্রেফতার হয়। তার স্বীকারোক্তি অনুযায়ী পুলিশ শিশুটিকে উদ্ধার করে।[২৬]

৫. রংপুরের পীরগঞ্জে জুলি নামের প্রায় ৬ বছরের এক শিশুকে ধর্ষণের পর মৃত্যু হলে লাশ ঘরের মেঝেতে পুঁতে রেখে গা- ঢাকা দেয় হিরু নামের এক ব্যক্তি। গত ১১ এপ্রিল ২০১৩ পীরগঞ্জ উপজেলার কুতুবপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। রাতে পীরগঞ্জ থানা পুলিশ হিরুর ঘরের মেঝেতে পুঁতে রাখা জুলির লাশ উদ্ধার করে। এ ব্যাপারে থানায় মামলা হয়েছে।[২৭]

৬. গত ৩মে ২০১৪ শনিবার দূপুরে পিরোজপুর সদর উপজেলার একটি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রী বাড়ী ফেরার পথে গ্রামের রুহুল মোল্লার ছেলে গাঁজা উজ্জল (২১) রাস্তা থেকে মেয়েটিকে জোর করে তুলে নিয়ে পাশের তালুকদার বাড়ির বাগানে নিয়ে নির্যাতন চালায়। চিৎকার করলে গলা টিপে মেরে ফেলার হুমকি দেয়। মেয়েটি বাড়ি গিয়ে ঘটনা মাকে জানায়। সে ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে মাকে জড়িয়ে ধরে এবং ঘটনার কথা বলে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। মা মেয়ের গায়ে রক্ত ঝরতে দেখে বুঝতে পারেন যে, শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছে। তাকে পিরোজপুর সদর হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। উজ্জলকে আসামী করে পিরোজপুর সদর থানায় মামলা হয়েছে।[২৮]

৭. গত ১৬ মে ২০১৪, ভৈরবের গাইটাল মহল্লায় চার বছরের শিশু আফরোজা এবং ৭বছরের শিশু মীমকে নিজের দু'পাশে নিয়ে ঘুমুচ্ছিলেন মা। বাবা নয়ন মিয়া শৌচাগারে যেতে ঘর থেকে বের হন। আর এ সুযোগেই শাহআলম(২২) ঘরে ঢুকে ঘুমন্ত আফরোজাকে নিয়ে পালিয়ে গিয়ে শিশুকে ধর্ষণের পর হত্যা করে।[২৯]

এক ধর্ষণই কত ভাবে সংগঠিত হচ্ছে তা উপরের উদাহরণ সমূহ থেকে স্পষ্ট এবং এ ধরনের ঘটনার শেষ নেই । প্রতিদিনই একটি - দু'টি কিংবা চারটি-পাঁচটি নয় বরং অনর্গল ঘটেই চলছে। এর প্রতিবাদও কম হচ্ছেনা। কিন্তু বন্ধ হচ্ছেনা ধর্ষণ জনিত ঘটনা। ধর্ষণজনিত ভয়ংকর সব ঘটনা ঘটেই চলছে।

---

[২৫]. প্রথম আলো , ২৭ জানুয়ারী , ২০১৩।

[২৬]. প্রথম আলো সোমবার, ১১ ফেব্রুয়ারী , ২০১৩।

[২৭]. আমাদের সময়, ১৩ এপ্রিল ২০১৩ ।

[২৮]. প্রথম আলো রোববার, ৫ মে , ২০১৪।

[২৯]. প্রথম আলো রোববার, ১৮ মে , ২০১৪।

২. এ্যাসিড সহিংসতা

এ্যাসিড সহিংসতা বংলাদেশের জন্য আরেক কলঙ্ক জনক অধ্যায়। বাংলাদেশ সহ পাকিস্তান, ভারত, নেপাল, কম্বোডিয়া এবং উগান্ডায় এ ধরনের সহিংসতা বিদ্যমান রয়েছে। এর বাইরে অধিকাংশ উন্নত এবং সভ্য দেশে এসিড দিয়ে কোন নারীর মুখ বা শরীর ঝলসে দেওয়ার কথা শুনা যায় না। বাংলাদেশে এই নিষ্ঠুর নির্যাতনের প্রধান শিকার হয় নারী ও কিশোরীরা। নারীর সৌন্দর্যকে নষ্ট করার জন্য্য সাধারণতঃ নারীর মুখমন্ডল ই হয় এর মূল লক্ষ্য। নারীই এর প্রধান হলেও নবজাতক থেকে শুরু করে বৃদ্ধ - বৃদ্ধা, নারী-পুরুষ কেউই এর থেকে রেহাই পাচ্ছে না।

এ্যাসিড সহিংসতার কারণ

এ্যাসিড সহিংসতার মূলে রয়েছে পুরুষের পুরুষতান্ত্রিক মানষিকতা, এ্যাসিডের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার এবং এ্যাসিড আক্রমনকারীদের যথাসময়ে এবং যথাযথ বিচার না হওয়া। প্রেমের প্রস্তাব, অনৈতিক কোন প্রস্তাব প্রত্যাখান করা হলে এবং যৌতুক আদায়ে ব্যর্থতার কারণে প্রধানতঃ এই ঘটনা ঘটে থাকলে ও বর্তমানে ব্যবসা বানিজ্য, জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধ ইত্যাদি কারণেও এ্যাসিড নিক্ষেপের ঘটনা ঘটছে।

২০১৩ সনের এর একটি অবস্থান নিম্নের ছকে দেখানো হ'ল-

সারণী ২৬

২০১৩ এ সংগঠিত বেশ কিছু এ্যাসিড সহিংসতা কারণ

কারণ	পুরষ	মহিলা	শিশু
যৌতুক	-	৩	-
পারিবারিক বিরোধ	-	৫	২
ভূমি সংক্রান্ত আর্থিক বিরোধ	১৪	১৩	-
বিবাহিত জীবনের বিরোধ	১	৫	-
প্রেমের / অনৈতিক প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান	১	৯	৯
কারণ জানা নেই	২	৩	১
অন্যান্য	১০	৬	১
সর্বমোট:	২৮	৪৪	১৩[৩০]

ছকটি পর্যালোচনায় এ্যাসিড সহিংসতার কারণ হিসেবে যৌতুক, পারিবারিক বিরোধ, ভূমি সংক্রান্ত আর্থিক বিরোধ, বিবাহিত জীবনের বিরোধ, প্রেমের / অনৈতিক প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান ইত্যাদি প্রধান হিসেবে দেখা যাচ্ছে।তার মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ২৮ জন হলেও মহিলাদেও সংখ্যা ৪৪ জন।

[৩০]. http://www.acidsurvivors.org/Statistics/2, accessed 12.4.14|

Dhaka University Institutional Repository

এ্যাসিড সহিংসতার প্রতিক্রিয়া

এ্যাসিড সহিংসতার প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত ভয়াবহ, কারণ এ্যাসিড মানুষের শরীরের চামড়ার নিচের টিস্যু গলিয়ে দেয় এমনকি কখনও কখনও হাড় পর্যন্ত গলিয়ে দিতে পারে। সর্বাধিক ক্ষতি হয় চোখ, কান এবং যৌনাঙ্গের। বিভিন্ন পত্রপত্রিকার তথ্যানুসারে এ পর্যন্ত এ্যাসিড আক্রান্ত অনেকেই হারিয়েছে তাদের দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণ ক্ষমতা, প্রজননক্ষমতা। অনেকে হারিয়েছে তাদের জীবনও । চিকিৎসার সুযোগ পেলেও তারা ফিরে পায়না তাদের পূর্বের শারিরীক অবয়ব বরং ঘটে তাদের শারীরিক বিকৃতি। শারীরিক বিকৃতির কারণে এ্যাসিড সহিংসতার শিকার ব্যক্তিরা পরিবার ও সমাজ সর্বত্রই শিকার হয় বৈষম্যের। তাদের জন্য যে প্রয়োজন মনঃসামাজিক এর মানসিক স্বাস্থ্য সেবা তার কথাই উঠছে।[৩১] কিন্তু যথা যথযথ ব্যবস্থাদি গড়ে ওঠেনি। বাংলাদেশ সরকারের মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের আওতায় ঢাকা মেডিকেল কলেজে রয়েছে ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার। সেখানেও এ্যাসিড আক্রান্তদের জন্য চিকিৎসার ব্যবস্থা রয়েছে।[৩২] (চিত্র-৫, ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার এ এসিড সহিংসতার শিকার একটি মেয়ের চিকিৎসারত অবস্থার ছবি)।

এ্যাসিড সহিংসতার পরিসংখ্যান

২০১০ সালে এ্যাসিড সহিংসতার কারণ এবং সংখ্যা নিম্নরূপ-

পারিবারিক কলহ জনিত কারণে ২১টি, যৌতুকের দাবিতে ৬টি, শত্রুতা জনিত কারণে ৭ টি, জমিজমা সংক্রান্ত্র কারণে ১০ টি, কুপ্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় ৮ টি, বিয়ের প্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় ৫ টি, প্রেমে ব্যর্থ হয়ে ৫টি, ধর্ষনের পর ১টি, স্বামীর বিরুদ্ধে মামলা করায় ১ টি, মামলা প্রত্যাহারে রাজি না হওয়ায় ২ টি, স্বামীকে তালাক দেওয়ায় ২ টি, যৌতুকের মামলা করায় ১ টি, কোন কারণ পাওয়া যায়নি এরূপ ২৪টি, মোট ৯৩টি - এ্যাসিড সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে। তন্মধ্যে মামলা হয়েছে মাত্র ৩৯টি ঘটনার বিপরিতে।[৩৩]

বাংলাদেশে গত এক যুগ ধরে এ্যাসিড সারভাইবারস ফাউন্ডেশন (এ এস এফ) এ্যাসিড সন্ত্রাসের শিকার নারীদের বিভিন্ন ধরনের সহযোগিতা প্রদান করে আসছে। প্রথম আলো প্রত্রিকায় ১২ মে ২০১১ এ প্রকাশিত এ্যাসিড সারভাইভারস ফাউন্ডেশনের তথ্য অনুযায়ী, মে ১৯৯৯ থেকে প্রপ্রিল ২০১১ পর্যন্ত ২৫০৬ টি এ্যাসিড সন্ত্রাসের ঘটনায় মোট ৩১৭৫ জন আক্রান্ত হয়েছেন।

তন্মধ্যে ২১৮১ জন নারী এবং ৯৯৪ জন পুরুষ। এই সময়ের মধ্যে এ্যাসিড - সন্ত্রাস জনিত ১৫৯৩টি মামলার মধ্যে মাত্র ১৬৭টি মামলার আসামিদের সাজা হয়েছে। প্রেমে ব্যর্থতা, যৌতুক, পূর্বশত্রুতা, জায়গা-জমি নিয়ে বিরোধকে কেন্দ্র করে এ ধরনের সহিংসতার কারণ হিসাবে উক্ত প্রতিবেদন দেখানো হয়েছে।[৩৪] প্রথম আলো পত্রিকাও এ্যাসিড আক্রান্তদের বিভিন্ন ধরনের সহযোগিতা প্রদান করে থাকে।

নিম্নে পাইচার্টের মাধ্যমে ১৯৯৯ - ২০১১ পর্যন্ত এ্যাসিড সন্ত্রাস জনিত ঘটনা, মামলা এবং এ্যাসিড সন্ত্রাসের ঘটনা জেন্ডার এর আলোকে দেখানো হ'ল-

---

[৩১]. প্রথম আলো, ২৫ ফেব্রুয়ারী ২০১৪।

[৩২]. ঢাকা মেডিকেল কলেজের আওতায় ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার এ এসিড সহিংসতার শিকার একটি মেয়ের চিকিৎসারত অবস্থার ছবি- চিত্র -৫।

[৩৩]. খাদিজা লীনা এবং চিররঞ্জন সরকার ঃ নির্যাতিত নারী উপেক্ষিত মানবাধিকার, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪০-৪১।

[৩৪]. প্রথম আলো, ১২ মে ২০১১।

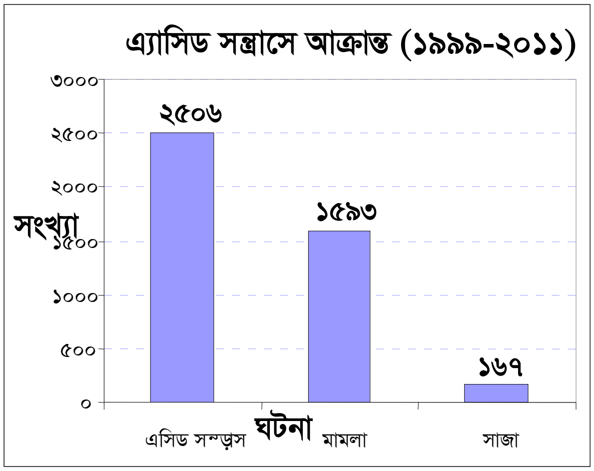

১

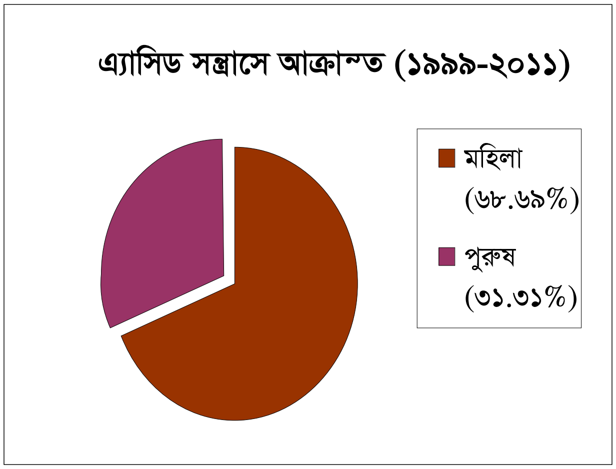

২

১. ১নং পাই চার্টটিতে এ্যাসিড আক্রান্তের ঘটনা তৎপ্রেক্ষিতে মামলা এবং সাজার পরিমান দেখানো হয়েছে।

২. ২নং পাই চাটটিতে এ্যাসিড আক্রান্তদের পরিমান Gender Perspective এ দেখানো হয়েছে।

তা হলো- ২১৮১(৬৮.৬৯%) জন মহিলা আর ৯৯৪ (৩১.৩১%) জন পুরুষ।[৩৫]

নিম্নের ছকে এ্যাসিড সহিংসতা সংক্রান্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মামলার তথ্য দেখানো হয়েছে -

সারণী-২৭

এ্যাসিড সহিংসতা ঘটনার মামলা সংক্রান্ত তথ্য ছক

বছর	রুজুকৃত মামলার সংখ্যা	অভিযোগপত্র	তদন্তাধীন মামলার সংখ্যা	বিচারাধীন	সাজা	স্থগিত
২০০২	২০৯	১৫৬	0	১৫৬	৪৩	১৮
২০০৩	২৫৮	১৫৮	0	১৫৮	৩৩	৩০
২০০৪	২০৮	১২৯	0	১২৯	২৪	১৮
২০০৫	২০৬	১২২	0	১২২	২৪	৩৪
২০০৬	১৪৬	৮০	0	৮০	১২	৩৬
২০০৭	১৭৭	১০৯	0	১০৯	১১	৬৭
২০০৮	১৬৩	৮০	0	৮০	৭	৫৮
২০০৯	১২৯	৭০	0	৭০	১৩	১৫
২০১০	৯৭	৪৬	১৮	৪৬	০	৪৫
মোট	১৫৯৩	৯৫০	১৮	৯৫০	১৬৭	৩২১[৩৬]

[৩৫].এ্যাসিড সারভাইভারস ফাউন্ডেশন এর প্রতিবেদন, প্রথম আলো, ১২ মে ২০১১।

[৩৬].এ্যাসিড সারভাইভারস ফাউন্ডেশন এর প্রতিবেদন, প্রথম আলো, ১২ মে ২০১১।

উপরের ছকে ২০০২ থেকে ২০১০ পর্যন্ত মোট মামলা ১৫৭৩টি মামলা হয়েছে। ৯৫০টির অভিযোগ পত্র পাওয়ার প্রেক্ষিতে স্বাভাবিক ভাবেই ৯৫০টি বিচারাধীন এ চলে এসেছে। বর্ণিত সময়ের মধ্যে সাজা হয়েছে ১৬৭টি মামলায় এবং বিচার স্থগিত হয়েছে ৩২১টি মামলার। বিচার স্থগিত হওয়া এবং স্বল্প সংখ্যক সাজার বিয়টি দুঃখজনক।

এই ঘটনারও শেষ নেই উদ্বেগজনক ভাবে তা চলছেই । আইন ও সালিশ কেন্দ্রের একটি পর্যালোচনা অনুসারে ২০১৪ সনে এ্যাসিড নিক্ষেপের ঘটনা ঘটেছে ৪৮টির মত। তন্মধ্যে মারা গিয়েছেন দু'জন মামলা হয়েছে ১৩টি।[৩৭]

সাম্প্রতিক সময়ের এ্যাসিড সহিংসতার কয়েকটি মারাত্মক ঘটনা

(১) এ্যাসিড দগ্ধ ইডেন ছাত্রী পায়ে ধরেও রেহাই পাননি

গত ১৫ জানুয়ারী, ২০১৩ রাজধানীর চানখার পুলের কাজি অফিসে ইডেন কলেজ ছাত্রী শারমিন আক্তার আঁখিকে এ্যাসিডদগ্ধ ও ছুরিকাহত করে তার সাবেক স্বামী মনিরউদ্দিন। মনিরউদ্দিন স্নাতক পাশ ও একটি শিল্পকারখানার মালিক পরিচয় দিয়ে ২০১২ সনে আঁখিকে বিয়ে করেন। অল্পদিন পরই তা মিথ্যা বলে ধরা পড়ে এবং বিয়ের এক মাসের মাথায় তাকে তালাক দেন আঁখি। এরপর মনির তাঁকে আবার বিয়ের জন্য চাপ দিতে থাকেন। ২য়বার মনিরকে বিয়েতে রাজি না হওয়ায় এ ঘটনা ঘটানো হয়েছে বলে এ্যাসিডদগ্ধ ছাত্রী জানিয়েছেন।

আঁখিকে হত্যার উদ্দেশ্যে কয়েকমাস আগেই ছুরি ও এ্যাসিড কেনে মনিরউদ্দিন। ঘটনার দিন কৌশলে তাকে কাজি অফিসে ডেকে এনে বিয়ের জন্য চাপ সৃষ্টি করে সে। বিয়েতে রাজি না হওয়ায় ছুরিকাঘাত ও এ্যাসিড দগ্ধ করে সে পালিয়ে যায়। এ সময়ে এ্যাসিড পড়ে মনিরউদ্দিনেরও হাত ও প্যান্ট পুড়ে যায়। পরে টিকাটুলির রাজধানির সুপার মার্কেট থেকে নতুন প্যান্ট সার্ট কিনে রাঙামাটির বরকল উপজেলার কুসুমছড়িতে পালিয়ে যায় মনিরউদ্দিন।

পূর্ব পরিচয়ের সূত্র ধরে কুসুমছড়ির রঙ্গুমিয়ার বাড়িতে আশ্রয় নেয় সে। ২২ জানুয়ারী, ২০১৩ খবর পেয়ে গোয়েন্দা পুলিশ রঙ্গুমিয়ার বাড়িতে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করে। পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদে মনিরউদ্দিন এসব কথা জানায়। এদিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বার্ণ ইউনিটে চিকিৎসাধীন ছাত্রীর আকুল আর্তি- 'আমি বাঁচতে চাই, আমাকে বাঁচতে দাও'।[৩৮]

(২) প্রেমের প্রস্তাবে প্রত্যাখ্যাত যুবকের ছোড়া দাহ্য পদার্থে ঝলসে গেছে কলেজ ছাত্রী

গত ৬ ফেব্রুয়ারী ২০১৪ দিনাজপুরের হাকিমপুর উপজেলার এক কলেজ ছাত্রী (১৯) কে গভীর রাতে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা করা হয়। এই ছাত্রীর বাড়ি জয়পুর হাটের মঙ্গলবাড়ি মহল্লায়। তিনি স্থানীয় একটি কলেজে পড়াশুনা করেন। কলেজে যাওয়া আসার পথে সায়েমউদ্দিন (২৬) নামের এক বখাটে তাকে প্রায়ই উত্যক্ত করতো। কিছুদিন আগে ওই ছাত্রীকে বিয়ের প্রস্তাব দেয় সায়েম। তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় সে ওই ছাত্রীকে প্রাণনাশের হুমকি দেয়। ভয়ে পরিবারের সদস্যরা ওই ছাত্রীকে হাকিমপুর উপজেলার চন্ডিপুর গ্রামে তার নানীর বাড়িতে রেখে আসেন।ওই ছাত্রী রাতে তাঁর নানীর সঙ্গে এক কক্ষে ঘুমন্ত অবস্থায় বখাটে

[৩৭]. প্রথম আলো , ১ জানুয়ারী ২০১৫।

[৩৮] .আমাদের সময়, ২৭ জানুয়ারী ২০১৩, প্রথম আলো, ২০ জানুয়ারী, ২০১৩, এবং ১৭ মার্চ ২০১৩ ।

সায়েম তিনজন যুবক সহ তিনটি মোটর সাইকেলে করে এসে রাত তিনটার দিকে ওই কক্ষের টিনের চাল ফাঁক করে ছাত্রীর গায়ে দাহ্য পদার্থ ছুড়ে মারে। তাদের দেয়া আগুনে ওই ছাত্রীর শরীরের ৩০% অংশই পুড়ে যায়। পাশে থাকা তার নানীর শরীরেরও কিছু অংশ পুড়ে যায়। ওই ছাত্রীকে দিনাজপুরের সদর হাসপাতালে নেয়া হলে চিকিৎসকগণের পরামর্শ অনুযায়ী ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বার্ণ-ইউনিটে চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসা হয়।[৩৯]

(৩) স্ত্রীকে এ্যাসিডে ঝলসে দিয়ে স্বামী পলাতক

মুঠোফোনে পরিচয়ের সূত্র ধরে নরসিংদীর বাসিন্দা হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রদীপের সঙ্গে নারায়নগঞ্জের বন্দর উপজেলার ধামগড় আনন্দ নগরের মুসলমান মেয়ে শশীর(২৪) বিয়ে হয়। তাদের মধ্যে প্রেমের সম্পর্কের প্রেক্ষিতে প্রদীপ মুসলমান হয়ে মামুন হোসেন নাম নেওয়ার প্রেক্ষিতে আদালতের মাধ্যমে তাদের বিয়ে হয়। ধর্মান্তরিত হওয়ার কারণে প্রদীপকে তার বাড়ি থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে বলে জানালে তাকে শশীদের বাড়িতে থাকার অনুমতি দেন শশীর বাবা মা। গত ২১ জুন ২০১৪ শনিবার দুপুরে একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে যাওয়ার আগে প্রদীপ জোর করে শশীর সিঁথিতে সিঁদুর ও হাতে শাঁখা পরানোর চেষ্টা করে। শশী এতে আপত্তি জানায়। বাগবিতন্ডার এক পর্যায়ে প্রদীপ শশীর মুখে এ্যাসিড ছুড়ে মারে। যাতে শশীর মুখের অনেকখানি ঝলসে যায়। তাকে দ্রুত ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বার্ন ইউনিটে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনার পর থেকে শশীর স্বামী পলাতক রয়েছে।[৪০]

(৪) মাদ্রাসা ছাত্রীকে এ্যাসিড নিক্ষেপ, নিভে গেছে তার চোখের আলো

গাজীপুর জেলার কালীগঞ্জ উপজেলার বক্তারপুর ইউনিয়নের ব্রাক্ষ্মণগাঁও গ্রামের হেলাল খানের কন্যা জনি আক্তর(১৩)। সে বক্তারপুর ইউনিয়নের ব্রাক্ষ্মণগাঁও মহিলা দাখিল মাদ্রাসার সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রী। তার প্রতিবেশী বখাটে উজ্জল দীর্ঘদিন ধরে জনিকে যৌন হয়রানি করে আসছিল। কিন্তু জনি তার ডাকে সাড়া না দেওয়ায় গত ৭ সেপ্টেম্বর রোববার সন্ধায় উজ্জল ৩/৪ জন বন্ধুকে নিয়ে তাদের ঘরে ঢুকে জনির উপর এ্যাসিড নিক্ষেপ করে তার দু'টি চোখ সহ শরীরের একাংশ ঝলসে দিয়েছে । তাতে জনির দু'টি চোখের আলো চিরদিনের জন্য ঝলসে গিয়েছে। এ বিষয়ে জনির মা বাদী হয়ে কালীগঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগের মাধ্যমে মামলা করেছেন।[৪১]

(৫) নরসিংদীতে স্বামী - স্ত্রী এ্যাসিড সন্ত্রাসের শিকার

গত ১অক্টোবর ২০১৪ বুধবার দিবাগত রাতে নরসিংদীর মনোহরদী উপজেলার কৃষ্নপুর ইউনিয়নের চর গোয়ালবাড়ী তে এ্যাসিড-সন্ত্রাসের শিকার হয়েছেন সাদিয়া আক্তার ও অসীম মিয়া দম্পতি। এতে সাদিয়ার পুরো শরীর এবং অসীমের শরীরের ডান দিকের অংশ ঝলসে যায়। চাচাদের সাথে জমি সংক্রান্ত বিরোধ কিংবা সাদিয়ার আগের স্বামীর আক্রোশের কারণে এ ঘটনা ঘটতে পারে বলে আত্মীয় স্বজনেরা অনুমান করছেন।তারা ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।[৪২]

[৩৯]. প্রথম আলো, ৮ ফেব্রুয়ারী ২০১৪।

[৪০]. প্রথম আলো, ২৩ জুন ২০১৪।

[৪১].যুগান্তর, ১০ সেপ্টেম্বর ২০১৪।

[৪২]. প্রথম আলো, ৩ অক্টোবর ২০১৪।

(৬) এ্যাসিড আক্রান্ত মাসুদা

নবম শ্রেণীতে পড়া কালীন বখাটে যুবক আরিফের ছোড়া এ্যাসিডে মুখ শরীর সহ দেহের অংশ ঝলসে যাওয়া মাসুদা। চিকিৎসাশেষে শরীরের অংশ কিছুটা ঠিক হলেও চোখ দুটি ফিরে পায়নি সে। তবুও চিকিৎসা শেষে অন্ধ মাসুদা ভাইয়ের, মায়ের সহযোগিতায় লেখা পড়া চালিয়ে যাচ্ছে। চোখ দুটি বিদ্যমান থাকলে কিনা হতে পারতো প্রতিভাময়ী এই মাসুদা?[৪৩] (চিত্র ৫. ১)।

এভাবে অন্যায়ভাবে এ্যাসিড দগ্ধ হয়েই চলছে বাংলাদেশের মেয়েরা/ নারীরা। এ্যাসিড নিক্ষেপের মত ঘটনা ভয়ংকর এবং অত্যন্ত দুঃখজনক। তা বন্ধ করার জন্য সাধারণ বিচার ব্যবস্থাই চলছে। মাননীয় আদালতে গেলে সেখানে সাক্ষী/প্রমানের যথাযথ উপস্থিতিতেও বাদীপক্ষ সফল হতে

৩. যৌতুক জনিত নিষ্ঠুরতা

যৌতুক কি?

বিয়ের শর্ত হিসাবে বিয়ের সময়ে বা পরে কিংবা বিয়ে টিকিয়ে রাখার লক্ষ্যে মেয়ের পক্ষ থেকে টাকা-পয়সা, জিনিসপত্র বা সম্পত্তি ছেলে পক্ষকে দেয়ার বাধ্যবাধকতাকেই যৌতুক বলা হয়। বাংলাদেশে এটি বিয়ের একটি অনমনীয় শর্তে পরিণত হয়েছে। অনেক সময় বিয়ের আগেই যৌতুকের অর্থ বা দ্রব্যাদি ছেলের বাড়িতে পাঠিয়ে দিতে হয়। কখনো কখনো ছেলেকে চাকুরী পাইয়ে দেয়া, বিদেশে পাঠানো ইত্যাদি যৌতুকের শর্ত হিসাবে দেখা যায়।

যৌতুক জনিত নিষ্ঠুরতা

সাধারণতঃ বিয়ের সময়ই বর পক্ষ দেনা পাওনা আদায় করে নেয়। কিন্তু অনেক সময় দরিদ্র পরিবারগুলো বিয়ের পূর্বে বা বিয়ের দিনই এই দাবি মেটাতে পারে না। তখন পরবর্তীতে যৌতুক দেয়ার শর্তে বিয়ে হয়ে থাকে। এরূপ অবস্থায় অপরিশোধিত যৌতুক আদায়ের জন্য বর পক্ষ মেয়েটির উপর ক্রমাগত চাপ সৃষ্টি করতে থাকে। অনেক সময় বিয়েতে যৌতুক দেয়ার মধ্য দিয়েই যৌতুকের দাবি শেষ হয়ে যায় না। প্রতিশ্রুত যৌতুকের সম্পূর্ণ অর্থ /সম্পদ মেটাবার পরও নতুন দাবি বা অধিকতর দাবী নিয়ে বরপক্ষ কনের উপর চাপ সৃষ্টি করতে থাকে।

এভাবে একজন বিবাহিত নারী আজীবন যৌতুকের চাপে থাকে এবং নানা ভাবে যৌতুকের জন্য নির্যাতিত হতে থাকে। যেমন গালি গালাজ করা, খেতে না দেয়া, বাপেরে বাড়ি যেতে না দেয়া, খোঁটা দেয়া, তালাক দেয়া এবং তালাকের হুমকি দেয়া, মারধর করা, কোলের সন্তানকে রেখে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়া ইত্যাদি। কখনো কখনো যৌতুককে কেন্দ্র করে নারীর উপর নিষ্ঠুর ভাবে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করা হয়। ফুটন্ত পানি শরীরে ঢেলে পুড়িয়ে মারা, আগুনে পুড়িয়ে মারা, এ্যাসিড ঢেলে দেহ বিকলাঙ্গ করে দেয়ার মত ঘটনাও ঘটে থাকে। প্রায় প্রতিদিনই খবরের কাগজ খুললেই যৌতুকের দাবি আদায় না হওয়ায় গৃহবধুকে ঘরে তালাবদ্ধ করে রাখা, সন্তানসহ ও অনেক সময় সন্তানকে রেখে দিয়ে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে

[৪৩].প্রথম আলে , ২৩ ডিসেম্বর ২০১৪। (চিত্র - ৫ .১ এসিড আক্রান্ত মাসুদা এবং তার লেখা পড়ার সাধনা)।

দেয়া, ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করা ইত্যাদি চোখে পড়ে। অনেক সময় নারীরা এসব নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যাও করে।- এ সবই বাংলাদেশে সমাজে যৌতুকজনিত নিষ্ঠুরতা হিসাবে চলছেই।

যৌতুক জনিত নিষ্ঠুরতার কারণ

- ধর্ম অনুযায়ী হিন্দু নারীদের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্য সম্পত্তিতে কোন অধিকার না থাকায় বিয়ের সময়ই না পাওয়াটা কিছুটা পুষিয়ে দেয়া এবং নেয়ার মনোভাব থেকে যৌতুক দেয়া ও নেয়ার কারণ। এটি ধীরে ধীরে মুসলিম পরিবার গুলোকেও আকৃষ্ট করেছে ;

- পৈত্রিক সম্পত্তিতে অধিকাংশ মুসলিম পরিবার মেয়েদের প্রাপ্য ন্যায্য হিস্যা থাকা সত্বেও তা না দিয়ে বিয়ের সময় কিছু দিয়ে দেয়ার প্রবনতা থেকেই মুসলিম পরিবার গুলোতে যৌতুক প্রথা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠার কারণ;

- পৈত্রিক সম্পত্তি থেকে অধিকাংশ মুসলিম মেয়েদেরকে তাদের পৈত্রিক সম্পত্তির কিছুই দেওয়া হয়না। অংশ নিলে ধ্বংশ হয় - এরূপ একটি অপব্যাখ্যা চালু করে দিয়ে মেয়েদেরকে বঞ্চিত করা একটি রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

- মেয়েরাও অজ্ঞতা বশতঃ কিংবা পিতা ভাইয়ের সংসারে অবাঞ্চিত হওয়ার ভয়ে নিস্ক্রিয় ভূমিকা পালন করে থাকে। ওরকম অবস্থায় স্ত্রীদের জিম্মি করে তার স্বামীর বাড়ির লোকজন মেয়েটির বাবার বাড়ি থেকে জোর পূর্বক অর্থ আদায়ের প্রয়াস চালাতে থাকে;

- মানুষের লোভ লালসাই যৌতুকের অন্যতম কারণ। ধনী পরিবারগুলো তাদের মেয়েদেরকে লেখাপড়ায় উপযুক্ত না করে বরং মধ্যবিত্ত পরিবারের অতিকষ্টে তৈরী একটি উপযুক্ত ছেলেকে একেবারে কিনে নিয়ে যেতে চায়। তখন ছেলে সহ ছেলের বাবা- মা ও লোভের শিকার হয়ে পড়েন। এটি দেখে দেখে নিম্নবিত্ত পরিবার গুলোও লোভের শিকার হয়;

- নিম্নবিত্ত পরিবার গুলোর ছেলেদের বেকারত্ব, অশিক্ষা, দারিদ্রতা ইত্যাদি যৌতুক আদায়ের কারণ;

- একদিকে আর্থিক অনটন, লোভ লালসা অপর দিকে পিতার পরিবারের বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে স্ত্রীদের অস্বস্তিবোধ বা সরাসরি অস্বীকৃতি প্রায়ই স্বামীদের এবং তাদের পরিবার পরিজনদের হিংস্র করে তোলে। তারই পরিণামে নারীর ওপর চালানো হয় হিংস্র, অমানবিক নির্যাতন।

যৌতুক জনিত নিষ্ঠুরতার/ সহিংসতার প্রতিক্রিয়া

- যৌতুক জনিত সমস্যা বাংলাদেশের একটি বিরাট সামাজিক সমস্যা যা পরিবার, সমাজ এবং রাষ্ট্রকে বিভিন্ন ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। প্রতিবছর এর ফলে বাংলাদেশের ধনী-গরীব, গ্রাম-শহরের হাজার হাজার নারী ও তাদের পরিবার অর্থনৈতিকভাবে নিঃস্ব ও সামাজিকভাবে অসম্মানিত হচ্ছে। অনেক নারী খুন হচ্ছে। কেউবা আত্মহত্যাও করছে;

- এটি বর্তমানে বাংলাদেশে একটি সামাজিক ব্যাধি হিসাবে রূপ নিয়েছে। মেয়ের পিতা মাতার কাছ থেকে যৌতুক না পেলে মারধর করা থেকে শুরু করে খুন করা, এসিড মারা সহ ভয়ংকর সব

নিষ্ঠুরতা চাপানো হচ্ছে মেয়েটির উপর। ফলে যৌতুক এবং যৌতুকের কারণে নির্যাতন বাংলা দেশে ভয়ানক সামাজিক ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে;

- যৌতুকের কারণে সমাজে সবচেয়ে বেশী মূল্য দিতে হয় নারীকে। নির্যাতনের শিকার নারীদের শরীরের হাড় ভেঙ্গে যাওয়া, স্বাস্থ্য খারাপ হওয়া, স্থায়ীভাবে অক্ষম, অপরিণত গর্ভপাত, ভ্রুণের স্বাভাবিক বৃদ্ধি রহিত হওয়া, কম ওজনের শিশু জন্মদান, গর্ভের সন্তান নষ্ট হওয়া সহ নানা সমস্যা দেখা দেয়;

- নারীরা হতাশা, আশঙ্কা- ভীতি সহ নানারকম চাপের মধ্যে মানসিক ভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে ; বাংলাদেশে স্বামী বা শাশুড়ী দ্বারা নির্যাতিত হয়ে খুনের ঘটনা সাধারণতঃ যৌতুকের কারনেই ঘটে থাকে;
- কখনও বা নির্যাতন- নিপীড়ন এমনই হয় যে, তাকে বাধ্য হয়ে আত্মহত্যা করতে হয়;
- নারীর প্রতি এই সহিংসতা শিশুর মধ্যেও নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। দেখা যায় বাবা মায়ের মধ্যকার বিবাদমূলক সম্পর্ক শিশু মৃত্যুর হারকে ও প্রভাবিত করে।

যৌতুক জনিত নিষ্ঠুরতার পরিসংখ্যান

২০১০ সালে যৌতুকের দাবীতে হত্যা করা হয়েছে ২২৪ জন নারীকে, আর যৌতুক সংক্রান্ত নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে ৩৮৮ টি।[88] সারণী -২৮ এ সে চিত্র তুলে ধরা হয়েছে -

সারণী-২৮

যৌতুককে কেন্দ্র করে নির্যাতন - ২০১০							
নির্যাতনের ধরণ	বয়স				বয়স উল্লেখ নেই	মোট	মামলা
	১৩ -১৮	১৯ -২৪	২৫ -৩০	৩০+			
শারীরিক নির্যাতন	১৭	১২৮	৮৪	২১	১৩৮	৩৮৮	৫০
এ্যাসিড নিক্ষেপ		২	১		৩	৬	১
স্বামীগৃহ থেকে বিতাড়িত						০	
তালাক		১				১	

[88]. খাদিজা লীনা এবং চিররঞ্জন সরকার ঃ নির্যাতিত নারী উপেক্ষিত মানবাধিকার , পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪০-৪১।

মোট	১৭	১৩১	৮৫	২১	১৪১	৩৯৫	৫১
হত্যা	৯	৯০	৫৫	১৪	৫৬	২২৪	১১২
নির্যাতিত হয়ে আত্মহত্যা		৭			১১	১৮	৬ [৪৫]

শিশু কাল থেকে প্রাপ্ত বয়য় পর্যন্ত এ নিষ্ঠুরতা তা চলছেই। যৌতুকের চাহিদায় শারীরিক নির্যাতন তো চলেই সেই সাথে এ্যাসিড নিক্ষেপ, তালাক প্রদান অতঃপর হত্যা থেকে আত্ম -হত্যা কোনটিই বাদ যায়না।

আবার এই নিষ্ঠুরতার শেষ নেই, তা চলছেই। আইন ও সালিশ কেন্দ্রের (আসক) এর সংগৃহীত তথ্য অনুসারে ২০১৪ সনে এসে যৌতুকজনিত নিষ্ঠুরতার শিকার হয়েছেন ২৯৬ জন নারী।[৪৬]

সাম্প্রতিক সময়ের যৌতুক সংশ্লিষ্ট কয়েকটি মারাত্মক ঘটনা

(১) যৌতুকের দাবীতে আটদিন ধরে স্ত্রীকে শেকলে বন্দী

বিয়ের পর থেকেই নিয়মিত যৌতুক দাবী করছিলেন স্বামী মাহমুদুল করিম। যৌতুক না পাওয়ায় স্ত্রী খালেদা বেগমকে বহুবার শারীরিক নির্যাতনও করেন তিনি। গত ৯ ফেব্রুয়ারী ২০১২ সকালে ৫০.০০০ টাকার দাবীতে স্বামী তাকে বেদড়ক মারধর করেন, অতঃপর রান্নাঘরে নিয়ে শেকল দিয়ে বেঁধে রাখেন। পাড়াপ্রতিবেশী আত্মীয়স্বজনের অনুরোধেও শেকল না খোলায় পুলিশকে খবর দেয়া হলে পুলিশ এসে শেকল বাঁধা অবস্থায় তাকে উদ্ধার করেন। অতঃপর উপজেলা স্বাস্থ্যকমপ্লেক্সে তাকে ভর্তি করা হয়।[৪৭] (চিত্র- ৬ক, ছবি সহ বিস্তারিততথ্য)

(২) যৌতুক না পেয়ে গৃহবধূকে হত্যা

মানিক গঞ্জের দৌলতপুর উপজেলার ধামশ্বর ইউনিয়নের ঘড়িয়ালা গ্রামে শিরিন আক্তার(১৮) নামের এক গৃহবধূ খুন হয়েছেন। প্রায় তিন বছর আগে ঘড়িয়ালা গ্রামের আবদুল বারেকের ছেলে মোঃ আজিজুল হকের সঙ্গে একই উপজেলার পাঁচকলিয়া গ্রামের লিয়াকত আলীর মেয়ে শিরীন আক্তারের বিয়ে হয়। বিয়ের পর থেকেই যৌতুকের টাকার জন্য প্রায়ই শিরিনকে তার স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকজন মারধর করতেন। মেয়ের নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে বছর খানেক আগে আজিজুলকে দেড়লাখ টাকা দেওয়া হয়। সম্প্রতি আজিজুল আরও এক লাখ টাকার জন্য শিরিনকে চাপ দেন। গত শুক্রবার (২২ ফেব্রুয়ারী ২০১৩) টাকা দিতে অস্বীকৃতি জানালে আজিজুল ও তার নানী হাজেরা বেগম শিরিনকে মারধর করেন। এক পর্যায়ে রাতেই তাকে

---

[৪৫].আইন ও সালিশকেন্দ্র ,৭/১৭ ব্লক বি, লালমাটিয়া, ঢাকা- ১২০৭।

[৪৬]. প্রথম আলো , ১ জানুয়ারী ২০১৫- আইন্ও সালিশ কেন্দ্রের সংগৃহীত তথ্য।

[৪৭].প্রথম আলো ১৮ ফেব্রুয়ারী, ২০১২।(চিত্র-৬(ক), ছবি সহ বিস্তারিততথ্য)

শ্বাসরোধে হত্যা করেন তারা। এ ঘটনায় গৃহবধুর মা বাদী হয়ে শিরিনের স্বামী আজিজুল হক (২৮) ও নানি শ্বাশুড়ী হাজেরা বেগমকে আসামী করে দৌলতপুর থানায় হত্যা মামলা করেছেন।[৪৮]

(৩) টাকা চেয়ে না পাওয়ায় স্বামী কর্তৃক স্ত্রীর গায়ে আগুন। আগুনে দগ্ধ স্ত্রী
বগুড়ার সারিয়া কান্দিতে লতিফুন (২৮) নামের এক গৃহ বধুর গায়ে গত ১০/০২/২০১৪ তারিখ শুক্রবার রাতে কেরোসিন ঢেলে আগুন দিয়েছে তার স্বামী। মারাত্মক দগ্ধ ওই গৃহবধুকে বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিক্যাল কলেজ(শজিমেক) হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। চিকিৎসকরা বলছেন, তার শরীরের ৯০ শতাংশ পুড়ে গেছে । অবস্থা খুবই আশঙ্কাজনক। এই ঘটনায় পরদিন শনিবার বেলা আড়াইটার দিকে বগুড়া শহর থেকে গৃহবধুর স্বামী হায়দার আলীকে আটক করেছে পুলিশ। প্রাথমিকভাবে হায়দার আলী পুলিশের কাছে স্বীকার করেছে যে, স্ত্রীর কাছে টাকা না পেয়ে সে কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয়।[৪৯] (চিত্র ৬ খ, বিস্তারিত তথ্য সহ)। একই ঘটনা ঘটেছে কুমিল্লার বরুড়া উপজেলার বড়াইপুর গ্রামে। যৌতুকের দাবীতে কুমিল্লার তাছলিমাকে পুড়িয়ে হত্যা করা হয়।(চিত্র ৬ গ)।

(৪) যৌতুকের জন্য মার্কস অলরাউন্ডার বীপাকে পিটিয়ে জখম ঃ বেসরকারী টেলিভিশন চ্যানেল এনটিভির রিয়েলিটি শো 'মার্কস অলরাউন্ডারের (২০১০)' মাধ্যমিকে চ্যাম্পিয়ান সাদিয়া রহমান বীপাকে (১৯) তার স্বামীর উপস্থিতিতে পিটিয়ে মারাত্মক জখম করেছে তার দেবর ও শাশুড়ী। ওই সময়ে পুরস্কার হিসেবে পাওয়া ১০ লাখ টাকা যৌতুক হিসেবে নেওয়ার জন্য তার ওপর এই নির্যাতন চালানো হয়। বীপার অবস্থা আশংকাজনক। গত ২৩ জুলাই ২০১৪ বুধবার রাতে তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।[৫০]

এই ক'টি ঘটনাই সব নয়। দেশ জুড়ে শহর-বন্দর-গ্রামে-গঞ্জে, ঘরে ঘরে চলছে যৌতুকজনিত নিষ্ঠুরতা।

৪. বাল্য বিবাহ

বাংলাদেশে বিদ্যমান আইন অনুযায়ী মেয়েদের বিয়ের সর্বনিম্ন বয়স ১৮ বছর এবং ছেলেদের ২১ বছর । এর আগে ছেলে বা মেয়ের বিয়ে হলে তা বাল্য বিবাহ হিসাবে বিবেচিত হয়। বাল্য বিবাহ সেই সুদূর অতীত কাল থেকেই পাক-ভারত উপমহাদেশে প্রচলিত রীতি। উনবিংশ শতাব্দির মাঝামাঝি সময়ে পাক-ভারত উপমহাদেশে তৎকালীন প্রাজ্ঞ ও বোদ্ধাজনেরা বাল্য বিবাহের কুফল উপলব্ধি করে এর বিরুদ্ধে তীব্র সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলেন। রাজা রামমোহন রায় ও ইশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁদের মধ্যে প্রধান। তাঁরা বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে একটি গতিশীল সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। কিন্তু তাদের তিরোধানের পর বিষয়টি যে তিমিরে থাকার সে তিমিরেই রয়ে যায়। ইতিমধ্যে প্রায় এক শতাব্দিকাল সময় অতিক্রম হলেও আজ ও এই দেশ এবং উপমহাদেশ বাল্য বিবাহের কঠিন শিকল হতে মুক্ত হতে পারেনি। আজও এটি বাংলাদেশের একটি অন্যতম সামাজিক সমস্যা হিসাবে বিদ্যামান।

---

[৪৮] .প্রথম আলো, ২৪ ফেব্রুয়ারী ২০১৩।

[৪৯] .আমাদের সময়, ২মার্চ ২০১৪।(চিত্র-৬(খ,) ছবি সহ বিস্তারিততথ্য) এবং চিত্র-৬(,গ) মৃত তাছলিমাকে নিয়ে বাবার আহাজারি)

[৫০] . যুগান্তর,২৪ জুলাই ২০১৪।

বাল্য বিবাহের কারণ

- বাল্য বিবাহের প্রধান কারণ হিসাবে ধর্মীয় কুসংস্কারকেই চিহ্নিত করা যায়। বাবা মায়ের ধারণা মেয়েকে তাড়াতাড়ি বিয়ে দিলে পুন্যের কাজ হবে। তাদের আখেরাত পরিচ্ছন্ন হবে। কিন্তু মেয়েকে মানুষ করে সংসার সুন্দর ভাবে পরিচালনার মত বুদ্ধিদীপ্ত করে বিয়ে দেয়াই যে আসল পুণ্যের কাজ তা তাদের বিবেচনায় নেই;
- আবার দরিদ্র পরিবারের বাবা মা, মেয়ে সন্তানটিকে বিয়ে দিয়ে দেয়ার মধ্যেই দারিদ্র মুকাবিলার একটি কৌশল হিসাবে বিবেচনা করেন;
- এ ছাড়া শিক্ষা ও সচেতনতার অভাবে দেশের অধিকাংশ বাবা মা কম বয়সী মেয়ের বিয়ে পরবর্তী সমস্যা ও অসুবিধা সম্পর্কে চিন্তাা করতে সক্ষম নন বিধায় তাঁরা তাৎক্ষনিক সুবিধা লাভ বা অসুবিধা দূর করার জন্য মেয়েকে অল্প বয়সে বিয়ে দেন;
- মেয়ে □□ □□□□ □□□ □□□□ ইভটিজিং □□ যৌন □□□□□□□ □□□ণে □□□□ □□□□□ সমস্যা মুকাবিলা □□□□ □□ বিভিন্ন □□□□□□□□ □□□□ □□□□□ মেয়েকে স্কুল □□□□□ □□□□□□□ ক্ষেত্রে □□□□□ □□□□□ □□□□□□ নিরাপত্তা □□□□□□ ভোগেন □□□□, □□□ বাধ্য □□□□ □□□□-□□ মেয়েকে □□ □□□□ □□□□ □□□□ দেন।

বাল □□□□□□□ প্রতিক্রিয়া

- বাল্য বিবাহ মানবাধিকার লঙ্ঘনের এক নির্মম ব্যবস্থা। এতে শুধু শিশু, অল্প বয়সী কন্যা বা তার পরিবারই ক্ষতিগ্রস্থ হয়না, এতে দেশ হয় অপুষ্ট ও দূর্বল ভবিষ্যৎ প্রজন্মের উত্তরাধিকারী। আর বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার মতে ২□ বছর বা তদুর্দ্ধ বয়ষী নারীদের তুলনায় ১৮ বছ□□□ □□ □□□□ প্রসূতিদের মৃত্যুর সম্ভাবনা প্রায় ২-৫ গুণ বেশী।[৫১]
- এ ছাড়া বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই এরা কেউ দীর্ঘস্থায়ী অসুখে ভোগে, কেউবা শারীরিক ভাবে দূবর্ল হয়ে □□□□□ □□□ নিরাপদ মাতৃত্বের অভাব বাল্য বিবাহের অন্যতম সমস্যা হিসেবে বিদ্যমান থাকে;
- বাল্য বিবাহ একটি মেয়ের কৈশোরের সমাপ্তি ঘটায়, জোর পূর্বক যৌন সম্পর্কে বাধ্য হ□, □□□ ব্যাক্তি স্বাধীনতা খর্ব হয় ও ব্যাক্তিত্বের বিকাশ ব্যহত হয়;
- বাল্য বিবাহের কারণে মেয়েটির পরিপূর্ণ মানবিক সত্তা বিকশিত হতে তো পারেইনা সে তা উপলব্ধিও করতে পারেনা, বিয়ের পর স্বামীর সংসারে কায়িক শ্রম দেয়ার কারণে;
- বাংলাদেশে জন্মহার হ্রাস করণের ক্ষেত্রে প্রধান দু'টি অন্তরায় হল বাল্যবিবাহ ও অল্প বয়সে সন্তান ধারণ। বেইজিং ঘোষণা ও পরিকল্পনায় বলা হয়েছে, ç অল্প বয়সে গর্ভধারণ বিশ্বের সর্বত্র নারীর শিক্ষাগত, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার উন্নত করার পথে বাধা হিসেবে বিরাজ করছে। সামগ্রিকভাবে, তরুনীদের অল্প বয়সে বিবাহ এবং মাতৃত্ব তাদের শিক্ষাগত ও চাকুরীর সুযোগ

---

[৫১]. জাতিসংঘ, চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলন, বেইজিং ঘোষণা ও পরিকল্পনা, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২২৫।

মারাত্মক ভাবে সংকুচিত করতে পারে এবং সন্তানের জীবনমানের উপর দীর্ঘমেয়াদী প্রতিক্রিয়া ফেলতে পারে।[৫২]

- ২০১৪ এর নভেম্বরে কিশোরগঞ্জের নিকলী উপজেলায় ৭ নভেম্বর ২০০৪ এ অনুষ্ঠিত জেএসসি (জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট) পরিক্ষায় ১৬ জন এবং জেডিসি (জুনিয়র দাখিল সার্টিফিকেট) পরিক্ষায় ১১ জন মোট ২৭ জন বাল্য বিয়ের কারণে অংশ গ্রহণ করেনি।[৫৩] এরূপ ঘটনা সারা বাংলাদেশেই কম বেশী ঘটেই চলছে।

বাল্য বিবাহের পরিসংখ্যান

- বিশ্বের যে ক'টি দেশে বাল্যবিবাহের হার বেশী এর মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। বাল্য বিবাহের পরিসংখ্যান রাখা কিছুটা কঠিন কাজ। কারণ এ বিষয়ে কোন অভিযোগ হয়না, [illegible] আবার যেহেতু [illegible] ইনাসিদ্ধ না, তাই বেশীরভাগ ক্ষেত্রে মেয়ের বয়স [illegible] বছর দেখানো হয়। তথাপিও 'জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষন ইন্সটিটিউট' বা 'ন্যাশনাল ইন্সটি ট অব পপুলেশন রিসার্স এ্যান্ড ট্রেনিং (নিপোর্ট)' এর প্রতিবেদন অনুযায়ী [illegible] শতাংশ মেয়ের বিয়ে হয় এবং দুই দশক ধরে এ হার অপরিবর্তিত আছে।[৫৪]

- জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদের ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে জাতিসংঘের শিশু তহবিলের (UNICEF) তথ্যের ভিত্তিতে দেখা যায় ২০১৪ এ এসেও বাল্য বিবাহের একই সংখ্যা বিদ্যমান। ১০টি এনজিও সংগঠনের যৌথ কার্যক্রমের আওতায় এ তথ্য প্রদান করা হয়েছে। সংগঠন গুলো হলো অ্যাকশন এইড বাংলাদেশ, আইন ও সালিশ কেন্দ্র, প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল, সেভ দ্যা চিলড্রেন, বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরাম, ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ, জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম, এডুকো, চাইল্ড রাইট গভর্নেন্স নেট্ওয়ার্ক এবং টেরে ডেস হোমস নেদারল্যান্ডস ।[৫৫]

- [illegible] জাতিসংঘের শিশু বিষয়ক সংস্থা ইউনিসেফের ওয়ার্ল্ড চিলড্রেন এর প্রতিবেদনের তথ্য ও প্রায় কাছাকাছি। সেখানে বলা হয়েছে, বাংলা দেশের [illegible]% [illegible], অন্যদিকে [illegible] থেকে [illegible] বছরেই অন্তঃস্বত্বা কিংবা মা হয় –এক তৃতীয়াংশ [৫৬]

---

[৫২]. জাতিসংঘ, চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলন, বেইজিং ঘোষণা ও পরিকল্পনা, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২২৫।

[৫৩] .প্রথম আলো, ৮ নভেম্বর ২০১৪।

[৫৪]. প্রথম আলো, ১৫ আগষ্ট ২০০৯।

[৫৫]. প্রথম আলো, ১৮ নভেম্বর ২০১৪।

[৫৬] .খাদিজা লীনা এবং চিররঞ্জন সরকার ঃ নির্যাতিত নারী উপেক্ষিত মানবাধিকার, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫১।।

- □□ থেকে □□ বছরের মধে □□□□□□□□ □□□ □□ থেকে □□ বছরের মধ্যে □□ শতাংশ মেয়ে শিশুকে বিয়ে দিয়ে দেয়া হ□□[৫৭] গ্রামাঞ্চলে এবং দরিদ্র –নিরক্ষর জনগোষ্ঠির মধ্যে বাল্যবিবাহের হার সবচেয়ে বেশী।

- শহরের নিম্ন মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তের মধ্যে বাল্য বিবাহের প্রচলন ব্যাপক। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ও জাতিসংঘ তহবিল (ইউনিসে□) □□ যৌ□ □□□□ 'প্রগতিরপথে''র তথ্য মতে, উত্তরাঞ্চলের চরাঞ্চলে এবং বরেন্দ্র এলাকায় ২০ থেকে □□ □□□ □□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□ □□□ □□□ হওয়ার পূর্বেই বিয়ে হয়েছে।[৫৮]

(বাল্যকালে বিয়ে হওয়া এবং সন্তানের মা হওয়া দু'টি মেয়ের ছবি, চিত্র ৭ (ক,খ) সংযুক্ত।)

সাম্প্রতিক সময়ের বাল্য বিবাহ সংশ্লিষ্ট কয়েকটি বাস্তব ঘটনা

(১) 'বিয়া তো বিয়া-ই ..... ফির বাল্যবিবাহ কী?,

ঘটনাটি □□□□□ গাইবান্ধার সাঘাটা উপজেলার ঘুড়দহ ইউনিয়নে ঝাড়াবর্ষা মন্ডলপাড়া গ্রামে। এই গ্রামের বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রী ৯ বছর বয়সের হাসেনা খাতুনের বিয়ের দিন ঠিক ছিল □□ □□ ফেব্রুয়ারি ২৫□□ □□□□□ □□ হাজার টাকা যৌতুক এর মাধ্যমে। হাসেনার বাবা হোসেন আলী কিছু গ্রাম্য মাতব্বরের সহযোগিতায় রাতে অতি গোপনে মেয়ের বিয়ে ঠিক করেন। পাড়া-প্রতিবেশীর মুখে এই □□□ □□□□□ পেরে বাল্য বিবাহ রোধ কমিটির নেত্রী নাজমা বেগম বিয়ে ঠেকাতে ঘুড়দহের ইউপি চেয়ারম্যান আতাউর রহমান আতাকে খবর দেন। চেয়ারম্যান নিজে গ্রাম পুলিশ ও স্থানীয় গণ্যমান্য লোকজন সঙ্গে নিয়ে ওই দিন হোসেন আলীর বাড়িতে গিয়ে হাসেনার বিয়ে বন্ধ করে দেন। বর এবং বরযাত্রীদেরও এলাকা ছাড়া করে তিনি স্থানীয় কাজীকে এই বিয়ে রেজিস্ট্রি করতে নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। কিন্তু অবুঝ হাসেনাকে ২৬ ফেব্রুয়ারি ২□□□, সোমবার রাতে জোর করে বিয়ে দেওয়া হয় পার্শ্ববর্তী পবনতাইড় গ্রামের পূর্বনির্ধারিত ওই বরের সঙ্গে।এ ব্যাপারে হাসেনার বাবা প্রান্তিক চাষী হোসেন আলী সাংবাদিকদের বলেন, বিয়া তো বিয়া-ই; তাই ফির বাল্যবিবাহ কী ? মাও মরা বেটিক বিয়া না দিয়ে গেলে আখেরাতে কী জবাব দেম![৫৯]

জনাব হোসেন আলী তার ৯ বছর বয়সের মেয়েকে □□ হাজার টাকা যৌতুক দিয়ে বিয়ে দিয়ে আখেরাতের জবাব দেয়া থেকে মুক্ত পেয়েছেন বলে ধারনায় ই এই বিয়ে অব্যাহত রেখেছেন। যৌতুক দেয়া ইসলাম সম্মত নয়, তা তিনি করেছেন এবং যদি ক'বছর পরে আরও যৌতুকের লোভে মেয়েটিকে জীবন দিতে হয় তখন তিনি পরকালে কি জবাব দেবেন? তা সম্ভবতঃ তিনি চিন্তা করেননি।

(২) বাল্যবিবাহ দেওয়ায় ক্ষোভে ছাত্রীর আত্মহত্যা

---

[৫৭]. প্রথম আলো, ৬ ডিসেম্বর ২০১০।

[৫৮]. প্রথম আলো, ১৫ আগষ্ট ২০০৯।(বাল্যকালে বিয়ে হওয়া এবং সন্তানের মা হওয়া দু'টি মেয়ের ছবি, চিত্র ৭ (ক,খ) সংযুক্ত।)

[৫৯]. সমকাল, ২৮ ফেব্রুয়ারী ২০০৯।

রাজশাহীর তানোর উপজেলার মুন্ডুমালা পৌর এলাকার এক মাদ্রাসা ছাত্রী গাছে ওড়না পেঁচিয়ে আত্মহত্যা করেছে। গত ১৬ জানুয়ারী বুধবার (১৬-০১-২০১৩) দিবাগত রাতে এই ঘটনা ঘটে। ওই মাদ্রাসা ছাত্রীর নাম হাফিজা খাতুন ওরফে মুক্তা। বাবার নাম হারুন-অর-রশিদ। হাফিজা উপজেলার চিনাশো আলিম মাদ্রাসার দশম শ্রেণীর ছাত্রী। আত্মহত্যার আগে মা-বাবার উদ্দেশ্যে সে একটি চিঠি লিখে যায়।

মৃত্যুর এক সপ্তাহ আগে হাফিজার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে মোহনপুর উপজেলার মহেশকুন্ডি গ্রামের আব্দুস সাত্তারের ছেলে ফিরোজ কবিরের সঙ্গে বিয়ে দেয়া হয়। কয়েকদিন আগে সে বাবার বাড়িতে বেড়াতে আসে। বুধবার (১৬-০১-২০১৩) রাতে একটি চিঠি লিখে রেখে হাফিজা বাড়ির এক গাছে ওড়না পেছিয়ে আত্মহত্যা করে।পরিবারের লোকজন তাকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখে পুলিশকে খবর দেয়। চিঠিতে অভিমানী হাফিজা লিখেছে ,“ প্রিয় বাবা-মা, আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তোমরা বিয়ে দিয়েছিলে। তোমাদের খুশি করার জন্য তা মেনে নিয়েছিলাম। তোমাদের ইচ্ছা পূরণ হয়েছে। কিন্তু আমার ইচ্ছা ছিল লেখাপড়া করে অনেক বড় হওয়ার। সেটি আর হলো না। তাই আমি তোমাদের ছেড়ে চলে গেলাম ওপারে। আমাকে ক্ষমা করে দিও”। হাফিজার বাবা বলেন, মেয়ের বিয়ের বয়স হয়েছে দেখে তারা বিয়ে দিয়েছেন। মেয়ে পড়াশুনা করতে চাইত। কিন্তু তার মনে এত বড় অসন্তোস ছিল, তারা তা বুঝতে পারেননি। তানোর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বলেন, বাল্য বিবাহের এ ঘটনা তিনি জানতেননা। আর তার মৃত্যুর ঘটনায় পরিবার থেকে কোন অভিযোগ ও তোলা হয়নি।[৬০] - এ হত্যার জন্য দায়ী তো হাফিজার বাবা কিন্তু এ ক্ষেত্রে কে করবে কার বিচার!

(৩) <u>১৩ বছর বয়সী ছাত্রীকে বিয়ে করলেন স্কুল কমিটির সভাপতি</u>

লালমনিরহাট সদর উপজেলার মোঘলহাট ইউনিয়নের খারচ্যাা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের রাশেদা খাতুন (১৩) নামের এক ছাত্রীকে জোর করে গত ২৬ জুন ২০১৪ ওই বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি আব্দুর রহিম বিয়ে করেছেন। বিয়ের সময় রাশেদার বয়স এফিডেবিট করে ১৮ বছর দেখানো হলেও মোঘলহাট ইউনিয়ন পরিষদের জন্মনিবন্ধন বই অনুসারে রাশেদার বর্তমান বয়স মাত্র ১৩ বছর। এলাকার ধনাঢ্য ব্যবসায়ী প্রভাবশালী আব্দুর রহিমের ভয়ে রাশেদার দরিদ্র পরিবারের কেউ মুখ খুলতে সাহস পায়নি।বিয়ের পর রাশেদা আব্দুর রহিমের বাড়ি থেকে বাবার বাড়িতে এসে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। রাশেদার বড়ভাই সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র মিজানুর রহমান দুঃখ করে বলেন, আমরা গরিব, তাই আমাদের পাশে কেউ নেই।আব্দুর রহিম মিথ্যা কথা বলে রাশেদাকে লালমনিরহাট শহরে নিয়ে গিয়ে নোটারী পাবলিকের কাছে মিথ্যা এফিডেফিট করে বয়স বাড়িয়ে বিয়ে করেছে।[৬১]

<u>(৪) বদরগঞ্জে এক মাসেই ১৬ স্কুল ছাত্রীর বাল্য বিয়ে</u>

রংপুর জেলার বদরগঞ্জে থামছেনা বাল্য বিয়ে। গত আগষ্ট ২০১৪ এর এক মাসেই বদরগঞ্জ উপজেলায় ১৬ জন স্কুল ছাত্রীকে অপরিণত বয়সে যেতে হয়েছে স্বামীর ঘরে।[৬২] (পরিশিষ্ট ২৪ এ ষোল জনের নাম ও ঠিকানা সহ বিস্তারিত তথ্য সহ পত্রিকার সংবাদ সংযুক্ত)।

---

[৬০].প্রথম আলো, ১৯ জানুয়ারী ২০১৩।

[৬১].যুগান্তর, ১২ আগষ্ট ২০১৪।(পরিশিষ্ট ২৪ এ ষোল জনের নাম ও ঠিকানা সহ বিস্তারিত তথ্য সহ পত্রিকার সংবাদ সংযুক্ত)।

[৬২]. যুগান্তর, ৩১ আগষ্ট ২০১৪।

দেশে বাল্যবিবাহ বন্ধের লক্ষ্যে পুরাতন আইনের পরিবর্তে প্রণীত হচ্ছে নতুন আইন। এখানে মেয়েদের বিয়ের বয়স ১৮ এর সাথে ১৬ ও সংযুক্ত করায় দেশের নারী নেতৃবৃন্দ সহ অনেকেই মেনে নিচ্ছেননা। তথাপিও এই আইনের আওতায় আইনপ্রয়োগকারী সংস্থা সহ অনেকেই চেষ্টা চালিয়েই যাচ্ছেন বাল্য বিয়ে বন্ধ করার। কিন্তু বন্ধ হচ্ছেনা।

৫. ইভটিজিং বা যৌনহয়রানী ঃ একটি মারাত্মক সামাজিক অবক্ষয়

ইভটিজিং কি?

ইভ টিজিং শব্দটি ইংরেজী। যার বাংলা করলে দাঁড়ায় নারীকে উত্ত্যক্ত করা। বাইবেলের ভাষ্য অনুযায়ী ইভ (Eve) হচ্ছেন পৃথিবীর আদি নারী বা আদি মাতা। মুসলমানরা যাঁকে বলেন বিবি হাওয়া। এখানে 'ইভ' শব্দটি নারীর রূপক হিসেবে ব্যবহৃত আর টিজিং (Teasing) অর্থ হচ্ছে উত্ত্যক্ত করা বা জ্বালাতন করা। Wikipedia এর সংজ্ঞা অনুযায়ী Eve teasing is a Euphemism used for ... Publicly sexual harassment, street harassment or molestation of Women by man. অর্থাৎ জনসমক্ষে, রাস্তাঘাটে পুরুষ কর্তৃক নারীকে উত্ত্যক্ত করার বিষয়টি মূলতঃ ইভটিজিং নামে পরিচিত।[৬৩]

ইভটিজিং' □□ 'যৌন হয়রানী,

সম্প্রতি দেশে ইভটিজিং শব্দটি বেশ ব্যবহৃত হচ্ছে। কারণ ইভটিজিংয়ের বেশ কিছু ঘটনার প্রেক্ষিতে নারীকে যৌন হয়রানির মাধ্যমে যৌন নির্যাতন অতঃপর হত্যা এবং আত্মহত্যার মত ঘটনা ঘটেই চলছে। এ অবস্থায় প্রতিটি ঘটনাকে ইভটিজিং আখ্যা দিয়ে এর গুরুত্ব কমানো হচ্ছে উল্লেখ করে একে এখন থেকে যৌন হয়রানি বলার নির্দেশ দিয়েছেন মাননীয় হাইকোর্ট।

একই সঙ্গে প্রস্তাবিত নারী ও শিশু নির্যাতন আইনে□ □□(□) □□□□ কিছু পরিবর্তন এনে এতে স্টকিং টু গার্লস অ্যান্ড উইমেন্সের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করার জন্য বলা হয়েছে।[৬৪]

ইভ টিজিং/ যৌন হয়রানী র অতীত ও বর্তমান

বাংলাদেশে এটি অতীতেও ঘটেছে বর্তমানেও ঘটছে। অতীতে কোন মেয়েকে রাস্তায় অশ্লীল ভাষায় অশালীন উক্তির মাধ্যমে টিটকিরি দেয়া হতো এবং কিছু অশালীন অঙ্গভঙ্গি করা হতো সেগুলো হল অশ্লীল মন্তব্য ছুড়ে দেয়া, অশালীন মুখভঙ্গি ও অঙ্গভঙ্গি ব , শিষ দেওয়া, জোরপূর্বক কথা বলার চেষ্টা, লালসাপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ, জোরে যৌনবিষয়ক গান বাজানো বা নিজেরাই অশ্লীল গান গেয়ে ওঠা, □□ □□□□ □□□□□□□,

---

[৬৩]. ডেইলি ষ্টার, ২১ জানুয়ারী ২০১৩।

[৬৪]. আমাদের সময়, ২৭ জানুয়ারী ২০১১।

ভীড়ের মধ্যে গা ধাক্কা দেওয়া, চিমটি কাটা, □□□□□□ □□□ □□□, আপত্তিকর ইংগিত করা, মেয়েদের অঙ্গ স্পর্শ করা ইত্যাদি।

বর্তমানে এটি শুধু অশালীন উক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বর্তমানে এর পরিধি আরও বেড়েছে। যৌন ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য, পর্নোগ্রাফী প্রদর্শন, চিঠি, ইমেইল, টেলিফোন, এস এম এস, পোষ্টার, কার্টুন, দেয়াল লিখনের মাধ্যমে উক্ত্যক্ত করা। কখনো প্রেমের প্রস্তাব দেয়া হয়। সে প্রস্তাব প্রত্যাখান হলে শারীরিক নির্যাতন যেমন- এ্যাসিড নিক্ষেপ, যৌন নির্যাতনের ঘটনাও ঘটে থাকে। যা মেয়ের বিয়ের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি □□□, কখনও মেয়েদের আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়ার পথও সুগম করে।

ইভটিজিং / যৌন হয়রানির কারণ

(ক) সামাজিক কারণ

আমাদের সমাজের তরুণরাই প্রধানতঃ এ সব ঘটনা ঘটাচ্ছে। মনোবিজ্ঞানীদের মতে এ সমাজের তরুণরা নানা ধরনের মানসিক সমস্যা ও সংকটের মধ্যে অস্থির সময় পার করছে। বাবা মায়ের সঙ্গে সামাজিক বন্ধন নষ্ট হয়ে যাওয়া, পারিবারিক নিয়ন্ত্রণ শিথিল হওয়া এবং পরিবার ভেঙ্গে যাওয়ার কারণে তরুণরা ব্যক্তিগত জীবনে অস্থিরতার কারণে মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ছে। মানসিক অসুস্থতা তাদের মানসিক বিকার গ্রস্থ করে তুলছে। □□ □□সিক □□□□ গ্রস্থতার □□□□□ □□□ ইভটিজিং □□ অন্যান্য সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে □□□□□□□□ লিপ্ত □□□□।

এছাড়া আধুনিক প্রযুক্তি আর ঐতিহ্যগত সংস্কৃতি - এ দুটোর মধ্যে সমন্বয় করতে পারছেনা তরুণ সমাজ। সংস্কৃতির বাইরে অনেক কিছুকেই তারা আধুনিকতা মনে করে। যেমন-মাদক সেবন। এর ফলে অনেক তরুণরাই নানা ধরনের অপরাধের দিকে ঝুঁকে পড়ছে এবং অনিয়ন্ত্রিত অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে। প্রযুক্তির নতুন নতুন ক্ষেত্র বিশ্বায়নে সহজলভ্য হওয়ার ফলে সামাজিক অপরাধের নতুন নতুন অনুসঙ্গ যুক্ত হচ্ছে;

সমাজে নারীর নাজুক অবস্থান এবং নারীর নিরাপত্তা বিষয়টি নিশ্চিত না হওয়ার বিষয়টিও নারীকে উত্যক্ত করার সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করা হচ্ছে;

□□□ ইভটিজিং □□□□□ প্রতিবাদ □□□□ গেলে প্রতিবাদকারীর □□□□□□ হুমকিও □□□□□ □□□ অত্যাচার নির্যাতনের ঘ□□ □□□ □□□□□ হত্যাকান্ড পর্যন্ত ঘ□□ গেলেও □□□ সুষ্ঠু প্রতিকার □□ □□□□ □ ইভটিজিং বৃদ্ধির □□□□□ হচ্ছে

(খ) ধর্মীয় কুসংস্কার

আমাদের সমাজে প্রচুর ধর্মীয় কুসংস্কার বিদ্যমান যা নারীকে তুচ্ছ করা□ সহায়ক। (ধর্মীয় কুসংস্কার, অপব্যাখ্যার উপর ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে বিস্তারিত দেখানো হয়েছে।) নারীদের ঘিরে ধর্মের অপব্যাখ্যা □□ কুসংস্কার ছেলেদের □□□ □□□□□□ তুচ্ছ □□□□ একটি প্রবনতা সর্বদাই বিদ্যমান □□□□□ ইভটিজিং □□ যৌন □□□□□□ সেই □□□□□□□□□ও একটি □□ঃপ্রকাশ

(গ) □□□ প্রয়োগে শিথি□□□

ইভটিজিংএকটি দন্ডনীয় □□□□□□ □□□ □ ক্ষেত্রে □□□□□ □□□□□ প্রয়োগ বাঞ্ছনীয় কিন্তু □□□□□ ইভটিজিং □□ ক্ষেত্রে □□□□□ প্রতিকারের পরিবর্তে ইভটিজিং □□ □□□□□ মেয়েদেরকেই দোষী □□□□ প্রবনতা বিদ্যমান। □□□ মেয়েটির □□□□□□□□ণ □□□□□ আশ্রয়ে □□□□ যেতে □□□□□ □□ □ □□নে□ □□□□ বৃদ্ধির □□□□□ হচ্ছে □ সম্পর্কে □□ অক্টোবর □□□□ দৈনিক প্রথম □□□□□ প্রদত্ত তথ্য □□□□, পুলিশ কর্মকর্তারা □□□□□□□□, "□□□ উত্যক্তের □□□□ □□, □□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□ □□□ □□□□□□ □□□ বেপরোয়া □□□ □□□□"।[৬৫] □□□ □□□□□ আশ্রয়ে গেলেও প্রভাবশালী ব্যক্তিগণের হস্তক্ষে□র মাধ্যমে যথাযথ সাক্ষ্য প্রমান আদালতে পেশ না হওয়ার কারণেও □□□□□□ প্রমাণ করা কঠিন □□□ □□□□

(ঘ) ইভটিজিং একটি Social Taboo তথা লুক্কায়িত সামাজিক বাস্তবতা

এটি এমন একটি অপরাধ যা নারীর সামাজিক অবস্থান ঠিক রাখার উদ্দেশ্যে ঘটনাটি গোপন রাখার প্রয়াস থাকে। যা দেশে বিদেশে সর্বত্রই বিদ্যমান। সেজন্যই বিদেশে এটিকে Social-Taboo তথা লুক্কায়িত সামাজিক বাস্তবতা নামেও আখ্যায়িত করা হয়।[৬৬] অধিকাংশ সময়ে ঘটনার শিকার মেয়েটিরই বিয়ে সহ অন্যান্য ক্ষেত্রে □□□ □□□□ □□□□□ক সমস্যার সৃষ্টি হয়ে থাকে। তাই মেয়েটির পিতামাতা বা অভিবাবকগণ ঘটনা গোপন রাখাকেই শ্রেয় বলে বিবেচনা করেন।

ইভটিজিং □□ □□□□□ আত্মহত্যা বা ঘটনা সম্পর্কে কোন মামলা হলে সে সব ঘটনাই প্রকাশ পেয়ে থাকে। কিন্তু এর বাইরে শতশত ঘটনা ঘটে যাচ্ছে যা প্রকাশের বাইরেই থেকে যাচ্ছে। বাংলাদেশেও এটি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই SocalTaboo তথা লুক্কায়িত সামাজিক বাস্তবতা হিসেবেই বিদ্যমান থাকছে বলে অপরপক্ষ ঘটনা এক চেটিয়া চালিয়ে যেতেই সক্ষম হচ্ছে।

ইভটিজিং / যৌন □□□□□□ প্রতিক্রিয়া

এ ধরনের ঘটনার পরিনতি হচ্ছে ভয়াবহ। এটি এমন একটি অপরাধ যার জন্য অপরাধীকে নয় বরং

- ঘটনার জন্য □□□□□□ □□□□ নির্দোষ মেয়েটিকেই দোষী করা হয়;
- লেখা পড়া বন্ধ করে দেয়া হয়;
- যার কারণে তাদের পরিপূর্ণ মানসিক বিকাশ বাধাগ্রস্থ হয়;
- দ্রুত বিয়ের ব্যবস্থা হয়;
- মেয়েটিকে যোগ্য করে বিয়ে না দেয়ার কারণে যৌতুক দেয়া হয়;

---

[৬৫] .প্রথমআলো, ২৮ অক্টোবর, ২০১০।

[৬৬]. Oxford Advanced learner's Dictionary, Millinium Dictionary 2000.

- সৃষ্টি হয় পারিবারিক সমস্যা, দাম্পত্য কলহ তথা নারী নির্যাতন এবং সংসার ভেঙ্গে যাওয়া;
- সব সময়ে যে বিয়ে দেয়া যায় তাও নয়, তখন বাড়ী থেকে বের হওয়াও বন্ধ করা হয়;
- বিনা কারণে দোষী সাব্যস্ত হয়ে অযৌক্তিক কষ্ট, সহ্যের সীমার বাইরে গেলে অনেক মেয়েই আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়;
- আবার ঘটনার ভয়াবহতাও অনেকের মৃত্যুর কারণও হয়ে থাকে। □্যা□□ নিক্ষেপ, যৌন নির্যাতন □□□□ মেয়েটির স্বাভাবিক জী□□□□ □□ □□□□□;
- পত্রিকার পাতা খুললেই প্রতি দিনই আমাদের এ ধরনের দুঃখজনক খবর দৃষ্টি গোচর হয়। সিথি, ইন্দ্রানী, তৃষা, রুমি, পিংকি, বৃষ্টি, ফাহিমা, রেশমা, ইলোরা এবং সায়মাদের তালিকা দীর্ঘ থেকে আরও দীর্ঘতর হচ্ছে;
- □□□□□ □□□□ □□ পেরে মেয়ে □□□□ □□□□ দগ্ধ □□□ □□□□□ □□□ মধ্যে □□□□□□ উদ্বেগ, বিষণ্ণতা, নিদ্রাহীনতা ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দেয়; চূড়ান্ত পর্যায়ে □□□ □□□□ □□□ আত্মহত্যার □□ বেছে নেয়;
- □□□ মারাত্মক □□□□ও ঘটে, তা হলো □□□□□ প্রতিবাদকারীদের ও □□□□ □□□□ □□।

ইভটিজিং /যৌন □□□□□□ পরিসংখ্যান

এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে ২০০৮ সালে বাংলাদেশে ১২টি ইভটিজিং এর ঘটনায় ৯ জন নারী আত্মহত্যা করেছিল। ২০০৯ সালে ৫৪টি ইভটিজিং এর ঘটনায় আত্মহত্যা করেছে ৭ জন।[৬৭] □□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ (বিএনডাব্লুউএলএ) কর্তৃক ইভটিজিং সংক্রান্ত এ□ □□□□ণা□ প্রাপ্ত তথ্য মতে □□□□□ □□ □□□□□ □□□ □□□□□□ কোননা কোন পর্যায়ে ইভটিজিং □□ □□□□ □□□□□□□ □□ থেকে □□ □□□ □□□□□ □□% মেয়ের □ □□নে□ নির্যাতনের শি□□□ হয়।[৬৮] পুলিশ □□□ দপ্তর থেকে □□□□ □□□□ অনুযায়ী আগস্ট, □□□□ পর্যন্ত এ□□□□□ ইভটিজিং □□ উত্যক্ত □□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□টি □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ (□□□) □□□□□ □□□টি □ □□□ □□□□ □□ উত্যক্ত □□□□ বিরুদ্ধে □□□□□□ □□□□□□ গ্রেফতা □□□□□ □□□ □□।[৬৯]

□□□ □ □□□□ কেন্দ্রের তথ্য অনুযায়ী □□□□ □□□ □□ □□ □□□ ইভটিজিং □□ □□ □□□□□□□ □□□□ পুরুষ □ □□ □□ □□□ খুন □□□□□□ □□□□□□□ উৎপাত □ উত্যক্ত □□□□ প্রতিবাদ □□□□□ □□□ □□ □□□ □□□□□□□ □□□ লাঞ্ছিত □□□□□□, এমনকি পুরুষেরাও রেহাই পাননি। প্রতিবাদ □□□□ □□□□ লাঞ্ছিত

---

[৬৭]. জনকণ্ঠ, ২১ শে এপ্রিল, ২০১০।

[৬৮]. বাংলাদেশ মহিলা আইনজীবি সমিতি (বিএনডব্লিউ এলএ)এর ইভটিজিং সংক্রান্ত তথ্য।

[৬৯]. প্রথমআলো, ২৮ অক্টোবর, ২০১০।

□□□□□□ □□ □□ পুরুষ। আত্মহত্যা□ □□ বেছে □□□□□□□ □□ □□ □□□□ □ □□□□ □□□□ ।[৭০] একই কেন্দ্রের সাম্প্রতিক সময়ের অপর এক তথ্য অনুযায়ী ২০১৪ সনের জানুয়ারী থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত উত্যক্ত করণ ও যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন ১৪৬ জন নারী। তাদের মধ্যে বখাটেদের উৎপাতে আত্মহত্যা করেছেন ১৪ জন নারী, আত্মহত্যার চেষ্টা করেছেন ২জন , প্রতিবাদ করায় খুন হয়েছে ৭ জন, বখাটেদের হাতে লাঞ্ছিত হয়েছেন ১১৫ জন, এবং বখাটেদের উৎপাতে ৮জনের স্কুলে যাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে। আবার উৎপাতকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষে আহত হয়েছেন ৫৭ জন ।[৭১]

সাম্প্রতিক সময়ের ইভজিং এর কারণে সংগঠিত কয়েকটি মারাত্মক ঘটনা

ইভটিজি□ □□□□ একটি □□□□□ □□□ □□□ থেকে শিক্ষিত, অশিক্ষিত , □□□□□ প্রতিষ্ঠিত, অপ্রতিষ্ঠিত কেউ রেহাই □□□□□□ বর্তমানে পত্রিকা□ □□□□ □□□□□□□ পর্যন্ত □□□□□ নির্যাতিত হলে□ □□□ □□□□□ সহ আরও কয়েকটি ঘটনার চিত্র তুলে □□□ □’□-

(১) □□□□□ জেগেই □□ □□ □□□□?

□□ □□ শে জুলাই □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□ সেরে □□□□□□□□ পান্থপথ □□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ যাচ্ছিলেন □□□□ রোডওর □□□□ □□□□□□□। সুবাস্তু □□□□□□□ □□□□□ হঠাৎ মোটর □□□□□□□□ □□□□□ □□ যুবক □□□□ ধাক্কা দেন। □ □□□□□ প্রতিবাদ □□□□ যুবকটির সঙ্গে □□□ তর্ক শু □□ □□□ □□ পর্যায়ে যুবকটি □□ □□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□ □ লাঞ্ছি□ □□□□□ □□ যুবক পান্থপথ □□□□□□ একটি দোকানের □□□□□ □ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ একটি □□□□□□ □□□ □□□□□□ পুলিশ □□ □□□□□ সাব্বু □ সে □□□□ দুই যুবককে সনাক্ত □□□□□□ পান্থপথে □□□□□ ফার্নিচারের দু'টি দোকান □□□□□□[৭২] ঘটনাটি □□□□ □□□□□□ □□□ □□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□ প্রথমতঃ □□□□ □□ □□□□ সেটি □□□□□□ □□□□□ (□□□) □□□□□□ গ্রহণ □□□ন। পরে □□□□□□□ অনুমোদন সাপেক্ষে পুলিশ □□ অভিযোগটি □□□□□ □□□□□□ গ্রহণ □□□ন। সাব্বু □ সে □□□□□□ আত্মসমর্পণ □□□ □□□□ □েন।[৭৩]

(২) পিংকীর আত্মহত্যা

জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট জে এস সি পরীক্ষায় এ প্লাস পাওয়া পিংকী ফলাফল বের হওয়ার পুর্বে বখাটেদের উত্যক্তে অস্থির হয়ে আত্ম হত্যার পথ বেছে নেয়। বখাটে রনি ও তার স্বজনদের উত্যক্তে দিশেহারা পিংকী গত ২৩ ডিসেম্বর ২০১২ বিকালে রাজধানীর মুগদা থানা এলাকার নিজেদের বাসায় পিংকি গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করে। বখাটে রনি কয়েকদিন আগে পিংকিকে অপহরণও করেছিল। তার পরীক্ষার ফলাফল জেনে তার বাবা বলেন, "যে মুহুর্তে আমাদের উৎসব করার কথা সে মুহুর্তে মেয়ের অপহরণকারী ও আত্মহত্যায় প্ররোচনা কারীদের গ্রেপ্তারে থানায় ধরনা দিতে হচ্ছে" ।[৭৪]

---

[৭০]. আইন ও সালিশ কেন্দ্র, ১ জানুয়ারী ২০১১ এর সংগৃহীত তথ্য মতে।।

[৭১].□□□ □ □□□□ কেন্দ্রের তথ্য - প্রথমআলো, ১ জানুয়ারী, ২০১৫।

[৭২] . প্রথমআলো, নারীমঞ্চ, ৩ আগষ্ট ২০১১।

[৭৩] .প্রথমআলো, ৬ আগষ্ট, ২০১১।

[৭৪]. আমাদের সময় ২৮ ডিসেম্বর ২০১২।

(৩) জিপিএ - ৫ পেয়েও কাঁদছে হীরা-মুক্তা

বখাটে দেবাশীষ স্কুলে যাওয়া - আসার পথে উত্যক্ত করতো হীরাকে। এ ঘটনার প্রতিবাদ জানান হীরার মা ফরিদপুর চিনি কলের টাইপিষ্ট কাম ক্লার্ক চাঁপা রানী। দুই মেয়ে হীরা ও মুক্তার ভবিষ্যৎ নিয়ে সব সময় ব্যস্ত থাকতেন তিনি। স্বাভাবিক ভাবেই মেয়েকে উত্যক্ত করায় প্রতিবাদ করেন তিনি। কিন্তু এ প্রতিবাদও তাঁর জন্য কাল হয়ে দাঁড়ায়। গত ২০১০ সনের ২৬ শে অক্টোবর বখাটে দেবাশীষ সাহা মোটরসাইকেলে চাপা দিয়ে হত্যা করে চাঁপারানীকে। বখাটে দেবাশীষ যখন চাপারানীকে হত্যা করে, তার কিছুদিন পরই ছিল নির্বাচনী পরীক্ষা। ওই ভয়াবহ ঘটনার পরও মনোবল হারায়নি হীরা ও মুক্তা। যথা সময়ে তারা এসএসসি পরীক্ষাও দেয় এবং এসএসসিতে পায় জিপিএ -৫। এই ফলাফলে হাসতে পারেনি হীরাও মুক্তা। হীরা বলে, " আজ আমার আনন্দিত হওয়ার কথা। কিন্তু আমি ফল শুনে হাসতে পারিনি। ছুটে গেছি বাড়ির দক্ষিনে অবস্থিত নিমতলায়। যার ছায়ায় চিরনিদ্রায় শুয়ে আছেন মা। তিনিই আমার সব প্রেরণার উৎস । আজ মা নেই। আমি কি ভাবে হাসব? কাকে দেখাব এ হাসি?"[৭৫] (চিত্র ৮, এস এসসি পরীক্ষায় জিপিএ - ৫ পাওয়া দুই কন্যা এবং তাদের মাতা চাঁপা রানীর ছবি)। গত ৯ জুন ২০১৪ সোমবার ফরিদপুরের জেলা ও দায়রা জজ আদালতের মাননীয় বিচারক কর্তৃক রায় প্রদান করা হয়েছে। রায়ে মামলার প্রধান আসামী দেবাশিষ সাহা রনিকে ফাঁসির আদেশ দেয়া হয়েছে।[৭৬]

(৪) নাটোরের দুই কিশোরীকে ইভটিজিং এবং তাদের আত্মহত্যার প্রচেষ্টা ও একজনের মৃত্যু

নাটোরের লালপুরে দুই ছাত্রীকে বখাটে যুবকেরা উত্যক্ত করার জেরে দু'জনেই বিষ পান করেছে। এদের একজন মৃত্যুবরণ করেছে, অন্য জনের চিকিৎসা চলছে। দুই কিশোরীই তাদের মামার সঙ্গে বিদ্যালয়ে যেত। সেই পথে শিশির ও ফাহাদ নামের দুই যুবক তাদের উত্যক্ত করত। এর প্রতিবাদ করায় সেই মামাকে তারা প্রহার করে। এই ঘটনায় মেয়েদের দোষী করে একটি মেয়ের মা তাঁর কন্যাকে দোষী করে বকাঝকা করায় তার অভিমান হয়। সে তার বান্ধবীকে নিয়ে বিষপান করে। একজন মৃত্যুবরণ করে অন্যজন মৃত্যুর সাথে লড়ছে।[৭৭]

ইভটিজিং জনিত এ ধরনের ঘটনা অব্যাহত রয়েছে দেশজুড়ে।

৬. □□□□□□□□

ফতওয়া এবং ফতোয়াবাজী এক কথা নয়। সমাজে বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য, অন্যায়- অবিচার দূর করার জন্য ইসলাম ধর্মের বিধিব্যবস্থার আলোকে আদালতকে যারা আইনী সহায়তা দিয়ে থাকেন তাঁদের প্রদত্ত ব্যাখ্যাই কখনও সাধারণ ভাবে, কখনও আদালতের মাধ্যমে জারি হওয়াই - **ফতওয়া**। অর্থাৎ ফতোয়া ব্যবস্থা □চার ফয়সলার সাথে সম্পৃক্ত এবং যারা ফতওয়া দেবেন তাঁরা অবশ্যই ইসলামিক বিষয়ে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত □□ বিশেষজ্ঞ। কিন্তু আমাদের সমাজে অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত লোকেরা ইসলাম ধর্মের অপব্যাখ্যার মাধ্যমে যত্র

---

[৭৫]. প্রথম আলো, ১৫ মার্চ ২০১১ এবং প্রথম আলো , ১৩ মে ২০১১। (চিত্র - ৮, এস এসসি পরীক্ষায় জিপিএ - ৫ পাওয়া দুই কন্যা এবং তাদের মাতা চাঁপা রানীর ছবি)

[৭৬].আমাদের সময় ১০ জুন ২০১৪।

[৭৭]. প্রথম আলো , ১৬ মে ২০১৪।

তত্র যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে, বিভিন্ন সময়ে ফতওয়া দিয়ে তা কার্যকর করে বেড়াচ্ছেন। যা আর ফতোয়া থাকছেনা হচ্ছে ফতোয়াবাজি। যার শিকার হচ্ছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে দরিদ্র অসহায় নীরিহ নারীরা।

পুরুষদেরকে ফতোয়া/ ফতোয়াবাজির শিকার হতে কমই দেখা যায়। চুরি করলে হাত কাটা, যৌতুক নয় বরং মোহরানা, স্ত্রীর ভরণ-পোষণ, পৈত্রিক সম্পত্তিতে নারীর অধিকার ইত্যাদি বিষয়ে পবিত্র কুরআনে স্পষ্ট বিধান রয়েছে। কিন্তু পবিত্র কুরআনের এসব বিধান সমাজে অধিকাংশ ক্ষেত্রে পালিত হচ্ছেনা স্বত্বেও এসব বিষয়ে কোন ফতওয়ার কথা কখনই শোনা যায়না। অনুমান করা যায় এই সব অপরাধ অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুরুষ কর্তৃক সংগঠিত হ[illegible] বলেই পুরুষ ফতোয়াবাজরা তার থেকে বিরত থাকেন। ফতোয়াকে কিভাবে ফতোয়াবাজিতে পরিণত করা হয়েছে সে বিষয়ে ৭ম অধ্যায়ে বিস্তারিত বলা হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশে ফতোয়াকে ফতোয়াবাজিতে পরিনত করায় সৃষ্ট নারী নির্যাতনের ধরণ তার পরিণতি বেড়েছে প্রচুর।

ফতোয়াবাজীর কারণ ও উদ্দেশ্য

অশিক্ষত, অর্ধশিক্ষিত ব্যক্তিগণ কর্তৃক ফতোয়া সম্পর্কে চৌদ্দশ' শতকের স্পেনের ইসলামী চিন্তাবিদ আবু ইসহাক আল শাতিবি বলেন, " Fatwas are issued with a view of satisfying, not the requirement of Law, but rather personal interest and greed". অর্থাৎ ব্যক্তি স্বার্থ এবং লোভই ফতোয়ার মূল কারণ।[৭৮] সেই সাথে বিদ্যমান থাকে দারিদ্র ও অশিক্ষা । সমাজের নানাবিধ শ্রেণী বৈষম্য এটিকে উস্কে দেয়। এর থেকেই সার্থান্বেষী পুরুষেরা নারীর প্রতি সহিংসতার অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করে ফতোয়াকে ফতোয়াবাজি হিসাবে । যার পেছনে বিদ্যমান থাকে নিম্নের কারণ সমূহও-

- ধর্মীয় কুসংস্কার;
- নারী সমাজকে দমিয়ে রাখার প্রবনতা;
- কু-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার মানসিকতা;
- হীন স্বার্থ চরিতার্থ করা;
- সামাজিক প্রতিপত্তিকে প্রতিষ্ঠার ভাব দেখানো;
- শাসন ও শোষণমূলক ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখা;
- প্রগতিশীল ধারণার চর্চা ও তার বিকাশকে রুদ্ধ করা।[৭৯]

ফতোয়াবাজীর প্রতিক্রিয়া

পবিত্র কুরআন তথা ইসলামের মৌলিক আদর্শ সম্পর্কে বিন্দুতম জ্ঞান না রেখেই দেশ ও সমাজের কিছু অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত ফতোয়াবাজরা যে ভাবে নারীজাতির জন্য ক্ষতিকর একপেশে ফতোয়া দিয়ে যাচ্ছেন তাতে ব্যক্তি, সম্প্রদায় বা গোষ্ঠিগত হীনস্বার্থ চরিতার্থ হচ্ছে বটে কিন্তু তা দেশ ও দেশের মানুষের অকল্যানে ভূমিকা রাখছে এবং ফতোয়া, ফতোয়াবাজিতে রূপ নিচ্ছে। ফতোয়া যেখানে দেশে শান্তি স্থাপনের সহায়ক হওয়ার কথা সেখানে ফতোয়াবাজি শান্তি ও সম্প্রীতি বিনষ্ট করছে।

বাংলা দেশে ধর্ষণ রূপ কার্যক্রমে [illegible], [illegible] বলপ্রয়োগ [illegible] - [illegible] শাস্তি [illegible] মেরে [illegible] বেত [illegible] জন [illegible] দেয়া

[৭৮] .উদ্ধৃত করেন সা'দউল্লাহ, দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৬ জানুয়ারী ২০০১।

[৭৯].খাদিজা লীনা ও চিররঞ্জন সরকার, পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ৬৬

□□□ □□□□ মেরে □□□□ বিষয়টি পবিত্র কুরআনে নেই, বেত □□□□ □□□ □□□□□ সেখানে □□□□ □□□ □□ প্রয়োগ □□□□□ □□□ সে □□□□ পবিত্র কুরআনে উল্লেখ □□□ সত্ত্বেও সে □□□ লক্ষ্য □□ □□□ □□□□□ □□□ □□□ নির্যাতন ক□□ □□□

□□□ পুরুষ কর্তৃক অন্যায় □□□ স্ত্রীকে তা□□□ দেয়ার □□ □□□ □□□ □□□□□ লক্ষ্যে □□ □□□□ জন □□□□□ ভিন্ন পুরুষকে ভোগের সুযোগ □□□ দেয়ার জন্য □□□□□ দেও□□ □□□ □ □□□□ পবিত্র কুরআনের □□□□□ সুক্ষ্ম □□□ পর্যালোচনা ক□□ □□□□ □□□ □□□□□ □□□□□ □□□ □□□ □□□ নির্যাতন এ□□ □□□□ ব্যক্তিত্বকে □□□□□□ অন্যদিকে □□□□- ধর্ম সম্পর্কে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি □□ □□□ দেশে □□□□□ আন্তর্জাতিক ভা□□ □□□□ ধর্মকে □□□-বিদ্বেষী ধর্ম □□□□□ গণ □□□□ সুযোগ সৃষ্টি □□□ □□ মানুষকে ধর্মের প্রতি আস্থা □□□□□ □□□□ □□□

<u>□□□□□□□□ পরিসংখ্যান</u>

বাংলাদেশে □□□□□□ বিষয়টি প্রথম দেশব্যাপী □□□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□ জানুয়ারী মৌ□□□ □□□□ জেলার □□□□ঞ্জ □□□□□□ □□□□□□ গ্রামের নুরজাহানকে □□□□ □□□□ দ্বিতীয় □□□□ □□□□□□ তুলে মাটির গর্তে পুতে □□□ টি □□□ □□□□ □□□□□ কেন্দ্র □□□ □ □□□□ □□ নূরজাহান □□□□□ আত্মহত্যা □□□□ □ □□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□ অভিযুক্তরা □□□□□ মুক্ত পায়।

□□□ □ শিশু নির্যাতন □□□ ট্রাইবুনাল, কুষ্টিয়ার □□□□(জেলাজজ) □□□ মো. □□□□ হোসেন □□ '□□□□□ □□□ □□□□ বাহির্ভূত শাস্তি বেআইনি'- প্রবন্ধে ১৯৯৩ থেকে ২০১০ পর্যন্ত এতদসংক্রান্ত নিম্নের ঘটনা সমুহের বিষয়ে উল্লেখ করে □□□□, " □□□□ □□□ মৌ□□□□□□ জেলার □□□□ঞ্জ □□□□□□ □□□□□□ গ্রামের গৃহবধু নুরজাহানকে মাটিতে পুতে □□□টি □□□ ছুড়ে □□□ □□ □□□ নুরজাহান □□□□□ আত্মহত্যা □□□□; □□□□ □□□□ □□ মে □□□ঞ্জে □□□ঞ্জে □□□□□ □□□□□ গ্রাম্য মাতব্বরা □□ □□□□ পুরুষকে □□□টি □□□ দোররা □□□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□ বাধ □□□□ □□□ স্বামীকে, ২□□□ □□□□ মে □□□ কুমিল্লার দাউদকান্দি □□□□□ বিটেশ্বরে □□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□টি দোররা □□□□, □□□□ □□□□ জুন □□□ কুমিল্লার দেবীদ্বারে এ□ □□□ □ □□ পুরুষকে □□□টি দোররা □□□□ নির্দেশ দেন স্থানীয় □□□□□□ □□□ মনিরুল □□□□ □□ □□□□□, □□□□ □□□□ □ অক্টোবর □□□ □□□□, □□□□ □□□□ □ সেপ্টেম্বর দুপচাঁ□□□□ গৃহবধু □ নওগাঁ□ পত্নীতলার □□□ □□□ দোররার □□□□ □□; □□□□ □□□□ □□ মে ব্রাহ্মনবাড়িয়ার বাঞ্ছারামপুর উপ□□□□□ পূর্বহাটি গ্রামের ভিন্ন ধর্মাবলম্বীর সাথে প্রেম □□□ □□ তরুনীকে দোররা □□□□ □□□□□ মাতব্বর, □□□□□□□ □□শে মে মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমংগল □□□□□ □□□ গ্রামের ক□□ বেগম, এবং □□□□ □□□□ □□ ডিসেম্বর □□□□□□ □□□□□□ ভিক্ষুক □□□ □□ প্রামাণিকের স্ত্রী সুফিয়াকে দোররা □□□□ □□□ মৃত্যু □□□ □□□□"।

বর্ণিত এসব ঘটনার বাইরেও আরও অনেক ঘটনা ঘটেছে। □□□□ (জেলাজজ) □□□ মো. □□□□ হোসেন নিজেই উল্লেখ করেন যে, □□□□ থেকে □□□□ □□□ পর্যন্ত দেশে □□□ টি □□□□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□ মৃত্যু □ আত্মহত্যা □□□ □□□□ □□□টি □□□ □□ □□ □□□□ □□□□ □□□□ মাত্র □□□টি।[৮০]

---

[৮০]. প্রথম আলো, ৬ মার্চ ২০১১।

নিম্নে সারণী ২৯ এ শুধুমাত্র ২০১০ এ বিভিন্ন বয়সের নারীদের ফতোয়ার শিকার হওয়ার একটি চিত্র তুলে ধরা হ'ল-

সারণী-২৯

[illegible] ও [illegible] মাধ্যমে [illegible] নির্যাতন ২[illegible]								
	হিল্যা বিয়ে	দোররা	গ্রামছাড়া/ সমাজচ্যুত/ একঘরে	শারীরিক ও মানষিক নির্যাতন	তালাক	মোট	মামলা	হত্যা
প্রেম		[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]	
[illegible] [illegible] অন্তঃসত্ত্ব		[illegible]	[illegible]			[illegible]		
মৌখিক ত[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]		
[illegible]-বহির্ভূত সম্পর্কের [illegible]		[illegible]				[illegible]		
ধর্ষণ			[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
পরপুরুষের সঙ্গে [illegible]				[illegible]		[illegible]		
চরিত্রের মিথ্যা [illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
কুপ্রস্তাব [illegible]						[illegible]		
[illegible] সম্পর্কের		[illegible]				[illegible]		

□□□□□□								
মোট	□	□	□	□	□	□□	□	□[৮১]

সারণী ২৯ এ □□□□ □ □□□□□□ মাধ্যমে □□□ নির্যাতন ২□□□ এর যে সংখ্যাটি তুলে ধরা হ'ল তাতে লক্ষ্যনীয় যে এক বছরেই বিভিন্ন ফতোয়াবাজির মাধ্যমে ২২টি দুঃখজনক ঘটনা ঘটেছে। সেগুলো হ'ল হিল্যাবিয়ে, দোররামারা, একঘরে করা, শারীরিক এ মানষিক নির্যাতন করা, তালাক দেয়া। এসব নির্যাতনের আদেশ যারা দেন তাদের ধর্মীয় বিষয়ে পরিস্কার ধারণা আছে বলে প্রতীয়মান হয়না।

□□□□□ জনিত কয়েকটি মারাত্মক বাস্তব ঘটনা

(১)শরীয়তপুরে ধর্ষক ও ফতোয়াবাজদের কান্ড

সাম্প্রতিক সময়ে হেনা আক্তারকে কেন্দ্র করে ফতোয়াবাজির ঘটনা আবার দেশব্যাপি প্রচন্ড আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। এক হেনা তার মৃত্যুর মাধ্যমে সমাজকে দোখয়ে গিয়েছে ফতোয়াবাজির নির্মম চিত্র। এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থার মিথ্যার আশ্রয় গ্রহনের নিষ্ঠুর রূপ।

□□□□ □□□□□□ □□□□ গ্রামের দারিদ্র কৃষব □□□□□□□ মেয়ে হেনা আক্তা (□□) □□□ প্রকৃতির □□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□ তুলে □□□ □□□□ পরিত্যক্ত □□□ ধর্ষণ □□□ প্রতিবেশী মাহাবুব(□□)। হেনার চিৎকারে মাহবুবের স্ত্রী ও □□□ □□□□ □□□ □□□ হেনাকে □□□ □□□ বেদম প্রহার □□□ □□□□ □ □□□□ □□□□□□ □□□ □□□□ □□□ সোমবার □□□□□ □□□□□ □□□□□□ এক □দসের নেতৃত্বে □□□□ বৈঠকের □□□□□ □□□ □□□ □□□□□ উপস্থিত □□ □□□□ গ্রামের স্থানীয় মাদ্রাসার শিক্ষক সাইফুল □ গ্রামের □□□□□□ □□□□ মাফজউদ্দিন □□□ □□□□□ □□□ □□□□ যে, দুই □□□□□ দোররা □□□ □□□□ স্থানীয় ইদ্রিস শেখ, □□□□ □□□ □□□□, আক্কাস, □□□□□ □ □□□□□ □□□ □□□□□□ সমন্বয়ে □ সদস্যে □□□□□ বোর্ড গঠন □□□ □□□ □□□ মাহবুবকে □□ দোররা □ □□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□ দেন। □□□□□□ হেনাকে □□'দোররা □□□□ □□□ ঘোষণা □□□□□ সঙ্গে সঙ্গে □□□□□□□□ দোররার □□□ কার্যকর □□□□□ দোররা □□□ অবস্থায় হেনা জ্ঞান □□□□□ মাটিতে লুটিয়ে □□□ □□□□ □□□ স্বজনর উদ্ধার □□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি □□□□ চিকিৎসাধীন অবস্থায় সোমবার □□□□ □□□□ □□ জানুয়ারী ২০১১ হেনা □□□ □□□□ □□□□ □□□□□ হেনা আক্তারের □□□□ □□□ □□□ □□□□□ সম □□□ □□□□ হেনার গ্রামের বা□□ □□□□□ শোকের □□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ হেনা আক্তারের □□□ □□□□□ □□ □□□ □□□ □□ □□□□ □□□□ □□□ মঙ্গলবার □□□□ □□□□ □□□□□ একটি হত্যা □□□□□ □□□□□ □□□□□

পত্রিকান্তরে প্রকাশ, □□ জানুয়ারী ২০১১ হেনার মৃত্যুর □□ □□□ দারিদ্র □□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ পুলিশ □□□□□□ ধর্ষণের □□□ উল্লেখ □□□□ □□□ পুলিশ কর্তৃক সুরত □□□ রিপোর্টেও এই মর্মে উল্লেখ □□□ □□□□□ যে, কোথাও কোন □□□□□ চিহ্ন নেই,

---

[৮১].খাদিজা লীনা এবং চিররঞ্জন সরকার ঃ নির্যাতিত নারী উপেক্ষিত মানবাধিকার, (আইন ও সালিশ কেন্দ্র থেকে সংগৃহীত তথ্য থেকে), পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ৬৯-৭০।

চোখের সামান □□□ □□□ □□, □□□□□ □□□□□ সঙ্গে সম্পর্ক □□, স্থানীয় □□□ □□□ গেছে, □□□□□ □□□□ □□□ গেছে। হেনার □□□□□□ □□□ তদন্ত রিপোর্টেও শরীয়তপুরের □□□□ সার্জনের নেতৃত্বে □□□ □□□□□□□□ চিকিৎসা কর্মকর্তা এবং □□□□ চিকিৎসা কর্মকর্তা ও □□□□ বিশেষজ্ঞ প্রদত্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ □□□ □□ যে, “হেনার □□□□ কোন □□□□ চিহ্ন □□□□ □□□□ □□□ স্বাভাবিক ছিল,□□□ □□□□ □□□□ □□□”। □□□□ সার্জন □□□□□□□□ □□□□, “□□□ নেতৃত্বে □□□□ ডাক্তার □□□□ তদন্ত □□□□□□ □□□□□ কোন □□□□□ চিহ্ন □□□□ □□□□, □□□ মৃত দেহটি হাল্কা □□□□ □□□ □□□□□ সংরক্ষণ □□□ □□□□□□ পরীক্ষার জন্য □□□ মেডিকেল □□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□। সেখানকার রিপোর্ট এলে মৃত্যুর মূল □□□ □□□ □□□”।[৮২]

হেনার □□□□□□ ময়নাতদন্ত প্রতিবেদনের তথ্য □□□ □□□□□ দৈনিক ডেইলী ষ্টার ৭ ফেব্রুয়ারীতে প্রতিবেদন প্রকাশ □□□□ এটি □□□□ □□□ মহামান্য হাইকোর্টের একটি বেঞ্চ স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে হেনার □□□□ পুনরায় □□□ তদন্তের □□□ দেন। □□□ হেনার □□□ তুলে □□□ মেডিকেল □□□□ □□□□□□□□ মর্গে হেনার □□□□ □□□ তদন্ত □□□ □□□ নতুন তদন্তে ভিকটিমের □□□ দেহে □□খ্য □□□□ ক্ষত চিহ্ন □□□□ □□□□□□ □□টি □□□□ চিহ্ন □□□□ □□□□□□ □□□□ হেনার □□□□□□ দু’টি □□□ তদন্ত প্রতিবেদন □□□□ দেখার নির্দেশ সহ হেনার □□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□ □ দোররা মেরেছেন, □□□□ বিরুদ্ধে নতুন □□□ □□□□ □□□□, □□□□□□ গ্রেফতার করার জন্য □□□ প্রথম সুরত □□□ প্রতিবেদন প্রস্তুতকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য □□□□ কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেন। □□□□ উচ্চ □□□□□□ নির্দেশে হেনা হত্যার □□□□ আরেকটি □□□□□ গ্রহণ □□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ বিরুদ্ধে □□□□□ □□□ □□□□ □□ং হেনাকে ধর্ষণ, ধর্ষণ □□□ □□□ চেষ্টা ও হত্যার □□□□□ □□□ □□□□□ পূর্বের ১০ □□ □□□□□□ নতুন □□□□□ □□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□ □□□ □ শিশু নির্যাতন দমন □□□□ □, □,□□ □□ □□□, প্যানেল কোড □□□, □□□(□),□□□,□□□, □□□ □□□□□□ □□□ □□□□ □□□ □□□□□□ বিষয়টিও □□□□□□ □□□ □□□□□□[৮৩]

মাসিক লিগাল এইড পত্রিকায় জনাব এম.এম.হোসেন বলেন, “ ঘটনার পারিপার্শ্বিকতা থেকে এটা স্পষ্ট যে, দারোগার সুরতহাল রিপোর্ট এবং মেডিকেল বোর্ডেও ময়না তদন্ত রিপোর্ট সত্য নয়, ... ঘটনার পারিপার্শ্বিকতা থেকে এটাও জানা গেছে যে, বিত্তশালী ও প্রভাবশালী আসামী পক্ষ দারোগাকে ও ডাক্তারকে অবৈধবাবে বশীভূত করে মিথ্যা সুরতহাল রিপোর্ট ও ডাক্তারী রিপোর্ট হাসিল করে। .. .. ওটা ব্যক্তিস্বার্থ হাসিল করার জন্য অসৎ উদ্দেশ্যে প্রণোদিত মিথ্যা রিপোর্ট।[৮৪] মিথ্যা সুরত হাল এবং ডাক্তারী রিপোর্ট প্রদানকারীদের বিরচদ্ধে গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে বিশেষ কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। গত ৩১ জানুয়ারী ২০১৩ এবং ২০১৪ এ হেনার দ্বিতীয় এবং তৃতীয় মৃত্যু বার্ষিকী গিয়েছে। এ পর্যন্ত সকল আসামী ধরা পড়েনি বলে বিচার কার্যক্রম শুরু হয়নি। হেনার মা বাবা সহ পরিবার আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। আর বিচার শুরুর জন্য প্রহর গুনছেন।[৮৫] (চিত্র ৯- মৃত হেনার □□) ।

[৮২]. প্রথম আলো, ৮ ফেব্রুয়ারী, ২০১১ ।।

[৮৩]. প্রথম আলো, ৩, ৮ এবং ১২ ফেব্রুয়ারী ২০১১।

[৮৪].প্রথম আলো, ২০ এপ্রিল - ২০ জুন পর্যন্ত বিভিন্ন সংখ্যা এবং প্রথম আলো, ৬ আগষ্ট ২০১১।

[৮৫].প্রথম আলো, ৩১ জানুয়ারী, ২০১৩ এবং ৩১ জানুয়ারী ২০১৪ ।(চিত্র ৯ মৃত হেনার ছবি)।

(২) হিল্লা বিয়েতে রাজি না হওয়ায় ঘরে বন্দী বধূ

ঠাকুরগাঁও জেলার সদর উপজেলার আখানগর হারাগাছপাড়া গ্রামের করুণ □ আবদুল্লাহ দম্পতি □□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ দেড় □□□□□ একটি সন্তান □□□□ করুণ □□□□, দাম্পত্য □□□□□ □□ পর্যায়ে করুণ □□□□ □□□□□ আশ্রয় নেন। আবদুল্লাহ □□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□ দেন। □□□ □□□□□□□ □□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□ করুণ □□□□□□□□ গ্রহণ □□ □□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ চেয়ারম্যান □□ □□□□ পরামর্শ □□□□ □□□□ চেয়ারম্যান □□□□ □□□ স্বামীর □□□□□ পাঠিয়ে দেন।

করুণ স্বামীর □□□□□ □□□□ □□□□ মুরুব্বিরা গ্রামে ছা□□□ দেন, □□□□ দেয়ার □□□ আবদুল্লাহ-করুণ □□ সঙ্গে □□□□□ □□□□ - □□□ ব্যাভিচার। □ জন □□□□□ দোররা □□□ □□□□ □ অবস্থায় আবদুল্ল □□□□□ □□□ ছেড়ে □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □ ব্যাপারে □□ গ্রামে এ□ □□□□□ আবদুল্লাহ করুণার সঙ্গে পুনরায় □□□□□ □□□□ □□□□□ করুণাকে হিল্লা □□□ □□□□ □□□ □□□ বৈঠকের মুরাব্বির □□□□□ দেন। করুণ হিল্লা □□□□□ আপত্তি □□□□ গ্রামের মাতব্বরগণ □□ □□□□□□□ সঙ্গে গ্রামের লোকদের □□ □□□ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন ব□□ নির্দেশ দেন। সেই থেকে □□□□ লোকজনও করুনার সঙ্গে কথাবার্তা □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□□□□ একটি □□□□

করুণার □□□□□ □□□ স্বামী রেগে □□□□ □□□□□□ জন □□ডোশ □□□□□□□□□ একজন □□□ ভুল স্বীকার □□□ □□□ □□□□ ক্ষমাও চেয়েছেন। □ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□ হোসেনের ম□ □□ □□□□□ রক্ষ □□□□ গ্রামবাসী □ □□□ □□□□□□, □ □□□□□ □□□ □□□□ কিছু নেই। প্রচলিত □□□□ হিল্লা □□□□ নিষিদ্ধ □□□□ □□□□□ অন □□□□□□□ আবদুস □□□□□ □□□□, "মানুষের তৈরী □□□□ □□□□ আস্থা নেই"।[৮৬] - মূলতঃ আফজাল হোসেন এবং আবদুস সামাদ গণের তৈরী বিধিব্যবস্থাই যে মানুষের তৈরী সে বিষয়ে ধর্মীয় বিষয় পর্যালোনা সংক্রান্ত পরবর্তী অধ্যায় থেকে স্পষ্ট হবে।

(৩) নিজ স্ত্রীকে এক রাত্রির জন্য অন্যের হাতে তুলে দিতে বাধ্য হন কৃষক আব্দুল মান্নান

বগুড়ার শাহজাহানপুর উপজেলার আশেকপুর ইউনিয়নের দক্ষিণ চকজোড়া গ্রামের কৃষক আব্দুল মান্নান ফতোয়া মেনে নিয়ে ঘর করছেন তার স্ত্রী বেলী বেগমকে নিয়ে। ঘটনার বর্ণনা তার দুই চোখ ছল ছল করতে থাকে। তিনি ফতোয়ার জোরে বাধ্য হয়ে অন্যের সাথে হিল্লার পর বউকে ঘরে তুলেছেন।

তিনি বলেন, "একদিন দুপুরে খেত থ্যাকে বাড়িত অ্যাসে দেকি বউ থালত ভাত বাড়েনি। রাগের মাথায় বউকে গালাগালি করি। বউও জবাব দেয়। হামার মাথাত রক্ত ওঠে যায়। বলি বউকে তালাক দিবো। কেমন করে সেই কথা লোকজনের কানে যায়। মাতবর আব্দুল হামিদ, সামাদ মিয়া অনেকেই ফতোয়া দেন। শুনে মাথায় বাজ পড়ে। বগুড়া শহরের এক মাওলানার কাছে যাই। তিনি বলেন, 'রাগের মাথায় তালাক দিলে ধর্মীয় মতে তালাক হয়না, সমাজ মেনে নিলে বউকে নিয়ে ঘর করতে বাধা নাই'। মাওলানা সাহেবের কথা গ্রামে এসে মাতব্বরদের বলি। কিন্তু তারা মানেনা। বাধ্য হয়ে অন্যের সাথে হিল্লার পর বউকে ঘরে তুলি। সে কথা মনে হলে এখনো রাগে-ক্ষোভে বুকটা ফেটে যায়"।[৮৭]

---

[৮৬].প্রথম আলো, ৬ সেপ্টেম্বর ২০১১।

[৮৭]. প্রথম আলো, ১ সেপ্টেম্বর ২০১৩।

(৪) এক ঘরে করে দেয়া হয়েছে দুই দম্পতিকে

একই গ্রামের সফিকুল ইসলাম ও শাহিনুর বেগম হিল্লা বিয়ের ফতোয়া হিসেবে এক রাত্রির জন্য অন্যের কাছে যাওয়ার বিষয় মেনে না নেওয়ায় তাদের এক ঘরে করে দেয়া হলে তারা বাধ্য হয়ে চকজোড়া গ্রামছেড়ে সাজাপুর গ্রামে চলে যান। আবার ফতোয়ার দৌলতে একঘরে হয়ে আছেন একই গ্রামের আখতার ও ঝরনা দম্পতিও।[৮৮]

৭. নারী ও শিশু পাচার

□□□□ f□

□□□□ অর্থ গোপনে □□ চুপচুপ ভ□□□□□□ □□□□□ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কোন মানুষকে □□□ নিজস্ব □□□□□ □□□□□□ থেকে বিচ্ছিন্ন □□□ গোপনীয়তা □□ মিথ্যার আশ্রয় □□□□ অন্য স্থানান্তর □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□। □□□□□□ ঘোষিত সংজ্ঞা অনুসারে □□□□ □□□□□ □□ - □□ দেখিয়ে □□ জোর □□□ □□□□ অন কোন □□□□ জুলুম □□□, □□□ □□□, প্রতারণ □□□, □□□□ □□□, মিথ্যাচার □□□, ভুল বুঝিয়ে, ক্ষমতার অপব্যবহা □□□, দুর্বলতার সুযোগ □□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□□□ কর্তৃত্ব □□□ □□□□ □□ সুযোগ সুবিধার লেনদেনের মাধ্যমে □□□ সম্মাত □□□ □□□ - শোষণ □□□□ উদ্দেশ্যে □□□□□ সংগ্রহ □□□, স্থানান্তারিত ক□□, □□□ □□□ □□□, □□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□□[৮৯]

□□□□, আন্তর্জাতিক দুই চক্রের সংগঠিত একটি □□ন্য□□ □□□□□□ □□□□□□ে□□ □ □□□□□□□ সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে পড়েছে। শুধু সম্পৃক্ত □□ □□□□□□□ মানুষ □□□□□□ একটি উৎস দেশ, □□□ □□□□ □□□□□□□ মানুষ □□□□□□ একটি ট্রানজিট '□□□□□□ ব্যবহৃত □□□ থাকে।[৯০]

□□□ □ শিশু প□□□□□ □□□□

□□ পৃথিবীতে বিদ্যমান ব্যবস সমুহের মধে মুনাফার □□□□□ সর্বাধিক ল□□□□□ ব্যবস হচ্ছে যথাক্রমে অস্ত্র ব্যবস, মাদকব্যবস, □□□ □□□□ □□□□। □□□□ □□□□ ব্যবসার মাধ্যমে □□□□□ বৈশ্বিক □□□□□ সংঘবদ্ধ একটি মুনাফ লোভী □ স্বার্থান্বেষী মহল বিশ্ববাজারে কোটি কোটি □□□ □□□□□□□ □□ □□□□ মোহেই এ কার্যক্রমটি □□□□□ যাচ্ছে।

□□□□□□□ □□□ দারিদ্র □ বেকার সমস্যার □□□□ স দাক্ষিণ □□□□□ একটি জনবহুল দেশ।বাংলাদেশের □□ কোটি মানুষের প্রায় □ কোটিই মেয়ে শিশু। দারিদ্র, বেকারত্ব, জনসংখ্যার আধিক্য ইত্যাদর ব□□□□ □

[৮৮]. প্রথম আলো, ১ সেপ্টেম্বর ২০১৩।

[৮৯] .খাদিজা লীনা এবং চিররঞ্জন সরকার ঃ নির্যাতিত নারী উপেক্ষিত মানবাধিকার,পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ৭৭।

[৯০].The counter Trafficking Framework Report ঃ Bangladesh perspective, Govt of Bangladesh, Ministry of women & children Affairs, 2004, P. 27.

দেশের □□□□□□ মেয়েরাই বিদ্যমান □□□□ □□□□□□ □ বঞ্চনার মধ্যে □□□□ খাদ , শিক্ষা, চিকিৎসা ইত্যাদি ক্ষেত্রে □□ বৈষম্যের □□□□□□ □□□ □□□□□ দেশের উপেক্ষিত □ □□□□□ বঞ্চিত মেয়েরা বিভিন্ন প্রতারণার ফাঁদে □□□ বিভিন্ন দেশে □□□□□ □□□ যাচ্ছে।

□□□□□□ সঙ্গে □□□□□□□□□□ □□টি জেলার মোট □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ সীমান্ত □□□□□□ □□□□ সীমান্তের □□□□□□□□ অরক্ষিত অরক্ষিত □□□ সীমান্ত □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□ প্রাতিনয়ত □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□□ মানুষ □□□□□□ একটি ট্রানজিট '□□□□□□ ব্যবহৃত হচ্ছে।[৯১]

□□□□ □ শিশু প□□□□□□ প্রতিক্রিয়া

□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ জন একটি □□□ উদ্বেগ □□□ সমস্যা □□□□□□□□ থেকে পুরুষ, □□□□□ শিশু '□□□□□ □□□□ মূলতঃ □□□□ □ শিশুরাই □□□□□□ প্রধান □□□□□□ □□□□□□□ থেকে □□□□ □ শিশু □□□□□□ সংঙ্গে □□□□□□□□, □□□□ □□□ □□□স্তানে শক্তিশালী দুষ্টচক্র বিদ্যমান □□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□ কষ্ট সাধ □□□ □□□□ □□ দেশে □□□□□ □□□□□ □□□□ সম্ভাবনা দেখা □□□□□ □□□□ □□□□□□ থেকে অন্য দেশে □□□□□□□□ সুযোগ '□□□ □□□□ □□□□□□

□□ দুষ্ট চক্র □□□□□ □□□ □□□□ □□□□ মূলতঃ □□□□□□□□ দেহব্যবসায় □□□□ □□□□□□□ উদ্দেশ্যে □□□□□ ইচ্ছের বিরুদ্ধে □□□□□□□ যৌন কর্মে □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ পুরুষদের যৌনলালসা মেটানোর জন্য □□□□□□ □□□□□ □□□□ বিক্রি □□□ দেওয়া □□□ □□□□□□□□ □□□□□□, অশ্লীল □□ □ চলচ্চিত্রে □□□ গ্রহণ □□□□□ □□□ ছোটোদের অ□□□□□ ভিক্ষাবৃত্তিতেএবং বয়স্কদের বিকৃত যৌনলালসা মেটাতে বাধ্য □□□ □□□ □ □□□□ □□□□□□ সস্তা শ্রম - □□□□ ব্যবহার □□□ □□, □□□□□□ □□□□ নেশার দ্রব □□□□□ □□□□□□ □□ □□□ □□□□□ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিক্রি □□□ □□ - □□ মানুষ □□□□□□ □□□□□ মৌলিক অ□□□□□□□ □□□ □□□□□□ মর্যাদাকে খর্ব □□□ □□□□□□□□□ লঙ্ঘনে চূড়ান্ত পর্যায়ে নি□□ পৌঁছায়।

□□□□ □□□□□□□□□ আশ্রয় □□ □□□□□□□□, □□□□□□ □□□ □□□স্তানের বিভিন্ন □□□□□□□□□ বিভিন্ন গবেষণার প্রাপ্ত তথ্য পর্যালোচনায় খাদিজা লীনা এবং চিররঞ্জন সরকারের প্রদত্ত তথ্য মতে, □□□□□□ □□□□□ মেয়ে শিশুদের □□□□□ □□ □□□□□□ জোর □□□ দেহব্যবসায় □□□□ □□□ □□□ □□□□□ প্রায় □□ লক্ষাধিক □□□ পাকিস্তানে প্রায় □ লক্ষাধিক □□□□□□□□ □□□□ □ শিশু পতিতাবৃত্তির সঙ্গে □□□□ □□□ □□□□ □□□□ বিভিন্ন পাচারের শিকার।[৯২]

পতিতাবৃত্তিতে □□□□□□ □□□□ □ মেয়েশিশুরা অ□□□□ যৌনাচারে □□□□□□□ □□□□□ □□□ মরণব্যাধি □□□□□□□ /□□□□□ - □ আক্রান্ত হচ্ছে □□□□ □□□□□ □□□□□ দেশে □□□□ □□□□ □□□ □□□□□□□ /□□□□□ □□ বিস্তার ঘটাচ্ছে।

□□□□ □ শিশু প□□□□□□ পরিসংখ্যান

গত ৭ বছরে (২০০৩ -১০) ৭৩০ জন নারী পাচারের শিকার হয়েছে। এর মধ্যে উদ্ধার হয়েছে ৫৪৪ জন। এদের মধ্যে ৫৪২ জনকে তাদের পরিবারের কাছে এবং ২ জনকে সরকারী সেফহোমে রাখা হয়েছে। পাচারের এ সব ঘটনায় ৪৮৯টি মামলায় ১৫১৯ জন আসামী হয়েছে। এর মধ্যে পুলিশ গ্রেফতার করেছে

৯১.The counter Trafficking Framework Report ঃ Bangladesh perspective, opcit, 2004 , P. 27

৯২. খাদিজা লীনা এবং চিররঞ্জন সরকার নির্যাতিত নারী উপেক্ষিত মানবাধিকার, পূর্বোক্ত , পৃ ঃ ৭৮।

৪৮৮ জনকে। একই সময়ে ৫৮১ টি শিশু পাচারের শিকার হয়েছে।এর মধ্যে উদ্ধার হয়েছে ৪৫৫ জন। যার থেকে ৪৫৪ জনকে তাদের পরিবারের কাছে এবং ১ জনকে সরকারী সেফহোমে রাখা হয়েছে। এ সব পাচারের ঘটনায় ৩০১টি মামলায় ১ হাজার ১ জনকে আসামী করা হয়েছে। এর মধ্যে পুলিশ গ্রেফতার করেছে ৬১৩ জনকে।[৯৩] সেভ দ্যা চিলড্রেন এর তথ্য মতে গত ৫ বছরে বাংলাদেশ থেকে ৫ লাখ নারীকে নানা ভাবে পাচার করা হয়েছে।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পাচার হওয়া এ সব নারীর কিছু অংশ মুক্তি পেয়ে দেশে ফিরলেও মিলছেনা এদের স্বাধীনতা। স্বাধীনভাবে চলাফেরার অধিকার ।

পাচার সংক্রান্ত কয়েকটি বাস্তব ঘটনা

(১) বিদেশে গিয়ে পাঁচ নারী প্রতারিত

মোর □□□□□ □□□□□ পোলার □□□ অসু , □□□□□□ □□□□ □□□ □□ দেশে □□□ □ □□□□ □□□□ পোলা □□□□ □□□□ বাইচ্চ থাকুম □□ ভিটামাটি খুইয়ে □□□□□□ □□□□ পেটের □□ জোগাড় □□□ লাইগা □□□□ গেলাম। প্রত্যারণায় প□□ দেশে □□□□□ অ্যাহন কী করুম? কোথায় যামু? চোখের পা□ ফেলতে ফেলতে □□□ □□ □□□ □□□□ ফেরত □□□লে□ গৌ□□□ উ□□□□ ব্যাথা ই□□□□□□ □□□□□□ গ্রামের গৃহবধূ (□□)।

□□□□□□ প্রতারিত □□□□ □□ □□□□, □□□ □□□□□□□ নন্দনপট্টি গ্রামের ত□□□ □□ গৃহবধূ □□□ চেঙ্গুটিয়া গ্রামের অ□□□ গৃহবধূ। ভুক্তভোগী , পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দা সূত্রে জানা গেছে □□□□ বেত□ □□□□ দেওয়ার □□ □□□ □□□□ □ □□ □□□□□ □□□□ পাঠিয়ে □□□□ □□ □□□ □□□□□ দালাল □□□□ □□ □ □□ স্ত্রী □□□□ বেগম। প্রতারিত □□□□□ □□□□, □□□□ □□□□ □□□ হোটেল □ □□□□□□□□ □□□□□ □□□ বাধ □□ □□□□□ □□□□□□ অত্যাচারে অতিষ্ঠ □□□ তারা বিভিন্ন সময়ে দেশে □□□ □□□□□□□

□□ গৃহবধূ □□□□, □□ □□□□ □□□ বেতনের □□ দেওয়ায় □□□ ভিটেমাটি বিক্রি □□□ □ □□□□□□ □□□ □□ □□ □□ □□□□ □□□ দেন। □□□□ □□□ □□□ একটি হোটেল কা□ দেওয়া □□□ □□□ □□নে□ □□□□□□ □□□□ □ন্য □□□ গৃহবধূ। প্রতারিত নারীরা জানান, তাঁদের বিদেশ নিয়ে হোটেল ও বাসাবাড়িতে অনৈতিক কাজে বাধ্য করা হয়েছে। অমানবিক অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে তারা বিভিন্ন সময়ে দেশে ফিরে এসেছেন। এক গৃহবধূ জানান ১৫ হাজার টাকা বেতনের কথা দেওয়ায় তিনি ভিটেমাটি বিক্রি করে ও ধারদেনা করে এক লাখ ২০ হাজার টাকা দেন। বিদেশ নিয়ে তাঁকে একটি হোটেল কাজ দেয়া হয়। একই ধরনের অভিযোগ করেন অন্য তিন গৃহবধূ।

---

[৯৩].আমাদের সময়, ২১ ডিসেম্বর, ২০১০।

প্রতারিত □□□□□ □ জুলাই ২০১১ তারিখ □□□□ □□□ □ □□□ স্ত্রী '□□□□ বেগমের বিরুদ্ধে গৌরনদী □□□□ একটি □□□□ □□□□□□□ গৌরনদী □□□□ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ও□) মো. নুরুল □□□□□ □□□□, □□□ ব্যবসায়ি □□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□□[৯৪]

(২) বাবা কর্তৃক মেয়েকে ভারতে পাচার

২০০৪ সালের ২ ডিসেম্বর কবির হোসেন যশোর জেলার মনিরামপুর উপজেলার লাউকুন্ডা গ্রামের শহীদ মোল্যার মেয়ে নাছিমা খাতুনকে বিয়ে করে। তাদের ৬ বছরের একটি কন্যা সন্তান রয়েছে। পরে যৌতুকের দাবীতে নির্যাতন করে তাড়িয়ে দেওয়ায় কবিরের বিরুদ্ধে তার স্ত্রী নাছিমা খাতুন মামলা করেন। ওই মামলায় মীমাংসার কথা বলে গত ১৭ মে ২০১৩ তারিখে কবির হোসেন তার স্ত্রী নাছিমা খাতুন ও নিজ মেয়েকে ডেকে নিয়ে যায়। এর পর কৌশলে মেয়েটিকে অপহরণ করে ভারতে পাচার করে। এই ঘটনায় স্ত্রী নাছিমা খাতুন মেয়ে পাচারের অভিযোগে স্বামী কবির হোসেনের বিরুদ্ধে মামলা করে।[৯৫]

(৩) ৪০০তরুনী উধাও

গত ১৪ ফেব্রুয়ারী ২০১৪ বাংলাদেশ প্রতিদিন পত্রিকা প্রকাশিত খবর মুলে এই পত্রিকায় '১৬০০ তরুণী উধাও' শিরোনামে প্রতিবেদন প্রকাশের পরিপ্রেক্ষিতে এ বিষয়ে মহানগর পুলিশে তোলপাড় শুরচ হলেও একই সময়ে দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে মানবাধিকার সংস্থার সহায়তায় পুলিশ ৪০০ তরুণীকে উদ্ধার করে থানা হেফাজতে নিয়ে যায়। কিন্তু তাদের মানব পাচার আইনে মামলা না করে ডিএমপি অ্যাক্টের সাধারণ ধারায় আদালতে পাঠালে সংশ্লিষ্ট দালালরা সামান্য জরিমানা জমা দিয়েই এসব তরুণীকে নিয়ে লাপাত্তা হন। এরপর থেকে সেসব তরুণীকেও আর খুজে পাওয়া যাচ্ছেনা। তারা নিজ নিজ অভিবাবকের কাছেও ফিরে যেতে পারেননি। শুধু হাত বদল হয়েছেন মাত্র।[৯৬]

মূলতঃ ডিএমপি অ্যাক্টের সাধারণ ধারায় মামলা করে আদালতে পাঠানোর ফলে সংশ্লিষ্ট দালালরা সামান্য জরিমানা জমা দিয়েই অশিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত নারীদের দেশের অভ্যন্তরে যৌনপল্লীতে ব্যবহার কিংবা বিদেশে একই কাজে পাচারের সুযোগ অব্যাহত থাকার প্রধান কারণ।

আর মানব পাচার আইনে মামলা হ'লে পাচারকারীদের তা মুকাবিলা করা কঠিন হ'তো ফলে এ ধরনের অভিযোগ কমে আসত সহজেই।

৮. গৃহ □□□□□□□ নির্যাতন

□□□□□□□□□ দারিদ্রপীড়িত পরিবারগুলোর মেয়ে সন্তানেরা □□□-□□□□□ □□□□ □□□□□ বাধ্য □□□ বিভিন্ন □□□□ বাধ্যত মূলক শ্রমে নিযুক্ত □□ | সেখানে প্রতিনিয়ত □□□ □□□□□- □□□□□ নির্যাতনের □□□□ □□□ □□□ □□□□□□ □□□ যৌন নির্যাতনও। কখনও কখনও নির্যাতনের মাত্রা □□ □□□□ □□ যে □□□□ মৃত্যু□□□ পর্যন্ত □□□□

---

[৯৪].প্রথম আলো, ১১ আগষ্ট ২০১১।

[৯৫].আমাদের সময়, ২০ আগষ্ট ২০১৩

[৯৬]. বাংলাদেশ প্রতিদিন, ১৪ ফেব্রুয়ারী ২০১৪।

গৃহ □□□□□□□□ পেশা □□□□□ গ্রহণ □□□ □□□□□ নির্যাতনের কার□

দারিদ্র □□□-□□□□□ □□□ নির্ভরশীল মেয়েশিশুরা এ□□ স্বামী পরিত্যক্তা ন□□□□ □□□ অন কোন পেশা গ্রহণে ব্যর্থ □□ □□□□□ □ □□□□□ পেশা গ্রহণে বাধ □□□ দেখা □□□ □□□□-□□□□, নদীভাঙ্গন □ বন্যাপ্লাবিত □□□□□□ দারিদ্র □□□-□□□□□ সন্তানেরা নিরুপায় □□□ □□□□ মানুষের □□□□ □□□□ যোগ দেয় - অর্থাৎ চ□□ দারিদ্রের □□□□□□ মেয়ে শিশু □ □□□□□ গৃহপরিচারিকার □□□ বেছে নেয়। আর এই □□□ □□□দ্রতাই তাদের উপর নির্যাতনের প্রধান সুযোগ। যা চরিত্রহীর কোনকোন পুরুষের লোভ-লালসা নিবারণের সুযোগও বটে।

গৃহ □□□□□□□ নির্যাতন সংক্রান্ত সহিংসতা

□□□ দারিদ্রের □□□□□□ অন্ন □□□□□ ছেলেমেয়ে □ □□□□□ গৃহপরিচারিকার □□□ বেছে নেয় □□□□ উচ্চবিত্ত পরিবারগুলো গৃহশ্রমিকদের ন্যূনতম মর্যাদা দেয়না। □□□□□□□ পরিশ্রম অনুপাতে মজুরি দেয়া □□□□□ □□□□□ তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের ক□□নে □□□□□□□ দেয়া □□□□ ঘুমানোর □□□□ একটু □□□□□ □□□ □□□□□ পোষাক। □□□ ভাঙ্গা পরিশ্রমের □□□ □□□□□□ □□নো□□□□□ সামান সুযোগ। অসু □□□ ডাক্তার দেখানোর পরিবর্তে অনুমানের ভিত্তিতে ওষুধ দেওয়া □□□ □□ □□ □□□□□ □□ সারাক্ষণ ফুটফরমাসের □□□□□□ □□□□ বিশ্রামের সময়টুকু পর্যন্ত প□□□□□ □□ থাপ্পড় আর □□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□ □□□□□ সর্বক্ষন □□□□ □□□ ফেরে। □□□□ □ □□□□□ কোন কিছু □□□□ গেলেও নির্যাতিত □□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□পর্যন্ত □□□□□ □□□ □□□□ □□ □□□□□ □ □□□ গেলে □□□□□ □□□□□ থেকে □□□ □□□□ কিছু ভেঙ্গে গেলে মারাত্মক নির্যাতনের শি□□□ □□□ □□□□ কোন পুরুষ সদস্যে যৌন নির্যাতনের শি□□□ □□□□ দোষী সাব্যস্ত □□ গৃহপরিচারিকাই। □ □□□নে নির্যাতনের মাত্রা □□ বেশী □□ যে, সে জীবনমৃত্যুর সম্মুখীন □□□ □□□□ □□□□□ মৃত্যু মুখেও □□□□ □□ □□ □□□□□□□□□ লঙ্ঘনে চূড়ান্ত পর্যায়ে নি□□ পৌছায়।

এই বিষয়ে সভাপতি, গৃহকর্মী অধিকার প্রতিষ্ঠা নেটওয়ার্ক এবং নির্বাহী পরিচালক, আইনও সালিশ কেন্দ্র - সুলতানা কামাল এর বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি তাঁর দু'টি গবেষণা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন, "আইন ও সালিশ কেন্দ্র গৃহকর্মীদের আইনি সহায়তা দেয়। এখন আমাদের মূল উদ্দেশ্য 'শিশু-শ্রম' নিরসন করা। গৃহকর্মীদের নিয়ে কাজ করার অভিজ্ঞতা থেকে আমরা একটি গবেষণা করেছি । এই গবেষণা পত্রটির নাম 'হয়্যার চিলড্রেন আর অ্যাডাল্ট' (যেখানে শিশুরা বয়স্ক)। আমরা দেখেছি, গৃহকর্মী শিশুদের জীবনে কোন শৈশব থাকেনা। আমাদের পরিবারের শিশুরা যেসব খেলাধুলা ও বিনোদন করে, আদর স্নেহ পায়, একজন গৃহকর্মী শিশু এর কিছুই পায়না। তারা বয়স্ক মানুষের থেকেও অধিক সময় কাজ করে। তারা ১২ থেকে ১৪ ঘন্টা কাজ করে। নিজেদের চলতে হয় । পরিবারকেও চালাতে হয়। সমাজে ক্ষমতাহীন ও ক্ষমতাসীনদের দ্বন্ধের মধ্যে পড়ে সহ্য করতে হয় বিভিন্ন ধরনের অত্যাচার, নির্যাতন ও নিপীড়ন। আমরা প্রথমে রাস্তায় যে সব শিশু বিভিন্ন ধরনের কাজের সঙ্গে যুক্ত, তাদের নিয়ে কাজ করি। শিশুদের জন্য 'আমার পৃথিবী' নামের একটা মডেল তৈরী করেছিলাম এর উদ্দেশ্যে ছিল, শিশুরা যেন নিজেকে জানতে পারে।পরবর্তী সময়ে অনেকে এই মডেল গ্রহণ করে। 'চিলড্রেন ক্রাই অ্যালোন' (শিশুরা একা নীরবে কাঁদে) নামে আরেকটি গবেষণা করি । এখানে দেখেছি, গৃহকর্মী এসব শিশু দিন-রাত একাকী নীরবে নিভৃতে কেঁদে যাচ্ছে। তাদের পাশে কেউ নেই। আমরা তাদের পাশে থাকার চেষ্টা করেছি। এসব শিশু গৃহের অভ্যন্তরে, আইনের বাইরে। যা আমার নিজের সন্তানদের জন্য কখনোই চাইব না। সেগুলোই আমরা একজন শিশু গৃহকর্মীকে দিয়ে করাচ্ছি। যে স্কুলের ব্যাগটি আমার সন্তান নিতে পারছেনা, তার চেয়ে ছোট শিশু সেই

ব্যাগ টানছে। এমনকি তার নিরাপত্তার দায়িত্বও এই শিশুর উপর পড়ছে। আবার কোন কাজে সমস্যা হলেই তাকে অত্যন্ত অমানাবিক, অসম্মানজনক শাস্তি দেওয়া হচ্ছে" ।[৯৭]

গৃহ □□□□□□ নির্যাতন সংক্রান্ত সহিংসতার পরিসংখ্যান

□□□□□□ পরিসংখ্যান ব্যুরোর জা□□□ শিশুশ্রম □□□□ □□□□ □□□□□ তথ অনুযায়ি গৃহকর্মে □□□□□□ মোট শিশু (□-□□) শ্রামিক হচ্ছে □ □□□ □□ □□□□□ তন্মধ্যে □□% ই মেয়ে শিশু। গৃহকর্মীদের □□□□□ □□' □□□□□ নিয়োগের ক্ষেত্রে কোন □□নে□ □□□□□ চুক্তি থাকেনা| তাদের ৮০% ই খাদ্যের □□□□ □ □□□□□□ □□ শোধ □□□□ বিভিন্ন গৃহে গৃহকর্মে যোগ □□□□ বাধ □□□ থাকে ।[৯৮] আইন ও সালিশ কেন্দ্রের তথ্য অনুসারে □□□□ সালে দেশে বিভিন্ন বয়সের □□ জন গৃহ পরিচারিকা নির্যাতনের শিকার হয়েছে। শারীরিক নির্যাতনের ফলে মারা গেছে ২০ গৃহ পরিচারিকা ।আবার তাদের উপর ধর্ষণের ঘটনাও ঘটেছে।

যা নিম্নের ছকে দেখানো হ'ল -

সারণী -৩০

গৃহ □□□□□□ নির্যাতন - ২০□□

নির্যাতনের □□ণ	□□□						□□□ উল্লেখ নেই	মোট	□□□□□	হত্যা
	□-□	□-□□	□□-□□	□□-□□	□□-□□	□□+				
□□□□□□ নির্যাতন		□	□		□			□	□	
ধর্ষণ		□	□				□	□	□	□
নির্যাতনের □□ণ উল্লেখ নেই(মৃত্যু)		□	□□	□	□	□	□	□□	□	
□□□□□□ নির্যাতন □□□ মৃত্যু	□	□	□		□	□	□	□□	□□	
আত্মহত্যা		□	□				□	□	□	

[৯৭]. প্রথম আলো (ক্রোড়পত্র), ২৮ ডিসেম্বর ২০১৩ এ প্রকাশিত ১৪ ডিসেম্বর প্রথম আলো আয়োজিত 'গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যান নীতিমালা ২০১০ অনুমোদন' শীর্ষক গোল টেবিল বৈঠকে প্রদত্ত সুলতানা কামালের বক্তব্য।

[৯৮]. সমকাল, ২৫ জুন ২০১০।

মোট	□	□□	□□	□	□	□	□	□□	□□	□ [99]

ছকটি পর্যালোচনায়ই দেখা যাচ্ছে কি পরিমান নিষ্ঠুর নির্যাতনের শিকার হচ্ছে অসহায় গৃহ পরিচারিকারা। ২০১০ সালে মোট ৭৭ জন গৃহপরিচারিকা ছকে উল্লেখিত মারাত্মক সব নির্যাতনের শিকার হয়েছে। এটি বন্ধ হচ্ছেনা, এই নির্যাতন চলছেই। আইন ও সালিশ কেন্দ্রের সর্বশেষ তথ্য অনুসারে □□□৪ সালে ৪১ জন নারী গৃহকর্মী নির্যাতনের শিকার হয়েছেন।[১০০]

গৃহকর্মী নির্যাতনের কয়েকটি বাস্তব এবং নিষ্ঠুর উদাহরণ

(১) □□□□□□□□ কাতরাচ্ছে গৃহকর্মী □□□

নির্মম নির্যাতনের □□□□ □□□□□□ গৃহক □□□ আক্তারের □□□ গাইবান্ধা □□□ □□□□□□□ বোয়ালী □□□□□□□□ দাক্ষি□ □□□□□□□□ গ্রামে। তা□ □□□ দিনমজুর আবদুল গফুর। ঢাকা□ উত্তরা□ গৃহকর্ত্রী□ নির্মম নির্যাতনের শি□□□ □□□□□ □□□ □□□□ পুলিশ উদ্ধা□ □□□ গাইবান্ধা আধুনিক □□□□□□□□ ভর্তি □□□□□ তার পেটের বিভিন্ন স্থানে ব□ □□ ফোসকা, □□□□ তালুতে □□□□□ □□, □□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□ □ গোটা □□□□ □□□□□□ চিহ্ন। পুলিশের □□□□□□□ অস□ অবস্থা□ □□□□ □□□ থেকে □□□ গাইবান্ধা আধুনিক □□□□□□□□ ভর্তি □□□□□ □□□ □□□□□□□□ জরুরি □□□□□ কর্তব্যরত ডাক্তার □□□□, □□□□ অবস্থ ভালো □□□ □□□ □□□□□ বিভিন্ন স্থানে অ□□□□□ চিহ্ন □□□ কোথাও কোথাও ফোসকা □ □□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□ প্রয়োজনীয় চিকিৎসার ব্যবস্থা নেওয়া □□□□□□ পুলিশ সুপা□ □□□□, □□□□□□ পেলে □□□□□□□□ বিরুদ্ধে □□□□□ ব্যবস্থা নেওয়া □□□□[১০১] (চিত্র ১০ ক, গৃহকর্মী লিলির ছবি) কিন্তু পুলিশ কেন অভিযোগ নেননি। সম্ভবত ওই পরিবারটি গরিব বলেই ।

(২) ঢাকায় গৃহকর্মী হিসেবে কাজ করতে গিয়ে নির্যাতনে নির্মমভাবে প্রাণ হারায় ময়মনসিংহের নান্দাইলের তাসলিমা আক্তার

পঞ্চম শ্রেণীর সমাপনী পরীক্ষা দিয়েই ময়মনসিংহের নান্দাইলের দিন মজুর আবুল কালামের বড় মেয়ে তাসলিমা (১৪) ঢাকার বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের সহকারী পরিচালক শহিদুল ইসলাম এর বাসায় কাজ নেয় । কিন্তু গত ১৭ এপ্রিল ২০১১ তারিখ রাতে তার কাফনবন্দী লাশ ঢাকা থেকে তার গ্রামের বাড়িতে পাঠানো হয়। নিহত তাসলিমার ওপর নির্যাতনের বর্ণনা দিতে গিয়ে তাসলিমার নানি কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। তিনি বলেন, ‘ঢাকা শহরের মানুষ কি সব আজরাইল অইয়া গেছে? গ্রামের মানুষ কুত্তারেও এইবায় মারিনা। তাসলিমার দাদী ফুলবানু বলেন, ‘নাতিনডারে মনে হয় চাবুক দিয়া মারতে মারতে মাইরা ফালাইছে। সারা শইলে শুধু লম্বা লম্বা কালো দাগ’। তাসলিমার মা হামেদা মেয়ের লাশ দেখার পর থেকে নাওয়া-খাওয়া বন্ধ

[৯৯].আইন ও সালিশ কেন্দ্র থেকে সংগৃহিত তথ্য।

[১০০] . আইন ও সালিশ কেন্দ্রের তথ্য, প্রথম আলো, ১ জানুয়ারী, ২০১৫।

[১০১].কালের কণ্ঠ, ৩ সেপ্টেম্বর ২০১১| (চিত্র ১০(ক) গৃহকর্মী লিলির ছবি)

করেছেন। বার বার মুর্চ্ছা যাচ্ছেন। আর চেতনা ফিরলেই মেয়ের নামধরে চিৎকার করে ডাকছেন। এই ঘটনায় নান্দাইল থানায় হত্যা মামলা করা হয়েছে।[১০২]

(৩) ডাষ্টবিনে পড়ে থাকা মানবতা

গত ২২ সেপ্টেম্বর রোববার বিকেলে বারিধারা ডিওএইচএস এলাকার একটি ডাষ্টবিনে জীবন্মৃত একটি ১১ বছরের শিশুকে অস্থি চর্মসার দেহ , হাত-পা শুকিয়ে কাঠ, পাঁজরের সব ক'টিহাড় গোণা যায়, শরীরে অনেকগুলো পোড়া ও জখমের দাগ, মাথা, চোঁখ, মুখমন্ডলে আঘাতের চিহ্ন যুক্ত জীবন্মৃত একটি শিশুকে উদ্ধার করেন দু'জন নারী। পরে এলাকাবাসী ও পুলিশের সহায়তায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মহিলা বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের আওতায় পরিচালিত ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টারে (ওসিসি) ভর্তি করানো হয়। খবর পেয়ে তার বাবা মা চলে আসেন হাসপাতালে। কেঁদে কেঁদে তার মা জানান, ''সোংসার চলেনা । কোন উপায় না দেইখ্যা দুই মাইয়ারে ঢাকায় কাজে দেছেলাম। আদুরিরে ৫০০ টাহা মাসিক ব্যাতন দেওয়ার কথা থাকলেও ওরা এক টাহাও দেয়নাই। ওরা আমার মাইয়াডারে এমনভাবে নির্যাতন করল ক্যান? বাড়িতে ফেরত পাঠাইয়া দেত।''

যদিও নির্যাতন কারী গৃহবধু ইতিমধ্যে গ্রেফতার হয়েছেন, পুলিশ বিভাগ ও সচেতেন ।[১০৩] হয়ত বিচার হবে, হয়ত হবেনা কিন্তু প্রশ্ন হলো আদুরীর লেখাপড়া না জানা মুর্খ মা বাবা যা বোঝেন তা শিক্ষিত অর্থশালী পরিবারটি বোঝেননি কেন? কাজ ভালো না করলে তাকে তার বাবা মায়ের কাছে পাঠিয়ে না দিয়ে মেরে ডাষ্টবিনে কেন? (চিত্র ১০(খ) ডাষ্টবিনে পড়ে থাকা মানবতা - জীবন্মৃত আদুরীর ছবি) ।

(৪) গৃহকর্মী কে বর্বরভাবে নির্যাতন, সটকে পড়েন দম্পতি

চুয়াডাঙ্গা জেলার জীবন নগর উপজেলার সুবলপুর গ্রামের শহীদুল ইসলামের মেয়ে আসমাউল। শহীদুল চুয়াডাঙ্গা বিএডিসির শ্রমিক। চার সন্তান ও স্ত্রী নিয়ে শহরের একটি বাড়িতে ভাড়া থাকেন। তাদের অভাবের সংসারে সহযোগিতার নামে দূর সম্পর্কের আত্মীয় অল্প বয়সের কন্যা আসমাউলকে নিয়ে শহরের এক প্রকৌশলী স্বামী ও চিকিৎসক স্ত্রী ও (রেজাউল-রত্না) র বাসায় তাদের শিশু সন্তানকে দেখাশুনার কথা বলে কাজে দেন। মেয়েটিকে কাজের ফাঁকে পড়াশুনা করাবেন এবং বিয়ে শাদীও দিবেন বলে আশ্বাস দেয়া হয়েছিলো। কিন্তু বাস্তবে মেয়েটিকে বর্বর কায়দায় নির্যাতন চালানো হয়েছিল।

আসমাউলের ভাষায়, ঢাকার ওই বাসায় এক বছর ধরে প্রায়ই তার উপর নির্যাতন চালানো হত। প্রতিদিন সকালে দুটি রুটি খেতে দিয়ে রেজাউল-রত্না কর্মস্থলে যেতেন। প্রায়ই বাড়ি ফিরতে তাদের সন্ধ্যা হত। তাই মাঝে মধ্যে ঘরে থাকা খাবার খেলে রত্না তাকে গরম খুন্তি দিয়ে ছ্যাঁকা দিতেন। কখনও খামচি দিয়ে রক্তাক্ত জখম করতেন। রাতে ঝিমুনি এলে চোখে আঘাত করতেন। কিছুদিন আগে দুপুরে না বলে ভাত খাওয়ায় গরম তাওয়া দিয়ে তার নিতম্বে ছ্যাঁকা দেয়া হয়। কোন চিকিৎসা না করিয়ে গত ১১ ফেব্রুয়ারী(২০১৪) মঙ্গলবার রাত ১১টার দিকে চুয়াডাঙ্গাগার বাসায় দিয়ে দ্রুত সটকে পড়েন তারা। নির্যাতনের শিকার গৃহকর্মী

১০২.প্রথম আলো, ২০ এপ্রিল ২০১১।

১০৩. প্রথম আলো, ২ এবং ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৩। ((চিত্র ১০(খ) ডাষ্টবিনে পড়ে থাকা মানবতা - জীবন্মৃত আদুরীর ছবি) ।

আসমাউলের মা শিল্পী খাতুন চুয়াডাঙ্গা থানায় অভিযোগ করেছেন।[১০৪](চিত্র ১০ (গ), নির্যাতনের চিহ্ন যুক্ত গৃহ কর্মী আসমাউলের ছবি)।

অর্থাৎ কোন অবস্থাতেই গৃহকর্মীরা মানুষ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছেনা।

৯. □□□□□□□ নির্যাতন

বাংলাদেশে □□□□□□□ নির্যাতন হ□□ পুরুষতন্ত্রে অন্যত□ □□□□□□□ □□□□ □□□ পুরুষের নিরংকুশ ক্ষমত, □□ন্ত্র□ □ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা এ□□ □□ □□□□ □□□□ জন পুরুষালি ক্ষমতার অপপ্রয়োগের □□□□ সংগঠিত □□ □□□□ □□□ □□□□□□□ নির্যাতন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সাম্প্রতিক □□□□ গার্হস্থ্য □□□□□□□ □□□ প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুসারে '□□□□□□□ □□□□□□□ ক্ষেত্রে ঝুঁকিপূর্ণ ৬টি দেশের মধ্যে □□□□□□□□□ অবস্থান অন্যত□ ।[১০৫]

□□□□□□□ □□□□ বিরুদ্ধে □□□□□□□ নির্মূল ঘোষণা □□ ডিক্লারেশন অন □□ □□□□□□□□ □□ ভায়োলেন্স এগেইনস্ট ওম্যান (□□□□) □ □□□ □□□□□, গৃহে স্বামী □□□□ □□□□□□□ অন্য কোন সদস্য দ্বারা সংঘটিত বিভিন্ন শোষণ □ বৈষম্যমূলক □□□□, □□□□□□ নির্যাতন, মেয়েশিশুর □□□ যৌন □□□□□, যৌতুকের জন্য নির্যাতন, স্বামী কর্তৃক ধর্ষণ, স্ত্রীর- অংগচ্ছেদ স □□□□ জন্য ক্ষতিকর অন্যান্য কর্মকান্ডসমূহ, □□ □□□□□□, যৌন □ □□□□□ □□□□□□□ পর্যায়ে প□□ সেগুলোকে □□□□□□□ নির্যাতন ব□□ □□□□ □□□ □□□□□ সমূহে স্বামী কর্তৃক স্ত্রী নির্যাতনের ঘ□□□ □□□□□ বেশী □□□ মারাত্মক[১০৬]

□□□□□□ নির্যাতন ঃ যেন একটি লুক্কায়িত বাস্তবতা (Social taboo)

বাংলাশের □□জ ব্যবস্থায় □□□□ □□□□□ স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্তা □□□□□□ মেনে নেয়া □□ □□□ □□□ সে মুখ বুজে □□ □□□□□□ সহ্য □□□ □□□ বাধ □□□ □□□□ □□ রাষ্ট্র □□□□□□□ নির্যাতনকে '□□□□ ব্যাপার' □□□□□□ □□□ নেয়। আবার পিতৃতান্ত্রিক স□□□ □□□□□□ সংগঠিত □□□□ □□ নির্যাতনের ঘ□□□ প্রথমে □□□□□□ দোষী □□□ □□□ □ □□ণে নির্যাতিতা নারী □□□□ মুখ খুলতে □□□□□ এ দেশের পুরুষতান্ত্রিক মূল্যবোধ, রক্ষণশীলত, □□□□□□□ বন্ধনের দায়বদ্ধত, চিন্তা - চেতনায় □□□□ ইত্যাদিও বিষয়টি গোপন □□□□ □□□□□ □□□ □□□□ মারাত্মক □□□□ □□□□ কেবল □□□ □□□□ চোখে □□□□ □□□ □□□□□□ □□□□ □□□ একটি □□□□□□□ নির্যাতন চিহ্নিত □□□ □□ □□□□ □□□□□□□ নির্যাতন এমন একটি বাস্তবত যা গোপন রাখার প্রবনতার মধ্যেই বিদ্যমান □□□□

□□□□□□ নির্যাতনের কার□

পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার □□□ ভিত্তি □□□ □□□ □□ বাংলাদেশের পরিবারগুলোতে □□□-পুরুষের □□□ ক্ষমত □□□ □□□, রাষ্ট্র □ □□□□□ □□□□ □□□ অবস্থানই □□□□□□□ নির্যাতনের মূল □□□ □□□□ কতগুলো উপলক্ষে □□□ □□□□□□□ নির্যাতন সংঘটিত □□□ □□□□

---

১০৪. প্রথম আলো, ১৪ ফেব্রুয়ারী ২০১৪। ((চিত্র ১০(গ), নির্যাতনের চিহ্ন যুক্ত গৃহকর্মী আসমাউলের ছবি)।

১০৫. খাদিজা লীনা ও চিররঞ্জন সরকার ঃ নির্যাতিত নারী উপেক্ষিত মানবাধিকার, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৯১|

১০৬. জাতিসংঘের ডিক্লারেশন অন দি □□□□□□□□ □□ ভায়োলেন্স এগেইনস্ট ওম্যান (□□□□)এর একটি ঘোষণা।

সেগুলো □'□-

- যৌতুক;
- □□□□ পরনির্ভরশীলতা;
- বাল্যবিবাহ;
- □□□□ □□□ পুরুষের নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব স্থাপন স্পৃহা;
- □□□□□□ - সাংস্কৃতিক মুল্যবোধে পুরুষের তুলনায় □□□□ মর্যাদা □□ □□□□□□ □□□□;
- পুরুষের বহুবিবাহ □□ বহুগামিতা স্পৃহা □□□□□□;
- ধর্মীয় কুসংস্কার □□□ ধর্মীয় মূল্যবোধের অপব্যাখ্যা
- □□□□□ স্বামী, শ্বাশুড় ও পুত্রবধু, পুত্রবধু-শাশুড়ী, □□□- □□□□□ □ □□□ □□□□□□□ পুরুষ সদস্যদের নেতিবাচক প্ররোচনা।

□□□□□□□ নির্যাতনের পরি□ □ প্রকৃতি

□□□□□□□ নির্যাতন সমূহ □□□□□□□ পরিমন্ডলে নিম্নে উল্লেখিত □□□□ সংগঠিত □□□ □□□-

□□□□□ □□ দৈহিক নির্যাতন

বাংলাদেশে একটি □□□□□□ □□□□ নির্যাতন শু □□ □□□ জন্মেরও □□□ - মাতৃগর্ভে বিদ্যমান ভ্রূণাবস্থা থেকে। মাতৃগর্ভেই ভ্রূণহত্যা, গর্ভবতী □□□□ □□□□□ স্বাস্থ্যসেবা ও খাদ্য থেকে বঞ্চিত □□□□□ □□নে শিশুটি গর্ভেই দুর্বল হয় □□□ পৃথিবীতে দুর্বল শিশু □□□□□ জন্ম নেয়। জন্মের □□□ শিশুটি না□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□ মেয়েশিশু জন্ম দেয়ার □□□□□ □□□□□ □□□□□□□ ক্ষেত্রেই □□□□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□□□ □ □□□□□□ নির্যাতন - স্বামীর দ্বিতীয় □□□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□□ □□□ □□□□□ মেয়েটি টিকে □□□ □□ □□□ □□□□ □□□ শশুরবাড়ির নির্যাতন □□□ □□ থাপ্পড় □□□□ থেকে শু □□□ পিটিয়ে □□ পুড়িয়ে মেরে ফেলার □□□□ পর্যন্ত বিভিন্ন □□নে□ □ মাত্রার □□□□□□ নির্যাতন □□□□□ সমূহের মধ্যে নিত্ত নৈমিত্তিক ঘ□□□□ □□□ □□□ □□□□□ □□□ □□□□□ □□□ বৃদ্ধাবস্থায় ও □□□□□□□□□ নির্যাতনের শি□□□ □□□ □□□□□

মানসিক নির্যাতন

দেশের □□□□□□ গুলোতে না□□□ □□□ □□□সি□ নির্যাতন একটি □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ নির্যাতন থেকে □□ পুরুষই □□□□ □□□□□ বিভিন্ন সুক্ষ্ম □□ স্থুল □□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□ নির্যাতন □□□□□□ □□□ যেমন অহেতুক স্ত্রীর চরিত্র □□□□ সন্দেহ □□ কটাক্ষ □□□, স্ত্রীকে □□□□ □□□□ □□ দেয়া, চাকুরি □□□ স্ত্রীর উপার্জিত অর্থ বিভিন্ন □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ নেয়া, স্ত্রীর □□□-□□, □□□□□□ সম্পর্কে □□□□□□□□□ □□□ □□□, □□□□□ □□□ যেতে □□ দেয়া, ঠিকমতে □□□-পোষণ □□ দেয়া, দূর্ব্যবহার □□ □□□□□□□□ □□□ □□□ সন্তানসহ □□ সন্তানকে □□□□□ □□□□ রেখে স্ত্রীকে তা□□□ □□□□ দেয়া ইত্যাদি। স্বামীর দ্বিতীয় □□□ □□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ প্রচন্ড □□□সি□ □□□□ □□□□□

যৌন নির্যাতন

যৌন নির্যাতন ব□□□ জোর পূর্বক যৌনাচার □□ □□□□ □□□□□ স্পর্শকাতর অঙ্গে □□□ □□ আক্রমণ □□□ বোঝানো □□□ বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক সংগৃহিত পরিসংখ্যান অনুসারে □□□ □□□□ ভেতরে - গৃহশিক্ষক, □□□□□/□□□□□/□□□□/ফুফাত ইত্যাদি দূর সম্পর্কের □□□ থেকে শু □□□ □□□/□□□/ খালু- □□□□ সৎপিতার দ্বারাও □ □□□□ নির্যাতনের শি□□ □□□ □□□□ □□□□ □□ স্বামী কর্তৃক জোরপূর্বক □□□□□□ (Marital rape) ক্ষেত্রে এই □□□□ বেশি □□□ □□□□□

<u>□□□□□□□ নির্যাতনের প্রতিক্রিয়া</u>

- নির্যাতন দেশ-□□□-□□□-□□□□□ অবস্থান ভেদে □□ □□□□□ □□□□ □ দুর্বল ব□□ তোলে। যেহেতু □□□□□ ক্ষেত্রে এটি একটি লুক্কায়িত বাস্তবতা □□□ □□□□□ সংঘটিত □ঞ্চ□-গঞ্জনা □□ □□□□□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□ পেরে □□□ □□□ □□□ দগ্ধ □□□ □□□□ □□□ মধ্যে □□□□□ উদ্বেগ, বিষণ্ণতা, নিদ্রাহীনতা ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দেয়। চূড়ান্ত পর্যায়ে □□□ □□□□ □□□ আত্মহত্যার □□ বেছে নেয়।
- □□□ নির্যাতনের প্রত্যক্ষ আর্থিক ক্ষতির মধ্যে □□□ নির্যাতনের ফলে □□□ □□□□ ক্ষতির জন্য চিকিৎসা ব্যয়, স্বাস্থ্যহানি, কর্মক্ষেত্রে যেতে □□ □□□, □□□ □ নিরাপত্তাসংক্রান্ত □□□, □□□□ বিচ্ছেদের ব্যয় ইত্যাদি। □□□□ প্রতি □□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ প্রতি □□□ অর্জিত □□□□□□ প্রায় দুই □□□□ শূন্য □□□ □□□ ক্ষতি হচ্ছে □ংকের □□□□ □□ □□□□ প্রায় □□ □□□□ □□কোটি □□□□ □□□□ কেয়ার □□□□□□ □□□□□□ □□□□ প্রতি □□□□□□ □□□□□ □□লাদেশ □□ জন্য □□□□ অর্থমূল্য দিচ্ছে শীর্ষক □□ সমীক্ষায় □ তথ্য □□□ □□□□□।[১০৭]
- □□□□□□□ নির্যাতনের শি□□ □□□□ সন্তানদের □□□ □ □□ নির্যাতনের মারাত্মক বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি □□□। গৃহ □□□□□□ □□নে শিশুরা □□□□ □□□□ □□ পেতে শু □□□ প□িবারের □□□□ ঘটনাগুলো দেখে □□□ □□□-□□□□ □□□ শ্রদ্ধা □□□□ ফেলে □□□ □□□□ □□□ শুনতে □□□ □□□ যেসব শিশু □□□□□□ নির্যাতন দেখে দেখে □□ □□ পরবর্তী □□□□ □□□□ □□□-ব্যবহার এগুলোর প্রভাব ফেলে □□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□ □□নে□ অনাকাঙ্ক্ষিত □□□□□□ □ □□□□□ পরিস্থিতিতে শিশুর স্ □□□□□□□□□□ প্রক্রিয়া দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত □□□
- □□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□ নির্যাতনের শি□□ □□□ □□□□□ যে কোন পর্যায়ে যে কোন □□□□ □ □□নে□ নির্যাতনের মুখোমুখি হও□□ একটি □□□□ □□□□ □□□□□□ নির্যাতন ব□□ একটি লিঙ্গভিত্তিক নির্যাতন।
- □□□□ □□□□□□□□ □□ণে□ একটি নিকৃষ্ট পন্থা □□□□□□ নির্যাতন। প□□□□□□ নির্যাতন কেবল □□□□ □□□□ □□□□□□ দুর্বিষহ □□□ এবং □□□ সক্ষমতার অপমৃত্যু □□□ তা □য়, □□□ গোটা □□□□□□□ □□ মাশুল □□□ □□□

১০৭. মানব জমিন, ১২ মে, ২০১১।

- বাংলাদেশে অন্তঃসত্ত্বা □□□□ □□□ □□□□□□ নির্যাতনের ঘ□□□□ খুব□ □□□□□ একটি ব্যাপার। গর্ভাবস্থায় যেখানে □□□□ □□□□ □□□□ □□□□, সাস্থ্য সুবিধা □ যত্ন □□□□□ □□□, সেখানে এগুলো □□□□ তো দূরে □□□, উল্টো □□□ □□□□□□ □ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□ অশিক্ষিত পরিবারের গর্ভবতী □□□রা। □□ণ□□□ □□ শিশুর অপুষ্টি, □□ □□□, □□□ □□□□□□ জটিলতা □□□□□ মৃত্যু পর্যন্ত হ□□ □□□□□ □□ পরিসংখ্যানে □□□ □□□ যে দেশে ঘন্টায় □ □□ অন্তঃস □□□□□ মৃত্যু □□□□ □□□□ □□ □□□□ □□ গর্ভকালীন সমস্য □□□ প্রসবকালীন জটিলতায় □□□ □□□□ □□ □□ □□□□□ □□□ □□□ □□□□□□□ □ মা□□□□ নির্যাতনের শি□□□ □□□□র □□□।[১০৮]

<u>□□□□□□□ নির্যাতনের পরিসংখ্যান</u>

□□□□□□□□ □□□□□□□ □র্যা□□ যেহেতু একটি লুক্কায়িত বাস্তবতা সেহেতু □ সম্পর্কে পর্যাপ্ত □□□ □র্ভরযোগ তথ্য □□□□□ খুবই কঠিন □□□□□ □ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ বৃদ্ধির পরিপেক্ষিতে □□□□□□□ নির্যাত□□□ বিষয়টি গণমাধ্যমে □□□□ শু □□□□□□

শাহেদা ফেরদৌসী মুন্নী □□□□□□□□□ □ □□□ □□□□□ □□□□□□□ একটি □□□□□□ প্রসঙ্গে জানান, “□ দেশে □□□□□ প্রতি □□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□ □□□ প্রায় □□□□□ □□ □□□□ সংঘটিত □□ □□□□□□□ মধ্যে এবং মোট খুনের □□□□□ □□□□□ □□ □□□ হচ্ছে স্বামী কর্তৃক স্ত্রী খুনের □□□□□ □□□□□□ের এক সুত্রের প্রসংগে তিনি আরও জানান, প্রাপ্তবয়স্ক □□□□□ □□□ □□□ পুরুষ □□□□□ □□□□□□ নির্যাতনের ক্ষেত্রে □□□□□□□□ স্থান বিশ্বে দ্বিতীয়, □□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□গুলোও □□% □□□ স্বামীর □□□□ □□□ □□□, □□% □□□ যৌ□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□ □□% □□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□”।[১০৯]

নিচের ছকে তা ২০১০ এর পারিবারিক নির্যাতনের শিকার এর একটি চিত্র স্পষ্ট করে দেখানো হ'ল -

<u>সারণী - ৩১</u>

□□□□□□□ নির্যাতন ২০১০								
ধরণ	বয়স					বয়স উল্লেখ নেই	মোট	মামলা
	□-□□	□□-□□	□□-□□	□□-□□	□□+			
স্বামী কর্তৃক নির্যাতন		□	□	□	□	□□	□□	□

[১০৮]. খাদিজা লীনা ও চিররঞ্জন সরকার ঃ নির্যাতিত নারী উপেক্ষিত মানবাধিকার, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৯০ -৯৬, এবং শাহেদা ফেরদৌসী মুন্নী ঃ পারিবারিক নির্যাতন, উন্নয়ন পদক্ষেপ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ০৭-২০।

[১০৯]. শাহেদা ফেরদৌসী মুন্নী ঃ পারিবারিক নির্যাতন, উন্নয়ন পদক্ষেপ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৩।

স্বামীর [illegible] কর্তৃক নির্যাতন				[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
স্বামী কর্তৃক হত্যা	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
স্বামীর [illegible] কর্তৃক হত্যা		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	৪৭	১৯
[illegible] [illegible]র কর্তৃক হত্যা		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
আত্মহত্যা	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible] [illegible]ারের সদস কর্তৃক নির্যাতন		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	
মোট	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible][১১০]

সারণী ৩১ দৃষ্টে [illegible] [illegible] দেশে বিভিন্ন [illegible] [illegible] নির্যাতনের শি[illegible] [illegible] [illegible]৭ [illegible] [illegible] [illegible] মধ্যে শুধু স্বামীর [illegible] প্রাণ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] স্বামীর [illegible] দ্বারা নির্যাতনের শি[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] গেছেন। স্বামী দ্বারা [illegible] নির্যাতনের শি[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নির্যাতনের সংখ্যা [illegible] বেশী [illegible] [illegible] [illegible] মাত্র [illegible]টি [illegible] থেকে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বেশী স্বামীর নির্যাতনের শি[illegible] হচ্ছে। [illegible] প্রতিবেদনে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]র সংখ্যা [illegible]টি [১১১]

আবার বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) কর্তৃক ভায়োলেন্স অ্যাগেইনষ্ট উইমেন(ভিএডব্লিউ) সার্ভে ২০১১ অনুসারে ঘরে স্বামীর দ্বারা কোন না কোন ধরনের নির্যাতনের শিকার হন ৮৭.৬% নারী। এর মধ্যে ৮১.৬% মানসিক, ৫৩.২% অর্থনৈতিক, ৩৬.৫% যৌন এবং ৬৪.৬% শারীরিক নির্যাতন ভোগ করে থাকেন। এ ছাড়া ৮৫% নারীর উপার্জনের অধিকার নেই এবং ১৯.১% নিজের ইচ্ছায় ভোট দিতে না পারা বাংলাদেশের নারীদের অবস্থার এক করুণ চিত্র।[১১২] (পরিশিষ্ট ২৫, বিবিএস কর্তৃক প্রদর্শিত পারিবারিক নির্যাতনের একটি সামগ্রিক তথ্য) ।

---

[১১০].খাদিজালীনা এবং চিররঞ্জন সরকার ঃ নির্যাতিত নারী উপেক্ষিত মানবাধিকার(আইন ও সালিশ কেন্দ্রের তথ্য থেকে উদ্ধৃত), পূর্বোক্ত, পৃঃ ৯১।

[১১১].পূর্বোক্ত, পৃঃ ৯১।

[১১২]. Report on Violence Against women (VAW) Survey 2011, Bangladesh Bureau of Statistics (BBS), Statistics and Information Division(SID), Ministry of planning, Govt. of peoples republic of Bangladesh and UNFPA, পৃঃ xx এবং নারী নির্যাতন, এখনই প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে' - শীর্ষক সম্পাদকীয়, প্রথম আলো , ২৬ জানুয়ারী ২০১৪ ।(পরিশিষ্ট ২৫, বিবিএস এর উল্লেখিত সার্ভে রিপোর্টে প্রদর্শিত পারিবারিক নির্যাতন এবং নারীদের অবস্থানের একটি সামগ্রিক চিত্র)।

□□□□□ উল্লেখ যে, □□ দেশেই □□□□□□□□ নির্যাতনের ঘ□□□ □□ বেশী □□□□□ উন্নয়নশী□ দেশগুলোতে □□□□ □□□□ □□□ □□□ খুব □□□ প্রকাশ □□□□ সুতরা□ পরিসংখ্যানে যা দেখা □□□ বাস্তবে দেশের অবস্থা □□□ চেয়ে □□□□ □□□□□□

পারিবারিক নির্যাতনের কয়েকটি ভয়ংকর চিত্র

(১) স্ত্রী আবার পড়াশুনা করতে চায়? কত্ত বড় অপরাধ, দাও কেটে তার হাত

দুবাই প্রবাসি স্বামী রফিকু□ □□□□□, দুবাই থেকেই □□□ □□□□□□□□ সদস্যদে□ □□□□ □□□□□ □□□ যে □□□ স্ত্রী জুই □□□ □□ □□ পরীক্ষা □□□□□ - □ □□□□□ সে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। দুবাই প্রবাসি স্বামী □□□ স্ত্রীর আনুগত্যহীনতার □□□ প্রকাশ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□ দেশে □□□ □□□□□ □□ □ ডিসেম্বর ২০১১ □□□ □□□ □□ □□ পরীক্ষার্থী স্ত্রী জুইবে □□□□□ □□□ □□□□□ বোনের বা□□□ ডেকে □□□ বোনদের □□□□□□□ একা□ কক্ষে □□□ □□□ □□□ □□□□□ আঙ্গুল গুলো কেটে □□□□□ন।[১১৩] তবে জুই দৃঢ় প্রতিজ্ঞ সে চিকিৎসা শেষে পরীক্ষা দিবেই এবং দিয়েছেও। লড়াকু জুই তার খালাতো বোনের সহায়তায় পরিক্ষা দিয়েছে এবং 'এ' গ্রেড পেয়েই এসএসসি পাশ করেছে। তারস্বপ্ন এখন বিচারক হওয়া। তাঁর স্বামী রফিকুল ইসলামের লাভ কি হয়েছে? তিনি আজ পর্যন্ত ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারে আছেন।[১১৪] শক্ত মনের জুই জীবনে এগিয়ে গিয়ে সফলতার শিখরে পৌঁছবে - এই প্রত্যাশা সকলের।

□ □□□□□ □□□ সাহিত্যিক □□□□ □□□□□ □□ □□ জানুয়ারী □□□□ সোমবার প্রথম □□□□ পত্রিকা□ যথার্থই বলেছেন, "... .. যে □□□□ □□□□ প্রবা□ জুইকে □□□ □□□ □□□□□ □□ ধ্বংসাত্মক পরিস্থিতি থেকে জুই নি□□□□ □□□ □□□□□□□, □□ □□□□□ □□□- □□□□ অনুভূতিকে □□□□ দেয়না, □□□ মস্তক □□□□□ □□□ □□□□□ .. .. □□□ প্রচেষ্টা □□□□ □□□□□ জেদ, □□□□□□, আত্মপ্রত্য □□ □□□□□ □□ □□□□□□ - পরিস্থিতিতে বাধাবিঘ্ন চুরমার □□□□ □□□□ শা□ □□□□□, □□□ □□□? □ মুহূর্তে জুইয়ে□ আঙ্গুলছাটা □□□ □□□□□ □□□ চোখে □□□□, □□□ □□□□ □□□□ ছেড়ে যাচ্ছে। জুই, □□□ দেখতে পাচ্ছি তুমি তোমার □□□□□ □□□□ প্রচেষ্টায় এ□□□ যাচ্ছ □□□□□□□ তুমি □□□□□□□ □□□□□□ □□□ শুভ □□□□□□ কিছু □□□ □□□□□□, তবু □□□ □□□□□ থাকো জুই।[১১৫]

(২) তিনি পুলিশ, তাঁর হাতে আইন প্রয়োগ হবে অন্যের বেলায়, নিজের বেলায় নয়

গত ৪ ডিসেম্বর ২০১২ রাতে যশোরের কেশবপুর থানার ষ্টাফকোয়ার্টারে একজন পুলিশ কনষ্টেবল তার স্ত্রীকে নৃশংসভাবে পিটিয়ে হত্যা করেছে। রাত ১০টায় কোয়ার্টারের অন্য পুলিশ সদস্যরা সুমি বেগমকে মুমূর্ষু অবস্থায় কেশবপুর হাসপাতালে নিয়ে গেলে রাতেই তার মৃত্যু হয়। সুমি বেগমের মাথা, ডানচোখ, বামকান ও গলায় মারাত্মক আঘাতের চিহ্ন ছিল। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের কারণে তাকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি।[১১৬]

---

[১১৩].প্রথম আলো, ২১ জানুয়ারী ২০১২।

[১১৪].আমাদের সময়, ২০ সেপ্টেম্বর ২০১৩।

[১১৫].প্রথম □□□, □□ জানুয়ারী □□□□।

[১১৬] .আমাদের সময়, ৬ ডিসেম্বর ২০১২।

(৩) পারিবারিক নির্যাতনের হাত থেকে রেহাই নেই শিক্ষিত চাকুরীজীবি নারীদেরও -তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ রুমানা মঞ্জুর

সাম্প্রতিক □□□□ □□□□□□□ নির্যাতনের ঘ□□□ সমূহের মধ্যে সর্বাধিক আ□□□□□ □□□ □□□□□□ সৃষ্টিকারী □□□□ □□□□ □□□□ বিশ্ব বিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক □□□□□□ □□□□□□ অধ্যাপক রুমানা মনজুরকে □□□ স্বামী □□□□□ □□□□ কর্তৃক নির্যাতনের ঘ□□□। এটি একজন □□□□□□ সৃষ্টি □□□□□ যে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত, □□□□□□□□□ সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ □□□□ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক □□□ □□□□□□ ইউনিভার্সিটি অব ব্রিটিশ কলোম্বিয়া (□□□□□)থেকে মাস্টার্স ডিগ্রী অর্জনের শেষ পর্যায়ে এ□□ পৌঁছোছিলেন। □□□□ □□□□□ আগষ্ট □□□□ □□□□□□ ব্রিটিশ কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষার জন্য শিক্ষাবৃত্তি নি□□ □□□□ □□ □□□ মে □□□□ □□□ দেশে ফেরেন। অক্টোবর □□□ □□□□□ □□□□ □□□ □□□□ণা পত্র (□□□□ পেপার) □□□ দেয়ার □□□□।[117]
(চিত্র ১০ক, চমৎকার এক রুমানা নিজ কন্যাটি সহ)।

এই রুমানাই নির্মম ভা□□ স্বামীর নির্যাতনের শি□□□ □□□ □□□□□ □□□□ মারাত্মক □□□ হন এবং দু'টি চোখ □□□□□ অন্ধ হয়ে যান।

রুমানা মনজুরের □□□ নির্যাতনের ঘ□□□ □□□□ রুমানার বক্তব্য □□□, □ জুন(□□□□) □□□□□□ □□□ □□□ একমাত্র মেয়েকে □□□□ □□□ □□□□□□ □ □□□□ স্বামী □□□□ □□□□ □□□ □□□ ঢুকে ভেতর থেকে □□□□ □□□□□ দেন। কিছু বুঝে □□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□□ □□□□ □□□ দুই চোখে আঙ্গুল ঢুকিয়ে খোঁচাতে □□□□□ □□□ ব্যথায় আর্তনাদ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□ পর্যায়ে স□□□ □□□ □□□□□ □□□ □□□ □□□ □□□ টিপে শ্বাসরোধ □□□□ চেষ্টা □□□□□ □□□□ □□□ □□□□ অগ্রভাগ □□□□□ □□□□ নেন। □□□□ □□□ □□□□□ □ □□□ □□□ □□□□□□ □□□□□, ঠোঁট □ □□□□ □□ স্থানের মা□□ □□□□ ফেলেন।

রুমানা □□□ □□□□, □□□□ □□ থেকেই □□□□ □□□ □□□ নির্যাতন ক□□□□□ □□□□□ পুর্বে □□□□ বুয়েট থেকে স্নাতক □□□□□□ □□□ □□□ □□□□□ □□□ □□□ □□□□□ □□□□, □□□□ □□□□ তৃতীয় বর্ষ পর্যন্ত □□□□□□□ চোখে □□ দেখার বিষয়টিও □□□□ গোপন □□□□□□□□ রুমানা □□□ □□□□, □□□□ □□□□ সন্দেহ □□□□□, □□□ ঈর্ষাপরায়ন □□□□□ □□□ □□নে □□□□ হীনমন্যতায় ভুগছিলেন □□□ □□□□□□□□□□ তাঁকে হত্যার চেষ্টা ক□□□।[118]

রুমানার পারিবারিক ঘনিষ্ঠজনদের সূত্রে জানা যায়, স্বামী হাসান সাইদ রুমানার বাবা মেজর(অব.) মনজুর হোসেনের ধানমন্ডির বাড়িতে ঘরজামাই থাক□□□□ □□□ □□□□, বেকার। তাদের ৬ বছরের মেয়েটির নাম আনুশা। হাসান সাইদ যেমন উচ্চ শিক্ষার জন্য রুমানার কানাডা গমনকে মেনে নেননি, তেমনি রুমানাও হাসান সাইদের ইটের ভাটা ও মিশুকের ব্যবসা পছন্দ করতেননা।[119]

রিমান্ডে থা□□ □□□□ □□□□ □□□ কর্মকর্তাদের জা□□□□□□ যে, □□□ রুমানাকে সন্দেহ □□□□□ □□□ □□□ হীনমন্যতায় ভুগতেন □□ □□শে মে ২০১১ □□□ রুমানাকে □□ □□□ বেধড়ক □□□□□ □□ □□ রুমানা □□□□ □□□□ দেয়ার সিদ্ধান্তের কথা □□□□□ দেন। □□□□ □□□ রুমানার □□□ ক্ষিপ্ত □□□ □□□□ □□□ হত্যার পরিকল্পনা নেন। পরিকল্পনা অনুযায়ী □□□ □ জুন ২০১১ রুমানার □□□ □□□□ □□□□□□ সুযোগ পেয়ে □□

---

[117] . আমাদের সময়, ১৪ ই জুন, ২০১১। (চিত্র ১১ ক, চমৎকার এক রুমানা নিজ কন্যাটি সহ)।

[118] . প্রথম আলো , ২৩ জুন ২০১১।

[119] . আমাদের সময়, ১৫ জুন, ২০১১।

□□□□ □□□□□□ □□ □□□ রুমানার □□ গ্রামের বা□□□□ □ □□□ □□□□ কর্মস্থলে □□□□□□ □ সুযোগে রুমানার □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□□ □□□□□□ গলাটিপে শ্বাসরোধে হত্যার চেষ্টা □□□□, দুই চোখে আঙ্গুল ঢুকিয়ে দেন, □□□□□□ □□□□□□ স্থানে কা□□□□ দেন। □□ পর্যায়ে বা□□□ গৃহকর্মীরা বিকল্প □□□ □□□□ □□□□ খুলে ভেতরে ঢুকে রুমানাকে রক্ষ □□□□□[১২০]

□ জুন ২০১১ □□ বর্বর ঘটনাটি □□□, □□ জুন ২০১১ □□□□□ □□□□□□ গ্রেফতার □□□ পুলিশ মুখ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□ রিমান্ডে নেন।[১২১]

□□□□□□□ □□□ □□□□□ চিকিৎসায় কোন প্রতিকার □□ পেয়ে রুমানাকে □□□□□ নেয়া □□□ কিন্তু □□□□□ □□□□□ দেখা গেছে □□□ □□□ চোখটি □□□□□□□ নষ্ট □□□ গেছে। □□□ চোখের □□□□ কিছুটা □□□ □□□□□□ সেই □□□ চোখ প্রতিস্থাপনেও অপটিব নার্ভ □□□ □□□□□□□ □□□□□□ ভ্যানকুভা জেনারেল □□□□□□□ রুমান □জ্ঞু□□ □□□□□□□ অস্ত্র □□□□ □□□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□□□ □ □□ সার্জন □□□ □□□ চোখ প্রতিস্থাপন □□□□□ কিন্তু চোখের অপটিব □র্ভ কাজ □□□□□□□ □ □□□□□ সেখা□□□□ চিকিৎসকরা রুমানার □□□□□ কোন □□□□ □□□ শোনাতে □□□□□□□ □□□ □□□□□□, চোখ প্রতিস্থাপনের প□ চোখের অপটিব নার্ভ কাজ □□ □□□□ রুমান □□ কোন □□□ দেখতে □□□□□□ □ জুলাই ২০১১ থেকে □□□□□ অবস্থা □□□□□ রুমান।[১২২] (চিত্র- ১১(খ), অন্ধ রুমানা) ।

ইতিমধ্যে রুমানার স্বামী হাজতে মৃত্যু বরণ করেছেন। আর রুমান □□□□□□□ □□□ দু'টি চোখ, অন্ধদের লাঠি ভর করে হাঁটছেন এখন রুমানা।[১২৩]

কিন্তু রুমানা পরাজিত হননি। ব্রেইল পদ্ধতিতে সব কিছু শিখে তিনি গত ২৮ জুন ২০১৩ কানাডার ইউনিভার্সিটি অব ব্রিটিশ থেকে মাষ্টার্স ডিগ্রী অর্জন করেছেন। তিনি এখন ইউনিভার্সিটি অব ব্রিটিশ কলম্বিয়ায় আইন বিষয়ে পড়াশুনা করবেন। আর সবার প্রার্থনা সঙ্গে করে রুমানা এগিয়ে যেতে চান অনেক দূর। পড়াশোনা শেষ করে কাজের ক্ষেত্রে প্রবেশ করতে চান তিনি। তিনি বলেন, 'অন্ধ হয়ে গেছি বলে কাজ করবনা, এমন যেন না হয়। দেশের সবার দোয়া চাই আমি'।[১২৪] (চিত্র ১১ গ, অন্ধের লাঠিহাতে রুমানা)।

রুমানার স্বামী আজ বেঁচে থাকলে নিশ্চয়ই বুঝতে সক্ষম হতেন, যে কাজটি তিনি করেছেন তা যথার্থ ছিল না।

(৪) আরেক শিক্ষিত নারী শেজাদী

রুমানা মনজুরের পর আরেক শিক্ষিত নারী শেজাদী। গত ৩ মে ২০১৩ সাল। কুমিল্লার ময়নামতি সেনানিবাসে চিকিৎসক স্ত্রী শেজাদী আপসাকে পেটাতে পেটাতে মেরেই ফেলেন তার সেনা কর্মকর্তা স্বামী। তাদের বিয়ে হয়েছিল ২০০০ সালে। আর মারধরের ঘটনা শুধু এইদিনেই নয়। শেজাদীর পারিবারিক সূত্র থেকে জানা যায় দাম্পত্য জীবনের শুরু থেকেই মারধরের ঘটনা। তা ঘটেছে অনক। শেষ পর্যন্ত মৃত্যুই

---

১২০. প্রথম আলো , ২৪ জুন ২০১১।

১২১. প্রথম আলো , ১৭ এবং ২৪ জুন ২০১১।

১২২. আমাদের সময়, ১৭ জুলাই, ২০১১।(প্রামাণ্য চিত্র ১১খ, অন্ধ হয়ে যাওয়া রুমানা)

১২৩. প্রথম আলো, ১৭ জুলাই ২০১৩।

১২৪.প্রথম আলো, ১৭ জুলাই, ২০১৩। (চিত্র ১১ গ, অন্ধের লাঠিহাতে রমানা)।

হয়েছে তার পরিণতি। দুজনেই উচ্চশিক্ষিত এবং সমাজের উচ্চতর অবস্থানে বিদ্যমান। তবু কেন এই পরিস্থিতি ?[১২৫]

(৫)শুধু হত্যা করেই তৃপ্ত নন স্বামী, লাশ টুকরো টুকরো করে গুম করার প্রচেষ্টা

স্ত্রী ফারহানা ইয়াছমিন মিলিকে (৩০) গলাটিপে শ্বাসরোধ করে হত্যা শেষে লাশ ৪ টুকরো করে গুম করতে গিয়ে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে ঘাতক স্বামী সাইফুল ইসলাম চৌধুরী জুয়েল(৩৫)। মিলি, বাগের হাটের রামপাল উপজেলার ঝনঝনিয়া গ্রামের মহিউদ্দিন শেখের কন্যা। আর জুয়েল ফেনীর ছাগলনাইয়া উপজেলার শুভপুর ইউনিয়নের দক্ষিন বলøভপুর গ্রামের ওসমান গণি চৌধুরী নামের ড্রাইভারের ছেলে। মিলি ছোট বেলায় তার পিতাকে হারায়। রামপাল কলেজ থেকে সে ডিগ্রী পাশ করে। ডিগ্রিতে পড়ার সময় মোবাইল ফোনে পরিচয়ের সূত্র ধরে প্রেমের মাধ্যমে ২০০৮ সালের ৯ আগষ্ট খুলনার বাগমারা প্রধান সড়ক কাজী অফিসে ১ লক্ষ ১ টাকা দেনমোহরে মিলি ও জুয়েলের বিয়ে হয়।

বিয়ের পর জুয়েল- মিলি দম্পতি চট্টগ্রাম নগরের বন্দর থানায় নিউমুরিং আবাসিক এলাকায় বাড়ি ভাড়া করে থাকতে শুরু করে। জুয়েলের এটি দ্বিতীয় বিয়ে এই বিষয়টি প্রকাশ হওয়ার পর জুয়েল ও মিলির দাম্পত্য জীবনে কলহ শুরু হয়। কলহের এক পর্যায়ে জুয়েল মিলিকে গলাটিপে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করে। এখানেই শেষ নয়। সে মিলির লাশকে ৪ টুকরো করে কাটে। দুই টুকরো বাসার ফ্রিজে রেখে বাকি দুই টুকরো মাছের কার্টুনে ভরে নিয়ে যাওয়ার পথে পুলিশের হাতে ধরা পড়লে জুয়েল ঘটনার সব কথা স্বীকার করতে বাধ্য হয়। মিলির আত্মীয়-স্বজন কর্তৃক মামলা করতে গিয়ে জুয়েল কর্তৃক বিয়ের কাবিনে ভুল নাম ঠিকানা ব্যবহারের তথ্যও উদঘাটিত হয়।[১২৬]

অর্থাৎ মিলির সাথে প্রেম ভালোবাসার অঙ্গিকার, বিয়ে এবং দাম্পত্য জীবন চলা সব অবস্থায়ই জুয়েল প্রতারনার অবস্থানে ছিল। আর মিলি ছিল বিশ্বাসের পর বিশ্বাসের স্তরে। সব শেষে মিলিকে শ্বাসরোধে হত্যা করেও জুয়েলের স্বাদ মেটেনি। লাশের প্রতিও তার বিন্দুতম মায়া হয়নি। লাশের সাথেও সে করে ভয়ংকর আচরণ। চারটুকরো করে কেটে দুই টুকরো সামাল দেয়ার প্র্রচেষ্টায় নামে। জুয়েল নামের এই ব্যক্তিটি কি মানুষ নাকি নরপশু? কাকে ভালোবেসেছিল মিলি?

(৬) স্বামীর পরকিয়ায় বাধা দেওয়ার শাস্তি কত কঠিন

পরকিয়ায় বাধা দেওয়ায় স্বামীর হাতে অমানবিক নির্যাতনের শিকার হয়েছে বরগুনা সদর উপজেলার বদরখালি গ্রামের দরিদ্র গৃহবধু ছবিরানী (৩৫)। তিনদিন ধরে অমানবিক নির্যাতনের পর শরীরের ক্ষত স্থান গুলোয় চুন ও লবন লাগিয়ে দফায় দফায় নির্যাতন করা হয়েছে তাকে। খবর পেয়ে নির্যাতিত ওই গৃহবধুকে উদ্ধার করে বরগুনা জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করেছেন স্থানীয় নারী নেত্রীরা। এ ঘটনায় ছবির স্বামী রবিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।[১২৭]

(৭) স্ত্রীকে অবিশ্বাস অতঃপর হত্যা

প্রায় পাঁচ বছর আগে ভালোবেসে বিয়ে করেছিলেন পোষাক শ্রমিক মিলন হোসেন (২২) ও সালমা আক্তার (২০)। কিন্তু এক বন্ধুর কথা বিশ্বাস করে ভালোবাসার মানুষটিকে অবিশ্বাস করেন মিলন। সেই অবিশ্বাসের ক্রোধে হত্যা করেন স্ত্রীকে। পরে আত্ম সমর্পণ করেন পুলিশের কাছে। গ্রেফতার অবস্থায় তিনি প্রথম

---

[১২৫] .প্রথম আলো, ২৯শে মে ২০১৩।

[১২৬]. আমাদের সময়, ২৪ এপ্রিল ২০১২।

[১২৭] .আমাদের সময়, ৫ জুন ২০১৩।

আলোকে বলেন,' আমি ওকে (সালমা) অনেক ভালোবাসতাম। ওর জন্য অনেক কিছু ছাইড়া দিছি। তারপরও ও নাকি কার সাথে প্রেম করত। সত্য-মিথ্যা যাচাই বাছাই না কইরাই ওরে মাইরা ফালাইছি'। [১২৮]

(৮) সন্তানদের সামনে মাকে খুন করলেন বাবা

নেশার টাকা না পাওয়ায় রংপুরের কামালকাছনা এলাকায় গত ১২মার্চ ২০১৪ ভোরে দুই সন্তান ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজের দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রী জুবাইদা আক্তার জান্নাতী ও জাহেদ হাসান সাদনানদের সামনে স্ত্রী সোমাকে পিটিয়ে ও বালিশ চাপা দিয়ে হত্যা করেন জাহাঙ্গীর আলম। অতঃপর সে পলাতক।[১২৯]

এই হলো বাংলাশের পারিবারিক অবস্থা!

১০. আত্মহত্যা

□□□ □□□□□ □□□□ খুন □□□□□□ □□□ □□ হত্যা □□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ খুন □□□□□ □□□ □□ - আত্মহত্যা। মানুষ পৃথিবীতে স□□□□□ বেশী □□□□□□□□ □□□□□□| □□□□□ পেট থেকে জন্মে □□ প্রথমে □□ □□□□□ □□□□ □□□ □□□□□ □□□□ যত্নে □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□ তোলে □□□□ যে □□□□ সেই □□□□□□ বেশী □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□ খুন □□□ □□ □□□? □□□□□□? □□□ কেন?

আত্মহত্যার ব□□□

□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□ থেকে □□□□□ ক্রমাগত □□□□□, ক্ষোভ, অসহায়ত্ব □□□ □□□□ □ তীব্র □□□ □□□ □□□ ক্রমাগত সে □□ □□□□□ □□□□□ □□□ □□□ □□□ □□□ সম্মুখে □□□□□ □□ কোন □□ □□□□□ □□□□ মানুষ □□□□□ □□□□ আত্মবিধ্বং □□□ □□□□

বিষন্নতাভোগীদের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা বেশী। বিষন্নতা, তিক্ততা, □□□□, প্রতিশোধ, বিদ্রোহ, প্রত্যাখ্যানকে আত্মহত্যার প্রধান □□□□ □□□□□□ সমাজে দেখা যায়| □□□□ পেছনেও □□□□□ □□□ □□□□ □□□□□ তন্মধ্যে - স্বামীর □□□□□□, স্বামীর □□□□□, প্রেমে ব্যর্থতা, □□□ নির্যাতন, ধর্ষণ, যৌতুকের জন □□□, উত্যক্ত □□□, নিরাপত্তার □□□□, □□□ □□□□□ সান্নিধ্য না □□□□□, পরীক্ষায় ফেল □□□ □ আত্মীয় □□□□□□□ □□□□ অন্যতম

শিক্ষার্থীদের আত্মহত্যার পেছনে উদ্বেগ, □□□□, বিষন্নতা, এডজাষ্টমেন্ট সমস্যা, অহেতুক □□, সম্পর্কগত সমস্যা, বিশ্বাসের অ□□□ □ □□□□□□□□□ সমস্যা অন্যতম

□ □□□ □□□□□□ □ পারিপার্শ্বিক অন্যান্য □□□□□ □□□□ □□□□□□ বিশেষজ্ঞরা। □□□□□□□ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক □□. □□□□ মোহাম্মদ □□□□□ □□□ছেন, "বিভিন্ন □□□□□□ দেখা গেছে, □□□□□□□ বিষন্নতায় ভোগে ৫□ □□□, সিজোফ্রেনিয়ায় ভোগে □□ □□□, মাদকাসক্তিতে □□ □□□ □ □□□ □□ □□□ অন্যান্য □□□□□

---

[১২৮]. প্রথম □□□, শুক্রবার, ৭ জুন ২০১৩।

[১২৯]. আমাদের সময়, ১৩ মার্চ ২০১৪।

বিষন্নতাভোগীরা বেশী আত্মহত্যা □□□"। □□□ □□□□, "□শ্চিমা বিশ্বে বয়স্ক লোক বেশী আত্মহত্য □□□□ □□ □□□□□ দেশে বেশী আত্মহত্যা □□□ □□□□□- □□□□□□"। ভৌগোলিক কা□□□ □ অবস্থ □□ □□□ □□□ □□□□□ □□□ □□□ □□□□, " □□□□□ দেশে মেয়েরাই বেশী বিষন্নতায় ভোগে। বিষন্নতায় □□□□ পুরুষ ভোগলে মেয়ে ভোগে □□□□□□ □□ পেছনে বিভিন্ন □□□□ □□□□□□ প্রেম-□□□□, যৌনপীড়ন, □□□□□□□ নির্যাতন স□ □□□ □□□□□□ বঞ্চনা□ □□□□□ □□ □□□□□□ □ □□□□□ □□□ □□ □□□ আত্মহত্যার □□ বেছে নেয়"।[১৩০]

আইন ও সালিশ কেন্দ্রের নির্বাহী পরিচালক সুলতানা কামাল বলেন, "একটি মেয়েকে যখন বখাটেরা উত্যক্ত করে, তখন সে ঠিকমতো আশ্রয় পায়না। অনেক ক্ষেত্রে পরিবার, সমাজ তাকে দূরে ঠেলে দেয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে অপরাধির কোনো সাজা হয়না । তাই আক্রান্ত মেয়েটি আরও বেশী নিগৃহীত হয় । সে মনে করে, আত্মহত্যা করা ছাড়া তার কোন পথ খোলা নেই" ।[১৩১]

আত্মহত্যার প্রতিক্রিয়া

আত্মহত্যার প্রতিক্রিয়া মারাত্মক এটি □□□ একটি □□□□ □□ পূর্ব থেকে □□□□ □□□□□□ □□□ প্রতিরোধ মূলক কোন ব্যবস্থা গ্রহণ □□□ সম্ভব □□□□। আত্মহত্যার উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য □□□ □□□□ □□ দন্ডবিধির ৩০৯ ধারানুযায়ী কিন্তু আত্মহত্যা কার্যকর □□□ গেলে খুনীর বিরুদ্ধে □□□□□□ কোন সুযোগ নেই। □□□□ আত্মহত্যার প্ররোচনা একটি স□ □□□□□□ প্ররোচনাকারীদের বিরুদ্ধে দন্ডবিধির ৩০৬ □□□□ □□□□□ □□□□ সুযোগ □□□□ কিন্তু যেহেতু ভিকটিম □□□□ শেষ □□□ □□□ □□□ □□□□□ আশ্রয় নেয়ারও কেউ □□□□□□ □□□ আত্মীয় স্বজনের □□□□□ আশ্রয়ে গেলেও শেষ পর্যন্ত ম□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ উৎসাহ □□□□□□ □□□ সাক্ষী-সাবুদের □□□□ □□ পর্যায়ে ম□□□□ নিষ্পত্তি হ□□ □□য়।

□□□ □□□□□□□ অন সদস্যর (তাদের সন্তান থাকলে তারা, আবার মা বাবা ভাইবোনেরা) □□□ায়ত্বের মধ্যে □□ □□□ □□ পৃথিবীর □□□□□, □□□□□□□ প্রতি □□□□□ ক্ষোভ নি□□□, প্রতিশোধ স্পৃহা □□□□ □□□□ □□ □□□ □□□□□□ □□তে থাকে শান্তির মারাত্মক বিপর্যয়।

আত্মহত্যার পরিসংখ্যান

□□□□□□□□ সাম্প্রতিক □□□□ □□□□□□ আত্মহত্যার বেশ কয়েকটি □□□□ লক্ষ্যনীয় □□□ □□□□□□ □□ □মে □□□□ সংখ্যায় □□□□□□□ □□□ দৈনিক পত্রিকায় পুরুষের চেয়ে □□□□□□ আত্মহত্যার প্রবণত □□□□ গুন বেশী □□□□□□□□ প্রকাশিত □□□ □□□□ - "দেশে □□ □□□□ আত্মহত্যার প্রবনত □□□□ গুন বেড়েছে। পুরুষের চেয়ে □□□□□□ আত্মহত্যার পরিসংখ্যানের পাল্লাও আড়াইগুন বেশী। □□ আত্মহত্যার পথযাত্রী □□□□□□ মধ্যে □□□□□□ □ তরুনীদের সংখ্যাই বেশী । □□□□□□□ □□□□□□□□□ বাস্তবায়ন সংস্থার □□ □□□□□ □□□□ গেছে, □□ এপ্রিল ২০১১ □□□□ আত্মহত্যা □□□□□□ □□ □□□□ □□ মধ্যে □□ □□ □□□□ □ □□ □□ পুরুষ। মার্চ □□□□ আত্মহত্যা □□□□□□ □□ □□□□ □□ মধ্যে □□ □□ □□□□ □ □□ □□ পুরুষ। জানুয়ারী □ ফেব্রুয়ারী □□□□ আত্মহত □□□□□□ □□ □□ □□□□ □ □□ □□ পুরুষ। □□□□ □□□□ □□□□ দেশে আত্মহত্যা □□□□ □□□ □□□ □□ মধ্যে □□□□ □□□ □□ □□□□ □ পুরুষ □□ □□□ □□□□ □□□□ আত্মহত □□□□□

---

[১৩০]. আমাদের সময়, ৪ মে ২০১১।

[১৩১]. প্রথম আলো, (বিশেষ প্রতিবেদন) , ১৩ সেপ্টেম্বর , ২০১৩।

[illegible] মধ্যে [illegible] পুরুষ”।[১৩২] আইন ও সালিশ কেন্দ্রে (আসক) সংরক্ষিত তথ্য অনুযায়ী ২০১৩ সনের - জানুয়ারী থেকে জুন পর্যন্ত উত্যক্তের শিকার হয়ে ১১ জন নারী, পারিবারিক নির্যাতনের কারণে ২৬ জন নারী , নির্যাতনের শিকার হয়ে চার জন গৃহপরিচারিকা, যৌতুকের কারণে ১২ জন নারী, ধর্ষণের শিকার হয়ে ১১ জন নারী আত্মহত্যা করেছেন।[১৩৩]

আবার বাংলাদেশ জার্নাল অব মেডিসিন - এর জানুয়ারী ২০১৩ এ প্রকাশিত ‘রিস্ক ফেক্টরস অব সুইসাইড প্যারা রুরাল বাংলাদেশ’ শীর্ষক একটি গবেষণায় জানুয়ারী ২০১৩ এ প্রকাশিত আত্ম হত্যার প্রবনতার চিত্রটি নিম্নের পাই চার্ট - ২ এ তুলে ধরা হ’ল-

আত্মহত্যার প্রবনতার একটি চিত্র[১৩৪]

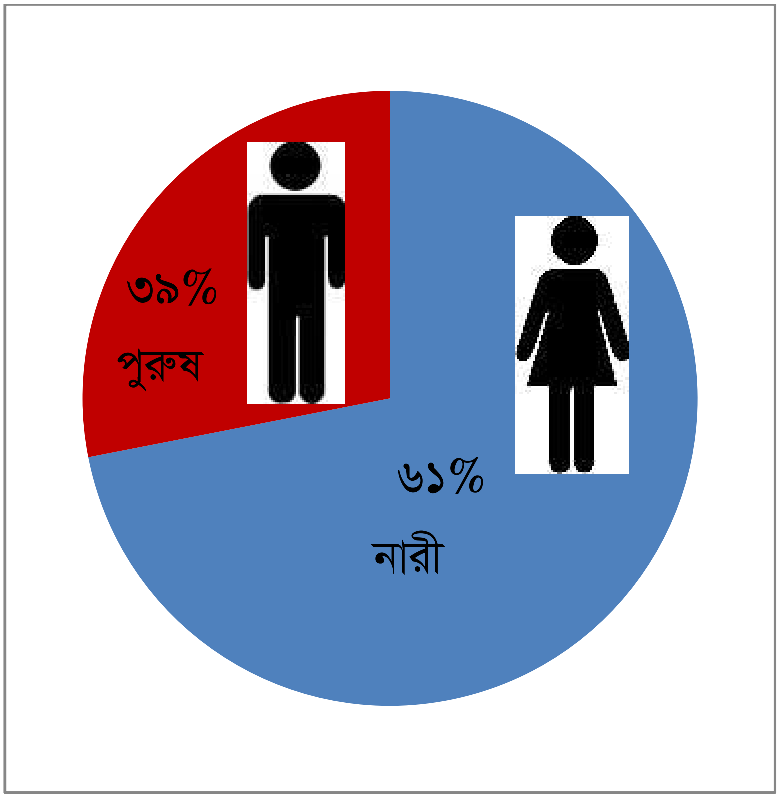

উক্ত গবেষণায়, উপরে প্রদশিত পাইচার্ট অনুসারে দেখানো হয়েছে যে, বাংলাদেশে ২০ থেকে ৩৯ বছর বয়সী তরুণ-তরুণীদের আত্মহত্যার প্রবণতা বেশী। এর মধ্যে ৬১ ভাগ নারী এবং ৩৯ ভাগ পুরুষ।[১৩৫] উক্ত গবেষণায় আরও বলা হয়েছে, বাংলাদেশের শহরাঞ্চলে প্রতারণার শিকারের কারণে আত্মহত্যার ঘটনা ঘটছে আর গ্রামাঞ্চলে এর পেছনের মূল কারণ যৌতুক।[১৩৬]

আত্মহত্যার কয়েকটি বাস্তব ঘটনা

[১৩২].আমাদের সময়, ৪ মে ২০১১।

[১৩৩]. প্রথম আলো, (বিশেষ প্রতিবেদন) , ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৩।

[১৩৪]. বাংলাদেশ জার্নাল অব মেডিসিনএর প্রতিবেদন থেকে তুলে ধরা হয় প্রথম আলো, ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০১৩ সংখ্যায়।

[১৩৫].পূর্বোক্ত।

[১৩৬]. পূর্বোক্ত।

(□) □□□□□ ছাত্রীর আত্মহত্যা

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতি□□ □□□□□□ ছাত্রী মার্জিয়া জান্নাত সুমী □□ □□ আগষ্ট □□□□ দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ে □□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□ কক্ষে আত্মহত্যা □□□□□

সুমীর □□□□□ বান্ধবী □□□□□, □□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□ উদ্ভিদ বিজ্ঞান □□□□□□ প্রভাষব মো. মনিরুজ্জামান □□□□□ সুমীর সঙ্গে সম্পর্ক □□□ তোলে। কিন্তু □□□□ □□□ □□□ □□ শিক্ষকের সঙ্গে □□□ মনোমালিন্য দেখা দেয়। □□□□□ □□□□ ঘন্ট □□□ সুমীকে □□□ বান্ধবীর কান্নাকাটি ক□□□ দেখেছেন। উদ্ভিদবিজ্ঞানের বিভা□□□ □□□□□ অধ্যাপক মোহাম্মদ □□□ আকন □□□□, □□ ছাত্রীর সঙ্গে মনিরুজ্জামানের □□□□□ □□□ □□□□□□ কিন্তু মেয়েটির □□□ □□□□ □□□□□□ □□□ ডিভোর্স □□□□□ পেরে □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ অস্বীকৃত □□□□□ ।[১৩৭]

জাহাঙ্গীর □□□ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন □□□□□□ □□□□□□ প্রাক্তন □ বর্তমান শিক্ষক যৌথভাবে গ□ □□ আগষ্ট, □□□□ □□□□□□ প্রথম □□□□□ প্রকাশিত □□□□ □□ প্রতিবেদনে উল্লেখ □□□□, "□□□ □□□ শুধু □□□□□ □□□ □□□ □□□□□, □□□ □□□□□ □□□□ তুষ □□□ □□□□□ □□□□ নির্মম প্রতিবাদ? যে □□□□□ □□□□ □□□ □□□ ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাল্যবিবাহের করুণ □□□□□□ □□□□□ □□, পরিস্থিতির □□□□ □□□ □□□□□ কবুল □□□□□ □□□ □□□ অশুচি □□□ শিক্ষার সর্বোচ্চ অঙ্গনেও সেই অশুচি দূর □□□□, সেই □□□□□ বাসিন্দাদের বিরুদ্ধেই বোধ □□□ সীমুর □□ প্রতিবাদ। .. ..□□□ □□□□ কোন ভাবালু □□□□□ থেকে আত্মহত ? □□□ □□□□□ সম্পর্ক □□□ মেয়ের □□□□ স্টিগমা □□□□ বেঁচে থা□□ দুরূহতা □□□□ পরাস্ত □□□? □□□ □□□□ সুন্দর স্বাভাবিক- □□□□□ □□□□□□ সম্ভাবনার বিচ্ছেদ □□□□ □□□ আ □□□? মেয়েরা □□□ ক্রমাগতভাবে □□□□ □□□ আত্মহত্যার □□ বেছে নিচ্ছে, □□□ □□□□ বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিগত □□□□ □□□ দেখা □□□□□ .. আত্মহত্যার প্ররোচনা স্ একটি □□□□□ □□□ □□ □□□, □□ কেউ সুমিকে আত্মহত্যায় প্ররোচিত ক□□ □□□.. প্ররোচনাকারীদের বিরুদ্ধে □□□□ ব্যবস্থা গ্রহণ □□□ □□□ ।[১৩৮]

□. □□□□□-□□□□- □□□□□ঃ চার শিশু সন্তান □□ □□□□ আত্মাহুত (যদিও দুটি সন্তান বেঁচে গিয়েছে)

আত্মহত্যার □□□□ মধ্যে সাম্প্রতিক □□□□ □□□ সন্তান □□ ট্রেনের □□□ □□□ □□□□ ফেরদৌসী আক্তারের আত্মহত্যার □□□ □□ □শৃঙ্খল্যক □□□ □□□□□ দেখা □□□□□□ ফেরদৌসী আক্তারের □□□ মাধবপুর □□□□□□ আন্দিউর □□□□□□□ সুলতানপুর গ্রামে। তা□ স্বামী জিল্লুর □□□□ □□□ □□□ □□□ দুবাই □□□ প্রতিবেশী আব্দুল □□□□□□ ফেরদৌসী বেগম ধর্মভাই ডেকেছেন। □□□ স্বামী □□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□ ফেরদৌসীর □□□□□□□ □□□ দেওয়ার জন অনুরোধ □□□ □□□□ □□ □□ থেকে আব্দুল □□□□ □ □□□□□ □□ □□□□ □□□□□□

এর মধ্যে গ্রামের কেউ □□□□ □□□□ □ ফেরদৌসীকে মাধবপুর □□□□□□□ দেখতে □□□□ □ □□□□ কানাঘুষ শু □□□ তাদের মধ্যে □□□□ সম্পর্ক □□ □□□ অনুমান □□□ □□ কানাঘুষ □□□□ □ □□□□ গ্রামে □□□□ □□□ □□□ গ্রামের মাতবর মহব্বত □□□□ □□□□□ □□ □□ চেয়ারম্যান আতিকুর □□□□□□

[১৩৭].আমাদের সময়, ১০ আগষ্ট ২০১১।

[১৩৮].প্রথম আলো, ১২ আগষ্ট এবং ২০ আগষ্ট ২০১১।

সভাপতিত্বে □□□□ □□□□ □□□□□ গৃহবধূ □ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□ □□□□□ □□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□ □□□□□ □□□□ ডেকে □□□□□□ □□□ □□□ □ শাস্তি □□□□ □□□ তুৎ □□□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□□ ফেরদৌসীকে সমাজচ্যুত □□□□□ □□□□□ □□□ ফেরদৌসীকে □□□□□, ক্ষোভ, অসহায়ত্বের চূড়ান্ত পর্যায়ে □□□ পৌঁ□□□ □□ ফেরদৌসীর মধ্যে □□□□□ □□□□ □ তীব্র □□□ □□□ যে □□□□□□□ □□□□ আত্মবিধ্বং □□□ □□□□ বাধ □□□।

হবিগঞ্জে মাধবপুর □□□□□□ আন্দিউর □□□□□□□ গ্রামের গৃহবধূ ফেরদৌসী আক্তা □□ঃ□□ চলন্ত ট্রেনের □□□ ঝাঁ□□□ □□□ শুধু □□□□□ □□□□□ পারসমাপ্ত □□□□□; সঙ্গে □□ সন্তানকে □□□ □□□ আত্মহত্যার জন্য ট্রেনের □□□ □□□ দেন, কিন্তু দুটি সন্তান □□□ □□□ প্রানে ব□□□□□ ফেরদৌসী আক্তার □□□ দুই সন্তান □□ মৃত্যু □□□ □□□□□ □ ব্যাপারে □□□□ শ্রী মঙ্গল □□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□[১৩৯] (চিত্র ১২(ক) - বেঁচে যাওয়া দুই সন্তানের ছবি)।

মানুষ □□□□□ □□□□□□□, □□ সন্তানদের □□□□□□□□ □□□□□ চেয়েও বেশি। কিন্তু □□□□□ নেতৃস্থা□□□□ ফেরদৌসী আক্তারের □□□□□ □□□□□ □□শিয়ে তোলেন যে □□□ সন্তানদেরসহ □□ □□□ □□ক্ষেপটি □□□□ বাধ □□□□□□ □□□□ যে □□□□□ ফেরদৌসীকে দেয়া □□□□□ □□ সত্য □□ □ □□□ □□ □□□ স্বামী বিশ্বাস □□□□□? □□□ □□□ □□ বিশ্বাস □□□□□? □□□□ □□□ □□□□ সন্তানদের ভাঁ□□□□ □□□□□ □□□ □□□□ □□□□□ □□□ দেয়া □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ প্রায় □□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ সম্ভবতঃ □ □□ চিন্তাই ফেরদৌসীকে □□□□□ □ সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করেছে।

□□□ □□□□□□□ গ্রেফতার □□□ □□□ সঙ্গে □□□ □ শিশু নির্যাতন দ□□ আইনানুযায়ী আত্মহত্যা প্ররোচনা দেওয়ার □□□□□□□ □□□□□□ বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য □□□ আত্মহত্যাকারী □□ □ □□□ সন্তানদের □□□□ রক্ষায় □□শ্লিষ্টদে□ ব্যর্থতা সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য □□□□□ হাইকোর্টের স্বতঃপ্রণোদিত অ□□□ □□□□ ভূমিকা □খতে □□□□□ □□□□□□ অন্যথা □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□ □□□ □□□ষ্ট সন্দেহের □□□□□ □□□□□□

৩. দুই মেয়ে নিয়ে মায়ের আত্ম-হনন

স্বামীর পরকীয়ায় আসক্তিকে কেন্দ্র করে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মনোমালিন্যকে কেন্দ্র করে রাজধানীর কাফরুলে স্ত্রী জাহানারা বেগম(৩৬) তার দুই মেয়ে হাওয়া(৮) ও শারমিনকে নিয়ে বিষপানে আত্ম হত্যা করেছেন।[১৪০] ((চিত্র ১২(খ) আত্মাহুতি দেওয়া- মা ও দুই মেয়ের ছবি)।

স্বামীর পরকিয়ায় স্বাভাবিক ভাবেই জাহানারা তার ও সন্তানদের ভবিষ্যত জীবনের অনিশ্চয়তা থেকেই এত ভয়ংকর সিদ্ধান্তটি নিয়েছেন। স্বাভাবিক অবস্থায় এ সিদ্ধান্ত সম্ভব নয় ।

---

[১৩৯].প্রথম আলো , ১৬ আগষ্ট ২০১১। (চিত্র ১২(ক), বেঁচে যাওয়া মেয়ে দু'টির ছবি)

[১৪০].আমাদের অর্থনীতি, ২৮ আগষ্ট ২০১২।(চিত্র ১২(খ), আত্মাহুতি দেওয়া মা ও দুই মেয়ের ছবি)।

১১. হত্যা এবং হত্যাকে আত্মহত্যায় রূপান্তরের প্রচেষ্টা

বাংলাদেশের নারীদের কারণে অকারণে হত্যা করা হচ্ছে। আবার হত্যাকে [illegible] মুখে [illegible] ঢেলে [illegible] আত্মহত্যা দেখিয়ে হত্যার [illegible] থেকে [illegible] পেতে চাচ্ছে নিষ্ঠুর খুনীরা। অর্থাৎ নির্যাতনের মাধ্যমে মৃত [illegible] নির্যাতনের হা[illegible] থেকে রেহাই [illegible]চ্ছেনা।

হত্যাকে আত্মহত্যায় রূপান্তরের [illegible]

আত্মহত্যার [illegible] কিছু সুয়োগ সুবিধা বিদ্যমান [illegible] আত্মহত্যা [illegible] ব্যর্থ [illegible] দন্ডবিধির ৩০৯ ধারানুযায়ী কিন্তু আত্মহত্যা কার্যকর [illegible] গেলে খুনীর বিরুদ্ধে [illegible] কোন সুযোগ নেই। [illegible] আত্মহত্যার প্ররোচনা একটি [illegible] প্ররোচনাকারীদের বিরুদ্ধে দন্ডবিধির ৩০৬ [illegible] সুযোগ [illegible] কিন্তু যেহেতু ভিকটিম [illegible] শেষ [illegible] আশ্রয় নেয়ারও কেউ [illegible] ভিকটিমের আত্মীয় স্বজনের [illegible] আশ্রয়ে গেলেও শেষ পর্যন্ত [illegible] উৎসাহ [illegible] সাক্ষী-সাবুদের [illegible] বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে [illegible] নিষ্পত্তি [illegible] [illegible]য় - [illegible] সুযোগের স[illegible] উদ্দেশ্যে বেশ কিছু হত্যাকে আত্মহত্যা [illegible] দেখানোর প্রবনতাও [illegible] বিদ্যমান।

হত্যাকে আত্মহত্যায় রূপান্তরের প্রতিক্রিয়া

হত্যাকে আত্মহত্যায় রূপান্তরে কৃতকার্য [illegible] খুনের [illegible] বেড়ে [illegible] শৃংখলা[illegible] সম্ভাবন অত্যাধিক। অবশ্য [illegible]-শৃঙ্খলা [illegible] কৃতকার্য [illegible] সম্ভাবন [illegible] কিন্তু পূর্বে উল্লেখিত হেনা হত্যাকান্ডের পর [illegible]-তদন্ত [illegible] সুরতহাল রিপোর্টে যে [illegible] সংগঠিত [illegible] সে [illegible] তদন্ত [illegible] সুরতহাল রিপোর্টে আত্মহত্যার কিছু [illegible] দেয়া সম্ভব [illegible] হত্যা [illegible] আত্মহত্যায় [illegible]

কয়েকটি বাস্তব ঘটনা

১. ইভা হত্যা

শারীরিক নির্যাতনে ব্যর্থ হয়ে চিকিৎসক সাজিয়া আফরিন ইভাকে শ্বাসরোধে হত্যা করা হয়েছে গত ৩০ ডিসেম্বর ২০১২ তারিখ বৃহস্পতিবার রাতে । ইভা সিলেট মেডিকেল থেকে ৪১ তম ব্যাচে এমবিবিএস পাস করে রাজধানীর সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে এফসিপিএস (পার্ট-২) কোর্সে অধ্যয়নরত ছিলেন। পড়াশুনার পাশাপাশি তিনি দক্ষিনখানস্থ আমতলা ব্রাক ক্লিনিকে খন্ডকালীন চাকরী করতেন।

গত ৩০ ডিসেম্বর ২০১২ তারিখ বৃহস্পতিবার রাতে ক্লিনিকের নার্স খাদিজা জরুরী অপারেশনের কথা বলে ইভাকে ডেকে নেয় ক্লিনিকে । এই রাতেই ইভা ক্লিনিকে খুন হন। এই ঘটনার জন্য ওই ক্লিনিকের কেয়ারটেকার ফয়সালকে গ্রেফতার করা হয়। আসামী ফয়সালের বক্তব্য এক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে জানানো হয়। সে তার বক্তব্যে জানায় যে, ওই ক্লিনিকের চিকিৎসক ডা. ইভার সাথে কথাবার্তার সুবাদে ইভার প্রতি তার দুর্বলতার সৃষ্টি হয়। সে সুযোগ খুজতে থাকে এবং গত বৃহস্পতিবার রাতেই তাকে একা পেয়ে যায়। সিজার অপারেশনের পর রাত সাড়ে ১২টার দিকে ফয়সাল ওয়েটিং রুমের দরজা নক করেন। ডা. ইভা দরজা খুলে দিলে সে ভিতরে ঢুকেই ইভাকে জড়িয়ে ধরে এবং কুপ্রস্তাব দেয়। ইভা রাজি না হওয়ায়

ফয়সাল তাকে বাধ্য করানোর চেষ্টা করে। এ সময়ে সে ইভার শরীরে কামড় দেয়। ইভাও তাকে চড় মারেন। ফয়সালের হাত থেকে বাঁচতে সে পালানোর সময় চেয়ারের উপর পড়ে যান। এতে ইভার কপাল ফেটে যায় এবং চেয়ারের পায়া ভেঙ্গে যায়। পরে ফয়সাল তাকে ফ্লোরে ফেলে বুকের উপর বসে গলা টিপে ধরে, এতে ইভা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লে সে দরজা ভিড়েয়ে রেখে ব্রাক্ষ্মন বাড়িয়া নবীনগরে নানা বাড়িতে চলে যায়"। নানার বাড়ি থেকেই ফয়সল গ্রেফতার হন।[১৪১]

একজন আসামীর জবানবন্দী সাংবাদিকদের সম্মুখে প্রদান করার কোন বিধান দন্ডবিধি কিংবা কার্যবিধির কোথাও নেই স্বত্তেও এ ক্ষেত্রে তা করা হয়েছে। এতে যে প্রশ্নটির দেখা দেয় তা হ'ল আইনপ্রয়োগকারী সংস্থা কর্তৃকই কেন আইনের ব্যত্যয় ঘটানো হ'ল? তার কোন জবাব নেই।

২.ধর্ষনের প□ হত্যা □□□ হত্যাকে আত্মহত্যা হি□□□□ দেখানোর প্রচেষ্টা

□□□□□ মুর্মু □□□□□ □□□□□ শিক্ষিকা □□□ বয়স্ক □□□□□, দুর্বৃত্তদের হা□ থেকে রেহাই □□□□□□ □□□□ ধর্ষণ □□□ ধর্ষণের □□ হত্যা □□□ হত্যাকে আত্মহত্যা □□□□□ দেখানোর ব্যবস্থা □□□ □□□□ □□□

□□□□□□□ গোদাগাড়ী □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ গ্রাম থেকে বিবস্ত্র অবস্থায় □□□□ বেঁধে রা□□ অবস্থায় □□□□□□□ □□□□ □□□□□ মুর্মুর(□□)□□□ উদ্ধার □□□ □□□ মারিয়মমুর্মু গোদাগাড়ীর □□□□□ □□□□□□□ গ্রামের একটি বয়স্ক শিক্ষা বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা □□□□□□ □ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ একটি বেসরকারি সংস্থার সঙ্গেং যুক্ত □□□□□। □□□ স্বামীর □□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ চৈত্রপুর গ্রামে। ২□□□ □□□□ স্বামীর মৃত্যুর □□ থেকে গোদাগাড়ীতে □□□□□ □□□□□

গত ১০ জুলাই ২০১১ তারিখ □□□□□ মুর্মুর □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ ভেতর থেকে একটি কুল (□□□) □□□□□ সংঙ্গে □□□□□□□ □□□ □□□□ □□□ পেচানো অবস্থায় ঝোলানো □□□□ লাশটি □□□ বিবস্ত্র। □□□□ থেকে ঝ□□□□ রক্ত গ্রামের অঞ্জ□□ মুর্মু প্রথমে লাশটি দেখতে □□□ □□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□□ লোকজন ছুটে □□□□ লাশটি □□□□□ ঢেকে □□□□□ □□□ দেয়। □□□□□ □□□□ □□□□□, এটি একটি পরিকল্পিত হত্যাকান্ড □□□ □□□□□ সঙ্গে □□□□ □□□□□□ □□ □□□ মাটিতে। দুই □□□ □□□ □□□□□□□□ □□□ □াঁ□□□ □□□□ □□□□□□□ যৌনাঙ্গ থেকে রক্ত □□□□□□ □□□ থেকে □□□□□ □□□ □□ ধর্ষণের □□ □□□□ হত্যা □□□ □□□□□ □□□ দুর্বৃত্তরা তা□ □□□ □□□□ বেঁধে রেখেছে।

□□□□□□ □□□□□□□ ছেলে □□□□ □□□ □□□□□ হত্যা □□□□□ □□□□□□ | □□□□□□□ ছেলে □□□□□□(□□) □□□□, □□□ □□□□ কে □□ □□□□ □□□ থেকেই মেরে ফেলার হুমকি □□□□□□ কিন্তু □□ □□□□ □□□ □□□□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□, □□□ □□□□ □□□□□ সঙ্গে □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□ □□□□ সঙ্গে কোন শত্রুতা নেই। □□ হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে জা□□□ □□□□□□□ □□□□□, □□□□□□□ সাংস্কৃতিক উন্নয়ন সংস্থা □ □□□□□□□ □□□□ উন্নয়ন সংস্থা যৌথভাবে □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ পয়েন্টে মানববন্ধনের মাধ্যমে প্রতিবাদ □□□□□□□□।[১৪২] মরিয়মের ছেলের ভাষ্যমতে তাঁর চাচার সঙ্গে জমিজমা নিয়ে তাঁদের বিরোধ চলছে। সেই সূত্র ধরে বিশ্ব নাথকে গ্রেফতার করা হয়েছে।[১৪৩]

[১৪১]. আমাদের সময়, ২ ডিসেম্বর ২০১২।

[১৪২]. প্রথম আলো , ১১ জুলাই ২০১১।

[১৪৩]. প্রথম আলো , ১২ জুলাই ২০১১।।

এ ধরনের ঘটনা অধিক হারে দেখা যায় গৃহভৃত্যকে হত্যার মধ্যে। তার দু'টি বাস্তব ঘটনা তুলে ধরা হ'ল –

৩.সাবেক সেনা কর্মকর্তার বাসায় গৃহকর্মী কে হত্যা এবং হত্যাকে আত্মহত্যা হিসেবে দেখানোর প্রচেষ্টা

□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □ □□□ □স এর □□□□□ □□ সেনা কর্মকর্তার বা□□ থেকে □□ ষোড়শ গৃহকর্মী ঝুলন্ত □□□ উদ্ধার □□□□□ পুলিশ। □□□ □□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□(□□)। □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□, □□□□ হত্যা □□□ □□□□□□

□□□□□□ প্রায় দুইবছর □□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□ □□ সেনা কর্মকর্তার □□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□ ফুলবাড়িয়া □□□□□□□ □□□□□ গ্রামে। তা□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ প্রথম □□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□, □□ □□□□□ সদস্যর □□□ মেয়েকে □□নে/ □□□□নে □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□, প্রায় □□ □□□ □□□ গৃহকর্তার ছেলে □□□□□□□□ শ্লীলতাহানীর চেষ্টা □□□□□ □□□ □ □□□ □□□□□ □□ □□□□ মেয়েকে □□ □□□□ থেকে □□□□ □□□□□□ চেষ্টা □□□□□□□□□□ কিন্তু গৃহকর্ত্রী মাহবুবা জোর □□□ □□□□□□□□ রেখে দেন। শুধু □□-□ □□, ছেলের বিরুদ্ধে শ্লীলতা □□□□□ □□□□□□□ দেওয়ায় মাহবুবা □□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ পিতার □□□□□□□ - ' □□ □ ছেলে □□□□ □□□□ মেয়েকে হত্যা □□□ ফ্যানের □□□□ ঝুলিয়েছে'।

□□□□□ □ □□□□□ □□□□□ □□□□□ সেনা কর্মকর্তা বা□□ □□□ ক্যান্টনমেন্ট □□□□□ একটি অপমৃত্যুর □□□□□ □□□□□ □□□□□ সুরতহাল প্রতিবেদনে □□□ □□, 'মৃতা □□□□□□ উগ্র স্বভাবের □□□ □□□□□□ □□□□□□ ন্যায় □□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□ গৃহকর্তৃ □□□□ □□□□□, অদ্য □□/□□/□□□□ □□□□ অনুমান □□□□ □□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□□ মৃতা □□□□□□ (□□□□□)□□□□ □□□□□ কক্ষের ফ্যানের □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ আত্মহত্যা □□□' ।

সুরতহাল প্রতিবেদনে মূলতঃ □□□□□ □□□□□ উল্লেখ □□□□ □□□□ এ ধরনের মন্তব্য নয়। কিন্তু □ ক্ষেত্রে □□ □□□ □□□□□ সুরতহাল প্রতিবেদনে □ □□নে□ □□□□□ □□ বক্তব্য লেখার □□□□ □□□ □□□□, সাংবাদিকগণ কর্তৃক □□ □□□□□ □□□□□ □□□□ প্রথমআলোর প্রতিনিধিকে □□□□, '□□, এগুলো লেখার কোন যৌক্তিকতা নেই। □□□ (কর্ণেল) □□ □□□□□□ □□-□ □□□□ি'। □□□□ □□ □□□□ সত্ত্বেও □□□ □□□ কেন □□□□□□□-□ প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে □ পুলিশ কর্মকর্তা মুঠোফোনের লাইন□ কেটে দেন। □□□ ফোনটি বন্ধ □□□□□ □□□□ মৃত নাসারিনের স্বজনেরা জানান, □□□□□ কোন □□□ □□□□ প্রকৃতির □□□□□□ সে স্বাভাবিক □□□□ □□□□□ □□□□□□□, ঘটনাটি ভিন্ন □□□□ □□□□ পুলিশ □□□ গল্প সাজাচ্ছে। □□□□□ □□□□ প্রকৃতির □□□, □□□ □□□ গৃহক□ মাহবুবা □□ □□□ ছেলে □□□□□□ □ প্রথম □□□□□□ □□□□□□।[১৪৪]

সুরতহাল রিপোর্টে এখা□নে□ □□□ □□□□□ মূলতঃ হত্যাকে আত্মহত্যায় রূপান্তরেরই প্রচেষ্টা। □ □□নে□ বক্তব্য পরবর্তিতে □□□□ □□□□□□ প্রভাবান্বিত করা□□ □□□□□

[১৪৪].প্রথম আলো, ১৯ এপ্রিল ২০১১।

(৪) উত্তরায় গৃহকর্মী ধর্ষণের পর হত্যা

রাজধানীর উত্তরায় ধর্ষণের পর এক শিশুকর্মীকে হত্যা করা হয়েছে। মেয়েটির নাম মোসাম্মৎ জান্নাতুল ফেরদৌস জান্নাত(৯)। নিহত জান্নাত উত্তরার ৭ নম্বর সেক্টরের ৪ নম্বর রোডের ৬ নম্বর বাসার দোতলায় জনৈক খাদেমুল বাশারের ফ্ল্যাটে কাজ করত। গৃহকর্ত্রী সানজিদা গত ৩০ জানুয়ারী বুধবার রাতে তাকে অচেতন অবস্থায় রেডক্রিসেন্ট হাসপাতালে নিয়ে যায়। চিকিৎসক মেয়েটিকে মৃত ঘোষণা করলে তিনি সেখান থেকে সটকে পড়েন। এর পর ওই হাসপাতালের চিকিৎসকরা থানায় খবর দেন। মেয়েটিকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে বলে ও পুলিশকে জানান তারা। পুলিশ খাদিমুল বাশার তার দুই বন্ধু এবং খাদেমুল বাশারের শ্যালক জুবায়েরকে গ্রেফতার করে। জান্নাতের গ্রামের বাড়ি কুমিল্লার ব্রাম্মনপাড়ার বড় কুসিয়ায়।

নিহতের মা সুমি বেগম বলেন, মমতাজ নামের এক প্রতিবেশী তার মেয়েকে ঢাকায় এনে মাসে ৫শ'টাকা বেতনে খাদিমুলের বাসায় গৃহকর্মীর কাজ দেয়। ৮ মাস কাজ করার পর বাড়ি গিয়ে কয়েকদিন কাটিয়ে দুই মাস আগে সে আবার ঢাকায় আসে। স্বামী হাবিবুর রহমান প্রায় তিন বছর আগে ক্যান্সারে মারা যান। আর এই মেয়ে ছিল তার তিন সন্তানের মধ্যে বড়।[১৪৫]

১২.□□□ নির্যাতনে মুঠোফোন/ভিডিও/ইন্টারনেট

□□□ নির্যাতনে মুঠোফোনের বা□□□ □□ সাম্প্রতিক □□□□ উদ্ভাবিত নির্যাতনের □□ নতুন রূপ মুঠোফোনে ভি□□ ক্যামেরা ব্য□□□□□ সুযোগের প্রেক্ষিতে দুষ্ট প্রকৃতির ছেলেরা মেয়েদের □□□ প্রেমের □□□□ □□□ □□□□□□ ঘুরার □□□ □□□ কোন □র্জ□ স্থানে নি□ □□□ □□□□□□ মধ্যে কিছু অন্তরঙ্গ মুহূর্তের □□ তুলে □□□ □□□ □□ □□□□ □□□ □□□ □□ দেখিয়ে □□□ □□□□ □□□□ □□□□ সুযোগ □□□□□ ব্যবহা □□□□ □□□, মেয়েটিকে যৌনকাজে ব্যবহারেও বাধ □□□□ □ □□□ ব্যর্থ □□□ □□□□ চিত্রটি প্রচার □□□ দেয়। □□□ মেয়েটি □□□□□□□ লোকজনের □□□ হেয় প্রতিপন্ন □□□ □□□, □□□□□ □□□□ □□ ভেঙ্গে □□□ □□□□ □□□□□ কোন উপায়ান্তর □□ পেয়ে মেয়েটি আত্মহত্যার □□□ বেছে নেয়।

□□□

□□□□□□□ঃ অস্ , বিকারগ্রস্ত □□ শ্রেনীর নরপশুর বিকৃত যৌনলালসা চারিতার্থ □□□ স্বার্থেই মুঠোফোনের □□ বিকৃত □□□□□□□ প্রধান □□□□ অশ্লীল বইপত্র □□□, পর্নোগ্রাফি ও কুরুচিপূর্ণ □□□□□ দেখে □□□□ মধ্যে □□ □□নের স্পৃহা জাগ্রত □□;

□□□□□□□□□ অস্   বিকারগ্রস্থ □□ ছেলেরা □□□□ নেশা ইত্যাদি মেটানোর স্বার্থে টা□□ □□□□ রোজগারের একটা □কৃ□ □□ □□□□□ □□ কৌ□□□□ গ্রহন □□□;

[১৪৫]. আমাদের সময়, ১ ফেব্রুয়ারী ২০১৩ সারাদেশ পৃঃ ৪।

□□ □□□□□ ভিডিওগ্রাফীর □□□□, মেয়ের □□□-□□ মেয়েটি□ □ □□□□□□□ □□□□□□ স্বীকৃতি ব□□ □□□□ প্রয়োজনে □□□□ □□□□□□ □□□□□ বিষয়টি গোপন □□□□ স্বার্থে টাকা □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□ গোপন □□□□ প্রবনতা □□ □□□□□ □□□□□□ প্রতিরোধ □□ □□□ □□□ □□□□□ ব্যাপ্ত ঘট□□□

প্রতিক্রিয়া

□□ প্রতিক্রিয়া ব্যাপক □□□ □□□□□ □□ □□□□ চিত্র □□□□□ প্রকাশ □□□ গেলে মেয়েটি□ □□□ □□□ □□□□□□□ পক্ষে □□□□ স্বাভাবিক জী□□ □□□□ □□ সম্ভব □□□□□ □□□□ □□□□ ছেলেটিকে দোষ □□ □□□□ মেয়েটি □□□ মেয়েটির □□□□□□□□ দোষী □□□□ চতুর্দিক থেকে □□ □□ □ □□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□

মেয়েটিকে □□□□ দেওয়া □□ সম্ভব □□□□□ □□□□□□ মেয়ের ক্ষেত্রে □□□□□ অবস্যম্ভাবী □□□ □□□□□ শুধু □□□□□□ শেষ □□□□, মেয়েটির □□□ □□□□ □□□□ নিদারুণ □□□□□□□ □□□□□□ নির্যাতন। উপায়ান্তর □□ পেয়ে মেয়েটি আত্মহত্যা □□□ □□ যন্ত্রনার □□□□□ □□□□ □□□□

পরিসংখ্যান

□□□□ নীর্যাতনে মুঠোফোনের ব্যব□□□ □□□ সাম্প্রতিক □□□□□ উদ্ভাবিত নির্যাতনের এ□ নতুন রূপ □□□□ □□ কোন সুস্পষ্ট □□□□□খ্যান অদ্যাবধি □□□□ □□□□□□ নিম্নে সাম্প্রতিক সময়ে সংগঠিত বাস্তব কয়েকটি ঘটনার চিত্র তুলে ধরা হ’ল।

বাস্তব উদাহরণঃ

১.মুঠো ফোনে আপত্তিকর □□□□ □□□□, ছাত্রীর আত্মহনন

জোর □□□ তোলা আপত্তিকর □□□□ চিত্র মুঠোফোনে ছাড়□□ দেয়ায় ক্ষোভ ও ঘৃণায় আত্মহত্যা □□□□□□ স্নাতক (সম্মান) পড়ুয়া □□ গৃহবধু। পুলিশ □□□□□ □□□□□ □□□□ রোড লেচুশাহ □□□□□ □□□□ থেকে □□□□ □□□□ প্যাচানো অবস্থায় □□ গৃহবধুর □□□ উদ্ধার □□□□□□ পুলিশ □□□□ চিত্র □□□□□□□ নজরুল □□□□□ □ □□□ □□□□□ □□□ আব্দুর রাজ্জাককে □□□ □□□□□□

আত্মহনন □□□ সুপর্না □□□(□□) □□□□□ ব্রজমোহন (□□□□) □□□□□□ গনি□ □□□□□□ স্নাতক (সম্মান) তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী। □□□ □□□ সাতক্ষীরার আশাশুনি □□□□□□□ লক্ষীখালি গ্রামে। এ□□ □□□□□□□ পুইজাল গ্রামের কা□□□ আশীষমন্ডলের □□□□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□□□□□ পদার্থবিজ্ঞান □□□□□□ স্নাতকোত্তর বর্ষের ছাত্র টিউশনি □□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□

□□□□ □□□ মন্ডল □□□□, প্রেম □□□ □□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□□ কিন্তু □□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ মেনে নেয়নি। □□□ □□□□□ □□ স্ত্রীকে নি□□ □□□□□ □□□□□□ লেচুশাহ □□□□□ প্রথম □□□□ □□□□জিলের তৃতীয় □□□□ □□□ □□□□□ □□□ স্ত্রীকে বি□□ □□□□□□ □□□□□□□□□ ভর্তি □□□ দেন। সেখানে □□□□ □□□□□ উত্যক্ত □□□□□ সহপাঠি নজরুল □□□□□ নজরুল সুপর্ণার □□□□□□ সুযোগ □□□ □□□ আপত্তিকর □ভিডি□ চিত্র □□□ □□□□ □□□ □□ বিভিন্ন মুঠোফোনে ছাড়□□ দেন। □□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□ লজ্জা - ক্ষোভে -দুঃখে সুপর্ণা সোমবার □□□□ ফ্যানের সংঙ্গে □□□□ □াঁ লাগিয়ে আত্মহত্যা □□□□□ □□□ পেয়ে পুলিশ সুপর্ণার □□□ উদ্ধার □□□ □□□□ তদন্তের জন্য □□□□□ শেরেবাংলা মেডিকেল □□□□ মর্গে □□□□□

নজরুল □□□□ □□□□□ পারস্ক □□□□ □□□ পুলিশ □□□□ গ্রেফতার □□□□ □□□□□ চিত্র □□নে□ □□□ নজরুল □□□□□□□□□□ □□□□ স্বীকার □□□।[১৪৬]

□. □□□□□ প্রলোভন দি□□ স্কুলছাত্রীর নগ্ন দৃশ্য ভিডিও ক□□ হয়

□□□□□□□ যাত্রাবাড়িতে স্কুলছাত্রীকে প্রেমের ফাঁদে ফেলে □□□ নগ্নদৃশ্যের □□□□□ ইন্টারনেটে □□□□□ □□□□□□□ গ্রেপ্তারকৃত প্রতারক প্রেমিক □□□□ হোসেন □□□□□, □□ স্কুলছাত্রীকে □□□ □□□□ পারকল্পন □□□ □□□□ কিন্তু স্কুলছাত্রীর □□□□□□ □□□ সঙ্গে □□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□□ আশঙ্কায় □□□□ গোপনে ছাত্রীর সঙ্গে দৈহিক সম্পর্ক স্থাপনের নগ্নদৃশ্য □□□□□ □□□□ ব্যবস্থা □□□□□ সেটি ট্রাম্পকার্ড □□□□□ ব্যবহারের পারকল্পনা □□□ □□□□ □□□□ □□□□, □□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□ □□□□ □□□□ সেটি □□□□ গোপনে বাণিজ্যের চেষ্টা □□□□□□ শু □□□□ সে □□ ছাত্রীর □□□□ □□□ □□□ মোটা অঙ্কের □□□□□ কিন্তু □□□ □□ পেয়ে □□□□ □□□□□ কিছু □□ □□□ গোপনেই ইন্□□□□□□ ছেড়ে দেয়। আরিফের সঙ্গে □□□ □□□□□ গ্রেপ্তার □□□□ □□ স্কুলছাত্রীর সহপাঠি □ বান্ধবি পুলিশকে □□□□□, □□□□ কিছুই □□□□□□ □□□ □□□□□ □□□ □□□□ □□□ প্রেমিকা ও□ স্কুলছাত্রীর সঙ্গে □□□□□ □□□□□ একান্তে □লোচনার □□□ □□□ □□□□□ □□□□□ অবস্থান □□□□□ কিছু □□□ □□ □□ স্কুল ছাত্রী সেখানে গেলে □□□□□ দু'□□□□ □□□□□ একটি রুমে একান্তে □□□ □□□□ ব্যবস্থা □□□ □□□ প্রায় □□ ঘন্টা □□ □□□□ দুই □□ সেখান থেকে বের □□□ □□□□ মেডিক্যাল □□□□ □□□□□□□□ স্কুল ছাত্রীর ডাক্তারি পরীক্ষা সম্ □□□ স্কুল ছাত্রী লজ্জা □□□ □□□□ যাত্রা □□□□ বাসা থেকে □□□□ □□□ □□□ গেছে।[১৪৭]

৩. □□□□□□□ আপত্তিকর □□□ ইন্টারনেটে-তরুণ গ্রেফতার

প্রতারণা □□□ স্কুলছাত্রীকে ধর্ষণ □ □□□ ভিডিওচিত্র ইন্টারনেটে ছেড়ে দেওয়ার □□□□□□□ আতিকুল □□□□□ □□□ (□□) □□□□□ □□ তরুণকে □ল্লাহ্ুল □□□ পুলিশ গ্রেফতার □□□□□□ □□□ ষ্ট্যামফোর্ড কা□□ থেকে □□□□ □□□ □□□□ পরীক্ষা দিচ্ছিল। □□ মেয়েটি □□□□ একটি □□□□ স্কুলের □□□ শ্রেণীর □□□□□ □□□□□ ছাত্রী। □□ ২০১০ এর নভেম্বর □□□□ □□□ মেয়েটিকে ধর্ষণ □□□ □□□□□ চিত্র □□□□ □□□□ □□□□□ ভিডিওটি দেখিয়ে সে মেয়েটিকে ব্ল্যাকমেইল ক□□□ □□□□□

□□ পর্যায়ে সে ভিডিওটি □ন্টার নেটে ছেড়ে দেয়। □□ □□ এপ্রিল □□□□ □□□□□ মেয়েটির □□ তেজগাঁও □□□□□ □□□ □ □□□ বন্ধু □□□□□ □□□□□ মোল্লার নামে □□□ মেয়েকে ধর্ষ□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□ গ্রেফতার □□□ পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদে ই□□ পুলিশকে □□□□□□□ যে, মেয়েটির □□□□ □□□ প্রণয় □□□□ সেই সুবাদেই □□□□□ মধ্যে ঘনিষ্ঠতা □□□ □□□ □□□ বন্ধুর □□□□□ চিত্রটি ইন্টারনেটে ছেড়ে □□□□□□□[১৪৮]

□.□□□□□□□ □□□□ ছাত্রীর আত্মহত্যা। ঘনিষ্ঠ মুহূর্তের দৃশ্য মুঠোফোনের ভিডিও ক্যামেরায় ধার□

মাদারীপুরের □□□□□□ পৌর □□□□□□ দাক্ষিণ কৃষ্ণ□□□ গ্রামের শ□□□□□ হোসেন □□□□□□□ মেয়ে চৈতী আক্তার □□ রোববার □□□□□ □□□ ফ্যানের হুকের □□□□ □□□□ পেঁ□□□ আত্মহত্যা □□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□ স্থানীয় □□ □□□□□□ অত্যাচারে আতিষ্ঠ □□□ সে □□ □□ বেছে □□□□ বাধ্য □□□□□□

---

[১৪৬]. প্রথম আলো, ২০ জুলাই, ২০১১।

[১৪৭]. আমাদের সময় ৮ আগষ্ট ২০১১।

[১৪৮].আমাদের সময় ৩ মে ২০১১।

□□□□□□ সূত্রে □□□ গেছে, □□□□□ সৈয়দ আবুল হোসেন □□□□□ □□□□ শ্রেণীর ছাত্রী □□□ □□□□ □□□□□□ □□□ □□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ ছেলে □□□ □□□□□ প্রায়ই □□□ উত্যক্ত □□□□ □□ পর্যায়ে □□□ □□□ প্রেমের প্রস্তাব □□□ সে □ প্রত্যাখ্যান □□□ □□□ □□□ □□□ হুমাক দেয় - প্রস্তাবে □□□ □ □□□ □□□ ছোট বোনের ক্ষাত □□□□ □□□ বাধ □□□ □□□□□ □□□ সম্পর্ক □□□ তোলে চৌতি। কিছু □□ □□□ চৌতির □□□ ঘানষ্ট মুহূর্তের কিছু দৃশ মুঠোফোনের □□□ ক্যামেরায় □□□ □□□ □□□□ বিষয়াট চৌতি ছোট বোনের □□□ খুলে □□□□□

আত্মহত্যার □□□ চৌতি □□□□ □□□□□ মধে একা চিঠ □□□ রেখে গেছে। চিঠিতে সে □□□□□, '□□□□ □□□ □□□□ □াঁ□□□ □□□□, □□□□ নষ্ট □□□□□ □□□ □□□ ছোট বোনকেও নষ্ট □□□ □□□ হুমাক দিচ্ছে। □ কথাগুলো □□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□ □□□ খুব □□□□ □□□ খুব সম্মা □□ | □□□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□□□ .. .. □□□ মেয়ে □□□ □□□ □□□□□ □□□ ত্যাগ □□□ কিন্তু □□ যে □াঁ□□, □□□ কোন কুল □□□□□ □ □□ খুজে □□□□| বাধ □□□ □□□ আত্মহত্যার □□ বেছে □□□□ | .. ..আব - আম্, তোমরা □□□□ ক্ষম □□□ □□□ দাদু, □□□, □□□□, আন্না, মুন্না, স্বর্ণা তোমরা কেউ □□□ জন □াঁ□□□□□[১৪৯]

৫. ধর্ষণের দৃশ্য মুঠো ফোনে, বিয়ে ভাঙল মেয়েটির

গত ২৮ মার্চ ২০১১ গোপালগঞ্জের কাশিয়ানী উপজেলার নবম শ্রেণীর এক ছাত্রীকে রেলওয়ে মাঠের কাছ থেকে মুখে কাপড় বেধে অপহরণ করে পাশের নির্মাণাধীন একটি বাড়িতে নিয়ে অস্ত্র দেখিয়ে ধর্ষণ করে চার জন। তারা এ দৃশ্য মুঠো ফোনে ধারণ করে। মেয়েটি বাড়ি এসে ধর্ষণের কথা বাবা-মাকে জানালে তারা গোপনে গ্রাম্য চিকিৎসক দিয়ে মেয়ের চিকিৎসা করান। এ ঘটনার পর ধর্ষকেরা মেয়েকে তাড়াতাড়ি বিয়ে দিতে বলে, নইলে এ্যাসিড নিক্ষেপ করা হবে বলে হুমকি দেয়।

বাধ্য হয়ে মেয়েটির অভিবাবকেরা ধর্ষণের বিষয়টি গোপন রেখেই নড়াইলের এক ব্যক্তির সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেন। বিয়ের পরই ধর্ষকেরা মেয়েটির রাজ মিস্ত্রি বাবার কাছে চাঁদা দাবী করে নইলে ধর্ষণের ভিডিও মুঠোফোনে ছড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দেয়। কিন্তু চাঁদা দিতে না পারায় তারা মেয়ের জামাইকে ধর্ষণের ভিডিও চিত্র দেখায়। এ ঘটনার পর মেয়ের জীবন দূর্বিষহ হয়ে ওঠে। স্বামী তাকে বেদম মারধর শুরু করে । এক পর্যায়ে জামাই শশুরকেও তাদের বাড়িতে ডেকে নিয়ে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করে। শেষে তারা মেয়েকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়। মেয়ে বাড়িতে এসে কাজির মাধ্যমে তালাক নামা পাঠায়।[১৫০]

৬. মোবাইল ফোনে ধারণ করা ধর্ষণের ভিডিও চিত্র ইন্টারনেটে ছড়িয়ে দেন লম্পট দুলাভাই

মানিকগঞ্জের স্যুটরিয়া উপজেলায় ১১ বছরের এক কিশোরীকে ধর্ষণ করেছে তারই লম্পট দুলাভাই বোরহান উদ্দিন(৩৫)। দুই থেকে আড়াইমাস আগে থ্রিপিচ কিনে দেওয়ার নাম করে বোরহানউদ্দিন তার শ্যালিকাকে নিয়ে বাজারে যায়। বাড়ি ফেরার পথে একটি তামাকক্ষেতের ভেতরে নিয়ে জোর করে ধর্ষণ করে সে তার শ্যলিকাকে। একই সাথে সে ধর্ষণের ঘটনাটি মোবাইল ফোনের ক্যামেরায় ভিডিও করে এবং বিষয়টি কাউকে জানালে খুন করার হুমকি দেয়। ধর্ষণের ভিডিও চিত্র ইন্টারনেট ও মোবহিলে ছড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দিয়ে পুনরায় ধর্ষণ করতে চাইলে কিশোরী অস্বীকৃতি জানায় এবং বিষয়টি বড় বোনকে জানিয়ে দেয়। এই নিয়ে বোনের সঙ্গে দুলাভাইয়ের ঝগড়া হলে এক পর্যায়ে সে তার স্ত্রীকে মারধর করে এবং ধর্ষণের ভিডিও চিত্র

---

[১৪৯]. প্রথম আলো, ১৪ ডিসেম্বর ২০১০ ।

[১৫০]. প্রথম আলো, ২৬ জুলাই ২০১১।

ইন্টারনেট ও মোবাইলে ছড়িয়ে দেয়। ফলে কিশোরীর পিতা গত ২২জুলাই ২০১৪ মঙ্গলবার থানায় মামলা করতে বাধ্য হন। ইতিমধ্যে ধর্ষক দুলাভাই গ্রেফতার হয়েছেন।[১৫১]

অর্থাৎ বাংলাদেশের মেয়েদের চলার জায়গা কোথাও নেই।

১৩. □□□□

□□□□ □ল্লে□□□ নির্যাতন সমূহের □□□□□□ বাংলাদেশে □□□ কিছু নির্যাত□ □□□ □□□□ □□ কোন □□□ ফেলা সম্ভব □□□□□ সেরকম কয়েকটি নির্যাতনের চিত্র □□□□ তুলে □□□ □□-

□. রংপুরের ২ গৃহবধুকে নির্যাতন

হাইকোর্টে এসে নির্যাতনের বর্ণনা □□□□□ রংপুরের ২ গৃহবধূ

রংপুরের □□□□ঞ্জ □□□□□□□ রাজারামপুর □□□□□□□ গ্রামের একব্যক্তি □□ □□ জুন □□□□□□□ আত্মহত □□□□□ □□ ব্যক্তির □□□□□ □□□□□□□ □□□, স্ত্রীর সঙ্গে মনোমালিন্যের □□□□□ □□□ আত্মহত্যা □□□□□□□ □□□ স্ত্রীর □□□□ □□□□ জন □□□□□ □□□□ □□□ □□ □□জুন গ্রামে স□□□□ □□□□ □□□□□ □□ ব্যক্তির স্ত্রীর □□□ একই সাথে □□□□□ □ড়ী□ আর □□ গৃহবধূ চারিত্রহীন □□□□□ □□□□ স্থানীয় মাতব্বরদে নির্দেশে প্রকাশ্যে লাঠিপেটা □□□ □□□ □□ □□ লোকের □□□□□ □□□□□ লাঠি □□□□ বেধড়ক পিটিয়ে অমানুষিক নির্যাতন ব□□ □□□ □ ঘ□□□□ বদরগগঞ্জ উপজেলার □□□□□□□ □□□□□ □ষ□□ কর্মকর্তা ৬ জুলাই □□□□ঞ্জ □□□□□ □□□□□ □□□□□[১৫২]

দুই গৃহবধুকে এ ভাবে নির্যানের বিষয়টি মহামান্যন্য হাইকোর্টের নজরে গেলে মহামান্য হাইকোর্ট গ্রাম্য মাতব্বরদের আদালতে হাজির হওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন। তাদের এবং দুই গৃহ বধুর বক্তব্য শুনে রংপুরের বদরগঞ্জে দুই গৃহ বধুকে সালিসের মাধ্যমে নির্যাতনের ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে চার জনকে গ্রেফতারের নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট। বিজ্ঞ আদালত নির্যাতনের শিকার দুই গৃহবধুর বক্তব্য শুনেন এবং তাদের দেখানো কিছু ছবিও দেখেন। পরে আদালত ওই সব ছবি বিচারিক আদালতে দাখিল করতে নির্দেশ দেন। একই সঙ্গে ছবিতে চেহি মোটকা, এনামুল, বাবুল, মহিবুল ও পবাকে গ্রেপ্তারের নির্দেশ দেন।[১৫৩]

□.সবুজবাগে ভা□□□□ □□□ বোন খুন

□□ □ মে ২০১১ বৃহস্পতিব □□□□□□□ সবুজ □□□ □□□□ □□□□□□□□□ একটি □□□□ □□ বোন রেখা □□□□□□□ কুপিয়ে হত্যা □□□□ □□□□ সৎ ভা□ মিঠুন □□□□ খুন □□□□ □□ মিঠুন □□ □□□□ □□□□□□ ডেকে পুলিশে □□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ পুলিশ □□□□ □□ □□□□ গ্রেফতার □□□□ □ □□□□□ ছেলে মিঠুনের বিরুদ্ধে সবুজবাগ □□□□ হত্যা □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ গ্রেফতারের □□ মিঠুন হত্যার □□□ স্বীকার □□□ □□□□□ □□□ ধা□□□ জবানবন্দি □□□□□□□□

রেখার স্বামী কামরুল □□□□□□ □□□□ ইদ্রিস □□□ প্রথম □□□□□ □□□□, □□□□ □□□ □□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□ সঙ্গে রেখার □ □□□□□□ □□□ ক্ষিপ্ত □□□ মিঠুন □□□ সৎবোন রেখাকে খুন □□□□□ □□□

[১৫১].আমাদের সময়, ২৪ জুলাই ২০১৪।

[১৫২]. প্রথম আলো, ২৫ জুলাই এবং ৭ আগষ্ট ২০১১।

[১৫৩]. প্রথম আলো, ৭ আগষ্ট ২০১১।

□□□□ রেখা □□□ গোপালগঞ্জে গ্রামের বা□□□ যেতেন। তখন □□□ □□□□ □□□□, □□□□□ সঙ্গে □□□□ □□ □□□ রেখার □ □□□□□[১৫৪]

□. নেশাগ্রস্ত ছেলের নির্যাতনে পা□□ বেড়াচ্ছেন মা

□□□□□□□ জেলার সৈয়দপুর □□□□□ পুরাতন বাবুপাড়ায় মেয়েজামাইর □□□□ আত্মগোপ □□□ □□□□ নেশাগ্র ছেলে জাহাঙ্গীরের মা □□□□□□ বেগম। ছয় □□□ ধরে মৃত □□□□ রেখে □□□□ □□ □□□□ সম্পত্ বিক্রি □□□ □□□ নেশা □□□□□ সে। □□□ □□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□ উপায়ান্তর □□ পেয়ে □□ মেয়ের □□□□□ □□□□□ □□□□ আশ্রয় □□□□□ স্বস্তি পাচ্ছেননা। □□□□□□ □ □□□ বন্ধুর সেখানেও □□□□ হুমকি দিচ্ছে। পত্রিকার □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□, '□□ □□□□ কিছুই □□□□ □□□□□□, কিন্তু □□□ □□□ □□□□ ক্ষান্ত □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□ দেবেন''।[১৫৫] মায়ের ভালোবাসাকে জিম্মি করেই জাহাঙ্গীর এই নির্যাতন চালাচ্ছে তার মায়ের উপর।৬

৪. রূপা হত্যার নেপথ্যে বর্ণবৈষম্য

দন্ত চিকিৎসা বিষয়ে ডিপ্লোমা পড়াকালে রূপার সঙ্গে সাগরের পরিচয়, প্রেম ও বিয়ে। শ্বশুর - শ্বাশুড়ী, দেবর, স্বামী ও আড়াই বছরের মেয়েকে নিয়ে লালমোহন দাস লেনের একটি বাড়ির নীচ তলায় ভাড়া থাকতেন। কিন্তু রূপা নিম্নবর্ণের নম:শূদ্র এবং সাগরের পরিবার কায়স্থ বিধায় সাগরের মা-বাবা রূপার প্রতি বিরূপ ছিলেন। তার হাতের রান্না খেতেননা শাশুড়ী। এ নিয়ে পারিবারিক দ্বন্ধ কলহের জের ধরেই গত ১৮ আগষ্ট ২০১১ খুন হন দন্ত চিকিৎসক রূপা রানী। রূপার গলায় ফাঁসের চিহ্ন ও পিঠে ধারালো অস্ত্রের আঘাত এবং শরীরে মারধরের চিহ্ন ছিল। যদিও পরিবারের সদস্যরা বাসায় ডাকাতি হয়েছে মর্মে বলতে চেয়েছেন এবং গয়নাগাটি নিয়ে গিয়েছে বলেছেন। কিন্তু পুলিশ তল্লাশী চালিয়ে এটি একটি হত্যাকান্ড বলেই ধারণা করেছেন। কারণ বাড়িতে ব্যবহৃত রান্না ঘরের বটি দিয়ে রূপার পিঠে কোপ দেয়ার প্রমান মিলেছে, ডাকাতদের নিজস্ব অস্ত্র থাকার কথা। আবার বাড়ির সকলের অলংকারাদিও ঘরের একটি কক্ষে পাওয়া গিয়েছে। পুলিশ রূপার স্বামী, দেবর এবং শাশুডীকে গ্রেফতার করেছে।[১৫৬]

৫. নেশার টাকার জন্য স্ত্রীকে যৌন পল্লিতে বিক্রি!

গাজীপুরের শ্রীপুরে নেশার টাকার জন্য জন্য একব্যক্তি তার স্ত্রীকে যৌন পল্লীতে বিক্রি করে দেন। গৃহবধু গত ৫ সেপ্টেম্বর ২০১২, ওই যৌন পল্লী থেকে কৌশলে পালিয়ে বাড়িতে এসে তাঁর স্বামী ও তার সহযোগীর বিরুদ্ধে শ্রীপুর থানায় মামলা করেন।[১৫৭]

৬. ছেলের হাতে মা খুন

বরগুনা জেলার বেতাগী উপজেলার কাজীরাবাদ ইউনিয়নের বকুলতলী গ্রামে জমি সংক্রান্ত বিরোধকে কেন্দ্র করে বৃদ্ধা মা সফুরা বেগম (৭৫) খুন হয়েছেন ছেলে সানুর (৩০) হাতে। সফুরা বেগমের ৩ ছেলের মধ্যে

---

[১৫৪]. প্রথম আলো, ৮ মে ২০১১।

[১৫৫]. প্রথম আলো, ৮ মার্চ ২০১১।

[১৫৬]. প্রথম আলো, ২৬ আগস্ট ২০১১।

[১৫৭]. প্রথম আলো, ১১ সেপ্টেম্বর ২০১২।

সানু (৩০) ছোট। অন্য ২ ছেলে হারুন ও মোশাররফের সংসারে স্বামী সহ বসবাস করছিলেন সফুরা। নিজ নামের ৬০ শতাংশ জমি থেকে ৩০ শতাংশ জমি অনেক আগেই ছেলে সানুকে দলিল করে দিয়েছে মা সফুরা। বাকি ৩০ শতাংশ জমি গত ৪ সেপ্টেম্বর ২০১৩, অন্য দুই ছেলে হারুন ও মোশাররফকে দলিল করে দেওয়ার কথা ছিল। তাতে সানু রাজি না হলেও মা তার সিদ্ধান্তে অটল থাকায় ছেলের হাতে তাকে প্রাণ দিতে হয়। [১৫৮]

৭. পরীক্ষা কেন্দ্রেও রেহাই নেই

গত ১৩ জুন ২০১৩ বৃহস্পতিবার বগুড়ার গাবতলী থানার সুখানপুকুর সৈয়দ আহম্মদ কলেজের পরীক্ষাকেন্দ্রে এইচএসসি পরীক্ষার কম্পিউটার বিষয়ের ব্যবহারিক পরীক্ষা চলাকালে পরীক্ষার্থী আল শাহরিয়ার হোসেন দুদু অন্য মেয়ে পরীক্ষার্থী কে প্রেমের প্রস্তাব দেয়। তার প্রস্তাবে সাড়া না দেয়ায় পরীক্ষা কেন্দ্রেই সে ব্লেডের পোঁচে মেয়েটির মুখমন্ডল ক্ষতবিক্ষত করে দেয়। পরে তাকে ভ্রাম্যমান আদালতে হাজির করা হলে তাকে ১ বছরের সশ্রম কারাদন্ড দেওয়া হয়।[১৫৯]

৮. সেই মায়ের ঠাঁই গাজীপুর বৃদ্ধাশ্রমে

গত ৩০ জানুয়ারী ২০১৪ রাতে কুমিল্লার পাষন্ড দুই ছেলে বোনের বাড়িতে বেড়াতে নিয়ে যাওয়ার কথা বলে তাদের গর্ভধারিণী মা আরাফাতুন নেছাকে বরিশালের গৌরনদীর টরকী বাসস্ট্যান্ডের রাস্তার পাশে ফেলে চলে যায়। রোগাক্রান্ত বৃদ্ধা পরবর্তী ১০ দিন রাস্তার পাশেই ছেলেদের আশায় দিনাতিপাত করতে থাকেন। স্থানীয় একটি এনজিও এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসার এর মাধ্যমে আরফাতুননেছার খাওয়া দাওয়া এবং চিকিৎসা চলতে থাকে। বিষয়টি পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকলে গত ১৫ ফেব্রুয়ারী শনিবার গাজীপুরের বয়স্ক পুনর্বাসন কেন্দ্রের সমন্বয়কারী মোঃ রবিউল ইসলাম আরফাতুন্নেছার ভরণপোষণের দায়িত্ব নেন।[১৬০](চিত্র ১৩, বৃদ্ধা আরাফাতুননেছার ছবি)

৯. এক স্ত্রীকে নয় দুই স্ত্রীকেই হত্যা

যৌতুক দাবী নয়, ঝগড়া বিবাদও নয় - হালকায় জিকির করতে যাওয়ার কারণে দুই স্ত্রীকেই কুপিয়ে হত্যা করেছেন রংপুরের রূপসী গাউসিয়া গ্রামের মোঃ ইলিয়াছ আলী । ঘাতক স্বামীর বিরুদ্ধে থানায় মামলা হয়েছে।[১৬১]

৫.৪.আদিবাসী নারীদের অবস্থা

বাংলাদেশে প্রায় ৪৫টির অধিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আদিবাসী জাতি বসবাস করে। যদিও দেশের দক্ষিন-পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত পার্বত্য চট্টগ্রামে সবচেয়ে বেশী আদিবাসী জাতির অবস্থান। একসময়ে এ অঞ্চলে সম্পূর্ণ রূপে আদিবাসী অধ্যুসিত হলেও নানা উত্থান-পতনের মধ্য সমতল এলাকার জনগণ কর্তৃক সেখানে বসবাস স্থাপনের মধ্য দিয়ে বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রামের মোট জন সংখ্যার ৫১% লোক আদিবাসী বংশোদ্ভুত বলে বলা হয়ে থাকে। আবার সমতল অঞ্চলের মধ্যেও উত্তর পশ্চিম অঞ্চল (রাজশাহী-দিনাজপুর), মধ্য-উত্তর

---

[১৫৮] .আমাদের সময়, ৫সেপ্টেম্বর ২০১৩।

[১৫৯].আমাদের সময়, ১৪ জুন ২০১৩।

[১৬০] .আমাদের সময়, ১৬ ফেব্রুয়ারী, ২০১৪।(চিত্র ১৩- বৃদ্ধা আরাফাতুননেছার ছবি)

[১৬১]. যুগান্তর, ১২ জুলাই ২০১৪।

অঞ্চল (বৃহত্তর ময়মনসিংহ-টাঙ্গাইল), উত্তর-পূর্ব অঞ্চল (বৃহত্তর সিলেট) উপকুল অঞ্চল (চট্টগ্রাম-কক্সবাজার-পটুয়াখালী-বরগুনা) এবং দক্ষিন-পশ্চিম অঞ্চল (বৃহত্তর বরিশাল-খুলনা-যশোর) অঞ্চলে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর বসবাস করছে। সমতল অঞ্চলের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মধ্যে সাঁওতালরাই হচ্ছে বৃহত্তর জনগোষ্ঠী। সমতল অঞ্চলের মোট আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মধ্যে ৩০% লোক সাঁওতাল জনগোষ্ঠী বলা হয়ে থাকে। এর পর যথাক্রমে গারো, হাজং, কোচ, মনিপুরী, খাসি, রাখাইন জনগোষ্ঠী।[১৬২] শান্তিপ্রিয় এই আদিবাসী এলাকার নারীদের উপরও নেমে এসেছে নির্যাতনের ঝড়। গত ২০১২ সালে ৭৫ জন আদিবাসী নারী ও শিশু সহিংসতার শিকার হয়েছে। যার মধ্যে ৫৫ জন পার্বত্য চট্টগ্রামের । সহিংসতার শিকার ৭৫ জনের মধ্যে ৩০ জনই শিশু, যাদের বয়স ১৬ এর নীচে।[১৬৩] মূলতঃ সুবিচার না পাওয়া, দূর্নীতি, আইনের প্রতি অশ্রদ্ধা, মামলার আলামত সংরক্ষণ না করা, যথাযথ মেডিকেল রিপোর্ট না পাওয়া প্রভৃতি কারণে আদিবাসী নারী ধর্ষণ ও অপহরণের ঘটনা বাড়ছে। স্ব- রাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের তথ্য মতে ২০১০ -১১ এই দুই বছরে তিন পার্বত্য জেলায় মোট ২১৫টি নারী ও শিশু নির্যাতন সংক্রান্ত মামলা করা হয়েছিল, যার মধ্যে ধর্ষণ ও যৌন হয়রানির মামলা সবচেয়ে বেশী। ২১৫টি মামলার মধ্যে ১৬৬টির চার্জশীট দেওয়া হয়েছে, রায় হয়েছে মাত্র নয়টির।একই সাথে আদিবাসী এলাকায় এমন অনেক ঘটনাই সংঘটিত হচ্ছে যেগুলো অনেকে সামাজিক বিড়ম্বনার ভয়ে প্রকাশ করতে চান না। কখনও কখনও নিরাপত্তা হুমকির কারণে ভুক্তভোগীরা থানায় মামলাও করতে পারেননা।[১৬৪]

আবার শুধু মাত্র কাউখালি উপজেলায় (রাঙামাটি জেলার) ডিসেম্বর ২০১২ মাসের প্রথম ও শেষ ভাগের মধ্যে তিনটি হত্যা কান্ড ঘটেছে। তন্মধ্যে ৮ ডিসেম্বর ২০১২ আমছড়ি পাড়ায় নিখোঁজের পাঁচদিন পর পুকুর থেকে এক তরুণীর লাশ উদ্ধার, ১৪ ডিসেম্বর ২০১২ নাইল্যাছড়ি গ্রামে পাহাড়ি চোলাইমদ খেতে এসে খুন হয় আলী আকবর নামের যুবক। অতঃপর গত ২১ ডিসেম্বর ২০১২ শুক্রবার কাউখালি উপজেলার কলমপতি ইউনিয়নের বড্ডল গ্রামের স্কুলপড়ুয়া এক ছাত্রী পাশ্ববর্তী পাহাড় থেকে গরু আনতে গিয়ে ধর্ষণের পর হত্যার শিকার হয়েছে।[১৬৫]

এই পাহাড়ী এলাকায় রাজা কর্তৃক একটা আঞ্চলিক বিচার ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল। সে সময়ে এই ধরনের ঘটনা এক রকম শুন্যের পর্যায়েই ছিল। বর্তমানে এই বিচার ব্যবস্থা স্তিমিত হয়ে পড়েছে। সম্ভবতঃ এই কারণেই এ ধরনের ঘটনা শান্তিপূর্ণ পার্বত্য এলাকায় বিস্তার লাভ করছে।

পুরো বাংলাদেশ জুড়ে □□□□ নির্যাতনের যে চিত্র বর্তমান অধ্যায়ে তুলে □□া হয়েছে □□□ □□□ □□□ সাম্প্রাতিক □□□□□□□ □ চিত্র অত্যন্ত □□□□□□ বাংলাদেশে নারী নির্যাতন এর পরিমান বেড়েই চলছে। এই ২০১৩/২০১৪ তে ও বাংলাদেশে পত্রপত্রিকার শিরোনাম ‘নারীর প্রতি সহিংসতা বেড়েই চলেছে’, ‘নির্যাতনে

---

[১৬২].মঙ্গল কুমার চাকমা , জেমস্ ওয়ার্ড খকশী, পল্লব চাকমা,মংসিং মারমা, হেলেনা বাবলী তানাং ঃ বাংলাদেশের আদিবাসী এথনোগ্রাফীয় গবেষণা (প্রথম খন্ড), ১২৭ আজিজ সুপার মার্কেট, শাহবাগ. ঢাকা, ১০০, ২০১০।

[১৬৩].কাপেং ফাউন্ডেশন রিপোর্ট, ২০১২।

[১৬৪]. ইলিরা দেওয়ান (মানবাধিকার কর্মী) ঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম-নারীর প্রতি সহিংসতা ও সাম্প্রতিক ঘটনা , প্রথম আলো, ১৭ জুলাই ২০১২ এর উপ - সম্পাদকীয় কলামে প্রকাশিত।

[১৬৫] .আমাদের সময়, ২৩ ডিসেম্বর ২০১২।

বিপন্ন নিরাপদ মাতৃত্ব’ এবং ‘নির্যাতনের বিরুদ্ধে করা [illegible] টিকে [illegible]’ ইত্যাদি।। [illegible] ও ডেনমার্ক স[illegible] যৌথ উদ্যোগে [illegible] কর্মসূচির সূত্র অনুসারে, জানুয়ারী [illegible] থেকে জানুয়ারী [illegible] পর্যন্ত মোট [illegible] নির্যাতনের শি[illegible] মধ্যে [illegible] ধর্ষণ [illegible] গণধর্ষনের [illegible] হত্যা [illegible] ধর্ষনের [illegible] হত্যা [illegible] আত্মহত্যা [illegible][166]

১৪ টি দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের ভিত্তিতে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের তৈরী করা পরিসংখ্যান অনুযায়ী, গত ২০১২ সনে দেশে পাঁচ হাজার ৬১৬ জন নারী বিভিন্নভাবে নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। এর মধ্যে ধর্ষণের শিকার হয়েছেন ৭৭১ জন৷৷ এর মধ্যে ১৫৭ জন গণধর্ষণের শিকার, হত্যা করা হয়েছে ৯০০ জন নারী ও শিশুকে। ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে ১০৬ জনকে। ১৩৩ জন নারীকে ধর্ষণের চেষ্টা করা হয়েছে। ৬৬২ জন নারীকে উত্যক্ত করা (ইভ টিজিং) হয়। এ কারণে ১৭ জন নারী আত্ম হত্যা করে। এসিডদগ্ধ হন ৬৭ জন। এর মধ্যে একজন মারা গেছে। এছাড়া গোপন রাখার প্রবণতার কারণে গণ মাধ্যমে প্রকাশিত খবরের সংখ্যা প্রকৃত ঘটনার তুলনায় অনেক কম বলে মনে করা হয়।[167]

পুলিশ সদর দপ্তরের নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ সেলের তথ্য অনুযায়ী , ২০০১ সাল থেকে ২০১২ সালের নভেম্বর পর্যন্ত প্রায় এক যুগে এক লাখ ৮৩ হাজার ৩৬৫ জন নারী নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। মোট মামলার সংখ্যা এক লাখ ৬৫ হাজার ১৯৪টি। গত এক যুগে মোট পাঁচ লাখ ৪৫ হাজার ৩৮১ জন আসামির মধ্যে গ্রেপ্তার হয়েছে মাত্র ৮০ হাজার ৮০১ জন। এ বিষয়ে আইন ও সালিশ কেন্দ্রের অভিমত হলো, নারী নির্যাতনের ঘটনাগুলোতে বিচার প্রক্রিয়ায় দীর্ঘসূত্রতা এবং অপরাধ নিরসনে যথাযথ ও কার্যকর ব্যবস্থা না থাকাতেই ঘটনার সংখ্যা ও ভয়াবহতা বেড়ে চলেছে।[168]

নারী নির্যাতন সংক্রান্ত সর্বশেষ খবর আরও ভয়ংকর। কারণ, দেখা যাচ্ছে ২০১৪ সালে এসেও নারী নির্যাতন বেড়েই চলছে। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের এক বিবৃতি অনুসারে- ২০১৪ সালে জানুয়ারী থেকে জুন পর্যন্ত ছয় মাসে ধর্ষণের ঘটনা ৩০৪টি, গণধর্ষণ ৮২টি, ধর্ষণের পর হত্যা ৪৫টি, যৌতুকের কারণে হত্যা ১২৭টি, যৌতুকের কারণে নির্যাতন ৯০টি, আত্মহত্যা ৮০টি, ফতোয়া সহ বিভিন্ন প্রকার নির্যাতনের ঘটনা ১৫টি। যার কারণে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন সামাজিক প্রতিরোধ কমিটি।[169]

আর আইন ও সালিশ কেন্দ্রের হিসাব মতে (যা পূর্বেও দেখানো হয়েছে) ২০১৪ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত উত্যক্তকরণ ও যৌনহয়রাণীর শিকার হয়েছেন ১৪৬ জন নারী, ৭০৭ জন নারী ও শিশু ধর্ষণের শিকার হন,

---

১৬৬. প্রথম আলো, বিশেষ প্রতিবেদন, ২ জুন, ২০১১।

১৬৭. রোকেয়া রহমানঃ নারীর প্রতি সহিংসতা বেড়েই চলেছে, প্রকাশিত প্রতিবেদন-প্রথম আলো, ২৮ মে ২০১৩|

১৬৮.প্রথম আলো, ১৯ জানুয়ারী ২০১৩।

১৬৯. যুগান্তর, ২৪ জুলাই, ২০১৪।

এসিড নিক্ষেপের ঘটনা ঘটেছে ৪৮ টির মত, যৌতুকের কারণে নির্যাতনের শিকার হয়েছেন ৯৬ জন নারী, পারিবারিক নির্যাতনের শিকার ৪৮৮ জন, ৬১ জন নারী গৃহকর্মী নির্যাতনের শিকার হন।[১৭০]

আবার পুলিশ সদর দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী জুন ২০১৩ থেকে ফেব্রুয়ারী ২০১৪ পর্যন্ত নারী নির্যাতনের কারণে রুজুকৃত মামলার একটি চিত্র নিম্নরূপ -

সারণী ৩২

পুলিশ সদর দপ্তর এর তথ্য অনুযায়ী জুন ২০১৩ থেকে ফেব্রুয়ারী ২০১৪ পর্যন্ত নির্যাতনের কারণে মামলার সংখ্যা

মামলর কারণ	জুন ২০১৩	জুলাই ২০১৩	আগষ্ট ২০১৩	সেপ্টেম্বর ২০১৩	অক্টোবর ২০১৩	নভেম্বর ২০১৩	ডিসেম্বর ২০১৩	জানুয়ারী ২০১৪	ফেব্রুয়ারী ২০১৪	মোট
যৌতুক	৬৫৭	৫৯৩	৫২২	৬১৬	৫৩৩	৪৪৬	৩৬২	৩৭৪	৩৬৭	৪৪৭০
এসিড নিক্ষেপ	১৪	৯	৯	১২	৬	২	৫	৪	৪	৬৫
Abduction	৩৬৬	২৮৫	২৭৩	৪০৮	৩১৯	৩৩৮	২৫৩	২৬৫	২৯১	২৭৯৮
ধর্ষণ	৩৭০	৩৪৫	২৫৪	৩৭৫	২৯৭	২৬৪	১৭১	১৭৭	২১৪	২৪৬৭
Homicide/injured after Rape	০	৪	০	১	২	৪	১	১	২	১৫
হত্যা	৩১	২২	২৬	১৪	১৮	২১	১৫	১৪	১৪	১৭৫
Injured	১৮	১৬	৮	১৯	২৬	৫	১২	৮	১১	১২৩
অন্যান্য	৪৬৫	৪৮০	৩৮৩	৩৬২	৩০৯	৩০৬	২১৫	১৯০	২৪৬	২৯৫৬
সর্বমোট	১৯২১	১৭৫৪	১৪৭৫	১৮০৭	১৫১০	১৩৮৬	১০৩৪	১০৩৩	১১৪৯	১৩০৬৯[১৭১]

দেখা যাচ্ছে জুন ২০১৩ থেকে ফেব্রুয়ারী ২০১৪ তথা মাত্র ৯ মাসে নির্যাতনের কারণে মোট মামলার সংখ্যা ১৩০৬৯। নারী নির্যাতনের ঘটনা বৃদ্ধিও এটি একটি দালিলিক প্রমান।তাতে যে প্রশ্নটির উদয় হয় তা হ'ল দেশে পুলিশ বাহিনী কর্তৃকই কি পর্যন্ত আইন বাস্তবায়ন করা সম্ভব হচ্ছে?

নারী নির্যাতন সংক্রান্ত সর্বশেষ খবর আরও ভয়ংকর। কারণ, দেখা যাচ্ছে ২০১৪ সালে এসেও নারী নির্যাতন বেড়েই চলছে। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের এক বিবৃতি অনুসারে- ২০১৪ সালে জানুয়ারী থেকে জুন পর্যন্ত ছয় মাসে ধর্ষণের ঘটনা ৩০৪টি, গণধর্ষণ ৮২টি, ধর্ষণের পর হত্যা ৪৫টি, যৌতুকের কারণে

---

[১৭০]. প্রথম আলো, ১ জানুয়ারী ২০১৫।

[১৭১]. Bangladesh Report ঃ The Implementation of the Beijing Declarationand Platform for Action(1995) and the outcomes of the Twenty-third Special Session of the General Assembly (2000), May, 2014, By Ministry of Women and Children Affairs, Govt . Of the Peoples Republic of Bangladesh. Annexes – P-X111.

হত্যা ১২৭টি, যৌতুকের কারণে নির্যাতন ৯০টি, আত্মহত্যা ৮০টি, ফতোয়া সহ বিভিন্ন প্রকার নির্যাতনের ঘটনা ১৫টি। যার কারণে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন সামাজিক প্রতিরোধ কমিটি।[১৭২]

গত ২০১২ সনের ১৩ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ আনুষ্ঠানিক ভাবে 'ওয়ান বিলিয়ন রাইজিং (ওবিআর) বা 'উদ্যমে উত্তরণে শতকোটি'- শীর্ষক এক বৈশ্বিক প্রতিশ্রুতির সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করে। আর গত ১৪ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার, ২০১৩ এ সারা দেশে নারী পুরুষ 'যথেষ্ট হয়েছে নারী নির্যাতন আর নয়' এ আওয়াজ তুলে মানব বন্ধনে মিলিত হন। দেশের প্রায় ২০০টি সরকারী - বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, সংস্থা, এনজিও সহ বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠান এ আন্দোলনে শরীক হয়েছেন। 'ওয়ান বিলিয়ন রাইজিং (ওবিআর) বা 'উদ্যমে উত্তরণে শতকোটি' শীর্ষক বিশ্বব্যাপি ঘোষিত এক প্রতিশ্রুর্তির প্রতি সংহতি জানিয়ে এ কর্মসূচি পালন করা হয়।[১৭৩]

গত ২০ জানুয়ারী ২০১৩, রবিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয় মানব বন্ধন। শিক্ষক- শিক্ষয়িত্রী, রাজনৈতিক নেতা-নেত্রী, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ সকলে একত্রিত হয়ে আওয়াজ তোলেন,'নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলুন''।[১৭৪] গত ১৯ জানুয়ারী ২০১৩ দৈনিক পত্রিকা প্রথমআলো 'নারীর প্রতি সহিংসতা এখনই প্রতিরোধ করুন' শীর্ষক এক গোল টেবিল বৈঠক এর আয়োজন করে। নারী নির্যাতনকে শুন্যের কোঠায় নামিয়ে আনার জন্য আলোচকেরা স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী সুপারিশ করেন।(চিত্র ১৪, গোল টেবিল বৈঠকের ছবি) ।[১৭৫]

বর্তমান গবেষণার ৪র্থ অধ্যায়ে দেখা গেছে বাংলাদেশে আইন- বিধি - ব্যবস্থা, জেন্ডার ইস্যু বাস্তবায়নে জাতীয় - আন্তর্জাতিক উদ্যোগ, প্রতিবাদ-প্রতিরোধ কিছুরই অভাব নেই। এরূপ অবস্থায় স্বাভাবিক ভাবেই যে প্রশ্ন দেখা দেয় তা হলো, কেন বন্ধ হচ্ছেনা নারী নির্যাতন? তার উত্তর প্রসঙ্গে মালেকা বেগমের বক্তব্য প্রাসঙ্গিক। তিনি বলেন, "জেন্ডার উন্নয়ন প্রেক্ষিতে বলা যায়, বাংলাদেশে নারীর অধিকার সুরক্ষার আইনের খুব একটা ঘাটতি নেই। যা আছে তা হলো আইন প্রয়োগের অভাব। এ ক্ষেত্রে পিতৃতান্ত্রিক মানসিকতা, সমাজের সর্বস্তরে দুর্বৃত্তায়ন, কালো টাকা ও পেশী শক্তির কারণে বেশিরভাগ সময়ই নারী ন্যায় বিচার থেকে বঞ্চিত হয়। এ ছাড়া মামলার দীর্ঘসূত্রতা কিংবা প্রচলিত আইনের দুর্বলতার কারণে অনেক সময়ই অপরাধী পার পেয়ে যায়''।[১৭৬]

মালেকা বেগম যে অন্যান্য কারণের সাথে পিতৃতান্ত্রিক মানষিকতার উল্লেখ করেছেন, মূলতঃ নারী নির্যাতনের মাত্রা বছরের পর পর এভাবে বেড়ে চলার পেছনের প্রধান কারণই হলো এটি। অধিকাংশ পুরুষ নারীর প্রতি এ ধরনের আচরণকে নির্যাতন মনেই করেননা। তারা মনে করেন এটি তাদের ধর্মীয় অধিকার। এ প্রসঙ্গে জাতিসংঘের জনসংখ্যা তহবিল পরিচালিত একটি জরিপের ফলাফল থেকে দেখা যায় - জরিপে অংশ গ্রহণকারী ৬৫% পুরুষ ধর্মীয় বিশ্বাসের ভিত্তিতে স্ত্রীকে মারধর করা সমর্থন করেন। ৫১% পুরুষ মনে করেন নারীদের অবাধে চলাফেরা করা উচিত নয়। ৬০% পুরুষ মনে করেন নারীর চলা ফেরা পুরুষ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। ৯৭% পুরুষ নারী নির্যাতনকে কোন সমস্যাই মনে করেননা। জরিপে যে বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে তা

---

১৭২. যুগান্তর, ২৪ জুলাই, ২০১৪।

১৭৩. প্রথম আলো, ১৩ ফেব্রুয়ারী ২০১৩।

১৭৪. প্রথম আলো, ২১ জানুয়ারী ২০১৩।

১৭৫.প্রথমআলো, ২০ জানুয়ারী ২০১৩। (চিত্র ১৪, গোল টেবিল বৈঠকের ছবি)

১৭৬.মালেকা বেগম ঃ নারী অধিকার বিষয়ক আইন, জেন্ডার ও উন্নয়ন কোষ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২১৫।

হলো নারীর প্রতি পুরুষের এ ধরনের আচরণ, নির্যাতন এবং সাধারণ ভাবে নারীর প্রতি পুরুষের ধারণা কিংবা দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে ধর্মীয় গোঁড়ামী এবং অপব্যাখ্যা গুরুত্বপূর্ণ একটি ভূমিকা পালন করে। পারিবারিক নির্যাতনের অধিকাংশ ঘটনাই ধর্মীয় গোঁড়ামীর ভিত্তিতে জায়েজ করার চেষ্টা করা হয়।[১৭৭] জরিপটি ৬/৭ বছর আগের হলেও অদ্যাবধি এই মনোভাবের কোনই ব্যতিক্রম হয়নি।

এ সম্পর্কে জনাব যতীন সরকার বলেন, "ধর্ম এমন একটা বিষয় যা মানুষের জীবনের সাথে এমন নিবিড় ভাবে সম্পৃক্ত যে তার কোন অপব্যাখ্যা থেকে কোন সৃষ্ট দুষ্ট শৃঙ্খল থেকে উত্তরণের বিষয়টি সহজসাধ্য নয়। আমাদের পুরুষতন্ত্র ধর্ম এবং তৎসংশ্লিষ্ট নীতি-নৈতিকতার নামে এমন কিছু সমাজ-শৃঙ্খলার বিধিনিষেধ নারীদের উপর চাপিয়ে দিয়েছে, যা নারীদের মনোজগতকে এমনভাবে শৃঙ্খলিত করে রেখেছে যাতে নারী সর্বদাই নিজেকে পুরুষের চেয়ে হীন ও দুর্বল ভাবতে বাধ্য হয় অথবা পুরুষের মনোরঞ্জন করাকেই জীবনের চরম প্রাপ্তি বলে মনে করে"।[১৭৮]

জনাব যতীন সরকার যে বলেছেন , "ধর্ম এমন একটা বিষয় যা মানুষের জীবনের সাথে এমন নিবিড় ভাবে সম্পৃক্ত যে তার কোন অপব্যাখ্যা থেকে কোন সৃষ্ট দুষ্ট শৃঙ্খল থেকে উত্তরণের বিষযটি সহজসাধ্য নয়"[১৭৯] । - মূলতঃ এ কথাটিও সঠিক ও যথার্থ নয়। আসলে সেই দুষ্ট শৃঙ্খল থেকে উত্তরণের কোন চেষ্টাই করা হয়না।

আর তাই বর্তমান গবেষণার মূল লক্ষ্যই হলো সেরূপ একটি প্রচেষ্টা। অর্থাৎ ধর্মের ভেতরে নারীদের ঘিরে অনুপ্রবেশ ঘটানো বিকৃতি, অপব্যাখ্যা এবং কুসংস্কার সমূহ চিহ্নিত করে ধর্মের মৌলিক আদর্শের অনুসন্ধান করা। সে লক্ষ্যেই বর্তমান গবেষণার পরবর্তী অধ্যায়ে ধর্মের অপব্যাখ্যা সমূহ সনাক্ত করে মৌলিক আদর্শের অনুসন্ধান করা হয়েছে।

---

[১৭৭]. সমকাল, ২৪ এপ্রিল, ২০০৭।

[১৭৮]. যতীন সরকার ঃ মুক্তি, জেন্ডার ও উন্নয়ন কোষ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬৩৯।

[১৭৯].পূর্বোক্তঃ পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬৩৯।

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

৬ষ্ঠ অধ্যায়
নারী মুক্তির ক্ষেত্রে ধর্মের অবস্থান

বর্তমান পৃথিবীতে বহুল প্রচলিত যে ক'টি ধর্ম তারমধ্যে হিন্দু, বৌদ্ধ, ইহুদী, খৃষ্টান এবং ইসলাম ধর্ম প্রধান। একটু গভীর ভাবে লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে বিদ্যমান সব ক'টি ধর্মেরই অন্তর এক ও অভিন্ন তথা এক স্রষ্টা, পরকাল, শেষবিচার এবং সেখানে ইহকালীন ক্রিয়াকান্ডের জন্য জবাব দিহিতা এবং পুরস্কৃত হওয়া ও শাস্তি পাওয়া ইত্যাদি। এ ছাড়াও সততা, সত্যবাদিতা, ধৈর্যশীলতা, ন্যায়নীতিবোধ এসব সকল ধর্মেরই প্রাণ। তার থেকেই এটি বিশ্বাস করার যুক্তি রয়েছে যে পৃথিবীতে বিদ্যমান সবক'টি ধর্মের ই উৎস এক। অর্থাৎ যুগে যুগে মহান স্রষ্টার পক্ষ থেকেই পৃথিবীতে সত্যের বাণী নিয়ে বার বার নাজেল হয়েছে সত্য ধর্ম। তবে প্রতিটি ধর্মের ক্ষেত্রেই যে বিষয়টি ঘটেছে তা হ'ল পরবর্তীতে, তথা একটা নির্দিষ্ট সময় পরে সাধারণ মানুষের হাতে পড়ে তাদের মনের আদলে সংকীর্ণ ব্যাখ্যা প্রাপ্ত হয়ে হয়ে প্রতিটি ধর্ম-ই বিকৃত হয়েছে। এভাবে সংকীর্ণ ব্যাখ্যা প্রাপ্ত হতে হতে যখনই একটা ধর্ম চূড়ান্ত ভাবে বিকৃত হয়েছে তথা ঐশ্বরিক ধারণাকে পর্যন্ত পরিবর্তন করে ফেলা হয়েছে, তখনই পুনঃ সত্যের বাণী নিয়ে আবার এসেছে - সত্য ধর্ম। তাই পৃথিবীতে বিদ্যমান কোন ধর্মই অবহেলার বিষয় নয়, তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের বিষয় নয়। কিন্তু যেহেতু সব ক'টি ধর্মই যুগে যুগে বিকৃত হয়েছে, কুসংস্কারাচ্ছন্ন হয়েছে তাই অবহেলার কিংবা তুচ্ছ তাচ্ছিল্য এবং সমালোচনার বিষয় হচ্ছে প্রতিটি ধর্মেই অনুপ্রবেশ করা বিকৃতি, অপব্যাখ্যা এবং কুসংস্কার। একটু গভীর ভাবে লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, এই সব বিকৃতি অপব্যাখ্যা এবং কুসংস্কার সমূহের অধিকাংশই এসেছে নারীকে ঘিরে। পুরুষের সীমাহীন শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদোনোদ্দেশ্যে এবং নারীকে তুচ্ছাতিতুচ্ছ সেবাদাসী বানানোর লক্ষ্যে। আর এভাবেই পৃথিবী জুড়ে ধর্মকেই করা হয়েছে নারী নির্যাতনের প্রধান হাতিয়ার।

বর্তমান গবেষণায় সর্বশেষ নাজেলকৃত ধর্ম ইসলাম ধর্মকেই আলোচনার কেন্দ্র হিসেবে গ্রহন করা হয়েছে এবং ইসলাম ধর্মের উপরই মৌলিক আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। তবে আলোচনার সুবিধার্থে অন্য ক'টি ধর্মের ক্ষেত্রে নারীদের ঘিরে অনুপ্রবেশ করা অপব্যাখ্যা, কুসংস্কার এবং বিকৃতির কিছুটা স্বরূপ তুলে ধরা হয়েছে। অতঃপর ইসলাম ধর্মে নারীকে ঘিরে অনুপ্রবেশ করা অপব্যাখা সমূহ সনাক্ত করার প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে। অপব্যাখ্যা সনাক্তের প্রচেষ্টার মাধ্যমে দেখানো হয়েছে যে মূলতঃ মূল ধর্ম কোন অবস্থাতেই নারী নির্যাতনের হাতিয়ার তো নয়ই বরং ধর্মের মৌলিক বিষয়াদিই নিশ্চিত করে সত্যিকার অর্থে নারীর মুক্তি, দেয় অধিকার এবং মর্যাদা।

৬.২ হিন্দু , বৌদ্ধ, ইহুদী এবং খ্রিষ্টান ধর্মে নারীদের ঘিরে বিকৃতি, অপব্যাখ্যা এবং কুসংস্কার

৬.২.১ হিন্দু ধর্ম

পৃথিবীতে বিদ্যমান ধর্মসমূহের মধ্যে হিন্দু ধর্মই প্রাচীনতম ধর্ম। তাই এটিকে সনাতন ধর্মও বলা হয়ে থাকে। এখানে এক ঈশ্বর বা ভগবান তথা এক স্রষ্টার ধারণা, ইহকাল, পরকাল এবং শেষ বিচার, ইহকালীন ভালো মন্দের জন্য পরকালে স্বর্গ ও নরক লাভের মৌলিক ভাবধারা বিদ্যমান স্বত্বেও এই ধর্মে অনুপ্রবেশ করেছে অসংখ্য কাল্পনিক দেবদেবী, সেগুলোর পুজো করা, বিভিন্ন শক্তি পুজা, মানুষ পুজা, স্বামীকে দেবতা ভেবে পূজা, নারীকে তাদের সেবা দাসী ভাবা, সতীদাহের নামে নারীকে জীবন্ত দাহ ইত্যাদি বিস্তর কুসংস্কার । সেগুলো ধর্মের ভিতর এমনভাবে স্থান করে নিয়েছে যে, মূল বিষয় নয় বরং এই কুসংস্কারই আজ ধর্ম হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। যদিও মূল হিন্দু ধর্ম গ্রন্থ গীতায় এবং বেদে কিন্তু নারীদের যথেষ্ট মর্যাদাই নিশ্চিত করা হয়েছে। কিন্তু সেদিকে কেউ খেয়াল না করে মানুষের তৈরী আইন-কানুন গুলোকে ধর্মীয় বিধান জ্ঞান করে

বসে আছেন। সেগুলোর চর্চা এত বেশী হয়েছে যে, সাধারণ মানুষেরা তো বটেই, প্রখ্যাত লেখক হুমায়ুন আজাদের মত বিজ্ঞজনেরাও একই ধারণার বশবর্তী হয়ে পড়েছেন।

প্রখ্যাত লেখক হুমায়ুন আজাদ হিন্দু ধর্মীয় আইনে নারীদের নিয়ে সৃষ্ট আইন বিধিবিধান সম্পর্কে বলেন, ‘‘হিন্দু ধর্মীয় আইনগুলো নারী পীড়নের স্বর্গীয় অনুমতি পত্র। .. . হিন্দু আইনে নারীর কোন মূল্য নেই, নারী অস্থাবর সম্পত্তি মাত্র, নারী কোন সম্পত্তির মালিক হতে পারেনা, পারেনা সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতে। .. .. বিয়েই তার জীবন কারাগার। .. .. হিন্দু বিধানে বিয়ে বাধ্যতামূলক নারীর জন্য, সে প্রক্রিয়ায় নারীকে পরিণত করা হয় দাসীতে। .. .. স্বামীকে করে তোলা হয়েছে গৃহের দেবতা, তবে গৃহে কোন দেবী নেই। রয়েছে দাসী, দাসী স্ত্রীটি। .. .. হিন্দু পিতৃতন্ত্রের বিধি বিধান নারীর জীবনকে এমন নারকীয় করে তুলেছিলো যে কন্যা কামনাই ছিলো নিষ্ঠুরতা, মেয়েকে লেখাপড়া শেখানো যাবেনা, বিয়ে দিতে হবে শৈশবে। তিরিশ বছরের পুরুষ বারো বছরের কন্যাকে বিয়ে করবে, চব্বিশ বছরের পুরুষ আট বছরের কন্যকে বিয়ে করবে, নইলে ধর্ম নষ্ট হয়। .. .. স্বামীর মৃত্য হলে তাকে আর বিয়ে দেয়া যাবেনা, তাকে তুলে দিতে হবে স্বামীর চিতায় .. .. বিধবা হিন্দু পিতৃতন্ত্রের দুঃস্বপ্ন, তার খড়্গের শোচনীয়তম বলী .. .. বিধবাকে সতী নাম দিয়ে দাহ করার ব্যবস্থা করেছে হিন্দু বিধি। .. .. সব বিধবা সহমরণে যেতোনা, তবে যারা বেঁচে থাকতো তারা বাঁচতো চরম লাঞ্চনা, অপমান, কলঙ্কের মধ্যে’’। এবং ‘‘হিন্দু পিতৃতন্ত্রে এ হচ্ছে নারীর সম্পূর্ণ জীবনী’’।[১]

অর্থাৎ পৃথিবীতে বিদ্যমান সনাতন ধর্মটি নারী নির্যাতনের বিশাল এক হাতিয়ার হয়ে বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু বেদ, গীতা পর্যালোচনা করে কেউ কখনই দেখেননি যে সেখানে নারীদের অবস্থান কিরূপ? একমাত্র রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরগণ কিছুটা উদ্যোগ নিয়ে সতীদাহ, বাল্যবিয়ে বন্ধের এবং বিধবাদের বিয়ের পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। অতঃপর সতীদাহ ব্যতীত বাল্যবিয়ে, বিধবাদের বিয়ে না হওয়া ইত্যাদি যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই চলে গেছে।

৬.২.২ বৌদ্ধ ধর্ম

বৌদ্ধ ধর্মের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা। সেখানেও নারীদের বিষয়ে ধর্মের যথেষ্ট বিকৃতি ঘটানো হয়েছে। ড. বেনু প্রসাদ বড়ুয়া তাঁর ‘বৌদ্ধধর্ম ও নারী’ প্রবন্ধে এই ধর্মের মৌলিক আদর্শ সম্পর্কে বলেন, “বুদ্ধের আবির্ভাব ভারতীয় নারী সমাজের জন্য একটি স্বর্ণযুগ বলা যেতে পারে।.. .. বুদ্ধ একজন সমাজ সংস্কারক ও সাংস্কৃতিক বিপ্লবের মাধ্যমে ঘৃণিত জাতিভেদ ও বর্ণপ্রথার উপর কুঠারাঘাত করে নারী স্বাধীনতার স্বপক্ষে তাঁর বাণী প্রচার করেন। বুদ্ধ মানুষের চিরাচরিত অভ্যাস ও চিন্তাধারার পরিবর্তনের জন্য একটি নবজাগরণের (Renascence) সৃষ্টি করেন। ভারতের নারীরা পুরুষের সমান অধিকার লাভ করল। বুদ্ধ নারী জাতিকে তাঁর ধর্মে আশ্রয় দিয়ে ভিক্ষুণী সংঘ গঠন করেন। তারপর থেকে দলে দলে ভারতের নারী সমাজ বিশেষতঃ অত্যাচারিত, বন্ধ্যা, স্বামী পরিত্যাক্তা, সন্তানহীনা বিধবা, স্বামী গৃহে নির্যাতিত প্রভৃতি নানা স্তরে মহিলা ভিক্ষুণী সংঘে যোগদান করে পরিণামে শান্তি লাভ করেছিলেন। এর পূর্বে সমাজে নারীদের পণ্য (Commodity) হিসেবে গণ্য করা হত”।[২] আবার ড. জিনবোধী ভিক্ষু তাঁর ‘বৌদ্ধ ধর্মে নারীর ভুমিকা’ প্রবন্ধে একই ভাবে বলেন, “বুদ্ধযুগের ভারতীয় নারীগণ শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে বিশেষতঃ আধ্যাত্মিক

---

[১] . হুমায়ুন আজাদ ঃ নারী, (২য় সংস্করণ) , পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ৭৮।

[২].ড. বেণু প্রসাদ বড়ুয়া ঃ বৌদ্ধধর্ম ও নারী (প্রবন্ধ), (অধ্যাপিকা রাশিদা খানম সম্পাদিত ' সমাজ ও নারী '), এ এইচ ডেভেলপমেন্ট পাবলিশিং হাউজ, ১৪৩ নিউমার্কেট, ঢাকা, ২০১০, পৃ ঃ ৪৯।

জ্ঞানে বিস্ময়কর কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন। পুরুষের ন্যায় নারীরা সংঘ জীবন-যাপনের অধিকারিনী হয়ে সর্বোচ্চ শিক্ষা ও জ্ঞান লাভের পাশাপাশি আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ সুযোগ সুবিধা প্রাপ্ত হয়েছিলেন। বৌদ্ধ শিক্ষা প্রণালী , তার আধ্যাত্মিক গভীরতা ও সার্বজনীনতার জন্য পৃথিবীর সর্বত্র খ্যাতি লাভ করেছিলেন। জাতি-ধর্ম-বর্ণ, স্ত্রী-পুরুষ, ধনী-দরিদ্র, মুচি-মেথর-নাপিত নির্বিশেষে প্রত্যেকের জন্যই বৌদ্ধ ধর্মে শিক্ষা-দীক্ষা, আধ্যাত্মিক ধ্যান-ধারণার দ্বার ছিল উন্মুক্ত। ... ধর্মীয় শিক্ষায় প্রশিক্ষিতা নারীগণ শুধুমাত্র যে শিক্ষা-দীক্ষায় উচ্চস্থানের অধিকারী হয়েছিলেন তা নয়, তাঁরা মানব প্রেম ও কাজে মৈত্রীর বাণী প্রচার ও প্রসারে এবং সমাজ সেবা মূলক কাজে নিজেদেরকে আত্মোৎসর্গ করে সর্বস্তরে মানুষের কাছে শ্রদ্ধার আসনে আসীন হয়েছিলেন" ।[৩]

এমন একটা চমৎকার ধর্মে পরবর্তীতে কি ঘটানো হয়েছে সে সম্পর্কে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঁর 'বৌদ্ধ ধর্মের অধঃপাত' প্রবন্ধে বলেন," বৌদ্ধ ধর্ম সহজ করিতে গিয়া, নির্বাণ সহজ করিতে গিয়া, অদ্বয়বাদ সহজ করিতে গিয়া, সহজযানীরা যে মত প্রচার করিলেন, তাহাতে ব্যভিচারের স্রোত ভয়ানক বাড়িয়া উঠিল। .. .. সহজযানীরা সন্ধ্যাভাষায় গান লিখিতে আরম্ভ করিলেন। সন্ধ্যাভাষার অর্থ আলো আঁধারী ভাষা। কানে শুনিবা মাত্র একরকম অর্থ বোধ হয়, কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলে তাহার গুঢ় অর্থ অতি ভয়ানক। তাঁহারা দেহতত্ত্বের গান লিখিতে আরম্ভ করিলেন। সমস্ত জগৎ ব্রম্মান্ড এই দেহের মধ্যেই আছে, তাহাই দেখাইতে আরম্ভ করিলেন। সুতরাং দেহে আকাশ, কামধাতু, রূপধাতু, অরূপধাতু, সুমেরু সবই রহিল। যে বোধিচিত্ত মহাযান মতে নির্বাণ পাইবার আশায় ক্রমেই আপনার উন্নতি করিতেছিলেন, দেহতত্ত্বের মধ্যে আসিয়া যে কী দশা হইল তাহা আর লিখিয়া জানাইবনা। জানাইতে গেলে সভ্যতার সীমা অতিক্রম করিয়া যাইতে হয়।[৪] যে কোন সমাজে সভ্যতার সীমা যখন অতিক্রম হয় তখনই সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্থ হয় নারীরা।

৬.২.৩ ইহুদী ধর্ম

আবার ইহুদী ধর্মের বিষয়ে পবিত্র বাইবেল - পুরাতন নিয়ম তথা তাওরাত পর্যালোচনা করলেই দেখা যায় কি পরিমান বিকৃতি ঘটানো হয়েছে সেখানে। মূলতঃ তাওরাত নাজিল হয়েছে হযরত মূসা (আঃ) এর উপর কয়েকটি প্লেটে কিছু নির্দেশনা সহ। সেখানে চমৎকার যে নির্দেশনা সমূহ দেয়া হয়েছে, তার কয়েকটি হ'ল-

- তুমি আপনার নিমিত্তে খোদিত প্রতিমা নির্মাণ করিওনা;
- উপরিস্থ স্বর্গে, নীচস্থ পৃথিবীতে এবং পৃথিবীর নীচস্থ জলমধ্যে যাহা আছে তাহাদের কোন মূর্তি নির্মাণ করিও না;
- তাহাদের কাছে প্রণিপাত করিওনা;
- তোমার পিতাকে ও তোমার মাতাকে সমাদর করিও;
- নরহত্যা করিওনা, ব্যাভিচার করিওনা, চুরি করিওনা;
- তোমার প্রতিবাসীর গৃহে লোভ করিওনা;
- প্রতিবাসীর স্ত্রীতে কিম্বা তাহার দাসে কি দাসীতে .. .. লোভ করিওনা;

[৩].ড. জিনবোধী ভিক্ষুঃ বৌদ্ধ ধর্মে নারীর ভূমিক(প্রবন্ধ), (অধ্যাপিকা রাশিদা খানম সম্পাদিত,'সমাজ ও নারী'), এ এইচ ডেভেলপমেন্ট পাবলিশিং হাউজ, ১৪৩ নিউমার্কেট, ঢাকা, ২০১০, পৃঃ ৭১ ।

[৪]. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ঃ বৌদ্ধধর্ম, (বৌদ্ধধর্মের অধঃপাত - প্রবন্ধ) নবযুগ প্রকাশনী, বাংলাবাজার,ঢাকা- ১১০০, পৃঃ ৯৫ |

- প্রতিবাসীর কোন বস্তুতেই লোভ করিওনা;
- তুমি মিথ্যা জনরব উত্থাপন করিওনা;
- অন্যায় সাক্ষী হইয়া দুর্জনের সহায়তা করিওনা;
- মিথ্যা বিষয় হইতে দূরে থাকিও এবং নির্দোষের কি ধার্মিকের প্রাণ নষ্ট করিওনা;
- তুমি উৎকোচ গ্রহণ করিওনা কেননা উৎকোচ মুক্তচক্ষুদিগকে অন্ধ করে এবং ধার্মিকদের কথা সকল উল্টায়;
- আর তুমি বিদেশীর প্রতি উপদ্রব করিওনা।[৫]

এরূপ আরও কতিপয় বিধান সহ মুসা (আঃ) যে প্রস্তর ফলক নিয়ে পর্বত থেকে নেমে এসেছিলেন তাইতো - তাওরাত। যে সম্পর্কে পবিত্র বাইবেলের যাত্রা পুস্তকে বলা আছে, "সেই দুই প্রস্তর ফলক হস্তে লইয়া (মোশি) পর্ব্বত হইতে নামিলেন; সেই প্রস্তর ফলকের এ পৃষ্ঠে ও পৃষ্ঠে লেখা ছিল। সেই প্রস্তর ফলক ঈশ্বরের নির্ম্মিত এবং সেই লেখা ঈশ্বরের লেখা, ফলকে খোদিত"।[৬] তাহলে সেই দু'টি প্রস্তর ফলকে প্রদত্ত বিধানই তো তাওরাতের বিধান। কিন্তু সেই প্রস্তর ফলক দু'টি কোথায় তা কেউ জানেনা। তার বদলে আমরা পাই তাওরাত নামে বিশাল এক ধর্ম গ্রন্থ।

উপরে প্রস্তর ফলকের গুরুত্বপূর্ণ যে ক'টি নির্দেশের উল্লেখ করা হয়েছে, যেখানে মাতাকে সমাদর করা, ব্যভিচার না করা, নরহত্যা না করা, চুরি না করা, প্রতিবাসীর গৃহে , প্রতিবাসীর স্ত্রীতে কিংবা তাহার দাসে কি দাসীতে কোন কিছুতেই লোভ না করার নির্দেশের মাধ্যমে নারী জাতির সম্মান ও মর্যাদাকে নিশ্চিত করা হয়েছে যা অনুসরণ করলে নারীর মর্যাদা তো বটেই সকল মানুষের মর্যাদাই নিশ্চিত হয়। পক্ষান্তরে বাস্তবে তাওরাত হিসেবে আমরা যে একখানা বিশাল ধর্মগ্রন্থ পাঠ করি তা হযরত আদম(আঃ) থেকে শুরু করে মূসা (আঃ) এবং মূসা(আঃ) এর পরের সকল নবী রসুলগণ সহ ঈসা (আঃ) পর্যন্ত বিশাল একখানা গ্রন্থ। মূসা (আঃ) কি তাঁর আগের, তাঁর সময়ের এবং তাঁর পরের নবী রসুলগণের বিবরণ, কার্যাবলী সবই বলে গিয়েছিলেন? তা তো সম্ভব নয়। তাহলে বলা যায় মুল বিষয়ের সাথে বিশাল আকারে মানুষের হস্তক্ষেপ করা হয়েছে তওরাতে। সেই হস্তক্ষেপে নারীজাতির প্রতি করা হয়েছে পর্যাপ্ত অবিচার। বিশাল এই গ্রন্থে থেকে মাত্র দু'টি বিষয় উল্লেখ করলেই নারী জাতির প্রতি সৃষ্ট দুরবস্থার বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায় -

(ক) আদমের পঞ্জর থেকে হাওয়াকে নির্মাণ সংক্রান্ত

" আর সদাপ্রভূ ঈশ্বর কহিলেন, মনুষ্যের একাকী থাকা ভাল নয়, আমি তাহার জন্য তাহার অনুরূপ সহকারিণী নির্ম্মাণ করি।.. .. .. পরে সদাপ্রভূ ঈশ্বর আদমকে ঘোর নিদ্রায় মগ্ন করিলেন তিনি নিদ্রিত হইলেন; আর তিনি তাঁহার একখানা পঞ্জর লইয়া মাংস দ্বারা সেই স্থান পুরাইলেন। সদাপ্রভূ ঈশ্বর আদম হইতে গৃহীত সেই পঞ্জরে এক স্ত্রী নির্মাণ করিলেন ও তাঁহাকে আদমের নিকট আনিলেন। তখন আদম কহিলেন, এবার হইয়াছে ; ইনি আমার অস্থির অস্থি ও মাংসের মাংস; ইহার নাম নারী হইবে, কেননা ইনি নর হইতে গৃহীত হইয়াছেন"।[৭] এই বিষয়টি অদ্যাবধি পৃথিবী জুড়ে নারী নির্যাতনের হাতিয়ার হয়ে আছে। কারণ পুরুষের পঞ্জর থেকে তৈরী নারীর যাওয়ার আর জায়গা কোথায়? পুরুষ তাকে কাটবে, মারবে যা ইচ্ছা তা করবে তাতে নারীর করার কিছুই নেই।(এ বিষয়ে পরবর্তীতে ৮ম অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে)।

---

[৫]. পবিত্র বাইবেল,(পুরাতন ও নতুন নিয়মঃ বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি (বিবিএস), ঢাকা, ১৯৮৭, পৃঃ ১৩৫।

[৬]. পূর্বোক্ত , পৃঃ ১৩৫।

[৭]. পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ০৩।

(খ) লুত নবীর আপন দুই কন্যা কর্তৃক পিতাকে দ্রাক্ষারস পান করিয়ে পিতার সাথে শয়ন, গর্ভধারণ ও দু'কন্যার দু'টি পুত্র সন্তান জন্মদান

একই গ্রন্থে যখন পিতার বংশ রক্ষার স্বার্থে লুত নবীর আপন দুই কন্যা কর্তৃক পিতাকে দ্রাক্ষারস পান করিয়ে রাত্রিতে পিতার সাথে শয়ন করে গর্ভধারণ ও দু'কন্যার দু'টি পুত্র সন্তান জন্মদানের বিবরণ[৮] দেখতে পাওয়া যায় তাতে অবাক না হয়ে কি পারা যায়? এরূপ জঘন্য বিবরণ সন্নিবেশ করে তাওরাতকে ধর্ম গ্রন্থের মর্যাদা থেকে কতখানি ভূলুণ্ঠিত করা হয়েছে তা কখনও বিবেচনা করা হয়নি।

পূর্বে উল্লেখিত ঈশ্বরের নির্ম্মিত এবং ঈশ্বরের লেখা, ফলকে খোদিত নির্দেশাবলির সাথে এরূপ ঘটনার মিল কোথায়? যেখানে মাতাকে সমাদর করা, ব্যভিচার না করা, নরহত্যা না করা , চুরি না করা, প্রতিবাসীর গৃহে , প্রতিবাসীর স্ত্রীতে কিম্বা তাহার দাসে কি দাসীতে কোন কিছুতেই লোভ না করার নির্দেশের মাধ্যমে নারী জাতির সম্মান ও মর্যাদাকে নিশ্চিত করা হয়েছে সেই একই গ্রন্থে অনুরূপ বিবরণ একদিকে ধর্মকে তো শেষ করেই অন্য দিকে নারী জাতির জন্য আর বিন্দুতম সম্মানের সুযোগই থাকেনা।

৬.২. ৪ খ্রিষ্টান ধর্ম

প্রচলিত বাইবেল গ্রন্থে মহান স্রষ্টার সরাসরি বিধান তেমন পাওয়া যায়না। এই গ্রন্থও শুরু হয়েছে যীশু খ্রীষ্টের জন্মের মাধ্যমে এবং শেষ হয়েছে তাঁর মৃত্যু ও সমাধির মাধ্যমে। মাঝখানে যীশু খ্রীষ্টের বেশ কিছু অলৌকিক কার্যক্রম বিধৃত হয়েছে। এখানেই প্রশ্ন যীশু(আঃ) এর উপর আল্লাহপাকের নাজেল হওয়া বিধান সমূহ কোথায়? এর কোন জবাব হয়ত আজ আর পাওয়া যাবেনা। তবে এই ধর্মের অনুকূলে তৈরী কিছু বিধিবিধানেও বিকৃতির শেষ নেই।

খ্রীষ্টান ধর্মে সৃষ্ট বিকৃতি নিয়ে ইতোমধ্যে কিছু কাজ করেছেন ডঃ মরিস বুকাইলী। তিনি বাইবেলে মানুষের হস্তক্ষেপের বিষদ বর্ণনা দিয়েছেন তাঁর 'বাইবেল কুরআন ও বিজ্ঞান' গ্রন্থে। তিনি বলেন, ''আসমানী কিতাব হিসেবে পরিচিত বাইবেলের বাণী বিকৃত হয়েছে এবং সেই বিকৃতি সাধিত হয়েছে মানুষের দ্বারাই। অর্থাৎ ঐতিহ্য নির্ভর এই সব বর্ণনা লোক মুখে এক পুরুষ থেকে আরেক পুরুষে ছড়িয়ে পড়ার সময়েই এসব বিকৃতি তার মধ্যে ঢুকে পড়েছে। কিংবা ঐতিহ্য নির্ভর এইসব বর্ণনা যখন লেখা হয়েছিলো, এই বিকৃতি সাধিত হয়েছিলো সে সময়েই। যতদূর জানা যায়, সুদুর অতীতেই বাইবেলের আদি পুস্তকখানির বিষয়বস্তু কমবেশী তিনশত বছরের মধ্যে অন্ততঃপক্ষে বার দুয়েক ঢেলে সাজানো হয়েছিলো। সেই অবস্থায় এই বাণীর মধ্যে এই ধরনের অসঙ্গতি ও অবাস্তবতা যে ঢুকে পড়বে তাতে বিস্ময়ের কি থাকতে পারে?''[৯]

বাইবেল মানুষের হাতে কতবার পরিবর্তন হয়েছে তা ডঃ মরিস বুকাইলী নিম্নের ছকের মাধ্যমে দেখিয়েছেন-

---

[৮]. পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ২৪-২৫।

[৯]. ড ঃ মরিস বুকাইলী ঃ বাইবেল কুরআন ও বিজ্ঞান(রূপান্তর ঃ আখতারউল- আলম), রংপুর পাবলিকেশন্স লিঃ, ঢাকা , বাংলাদেশ, ১৯৮৮, পৃঃ ৬৩।

সারণী-৩৩

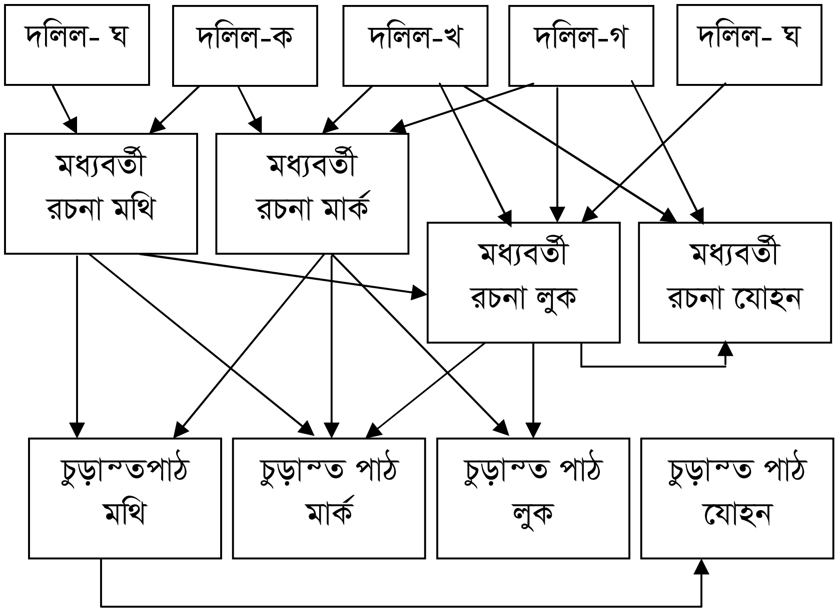

এই ছকে দলিল ক, খ, গ, ঘ হ'ল বাইবেলের কমন ডকুমেন্ট। দেখা যাচ্ছে এই সব কমন ডকুমেন্ট থেকে গৃহিত উপাদানের দ্বারা কিন্তু বর্তমানের মার্ক, মথি, লুক ও যোহনের চূড়ান্ত পাঠ সমূহ রচিত হয়নি। এর মাঝখানেও মার্ক, মথি, লূক ও যোহনের চার চারটি সুসমাচার রচিত হয়েছিলো। যেগুলোকে মধ্যবর্তী রচনা হিসেবে দেখানো হয়েছে। আবার কমন ডকুমেন্ট সমূহও কিন্তু মৌলিক বিষয় নয়। এগুলোও মূল নথীপত্র, দলিল দস্তাবেজ, উপকথা ও কাহিনীর সমাবেশ।[১০]

মধ্যবর্তী সময়ের এবং বর্তমান সময়ের এই মার্ক, মথি, লুক ও যোহনের সুসমাচার সমূহের মধ্যে প্রচুর মত পার্থক্য দেখিয়ে ডঃ মরিস বুকাইলী জানতে চেয়েছেন; ''এখানেই প্রশ্ন, কার বর্ণনা আমরা বিশ্বাস করব? মার্কের, মথির, লুকের, না যোহনের''?[১১]

এই বাইবেলকেই কেন্দ্র করে খ্রিষ্টান সমাজের জন্য যে আইন তৈরী হয়েছে, সেখানেও নারীদের প্রাণ ভরে শাস্তি দেওয়া হয়েছে। এই সম্পর্কে লেখক হুমায়ুন আজাদ বলেন, ''হিন্দু বিধি পৃথিবীর একটি বিশেষ খন্ডে সীমাবদ্ধ, কিন্তু যে দু'টি আইনের জগতে সূর্য কখনও ঢোবেনা, সে দু'টি হচ্ছে ইংরেজী সাধারন আইন ও রোমান আইন। .. .. এ দু'টি বিধির পেছনে হিংস্র পিতৃতান্ত্রিকের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে বাইবেল, প্রাণভরে শাস্তি দিয়েছে নারীকে। তাদের চোখে একটি নারী- মেরী ছাড়া আর সব নারীই পাপিষ্ঠা, তাই তারা নারীদের জন্য যে সব বিধি রচনা করেছেন, সেগুলো পাপিষ্ঠাদের জন্য রচিত বিধি। .. .. এ দু'টি আইনেই নারী, পুরুষের সম্পূর্ণ অধীন। নারীকে পুরুষের বাধ্যতামূলক ক্রীতদাসী করার একটি নিপুণ কৌশলের নাম হচ্ছে বিবাহ, যার কবলে পড়ে নারী হারায় তার অস্তিত্ব ও অধিকার। .. .. বিয়ের অনুষ্ঠানেই বধুটিকে দীক্ষা দেয়া

[১০]. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১১৯-১২১।
[১১]. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১১৫।

হয় সন্তুপালের অনুশাসনে, ঈশ্বরের প্রতি সে যেমন অনুগত থাকবে তেমনই অনুগত থাকবে স্বামীর প্রতি। .. .. বিয়ের সময় নারীর যা কিছু স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি থাকে, তা হয়ে ওঠে স্বামীর সম্পত্তি। এমনকি বিয়ের পরও সে যা কিছুর মালিক হয় তাও তার থাকেনা। অবলীলায় হয়ে ওঠে স্বামীর''।[১২] অর্থাৎ খ্রিষ্টান ধর্মে স্বামীরূপ মানুষটিকেই করে ফেলা হয়েছে যেন তিনিই নারীর - ঈশ্বর!

৬.৩ নারীদের কেন্দ্র করে ইসলাম ধর্মে বিকৃতি, অপব্যাখ্যা চিহ্নিত করে ধর্মের মৌলিক বিষয়ের অনুসন্ধান

পৃথিবীতে নাজেলকৃত ধর্ম সমূহের মধ্যে **ইসলাম** সর্বশেষ এবং চূড়ান্ত ধর্ম। এই ধর্মটি নাজেল হয়েছে মহানবী হযরত মুহম্মদ(সঃ) এর মাধ্যমে। পবিত্র গ্রন্থ কুরআন এই ধর্মের নাজেলকৃত ধর্মগ্রন্থ। মুসলমানদের দাবী এবং বিশ্বাস, পবিত্র গ্রন্থ কুরআন আজও অবিকৃত রয়েছে এবং থাকবে। পবিত্র কুরআন অনুসারে ইসলাম ধর্মের অনুসারীদের বিশ্বাস করতে হবে পূর্বেকার নাজেলকৃত গ্রন্থ এবং নবীদের।(আঃ ৪,সুরা বাকারা)। এখানে এক স্রষ্টা - আল্লাহ্, ইহকাল-পরকাল, ইহকালের পাপপুণ্যের জন্য পরকালে হিসাব নিকাশ এবং বেহেস্ত-দোজখ লাভ ইত্যাদি মৌলিক বিষয়াদি সত্বেও এটিও সত্য যে, ইসলাম ধর্মও মূল গ্রন্থে নয়, ধর্মীয় ব্যাখ্যার পর্যায়ে গিয়ে অপব্যাখ্যা এবং কুসংস্কারের হাত থেকে রেহাই পায়নি। এখানেও সৃষ্টি হয়েছে বিস্তর অপব্যাখ্যা এবং কুসংস্কার। যার অধিকাংশই নারীকে ঘিরে।

যেহেতু ইসলাম সর্বশেষ এবং সর্ব কনিষ্ঠ ধর্ম ফলে সর্বশেষ ধর্মগ্রন্থ কুরআন আজও অবিকৃত রয়েছে। এখান থেকে মৌলিক বিষয়াদি খুজে বের করা অনেকটাই সহজ সত্বেও যেহেতু এই ধর্মের ক্ষেত্রে বিদ্যমান রয়েছে যথাযথ ভাবে ধর্ম চর্চার অভাব, সে জন্যই অজ্ঞ, অশিক্ষিতরাতো বটেই বিস্তর জ্ঞানীগুণি জনেরা, বিদগ্ধ ব্যক্তিরাও ধর্মের নামে সৃষ্ট অজ্ঞতা, কুসংস্কার, গোঁড়ামীকেই ধর্ম জ্ঞান করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছেন। এ কারণেই তাঁরা ইসলাম ধর্ম সহ অন্যান্য সকল ধর্ম সম্পর্কে এরূপ ধারণা পোষণ করেন যে, পৃথিবীর তাবৎ ধর্ম গ্রন্থগুলো মানুষের রচিত। সেই ধারণার থেকেই প্রখ্যাত লেখক হুমায়ুন আজাদ বলেন,''ধর্ম হচ্ছে পুরুষের তৈরী একটি বল প্রয়োগ সংস্থা। যা শুধু মাত্র নারীদের পীড়নের উদ্দেশ্যেই তৈরী''। তিনি বলেন, ''পুরুষ ভালোভাবেই জানে যে, তাদের তৈরী ওই সব বিধান নারীরা মেনে নেবেনা কিছুতেই। তাই সুচতুর পুরুষেরা সু-কৌশলে সে গুলোকে ঘোষণা করেছে ঐশী বলে এবং পুরুষাধিপত্যকে প্রতিষ্ঠা করেছে নিজেদের শাশ্বত অধিকার বলে''।[১৩]

মূলতঃ ধর্ম কারও তৈরী নয়, তা নাজেলকৃত। তবে রচিত/ তৈরী হয়েছে ধর্মের বিপরীতে অপব্যাখ্যা যার অধিকাংশই গিয়েছে নারীর বিরুদ্ধে। ইসলাম ধর্মের ক্ষেত্রেও হয়েছে একই অবস্থা।

বর্তমানে পবিত্র কুরআনের ক্ষেত্রে কিছু ব্যাখ্যায়, হাদিসে, শরীয়তের বিধানে এবং প্রচলিত বেশ কিছু কুসংস্কার এবং অপব্যাখ্যা সনাক্ত করে দেখানো হচ্ছে যে, সে সব ধর্মের মৌলিক বিষয় নয়। কারণ মূল ধর্মে নারী নির্যাতন তো নয়ই বরং ধর্মের মৌলিক আদর্শে নিশ্চিত করা হয়েছে নারীর অধিকার, সম্মান এবং মর্যাদা।

---

[১২] .হুমায়ুন আজাদ ঃ নারী, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭৮-৭৯।

[১৩]. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬২।

৬.৩.১ পবিত্র কুরআন এবং নারীর অধিকার বিশ্লেষণ

সরাসরি পবিত্র কুরআনের কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হলেই দেখা যাবে যে, পবিত্র কুরআনে নারীদের অধিকার ও মর্যাদা অক্ষুন্ন থাকা স্বত্বেও নারীদের কিভাবে বঞ্চিত করা হয়েছে, তুচ্ছ করা হয়েছে।

১. সম্পত্তি বন্টন সংক্রান্ত

পবিত্র কুরআনের সুরা নেসার ৭, ১১, ১২, ও ১৭৬ নং আয়াতে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি তার উত্তরাধিকারীগণ যে ভাবে পাবেন তার বিধান দেওয়া হয়েছে। সেগুলো হল -

- পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যাক্ত সম্পত্তিতে পুরুষদেরও অংশ রয়েছে এবং নারীদেরও অংশ রয়েছে। অংশ অল্পই হউক কিংবা বেশীই হউক এ অংশ অকাট্য। (সুরা নিসা, আয়াতঃ ৭)।

- আল্লাহ্ তোমাদের সন্তান সম্পর্কে নির্দেশ দিচ্ছেন, একজন পুরুষের অংশ দুইজন নারীর অংশের সমান, অতঃপর যদি শুধু নারীই হয় দুই এর অধিক তবে তাদের জন্য পরিত্যাক্ত সম্পত্তির তিন ভাগের দুইভাগ, আর যদি মাত্র একজন নারী হয় তবে তার জন্য অর্ধেক। মৃতের পিতা-মাতার মধ্য থেকে প্রত্যেকের জন্য ত্যাজ্য সম্পত্তির ছয় ভাগের এক ভাগ যদি মৃতের পুত্র থাকে। মৃত, নিঃসন্তান হলে এবং শুধু পিতা-মাতাই উত্তরাধিকারী হলে তার মাতা পাবে তিনভাগের একভাগ, তার ভাইবোন থাকলে মাতার জন্য ছয়ভাগের একভাগ। এ সবই সে যা অসিয়ত (মৃত্যুর পূর্বে সম্পত্তি বন্টনের নির্দেশ নামা) করে তা দেবার পর, ঋণ পরিশোধ করার পর। তোমরা তো জান না তোমাদের পিতা-মাতা ও সন্তানদের মধ্যে কে তোমাদের উপকারের দিক দিয়ে অধিকতর নিকটবর্তী। এ আল্লাহ্র বিধান। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়।(সূরা নিসা, আয়াতঃ ১১)।

- আর তোমাদের হবে অর্ধেক সম্পত্তি যা ছেড়ে যায় তোমাদের স্ত্রীরা যদি তাদের কোন সন্তান না থাকে, এবং যদি তাদের সন্তান থাকে তবে তোমাদের হবে ঐ সম্পত্তির এক -চতুর্থাংশ, যা তারা ছেড়ে যায়। তারা যা অসিয়ত করে তা দেবার পর এবং ঋণ পরিশোধের পর। স্ত্রীদের জন্য এক চতুর্থাংশ হবে ঐ সম্পত্তির যা তোমরা ছেড়ে যাও, যদি তোমাদের কোন সন্তান না থাকে। আর যদি তোমাদের সন্তান থাকে, তবে তাদের জন্য হবে ঐ সম্পত্তির আটভাগের একভাগ যা তোমরা ছেড়ে যাও, অসিয়তের পর এবং ঋণ পরিশোধের পর। আবার - যে পুরুষের ত্যাজ্য সম্পত্তি, তার যদি পিতা-পুত্র কিংবা স্ত্রী না থাকে এবং মৃতের এক ভাই কিংবা এক বোন থাকে, তবে উভয়ের প্রত্যেকে ছয় ভাগের এক ভাগ পাবে। আর যদি ততোধিক থাকে, তবে তারা এক তৃতীয়াংশের অংশীদার হবে, ইহা যা অসিয়াত করা হয় তা দেবার পর এবং ঋণ পরিশোধের পর, এমতাবস্থায় যে, অপরের ক্ষতি না করে । এ আল্লাহর নির্দেশ, বস্তুত আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সহনশীল।(১২ নং আয়াত, সুরা নিসা)।

- পিতামাতাহীন নিঃসন্তান ব্যক্তি সম্বন্ধে তোমাদেরকে আল্লাহ্ পরিষ্কার ভাবে জানাচ্ছেন, কেউ মারা গেলে সন্তানহীন অবস্থায় এবং তার এক বোন থাকলে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধাংশ সে পাবে এবং সে যদি সন্তানহীন হয় তবে তার ভাই তার ওয়ারিশ হবে, আর দুই ভগিনী থাকলে তাদের জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই তৃতীয়াংশ, আর যদি ভাইবোন উভয়েই থাকে তবে এক পুরুষের অংশ দুই নারীর অংশের সমান।(আঃ ১৭৬, সুরা নিসা)।[১৪]

---

[১৪]. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান কর্তৃক অনুদিত ও সম্পাদিতঃ পবিত্র কোরআনুল করিম(বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তফসীর) , মুদ্রণ - বাদশাহ ফাহদ কোরআন মুদ্রণ প্রকল্প, মদীনা মোনা্ওয়ারা, ১৪১৩ হিজরী এবং হযরত মা্ওলানা মুফতি মুহম্মদ শফী (রাহ্ঃ) কর্তৃক

উপরে উল্লেখিত আয়াত সমূহ পর্যালোচনায় সম্পত্তির ভাগ-বাটোয়ারার বিষয়ে নিম্নের বিষয়াদি লক্ষ্যনীয় -

- সম্পত্তি বন্টনের বিষয়টি সম্পত্তির মালিক যিনি ছিলেন, সেই ব্যক্তির মৃত্যু বরণ করার পর। তিনি নারীও হতে পারেন এবং পুরুষও হতে পারেন। প্রতিবারই বলা হয়েছে 'মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির ভাগ-বাটোয়ারা হবে - সে যা অসিয়ত (মৃত্যুর পূর্বে সম্পত্তি বন্টনের নির্দেশ নামায়) করে তা দেবার পর এবং ঋণ পরিশোধের পর'। - অর্থাৎ জীবিত অবস্থায় সম্পত্তির মালিক তার সম্পত্তি কাউকে দেয়ার জন্য অসিয়ত করে যেতে পারেন, বেচা বিক্রি করতে পারেন, দান করে যেতে পারেন। এবং উপরে সম্পত্তি বাটোয়ারার যে বিধান তার সবই সম্পত্তির মালিকের মৃত্যুর পরে।

- প্রত্যেক আয়াতেই সম্পত্তিতে নারীর অংশ রয়েছে। নারীর ক্ষেত্রে পরিমান কিছু কম হলেও ২নং আয়াতে কঠিন ভাবে সতর্ক করে বলা হয়েছে, "অংশ অল্পই হউক কিংবা বেশীই হউক এ অংশ অকাট্য"।

পবিত্র কুরআনের উল্লেখিত নির্দেশনার আলোকে, এতদসংশ্লিষ্ট হাদীস, ইজমা (উলেমাগণের ঐক্যমত্য) এবং কিয়াস (তুলনামুলক অবরোহন প্রক্রিয়া) এর মাধ্যমে শরীয়তের বিধানে সম্পত্তি বন্টনের বিধান করা হয়েছে। যেখানে পবিত্র কুরআনে যাদের অংশ স্পষ্ট ভাবে নির্ধারণ করে দিয়েছে পরবর্তীতে সুন্নাহ ও ইজমা দ্বারা তা সুনির্দিষ্ট ভাবে রেখে দেয়া হয়েছে। তাদেরকে 'জাবিল ফুরুজ' বলা হয়েছে এবং যে/ যারা নির্দিষ্ট অংশের পর অবশিষ্ট অংশ গ্রহণ করে এবং একমাত্র হলে সম্পূর্ণ সম্পত্তি গ্রহণ করে তাদেরকে 'আসাবা' আখ্যায়িত করা হয়েছে। যার ভিত্তিতে আমাদের শরীয়তের বিধানে সম্পত্তির উত্তরাধিকার নির্ধারণ প্রণীত হয়েছে।

সম্পত্তি বন্টনের বিষয়ে শরীয়তের বিধানে নির্ধারিত উত্তরাধিকারের উপর তেমন কোন আপত্তি দীর্ঘ সময় ধরে উত্থাপিত না হলেও যেহেতু মুসলিম পুরুষ সমাজের একটি মহল আল্লাহপাক নারীদেরকে কম সম্পত্তি দিয়ে পুরুষের তুলনায় তুচ্ছ করেছেন মর্মে ধুঁয়া তোলেন এবং তাদের প্রাপ্য অংশ থেকে বঞ্চিত করেন এবং শুধু তুচ্ছ এবং বঞ্চিত করাই নয়, তারা নিজেদেরকে নারী নির্যাতনের অধিকারীও ভাবতে থাকেন। সে কারণেই এবং তা বিশ্বাস করেই বাংলাদেশের নারী নেতৃবৃন্দের পক্ষ থেকে দাবী তোলা হয় উত্তরাধিকার সুত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তিতে ভাইবোনের তথা পুরুষ নারীর সমান অধিকার স্থাপন করতে হবে।

কিন্তু উভয় পক্ষের কেউই পবিত্র কুরআনে প্রদত্ত নারীর অন্যান্য আয়ের উৎস তথা মোহরানা, ভরণ-পোষণ পাওয়া এবং সংসারে খরচ বাধ্য বাধকতা না থাকা ইত্যাদি বিষয় হিসাব করেননা এবং পৈত্রিক সম্পত্তিতে বোনের তুলনায় ভাইয়ের দ্বিগুন সম্পত্তি প্রাপ্তির কারণও অনুসন্ধান করেননা।

ইসলামিক বিধিব্যবস্থাপনার আওতায় নারী ও পুরুষের সার্বিক আয় ও ব্যয়ের খতিয়ান নিম্নরূপ -

---

মূল উর্দু রচনা, মাওলানা মুহিউদ্দীন খান কর্তৃক অনুদিত ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ কতৃক ১৯৮০, ১৯৮৩ এ প্রকাশিত এবং তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন , নূরানী কোরআন শরীফ (বাংলাউচ্চারণ অর্থ ও শানে নুযুল সহ), সোলেমানিয়া বুক হাউস, ৩৬ বাংলাবাজার, ঢাকা - ১১০০ থেকে।

সারণী-৩৪

ইসলামিক বিধিব্যবস্থায় নারী ও পুরুষের আয় ও ব্যয়ের খতিয়ান

নারী (বোন)		পুরুষ (ভাই)	
আয়	ব্যয়	আয়	ব্যয়
(১) উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি	কোনই বাধ্য বাধকতা নেই।	(১) উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি	(১) নিজের যাবতীয় খরচ
(২) নিজস্ব উপার্জন		(২) নিজস্ব উপার্জন	(২) স্ত্রীকে দেয় মোহরানা
(৩) মোহরানা		-	(৩) স্ত্রীর ভরণপোষণ
(৪) ভরণপোষণ		-	(৪) সন্তানদের ভরণপোষণ [১৫]

ছকটি পর্যালোচনায় দেখা যাচ্ছে, পরিবারে ভাই (পুরুষ) এর আয় তথা অর্থের উৎস দুটি, আর বোনের (নারী) উৎস চারটি। আবার ভাইয়ের (পুরুষ) খরচের ক্ষেত্র চারটি পক্ষান্তরে বোনের (নারী) খরচের ক্ষেত্রে কোনই বাধ্যবাধকতা নেই, এটি তার নিজস্ব এখতিয়ার। পুরুষ তার স্ত্রী ও সন্তানের পেছনে খরচে বাধ্য। এভাবে ইসলামিক বিধিব্যবস্থায় আর্থিক ভাবে লাভবান কিন্তু নারী, পুরুষ নয়।

এই বিধান আল্লাহ্‌র বিধান। এখানে হস্তক্ষেপের অধিকার কারও নেই। একই সাথে সব মিলিয়ে সম্পত্তি প্রপ্তির ক্ষেত্রে মূলতঃ মেয়েদেরকেই জেতানো হয়েছে। কোন অবস্থাতেই তাদের বঞ্চিত করা হয়নি। তাই এখানে এক স্থানে হস্তক্ষেপ করা হলে নারীরা পরবর্তী তিন স্থান থেকে বঞ্চিত হবে - এই বিষয়টি সকলকেই অনুধাবন করতে হবে।

২. স্ত্রীকে প্রহার করা সংক্রান্ত

পবিত্র কুরআনের সুরা নেসার ৩৪ নং আয়াতটির একটি অংশের ‘‘স্ত্রীদের মধ্যে যাহাদের অবাধ্যতার আশংকা কর, তাহাদিগকে সদপুদেশ দাও, তারপর তাদের শয্যাবর্জন কর এবং তাহাদিগকে প্রহার কর’’ - এ ধরনের অনুবাদ থেকে মুসলমান পুরুষদের কেউকেউ তাদেরকে তাদের স্ত্রীদের মারধর করার ক্ষমতার ধারক ও বাহক বলে মনে করে আসছেন দীর্ঘ সময় ধরে। শুধু মনে করছেন তা নয় তৎপ্রেক্ষিতে তারা স্ত্রীদের ধর্মীয় ক্ষমতা বলে মারধর/নির্যাতন/ নিপীড়ন/শাসন/শোষণ কোনটির থেকেই রেহাই দেননি। এরূপ অনুবাদ একদিকে নারী নির্যাতনের সহায়ক হয়েছে, আবার অন্যদিকে মানবাধিকারকে সর্বাধিক মূল্য প্রদানকারী ইসলাম ধর্মের মত চমৎকার একটি ধর্ম যে, নারী নির্যাতনকারী ধর্ম হিসেবে বিশ্ব জুড়ে প্রচার পাচ্ছে সে দিকে কেউ খেয়াল করছেননা। এই কারণে মুসলমানরা যে কোনঠাঁসা হয়েই চলছেন সেদিকেও কারো লক্ষ্য নেই।

ফলে এটি পরিস্কার হওয়া প্রয়োজন যে, মূলতঃ স্ত্রীদের প্রহার করার অধিকার স্বামীদের রয়েছে কিনা?

[১৫] .রওশন আরা বেগম ঃ অকৃত্যাপনোদন(তসলিমা নাসরিনের নির্বাচিত কলাম প্রসঙ্গে), রাহাত প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিকেশন্স, নীলক্ষেত, বাবুপুরা, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃঃ ৫৩।

দেখা যাক, উক্ত আয়াতে 'প্রহার কর' শব্দটি কেন এলো? কোত্থেকে এলো? এই প্রশ্নের উত্তর এবং এর পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা পাওয়া যায় পাকিস্তানের লেখক প্রফেসর রফিউল্যাহ শিহাব এর Rights of women in Islamic shariah গ্রন্থের 'The Quran and the beating of women' প্রবন্ধে। সেখানে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, আরবী 'ওয়াজরাবুহুন্না' শব্দটি, যার উৎপত্তি জারাবা শব্দ হতে, এর একাধিক অর্থ রয়েছে। তম্মধ্যে অত্যন্ত সাধারণ একটি অর্থ 'প্রহার', গ্রহণ করে উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় ইসলামের মৌলিক আদর্শের ব্যত্যয় ঘটানো হয়েছে। যার কারণে বড় বড় ইসলামী চিন্তাবিদ ও ব্যাখ্যাকারগণ নিজেরাই বিব্রত হয়েছেন। তাঁরা নিজেরাই ইসলামের মূল আদর্শের সাথে এর সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টাও করেছেন। তাঁদের কেউ কেউ প্রহার দাম্পত্য সম্পর্ককে নষ্ট করে এবং নবীজি (সঃ) স্ত্রীকে প্রহার পছন্দ করতেন না মর্মে হাদিস উদ্ধৃত করে স্ত্রীকে প্রহার নিরুৎসাহিত করেছেন (ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম)। কেউ বলেছেন মারার একটা অনুমতি আছে তবে না মারাই উত্তম, কিংবা প্রহার কর, তবে লাঠিটা যেনো কোন অবস্থাতেই টুথ ব্রাসের চেয়ে বড় না হয় (হযরত ইবনে আব্বাস)। এই সব ব্যাখ্যা সম্পর্কে ইসলামী চিন্তাবিদ আল্লামা সওকানীর বক্তব্যের উদ্ধৃতি দিয়ে জনাব রফিউল্যাহ শিহাব বলেন, ''This explanation renders this beating affairs a funny one''! অর্থাৎ এই সব ব্যাখ্যা স্ত্রীকে প্রহারের বিষয়টিকে কৌতুকপ্রদ করে তুলেছে।[১৬]

জনাব রফিউল্যাহ শিহাব আরবের বিখ্যাত শব্দবিদ (Laxicografer) সৈয়দ মূর্তজা আল হুসাইনী আল জুবাইদীর মত উল্লেখ করে অভিমত ব্যক্ত করেন যে, কাজী কর্তৃক বিচার ফয়সালার ক্ষেত্রে 'জারাবা' শব্দটি বাধা দেওয়া কিংবা আটক করা অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং যেহেতু বিচার ফয়সালাই বর্তমান আয়াতটির মূল মর্ম, তাই এই ক্ষেত্রে বাধা দেওয়া বা আটক করা অর্থই যথার্থ হবে। এই সব দিক বিবেচনা করে জনাব শিহাব উল্লেখিত আয়াতটির নিম্নরূপ অর্থ হবে মর্মে উল্লেখ করেছেনঃ ''And as to those on whose part you fear disruption admonish them leave them alone in their beds and prevent them from going out of house.'' অর্থাৎ ''এবং যাদের পক্ষ থেকে অবাধ্যতার আশংকা কর তাদেরকে সদুপদেশ দাও, তারপর শয্যা বর্জন কর এবং তাদের বাইরে গমনে বাধা দাও''।[১৭] প্রহার করার অনুমতি এখানে আসেনি এবং এই ব্যাখ্যাই কিন্তু ইসলামের মৌলিক আদর্শের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

কারণ ইসলাম এমনই একটা ধর্ম যাতে বিন্দুতম অত্যাচার অবিচারের স্থান নেই। নারীর প্রতি তো নয়ই। ইসলাম নারীর স্বার্থ বিশেষ ভাবে সংরক্ষণ করেছে। তবে ইসলাম ধর্মের আবির্ভাবের পূর্বে তৎকালীন আরব দেশের জাহিলিয়া সমাজে যত অত্যাচার, অবিচার, শিকড় গেড়েছিলো তন্মধ্যে স্ত্রীদের প্রহার ছিলো অন্যতম। মহানবী হযরত মুহম্মদের (সঃ) মাধ্যমে ইসলাম ধর্ম প্রচার কালে এক এক করে জাহিলিয়া যুগের প্রতিটি অন্যায় উৎপীড়নের মূল্যোৎপাটন করা হয়। স্ত্রীদের প্রহারও নিষিদ্ধ হয়। নবীজি (সঃ) স্বয়ং স্ত্রীদের প্রহার নিষিদ্ধ করে বলেন, ''তোমরা কেউ নিজ স্ত্রীদের গোলামের মত প্রহার করোনা। কেননা দিনের শেষে তার সাথে তো মিলিত হবে'' (বুখারী হাদিস)। যে কোন বিষয়ে নবীজি (সঃ) নির্দেশ প্রদান করেই কেবল ক্ষান্ত হননি, নিজ জীবনে সেই আদর্শের প্রতিফলন ঘটিয়েও দেখিয়ে গিয়েছেন। বিবি খাদিজার সাথে তাঁর দীর্ঘ জীবন পরিক্রমায় এবং পরবর্তী কালে ৯/১০ জন স্ত্রীসহ বসবাসের কালেও স্ত্রীদের প্রহার দূরে থাকুক, ছোটখাট খারাপ আচরণেরও কোন নজির নেই। তিনি স্ত্রীদের আত্মসম্মানের মর্যাদা দিতেন (বুখারী)। তিনি ওসিয়্যত করেছেন যে, ''তোমরা নারীদের প্রতি সদ্ব্যবহার কর'' (বুখারী)।"সেই উত্তম পুরুষ যে তার স্ত্রীর

---

[১৬]. Prof. Rafiullah Shehab ঃ Rights of Women in Islamic Shariah, Indus Publishing House, 17 – Urdu Bazar lahore, 1986, পৃঃ ১৪।

[১৭]. পুর্বোক্ত, পৃঃ ১২।

নিকট উত্তম''(আল ত্রিমিদি)। ব্যক্তিগত জীবনে তাঁর স্ত্রীরা কচিৎ কদাচিৎ তাঁর সাথে রাগারাগিও করতেন, কখনওবা পরিবারে জটিল অবস্থারও সৃষ্টি হতো, এমনকি এক সময়ে অবস্থা এমনই বেগতিক হয়েছিলো যে, কোন কোন স্ত্রীদের সাথে মনঃক্ষুন্ন হয়ে নবীজি (সঃ) এক মাস বাড়ির বাইরে পৃথক অবস্থান নিয়েছিলেন (বুখারী হাদিস)।[১৮] তাবৎ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানব, নবীকুল শিরোমণি মহান আল্লাহ্‌র সর্বাধিক প্রিয় সৃষ্টি হযরত মুহম্মদের (সঃ) মনোঃকষ্ট জনিত দীর্ঘ একটি মাস পৃথক অবস্থান কালেও কিন্তু স্ত্রীদের প্রহারের অনুমতি মেলেনি। আল্লাহ্‌পাক তাঁর স্ত্রীদের প্রতি সাবধানী আয়াত নাজেল করেছেন- ''হে নবী! স্বীয় স্ত্রীদের বলে দিন, যদি তোমরা দুনিয়ার সুখ ও আরাম আয়েশ এবং দুনিয়ার প্রতি প্রত্যাশী হও তবে আস আমি তোমাদের শান্তিপূর্ণ ভাবে ছুটি দান করবো। আর যদি আল্লাহ্ ,আল্লাহ্‌র রসুল ও আখেরাতের প্রত্যাশা কর, তাহলে আল্লাহ্‌পাক পুণ্যবানদের জন্য বড় পুরস্কার নির্ধারিত রেখেছেন'' (সুরা আহজাব আঃ ২৯)। এবং শেষ পর্যন্ত নবীজীর (সঃ) সেই স্ত্রীগণকে বলতে হয়েছে- ''সব কিছু ছেড়ে আল্লাহ্ ও আল্লাহ্‌র রাসুলকে গ্রহণ করেছি''।[১৯]

স্বয়ং মহানবীর (সঃ) গভীর মনোঃকষ্ট জনিত অবস্থায়ও যখন স্ত্রীদের প্রহারের অনুমতি মেলেনি, তখন এটি কিভাবে গ্রহণীয় ও বিশ্বাস্য যে, নবীজির (সঃ) তাবৎ পুরুষ উম্মতেরা তাদের স্ত্রীদের প্রহারের ছাড়পত্র পেয়েছেন? এবং প্রহার ইসলাম সম্মত? এটি লক্ষ্যনীয় যে, স্ত্রীদের সাথে মনোমালিন্যের সময়ে স্বয়ং মহানবী (সঃ) বাড়ির বাইরে পৃথক অবস্থান নিয়েছিলেন আর তাঁর স্ত্রীরা ঘরেই ছিলেন। ইসলামে নারীর সম্মানের প্রকৃত মাত্রা বোঝানোর জন্য এর চেয়ে উৎকৃষ্ট উদাহরণ আর কি হতে পারে?

৩. স্বামী (পুরুষরা) স্ত্রীর (মহিলা)দের তত্বাবধায়ক/শাসক নাকি বন্ধু?

পবিত্র কুরআনের সুরা নেসার ৩৪নং আয়াতটির শুরুতেই উল্লেখিত "ওয়ালের রেজালে কাউয়ামুনা আলান্নেসাএ"।- এই আয়াতের 'কাউওয়ামুন'- একটি বহুধা বিস্তৃত ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। সৌদী আরব থেকে প্রকাশিত 'The Holy Quran' (English translation of the meanings and commentary) এর ১১৯ নং পৃষ্ঠায় এবং আবদুল্লাহ ইউসুফ আলী কর্তৃক অনুদিত 'The Holly Quran, (Text, Translation and Commentary) এর ১৯৫ নং পৃষ্ঠায় ইংরেজীতে এর অর্থ প্রসঙ্গে বলা হচ্ছেঃ ''One who stands firm in another business protect his interest and look after his affairs''- অর্থাৎ 'যিনি দৃঢ় ভাবে অন্যের স্বার্থ সংরক্ষণ করেন, অন্যের অধিকারের ও নিরাপত্তার হেফাজত করেন এবং যাবতীয় প্রয়োজন মিটিয়ে থাকেন, তিনিই 'কাউওয়াম'। আবার ঈমাম রাগেব 'কাউওয়াম' শব্দের ধাতুগত তাৎপর্য, বিভিন্ন শব্দরূপ ও ব্যবহারিক অর্থের দীর্ঘ আলোচনা করেছেন এবং বিভিন্ন ব্যবহারিক তাৎপর্যের নজীর পবিত্র কুরআন থেকে উদ্ধৃত করে দেখিয়েছেন যে, "স্ত্রীলোকের 'কাউওয়াম' অর্থে- তার ভরণপোষণ, তার মানসম্ভ্রম রক্ষার ও তার সমস্ত অভাব অভিযোগের প্রতিকার করার দায়িত্বশীল হিসেবে পুরুষকে বোঝাবে"।

মহান আল্লাহর এক নাম 'কাইয়ুম' - যা একই ধাতু থেকে উৎপন্ন। এর তাৎপর্য থেকে ঈমাম রাগেব বলেন, ''যিনি প্রত্যেক বস্তুর পর্যবেক্ষক এবং তাহাকে বজায় রাখার জন্য আবশ্যক সব কিছু যিনি প্রদান করেন তিনি

[১৮]. আল্লামা শিবলী নো'মানী ও সৈয়দ সুলাইমান নাদভী ঃ সীরাতুন্নবী ১ম খন্ড, (বঙ্গানুবাদঃ আলহাজ্ব মাওলানা এ. কে.এম. ফজলুর রহমান মুনশী), দি তাজ পাবলিশিং হাউস, ৬/২ প্যারিদাস রোড, ঢাকা-১১০০, পৃঃ ৩৬৪-৩৭৬।
[১৯]. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৭১।

কাউওয়াম''।[২০] কিন্তু কোন কোন অনুবাদকগণ 'কাউওয়ামুন' শব্দটির অর্থ শাসক বা শাসনকর্তা গ্রহণ করেছেন। যা আয়াতটির নিরপেক্ষতা বিনষ্ট করে এর অর্থকে সম্পূর্ণরূপে নারী নির্যাতনের সহায়ক করে তুলেছে। যা ইসলামের মৌলিক আদর্শের পরিপন্থি। মোঃ আকরাম খাঁ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইসলামের মৌলিক আদর্শের পরিপন্থি ভাবধারার সৃষ্টি প্রসঙ্গে দুঃখের সাথে বলেন, ''এই আয়াতের তাফসীরে এমন একটা ভাবধারার সৃষ্টি করিয়া দেওয়া হইয়াছে যাহা পড়িলে মনে হইবে যে, ইসলামের দৃষ্টিতে স্ত্রী হইতেছে একটা Home enternee আর তাহার স্বামী হইতেছে পিটুনী পুলিশের এক জবরদস্ত দারোগা। ইসলামের ওছুল ও আদর্শের সহিত এই ধারণার কোন সংস্রব নাই''। তিনি দৃঢ়তার সাথে বলেন, ''শাসক শাসিতের কোন প্রসঙ্গই এই আয়াতে নাই। উচ্ছৃঙ্খলতার সমর্থনও নাই''।[২১]

আয়াতের পরের লাইনটির ক্ষেত্রেও কিন্তু একই অবস্থা করা হয়েছে। অর্থাৎ যেখানে আল্লাহ্পাক বলছেন, ''তোমাদের কতেকের উপর কতেকের প্রাধান্য রয়েছে''। সেখানে কোন কোন অনুবাদে ব্রাকেটে 'নারীর উপর পুরুষের' এরূপ মনগড়া শব্দ বসিয়ে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ্পাক যে এখানে সরাসরি নারীদের উপর পুরুষের প্রাধান্যের কথা বলেননি সেই বিষয়ে কিন্তু উক্ত অনুবাদক, তাফসিরকারকগণ ভালোভাবেই ওয়াকেবহাল। আর সেজন্যই তাফসীরে মা'আরেফুল কোরআনে স্বীকার করে বলা হচেছ, 'এখানে সোজাসোজি স্ত্রীদের উপর পুরুষের প্রাধান্য রয়েছে একথা না বলে তোমাদের কতেকের উপর কতেকের প্রাধান্য রয়েছে বলা হয়েছে''।[২২] এর পরও কোন কোন অনুবাদকগণ ধরে নিয়েছেন যে প্রাধান্যের কথা যখন বলাই হয়েছে তখন নিশ্চয়ই এ প্রাধান্য নারীর উপর পুরুষের প্রাধান্য এবং আল্লাহ্পাক কেন পুরুষের প্রাধান্যের কথা সরাসরি বলেননি তার কারণও তাঁরা ধারণা করে নিয়েছেন।

তাফসীরে মা আরেফুল কুরআনে এই ধারণার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে নারীকে একটা শান্তনা দেয়ারও চেষ্টা হয়েছে, এভাবে - ''এরূপ বর্ণনাভঙ্গী অবলম্বনের তাৎপর্য হলো এতে নারী ও পুরুষকে পরস্পরের অংশ বলে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কোন কোন বিষয়ে পুরুষরা নারীর তুলনায় শ্রেষ্টত্বের অধিকারী হলেও মানুষের মাথা যেমন তার হাতের তুলনায় উত্তম, পুরুষও নারীর তুলনায় তদনুরূপই শ্রেষ্ঠ। সুতরাং হাতের তুলনায় মস্তকের শ্রেষ্ঠত্ব যেমন হাতের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তাকে খর্ব করেনা তেমনি নারীর তুলনায় পুরুষের শ্রেষ্ঠত্বও নারীর মর্যাদা খর্ব করেনা। কেননা উভয়েই দেহের বিভিন্ন অঙ্গের ন্যায়। পুরুষকে যদি দেহের মাথা ধরা হয়, তবে স্ত্রী তার শরীর বিশেষ''।[২৩] এর চাইতে Gender blindness এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ আর কি হতে পারে?

কারণ, যেহেতু এই আয়াতে আল্লাহ্পাক প্রাধান্যের ক্ষেত্রে সরাসরি কাউকে নির্দিষ্ট করেননি তথাপিও আয়াতের ব্যাখ্যায় এসে প্রাধান্যের বিষয়টি পুরুষের দিকে নির্দিষ্ট করণের কারণ কি? কেনই বা পুরুষকেই দেহের মাথা হিসেবে বিবেচনা করা হলো? দেহের মাথা হিসেবে নারীকে ধরে নিতে অসুবিধা কোথায়?

অবশ্যি ব্যাখ্যা দাতাগণ তাঁদের ব্যাখ্যায় পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের যেসব কারণ উল্লেখ করেছেন তাহলো, পুরুষের জ্ঞানৈশ্বর্য ও পরিপূর্ণ কর্মদক্ষতার কারনে, নারীর যাবতীয় প্রয়োজনের নিশ্চয়তা পুরুষ নিজের

---

২০ . মোহাম্মদ আকরম খাঁ ঃ সরল বাংলা অনুবাদ ও বিস্তারিত তাফসীর সহ কোরআন শরীফ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬৪৬-৬৪৭।

২১. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬৪৬।

২২. হযরত মা্ওলানা মুফতি মুহম্মদ শাফি (রহ) ঃ তাফসীরে মা'আরেফুল, কোরআন, দ্বিতীয় খন্ড, অনুবাদ ও সম্পাদনাঃ মাওলানা মুহিউদ্দিন খান, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা,১৯৮৬, পৃঃ ৪৪৭।

২৩. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৪৭।

উপার্জনে কিংবা স্বীয় সম্পদের দ্বারা বিধান করে থাকেন বলে এবং শারীরিক শক্তিতে পুরুষ অধিকতর বলিয়ান বলেই পুরুষ শ্রেষ্ঠ, পুরুষ প্রধান।[২৪]

এরূপ ব্যাখ্যা যাঁরা প্রদান করেন তাঁরা কিভাবে ভুলে যান যে পুরুষের সমান সুযোগ পেলেই যুগে যুগে জ্ঞান-মেধা, আমল- আখলাক ও ব্যক্তিত্বের দিক দিয়ে অনেক নারী অনেক পুরুষের তুলনায় শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় রেখেছেন। পবিত্র ধর্মগ্রন্থ কুরআন থেকে শুরু করে ইতিহাসের পাতা তার সাক্ষ্য বহন করছে। যুগে যুগে বহু নারী উপার্জন করে আসছে, সংসারের হাল ধরছে, বর্তমানে হিমালয় এবং অ্যান্টার্কটিকা পর্বতেও আরোহন করেছে (প্রামান্যচিত্র ২১এবং ২২)।

সর্বোপরী, একটি সন্তান গর্ভে ধারণ ও জন্মদানের দীর্ঘ প্রক্রিয়ায় নারী যে শারীরিক শক্তি প্রয়োগ করে, তার তুলনা কোথায়? পুত্র কন্যা উভয়কে যে মাতা গর্ভে ধারণ করে অজানা এক স্বর্গপুরী থেকে এই পৃথিবীতে আনয়নের ধারক ও বাহক হয়েছেন সেই সন্তান গর্ভে ধারণ ও জন্মদান প্রক্রিয়ায় নারীর যে অতুলনীয় ভূমিকা -তাতে তো কখনই কোন অবস্থাতেই কোন পুরুষের অংশ গ্রহণ সম্ভব নয়। পক্ষান্তরে পুরুষের প্রতিটি ভূমিকাতেই নারীর অংশ গ্রহণ সম্ভব। *প্রকৃতিতে যখনই নারী তখনই সৃষ্টি সচল, প্রকৃতিতে যখনই পুরুষ তখনই সৃষ্টি স্থবির।* অর্থাৎ নারীর মাধ্যমেই সৃষ্টি পাচ্ছে গতি, প্রবেশ করছে যুগ থেকে যুগে, কালের থেকে কালে। এর যন্ত্রনাও কিন্তু কম নয়। তীব্র তীক্ষ্ণ যন্ত্রনার সবটুকুই নারী মেনে নিচ্ছে হাসি মুখে, নব সৃষ্টির সফলতায়। পৃথিবীতে নারীর এই ভূমিকার সাথে পুরুষের কোন ভূমিকা শ্রেষ্ঠ হতে পারে? শুধু শ্রেষ্ঠ নয়, তুলনীয় হতে পারে? তবে, প্রাধান্য এবং শ্রেষ্ঠত্বের ক্ষেত্রে নারী নয় কেন?

পবিত্র কুরআন বলে, ''কত কষ্টে জননী তাহাকে গর্ভে ধারণ করিয়াছে আর কত কষ্টে তাহাকে প্রসব করিয়াছে, তাহাকে ধারণ করা হইতে তাহার দুগ্ধ ত্যাগ পর্যন্ত মুদ্দৎ চলিতে থাকে'' (সুরা লোকমান আঃ ১৪)। যে কারণে মহানবী (সঃ) ঘোষণা করেছেন, ''মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের বেহেস্ত'' (ইবনে হাম্বল, ইবনে মাজাহ)। এই সন্তান কিন্তু কেবল মাত্র কন্যা সন্তান নয়, পুত্র কন্যা উভয়েই।

আরো একটি সুপ্রসিদ্ধ হাদিস হলো - নবীজির (সঃ) নিকট জানতে চাওয়া হয়েছিলো- আল্লাহ ও তাঁর নবীর পরে পৃথিবীতে কাকে বেশী ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা করা হবে?

নবীজির (সঃ) উত্তর হলো- তোমার মাকে।
আবার জানতে চাওয়া হলো- তারপর?
উত্তর হলো- তোমার মাকে।
আবার প্রশ্ন- তারপর?
উত্তর হলো- তোমার মাকে।
আবার প্রশ্ন- তারপর?
উত্তর- তোমার পিতাকে।(বুখারী এবং মুসলিম শরীফ)।

এরপরও পুরুষ ই শ্রেষ্ঠ? এবং ইসলাম তাই বলে? আসলে মোটেও তা নয়। বরং ঈমাম রাগেবের অনুবাদই যথার্থ। তা হলো, ''যিনি প্রত্যেক বস্তুর পর্যবেক্ষক এবং তাহাকে বজায় রাখার জন্য আবশ্যক সব কিছু যিনি প্রদান করেন তিনি কাউওয়াম''। এই অর্থেই সকল স্বামী সকল স্ত্রীদের কাউয়াম। শাসক নন- বন্ধু, হেফাজত কারী, নিরাপত্তা প্রদানকারী।

---

[২৪] . পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৪৫-৪৪৯।

৪. পর্দা নারীকে বন্দী করে কিনা?

পর্দা সংক্রান্ত পবিত্র কুরআনের আয়াত সমূহের অপব্যাখ্যার কারণেই নারীদের গৃহবন্দী করে রাখার প্রবনতা দীর্ঘ সময় ধরে মুসলিম সমাজে বিদ্যমান। মুসলিম নারীদের লেখাপড়া পর্যন্ত করতে দেয়া হয়নি যুগযুগ ধরে। উদাহরন হিসেবে - ১৮৬৭ সালে নওয়াব আব্দুল লতিফ কর্তৃক 'বেংগল সোসাল সায়েন্স এ্যাসোসিয়েশনে' মুসলমানদের শিক্ষার উপর পাঠ করা প্রবন্ধটির বিষয়ে উল্লেখ করা যেতে পারে। যাতে নারী শিক্ষার উল্লেখ মাত্র ছিলনা। প্রবন্ধ পাঠ শেষে 'আলালের ঘরের দুলাল' রচয়িতা প্যারিচাঁদ মিত্র উক্ত প্রবন্ধের বিষয়ে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে জানতে চেয়েছিলেন, "হিন্দুদের মধ্যে স্ত্রী শিক্ষার যেরূপ প্রচেষ্টা চলছে, মুসলমানদের মধ্যে অনুরূপ কোন প্রচেষ্টা চলছে কিনা"?

উক্ত প্রশ্নের জবাবে কলকাতা মাদ্রাসার তৎকালীন মৌলবী জনাব আব্দুল হাকিম উর্দু ভাষায় যা বলেন, তা এক্ষেত্রেও প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, - "নারী শিক্ষা মুসলমান সমাজে অপ্রচলিত নয় এবং এর জন্য মুসলমানদের বাহির হতে কোনরূপ অনুপ্রাণিত বা উৎসাহিত করে তোলার প্রয়োজনও নেই, তাদের ধর্মেই অনুরূপ নির্দেশ রয়েছে। মুসলমানদের নবীও সমভাবে নারী-পুরুষের মধ্যে জ্ঞান বিতরণের উপদেশ দিয়েছিলেন, তাঁর স্ত্রী কন্যাগণ উচ্চ শিক্ষিত ছিলেন, তাঁদের কেহ কেহ বিখ্যাত কবিও ছিলেন, যে সব লেখা অধ্যাবধি বেঁচে আছে। অনুরূপভাবে বাগদাদ, দামেস্ক ও কর্ডোভার খলিফাদের স্ত্রী কন্যারাও উচ্চ শিক্ষিত ছিলেন। দিল্লীর বেগমও বাদশাহজাদীদের লেখা গ্রন্থ বর্তমানেও নিস্প্রভ হয়ে যায়নি। মনে হয় মুসলিম সমাজের মত অন্য কোন সম্প্রদায় নারী-শিক্ষার প্রয়োজন ও গুরুত্ব উপলব্ধি করে নাই। তারা জানে শিশুরা তাদের মায়ের নিকট হতে প্রাথমিক ধ্যানধারণা লাভ করে থাকে, তাই শিশুরা যাতে নষ্ট হতে না পারে সে জন্য পূর্ব থেকে তার প্রতিকারের ব্যবস্থা করে রেখেছে। অধিকন্তু একজন শিক্ষিত নারী পারিবারিক বিষয়ে তার স্বামীকে কত বেশী সাহায্য করতে সক্ষম সে সম্পর্কেও তারা ওয়াকেবহাল"।[২৫] ইসলাম ধর্মে নারীদের বিষয়ে এত সুযোগ সুবিধার বিষয়ে বিস্তারিত জানা স্বত্বেও শেষে যে কথাটি তিনি বললেন, তা হলো "তবে যে কাজটি মুসলমানরা করতে সক্ষম নয় তা হল, অন্য জাতির মত তারা তাদের নারীদের স্কুল কলেজে পাঠাতে পারেনা। কারণ ধর্মতঃ তাঁরা তাঁদের নারীদের পর্দা পুষিদা মত রাখতে বাধ্য"।[২৬]

তৎকালীন কলকাতা মাদ্রাসার মৌলবী জনাব আব্দুল হাকিম এর এ উত্তর অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। এ দুর্ভাগ্য আর কারও নয়, বাংলার মুসলিম সমাজের। কেননা নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা, গুরুত্ব এবং ইসলাম ধর্মে এর বিধান ও উদাহরণ থাকা এবং তা জানা সত্বেও তৎকালীন এ দেশীয় মুসলিম পুরুষ সমাজ নারী জাতিকে শুধু যে পর্দার অন্তরালে বন্দীই করে রেখেছিলেন, তা নয়, পর্দার উছিলায় তাদেরকে জ্ঞানের আলো থেকেও করে রেখেছিলেন বঞ্চিত। এর কুফল যে শুধু নারীরাই বহন করেছে তা নয়, পুরুষেরাও করেছে এবং অদ্যাবধি করছে । অর্থাৎ পুরো মুসলিম সমাজ, আজ পর্যন্ত এর খেসারত বহন করেই চলছে। কারণ মা অশিক্ষিত থাকলে সন্তান(ছেলেও মেয়ে উভয়েই) সঠিক পথের দিশা পাবে কার কাছ থেকে?

পবিত্র কুরআনে পর্দা সংক্রান্ত বিধান দেখা যেতে পারে। সামগ্রীক ভাবে পর্দার বিধান এসেছে সুরা নুরের ৩০নং আয়াতে। সেখানে বলা হয়েছে,- ''আপনি মুসলমান পুরুষদিগকে বলিয়া দিন, যেন তাহারা স্বীয় দৃষ্টি অবনত রাখে এবং নিজ নিজ লজ্জার স্থানকে হেফাজত করে; ইহা তাহাদের জন্য অধিকতর পবিত্রতার কথা;

---

[২৫]. Dr. Mohar Ali (edited) ঃ Nawab Abdul Luteef Khan Bahadur (Autobiography and other writings), The Meharab Publications, Chittagong, 1968,P. 103-105

[২৬].পূর্বোক্ত, পৃঃ ১০৩-১০৫।

নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সবই জানেন তাহারা যাহা কিছু করিয়া থাকে। আর মুসলমান নারীদিগকে বলিয়া দিন, যেন স্বীয় দৃষ্টি নিম্নমুখী রাখে আর নিজ নিজ লজ্জা স্থান সমূহের হেফাজত করে এবং স্বীয় যীনত সমূহ প্রকাশ না করে। আর যেন নিজের চাদর স্বীয় বক্ষের উপর জড়াইয়া রাখে''(সুরা নুর, আয়াত ৩০)। – লক্ষ্যণীয় যে এই আয়াতে পর্দা তথা আবৃত করার নির্দেশ আগে পুরুষের জন্য পরে নারীর। পুরুষের মনের কুপ্রবৃত্তির লাগামও তাদের প্রতি পর্দা রক্ষার ওই নির্দেশের মধ্যেই টেনে ধরা হয়েছে এবং এই আয়াতে পুরুষদেরকে তাদের দৃষ্টি অবনত রাখার নির্দেশ রয়েছে।

জানতে চাওয়ার বিষয় হলো পুরুষদেরকে তাদের দৃষ্টি অবনত রাখার নির্দেশ কেন? যদি রাস্তায়, নারীই না থাকবে? রাস্তায় নারী না থাকলে পুরুষের দৃষ্টি হেফাজতের কোন প্রশ্নই আসেনা। তাদের প্রতি মহান আল্লাহর সতর্ক নির্দেশ হলো- ''নিশ্চয়ই আল্লাহ সবই জানেন তাহারা যাহা কিছু করিয়া থাকে''।(সুরা নুর, আয়াত ৩০)। আরও লক্ষ্যনীয় যে, পর্দার ক্ষেত্রে নারী পুরুষ উভয়কে দৃষ্টি নিম্নমুখী রাখা এবং স্ব স্ব লজ্জাস্থানের হেফাজত করার তথা সততা ও সতীত্ব বজায় রাখার ক্ষেত্রে একই নির্দেশ দেয়া হয়েছে। স্ব স্ব লজ্জাস্থানের হেফাজতের এই পারস্পরিক ব্যবস্থা যদি সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয় তবে সেই সমাজ থেকে সহজ ও স্বাভাবিক ভাবেই নারী হরণ, নারী ধর্ষণ, তথা নারী বিষয়ক যে কোন ছোট বড় অপরাধ সমূলে বিলোপ হবে, সেখানে তখন কঠিন কঠোর আইনেরও প্রয়োজন হবেনা।

এই আয়াতে নারীদের প্রতি বাড়তি যেই নির্দেশ তা হলো - ''তারা যেনো স্বীয় যীনত তথা গহনা প্রকাশ না করে এবং বুকের উপর ওড়না বা চাদর ব্যবহার করে''। মূলতঃ ইসলাম নারীকে মানুষ হিসেবেই প্রতিষ্ঠিত দেখতে চায়, তাই সজ্জিত হয়ে, শরীর দেখিয়ে, নারীত্বের প্রদর্শনী থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেয়। অর্থাৎ নারীদেকে গৃহে বন্দী করা হয়নি। শালিনতার মাধ্যমে চলা ফেরার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যে নির্দেশ নারী-পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

পর্দা সম্পর্কে সুরা আহযাবের ৩২-৩৩ নং আয়াত ও আমরা দেখতে পারি। পবিত্র কুরআনে পুরো আয়াতটি এরূপ- ''হে নবী পত্নিগণ! তোমরা সাধারণ স্ত্রী লোকের মত নও, যদি তোমরা খোদা ভীতি অবলম্বন কর। অতএব তোমরা বাক্যালাপে কোমলতা অবলম্বন করিওনা। যাতে এইরূপ লোকের অন্তরে আকাংখা হয়, যাহার অন্তরে কুপ্রবৃত্তি রহিয়াছে এবং রীতি অনুসারে কথা বলিও। তোমরা গৃহ সমূহে অবস্থান কর এবং পূর্বের অজ্ঞতা যুগের নারীদের ন্যায় সজ্জিত হয়ে গৃহের বাইরে যেয়ে নিজেদের সৌন্দর্য ও বেশভূষা প্রদর্শন করবেনা'' (সুরা আহযাব আঃ ৩২-৩৩)। সুরা আহযাবের এই আয়াতটি বিশেষ ভাবে নবী মুহম্মদের (সঃ) বিবিগণের উদ্দেশ্যে নাজেল হয়েছে। সে জন্য উক্ত আয়াতের শুরুতে 'হে নবীপত্নিগণ' বলে সম্বোধনও করা আছে।

তবে নবী পত্নিগণের প্রতি বিশেষ ভাবে আয়াতটি নাজেল হলেও সামগ্রীক ভাবে সুরা নুরের ৩০নং আয়াতের সাথে এর বিশেষ কোন পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়না। এ ক্ষেত্রে বাক্যালাপে কোমলতা অবলম্বন না করা, রীতি অনুসারে কথা বলা এবং প্রয়োজনে ঘরের বাইরে বেরুতে হলে অধিক সাজসজ্জা না করার নির্দেশ মূলতঃ নারীকে তার ব্যক্তিত্বকেই সমুন্নত রাখার নির্দেশ। একটু গভীর ভাবে অনুধাবনের চেষ্টা করলে তা বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয়।

বাস্তবেও দেখা যায়, বিশেষতঃ কর্মজীবি নারীরা অধিক সাজসজ্জা থেকে বিরত থাকে, রীতি মাফিক কথাবার্তার মাধ্যমে তারা নিজেদের মধ্যেই প্রতিরোধের আবরণ সৃষ্টি করে। নারীকে তার এই ব্যক্তিত্বকে সমুন্নত রাখার নির্দেশই এই আয়াতে রয়েছে। এই ব্যক্তিত্বের আব্রুই নারীর প্রকৃত আব্রু। কুপ্রবৃত্তি যুক্ত

পুরুষের মনের কুপ্রবৃত্তি নারীর এই ব্যক্তিত্বের আব্রুর কাছে পরাজিত হতে বাধ্য। এই আয়াতে 'তোমরা গৃহ সমূহে অবস্থান কর' বলতে নারীকে তার ঘরকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করতে বলা হয়েছে। যেহেতু ঘরের সাথে নারীর সম্পর্ক নিবিড় এবং ঘর নারীর নিরাপত্তার জন্য, তার সন্তানদের নিরাপদে বেড়ে ওঠার জন্য জরুরী, তাই ইসলাম ঘরকে নারীর জন্য নির্ধারণ করে। আর সেজন্যই নারীকে প্রাধান্য দিতে বলা হয়েছে তার ঘরকে। ঘরকে নারীদের জন্য প্রাধান্য দিয়ে সুরা তালাকেও স্পষ্ট ভাবে বলা হয়েছে ।

অর্থাৎ পর্দার নির্দেশনায় পুরুষের ও নারীর মধ্যে কোন বিভেদ সৃষ্টি করা হয়নি বরং নারীদেরকে তাদের মাতৃত্বের হেফাজতের জন্য কিছুটা গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

৫. গৃহ পরিচারিকা উপভোগ সংক্রান্ত

পবিত্র কুরআনের নিম্নে উল্লেখিত আয়াত সমূহের বলে আমাদের সমাজের কিছু অশিক্ষিত/অর্ধশিক্ষিত লোকজন অন্যায়ভাবে দাসী উপভোগের সুযোগ খোঁজেন। আয়াতগুলো নিম্নরূপ -

(১) তোমরা যদি আশংকা কর যে ইয়াতিম মেয়েদের প্রতি সুবিচার করিতে পারিবেনা, তবে বিবাহ করিবে নারীদের যাহাকে তোমাদের ভালো লাগে; দুই তিন অথবা চার আর যদি আশংকা কর যে সুবিচার করিতে পারিবেনা তবে একজনকে এবং তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসীকে (সুরা নেছা আঃ ৩)। (এখানে অনুবাদে আয়মান , ইয়ামীন শব্দের অর্থ দাসী গ্রহণ করা হয়েছে)।

(২) এবং নারীদের মধ্যে তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসী ব্যতীত সকল সধবা তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ। তোমাদের জন্য ইহা আল্লাহ্‌র বিধান (সুরা নেছা আঃ ২৪)। (এখানেও অনুবাদে আয়মান, ইয়ামীন শব্দের অর্থ দাসী গ্রহণ করা হয়েছে)।

(৩) তোমার জন্য অন্য কোন নারী বৈধ নহে এবং তোমার স্ত্রীদিগের পরিবর্তে অন্য স্ত্রী গ্রহণও বৈধ নহে, যদিও উহাদিগের সৌন্দর্য তোমাকে বিস্মিত করে, তবে তোমার অধিকারভুক্ত দাসীদিগের ব্যাপারে এই বিধান প্রযোজ্য নহে (সুরা আহযাব আঃ ৫২)। (এখানেও আয়মান , ইয়ামীন শব্দের অর্থ দাসী গ্রহণ করা হয়েছে)।

(৪) এবং যাহারা নিজদিগের যৌন অঙ্গকে সংযত রাখে, তাহাদিগের পত্নি অথবা অধিকারভুক্ত দাসীদিগের ক্ষেত্র ব্যতীত, ইহাতে তাহারা নিন্দনীয় হইবে না (সুরা মা আরিজ, আঃ ২৯-৩০)। (এখানেও আয়মান, ইয়ামীন শব্দের অর্থ দাসী গ্রহণ করা হয়েছে)

(৫) আমি তোমার জন্য বৈধ করিয়াছি তোমার স্ত্রীগণকে, যাহাদিগকে মোহর তুমি প্রদান করিয়াছ এবং বৈধ করিয়াছি ফায় (যে সম্পদ যুদ্ধ ব্যতীত হস্তগত হয়) হিসাবে আল্লাহ তোমাকে যাহা দান করিয়াছেন তম্মধ্য হইতে যাহারা তোমার মালিকানাধীন হইয়াছে, তাহাদিগকে। (সুরা আহযাব আঃ ৫০)।

এই আয়াত সমূহের যথাযথ ব্যাখ্যার অভাবে ইসলাম ধর্ম নিয়ে ভুল বোঝাবোঝির সৃষ্টি হয়েছে। কোন কোন মুসলমান পুরুষেরা দাসী উপভোগকে তাদের জন্য বৈধ বলে ভেবে নিয়ে অধ্যাবধি গৃহপরিচারিকাদের উপভোগ করতে দ্বিধাবোধ করেননা। যার কারণে ঘরে ঘরে কাজ করতে যাওয়া মেয়েদের আজও লাশ হয়ে ফিরতে হয়। (৫ম অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে) ।

উপরের আয়াতগুলোর কথা উল্লেখ করে তসলিমা নাসরিন ইসলাম ধর্মের সমালোচনা করে মনের ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, ''অর্থাৎ দাসী বৈধ। দাসীকে ভোগ করায় কোন পাপ নাই। যুদ্ধে পরাজিত সৈন্যদের ঘরবাড়ি, অর্থ, শষ্য, নারী, বিজেতার দখলে আসে এবং সকলেই তাদের ভোগের জন্য বৈধ''। তিনি আরো বলেন, ''এই যদি হয় আইন, তবে সে আইনে পুরুষের জন্য ক্রীতদাসী বা ভাড়াটে দাসী কোন দিক থেকে অসঙ্গত বা অবৈধ নয়''।[২৭]

মূলতঃ যারা এই আয়াত বলে দাসী উপভোগের বৈধতা খোঁজেন তারা শুধু ভুল নয় অন্যায় করেন এবং পাপও করেন। আবার যারা এসব আয়াতের অর্থ থেকে ইসলাম ধর্মের সমালোচনা করেন তারাও ভুল করেন। ভুল এখানে যে তাঁরা উল্লেখিত আয়াত সমুহের 'আয়মান' বা 'ইয়ামীন' শব্দের অর্থ কেবল মাত্র দাসীই বুঝেছেন এবং আয়াতগুলোকে দাসীদেরকে অবৈধ ভোগের অনুমতি হিসেবে গ্রহণ করেছেন। মূলতঃ এটি একটি দীর্ঘদিনের পুঞ্জিভূত ভুল। যেখানে ইসলাম ধর্মে দাসদাসী প্রথাই নির্মূল করা হয়েছে - তা মাথায় না নিয়ে এসব আয়াতের অর্থে 'দাসী' শব্দটিতো নেয়া হয়েছেই একই সাথে তাদের অন্যায় ভাবে উপভোগ করার বৈধতাও দেয়া হয়েছে। পবিত্র ধর্মের ভেতর যারা এই অবৈধ বিষয়টির অনুপ্রবেশ করিয়েছেন তাদের উদ্দেশ্য যে মহৎ নয় তা উল্লেখ করে বর্তমানে উল্লেখিত আয়াতগুলো এক এক করে আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টি স্পষ্ট করা হলো -

(ক) উল্লেখিত ক্রমিকের ১ম আয়াতটিকে বিয়ের ক্ষেত্রে চারটি পর্যন্ত বিয়ে বৈধ করা হয়েছে ইনছাফ তথা ন্যায় সঙ্গত আচরণ বজায় রাখার কঠিন শর্তে। এই শর্ত পূরণে সক্ষম না হলে এক বিয়েতেই ক্ষান্ত থাকার জন্য এবং সেই ব্যক্তির অধিকারে রয়েছে এমন কোন অসহায় নারীকেও বিয়ে করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সে কোন এতিম মেয়ে হতে পারে কিংবা দাসী মেয়েও হতে পারে। অর্থাৎ এখানে বিয়ের কথাই বলা হয়েছে, অবৈধ ভোগের নয়। এই আয়াত থেকে যারা অবৈধ ভাবে দাসীদের উপভোগের বৈধতা খোঁজেন তাদের উদ্দেশ্যে মোঃ আকরম খাঁ বলেন, ''এক শ্রেণীর আলেমগণ মনে করেন যে, দাসী বাঁদীকে বিবাহের নির্দেশ এই আয়াতে দেওয়া হয়নাই, তাঁহারা মনে করেন যে দাসী বাঁদীদিগকে মালিকানা সত্বাধিকারের বলে যথেচ্ছ ভাবে সম্ভোগ করা যাইতে পারে। সেজন্য বিবাহের দরকার হয়না। আমি দৃঢ়তার সাথে ঘোষণা করিতেছি যে, এই অভিমত ইসলামের সাধারণ আদর্শ ও কোরআনে প্রবর্তিত বিশেষ নীতির সম্পূর্ণ বিপরীত একটা অপসিদ্ধান্ত ছাড়া আর কিছুই নহে।

এই আয়াতে স্পষ্ট ভাষায় বলা হইতেছে- তোমরা স্বাধীন নারীদিগকে বিবাহ করিবে-

দুই দুইটা করিয়া বা

তিন তিনটা করিয়া বা

চার চারটা করিয়া বা

একটা মাত্র বা

বাঁদীদাসী দিগকে।

---

[২৭] তসলিমানাসরিন ঃ নির্বাচিত কলাম, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৪৮-১৪৯।

Dhaka University Institutional Repository

মূলতঃ এই প্রকারগুলি সমস্তই বিবাহ করিবে, এই একই ক্রিয়া পদের অধীনে বর্ণিত হইয়াছে এবং বাদীদাসীদিগের প্রশ্নকে এই ব্যাপক নির্দেশের আমল হইতে বর্জন করার একটু সামান্য ইঙ্গিতও আয়াতের কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যাইতেছেনা। সুতরাং এই ব্যতিক্রমের কোন হেতু নাই"।[২৮]

(খ) ২য় ক্রমিকের আয়াতটি হলো সুরা নেছার ২৪নং আয়াত যা একই সুরার ২২ ও ২৩ নং আয়াতের সাথে সম্পৃক্ত। ২২, ২৩ ও ২৪ নং আয়াত তিনটিতে কোন্ ধরনের নারী বিয়ের ক্ষেত্রে অবৈধ তা উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন, ২২নং আয়াতে বিয়ে করতে নিষেধ করা হয়েছে পিতা কর্তৃক বিয়ে করা নারীকে, ২৩নং আয়াতে মাতা, কন্যা, বোন, ফুফু, খালা, ভাতৃকন্যা, ভগ্নিকন্যা, দুধমাতা, দুধভগ্নি, শাশুড়ী, স্ত্রীদের পূর্বের স্বামীর কন্যা, পুত্রবধু, একত্রে দুই ভগ্নি এদেরকেও বিয়ের ক্ষেত্রে অবৈধ করা হয়েছে। ২৪নং আয়াতে এসে প্রথমতঃ সধবা নারীকেও বিয়ে করা অবৈধ ঘোষণা করে, এই ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম রাখা হয়েছে যুদ্ধবন্দিনী বা নওমুসলিম অসহায় নারীদেরকে; যাদের স্ব-পরিবারে ফেরত যাবার উপায় নেই কিংবা যেতে অনিচ্ছুক। অর্থাৎ এই আয়াতে 'আয়মানুকম' বলতে যুদ্ধবন্দি অসহায় নারীদের বোঝানো হয়েছে। তারা সধবা হলেও বিয়ে করার অনুমতি দেয়া হয়েছে, অবৈধ ভোগের অনুমতি নয়। এই প্রসঙ্গেও মোঃ আকরাম খাঁ বলেন, ''এখানে 'মা মালাকাত আয়মানুকুম' পদের অর্থ কি হইবে সে সম্বন্ধে দুইটি পরস্পর বিপরীত মত প্রথম হইতে চলিয়া আসিতেছে। বহু ঈমাম ও আলেমের মত এই যে, এখানে ঐ পদের অর্থ হইবে- তোমাদিগের দক্ষিন হস্তগুলি যাহাদের অধিকারী হইয়াছে ইহা হইতে যুদ্ধের বন্দিনীদিগকে বুঝাইতেছে। .. .. অপর পক্ষে আবুল আলিয়া, আতা, ছাইদ ইবনে জোবায়ের, তাউছ প্রভৃতি বহু বিশিষ্ট তাবেয়ী ও তাফসীরের রাবী বলিতেছেন, আয়াতে 'আয়মান' শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে, উহার একবচন 'ইয়ামিন'। ইহার অর্থ যেমন দক্ষিন হস্ত হইতে পারে, ঠিক সেইরূপ পরস্পরের সম্মতিক্রমে সম্পাদিত চুক্তি এবং দিব্য, একরার ও অঙ্গিকারকেও ইয়ামিন বলা হয়। পরস্পরের অঙ্গীকারক্রমে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হইয়া যেসব নারীর উপর স্বামীর দাম্পত্য অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়, আয়াতে তাহাদিগের কথা বলা হইয়াছে। ইহাতে এবনে আব্বাছের সমর্থনও কোন কোন রেওয়াতে বর্ণিত হইয়াছে"।[২৯]

(গ) ৪র্থ ক্রমিকের আয়াতটি সুরা মা-আরিজ এর ২৯-৩০ নং আয়াত। এখানেও 'আয়ামীন' শব্দটিই ব্যবহৃত হয়েছে। এখানেও মোহরানা প্রদানের মাধ্যমে বিবাহিত স্ত্রী ও পরস্পর অঙ্গীকার ক্রমে(মোহরানা ব্যতীত) বিবাহিতদের ক্ষেত্র ব্যতীত অন্যত্র যৌন অঙ্গকে সংযত রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ অসহায় নারীদেরকে অবৈধ উপভোগের সুযোগ খোঁজার কোন সুযোগ এই আয়াতে নেই।

(ঘ) ৩য় এবং ৫ম ক্রমিকের আয়াত দুটি বিশেষতঃ নবী করিম (সঃ) এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। একটি বর্বর সমাজকে সুষ্ঠ রূপ দেয়ার মহা নবীর (সঃ) সাধনার ক্ষেত্রে বিয়েও বাদ পড়েনি। উপভোগের বাসনায় তিনি বিয়ে করেননি, করেছেন সমাজ শোধনের জন্য, দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্য এবং অসহায় নারীদের সহায়তার জন্য।

---

[২৮].মোহাম্মদ আকরম খাঁ ঃ সরল বাংলা অনুবাদ ও বিস্তারিত তাফসীর সহ কোরআন শরীফ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫৮১।

[২৯]. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬২৮-৬২৯।

বাস্তবে লক্ষ্যনীয় যে, মহানবী (সঃ) যথাযথ ভাবে মোহর প্রদানের মাধ্যমেই নারীদের বিয়ে করেছিলেন, ব্যতিক্রম ছিলেন একজন, যিনি বিনা মোহরে নবীজি (সঃ)কে বরণ করেছিলেন। জানা যায় তিনি খুজায়মা বিন হারিছের কন্যা জয়নব। (ইনি যায়েদের তালাক প্রদত্ত স্ত্রী এবং নবীজির ফুফাতো বোন জয়নব নন)। নবীজি (সঃ) যুদ্ধবন্দী দুইজন নারীকেও বিয়ে করেছিলেন, তারা হলেন বারারাহ ও ছুফিয়া। আরো একটি ব্যতিক্রমী বিয়ে আছে নবীজীর (সঃ) জীবনে, সেটি হলো মারিয়ায়ে কিবতিয়াকে বিয়ে। জানা যায় মারিয়ায়ে কিবতিয়া ছিলেন তৎকালীন মিসরের শাসনকর্তা মিকাওকিচের চাচাত বোন। মিকাওকিচ মারিয়ায়ে কিবতিয়াকে তৎকালীন প্রচলিত প্রথানুযায়ী বিস্ত উপঢৌকন সহ উপহার স্বরূপ মহানবী (সঃ) বরাবরে প্রেরণ করেছিলেন। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সৌহার্দ বজায় রাখার স্বার্থে মহানবী (সঃ) এ উপহার সানন্দে গ্রহণ করেন। তবে ইসলামিক রীতি মাফিক তিনি মারিয়াকে ইসলামের দাওয়াত দেন, মারিয়া তা নির্মল চিত্তে গ্রহণ করেন। অতঃপর মহানবী (সঃ) সম্পূর্ণ ইসলামিক বিধান মাফিক বিয়ের মাধ্যমে তাঁকে স্বীয় পত্নিত্বে বরণ করে নেন। এভাবে মহানবী (সঃ) রাষ্ট্রপতি মুকাওকিচের উপঢৌকনের যথাযথ মর্যাদা প্রদান করেন।[৩০]

৩য় এবং ৫ম ক্রমিকে বর্ণিত সুরা আহযাবের ৫০ ও ৫২ নং এই আয়াতদ্বয়ে উল্লেখিত সকল নারীদের নবী করিম (সঃ) এর জন্য বৈধ করে দিয়ে তাঁর পক্ষে আরো স্ত্রী গ্রহণ নিষিদ্ধ হয়েছে। অর্থাৎ এখানেও অবৈধ উপভোগের অনুমতি নেই।

এভাবে আইয়ামে জাহেলিয়া যুগের বিরাট সংখ্যক অসহায় নারীদের প্রাথমিক অবস্থায় পুরুষদের জন্য বৈধ করে দেয়া হয় প্রতিজ্ঞা পূর্বক স্ত্রী হিসেবে গ্রহণের মাধ্যমে। এক পর্যায়ে এদেরকে মোহর প্রদানেরও নির্দেশ হয়। এছাড়া দাসী মেয়েদের মুনিবদের অনুমতিক্রমে অন্যদের বিয়ের অনুমতিও দেয়া হয়।

এ ভাবে নারীদের সাথে সকল বৈষম্য নাকচ করে দিয়ে মহান আল্লাহ্ বলেন, ''তোমরা পরস্পর একে অন্যের অংশ, সুতরাং তাহাদিগকে তাহাদের মালিকের অনুমতি ক্রমে বিবাহ কর এবং তাহাদিগকে তাহাদের মোহর নিয়মানুযায়ী দিয়ে দাও, এই হিসাবে যে তাহারা বিবাহিতা রূপে গৃহিত হইয়াছে, এই হিসাবে নহে যে তাহারা প্রকাশ্য ব্যভিচারিনী কিংবা গুপ্ত প্রেমিকা'' (সুরা নেছা, আঃ ২৪)।

পবিত্র কুরআনের এরূপ সুস্পষ্ট নির্দেশের পরও এটি কিভাবে গ্রহণীয় যে, দাসী শ্রেনীর নারীদের অবৈধ ভোগের অনুমতি রয়েছে? তা মোটেও নয় বরং এই আয়াত সমূহের মাধ্যমে যুদ্ধ বন্দী, নওমুসলিম, এতিম ইত্যাদি বিভিন্ন শ্রেণীর অসহায় নারীদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং বিরাট সংখ্যক মানবেতর, নোংরা ও কলুষতর জীবনযাপনকারী দাসী শ্রেণীর নারীদেরকে দাসী থেকে স্বাধীন নারীদের সমমর্যাদায় উত্তীর্ণ করে একেবারে মানুষের মর্যাদায় অভিষিক্ত করা হয়েছে। এর চাইতে চমৎকার সমাধান (Solution) আর কোথায় রয়েছে এবং কি হতে পারে ?

অথচ দাসী উপভোগের এই অপব্যাখ্যার কারণে মুসলমান সমাজ তাদের চিন্তা-চেতনাকে বিশাল এক পর্যায়ে থেকে নামিয়ে কোন সংকীর্ণ পর্যায়ে নিয়ে এসেছেন তা কেউই খেয়াল করছেন না।

[৩০]. আল্লামা শিবলী নো'মানী ও সৈয়দ সুলাইমান নাদভী ঃ সীরাতুন্নবী ২য় খন্ড, (বঙ্গানুবাদ ঃ আলহাজ্ব মা্ওলানা এ. কে.এম. ফজলুর রহমান মুনশী), পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ৮৬০ ।

Dhaka University Institutional Repository

৬. হুর শব্দের অর্থ কি রমনী?

পবিত্র কুরআনের আরবী ‘হুর’ শব্দটির অর্থ ‘রমনী’ গ্রহণের মাধ্যমে ধর্মের পক্ষে কোন কোন ব্যাখ্যা দাতাগণ স্বস্থি বোধ করেছেন দীর্ঘ সময় ধরে। অপর পক্ষে ধর্মের বিরুদ্ধাচরণ করেন যারা, তারা এটিকে ধর্মের বিরুদ্ধাচরণের একটি মোক্ষম অস্ত্র হিসেবে গ্রহণ করে আনন্দ অনুভব করেছেন। উদাহরণ হিসেবে কয়েকটি আয়াতের প্রদত্ত অর্থ উল্লেখ করা হল -

(১) তাহাদের জন্য থাকিবে পান পাত্র, কুজা, প্রসবন নিঃসৃত সুরাপূর্ন পেয়ালা, তাহাদের পছন্দ মত ফলমূল, ঈপ্সিত পাখির মাংস আর তাহাদের জন্য থাকিবে আয়াতলোচনা **হুর**। সুরক্ষিত মুক্তা সদৃশ (সুরা ওয়াক্বিয়াহ আঃ ১৮-২৩)।

(২) তাহারা যেনো প্রবাল পদ্মরাগ (সুরা আররহমান আঃ ৫৮)।

মোহাম্মদ আবদুল হাকিম ও মোহাম্মদ আলী হাসান অনুদিত ‘আল কুরআনুল হাকিম (তাফসীর ও বঙ্গানুবাদ)’- এ **হুর** শব্দের অর্থ শুধু রমনীই গ্রহণ করা হয়নি অধিকন্তু তাদের সাথে বেহেস্তী পুরুষদের বিবাহের আয়োজনও করেছেন তাঁরা। এরূপ বিয়ের স্বপক্ষে মতামত ব্যক্ত করে তাঁরা বলেন, ‘‘মানবের সংসার জীবনে প্রাসাদোপম গৃহ, রাজ ঐশ্বর্য ও সুখসম্ভোগের অফুরন্ত উপকরণ থাকিলেও যদি সেই সংসারে শান্তিময়ী সতীস্বাধ্বী ও পতিপ্রাণা পত্নি বিদ্যমান না থাকে, তাহা হইলে সেই সংসার যেরূপ অশান্তিময় ও নিরানন্দ হইয়া ওঠে, স্বর্গোদ্যানের অফুরন্ত সুখ সম্পদের সহিত তথায় রমণীরত্ন না থাকিলে সেখানেও সেইরূপ অসম্পূর্ণতা ও নিরানন্দ অনুভূত হওয়া সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। তাই পরম করুণাময় আল্লাহ্‌তায়ালা মনোরম স্বর্গোদ্যানে পরমাসুন্দরী **হুর** রূপিনী রমণীরত্ন সৃষ্টি করিয়া উহাকে সর্বোতোভাবে সার্থক ও সুন্দরতর করিয়া তুলিয়াছেন। সংসার জীবনে সতীস্বাধ্বী পতিপ্রাণা স্ত্রী যদি সুন্দরী ও সুশিক্ষিতা হয়, তবে সে স্বামীর পক্ষে যে অমূল্য রত্ন ও সুখ শান্তির পূর্ণধারা স্বরূপিনী বলিয়া অনুভূত হয়, পারলৌকিক জীবনেও পূণ্যবান ব্যক্তিরাও স্বর্গ্যেদ্যানে সেইরূপ পরমাসুন্দরী মনোরমা **হুর** লাভ করিয়া নিজেকে ধন্য ও কৃতার্থ মনে করিবে এবং শারীরিক সুখ, শান্তি ও ভোগবিলাসের দিক দিয়া ইহাই তাহাদের পারলৌকিক জীবনে পূর্ণ সফলতা’’।[৩১]

আবার তসলিমা নাসরিন তাঁর ‘নির্বাচিত কলাম’ গ্রন্থে পবিত্র কুরআনের, **হুর** সংশ্লিষ্ট উল্লেখিত আয়াতে, **হুর** বলতে বেহেস্তি রমণীদের বোঝানো হয়েছে মর্মে সমালোচনা করে বলেন, ‘‘স্বর্গের নারীদের চোখ বড় বড় ও সুন্দর, তারা আয়াতলোচনা, তারা সুরক্ষিত, মানুষ ও জ্বীন পূর্বে তাদের স্পর্শ করেনি। তারা মুক্তার মত গৌরবর্ণ। প্রবাল, পদ্মরাগ, মুক্তা, মূল্যবান রত্ন বিশেষ, নারীকে এইসব ধাতুর সাথে তুলনা করা হয়েছে। নারীকে সুরা, ফলমূল, মাংসের কাতারে উপস্থিত করা হয়েছে’’।[৩২]

মূলতঃ হুর শব্দের অর্থ রমনী গ্রহণ এবং সেখানে পৃথিবীর অনুরূপ বিয়ে - শাদীর আয়োজন যুগ যুগ ধরে পুঞ্জিভূত একটি ভুল ধারণা। ধর্মের পক্ষে ব্যাখ্যা দাতাগণ যেমনি **হুর**কে রমণী অর্থে গ্রহণ করে বক্তব্য প্রদানে স্বস্থি বোধ করেন, তেমনি তসলিমা নাসরিন যে আঙ্গিকে সমালোচনা করেছেন উভয় ক্ষেত্রেই কিন্তু বিষয়টি ধর্মের বিরুদ্ধেই যাচ্ছে।

[৩১]. মোঃ আবদুল হাকিম ও মোঃ আলী হাসান (অনুদিত) ঃ আল কুরআনুল হাকিম (তফসীর ও বঙ্গানুবাদ), ওসমানিয়া বুক ডিপো,৩০/৩২ নর্থব্রুক হল রোড, ঢাকা , সন তারিখ উল্লেখ নেই। পৃঃ ১৬৭৯।

[৩২]. তসলিমানাসরিন ঃ নির্বাচিত কলাম, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৪৮-১৪৯।

এবার দেখা যাক **হুর** শব্দের অর্থ আসলে কি? তা কি রমণী? আরবী ভাষায় রমনী কিংবা নারীদেরকে কি **হুর** বলে? রমণী বা নারী অর্থে আরবীতে একাধিক শব্দ রয়েছে বটে কিন্তু তা যে কোন অবস্থাতেই **হুর** নয় এই ব্যাপারে নিশ্চিত হয়েই বলা যায়। তাহলে **হুর** শব্দের অর্থ কি? এর অর্থ প্রসঙ্গে প্রফেসর রফিউল্যাহ শিহাব বলেন, ''Its basic meaning is whiteness. In Arabic language it is the name of a kind of 'Wood' having white colour.'' অর্থাৎ আরবী ভাষায় **হুর** দ্বারা এক ধরনের কাঠকে বোঝায় যার রং সাদা। এর মূল অর্থ হলো শুভ্রতা। [৩৩] প্রশ্ন হতে পারে তাহলে পবিত্র কুরআনে এই **হুর** বলতে কি সাদা কাঠকে বোঝানো হয়েছে? না তা নয়। এটি রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

মোঃ আসাদের মতে **হুর** বলতে বিশুদ্ধ কোন সৃষ্টি এবং সঠিক অর্থে পবিত্র কোন সাথীকে বোঝাচ্ছে, যারা হবেন রূপময় আয়তলোচন চোখের অধিকারী। তিনি তাঁর 'The massage of the Quran' এ সুরা ওয়াক্কিয়ার **২১**নং আয়াতের এরূপ অনুবাদ করেছেন; æAnd (with them will be their) companions pure, most beautiful of eye'' যার বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছেন তিনি এভাবে; ''The noun 'Hur' ...rendered as 'companions pure' .. is a plural of both 'Ahwar' (masculine) and 'Hawara' (feminine) either of wich descrives a person distinguished by 'Hawra' wich latter term primarily denotes intence whiteness of the eyeballs and lustrous black of the iris (Qamus), in a more general sense, 'Hawar' signifies simply 'Whiteness (Asas) or, as a moral qualification, purity hence the compound expression Hur in signifies, approximately pure beings (or more specifically, companions pure) of in, (plural of ayan). অর্থাৎ হুর শব্দটি দ্বারা পবিত্র এক সঙ্গীকে বুঝায় যা পুলিঙ্গ এবং স্ত্রী লিঙ্গের মিলিত রূপ, যারা সুন্দর টানাটানা চোখের অধিকারী। আরও স্পষ্ট অর্থে যা শুভ্রতা এবং বিশুদ্ধতার মূর্ত প্রতিক যা নৈতিক অর্থে পরিচ্ছন্ন এবং বিশুদ্ধ মানুষের পবিত্র সঙ্গী ।[৩৪]

এখন প্রশ্ন হলো এই সুন্দর টানাটানা চোখের অধিকারী পবিত্র সাথীরা কি কেবলই নারী? না তা নয়। মোঃ আসাদের উল্লেখিত বক্তব্য থেকেই এটি স্পষ্ট যে হুর বলতে নারী- পুরুষ উভয়কে বোঝায়। এই প্রসঙ্গে মোঃ রফিউল্যহ শিহাব আরও স্পষ্ট করে বলেন, The word 'hoor' occurs in the holy Quran four times. Literally, it is a plural of 'Ahwar' (applied to male) and 'Haura' (applied to female). In the light of these meanings, word hoor applies to both males and females of white colour and it is wrong to confine it to female only''. অর্থাৎ হুর শব্দটি পবিত্র কুরআনে চারবার ব্যবহৃত হয়েছে। আহওয়ার (পুরুষ অর্থে) এবং হাওয়ারা (নারী অর্থে) দুটি শব্দের মিলিত বহুবচন রূপ হলো- **হুর**। তাই **হুর** দ্বারা সাদা রংয়ের নারী পুরুষ উভয়কেই বোঝায়। এমতাবস্থায় এটিকে কেবলমাত্র রমণী অর্থে গ্রহণ সঠিক ও যথার্থ নয়। [৩৫]

---

[৩৩]. Prof. Rafiullah Shehab ঃ Rights of women in Islamic shariah, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১২৫।

[৩৪].আবু ফয়সল ও আহমদ মনসুর ঃ নির্বাচিত কলামে তসলিমা নাসরিন কর্তৃক কুরআন, হাদিস ও ধর্মের অবমাননা এবং অপব্যাখ্যা ঃ তসলিমা নাসরিনের ইসলাম বিদ্বেষ ও অপব্যাখ্যা, আমান প্রকাশনী, ফরিদপুর, - গ্রন্থে English Translation and commentary of the Holy Quran (The massage of the Quran) প্রবন্ধে, উদ্ধৃত করেন আহমদ মনসুর ঃ পৃঃ ৪৬।

[৩৫].Prof. Rafiullah Shehab ঃ Rights of women in Islamic shariah, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১২৫।

শুধু তাই নয়, মোঃ রফিউল্যাহ শিহাব আরও বলেছেন যে, æSimilarly the word 'Hoorain' used as plural in the Urdu Ianguage is also wrong as the word 'Hoor' itself is a plural''অর্থাৎ" যেহেতু **হুর** শব্দটি স্বয়ং বহুবচন, আর তাই উর্দু ভাষায় এর বহুবচনের রূপ **হুরেইন** জাতীয় আরেকটি শব্দ আবিস্কারও যথার্থ নয়। [৩৬]

এসব ব্যাখ্যার অনুসরণে হুরকে ইংরেজী Student কিংবা parent রূপ শব্দ হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পাওে যা নর- নারী উভয়কেই বোঝায় এবং যা স্বয়ং এক বচন নয়, বরং বহু বচন। জনাব আহমদ মনসুরও বলেন, ''সুতরাং (Hur) শব্দটি দ্বারা নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ পাক পুরুষ বাচক (Masculine) ও স্ত্রী বাচক (Faminine) এই দুটি স্বত্তারূপ এমন এক সৃষ্টির কথা উল্লেখ করেছেন যে সম্পর্কে আমাদের বিন্দু পরিমাণও ধারণা বা জ্ঞান নেই''।[৩৭]

উপরের আলোচনা থেকে এটি বোঝা যাচ্ছে যে, **হুর** শব্দের অর্থ রমণী নয় বরং **হু** পবিত্র বেহেস্তের এক রহস্য যা নর-নারী উভয়কেই বোঝায়। এরূপ অবস্থায় বেহেস্তে হুরের সাথে বেহেস্তবাসী পুরুষদের বিয়ের বিষয়টি যা মোহাম্মদ আবদুল হাকিম ও মোহাম্মদ আলী হাসান উল্লেখ করেছেন তা একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক। ব্যাখ্যাটি আংশিক এবং একেবারেই জাগতিক হয়ে গিয়েছে। কারণ শারীরিক সুখ, শান্তি ও ভোগ বিলাসের দিক দিয়ে পারলৌকিক জীবনের পূর্ণ সফলতার যে চিত্র তাঁরা অংকন করেছেন তা কেবল মাত্র পুরুষদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছেন। তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ন হলো এখানে পার্থিব জীবনের সাথে পারলৌকিক জীবনকে একেবারে একাকার করে ফেলা হয়েছে। পরকালে মানুষের অবয়ব, ধরনধারণ পৃথিবীর মতই হবে এটা কে নিশ্চিত করে বলতে পারে?

সব কিছুই ধ্বংস হবে, অতঃপর আবার সৃষ্টি হবে, সেই সৃষ্টি বর্তমান সৃষ্টির মতই হবে তা কিভাবে বলা যায়? তাছাড়া বেহেস্তে যে পৃথিবীর মতই দৈহিক মিলনের বিষয়টি সম্ভব নয়, তা তো নিশ্চিত হয়েই বলা যায়। কারণ তা হলে আদম ও হাওয়ার পক্ষে গন্ধম খাওয়ার পরও বেহেস্তে অবস্থান সম্ভব হতো। কিন্তু তাতো হয়নি। বরং গন্ধম তথা নিষিদ্ধ ফল খাওয়া এবং লজ্জাস্থানের উম্মুক্ততার সাথে সাথে মুহুর্তের জন্যও আদম ও হাওয়ার বেহেস্তে স্থান হয়নি, ছিটকে আসতে হয়েছে এখানে, এই পৃথিবীতে। অতএব যারা হুর শব্দের অর্থ রমণী গ্রহণ করেন এবং বেহেস্তে তাদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার প্রত্যাশা করেন তা মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়।

এই বিষয়ে মোঃ রফিউল্যাহ শিহাব এর বক্তব্য প্রনিধানযোগ্য। তাঁর ভাষায়; æAt two places in the holly Quran Lii 20 and xLIV-54 the word Jawwaj is used ib relation to Hoor 'Zawwaguna humbi hooreen'- this verse has commonly been translated as marriage with hoor while actually there will be no marriage affairs in the paradise. Here the word 'Zawwj' has been used in its literal meaning of coupling a thing with another, as has been used in the Holy Quran it self in surah Lxxxi-7 'wa Izal Nufaz zu wwijat' which is translated as and when the souls shall be united with the fellows''. অর্থাৎ সুরা তুরের ২০নং আয়াতে এবং সূরা দু'খান

[৩৬].পূর্বোক্ত, পৃঃ ১২৫।

[৩৭].আবু ফয়সাল ও আহমদ মনসুর ঃ তসলিমা নাসরিনের ইসলাম বিদ্বেষ ও অপব্যাখ্যা, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৭।

এর ৫৪ নং আয়াতে হুরেইনদের সাথে বিবাহ করাইব মর্মে অনুবাদ গ্রহণ করা হয়েছে। যদিও পবিত্র বেহেস্তে বিবাহের বিশেষ কোন নিয়মই নেই। মূলত এখানে জ্ওজ শব্দটির সাহিত্যিক ভাব গ্রহণ পূর্বক একবস্তুর সাথে অন্য বস্তুর সমন্বয় সাধনের কথা বলা হয়েছে যে ভাবে একই শব্দ সুরা তাকাসুরের ৭নং আয়াতে আত্মাদের পরস্পরের সাথে সমবেত করাইব অর্থে গৃহিত হয়েছে।[৩৮] তিনি সুরা তুরের ২০নং আয়াতের এরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন; æIn the paradise the righteous man and women will be blessed with the companionship of white (pure) men and women''. অর্থাৎ পবিত্র বেহেস্তে পবিত্র মানুষেরা (নারী-পুর) পবিত্র সঙ্গী পাবে।[৩৯] ড. রাশিদ খলিফাও তাঁর Quran ঃ The final testamint এ সুরা তুরের উল্লেখিত আয়াতের বাক্যটির অনুবাদ করেছেন এভাবে যে, æWe match them with beautiful spouses''[৪০] - ঠিক গন্ধম খাওয়ার পূর্বে আদম হাওয়া যেমন ছিলেন।

অথচ হুর শব্দটির শুধু মাত্র রমণী অর্থ গ্রহণ করা এবং জওজ বা আজওয়াজুন শব্দের ক্ষেত্রে কোথাও কেবল মাত্র স্ত্রী এবং কোথাও বিবাহ করাইব অর্থ গ্রহণ পূর্বক পবিত্র বেহেস্তকে শত রমণী ভোগের বিচিত্র এক হেরেম খানায় পরিণত করা হয়েছে। যাতে মূলতঃ ইসলাম ধর্মের অফুরন্ত ক্ষতিই করা হয়েছে! এতে করে ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে ভুল বোঝাবোঝির সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এটি যুব সমাজকে দলেদলে বিপদগামী করারও সহায়ক হয়েছে। ওমর খৈয়াম তো অনেক আগেই প্রশ্ন রেখেছেন -

কোরআন হাদিস সবাই বলে পবিত্র সেই বেহেস্তে নাকি
মিলবে সেথায় আসল শরাব তন্বি হুরি ডাগর আঁখি,
সরাব এবং প্রিয়ায় নিয়ে দিন কাটে মোর দোষ কি তাতে?
বেহেস্তে যা হারাম নহে মর্তে হবে হারাম তাকি?[৪১]

এই প্রশ্ন শুধু ওমর খৈয়ামেরই নয়, প্রতিটি আধুনিক মানুষের। কিন্তু এর জবাব তারা পাননি এবং পাচ্ছেনওনা। আর তাই মানুষ বিপথে যাচ্ছে, পাপে লিপ্ত হচ্ছে, নতুবা নাস্তিকতাকেই উত্তম ভেবে নাস্তিকতাকে অবলম্বন করছে।

এখন প্রশ্ন হলো, **হুর** শব্দটির রমণী অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে কখন? এবং কেন?

এ সম্পর্কেও প্রফেসর রফিউল্যাহ শিহাবের মতামত প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, æWomen in the early Islamic period were a perfect model of .. .. Teaching of Islam and so enjoyed the highest respect in the Muslim society. But when, later, monarchy replaced the Islamic form of government, the complexion of things changed. Islam demanded simple living while monarchy flourished on luxuries of every king. Women were encouraged to adopt the luxurious way of life, which they

[৩৮]. Prof. Rafiullah Shehab ঃ পূর্বোক্ত, পৃঃ ১২৫।

[৩৯]. পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ১২৫।

[৪০]. উদ্ধৃত করেন আহমদ মনসুরঃ তসলিমা নাসরিনের ইসলাম বিদ্বেষ ও অপব্যাখ্যা, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৪।

[৪১]. ওমর খৈয়াম ঃ রুবাইয়াৎ (রুবাই ১৭৮, কাজী নজরুল ইসলাম কর্তৃক অনুদিত), কলিকাতা, স্ট্যান্ডার্ড , ১৯৫৯ পৃঃ ১১৭।

anxiously did. Resultantly, they themselves became items of luxury in the new society. Monarchy ruled various parts of the Muslim world for many centuries. It was during this period that the bulk of classical literature on Islam was prepared. In this literature, women were presented as an object of play with rather than an object to respect. Slavery, which was banned by the Holy Quran, was revived and slave girls became the decoration pieces of the palaces of kings and princes. This change rested from the culture influences coming from the various countries conqured by the Muslims. But to justify this change a large number of verses of the holly Quran were interpreted in a way that helped popularise the various luxurious of life introduced by the monarchy. Among the new ideas introduced in Muslim society during the period of monarchy was the concept of 'Hoor' as a beautiful maidan in the paradise. The faithful will enjoy the company of hundreds of these beautiful maidans in the paradise.''

যার সার অর্থ দাঁড়াচ্ছে এই যে, "ইসলামের প্রাথমিক যুগে খাঁটি ইসলামিক বিধিব্যবস্থায় নারীরা সর্বাধিক মর্যাদাপূর্ণ অবস্থানে ছিলো, কিন্তু পরে যখন ইসলামিক বিধিব্যবস্থার স্থলে রাজতন্ত্র স্থান করে নিতে থাকে তখন ধীরে ধীরে অবস্থারও পরিবর্তন হতে থাকে। ইসলামের সাধারণ জীবনযাপন পদ্ধতির স্থলে রাজতন্ত্র বিলাস বহুল পদ্ধতি গ্রহণ করে, নারীদেরকেও এরূপ বিলাসবহুল জীবনযাপন পদ্ধতিতে উৎসাহিত করে তোলা হয় এবং তারা এতে উদ্বুদ্ধও হয়। ফলে তারা নতুন সমাজ ব্যবস্থায় ভোগবিলাসিতার উপকরণে পরিণত হয়। মুসলিম বিশ্বের অধিকাংশ জুড়ে রাজতন্ত্র শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বিদ্যমান ছিলো। এই সময়েই ইসলামিক বিষয়ে প্রচুর ক্লাসিক্যাল সাহিত্য রচনা করানো হয়েছিলো। এই সব সাহিত্যে নারীদেরকে শ্রদ্ধেয় নয়, বরং ভোগ্যবস্তু হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। দাসত্ব- যা পবিত্র কুরআন বাতিল করেছে, তা এই সময়ে পুনরুজ্জীবিত হয়। দাসী বালিকারা প্রাসাদের অলংকার হিসেবে এবং রাজা ও রাজপুত্রদের ভোগ্যবস্তুতে পরিণত হয়। এই সংস্কৃতিই মুসলিম বিশ্বে বিস্তার লাভ করতে থাকে। রাজতন্ত্রের এই ভোগবিলাসিতাকে Justify করার লক্ষ্যে পবিত্র কুরআনের বেশ কিছু আয়াতেরও সেই আঙ্গিকে অনুবাদ করানো হয়। তন্মধ্যে **হুর**কে রমণী অর্থে গ্রহণ এবং বেহেস্তে শত শত রমণী উপভোগের জন্য পাওয়া অন্যতম"।[৪২]

অর্থাৎ **হুর** শব্দের অর্থ রমণী গ্রহণ এবং পবিত্র বেহেস্তকে শত রমণী ভোগের হেরেম খানায় পরিণত করেছে- রাজতন্ত্র, ইসলাম নয়। অতঃএব পবিত্র কুরআনের সকল অনুবাদে, ব্যাখ্যায় **হুর** শব্দের যথার্থ অর্থই স্থান পাওয়া, বিশ্লেষণ হওয়া আবশ্যক।

জনাব আহমদ মনসুর এর সাথে একমত হয়ে বলা যায় , ''সুতরাং **হুর** (Hur) শব্দটি দ্বারা নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ পুরুষবাচক (Masculine) ও স্ত্রী বাচক (Faminine) এই দু'টি স্বত্ত্বারূপ এমন এক সৃষ্টির কথা উল্লেখ করেছেন যে সম্পর্কে আমাদের বিন্দু পরিমাণও ধারণা বা জ্ঞান নেই"।[৪৩]

---

[৪২]. Prof. Rafiullah Shehabঃ Rights of women in Islamic shariah, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১২৪-১২৫।

[৪৩]. আহমদ মনসুর ঃ তসলিমা নাসরিনের ইসলাম বিদ্বেষ ও অপব্যাখ্যা, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৭।

Dhaka University Institutional Repository

৬.৩.২ নারীদেরকে কেন্দ্র করে পবিত্র হাদিসের মধ্যে সৃষ্ট বিকৃতি সনাক্ত করে হাদিসের মৌলিকত্ব অনুসন্ধান

১. হাদিস কি ও কেন

শাব্দিক অর্থে হাদিস মানে কথা। প্রাচীন ও পুরাতনের বিপরীত বিষয়। অর্থাৎ যে সব কথা, কাজ ও বস্তু পূর্বে ছিলোনা এখন অস্তিত্ব লাভ করেছে- তা-ই হাদিস। মহানবী হযরত মুহম্মদ (সঃ) আল্লাহর মনোনীত রাসুল হিসেবে ''যা কিছু করেছেন, যা কিছু বলেছেন এবং যা কিছু করার ও বলার অনুমতি দিয়েছেন অথবা সমর্থন করেছেন''- তা ই - হাদিস। একই সাথে মহানবী (সঃ) সম্পর্কিত বর্ণনা ও তাঁর গুণাবলী সম্পর্কিত বিবরণকেও হাদিসের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।[৪৪]

ইসলাম প্রচারের প্রাথমিক পর্যায়ে পবিত্র কুরআন ব্যতীত নবীজির (সঃ) বক্তব্য লিখে রাখার ব্যাপারে নবীজি (সঃ) বিশেষ গুরুত্বারোপ করেননি। তথাপিও কিছু কিছু উৎসাহী সাহাবীরা নিজ উদ্যোগে নবীজির (সঃ) অনেক কথা ও বিবরণ লিখে রেখেছিলেন এবং তাঁরা ব্যক্তিগত ভাবে নবীজির (সঃ) সমর্থনও আদায় করেছিলেন বলে ধারণা করা হয়। তাঁদের মধ্যে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ), আবু হুরায়রা (রাঃ), আলী ইবনে আবু তালিব(রাঃ) প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। এই সব সাহাবী ও অন্যান্য সাহাবী যাঁরা নবীজি (সঃ) কে স্বয়ং দেখেছেন তাঁদের থেকে পরবর্তীতে যাঁরা হাদিস সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেছেন, তাদেরকে 'তাবিঈ' বলে। এই তাবিঈগণের থেকে হাদিসের বিষয়ে জ্ঞান অর্জনকারীদের 'তাবই-তাবঈন' বলে।

একজন তাবঈ বহু সংখ্যক সাহাবীর সাথে সাক্ষাৎ করে মহানবীর (সঃ) জীবনের ঘটনাবলী, তাঁর বাণী, কাজ ও সিদ্ধান্ত ইত্যাদি সংগ্রহ করেছেন। এদের কাছ থেকেই আবার 'তাবই-তাবঈ'গণ হাদিস সংগ্রহ করেছেন। এই 'তাবই-তাবঈ'গণের সময়েই হাদিস সমূহ ব্যাপক ভাবে একত্রিত করণের প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে উত্তীর্ন হয়ে গিয়েছিলো হিজরীর একটি শতক এবং সমস্ত সাহাবীগণ এবং অধিকাংশ তাবঈগণ পরলোক গমন করেছেন। এই তাবই-তাবঈ'গণের আমলেই ইসলামী বিশ্বের খলিফা উমর ইবনে আবদুল আযীয(রঃ) দেশের বিভিন্ন এলাকায় প্রশাসকদের নিকট হাদিস সংগ্রহের জন্য রাজকীয় নির্দেশ জারী করেন। হাদিস সংগ্রহে সম্ভবতঃ এটিই প্রথম সরকারী উদ্যোগ।

এভাবে সরকারী উদ্যোগে সংগৃহিত হাদিসের বিভিন্ন সংকলন রাজধানি দামেস্কে পৌছাতে থাকে। খলিফা সেগুলোর একাধিক পান্ডুলিপি তৈরী করে দেশের সর্বত্র পাঠিয়ে দেন। এই কালেই প্রসিদ্ধ ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালিক হাদিস গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই যুগের আরও কতিপয় হাদিস সংস্কারক হচ্ছেন- জামি সুফিয়ান সাওরী, জামি ইবনুল মুবারক, জামি ইমাম আওযাঈ, জামি ইবনে জুরাইজ। হিজরী ২য় শতকের শেষ থেকে ৪র্থ শতকের শেষ পর্যন্ত হাদিস চর্চা আরও ব্যাপক হয়। তৃতীয় হিজরীতে প্রসিদ্ধ ইমাম বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ সিজিস্তান, নাসাঈ ও ইবনে মাজা(রাঃ) গণের আবির্ভাব ঘটে। তাঁদের প্রচুর পরিশ্রম ও অধ্যাবসায়ের মাধ্যমে ছয়খানি হাদিস গ্রন্থ সংকলিত হয়।

---

[৪৪]. ইমাম মুহম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল বুখারী(রঃ) ঃ বুখারী শরীফ (দ্বিতীয় খন্ড),(সম্পাদনা পরিষদের অনুদিত এবং সম্পাদিত), ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা ১০০০, ১৯৯১, পৃঃ এগার, এবং মওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম ঃ হাদীস সংকলনের ইতিহাস (পঞ্চম সংস্করণ), পূর্বোক্ত, পৃঃ ০৩ - ১৫।

এই গ্রন্থ সমূহকেই হাদিসের মৌলিক গ্রন্থ ধরে বর্তমান কাল পর্যন্ত সকল মুসলমান অধ্যুষিত দেশ সমূহে হাদিসের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও গবেষণা চলছে।[৪৫]

এই ছয়খানি গ্রন্থের মধ্যে বুখারী শরিফের মর্যাদা সবার উর্ধ্বে। এই বিষয়ে মুহাদ্দিস ও আলেমগণ একমত। তাঁরা এই গ্রন্থখানিকে সর্বাপেক্ষা অধিক বিশুদ্ধ হিসেবে বিবেচনা করেছেন। তার কারণ সম্ভবতঃ এখানে যে ইমাম বুখারী সর্বাধিক যাচাই বাছাইয়ের ব্যবস্থা সহ প্রচন্ড সতর্কতা অবলম্বন করেছিলেন। এ বিষয়ে প্রচলিত কাহিনীটি হলো - জনাব বুখারী আল্লাহ্ প্রদত্ত স্বীয় ক্ষমতা, এলম ও অভিজ্ঞতার দ্বারা প্রতিটি হাদিসকে সূক্ষ্মাতিসূক্ষরূপে পরখ করেছেন। এর পরও প্রতিটি হাদিস লিপিবদ্ধ করার পূর্বে গোছল করে দুই রাকায়াত নফল নামাজ পড়ে আল্লাহতায়ালার নিকট এস্তেখারা করার পর এক একটি হাদিস লিপিবদ্ধ করেছেন। স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন আসে ইমাম বুখারী সাহেবের এতটা সতর্কতা এবং যাচাই বাছাইয়ের প্রয়োজন হ'ল কেন? তার জবাবও ইমাম বুখারী থেকে পাওয়া যায়। তা হ'ল, তিনি স্বপ্নে দেখেছিলেন যে, রাসুলুল্লাহর (সঃ) দেহ মুবারকের উপর মাছি এসে বসেছে আর তিনি (ইমাম বুখারী) পাখা দিয়ে সেগুলো তাড়িয়ে দিচ্ছেন।

জ্ঞানী ব্যক্তিগণের স্বপ্ন প্রায়ই সত্য হয়ে থাকে এবং তাঁরা সত্য বিষয়ে প্রতীকি স্বপ্নও দেখে থাকেন। এই স্বপ্নের তাৎপর্য হলো নবীজির(সঃ) কথায় ও তাঁর অবলম্বিত জীবন পদ্ধতির বিবরণে তথা হাদিসে বিস্তর ভুল তথ্য এবং বিকৃতির অনুপ্রবেশ ঘটেছে। সে সব ভুল তথ্য ও বিকৃতি থেকে হাদিসকে মুক্ত করা প্রয়োজন। এর প্রয়োজনীয়তা এবং গুরুত্ব ইমাম বুখারী অনুধাবনে সক্ষম হয়েছিলেন। এই স্বপ্ন তাঁর সেই উপলব্ধিই বটে। এ সবই তাঁকে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে প্রচন্ড যাচাই বাছাইয়ের মাধ্যমে একখানি হাদিস গ্রন্থ প্রণয়নে উদ্বুদ্ধ করেছে এবং তিনি তাঁর সংগৃহিত মোট ছয়লক্ষ হাদিস থেকে যাচাই বাছাই পরখ পর্যালোচনা করে সর্বমোট ৭৩৯৭টি হাদিস, উক্ত গ্রন্থে সংকলন করেছেন। তন্মধ্যে কিছু কিছু শব্দের কথার এদিক সেদিক হওয়ার জন্য কিংবা একই হাদিস বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রযোজ্য এরূপ ক্ষেত্রে কোন কোন হাদিস কয়েকবার পুনরাবৃত্তিও ঘটেছে।

উক্ত পুনরাবৃত্তি সমূহ বাদ দিলে বুখারী হাদিসের সংখ্যা দাঁড়ায় ২৫১৩টি।[৪৬]

২. হাদিস বিকৃতির স্বরূপ

পূর্বের বর্ণনা থেকে এটি দিনের আলোর মত পরিস্কার যে, মহানবীর (সঃ) কথা ও কাজের বিবরণী তথা হাদিসে বিস্তর বিকৃতির অনুপ্রবেশ ঘটেছে। অথচ মহানবী (সঃ) কর্তৃক তাঁর জ্ঞানী, শিক্ষিত উম্মতদের প্রতি ন্যস্ত করা এটি একটি নির্ধারিত দায়িত্ব যে নবীজির (সঃ) কথা ও কাজকে যুগে যুগে মানুষের নিকট পৌঁছে দিতে হবে। নবীজি (সঃ) বিদায় হজ্বে বলেছেন, ''তোমরা যারা আমার কথা শুনেছো তারা, এখানে যারা উপস্থিত নেই তাদের কাছে আমার কথাকে পৌঁছে দেবে''।[৪৭] এই দায়িত্ব কিন্তু সর্বকালের সর্বযুগের

[৪৫]. ইমাম মুহম্মদ ইব্ন ইসমাঈল বুখারী(রঃ) ঃ বুখারী শরীফ (দ্বিতীয় খন্ড), পূর্বোক্ত, পৃঃ নয়-একত্রিশ, মওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম ঃ হাদীস সংকলনের ইতিহাস (পঞ্চম সংস্করণ), পূর্বোক্ত, পৃঃ ০৩ - ১৫ এবং মাওলানা নূর মোহাম্মদ আজ'মী (রঃ) ঃ মেশকাত শরীফ, (বঙ্গানুবাদও ব্যাখ্যাসহ, প্রথম জিলদ), এমদাদিয়া লাইব্রেরী, চকবাজার, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃঃ ব-ম।

[৪৬]. বিস্তাারিত জানার জন্য, বুখারী শরীফ (১ম- ৮ম খন্ড), পূর্বোক্ত।

[৪৭]. আল্লামা শিবলী নো'মানী ও সৈয়দ সুলাইমান নাদভী ঃ সীরাতুন্নবী ২য় খন্ড, (বঙ্গানুবাদঃ আলহাজ্ব মা্ওলানা এ. কে.এম. ফজলুর রহমান মুনশী), পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬০৩ ।

মুসলমানের। তবে এই দায়িত্ব পালন করতে হবে সংকীর্ণ স্বার্থের উর্দ্ধে থেকে। ন্যায় নিষ্ঠা সতর্কতা ও পবিত্রতার সাথে। এই দায়িত্ব পালনকালে প্রতিটি উম্মতের সতর্ক ও সচেতন থাকতে হবে নবীজির (সঃ) সেই নির্দেশের প্রতি- ''আমি যা বলিনি, তা আমার উপর যে ব্যক্তি আরোপ করবে, সে যেনো তার জন্য আগুনের আসন ঠিক করে নেয়'' (বুখারী)। জানা যায় নবীজির (সঃ) এই বাণীর প্রতি ইসলামের চার খলিফা হযরত আবুবকর, ওমর, ওসমান ও আলী অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন। পরবর্তীকালে চার ইমামের অন্যতম ঈমাম, ঈমাম আবু হানিফাও মহানবীর (সঃ) উল্লেখিত সতর্কমূলক নির্দেশের প্রতি এতটা ভীত ছিলেন যে, স্বয়ং প্রচুর হাদিস সংগ্রহ করলেও ব্যবহার করেছিলেন স্বল্প সংখ্যক হাদিস।

কিন্তু দুঃখ জনক হলেও সত্যি যে নবীজির (সঃ) এরূপ কঠিন সতর্কতা সত্ত্বেও এবং হাদিস ব্যবহারের ক্ষেত্রে সতর্কতার এমন দৃষ্টান্ত থাকা সত্ত্বেও ইসলামের প্রাথমিক যুগ থেকে হাদিস বিকৃত হয়েছে। যা নবীজি (সঃ) বলেননি, যা করেননি, কিংবা করতে বলেননি - এরূপ অসংখ্য বক্তব্য নবীজির (সঃ) আদেশ নির্দেশ হিসেবে তাঁর উপর আরোপ করা হয়েছে।

সর্বপ্রথম হাদিস বিকৃত করণের কাজটি শুরু হয় খোলাফায়ে রাশেদিন এর শেষ পর্যায়ে খাওয়ারিজ ও শিয়াদের দ্বারা। সিফ্‌ফিনের যুদ্ধে (৩৬হিঃ) সন্ধিসূত্র নিয়ে মতভেদের কারণে খাওয়ারিজরা এক স্বতন্ত্র মতবাদের উদ্ভব ঘটায়। তাদের স্বতন্ত্র মতবাদের স্বপক্ষে তারা হাদিসের নামে মিথ্যা প্রচারণা শুরু করে। একই ভাবে শিয়া সম্প্রদায়ও তাদের স্বতন্ত্র মতবাদ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে হাদিস জাল করেছে। এছাড়া হিজরী দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতকে হাদিস জাল করণের এক নতুন ফিতনা জাগ্রত হয়েছিলো। লোকেরা কিস্‌সা কাহিনী, মিথ্যা ও অমূলক কিংবদন্তি হাদিসের নামে বর্ণনা পরম্পরা সূত্র সহকারে প্রচার করতে শুরু করে, এদের মধ্যে রাজনৈতিক স্বার্থবাদী, কিস্‌সা কাহিনী বর্ণনাকারী ও গোপন ধর্মদ্রোহিতাকারীরাই প্রধান।

মওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম বলেন, ''একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, হাদীসের এই দীর্ঘ ধারাবাহিকতায় এমন এক একটি অবস্থা দেখা দিয়াছে, যখন দুষ্ট লোকেরা স্বার্থ কিংবা অসদুদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া নিজেদের কথাকে রসূলের হাদীস নামে চালাইয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছে এবং এমন কিছু কিছু কথা রসুলের বিরাট হাদীস সমুদ্রের সহিত মিশিয়া যাইবার সুযোগ লাভ করিয়াছে''।[৪৮] তিনি আরও বলেন, ''এই ফিতনা সমূহের প্রায় সকল ধারকই- নিজস্ব ভাবে কথা রচনা করিয়া রসুলের নামে হাদিস বর্ণনা করিতে শুরু করে। উহার সহিত প্রকৃত হাদিসের মত সম্পূর্ণ মনগড়া ভাবে বর্ণনা সূত্র (সনদ) জুড়িয়া দেওয়া হয় এবং উহাকে এমনভাবে পেশ করা হইতে থাকে যেনো সকলেই উহাকে রসুলের মুখ নিঃসৃত বাণী বলিয়া বিশ্বাস লয়''।[৪৯]

মোট কথা, হাদিস জাল হয়েছে, বিকৃত হয়েছে। হাদিস জাল ও বিকৃত করার কারণে ইসলাম ধর্মে প্রচন্ড বিভ্রান্তি ও জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে, যা ধর্মের জন্য মারাত্মক ক্ষতির কারণ হয়েছে। কিন্তু সুখের কথা এই যে, একই সাথে সাহাবাদের যুগ থেকে শুরু করে তাবঈ, তাবই-তাবেঈন, মোহাদ্দেস-ঈমামগণের যুগে এবং ক্ষীণ আকারে হলেও অদ্যাবধী হাদিসের উপর যাচাই বাছাই গবেষণা অব্যাহত রয়েছে। তন্মধ্যে তাবে-তাবেঈনদের পরবর্তীতে মুহাদ্দেস ও ইমামদের যুগে হাদিস সংগ্রহ ও রক্ষণাবেক্ষণে এবং পরিশুদ্ধ করণে ব্যাপক অভিযান ও তীব্রতা পরিলক্ষিত হয়। বলা যায়, তাঁরা ইসলাম ধর্মের ২য় বুনিয়াদ হাদিস সংরক্ষণে এবং পরিশুদ্ধ করণে এক রকম জেহাদেই অবতীর্ন হয়েছিলেন। তা না হলে আজ মুসলিম জাতি মহানবীর

[৪৮]. মওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীমঃ হাদীস সংকলনের ইতিহাস, পূর্বোক্ত , পৃঃ ৫৬৬।

[৪৯]. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৮৪।

(সঃ) সুন্নতের বিরাট অংশ থেকে বঞ্চিত হতো, তাতে সন্দেহ নেই। তাঁরা হাদিস সংগ্রহ করেছেন, তা নিয়ে গবেষণা করেছেন, জ্বালিয়াতির কারণ নির্ণয় করেছেন এবং এর থেকে হাদিসকে মুক্ত করার পথও নির্দেশ করেছেন। হাদিস বিকৃত ও জাল করণের যে সমস্ত কারণ ইমাম, মোহাদ্দেসগণ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত নির্ণিত হয়েছে, সেগুলো হ'ল-

এক. মুসলমানদের মধ্যে একদল লোক ছিলো যারা মুসলমানদের ছদ্মাবরণে ইসলামের অনিষ্ট সাধনে তৎপর ছিলো। এরা ইসলামের মূলনীতি বিশ্বাসগুলোর প্রতি মানুষকে শ্রদ্ধাহীন করার উদ্দেশ্যে নবীজির (সঃ) নামে বহু সহস্র হাদিস জাল করেছে;

দুই. একদল সুফি ও আবেদ প্রকৃতির লোক অথচ অশিক্ষিত ও মুর্খ, তারা কিছু অভিনব এবাদত সৃষ্টি করেছেন এবং তারাই সে সবের ছওয়াব ও ফজিলত সম্পর্কিত হাদিস তৈরী করেন;

তিন. বিদয়াৎ সৃষ্টিকারী ও বিশেষ মাজহাবী মতের অনুসারীরা নিজেদের মতের সমর্থনে এবং প্রতিপক্ষ মাজহাবের গৌরবহানির উদ্দেশ্যে হাদিস তৈরী করেছেন;

চার. হাদিস ইসলামী আইনের গুরুত্বপুর্ন ভিত্তি হবার কারণে রাজা বাদশাহ আমীর ওমরার খোশখেয়ালের সমর্থনে মোছাহেবীর কারণে এবং রাজনৈতিক স্বার্থোদ্ধারের নিমিত্তে হাদিস তৈরী হয়েছে;

পাঁচ. অশিক্ষিত, অযোগ্যও সংকীর্ণমনা কিছু কিছু ওয়াজ ব্যবসায়ী অজ্ঞ জনসাধারণের নিকট সহজে খ্যাতিলাভ ও অর্থোপার্জনের উদ্দেশ্যে নানা প্রকার আজগুবি ও ভিত্তিহীন গল্পগুজবকে হাদিস হিসাবে চালিয়ে দিয়েছেন;

ছয়. লোকদিগকে ভয় ও প্রলোভনের মাধ্যমে সৎকর্মে লিপ্ত করা ও অসৎকর্ম থেকে বিরত রাখার সদুদ্দেশ্যেও বহু হাদিস সৃষ্টি করা হয়েছে;

সাত. অন্য ধর্মাবলম্বীদের সাথে তর্কে স্বীয় ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনোদ্দেশ্যে ও হাদিস সৃষ্টি করা হয়েছে;

আট. জনসাধারণকে জেহাদে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে এবং আমীর বাদশাহগণের আত্মকলহে ব্যক্তি বা দল বিশেষের প্রতি জনসাধারণের মনোযোগ আকর্ষনোদ্দেশ্যে হাদিস সৃষ্টি করা হয়েছে;

নয়. অসতর্কতা, সংকীর্ণ চিন্তাভাবনা ও অন্ধভক্তির বশীভূত হয়েও হাদিস সৃষ্টি করা হয়েছে;

দশ. সাহাবীগনের ভক্তি, আরবী প্রবাদ, জ্ঞানী ও মনীষীদের বাণীকেও রসুল (সঃ) এর সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে;

এগার. এমন কি হাদিস বিকৃতিকারকগণ হাদিস তৈরী করে তার বিশ্বাস্যতা প্রতিপাদোনোদ্দেশ্যে সর্বজন পরিচিতি সনদ পর্যন্ত তৈরী করে ফেলতেন। এর উদ্দেশ্য ছিলো তাদের কথাই সত্য, তার মধ্যে কোন অভিযোগ আনা যেতে পারেনা। একই সাথে তাদের নতুন আবিস্কারে লোকদেরকে চমকিত করাও তাদের উদ্দেশ্য ছিলো। [৫০]

বার . হাদিস বিকৃতির একটি বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে নারীদের উপর পুরুষের প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন। উদাহরণ হিসেবে বিবি আয়শার বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। একবার নবীপত্নি বিবি আয়শার উপস্থিতিতেই একদল লোক কুকুর, গাধা ও মহিলারা নামায নষ্টের কারণ উল্লেখ করলে বিবি আয়শা

[৫০]. মওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম ঃ হাদীস সংকলনের ইতিহাস, পূর্বোক্ত , পৃঃ ৫৬৬-৬১৪; মোহাম্মদ আকরম খাঁ ঃ মোস্তফা-চরিত (৪র্থ সং), ঝিনুক পুস্তিকা, ৩/১৩, লিয়াকত এভিন্যু, ঢাকা-১,১৯৭৫, পৃঃ ৭-১৩০, আবদুল মান্নান তালিব (সম্পাদিত) ঃ সহীহ আল বুখারী (১ম খন্ড), পৃঃ ছ, জ।

তার প্রতিবাদ করে বলেন, ''তোমরা আমাদেরকে কুকুরের সামিল করে দিয়েছো, আমি নবী (সঃ)কে দেখেছি তিনি সালাত আদায় করতেন আর আমি তাঁর ও কিবলার মাঝে চৌকির উপর শুয়ে থাকতাম'' (বুখারী)। এভাবে নারীদের উপর পুরষের প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপানোদ্দেশ্যে ও প্রচুর হাদিস বিকৃত করা হয়েছে।

এভাবেই যুগে যুগে হাদিস বিকৃত হয়েছে এবং হচ্ছে। আর সেজন্যই জনাব বুখারীকে এতটা সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়েছে। হাদিস বিকৃতির এই স্রোতধারা সেই যে শুরু হয়েছে তা কিন্তু কোন একটি যুগে বা সময়ে এসে থেমে যায়নি বরং অদ্যাবধি চলছে।

(৩) বিকৃতির হাত থেকে হাদিসকে বিশুদ্ধ করণ প্রক্রিয়া

এখন প্রশ্ন হলো, প্রচন্ড সতর্কতা পর্যাপ্ত যাচাই বাছাই এর মাধ্যমে জনাব বুখারী যে ছয় লক্ষ হাদিস থেকে শেষ পর্যন্ত **২৫১৩**টি মাত্র হাদিস গ্রহণ করেছেন, বাকীগুলো কোথায়? প্রচন্ড সতর্কতা সত্ত্বেও জনাব বুখারী কি হাদিসকে ১০০% নির্ভুল করতে সক্ষম হয়েছেন? জনাব বুখারী সহ অন্যান্য হাদিসবেত্তাগণ যেগুলো লিপিবদ্ধ করেননি সেগুলোর সবই কি বিকৃত? এবং বিকৃত হাদিস সনাক্তের মাধ্যমে সেগুলো ধ্বংসের কোন ব্যবস্থা কখনও হয়েছিলো কি? না, তার কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তাই এটি সত্য যে, সঠিক হাদিসের সাথে বিরাট সংখ্যক জাল ও বিকৃত হাদিসের সাগরে মুসলমান সমাজ হাবুডুবু খাচ্ছে। যদিও এই জাল ও বিকৃত হাদিস থেকে ইসলাম ধর্মকে রক্ষা করার জন্য এক সময়ে ঈমাম- মুহাদ্দেশগণ প্রচুর পরিশ্রম করেছিলেন এবং কিছু কার্যক্রম ও স্থির করেছেন। সেগুলো হ'ল -

এক. প্রচলিত হাদিসগুলোকে বিভিন্ন শ্রেণী ও স্তর ভুক্ত করা

সহীই হাদিসঃ যে হাদিস বর্ণনাকারীগণ সর্বোচ্চ চারিত্রিক গুণে গুণান্বিত, পর্যাপ্ত ধী-শক্তি সম্পন্ন এবং যে হাদিস সর্বাধিক ত্রুটিমুক্ত।

হাছান হাদিসঃ সহীই হাদিসের সকল গুণাবলীযুক্ত, তবে রাবির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য যেক্ষেত্রে কিঞ্চিৎ দুর্বল, সে সকল হাদিস।

গরীব হাদিসঃ যে সব হাদিসের একাধিক বর্ণনাকারী নেই।

যঈফ হাদিসঃ অপেক্ষাকৃত দুর্বল চরিত্রিক বৈশিষ্ট সম্পন্ন ও কম স্মরণশক্তি সম্পন্ন বর্ণনাকারীর বর্ণিত হাদিস।

মারুফ ও মুনকার হাদিসঃ একেবারে দুর্বল চরিত্রের বর্ণনাকারী কর্তৃক বর্ণিত হাদিস।

মাতরুক হাদিসঃ যে ব্যক্তি ব্যক্তিগত জীবনে কাজে কারবারে মিথ্যার আশ্রয় নেয়, এরূপ ব্যক্তির বর্ণিত হাদিস।

মওজু/জাল হাদিসঃ নবীজির (সঃ) বক্তব্য বলে ইচ্ছা করে, মিথ্যে রচনা করে বর্ণিত হাদিস। এরূপ তথাকথিত হাদিস সর্বোতোভাবে পরিত্যাজ্য।[৫১]

[৫১].মাওলানা নূর মোহাম্মদ আজ'মী (রঃ)ঃ মেশকাত শরীফ, (বঙ্গানুবাদও ব্যাখ্যাসহ, প্রথম জিলদ, অষ্টম মুদ্রণ), পূর্বোক্ত, পৃঃ ছ, জ।

দুই. উল্লেখিত বিভিন্ন স্তরের হাদিসের সংকলন যুক্ত গ্রন্থ সমূহকে বিভিন্ন স্তরে ভাগ করা হয়েছে

প্রথম স্তর ঃ সর্বোচ্চ যাচাই বাছাই ও সতর্কতা অবলম্বনের মাধ্যমে যে সব হাদিস গ্রন্থ সংকলিত হয়েছে। যেমন, বুখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ, মুত্তয়াত্তা ইমাম মালিক এই তিনখানি গ্রন্থ এই স্তরের বলে অনুমোদিত। এর মধ্যে আবার বুখারী শরীফের মর্যাদা সর্বোচ্চ।

দ্বিতীয় স্তর ঃ এগুলো প্রথম স্তরের কাছাকাছি। এতে সহীই এবং হাছান হাদিসের সমাবেশ ঘটেছে। যঈফ হাদিসও আছে, তবে নগণ্য। নাসাঈ শরীফ, দাউদ শরীফ, তিরমিজি শরীফ এই স্তরের।

তৃতীয় স্তর ঃ যে সব কিতাবে সহীই, হাছান, যঈফ, মারুফ, মুনকার ইত্যাদি সকল রকমের হাদিস স্থান লাভ করেছে। মুসনাদআবী ইয়েলো, মুসনাদ আবদুর রাযযাক, রায়হাকি, তাহাড়ী ও তাবরানী ইত্যাদি এই স্তরের।

চতুর্থ স্তর ঃ যে সব কিতাবে কেবল মাত্র যঈফ বা অগ্রহণ যোগ্য হাদিসের সমাবেশ ঘটেছে। ইবনে হিব্বানের কিতাবুল ফুআকা, ইবনুল আমীরের কামিল ও খাতিব বাগদাদি, আবু মুআযম ইত্যাদি কিতাব সমূহ এই স্তরের।

পঞ্চম স্তরঃ উপরের ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেনীর বাইরের সংকলন যুক্ত গ্রন্থ।[৫২]

তিন. যঈফ ও মাওজু তথা জাল হাদিস থেকে সঠিক হাদিসকে উদ্ধারের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ - হাদিস যাচাইয়ের রেওয়ায়েৎ ও দিরায়াৎ পদ্ধতি আবিস্কারের মাধ্যমে

রেওয়ায়েৎ পদ্ধতি

এই পদ্ধতিতে হাদিস বর্ণনাকারীর চরিত্র, ইসলামী জ্ঞান ও বিদ্যা সম্পর্কিত তার জ্ঞানের পরিধি, বোধশক্তি, প্রতিভা, স্মরণশক্তি, আকীদা, বিশ্বাস, চিন্তা - চেতনা, সত্যবাদিতা, সুখ্যাতি ইত্যাদি যাচাই করা হয়। আরও যাচাই করা হয় যে, সে কোথা থেকে, কার কাছ থেকে হাদিস সংগ্রহ করেছে। এই সব সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মরূপে, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করা হয়। এই বিষয়ে ইমাম শাফেয়ী (রঃ) বলেছেন, ‘‘সনদসূত্র ও তৎসংক্রান্ত জ্ঞান ব্যতীত যে লোক হাদিসের সন্ধান ও গ্রহণ করে সে ঠিক রাত্রির অন্ধকারে সেই কাষ্ঠ আহরণকারীর মত লোক, যে কাষ্ঠের বোঝা বহণ করিতেছে, অথচ তাহার মধ্যে বিষধর সর্প রহিয়াছে, উহা তাহাকে দংশন করে কিন্তু সে টেরই পায়না’’।[৫৩] এখানে বিষধর সর্প বলতে জাল ও মওজু হাদিসকেই বুঝানো হয়েছে, যা নীরবে নিঃশব্দে ইসলাম ধর্মকে দংশন করেই যাচ্ছে, যা এই ধর্মের ভার বহনকারী তথা অনুসারীরা টের পাচ্ছেন না।

দিরায়াৎ পদ্ধতি

দিরায়াৎ হলো রেওয়ায়েৎ পদ্ধতির আরও উন্নত সংস্কারণ। রেওয়াতে কেবলমাত্র হাদিস বর্ণনা কারীর চরিত্র, ও হাদিসের সুত্র যাচাই করা হয়, কিন্তু এর অন্তর্নিহিত বক্তব্য কমই যাচাই করা হয়েছে। ফলতঃ সনদ সূত্র যুক্ত করে হাদিস জাল হতে থাকে। তাই ইসলামিক চিন্তাবিদগণ হাদিসের অন্তর্নিহিত মূল বক্তব্যকে তীক্ষ্ম বুদ্ধি বিবেচনা ও যুক্তির কষ্ঠি পাথরে যাচাই করে এর সত্যাসত্য নিরূপণের সম্পূর্ণ এক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি আবিস্কার করেছেন, যাকে দিরায়াৎ পদ্ধতি বলা হয়। এই পদ্ধতি পবিত্র কুরআন পরিপন্থি নয়। কারণ পবিত্র

---

[৫২]. পূর্বোক্ত, পৃঃ ছ, জ।

[৫৩]. মওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম ঃ হাদীস সংকলনের ইতিহাস(পঞ্চম সংস্করণ),পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫৮৮।

কুরআনে আল্লাহপাক বলেন, ''হে ঈমানদারগণ! কোন ফসিক ব্যক্তি তোমাদের নিকট কোন খবর লইয়া আসিলে তোমরা উহার সত্যতা যাচাই করিয়া লও। অন্যথায় অজ্ঞতা বশত কোন জাতির উপর বিপদ টানিয়া আনিতে পার। ফলে তোমরা লজ্জিতও হইতে পার'' (সুরা হুজরাৎ, আঃ ৭)। দিরায়াতের ভিত্তিতে হাদিস যাচাই কাজে হযরত আয়শা অগ্রণী ভূমিকা রেখেছেন। তাঁর সম্মুখে একবার বলা হয়েছিলো, ''মৃত ব্যক্তির জন্য তার পরিবারের জীবিত সদস্যগণ কান্নাকাটি করিলে মৃত ব্যক্তির আযাব হয়''। এটি শুনে বিবি আয়শা বলেছিলেন যে, ''তা সত্য হতে পারেনা, কারণ কুরআন মজিদে সুস্পষ্ট ভাবে বলা আছে যে- কোন লোকই অপর কারো গুনাহের বোঝা বহন করবেনা।'' আবার তিনি যখন শুনতে পান যে, জনসাধারণের মধ্যে প্রচার হচ্ছে যে, মিরাজের রাত্রে নবী করিম (সঃ) আল্লাহ্র প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ লাভ করেছেন। তাতে প্রতিবাদ করে বিবি আয়শা বলেন, ''এই হাদিসের বর্ণনাকারী সুস্পষ্ট মিথ্যাবাদী, কেননা কুরআনে আছে- কোন সৃষ্টি আল্লাহকে আয়ত্ব করতে পারেনা। তিনিই সমস্ত সৃষ্টিকে আয়ত্ব করে থাকেন''।[৫৪] যদিও হাদিস যাচাইয়ের দিরায়াৎ পদ্ধতি তখনো উদ্ভব হয়নি, তবুও বিবি আয়শা যে পবিত্র কুরআনের আলোকে যুক্তি প্রয়োগ করেছেন তা-ই পরবর্তী কালের দিরায়াৎ পদ্ধতির উদ্ভাবকদের পথ প্রদর্শক হয়েছে। হাদিস যাচাইয়ের সর্বাধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হলো এই **দিরায়াৎ**। এই পদ্ধতিতে হাদিস যাচাইয়ের কালে কোন্ কোন্ বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা জরুরী তা এই বিষয়ক ঈমামগণ নির্ধারণ করে দিয়েছেন। সেগুলো হ'ল-

- উক্ত বক্তব্যে পবিত্র কুরআনের সুস্পষ্ট নির্দেশের বিপরীত বক্তব্য রয়েছে কিনা?
- নির্ভুল হাদিসের বিপরীত বক্তব্য রয়েছে কিনা?
- ইসলামের মৌলিক আদর্শের/নীতির বিপরীত বক্তব্য রয়েছে কিনা?
- প্রত্যক্ষ সত্য (ফ্যাক্ট) এর বিপরীত কোন বক্তব্য রয়েছে কিনা?
- সামান্য ভালো কাজের জন্য বড় পুরস্কার এবং সামান্য ক্রটির জন্য কঠোর দন্ড বর্ণিত হয়েছে কিনা?
- বক্তব্যে জঘন্য ভাবের তথা অশ্লীলতার সমাবেশ ঘটেছে কিনা?
- অসাধু ভাষা, অনর্থক বাজে কথার সমাবেশ ঘটেছে কিনা?
- পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন সুরার বিপরীতে বিশেষ ফজিলত বর্ণিত হয়েছে কিনা?
- জ্ঞান বিরুদ্ধ বক্তব্য প্রকাশ পেয়েছে কিনা?
- যুক্তি, সুক্ষসমালোচনা ও অভ্যন্তরীন সাক্ষ্য প্রমানাদির দ্বারা তা ভিত্তিহীন প্রতীয়মান হচ্ছে কিনা?
- এই প্রক্রিয়ায় হাদিসের সনদে এবং মূল বক্তব্যে যদি এমন কোন অকাট্য প্রমাণ বা যুক্তি থাকে যাতে হাদিসটির অবিশ্বাস্যতা নিঃসন্দেহে প্রতীয়মান হয়, সে ক্ষেত্রে রেওয়ায়েৎ পদ্ধতির ছহী সনদের হাদিসও অগ্রাহ্য হবে।[৫৫]

উপরের শর্তাবলী থেকে এটি স্পষ্ট যে দিরায়াৎ হলো যুক্তির কষ্টি পাথরে হাদিস বিশুদ্ধ করণের একটি চমৎকার, যুক্তিসঙ্গত, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। যার উদ্ভাবনের কারণে মুসলিম সমাজকে জাল হাদিসের বেড়াজাল থেকে রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে। এই প্রসঙ্গে নওয়াব সিদ্দিক হাসান বলেন, ''হাদিস জাল করণ সম্পর্কিত ইলম এখন এক প্রকার বিজ্ঞান, যাহা দ্বারা কোন্ হাদিসটি জাল এবং কোন্টি প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত তাহা

[৫৪]. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬০৯।

[৫৫]. মওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীমঃ হাদীস সংকলনের ইতিহাস, পূর্বোক্ত , পৃঃ ৫৬৬-৫৯৬ এবং মোহাম্মদ আকরম খাঁ ঃ মোস্তফা-চরিত,(চতুর্থ সং),পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৯-১১৫।

Dhaka University Institutional Repository

জানিতে ও চিনিতে পারা যায়। এবং উহা দ্বারা জালকারীর অবস্থাও জানা যায় যে, সে উহা সত্য বলিয়াছে না মিথ্যা। এই বিশেষ জ্ঞানের উদ্দেশ্য হইতেছে সত্য ও মিথ্যা হাদিস এবং সত্য বর্ণনাকারী ও মিথ্যা বর্ণনাকারীর মধ্যস্থিত পার্থক্য বুঝিবার প্রতিভা ও যোগ্যতা অর্জন। এই জ্ঞানের লক্ষ্য ও ফায়দা এই যে, ইহার সাহায্যে এই ধরনের মিথ্যা ও জাল হাদিস হইতে আত্মরক্ষা করা সম্ভব হয়। অথবা হাদিসটি বর্ণনা করার সঙ্গে সঙ্গে উহা যে জাল তাহাও বলিয়া দেওয়া সম্ভব হয়। হাদিসের ক্ষেত্রে ইহা অত্যন্ত জরুরী ও প্রয়োজনীয় জ্ঞান। কেননা নবী করিম (সঃ) বলিয়াছেন," যে ব্যক্তি আমার প্রতি কোন মিথ্যা আরোপ করে, যেন জাহান্নামে তাহার আশ্রয় বানাইয়া লয়''।[৫৬]

হাদিসকে জাল ও মিথ্যার হাত থেকে মুক্ত করার জন্য সাহাবাদের থেকে শুরু করে বহু ইমাম, মোহাদ্দেসগণ আত্মনিয়োগ করেছেন। মওলানা মুহম্মদ আবদুর রহিম তাঁর হাদিস সংকলনের ইতিহাস গ্রন্থে এরূপ ৬০ জন ইমামের নামোল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে সাহাবীদের পর্যায়ে হযরত আবদুলাহ ইবনে আব্বাস, উবাদা ইবনে সামিত, আনাস ইবনে মালিক, তাবেয়ীদের পর্যায়ে ইবনে সিরীন, আমের শা'বী এবং সায়ীদ ইবনে মুসাইয়েব, পরবর্তীতে ঈমাম আবু হানিফা, সুফিয়ান আস সওরী, হাম্মাদ ইবনে সালমা, ইয়াহইয়া ইবনে সায়ীদুল কাতাব, আবদুর রহমান ইবনে মাহদী, আহমদ ইবনে হাম্বল, ইয়াহইয়া ইবনে মুয়ীন, মুহম্মদ ইবনে সায়াদ, আহমদ ইবনে সালেহ, ইমাম দারেমী, ইমাম বুখারী, আবু হাতেম, ইমাম মুসলিম, আবু দাউদ সিজিস্তানী, আবদুর রহমান ইবনে ইউসুফ আল বাগদাদী, সালেহতাজেরা, আবদুলাহ ইবনে আহমদ প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। মাওলানা আবদুর রহিম এরূপ কয়েকখানি গ্রন্থেরও নামোল্লেখ করেছেন। যেমন পনের খন্ডের বিরাটায়তনের গ্রন্থ রচনা করেছেন তাবকাত ইবনে সায়াদ। ইমাম সুয়ূতী যার সংক্ষিপ্তসার রচনা করেছেন। ইমাম বুখারী রচনা করেছেন তারিখে কবির, তারিখে সগীর, তারিখে আওসাত। ইমাম ইবনে কাসীর রচিত কিতাবুল তাকমীল ইত্যাদি।[৫৭]

এখন যদি বলা হয় যে, হাদিস বেত্তাগণ, মুহাদ্দেসগণ, বিশ্বস্ত ইমামগণ অনেক আগেই এসব ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে রেখে গেছেন, বর্তমানে আমাদের দায়িত্ব হলো শুধু বয়ান করে যাওয়া, তা কিন্তু সঠিক ও যথার্থ নয়। কারণ ইসলামের শত্রু সর্বকালে সর্বযুগেই বিদ্যমান ছিল ও আছে। আর হাদিস বিকৃতির ধারা এবং সনাক্তকৃত জাল হাদিসগুলোও এখনো বিদ্যমান। সনাক্তকৃত জাল হাদিসগুলো ধ্বংস করা হয়নি, কেবল বিভিন্ন শ্রেনী বিভাজন হয়েছে মাত্র। সেজন্যে হাদিসের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও সনাক্তের প্রক্রিয়া সর্ব যুগে সর্বাবস্থায় মুসলমানদের মধ্যে সমান ক্রিয়াশীল থাকতে হবে। এ ক্ষেত্রে মহান আল্লাহ্‌র সেই নির্দেশের প্রতি মুসলমানদের সজাগ থাকা বাঞ্ছনীয় যে, ''হে ঈমানদারগণ! কোন ফাসিক ব্যক্তি তোমাদের নিকট কোন খবর লইয়া আসিলে তোমরা উহার সত্যতা যাচাই করিয়া লও'' (সুরা হুজরাতঃ আঃ ৭)। এই নির্দেশ তো কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা বিশেষ যুগের জন্য নয়। ইসলাম ধর্মের মূল দর্শন বা মৌলিক আদর্শকে সর্বকালের সর্বযুগের জন্য জিইয়ে রাখতে হলে এই নির্দেশও সর্বকালের সর্বযুগের মুসলমানদেরকে পালন করতে হবে। নতুবা এটি বিচিত্র নয় যে ইসলাম ধর্ম ও অন্যান্য ধর্মের ন্যায় বিকৃতির করাল গ্রাসে নিমজ্জিত হবে।

বর্তমানে নারীদের ঘিরে হাদিসের নামে প্রচলিত কিছু বক্তব্য তুলে ধরে যুক্তির কষ্ঠিপাথরে হাদিস যাচাইয়ের দিরায়াৎ পদ্ধতির শর্তাদি প্রয়োগ পূর্বক উক্ত হাদিস সমূহের গ্রহণযোগ্যতা যাচাই করে দেখা যেতে পারে। কারণ দিরায়াৎ এমন একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি যার মাধ্যমে উৎকৃষ্ট হাদিস গ্রন্থের হাদিসও পরীক্ষিত হওয়া

---

[৫৬]. মওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম ঃ হাদীস সংকলনের ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫৭৬-৫৭৭।

[৫৭]. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫৯৩-৫৯৫।

সম্ভব। ইতিমধ্যে বুখারী শরীফের হাদিসও পরীক্ষিত হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ''নবীজি(সঃ) কর্তৃক বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারীদের- যাহা ইচ্ছা করিয়া যাও, তোমাদের জন্য বেহেস্ত নিশ্চিত''- এরূপ অনুমতি সংক্রান্ত বুখারী শরীফের একটি হাদিস সম্পর্কে মোহাম্মদ আকরাম খাঁ বলেন, ''এই বক্তব্য ইসলামের মৌলিক শিক্ষার বিপরীত। কারণ পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্‌পাক পাপ করলে স্বয়ং নবী (সঃ)কেও কঠোর সাজা ভোগ করতে হবে মর্মে সতর্ক করেছেন''।[৫৮] তিনি এই ধরনের আরও কয়েকটি হাদিস পর্যালোচনা করে সেগুলো রাবির বর্ণনা বা স্মৃতিবিভ্রম হতে পারে মর্মে অনুমান করেছেন।[৫৯] প্রশ্ন হতে পারে হাদিসের সর্বোৎকৃষ্ট গ্রন্থ বুখারী শরীফে এ ধরনের অগ্রহণযোগ্য হাদিস স্থান পেলো কিভাবে?

এ ক্ষেত্রে কিছু কারণ অনুমান করা যেতে পারে মাত্র। তা হলো- হাদিস ইসলামী আইনের গুরুত্বপুর্ণ ভিত্তি হবার কারণে যেভাবে সুকৌশলে ইসলামের শত্রুগণ কর্তৃক মহানবীর(সঃ) বক্তব্যই বিকৃত হয়েছে সেই একই ভাবে বুখারী শরীফ উৎকৃষ্ট হাদিস গ্রন্থ হিসেবে সর্বজন স্বীকৃত বিধায় এখানেও পরবর্তী কালে সুকৌশলে ইসলামের মৌলিক আদর্শ বিরোধী কিছু বক্তব্য অনুপ্রবেশ করিয়ে দেওয়া অসম্ভব কিছু নয়। কারণ বুখারী হাদিস লিপিবদ্ধ হওয়ার পর ইতোমধ্যে বহু সময় অতিবাহিত হয়েছে এবং এটি বহু ভাষায় অনুদিতও হয়েছে।

৪. হাদিস বিশুদ্ধকরণ প্রক্রিয়ায় কতিপয় জাল হাদিস সনাক্ত করণ

এবার নারীদের ঘিরে হাদিস হিসেবে বাংলাদেশে বহুল প্রচলিত কিছু বক্তব্য পর্যালোচনা করা হলো - যে বক্তব্যগুলো হাদিসের নামে সমাজে প্রচলিত তো বটেই একই সাথে তসলিমা নাসরিন এবং প্রখ্যাত লেখক হুমাউন আজাদও ইসলাম ধর্মের সমালোচনা করতে গিয়ে যথাক্রমে তাঁদের রচিত ' নির্বাচিত কলাম' এবং 'নারী ' গ্রন্থে ব্যবহার করেছেন। যে গুলোর ভিত্তিতে তাঁরা ইসলাম ধর্মকে তুচ্ছ করে সমালোচনাও করেছেন। সেগুলো বর্তমানে রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহার করা বর্তমান গবেষণার জন্য সহজ হয়েছে। আলোচনায় দেখানো হয়েছে যে, মূলতঃ তাদের উল্লেখিত বক্তব্যের অধিকাংশ গুলোকেই যদি হাদিস বলা হয় তবে বিরাট এবং বিশাল একটি ধর্ম তথা ইসলাম ধর্ম, অচিরেই সংকীর্ণতায় আবদ্ধ হয়ে হয়ে অন্য ধর্মের মত নিশ্চিহ্ন হতে থাকবে।

বর্তমানে তসলিমা নাসরিন এর নির্বাচিত কলাম গ্রন্থে হাদিস হিসেবে উল্লেখিত পঁচিশটি বক্তব্যকে[৬০] দু'ভাগে ভাগ করে নিম্নোক্ত ভাবে উপস্থাপন করা হ'ল-

এক. রেফারেন্স বা তথ্য সূত্র যুক্ত;

দুই. রেফারেন্স বা তথ্য সূত্র বিহীন;

প্রথমতঃ রেফারেন্স যুক্ত হাদিসের নামে বক্তব্য, পূর্বে বর্ণিত দিরায়াৎ -পদ্ধতির মাধ্যমে তৎসংশ্লিষ্ট মৌলিক হাদিস এবং পবিত্র কুরআনের স্পষ্ট আয়াতের আলোকে পরীক্ষা করে দেখানো হলো যে, মূলতঃ তাঁদের ব্যবহৃত বক্তব্য সমূহ যথার্থই হাদিস নয়, হতে পারেনা ।

---

[৫৮]. মোহাম্মদ আকরম খাঁ ঃ মোস্তফা-চরিত, (চতুর্থ সং), পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ৪৮।

[৫৯]. বিস্তারিত জানার জন্য মোস্তফা-চরিত, পূর্বোক্ত।

[৬০]. তসলিমা নাসরিনঃ নির্বাচিত কলাম, পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ১৫-১৩৮।

এক. দুনিয়ার সব কিছু ভোগের সামগ্রী, আর দুনিয়ার সর্বোত্তম সামগ্রী হচ্ছে মেয়ে মানুষ (মুসলিম শরীফ)।[৬১]

হাদিসটির মূল বক্তব্য হলো, ''ইন্নাদ্দুনিয়া কুল্লাহু মাতাউন ওয়া খাইর মাতা ইদ্দুনিয়া আল মায়াতুন সালেহাতুন''- অর্থাৎ ''দুনিয়ার সবকিছু সম্পদ এবং দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ সম্পদ ধর্মপ্রাণ স্ত্রী''। এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আবু ফয়সল বলেন, ''এই হাদিসে কেবল নারীকে নয়, পুরুষ সহ সব কিছুকে সম্পদ বলা হয়েছে। অনেকটা আধুনিক অর্থনীতির মত। যেখানে মানুষকে মানব সম্পদ বলা হয়। এই হাদিসে সব কিছুকে সম্পদ বললেও শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলা হয়নি। এমনকি সকল নারীকেও শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলা হয়নি। কেবল চরিত্রবান ও সৎ স্বভাবের নারীকেই সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ বলা হয়েছে। সৎ নারীকে সম্মান দেখানোই ছিলো রাসুলের (সঃ) উদ্দেশ্য''।[৬২] পক্ষান্তরে তসলিমা নাসরিন হাদিসটির যে অনুবাদ গ্রহণ করেছেন তা যথার্থ নয়, কারণ তাতে সম্পদের স্থলে সামগ্রী এবং ভোগের সামগ্রী আর ধর্মপ্রাণ নারীর স্থলে মেয়ে মানুষ এরূপ শব্দ বসিয়ে মুল হাদিসকে বিকৃত করা হয়েছে। মূলতঃ হাদিসটি যথাযথ অর্থ প্রয়োগে তথা ''দুনিয়ার সবকিছু সম্পদ এবং দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ সম্পদ ধর্মপ্রাণ স্ত্রী'' সমালোচনার কোন সুযোগই নেই। তা যথার্থই।

দুই. যদি কোন ব্যক্তি সঙ্গম করার ইচ্ছায় স্ত্রীকে আহ্বান করে তবে সে যেনো তৎক্ষণাৎ তার নিকট উপস্থিত হয়, যদিও সে উনানে রন্ধন কাজে লিপ্ত থাকে (মুসলিম ও তিরমিজি)।[৬৩]

এই বক্তব্য নবীজির (সঃ) অন্য বক্তব্যের সাথে সংগতিপূর্ণ নয়। নবীজি (সঃ) অন্যত্র বলেছেন, ''অতিরিক্ত গরমের দিনে, ভরা পেটে, ঘর্মাক্ত কলেবরে এবং গোসলের পরক্ষণে সঙ্গম করবেনা। কারণ এতে সন্তান মূর্খ ও বোকা হতে পারে'' (বুখারী)। নবীজি(সঃ) এরূপ বক্তব্য বলে থাকলে উপরে উল্লেখিত বক্তব্য তাঁর পক্ষে বলা স্বাভাবিক নয়। কারণ রন্ধন কাজে লিপ্ত অবস্থায় ঘর্মাক্ত ও পরিশ্রান্ত থাকা অত্যন্ত স্বাভাবিক। এছাড়াও উপরের বক্তব্যে স্বামী কর্তৃক স্ত্রীর প্রতি অন্যায় আচরণের একটা প্রচ্ছন্ন আভাস রয়েছে, যা নবীজির পক্ষে বলা স্বাভাবিক নয়। নবীজি(সঃ) স্ত্রীদের সম্মান করতেন, তাঁদের ব্যক্তিত্বের মর্যাদা দিতেন (বুখারী হাদিস)। এরূপ অবস্থায় স্ত্রীদের অনেকাংশেই তুচ্ছকর এবং অমর্যাদাকর একটি বক্তব্য মহানবীর(দঃ) পক্ষে বলা স্বাভাবিক নয়। যা ইসলাম শান্তির ধর্ম - এই মৌলিক আদর্শের বিরোধীও বটে।

তিন. যদি কোন ব্যক্তি নিজের স্ত্রীকে শয্যায় আহ্বান করে, তাতে সে অস্বীকার করার জন্য যদি স্বামী রাগান্বিত অবস্থায় রাত কাটায় তবে প্রভাত না হওয়া পর্যন্ত ফেরেস্তাগণ সেই স্ত্রীলোকের প্রতি অভিসম্পাত করে (মুসলিম/তিরমিজি)।[৬৪]

এ বক্তব্যে দিরায়াৎ পদ্ধতিতে উল্লেখিত লঘু পাপে গুরুদন্ড বর্ণিত হয়েছে। কারণ স্বামীর আহ্বান অযৌক্তিক হতে পারে, ঘরে বড় বড় সন্তান এবং অতিথি থাকা সম্ভব, কিংবা স্ত্রীর শারীরিক অসুস্থতাও থাকতে পারে। এছাড়া ছোটখাট পারিবারিক কোন্দল, মান অভিমান, যা হয়ত অচিরেই মীমাংসা হচ্ছে এসব অবস্থায় স্ত্রীর পৃথক শয্যায় অবস্থান কোন অবস্থাতেই সারা রাত ভরে ফেরেস্তাগণ কর্তৃক অভিশাপ বর্ষিত হওয়ার জন্য যথেষ্ট বড় পাপ নয়। এই বক্তব্যে স্ত্রীর রাগ-দুঃখ-অভিমানকে তুচ্ছ করা হয়েছে, স্বামীর রাগকে দেবতার রোষে পরিণত করা হয়েছে - যা মোটেও ইসলামিক নয়। এই ক্ষেত্রে স্ত্রীকে অবহেলা করে স্বামী পৃথক শয্যায়

[৬১]. পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ১৫।

[৬২].আবু ফয়সল ও আহমদ মনসুর ঃ তসলিমা নাসরিনের ইসলাম বিদ্বেষ ও অপব্যাখ্যা (নাসরিন এই একাডেমিক ডিজঅনেষ্টি প্রায় সবখানেই করেছেন- নামীয় প্রবন্ধ), পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৩।

[৬৩]. তসলিমা নাসরিনঃ নির্বাচিত কলাম, পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ৩, ১৩৭।

[৬৪]. পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ৩০, ১৩৭।

কিংবা অন্যত্র রাত কাটালে কি হবে সে বিষয়টি অনুপস্থিত। ফলে এই বক্তব্য নিরপেক্ষও নয়। এরূপ অনিরপেক্ষ, অন্যায্য বক্তব্য মহানবীর (সঃ) পক্ষে বলা সম্ভব নয়, তাই এটি হাদিস হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়।

চার. যে স্ত্রী লজ্জাহীনতার কাজ করে তাকে আপন বিছানা থেকে পৃথক করে দাও এবং এরূপ স্ত্রীকে সাধারণ ভাবে কিছু মারপিট কর (তিরমিজি)।[৬৫]

এই ক্ষেত্রে 'মারপিট কর' এই অংশ ব্যতীত বাকি বক্তব্যে সন্দেহ পোষণের কোন কারণ নেই। কারণ বক্তব্যটি বহুলাংশেই পবিত্র কুরআনের সুরা নেসার ৩৪নং আয়াতের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। সুরা নেসার ৩৪নং আয়াতের মারপিট কর শব্দটি নিয়ে ইতোমধ্যে ইসলামী চিন্তাবিদগণের মধ্যে যে দ্বিমতের সৃষ্টি হয়েছে তা উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় পূর্বে বিস্তারিত বলা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে, আরবী 'ওয়াজরাবুহুন্না' শব্দটি যার উৎপত্তি জারাবা শব্দ থেকে, এর একাধিক অর্থ রয়েছে। তন্মধ্যে বিচার ফয়সলার ক্ষেত্রে এটি বাধা দেওয়া কিংবা আটক করা অর্থে প্রযোজ্য।

সুরা নেসার ৩৪নং আয়াতটি বিচার-ফয়সলা বোধক সত্বেও এই ক্ষেত্রে বাধা দেওয়া কিংবা আটক করা অর্থ গ্রহণ না করে অত্যন্ত সাধারণ একটি অর্থ 'মারপিট' গ্রহণ করে, ইসলামের মৌলিক আদর্শের ব্যত্যয় ঘটিয়ে এই ক্ষেত্রে যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা হয়েছে, তাতে বড় বড় ইসলামিক চিন্তাবিদগণ এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রদান করতে গিয়ে কিরূপ বেকায়দায় পড়েছেন এবং মেছওয়াক দিয়ে মারার কথা বলে বিষয়টিকে কি ভাবে হাস্যকর করে তুলেছেন তাও পূর্বে বিস্তারিত বলা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে প্রফেসর রফিউল্যাহ শিহাবের প্রদত্ত ব্যাখ্যাই যথার্থ বলে প্রতীয়মান হয়েছে। তিনি আয়াতটি মূলতঃ বিচার ফয়সলা বোধক বিবেচনায় এই ক্ষেত্রে 'জারাবা' শব্দের বাধা দেওয়া কিংবা আটক করা অর্থই গ্রহণের পক্ষপাতি।

এই হিসাবে সুরা নেসার ৩৪ নং আয়াতটির অর্থ দাঁড়ায়- ''স্ত্রীদের মধ্যে যাদের পক্ষ থেকে অবাধ্যতার, অশ্লীলতার আশংকা কর, তাহাদিগকে সদুপদেশ দাও, তারপর শয্যা বর্জন কর এবং তাহাদিগকে বাহিরে গমনে বাধা দাও কিংবা আটক কর''। এই আটক বিচার ফয়সলাকারী কর্তৃক হাজতে আটক হতে পারে কিংবা আত্মীয়-স্বজন কর্তৃক গৃহেও আটক হতে পারে। অর্থাৎ আয়াতটি বিচার ফয়সলা বোধক বিধায় এখানে মারপিটের পরিবর্তে বাধা দেওয়া বা আটক করা অর্থে গ্রহণ পূর্বক হাদিসটির ক্ষেত্রে দ্বিমত পোষণের কোন সুযোগ নেই। কারণ ব্যভিচারিত্বে লিপ্ত নারীর সাথে একই বিছানায় অবস্থান কতখানি বিপজ্জনক তা স্বাভাবিক বুদ্ধি সম্পন্ন যে কোন মানুষের পক্ষে বোঝা সহজ।

পাঁচ . স্ত্রীলোক গোপনীয় বস্তু, যখন সে পর্দার বাহির হয়, শয়তান তাহাকে পুরুষের চক্ষে মনোমুগ্ধকর করিয়া দেখায় (তিরমিজি)।[৬৬]

এই বক্তব্য বাস্তব সত্য বিরোধী এবং নবীজির (সঃ) নারী বিষয়ক অন্যান্য কথা ও কাজের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণও নয়। কারণ স্ত্রী লোকেরাও মানুষ, তারা স্বর্নালংকার কিংবা টাকা পয়সা নয় যে সিন্দুকে আটক থাকবে। তাই স্ত্রীলোককে গোপনীয় বস্তু আখ্যায়িত করা বাস্তব সম্মত হয়নি। নবীজির (সঃ) আমলে মেয়েরা ঘরের ভিতরে গোপনীয় বস্তু হিসেবে আটক ছিলোনা। নবীজি(সঃ) নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকলকে মিলিত ভাবে দীক্ষা দিতেন, একত্রে মসজিদে নামাজ পড়াতেন, ঈদগাহে সমাবেশ করেছেন, হজ্বে গিয়েছেন এবং যুদ্ধেও গিয়েছেন- এই রকম বহু হাদিস বুখারী শরীফে আছে। ইতিহাসও তার সাক্ষ্য দেয়। নবীজি(সঃ) এই কথাও

[৬৫]. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৩৭।

[৬৬]. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৩৪।

বলেছেন যে- ''আল্লাহতায়া'লা তোমাদের (নারীদের) প্রয়োজনে বাইরে যাবার অনুমতি দিয়েছেন'' (বুখারী)। পবিত্র কুরআনও নারীকে গোপনীয় বস্তু হিসেবে সাব্যস্ত করেনি। নারীরাও তাদের প্রয়োজনে বাইরে থাকবে জন্যইতো আল্লাহপাক পুরুষদেরকে সুরা নুরের ৩০নং আয়াতে নিজ নিজ চক্ষুকে সংযত রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। পক্ষান্তরে পুরুষেরা নিজেদের চক্ষুকে সংযত রাখার কঠিন দায়িত্বকে উপেক্ষা করে নারীদেরকে গোপনীয় বস্তু আখ্যায়িত করে গৃহবন্দি রাখার যে বিকল্প পথ উদ্ভাবন করেছেন তা যে নবীজীর (সঃ) পরবর্তী কালের উদ্ভাবন তা সহজেই অনুমান করা যায়।

ছয়. <u>যদি আমি কাহাকেও সেজদা করিতে হুকুম করিতাম, তবে নিশ্চয়ই সকল নারীকে হুকুম করিতাম, তাহারা যেনো তাহাদের স্বামীকে সেজদা করে। যেহেতু আল্লাহতায়ালা স্ত্রীলোকদের উপর স্বামীর হক নির্ধারিত করিয়াছেন (আবু দাউদ)।</u>[৬৭]

সেজদা একান্তই আল্লাহ্‌র হক। পবিত্র কুরআনে এরূপ অভিব্যক্তি বহুবার ব্যক্ত হয়েছে। তাই এই সেজদার সম্ভাব্যতাও দুনিয়ার কারো ক্ষেত্রে চিন্তা করা স্রেফ শরীকি চিন্তা ছাড়া আর কিছুই হতে পারেনা। মহান আল্লাহ্‌ পরে তো দুনিয়াতে নবীদের স্থান। সেই নবীদের ক্ষেত্রে সেজদার সম্ভাব্যতা ব্যক্ত না হয়ে ঢালাও ভাবে স্বামীদের তথা মহানবীর (সঃ) পুরুষ উম্মতদের ক্ষেত্রে ব্যক্ত হওয়া কিভাবে সম্ভব? যেখানে স্বামীদের মধ্যে কোনকোন স্বামীরা (পুরুষ) লম্পট, চরিত্রহীন, মদখোর, জুয়াড়ি, ঘুষখোর, চোর, ডাকাত ইত্যাদি আছেন। এছাড়া মহান আল্লাহ্‌ তো কেবলমাত্র স্ত্রীলোকদের উপর স্বামীর হক নির্ধারণ করেননি, স্বামীদের উপরও স্ত্রীদের হক নির্ধারণ করেছেন। মহান আল্লাহ্‌ পাকের নির্দেশ হলো, ''নারীর উপর পুরুষের যেরূপ অধিকার আছে, পুরুষের উপরও নারীর সেরূপ অধিকার আছে'' (সুরা বাকারা আঃ ২২৮)। বিদায় হজ্বে ও মহানবী (সঃ) একই বিষয়ে সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, ''জানিও তোমাদের সহধর্মিণীগণের উপর তোমাদের যেমন দাবীদাওয়া ও স্বত্বাধিকার আছে তোমাদের উপরও তাহাদিগের সেইরূপ দাবীদাওয়া ও স্বত্বাধিকার আছে'' (মুসলিম/আবু দাউদ)। পবিত্র কুরআনে আরো বলা হয়েছে যে, ''তোমরা পরস্পরের অংশ'' (সুরানেছা, আঃ ২৫)। ''মমিন পুরুষ মমিন নারী পরস্পর বন্ধু''(সুরা তওবা, আঃ ৭১)।

এভাবে পবিত্র কুরআন ও বিশুদ্ধ হাদিস যেখানে নারী পুরুষের সমতাকেই ইসলামের মৌলিক আদর্শ হিসেবে নির্দেশ দেয় সেখানে স্বামীদেরকে (পুরুষ) সেজদার মালিক আল্লাহ্‌র সমতুল্য করার বক্তব্য নবীজির (সঃ) বক্তব্য হিসেবে কি ভাবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে?

সাত. <u>যদি স্বামী স্ত্রীকে আদেশ করে, তবে সে জরদ পর্বত হইতে কালো পর্বতের দিকে এবং কালো পর্বত হইতে সাদা পর্বতের দিকে ধাবিত হউক, তথাপি সেই আদেশ প্রতিপালন করা তাহার কর্তব্য (আহমদ)।</u>[৬৮]

এটি অন্যায়, অবিচার, অত্যাচার ও নির্যাতনের কথা। স্বামী কতৃক স্ত্রীকে পর্বত থেকে পর্বতান্তরে ধাবিত করণের দৃশ্য তো জাহেলিয়া যুগের অত্যাচারকেও হার মানাবে। অথচ ইসলাম শান্তির ধর্ম। নবীজি(সঃ) সেই শান্তির ধর্ম প্রচার করেছেন। শুধু প্রচারই নয়, প্রতিষ্ঠা করেছেন। তিনি বলেছেন, ''তোমরা নারীদের সাথে সদ্ব্যবহার কর।'' বুখারী শরীফে এরূপ বহু হাদিস রয়েছে। শুধু বক্তব্যেই নয়, নবীজি(সঃ) সমাজ থেকে নারী নির্যাতনের মূলোৎপাটন করেছেন। ব্যক্তিগত জীবনে নিজ স্ত্রীদের সাথে কখনও কোন কটু কথা বলেছেন মর্মেও প্রমাণ নেই। এমতাবস্থায় নবীজির(সঃ) বক্তব্য হিসেবে অনুরূপ বক্তব্য শুধু মিথ্যাচারই নয়, জঘন্য।

---

[৬৭]. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭০, ১৩৮।

[৬৮]. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭১, ১৩৮।

আট. স্বামী তাহার স্ত্রীকে চারটি কারণে প্রহার করতে পারে। (ক) স্ত্রীকে সাজসজ্জা করিয়া তাহার নিকট আসিতে বলার পর স্ত্রী তাহা অমান্য করিলে, (খ) সঙ্গমের উদ্দেশ্যে স্বামীর আহ্বান অমান্য করিলে, (গ) স্বামীর বিনা অনুমতিতে কাহারও বাড়িতে বেড়াইতে গেলে (তিরমিজি)।[৬৯]

স্ত্রীকে প্রহার ইসলাম সম্মত নয়। স্বয়ং নবীজি (সঃ) ব্যক্তি জীবনে কখনও তা করেননি। তিনি স্ত্রীদের প্রহার নিষিদ্ধ করেছেন। তিনি স্বয়ং স্ত্রীদের আত্মসম্মানের মর্যাদা দিয়েছেন (বুখারী)। এ ছাড়া উপরের বক্তব্যে লঘু পাপে গুরু দন্ড আরোপের বিধান বর্ণিত হয়েছে। যা ইসলাম শান্তির ধর্ম এই মৌলিক আদর্শের বিরোধী। এমতাবস্থায় এরূপ বক্তব্য মহানবীর বক্তব্য হিসেবে গ্রহণযোগ্য হতে পারেনা।

নয়. নারী শয়তানের আকৃতি ধরে নিকটে আসে এবং শয়তানের আকৃতিতে ফিরে যায়। যখন তোমরা কেউ নারী দেখে সুখানুভব কর, তোমাদের অন্তরে পতিত হয়, তখন সে যেন তার স্ত্রীর দিকে মন আকৃষ্ট করে নেয়, এবং তার সঙ্গে সঙ্গম করে। কেননা তার অন্তরে যা আছে তা সঙ্গমের দ্বারা বিদূরিত হয়ে যাবে (বুখারী)।[৭০]

এটি বুখারী হাদিস সত্বেও এখানে ফ্যাক্ট এর বিরুদ্ধ বক্তব্য সন্নিবেশিত হয়েছে। শয়তানের আকৃতি কিরূপ তা কখনই কোন নারী দেখেনি বা দেখা সম্ভবও নয় এবং নারীর পক্ষে শয়তানের আকৃতি ধারণও সম্ভব নয়। কারণ কোন কিছুর আকৃতি ধারণের ক্ষমতা সৃষ্টিকর্তা নারীদেরকে দেননি। বরং শয়তান তথা ইবলিসেরই বিভিন্ন আকৃতি ধারণের ক্ষমতা রয়েছে। সেক্ষেত্রে শয়তানই নারীর আকৃতি ধরে পুরুষের নিকট আসা যাওয়া করতে পারে, নারী নয়। এবং কোন পুরুষের মনের অবৈধ ভোগাকাংক্ষা স্ত্রী মিলনের মাধ্যমে দূরীভুত হওয়াও বাস্তব সম্মত নয়।

সেইজন্য তাকে আল্লাহ্‌র ভীতি মনে জাগ্রত করতে হবে। যেই নির্দেশ সুরা নুরের ৩০ নং আয়াতে দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ চক্ষু সংযত রাখার নির্দেশ, তা স্মরণ করতে হবে। আল্লাহ্‌র এবাদত করতে হবে। নিজ অসওয়াসাকে কলুষতা মুক্ত করতে হবে। তথাপিও আমরা হাদিসটি একেবারে বাতিল না করে নিম্নোক্ত ভাবে গ্রহণ করতে পারি। তাহলো- ''শয়তান নারীর আকৃতিতে পুরুষের নিকট আসাযাওয়া করে, এরূপ অবস্থায় তাকে "আল্লাাহর ভীতি মনে আনয়ন করতে হবে এবং নিজ স্ত্রীর প্রতি মন আকৃষ্ট করতে হবে''। হাদিসটির প্রথম ও শেষাংশে রাবী পরস্পরায় শ্রুতিবিভ্রমের কারণে নতুন বক্তব্য সংযোজিত হওয়া সম্ভব।

দশ. সোমবারের সহবাসের সন্তান খোদাভক্ত ও কোরআনে হাফেজ হয়, মঙ্গল বারের সহবাসের সন্তান মুমিন ও আল্লাহ্‌র প্রিয়পাত্র হয়, বৃহস্পতিবারের দ্বি-প্রহরের পূর্বে সহবাসের সন্তান বিজ্ঞ পন্ডিত হয়। তার উপর যাদুমন্ত্রের বাণও কার্যকর হবেনা। শুক্রবারের দ্বি-প্রহরের পূর্বে সহবাসের সন্তান অত্যন্ত উত্তম ও সৎ চরিত্রবান হয় (তিরমিজি)।[৭১]

এটি সর্বতোভাবে ফ্যাক্ট বহির্ভূত, অবাস্তব বক্তব্যে পূর্ণ। কারণ এই বক্তব্য যদি সঠিক হতো তবে আর স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, মক্তবের প্রয়োজন হতো না। পিতা মাতাকেও তাদের সন্তানকে মানুষ করার জন্য চিন্তাভাবনা করে করে গলদঘর্ম হতে হতোনা। কেবল উল্লেখিত মতে দিনক্ষণ বেছে বেছে সন্তান জন্মানোর ব্যবস্থা করলেই হয়ে যেতো। হ্যাঁ, বিভিন্ন এলাকার মায়েদের সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে একটি জরিপ চালিয়ে বর্ণিত সময়ে পেটে ধারণ করা সন্তানদের কে কি হয়েছে তার সত্যাসত্য নিরূপণ করার একটা ব্যবস্থা

[৬৯]. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭১।

[৭০]. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১২।

[৭১]. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১২।

করা যেতে পারে। সেটি না হয় মুসলমানদের বেলায় করা গেল, কিন্তু হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান ইত্যাদি ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের বেলায়? জরিপ চালালে সেখানেও তো ঐ রকম সোম, মঙ্গলবারে গর্ভে ধারণ করা অগণিত অসংখ্য সন্তান পাওয়া যাবে। তারা কি সব কুরআনে হাফেজ এবং মুমিন বান্দা (ইসলামিক ধারণায়) হচ্ছে?

আসলে কুরআনে হাফেজ, মুমিন, সৎচরিত্রবান, বিদ্বান, পন্ডিত হওয়ার ক্ষেত্রে চাই পারিবারিক ও সামাজিক অনুকূল পরিবেশ, সেই সাথে চাই সেই ব্যক্তিটির নিজস্ব ইচ্ছা। ব্যক্তিগত সদিচ্ছার সাথে, অনুকুল পরিবেশ, এই দুটির সমন্বয়ের মাধ্যমেই কোন ব্যক্তি কি কুরআনে হাফেজ হবে, কি বিদ্বান-পন্ডিত হবে তা নির্ধারণ সম্ভব। এই সব তো সমাজ বিজ্ঞানীদের দীর্ঘ সময় সমাজকে অবলোকন এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর গৃহীত সিদ্ধান্ত। এমতাবস্থায় উক্তরূপ বাস্তব বিবর্জিত বক্তব্য মহানবী (সঃ) কর্তৃক ব্যক্ত হওয়া স্বাভাবিক নয়। কারণ ইসলাম প্রকৃতির ধর্ম, প্রকৃতিতে যা স্বাভাবিক সেটিই ইসলাম ব্যক্ত করে। অতএব এটিও হাদিস হতে পারেনা।

এগার. <u>কখনও ঐ জাতির মঙ্গল সাধিত হয়না যারা নিজেদের নেতা নির্ধারণ করেন কোন মহিলাকে (বুখারী)।</u>[৭২] এটি মহানবীর (সঃ) বক্তব্য বলে কি ভাবে গ্রহণীয় হতে পারে? কারণ এটি তো অত্যন্ত সত্য যে, নবী হিসেবে মানুষের কল্যানের নিমিত্তে তিনি যে কথা বলবেন, যা করবেন তা হবে সার্বজনীন, সর্বকালের, সকলের জন্য যা প্রযোজ্য তথা শাশ্বত। কিন্তু এই বক্তব্যে সেই নিরপেক্ষতা ও সার্বজনীনতা কোথায়? চোখের সামনেই বাংলা দেশে তিন/চারটে পিরিয়ডে নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছেন নারী। যাবতীয় ভুলত্রুটি সত্বেও বিগত স্বৈরশাসন তথা পুরুষ শাসনের তুলনায় বাংলাদেশেও নারী শাসন (সরকারী/ বিরোধী নেতৃ উভয়ের আমলেই) যে হাজার গুণ শ্রেয় তা তো অস্বীকার করার জো নেই। পাকিস্তানে ও শ্রীলঙ্কায় নেতৃত্ব দিয়েছেন নারী, মায়ানমারে দীর্ঘ প্রচেষ্টার পরও সূচির নারী নেতৃত্ব ঠেকানো যাচ্ছেনা। এগিয়ে আসছে নারী সূচির নেতৃত্ব। থাইল্যন্ডে নেতৃত্ব দিচ্ছেন নারী। নারী নেতৃত্বের কারণে অমঙ্গলের বিশেষ কোন বাঁশী সেখানে বেজে উঠেছে বলে তো শোনা যাচ্ছেনা। অমঙ্গল বা অকল্যান যা কিছুই হচ্ছে তা নারী এবং পুরুষ উভয়ের নেতৃত্বেই হচ্ছে। প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতে নারী ইন্দিরা গান্ধীর শাসন, ইংল্যন্ডে নারী মার্গারেট থেচারের রাজত্বি, নেতৃত্ব - সে সব জাতিরও নারী শাসনের কারণে বিশেষ কোন অমঙ্গল তো দেখা যায়নি, শোনা যায়নি। মুসলমান জাতির ইতিহাসে নারী নেতৃত্বের অনেক প্রমাণও আছে। এক সময়ে নবীপত্নি বিবি আয়শাও মুসলমানদের একটি দলের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। সর্বোপরি পবিত্র কুরআনে সুরা নামল এ বিলকিস বেগম নামীয় এক নারীর নাম রয়েছে, যিনি সারা সম্প্রদায়ের রাজা ছিলেন। তারা সূর্যকে সেজদা করে, ধর্ম বিষয়ক এই ত্রুটি ব্যতীত তাঁর দ্বারা রাজ্য পরিচালনার কারণে ঐ জাতির কোন অমঙ্গলের কথা কিন্তু পবিত্র কুরআনে ব্যক্ত হয়নি। বরং (পবিত্র কুরআন দৃষ্টে) তাঁর রাজত্বিতে ছিল গণতান্ত্রিক পরিবেশ। বিলকিস বেগম সভাসদদের মতামত গ্রহণ ব্যতীত কোন সিদ্ধান্ত নেন না। সভাসদরাও তাঁর প্রতি বিশ্বস্ত এবং তাঁর মতামতের গুরুত্ব প্রদান করেন। বিলকিস বেগম সারা জাতির সেই নেতা যিনি রাজ্যের জনগণের মঙ্গল চিন্তায় যুদ্ধ এড়াবার কৌশল গ্রহণ করেন। তিনি আল্লাহ্ ব্যতীত সূর্যকে সেজদা করার মত ভুল বোঝার জ্ঞান রাখেন এবং নবী সোলায়মানের কাছে গিয়ে সত্য ধর্মকে বরণ করে নেন। তাহলে পবিত্র কুরআনেও নারী নেতৃত্বের বর্ণনা রয়েছে, যাকে শাসক হিসেবে উত্তম দেখানো হয়েছে, অমঙ্গল জনক নয়।

এরূপ অবস্থায় উপরের বক্তব্য নবীজির বক্তব্য হিসেবে কিভাবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে? আসলে যিনি নেতা তিনি নারী নাকি পুরুষ সেটি বড় কথা নয়। বড় কথা হলো তাঁর সঠিক পরিচালনা, যোগ্য নেতৃত্ব। মহান আল্লাহ্র কাছে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের মাপকাঠি হলো তার আমল ও আখলাক, তথা তাঁর কাজ ও

---

[৭২]. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৩৩।

তাঁর চরিত্র। নারী কিংবা পুরুষ নয়। স্বয়ং আল্লাহ্পাক বলেছেন, ''আর তোমরা এরূপ আকাঙ্খা করোনা এমন সব বিষয়ে যাতে আল্লাহ্তায়া'লা- তোমাদের একের উপর অপরের শ্রেষ্ঠত্ব/বৈশিষ্ট্য দান করেছেন। পুরুষ যা অর্জন করে সেটা তার অংশ, নারী যা অর্জন করে সেটা তার অংশ'' (সুরা নেছা, আঃ ৩২২)। বিষয়টি নিয়ে একটু গভীরে গিয়ে চিন্তা করলে দেখা যাবে আসলে যাবতীয় নেতৃত্বই মায়ের (নারীর)। মা (নারী) হলো স্বাভাবিক কিংবা প্রাকৃতিক নেতা। যেই মা সংসারে তার সন্তানদের সুষ্ঠভাবে পরিচালনা করেন, সন্তানদের প্রতি সুষ্ঠ নেতৃত্ব প্রয়োগ করেন, সেই সন্তানরা সুষ্ঠু ও সুন্দর ভাবে গড়ে উঠবেই। আর এভাবেই মা-ই (নারী) একটি জাতি গঠনের প্রধান নেতা তথা হাতিয়ার। তাই এই নারী জাতিকে অবমুল্যায়নকর কোন বক্তব্য দেয়া মহানবীর(সঃ) জন্য স্বাভাবিক নয়। আর মাকে অবহেলা আর অমর্যাদার কারণেই আজ বিশ্ব জুড়ে মুসলিম জাতির মর্যাদাকর অবস্থান ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হচ্ছে।

বার. আর যখন তোমাদের দুষ্ট লোকেরা আমীর শাসক আর মালদার ব্যক্তিরা কৃপণ হবে এবং তোমাদের যাবতীয় কার্যাবলী নারীদের হাতে সোপর্দ হবে তখনই পৃথিবীর পেট তার পিঠের তুলনায় অর্থাৎ দুনিয়াতে না থাকাই তোমাদের জন্য উত্তম হবে (তিরমিজি)।[৭৩]

এটি যথার্থই হাদিস। কারণ আমীর শাসকদের অবশ্যই উত্তম চরিত্রের অধিকারী হতে হবে, তা না হলে জনগণের কষ্টের সীমা থাকবেনা। একই ভাবে কৃপণ লোকের হাতে সম্পদ জড়ো হলে সাধারণ জনগণেরা দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হতেই থাকবে। আর পুরুষেরা অলস কর্মবিমুখ হয়ে ঘরে বাইরে সকল দায়-দায়িত্ব নারীর উপর ন্যস্ত হলে ধ্বংস তো অনিবার্যই। সমাজরূপ শকটের চক্র দুটো -একটি পুরুষ - একটি নারী। এর যে কোন একটি অচল হলে শকটের গতি স্বাভাবিক থাকতে পারেনা। তার গতি স্তব্ধ হতে বাধ্য। উপজাতিগুলোর দিকে তাকালেই এর উদাহরণ স্পষ্ট হবে। অধিকাংশ উপজাতির পুরুষেরা অলস। তারা কেবলমাত্র নারীর উপার্জনের উপর নির্ভরশীল। ঘরে বাইরে যাবতীয় দায়িত্ব নারীদের। ফলতঃ উপজাতিগুলোর পক্ষে তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা কঠিন হচ্ছে।

অর্থাৎ কল্যানের জন্য, মঙ্গলের জন্য, সমাজ সভ্যতাকে টিকিয়ে রাখার জন্য নারী পুরুষ সকলকেই সকল প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে কাজ করতে হবে। অতএব হাদিসটি অগ্রহণযোগ্য হবার কোন কারণ নেই।

তের. পুরুষেরা যখন মহিলাদের আনুগত্য স্বীকার করবে তখন তারা ধ্বংশ প্রাপ্ত হবে (মুসতাদরক/আলহাকিম)।[৭৪]

এটিও অত্যন্ত খাঁটি কথা। কারণ সকল আনুগত্য আল্লাহ্র জন্য। পুরুষেরা যদি সেই আল্লাহ্র আনুগত্য, আল্লাহ্র ভীতি বাদ দিয়ে ঘরে বাইরে সর্বত্র নারী লোভী, নারী পূজারী হয়ে ওঠে তখন ধ্বংশ তো অনিবার্যই।

(দুই) এবারে তথ্য সূত্র বিহীন কয়েকটি হাদিস হিসেবে প্রচলিত বক্তব্যে আসা যাক, যে গুলোও ইসলাম ধর্মের সমালোচনা করতে গিয়ে তসলিমা নাসরিন তাঁর নির্বাচিত কলাম গ্রন্থে হাদিস হিসেবে উল্লেখ করেছেন। যদিও তথ্যসূত্র নেই বিধায় এক বাক্যেই সেগুলো নাকচ করে দেয়া যায় তথাপিও দিরায়াৎ পদ্ধতিতে তথা যুক্তির কষ্ঠি পাথরে পরীক্ষা করে দেখলে এটি স্পষ্ট হবে যে, সেগুলোও নবীজির (সঃ) বক্তব্য হতে পারেনা।

[৭৩]. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৩৪।

[৭৪]. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৩৪।

এক. স্বামীর পায়ের নীচে স্ত্রীর বেহেস্ত।[৭৫]

হাদিস গ্রন্থ গুলোর কোথাও এটি হাদিস হিসেবে বিদ্যমান নেই বরং বিদ্যমান হাদিসটি হলো **মায়ের পায়ের নীচে সন্তানের বেহেস্ত** ((ইবনে হাম্বল/ইবনে মাজাহ) **।** অথচ যুগ যুগ ধরে কোন দলিল প্রমাণ ছাড়াই **স্বামীর পায়ের নীচে স্ত্রীর বেহেস্ত** হাদিস তথা নবীজির (সঃ) বাণী হিসেবে প্রবল প্রতাপের সাথে রাজত্বি করে আসছে, আজও করছে। প্রায়শঃই এই বক্তব্য প্রবাদ বাক্যের মত হাদিস মর্মে উচ্চারিত হয়। এমনকি বাংলাদেশের সিনেমাগুলোর নায়িকাদের মুখ দিয়েও এটিকে হাদিস হিসেবে উচ্চারণ করানো হয়। যারা এ কাজটি করেন ও করান, তারা কি একবারের জন্যও চিন্তা করেননা মহানবীর (দঃ) সেই সতর্ক বাণীর কথা? ''আমি যা বলিনি তা আমার উপর যে ব্যক্তি আরোপ করবে সে যেন তার জন্য আগুনের আসন ঠিক করে নেয়'' (বুখারী)।

বরং **মায়ের পায়ের নীচে সন্তানের বেহেস্ত** ((ইবনে হাম্বল/ইবনে মাজাহ) - এই হাদিসে বেহেস্ত তথা পরকালীন সফলতা লাভের প্রক্রিয়ায় মায়ের প্রতি সন্তানের ইহকালীন যে দায়িত্ব ও কর্তব্যের ইঙ্গিত রয়েছে তার থেকে কোন অবস্থাতেই কন্যা সন্তানটিও যে বাদ পড়েনা তা সুস্পষ্ট। এই কন্যা সন্তান, যিনি পরবর্তীতে স্বামীর স্ত্রী, তাকে সম্পূর্ণরূপে মায়ের তথা পিতা-মাতা থেকে বিচ্ছিন্ন করার সুক্ষ্ণ ও হীন কৌশল থেকেই কোন এক সময়ে এরূপ বিষয়ের উদ্ভাবন হয়েছে মর্মে অনুমান করা যায়। অথচ আল্লাহ্পাক স্বামী-স্ত্রী তথা পুরুষ ও নারীকে করেছেন পরস্পরের বন্ধু। ''মমিন পুরুষ মমিন নারী পরস্পর পরস্পরের বন্ধু'' (সুরা তওবা, আয়াত ৭১)। ''তোমরা পরস্পর পরস্পরের অংশ'' (সুরা নেছা, আঃ ২৪)। এবং ''স্ত্রীর উপর স্বামীর যেরূপ অধিকার আছে, স্বামীর উপরও স্ত্রীর সেরূপ অধিকার আছে'' (সুরা বাকারা আঃ ২২৮)। এই সব বিধান সমাজে চালু হলে স্বামীর এবং তার পিতামাতা ভাইবোনদের বিপদে আপদে সুখসাচ্ছন্দে যেমনি স্ত্রী থাকবে স্বামীর পাশে, একই ভাবে স্ত্রীর এবং তার পিতামাতা ভাই বোনদের বিপদে আপদে সুখস্বাচ্ছন্দ্যে স্বামীকেও থাকতে হবে স্ত্রীর পাশে। সেখানে কেউ কারো পর নয়, পরস্পর পরস্পরের বন্ধু। এভাবেই পরিবারে ও সমাজে যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে, তার কি কোন তুলনা আছে? প্রকৃতিতে যা কিছু স্বাভাবিক সেটিই ইসলামের বিধান। অথচ সেই বিধানকে যথাযথ অনুসরণ না করে সংকীর্ণ স্বার্থ প্রণোদিত হয়ে মিথ্যে বক্তব্যকে হাদিস হিসেবে চালিয়ে স্বাভাবিকতাকে প্রতিরোধ করতে গিয়ে যুগ যুগ ধরে যে অন্যায়গুলো হয়ে গেলো এবং আজও হচ্ছে তার যাবতীয় দায়দায়িত্ব থাকলো যারা এরূপ মিথ্যে হাদিস তৈরী করেছেন- তাদের উপর, আর যারা জেনে শুনে সত্য গোপন করেছেন- তাদের উপর। অতঃপর **স্বামীর পায়ের নীচে স্ত্রীর বেহেস্ত নয় বরং মায়ের পায়ের নীচে সন্তানের (ছেলে মেয়ে উভয়ের) বেহেস্ত** - এই হাদিসটিই প্রতিষ্ঠিত হউক।

দুই. তিন ব্যক্তির নামায বন্দেগী কিছুই কবুল হইবেনা। (ক) যে গোলাম মনিবের নিকট হইতে পালাইয়া গিয়াছে, সে মনিবের নিকট হাজির না হওয়া পর্যন্ত (খ) যে স্ত্রীর স্বামী তাহার উপর অসন্তষ্ট সে সন্তষ্ট না হওয়া পর্যন্ত। (গ) নেশাখোর নেশা ছাড়িয়া না দেওয়া পর্যন্ত ।[৭৬]

এই ক্ষেত্রে গ ক্রমিকের বক্তব্য যথার্থ। নেশাগ্রস্থ অবস্থায় মন মানষিকতা ও মস্তিস্ক জড়তা ও অবসাদগ্রস্থ থাকে। সে অবস্থায় নামায সহ কোন এবাদতই সম্ভব নয় এবং তা সুস্থ এবাদত হওয়ারও কথা নয়। ফলতঃ কবুল হওয়ার সম্ভবনাও নেই। নেশাগ্রস্থ অবস্থায় এবাদত না করার নির্দেশ পবিত্র কুরআনেও রয়েছে - ''হে ঈমান্দারগণ! যখন তোমরা নেশাগ্রস্থ থাক, তখন নামাযের ধারে কাছেও যেওনা, যতক্ষন না বুঝতে সক্ষম হও, যা কিছু তোমরা বলছ'' (আঃ ৪৩, সুরা নেছা)। তাই এই বক্তব্য মহানবীর (সঃ) পক্ষে বলা স্বাভাবিক।

---

[৭৫]. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫৭।

[৭৬]. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭০।

কিন্তু মনিব যদি হয় অত্যাচারী, নিপীড়ক সে ক্ষেত্রে গোলামের পালানো ছাড়া তো আর কোন পথ নেই। সে অবস্থায় এরূপ গোলামের এবাদত কবুল না হওয়ার কোন যুক্তিও নেই। এবং মূলতঃ গোলাম- মুনিব এরূপ বিষয় ইসলাম সম্মত নয়। নবীজি (সঃ) সমাজ থেকে এই ব্যবস্থার মূলোৎপাটন করেছিলেন এবং সকল মানুষ ভাই ভাই সমাজে ভ্রাতৃত্বের সর্বোৎকৃষ্ট এই আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সে ক্ষেত্রে নবীজির পক্ষে এ ধরনের বক্তব্য স্বাভাবিক নয়। আবার স্বামী যদি হয় লম্পট, চরিত্রহীন ও লোভী, সে ক্ষেত্রে কোন স্ত্রীর পক্ষেই আল্লাহ্‌র আহকাম ঠিক রেখে স্বামীকে সন্তুষ্ট রাখা কোন ক্রমেই সম্ভব নয়। এখানে পবিত্র কুরআনে বিবি আসিয়ার(ফেরআউনের স্ত্রী) বেহেস্তবাসীর হওয়ার বিষয় পুনরায় উল্লেখ করা যায়। তাঁর স্বামী তাঁর উপর মোটেও সন্তুষ্ট ছিলেননা। কিন্তু আল্লাহ পাক তাঁর সকল এবাদত কবুল করেছেন। এরূপ অবস্থায় স্ত্রীর এবাদত কবুল না হওয়ারও কোন যুক্তি নেই। এ ধরনের অযৌক্তিক, অনিরপেক্ষ বক্তব্য মহানবীর (সঃ) পক্ষে বলা স্বাভাবিক নয়।

তিন. যে স্ত্রীরা সর্বদা স্বামী দিগকে সন্তুষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে সাজ-সজ্জা করে, স্বামীর হক আদায় করিতে থাকে, স্বামীর সন্তোষ তলব করে তবে সেই স্ত্রীরা পুরুষের জুম্মা, জমাত, হজ্ব ও ওমরার তুল্য সওয়াব পাইবে। [৭৭]

এটি শুধু জাল নয়, জঘন্য। কারণ এখানে স্বামীরূপে মানুষটিকে আল্লাহ্‌র শরীক তথা সমতুল্য করে ফেলা হয়েছে। তা এভাবে যে, পুরুষেরা জুম্মা, জমাত, হজ্ব ও ওমরার মত আল্লাহ্‌র ফরজ এবং ওয়জেব এবাদত করবে আর অনুরূপ এবাদতের পরিবর্তে নারীরা করবে স্বামীর পায়রবি। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির প্রক্রিয়া তথা এবাদত এবং স্বামীর সন্তুষ্টির প্রক্রিয়া তথা স্বামীর পায়রবিকে এক ও অভিন্ন করে ফেলা হয়েছে। এর চাইতে জঘন্য আর কি হতে পারে? এটি স্পষ্ট শরীকি। মহান আল্লাহ্‌ মানুষের যে গুনাহটি কখনই ক্ষমা করবেননা সেটি হলো অন্য কাউকে কিংবা অন্য কিছুকে স্বীয় প্রতিপালকের সমকক্ষ সাব্যস্ত করা তথা শরীক করা। ‘‘নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌ তাকে ক্ষমা করেননা, যে লোক তাঁর সাথে শরীক করে। তিনি ক্ষমা করেন এর নিম্ন পর্যায়ের পাপ, যার জন্য তিনি ইচ্ছা করেন’’ (আঃ ৪৮, সুরা নেছা)। এমতাবস্থায় এটি হাদিস হিসেবে গণ্য হতে পারেনা।

চার. যে সমস্ত স্ত্রী লোক স্বামীর ২য় বিবাহে হিংসা না করিয়া ছবর করিয়া থাকে, তাহাদিগকে আল্লাহ্‌ **শহীদের তুল্য সওয়াব দান করিবেন।**[৭৮]

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ‘‘আর যারা আল্লাহ্‌র রাহে নিহত হয়, তাদেরকে তুমি কখনও মৃত মনে করো না। বরং তারা নিজেদের পালন কর্তার নিকট জীবিত ও জীবিকা প্রাপ্ত’’ (আঃ ১৬৯, সুরা আল-ইমরান)। অর্থাৎ শহীদরা আল্লাহ্‌পাকের কাছে বিশেষভাবে মর্যাদাবান। আর স্বামীর ২য় বিয়ে কি এমন মহৎ কাজ যে তাতে সবর করলে ১ম স্ত্রীরা আল্লাহ্‌পাকের কাছে বিশেষ ভাবে মর্যাদাবান বান্দা হিসেবে গণ্য হবেন। যেখানে মহান আল্লাহ্‌ পবিত্র কুরআনে স্বয়ং একাধিক বিয়ে নিয়ন্ত্রনের নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন, ইনছাফ কায়েমে সক্ষম না হলে এক স্ত্রী-তেই ক্ষান্ত থাকার জন্য বলেছেন (আঃ ৩, সুরা নেছা) এবং আরও কঠোর ভাবে সতর্ক করেছেন এই ভাবে যে - ‘‘তোমরা যতই চেষ্টা করনা কেন ইনছাফ কায়েমে সক্ষম হবেনা’’ (সুরা নেছা আঃ ১২৮)। অর্থাৎ যেখানে একাধিক বিয়ে স্বয়ং আল্লাহ্‌পাক অপছন্দ করেছেন সেখানে মহানবী (সঃ) তার বিপরীত বক্তব্য বলবেন কিভাবে?

---

[৭৭]. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭০।

[৭৮]. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭০।

এখানে একটি হাদিসও প্রাসঙ্গিক- তাহলো, নবী জামাতা হযরত আলীর ২য় বিয়ে প্রসঙ্গে মহানবী (সঃ) বলেছিলেন, ''আমি অনুমতি দেবনা, আমি অনুমতি দেবনা, আমি অনুমতি দেবনা। .. .. ফাতেমা আমার কলিজার টুকরা তাকে যা কষ্ট দেয় তা আমাকেও কষ্ট দেয়'' (বুখারী)। প্রখ্যাত এই হাদিসে মহানবী (সঃ) নিজ কন্যাকে সবরের কথা বলেননি বরং কন্যার হৃদয়ের যন্ত্রনাকে মূল্যায়ন করেছেন। এই বিষয়ে অন্যত্র মহানবী হযরত মুহম্মদ(দঃ) এর সতর্ক বানী রয়েছে এভাবে, ''যে ব্যক্তির দুই স্ত্রী রয়েছে সে যদি এদের মধ্যে ব্যবহারের ক্ষেত্রে পূর্ণ সমতা ও ইনছাফ করতে না পারে, তবে কিয়ামতের ময়দানে এমন ভাবে উঠবে যে তার শরীরের এক পার্শ্ব অবশ হয়ে থাকবে'' (মেশকাত শরীফ)।

পবিত্র কুরআনের নির্দেশ এবং এই হাদিস সমূহের প্রেক্ষিতে এটি স্পষ্ট যে উপরের বক্তব্য - **'যে সমস্ত স্ত্রী লোক স্বামীর ২য় বিবাহে হিংসা না করিয়া ছবর করিয়া থাকে, তাহাদিগকে আল্লাহ্ শহীদের তুল্য সওয়াব দান করিবেন' - তা** মোটেও হাদিস নয়।

একাধিক বিয়ের অনুকূলে আমাদের দেশে স্বয়ং মহানবী (সঃ) এবং তার সাহাবীগণের একাধিক বিয়ের উদাহরণ টানা হয়। মূলতঃ এ উদাহরণও অবাস্তব। কারণ ইসলামের একেবারে প্রাথমিক অবস্থায় বহু বিবাহ ব্যবহৃত হয়েছে বটে কিন্তু সেটিও ছিলো তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থার অনুকুলে এক ধরনের নিয়ন্ত্রণ। এই বিষয়ে পরে আরও বিস্তারিত বলা হয়েছে।

পাঁচ. <u>যখন কোন স্ত্রী স্বামীকে বলিবে যে, তোমার কোন কাজই আমার পছন্দ হইতেছেনা তখনই তাহার ৭০ বছরের এবাদত বরবাদ হইয়া যাইবে। যদিও সে দিবসে রোযা রাখিয়া ও রাত্রে নামায পড়িয়া ৭০ বছরের জন্য পুণ্য কামাই করিয়াছিল।</u>[৭৯]

অথচ পবিত্র কুরআনে স্বয়ং আল্লাহপাকের নির্দেশ হলো-''মমিন পুরুষ ও মমিন নারী একে অপরের বন্ধু, সাহায্যকারী ও অভিভাবক (ওয়ালী)। তারা সৎকাজে নির্দেশ দেয় ও মন্দ কাজ হতে নিষেধ করে'' (সুরা তওবা, আঃ ৭১)। এর থেকে এটি স্পষ্ট যে স্বামী-স্ত্রী অন্যদেরকে তো বটেই একই সাথে নিজেরা পরস্পর পরস্পরকে অন্যায় কাজে নিষেধ করবে, পরস্পরের অন্যায়ের প্রতিবাদ করবে, বাধা দেবে। আর যে স্ত্রী দিবসে রোজা রেখে রাতে নামাজ পড়ে ৭০ বছরের পুণ্য কামাই করেছে তিনি তো অবশ্যই মমিন নারী, এরূপ নারী অন্যায় ও অহেতুক ভাবে স্বামীকে বলবে যে, ''তোমার কোন কাজই আমার পছন্দ হইতেছেনা"- তা গ্রহণযোগ্য নয়, বরং অনুরূপ স্ত্রীর পক্ষে স্বামীর কোন অন্যায় কাজ কিংবা আচরণের প্রতিবাদ ও বাধা দিতে গিয়েই এরূপ বলা সম্ভব। আর মমিন নারী হিসেবে এটিতো তার প্রতি আল্লাহ্র নির্দেশ। সে অবশ্যই তার স্বামীকে সৎকাজে নির্দেশ দিবে ও মন্দ কাজে নিষেধ করবে।

এমতাবস্থায় আল্লাহ্ পাক তাঁর ৭০ বছরের এবাদত বাতিল করে দিবেন তা পবিত্র কুরআনের উল্লেখিত নির্দেশের বিরোধী। তাই মহানবীর (সঃ) পক্ষে এরূপ বক্তব্য প্রদান সম্ভব নয়। এটি যথার্থ হাদিস নয়।

ছয়. <u>বেহেস্তবাসিদের মধ্যে সর্বাপেক্ষ নিম্ন মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তির আশি হাজার দাস ও বাহাত্তর জন স্ত্রী থাকিবে।</u>[৮০]

দাস প্রথা ইসলাম সম্মত নয়। নবীজি (সঃ) দাস প্রথা নির্মূল করেছেন- এই পৃথিবীর জন্যই। সকল মানুষ সমান- এটি ইসলামের মৌলিক আদর্শ। লাভালাভ, স্বার্থাস্বার্থ মিলিয়ে যে পৃথিবী, সেখানেই দাস প্রথা স্বীকৃত না হলে পবিত্র বেহেস্তে কিভাবে সম্ভব? একই ভাবে স্বামী-স্ত্রী রূপ দাম্পত্য সম্পর্ক তো এই পৃথিবীর জন্যই।

---

[৭৯]. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭০।

[৮০]. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭১।

কারণ গন্ধম খাওয়া ও লজ্জা স্থানের উন্মুক্ততার সাথে সাথেই আদম ও হাওয়ার পক্ষে মুহূর্তের জন্যও বেহেস্তে স্থান লাভ সম্ভব হয়নি, ছিটকে আসতে হয়েছে পৃথিবীতে। তাই বেহেস্তে ৭২ জন দূরে থাকুক পৃথিবীর অনুরূপ দাম্পত্য সম্পর্কযুক্ত কোন স্ত্রীই থাকবে কিনা সন্দেহজনক। মূলতঃ বেহেস্তের রহস্য কোথাও পুরোপুরি উন্মোচিত হয়নি। পবিত্র কুরআনের কোথাও কোথাও মনোমুগ্ধকর বাগান, ঝর্ণাধারা, ফোয়ারা, দুগ্ধ, মধু, ফল এবং হুর ইত্যাদি সংক্রান্ত যে আভাষ ইঙ্গিত রয়েছে তার কিছুই পার্থিব বিষয়াদির সাথে তুলনীয় নয়।

সুরা সেজদার ১৭নং আয়াতে আল্লাহ্‌পাক বলেন, ''কেহই জানেনা তাহাদের জন্য নয়ন প্রীতিকর কি লুকায়িত রাখা আছে, তাহাদের কৃতকর্মের পুরস্কার স্বরূপ''। এই আয়াতের সাথে সঙ্গতি রেখেই নবীজি (সঃ) বলেছেন, ''মহান আল্লাহ বলেছেন, আমার পুণ্যবান বান্দাদের জন্য এমন জিনিষ তৈরী করে রেখেছি, যা কোন চক্ষু দেখেনি, কোন কান শোনেনি, যার সম্পর্কে কোন মানুষের মনে ধারণাও জন্মেনি'' (বুখারী)। এরূপ অবস্থায় পবিত্র বেহেস্তে ৮০ হাজার দাস ও ৭২ জন স্ত্রী সংক্রান্ত ঘোষণা নবীজির (সঃ) বক্তব্য হিসেবে গ্রহণযোগ্য হতে পারেনা।

সাত. ঐ স্ত্রীলোক অতি উত্তম যে দেখিতে সুন্দরী এবং যাহার মোহর অতি নগণ্য। (এ হাদিসটি উদাহরণ হিসেবে দেখাতে গিয়ে তসলিমা নাসরিন এই অংশটুকুও সংযুক্ত করেছেন - **"দেখতে অসুন্দরী স্ত্রীলোককে মহানবীও অপছন্দ করতেন")।**[৮১]

তবে কি দেখতে অসুন্দরী স্ত্রীলোকের মোহর নগণ্য হলেও তিনি উত্তম হবেননা? আসলে সুন্দরীও চাই এবং মোহরও কম হওয়া চাই অর্থাৎ গাছেরও খাই, তলারও কুড়াই তথা সবদিক থেকে লাভবান হওয়ার সংকীর্ণ স্বার্থ চিন্তা থেকে এরূপ বক্তব্যের উদ্ভব ঘটেছে- যা মোটেও মহানবীর (সঃ) বক্তব্য হতে পারেনা। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্‌পাক বলেন, ''তোমরা স্ত্রীদিগকে তাহাদের মহর সন্তুষ্ট চিত্তে দিয়ে দাও। তবে যদি স্ত্রীগণ সন্তুষ্ট চিত্তে তোমাদিগকে মোহরের কিয়দংশ ছাড়িয়া দেয় তবে তোমরা উহা মর্যাদার তৃপ্তিকর মনে করিয়া উপভোগ কর'' (সুরা নেছা আঃ ৫) - আয়াত থেকে এটি স্পষ্ট যে স্বামীদের ক্ষেত্রে মোহর প্রদান করা অবশ্য কর্তব্য, তথা বাধ্যতামূলক। আর মোহরের কিয়দংশ ছেড়ে দেবে কি দেবেনা সেটি স্ত্রীদের ইচ্ছেধীন তথা এখতিয়ারধীন। তবে উভয় ক্ষেত্রেই স্বামী এবং স্ত্রীই বিবেচ্য। তাহাদের সৌন্দর্য নয়। এরূপ অবস্থায় মহানবী (সঃ) কর্তৃক সুন্দরী নারীর সাথে মোহর কমানোর বিষয় সংযুক্ত করণের সুযোগ কোথায়?

একই বাক্যে তসলিমা নাসরিন ব্রাকেটে যে বক্তব্য রেখেছেন তা আরও দুঃখজনক। সেটি হলো 'দেখতে অসুন্দরী স্ত্রীলোককে মহানবীও অপছন্দ করতেন '। যার কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই। এই বক্তব্যও যে জ্বলন্ত মিথ্যে তা একটি হাদিস থেকে প্রমাণ সম্ভব। তা হলো কোন নারীকে স্ত্রী হিসেবে পেতে হলে সাধরণতঃ যে বিষয় গুলোর উপর গুরুত্বারোপ করা হয় তার উল্লেখ পূর্বক মূলতঃ কোন বিষয়টি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সেই বিষয়ে দিক নির্দেশ করে মহানবী (সঃ) বলেন, ''চারটি গুণের কারণে একটি মেয়েকে বিয়ে করার কথা বিবেচনা করা হয়- তার ধনমাল, তার বংশগৌরব, সামাজিক মানমর্যাদা, তার রূপ ও সৌন্দর্য এবং তার দীনদারী। কিন্তু তোমরা দীনদার মেয়েকেই গ্রহণ করো'' (বুখারী)। কৈ নবীজি(সঃ) তো সুন্দরী নারীর উপর গুরুত্বারোপ করেননি? করেছেন দীনদারী তথা জ্ঞানী ও ধার্মিক নারীর প্রতি। এবং এটিই মহানবীর (সঃ) পক্ষে বলা স্বাভাবিক। নবীজি (সঃ) স্বয়ং পঁচিশ বছর বয়সে বিয়ে করেছেন ৪০ বছর বয়সের বিবি খাদিজাকে। এর পরও তাঁর অধিকাংশ স্ত্রীরাই ছিলেন বিধবা এবং অসহায় নারী। সৌন্দর্য তাঁর বিবেচ্য বিষয় ছিলোনা, বিবেচ্য ছিলো অসহায় নারীদের অসহায়ত্ব মোচন। বলা যায় অনুরূপ বক্তব্য তসলিমা নাসরিনের

---

[৮১]. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮১।

Dhaka University Institutional Repository

নিজস্ব উদ্ভাবন এবং তা হাদিস বিকৃত করণের উৎকৃষ্ট উদাহরণও বটে। যুগে যুগে মনগড়া বক্তব্যের মাধ্যমেই তো হাদিস বিকৃত হয়েছে। এটিও তারই একটি উদাহরণ।

আট. স্বামীর বিনানুমতিতে নফল রোযা রাখা স্ত্রীর পক্ষে জায়েজ নয় এবং স্বামীর বিনানুমতিতে স্বামীর বাড়ি থেকে কোথাও যাওয়া বা কোন জিনিষ কাউকে দেওয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। যদি কেউ এই নির্দেশ অমান্য করে তবে ফেরেস্তাগণ তার প্রতি অভিসম্পাত করে।[৮২]

নফল রোজা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে বাড়তি এবাদত। হউক নফল, তবুও তো আল্লাহ্‌র এবাদত। আল্লাহর এবাদত তা নফলই হোক কি ফরজই হোক তাতে মানুষের অনুমতির আবশ্যক হবে কেন? তবেতো সেই মানুষটিকে শুধু আল্লাহর সমকক্ষই নয়, আল্লাহর উপরেই স্থান করে দেয়া হলো! আর এটিই যদি সত্য হবে তবে তো ফেরআউনের স্ত্রী বিবি আছিয়ার বেহেস্তবাসী হওয়ার কথা নয়। বিবি আছিয়া দিবা-রাত্রি আল্লাহর এবাদত করতেন, যাতে ফরজ- নফল সব রকমের এবাদতই থাকা স্বাভাবিক, আর এটাও সত্য যে বিবি আছিয়ার কোন এবাদতেই তার স্বামী ফেরআউনের অনুমোদন ছিলোনা।

আর মহান আল্লাহ স্বয়ং পবিত্র কুরআনে ফেরআউনের স্ত্রী (বিবি আছিয়া)কে পরকালে পুরস্কৃত করণের ঘোষণা রেখেছেন (সুরা আত্তাহরীম, আঃ ১১)। এবং একজন পুরুষ তিনি যত ধার্মিকই হউননা কেন তার এবাদতের বদৌলতে কিন্তু তার স্ত্রীর পক্ষে পরকালীন সফলতা অর্জন সম্ভব নয়। প্রত্যেক নারীকে তার নিজস্ব এবাদত ও সৎকর্মের মাধ্যমেই পরকালীন সফলতা অর্জন করতে হবে। স্বয়ং নুহ(আঃ) ও লূত(আঃ) নবী হওয়া সত্বেও তাদের স্ত্রীদের কোনই কাজে লাগেননি। কারণ তাঁদের স্ত্রীরা ধর্মের বিষয়ে তাঁদের বিরুদ্ধাচরণ করেছিলো। আল্লাহপাক বলেন, ''সুতরাং সেই দুইজন নেককার বান্দা আল্লাহর মুকাবিলায় তাহাদের কিছু মাত্র কাজে আসিতে পারে নাই'' (সুরা আত্তাহরীম, আঃ ১০)। পবিত্র কুরআনে আল্লাহপাক আরো ঘোষণা করেছেন যে, ''পুরুষদের জন্য তাদের আমল সমূহের অংশ রহিয়াছে এবং নারীদের জন্যও তাদের আমল সমূহের অংশ রহিয়াছে'' (সুরা নেছা আঃ ৩২)। অর্থাৎ পুরুষ কিংবা নারী যার যার আমলে তার তার পাওনা। অতএব স্ত্রীর নফল রোজারূপ আমল স্বামীর অনুমতি না থাকলে তা না জায়েয বা বাতিল এরূপ নবীজির (সঃ) বক্তব্য বলে গ্রহণীয় হতে পারেনা।

এর পরের বক্তব্যগুলোও যে নবীজির বক্তব্য হতে পারেনা তা নিম্নের প্রখ্যাত হাদিস সমূহ থেকে প্রমাণ সম্ভব। তাহলো, এক সময় নবী পত্নি বিবি সওদা এক রাতে কোন কারণে বাইরে গেলে হযরত ওমর (রাঃ) কর্তৃক বাধা প্রাপ্ত হয়ে ঘরে এসে নবীজি (সঃ)কে জানালে নবীজি(সঃ) বলেন, ''আল্লাহতায়া'লা তোমাদের প্রয়োজনে তোমাদের জন্য বাইরে যাবার অনুমতি দিয়ছেন'' (বুখারী)। আরও একটি হাদিস এরূপ যে, হযরত ওমরের স্ত্রীই কোন কাজে বাইরে গেলে অন্য সাহাবীরা ওমর তাঁর স্ত্রীর বাইরে যাওয়া পছন্দ করেননা মর্মে জানালে হযরত ওমরের স্ত্রী বলেন যে, ওমর স্বয়ং তাকে বাধা দেয়না কেন? এবং হযরত ওমরের জন্য বাধা না দেওয়ার কারণ ছিল নবীজির (সঃ) তাতে অনুমোদন ছিলো (বুখারী)। অতএব এটি কিভাবে বিশ্বাস্য যে স্বামীর বিনানুমতিতে স্বামীর বাড়ি থেকে কোথাও যাওয়া নবীজি (সঃ) সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করেছেন?

আরও দেখা যায় যে, একবার বিবি আসমা (নবী পত্নি বিবি আয়শার বোন) এক সময় নবীজির (সঃ) নিকট এসে জানতে চেয়েছিলেন যে, তাঁর স্বামী যুবায়ের বিবি আসমার নিকট যে ধনসম্পদ রাখে সেগুলো ব্যতীত বিবি আসমার নিজস্ব কোন ধন-সম্পদ নাই। তিনি উক্ত সম্পদ থেকে সাদকা করবেন কিনা? তার জবাবে নবী করিম (সঃ) বলেছিলেন, ''হ্যাঁ সাদকা কর, আল্লাহর পথে খরচ কর, হিসাব করতে যেওনা, তাহলে আল্লাহ

[৮২]. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৩৮।

তোমার বেলায় হিসাব করবেন, কার্পণ্য করবেনা, তবে কিন্তু আল্লাহ তোমার বেলায় কার্পণ্য করবেন" (বুখারী)। এর পরেও এটি কিভাবে বলা সম্ভব যে নবীজি (সঃ) স্বামীর বাড়ি থেকে কাউকে কিছু দেওয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করেছেন?

নয়. যদি কোন পুরুষের শরীর হইতে সর্বদা পুঁজ রক্ত বাহির হইতে থাকে আর তাহার স্ত্রী ঐ সমস্ত পুঁজ রক্ত নিজের জিহ্বা দ্বারা চাটিয়া সাফ করিয়া দেয় তথাপিও পুরুষের হক আদায় হইবেনা।[৮৩]

একজন অসুস্থ মানুষের সেবা যত্নের মাধ্যমে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন সম্ভব, এটি ইসলাম ধর্মেরই বিধান। সেই স্বাভাবিক নিয়ম মতই অসুস্থ্য স্বামী, তার স্ত্রীর সেবাযত্ন পেতে পারেন এবং যেহেতু তিনি স্বামী, সেক্ষেত্রে স্ত্রীর সেবার হাত অধিকতর যত্নশীল হবে তাও স্বাভাবিক এবং একই বিষয় অসুস্থ স্ত্রীর বেলায়ও স্বামীর পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু স্বামীর শরীর থেকে সর্বদা প্রবাহিত পুঁজ-রক্ত জিহ্বা দ্বারা চেটে পুটে ছাফ করে দিতে হবে, এটি কোন ধরনের সেবা পদ্ধতি? তাতে তো রোগ-জীবানু নিজ শরীরে প্রবেশ করে অচিরে একই রোগে স্ত্রীও আক্রান্ত হয়ে যাবে। সে ক্ষেত্রে কার সেবা কে করবে? আশ্চর্যের বিষয় এই যে, উল্লেখিত বক্তব্য মাফিক এর পরেও কিন্তু স্বামীর হক আদায় হচ্ছেনা! প্রশ্ন হলো- ভয়ংকর সেই হকটা কি? কোন কাজের বিনিময়? তা কিন্তু খুজে পাওয়া মুশকিল। বরং স্ত্রীদের বেলায়ই বলা যায় স্ত্রীরা যে নয় মাস দশদিনের দীর্ঘ মেয়াদি কষ্ট যন্ত্রণা ভোগের পরও তীব্র, তীক্ষ্ণ যাতনার মাধ্যমে সন্তান জন্ম দিয়ে থাকে তার সেই যন্ত্রণার যে কোন একটি মুহূর্তের বিনিময় কি কোন স্বামীর পক্ষে করা সম্ভব? তিনি তো বিনা কষ্টে পিতা হয়ে গেলেন? তাঁর এই পিতৃত্বের পেছনে যে যন্ত্রণা নারীকে ভোগ করতে হয়েছে জীবন ভর প্রচন্ড যত্ন আদ্যি ভালোবাসার বিনিময়েও কি সেই হক আদায় সম্ভব? এবং কি পরিমাণ সম্পদের বিনিময়ে সেই হক আদায় সম্ভব? যার জন্য মহানবী ঘোষণা করেছেন, ''সেই উত্তম স্বামী যে তার স্ত্রীর নিকট উত্তম" (ইবনে হাম্বল)। এবং ''মায়ের পায়ের নীচে সন্তানের বেহেস্ত" (ইবনে হাম্বল/ইবনে মাজাহ))।

অতএব রক্ত পুঁজ জিহ্বা দ্বারা চেটে সাফ করা এবং তাতেও স্বামীর হক আদায় না হওয়া রূপ ফ্যাক্ট বিরুদ্ধ বক্তব্য মহানবীর (সঃ) বক্তব্য হতে পারেনা।

ইসলাম শান্তির ধর্ম, সেখানে নারীর অধিকার ও মর্যাদার প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করা আছে। ইসলামের এই সব মৌলিক আদর্শের সাথে উল্লেখিত বক্তব্য গুলোর অধিকাংশেরই কোন মিল নেই। তাই সেগুলো হাদিস তথা মহানবীর বক্তব্য নয়, হতে পারেনা। আসলে ধর্ম অনন্য, হাদিসও অনন্য। এ সত্য উপলব্ধি করতে সক্ষম হলে এটি বোঝা সহজ হবে যে, ধর্মকে ঘিরে নারী জাতির উপর যে নির্যাতন চালানো হয় তা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়।

(তিন) প্রখ্যাত লেখক হুমায়ুন আজাদও তাঁর নারী গ্রন্থে ইসলাম ধর্মের সমালোচনা করতে গিয়ে তসলিমা নাসরিন কর্তৃক তার 'নির্বাচিত কলাম' গ্রন্থের উপরে উল্লেখিত হাদিস সমূহ সহ আরও বেশ কিছু হাদিসের সমালোচনা করেছেন, যেগুলোর অধিকাংশই বিকৃত, অগ্রহণযোগ্য এবং জাল। শ্রদ্ধেয় হুমায়ুন আজাদও সম্ভবতঃ বুঝতে সক্ষম হননি। তিনিও সেগুলোকে মৌলিক হিসেবে ধরে নিয়ে ইসলাম ধর্মের সমালোচনা করেছেন। মূলতঃ ইসলাম ধর্মের মৌলিক আদর্শের সাথে যেগুলো মোটেও সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। উপরে উল্লেখিত হাদিস গুলো পুনরায় উদ্ধৃত না করে হুমায়ুন আজাদ সেগুলোর অতিরিক্ত আরও যে ক'টি বিষয় উল্লেখ করেছেন,বর্তমানে সেই অতিরিক্ত হাদিস সমূহ দিরায়াৎ- পদ্ধতিতে আলোচনা করে দেখানো হ'ল-

[৮৩]. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭০।

এক. <u>স্ত্রীগণকে সদুপদেশ দাও, কেননা পাঁজরের হাড়ের দ্বারা তারা সৃষ্ট। পাঁজরের হাড়ের মধ্যে ওপরের হাড় সবচেয়ে বাঁকা, যদি ওকে সোজা করতে যাও, তবে ও ভেঙ্গে যাবে, যদি ছেড়ে দাও তবে আরো বাঁকা হবে।</u>[৮৪]

নারী পুরুষের পাঁজরের হাড় থেকে সৃষ্ট- এটি বাইবেলের বক্তব্য, পবিত্র কুরআনের নয় এবং বাইবেল ঐশী গ্রন্থ সত্বেও এতে যে বিস্তর মানুষের হস্তক্ষেপ হয়েছে তা ড.মরিস বুকাইলী স্পষ্ট করে দিয়েছেন- তা পূর্বে দেখানো হয়েছ পরেও বিস্তারিত বলা হয়েছে। সেজন্য দেখা যেতে পারে এই বিষয়ে পবিত্র কুরআন কি বলে? পবিত্র কুরআন বলে, ''তাহার নিদর্শন সমুহের মধ্যে একটি এই যে, তিনি মানব সাধারণকে একই মূল উপাদান থেকে সৃষ্টি করিয়াছেন'' (সুরা রুম, আঃ ২১)। আবার সুরা নেছার ০১নং আয়াতেও প্রায় একই কথা বলা হয়েছে। ''হে মানব! স্বীয় প্রতিপালককে ভয় কর, যিনি তোমাদিগকে একই প্রাণ থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং সেই উপাদান হইতেই তোমাদের যুগলকে পয়দা করিয়াছেন''- অর্থাৎ নারী পুরুষ একই উপাদান থেকে সৃষ্ট। নারী জাতি পাঁজরের হাড় দ্বারা সৃষ্ট, তা পবিত্র কুরআন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত নয়।

আবার এই বিষয়ক বুখারী শরীফের হাদিসটির সাথেও উপরের বক্তব্যের মিল নেই। বুখারী শরীফে এই সংক্রান্ত হাদিসটি হলো - ''স্ত্রী লোকেরা পাঁজরের হাড়ের মত, যদি তোমরা তাকে সোজা করতে যাও তাহলে ভেঙ্গে যাবে, সুতরাং বাঁকা অবস্থায় তা থেকে ফায়দা গ্রহণ কর।''- এখানেও পাঁজরের হাড় দ্বারা সৃষ্ট বলা হয়নি, বলা হয়েছে পাঁজরের হাড়ের মত। পাঁজর বা পাঁজরের হাড়কে এখানে উপমা হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে এবং এখানে নারীকে তার স্বভাব মাফিক গ্রহণের নবীজির স্পষ্ট নির্দেশ ব্যক্ত হয়েছে। এর বাইরে বেশী কিছু করতে চাইলে ফলাফল ভালো হবেনা মর্মে সতর্ক করা হয়েছে।

অতএব উল্লেখিত বক্তব্য পবিত্র কুরআন ও সহিহ হাদিস দ্বারা সমর্থিত নয় বিধায় এবং বক্তব্যের শেষাংশে নারী নির্যাতনের সমর্থন ব্যক্ত হয়েছে যা ইসলামের মৌলিক আদর্শ বিরোধী, তাই সেটি হাদিস হিসেবে গ্রহণযোগ্য হতে পারেনা।(এই বিষয়ে পরে আরও বিস্তারিত বলা হয়েছে)

দুই. <u>বিবি আয়শা (রাঃ) বলিয়াছেন নারীগণ এখন যে ধরনের চাল চলন এখতেয়ার করিয়াছে, তাহা যদি রসুলুল্লাহ (সঃ) দেখিতেন, তবে নিশ্চয়ই তাহাদিগকে মসজিদে যাইতে বাধা দিতেন।</u>[৮৫]

বিবি আয়শা বেঁচে থাকা অবস্থাতেই মেয়েরা কোন ধরনের চাল-চলন এখতেয়ার করেছিলো? তা কি আইয়ামে জাহেলিয়া যুগের মেয়েদের থেকেও খারাপ? যদি তা না হয়, তবে আইয়ামে জাহেলিয়ার মেয়েদেরকেই যদি নবীজি (সঃ) মসজিদে নিয়ে যেতে পারলেন এবং পুরুষের সমান শিক্ষা দিতে পারলেন, তবে নবীজির (সঃ) ওফাতের পর পরই বিবি আয়শার জীবিতাবস্থাতেই কি এমন চাল-চলন মেয়েরা এখতেয়ার করে ফেললো যে, বিবি আয়শাকে মেয়েদের মসজিদে যাওয়া বন্ধ করে দিয়ে প্রকারান্তরে মেয়েদের জ্ঞান অর্জন ও এবাদতের প্রশস্ত পথ বন্ধ করার বিষয়ে সমর্থন জোগাতে হলো? মূলতঃ বিবি আয়শা ছিলেন সেই যুগের অন্যতম বিদূষী রমনী। যিনি ছিলেন নবীজির (সঃ) আদর্শকে হুবহু তুলে ধরার এক পবিত্র প্রতীক। যিনি সারাজীবন ধরে নবীজির (সঃ) উপর আরোপিত যে কোন মিথ্যাকে প্রচন্ডভাবে ঠেকিয়েছিলেন, সেই বিবি আয়শা কর্তৃক নবীজির (সঃ) প্রতিষ্ঠিত আদর্শ ব্যবস্থার বিরুদ্ধাচরণ করা হবে তা কিভাবে গ্রহণযোগ্য? তখন মসজিদই তো ছিলো জ্ঞান চর্চার কেন্দ্র তথা বিদ্যাপীঠ। নবীজি (সঃ) জ্ঞান অর্জনকে প্রত্যেক মুসলমান নর নারীর জন্য ফরজ করেছেন। তিনি মসজিদে নরনারীদের নিয়ে মিলিত ভাবে দীক্ষা দিতেন, নামাজ পড়াতেন, ঈদগাহে নিয়ে যেতেন।(বুখারী শরীফ)।

---

[৮৪]. হুমায়ুন আজাদ ঃ নারী, ২য় সং, ৩য় মুদ্রণ, আগাম প্রকাশণী, ৩৬ বাংলা বাজার, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯২, পৃঃ ১৯।

[৮৫]. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭২।

সে অবস্থায় মসজিদ থেকে মেয়েদের বহিস্কার করার অর্থ হলো তাদেরকে জ্ঞানার্জন ও ধর্ম কর্ম শিক্ষা থেকে বহিস্কার করা। বিবি আয়শার পক্ষে যা মোটেও স্বাভাবিক নয়। অতএব এ হাদিস ও সন্দেহজনক।

তিন. দোজখ পরিদর্শন কালে আমি দোজখের দ্বারে দাঁড়ালাম এবং জানতে পারলাম যে দোজখীদের মধ্যে নারীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ।[৮৬]

যদি নবীজি (সঃ) এরূপ বিষয় দেখে এসেই থাকেন তবে তো মেয়েদের জন্য তা অবধারিত। মেয়েদের আর এবাদতেরই বা প্রয়োজন কি? সৎকর্মে মনোযোগী হবারইবা দরকার কি? দোজখ তো তাদের জন্য নির্ধারিত। আসলে নবীজি (সঃ) কর্তৃক এরূপ বক্তব্য স্বাভাবিক নয়। কারণ এই বক্তব্যে এই আভাসও রয়েছে যে বেহেস্তে পুরুষেরাই সংখ্যা গরিষ্ঠ। তাতে প্রশ্ন থেকে যায়, কোন উৎকৃষ্ট কাজের জন্য অধিক সংখ্যক পুরুষেরা স্রষ্টা কর্তৃক বিশেষ ভাবে পুরস্কৃত হচ্ছেন? জীবন বাজি রেখে স্রষ্টার সৃষ্টিকে সচল রাখতে গিয়ে মানব শিশুকে এই পৃথিবীতে আননয়ন করছে নারীরা, যেই বিষয়ে স্বয়ং পবিত্র কুরআন বলে, ''কত কষ্টে জননী তাহাকে গর্ভে ধারণ করিয়াছে, আর কত কষ্টে সে তাহাকে প্রসব করিয়াছে, তাহাকে ধারণ করা হইতে তাহার দুগ্ধ ত্যাগ পর্যন্ত মুদ্দৎ চলিতে থাকে'' (সুরা লোকমান, আঃ ১৪)। এর পরও নারীরাই দোজখী? আর এর বিন্দুতম কষ্ট ভোগ না করেও পুরুষরাই বেহেস্তী? যেই কষ্ট ও যন্ত্রনার প্রতি লক্ষ্য রেখে মহানবী (সঃ) ও ঘোষণা করেছেন, ''মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের বেহেস্ত'' (ইবনে হাম্বল/ইবনে মাজাহ)। অর্থাৎ পুরুষের বেহেস্ত অর্জনের প্রক্রিয়ায় মায়ের (নারীর) সন্তুষ্টি অন্যতম শর্ত। তথাপিও পুরুষরাই বেহেস্তবাসী? নারীরা নয়? যুগে যুগে নারীরাই তো পুরুষের হাতে নির্যাতিত হয়েছে। নারী জাতিকে এই নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা করাই ছিলো মহানবীর (সঃ) ধর্মীয় সংস্কারের অন্যতম সংস্কার। তিনি নারী জাতিকে নির্যাতনের হাত থেকে মুক্ত করেছিলেন এবং ভবিষ্যতে নারী নির্যাতন থেকে বিরত থাকার জন্য পুরুষদের প্রতি রেখে গেছেন প্রচুর সতর্ক বাণী, আদেশ, নির্দেশ। তন্মধ্যে 'মায়ের পায়ের নীচে সন্তানের বেহেস্ত'(ইবনে হাম্বল/ইবনে মাজাহ) অন্যতম। আর সেই নবীজি (সঃ)ই দোজখে নির্যাতিতদেরই সংখ্যাধিক্য প্রত্যক্ষ করেন? তার পেছনে গ্রহণযোগ্য যুক্তিটি কোথায়?

চার. হযরত জাবের (রঃ) বলেন,- এক ব্যক্তি রসুলুল্লাহর (সঃ) নিকট আসিয়া বলিলঃ হুজুর আমার একটি দাসী আছে, সে আমাদের খেদমত করে। আমি তাহাকে উপভোগ করি। অথচ তাহার গর্ভ ধারণ করাকে আমি পছন্দ করিনা। হুজুর বলিলেনঃ ইচ্ছা থাকিলে আজল করিতে পার।[৮৭]

এই বাক্যে দাসপ্রথা ও ব্যভিচারিত্বের প্রতি নবীজির (সঃ) অনুমোদন দেখানো হয়েছে, যা ইসলাম ধর্মের মৌলিক আদর্শ বিরোধী। নবীজি (সঃ) দাস প্রথাকে নির্মূল করেছেন এবং ব্যভিচারিত্বকে কোন অবস্থাতেই অনুমোদন করেননি। পবিত্র কুরআনে ব্যভিচারিদের কঠোর সাজার নির্দেশ রয়েছে, এমন কি সাজা প্রদান কালে তাদের প্রতি বিন্দুতম দয়া প্রদর্শন না করার নির্দেশ রয়েছে (সুরা নুর আঃ ১,২) এবং পবিত্র কুরআনে দাসীদেরকে মোহর প্রদানের মাধ্যমে বিয়ে করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, কোনরূপ গুপ্ত প্রেমিকা কিংবা প্রকাশ্য ব্যভিচারী হিসেবে তাদের সাথে যে কোন আচরণ নিষিদ্ধ হয়েছে (সুরা নেছা, আঃ ২৪)। বর্তমান ক্ষেত্রে জনৈক ব্যক্তি নিজেকে প্রকাশ্য ব্যভিচারী হিসেবে ব্যক্ত করেছে এবং তাতে নবীজির (সঃ) অনুমোদন দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। তাই পবিত্র কুরআন বিরুদ্ধ এই বক্তব্য হাদিস হতে পারনা।

---

[৮৬]. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭৪।

[৮৭]. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭৮।

পাঁচ. হযরত আবু ছায়ীদ খুদরী (রাঃ) বলেন, আমরা রসুলুলাহর (সঃ) সাথে বনি মুস্তালিক যুদ্ধে বাহির হইলাম এবং তথায় আমরা বহু যুদ্ধ বন্দি লাভ করিলাম। এ সময়ে আমাদের নারী সঙ্গমের আকাংক্ষা জাগিল এবং নারী বিহীন থাকা আমাদের পক্ষে কষ্টকর হইয়া পড়িল, কিন্তু আমরা (যুদ্ধ বন্দিনীদের সাথে) আজল করাকেই পছন্দ করিলাম; আমরা তাঁহাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি বলিলেন, না করিলেও তোমাদের কোন ক্ষতি হইবেনা।[৮৮]

এখানেও অত্যন্ত সুকৌশলে ব্যভিচারিত্বের প্রতি নবীজির (সঃ) অনুমোদন দেখানো হয়েছে, যা পবিত্র কুরআনের সুরা নুরের ১ ও ২ নং আয়াতের বিরোধী। শুধু তাই নয় এখানে অসহায় যুদ্ধবন্দি নারীদের প্রতি যে অবমাননা প্রদর্শিত হয়েছে তাও মহানবীর প্রতিষ্ঠিত আদর্শের বিরোধী। কারণ যুদ্ধবন্দীদের প্রতি বিশেষতঃ নারী বন্দীদের প্রতি নবীজির(সঃ) সদ্ব্যবহারের কথা সর্বজন বিদিত। তিনি প্রথমতঃ তাঁদেরকে সসম্মানে নিজ নিজ আত্মীয়স্বজনদের কাছে ফেরত পাঠাতেন, কেউ স্বেচ্ছায় যেতে অস্বীকৃত হলে সক্ষম মুসলমানদের তাদের বিয়ে করে নিতে হতো। এই ক্ষেত্রেও উক্ত নারীদের নিকট প্রস্তাব করা হতো, তারা রাজি হলেই কেবল বিয়ের ব্যবস্থা হতো।[৮৯] নারীদের মান সম্মান ইজ্জতের প্রতি যাঁর এতটা তীক্ষ্ণ নজর তিনি অনুরূপ অনুমোদন দিয়েছেন, যা পবিত্র কুরআন বিরোধীও বটে তা কিভাবে গ্রহণীয় হতে পারে? এছাড়া ধর্মের জন্য পবিত্র যে জেহাদ সেই জেহাদের ময়দানে এরূপ অশ্লীলতার চর্চা স্বয়ং মহানবী কর্তৃক অনুমোদনের বক্তব্য বুখারী হাদিস হতেই পারেনা। পরবর্তীতে সুকৌশলে এটি সংযুক্ত করা হয়েছে বলে ধরে নেয়া যায়।

এছাড়া হুমায়ুন আজাদ তাঁর ‘নারী’ গ্রন্থে অত্যন্ত দুঃখজনক ভাবে নবীজির (সঃ) উপর ইসলামের শত্রুগণ কর্তৃক চাপিয়ে দেয়া, আরেকটি বিষয় যা বাড়ির ক্রীত দাসীকে নিয়ে ভয়ংকর ও জঘন্য মিথ্যাকে পুনঃ উপস্থাপন করেছেন। এখানে তাঁর ক্রীতদাসী বলতে নবী (সঃ) কর্তৃক কিংবা তাঁর স্ত্রী হাফসা কর্তৃক ক্রয় করা দাসীকে বুঝিয়েছে। কিন্তু মহানবী (সঃ) কিংবা তাঁর বিবিগণের কেউ দাসবৃত্তির জন্য কোন পুরুষ কিংবা নারীকে ক্রয় করেছিলেন এরূপ ঘটনার কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই। যিনি অর্থের বিনিময়ে মানুষ ক্রয়-বিক্রয়কে চিরতরে বন্ধ করেছিলেন, যিনি দাস-দাসী প্রথা সমাজ থেকে নির্মূল করেছিলেন তাঁরই বাড়িতে ক্রীত দাস-দাসীর অস্তিত্বই তো অকল্পনীয় ব্যাপার।

অথচ কি অবলীলায়ই না ইসলামের শত্রুগণ সেই মহানবীর (সঃ) বাড়িতে ক্রীতদাসীর অস্তিত্ব খুজে পেয়েছেন। এটি জঘন্য মিথ্যাচার, ভয়ংকর জালিয়াতি ছাড়া আর কি হতে পারে? মূলতঃ যুগে যুগে ইসলামের শত্রগণ কর্তৃক মহানবীর (সঃ) পুতঃ পবিত্র চরিত্রে কালিমা লেপনের প্রচুর অপচেষ্টা হয়েছে যদিও কখনই তা সার্থক হয়নি। বর্তমান বক্তব্য তার মধ্যে একটি। দুঃখজনক যে হুমায়ুন আজাদের মত একজন স্বনামধন্য লেখক মিথ্যা এবং জাল হিসেবে সহজেই সনাক্তযোগ্য বিষয়টিকে পুনঃ উপস্থাপন করেছেন। [৯০]

অথচ অনুসন্ধিৎসু লেখক হুমায়ুন আজাদ বাস্তবিকই ইসলামের মৌলিক আদর্শগুলো সম্পর্কে কিছুই জানতেনননা- এটি কি গ্রহণযোগ্য?

এই প্রসঙ্গে ডঃ মরিসবুকাইলির উক্তিতে বলতে হয়ঃ ‘‘ইসলাম সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা গড়ে উঠেছে প্রথমতঃ অজ্ঞতার কারনে, দ্বিতীয়তঃ .. .. ইসলামকে সুপরিকল্পিত ভাবে হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে। উল্লেখ্য যে, ধর্মের কোন সত্যি ঘটনা সম্পর্কেও যখন কিছু বলা হয় বা লেখা হয়, দেখা যায়, মিথ্যাচার চলে সেখানে

---

৮৮. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭৮।

৮৯. মোহাম্মদ আকরম খাঁ ঃ মোস্তফা চরিত, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৮।

৯০. হুমায়ুন আজাদ ঃ নারী, , পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩০০-৩২৮।

সবচাইতে বেশী মাত্রায়। অথচ স্বীকার না করে উপায় নাই কোন বিষয়ে প্রদত্ত কোন মতামত অসত্য হলে তা উপেক্ষা করা যেতে পারে; কিন্তু জেনে শুনেই যখন কোন বাস্তব ও সত্য ঘটনা বিকৃত করা হয় তখন তা ক্ষমার অযোগ্য হয়ে দাঁড়ায়। তাই কোন লেখক তাঁর রচনায় যখন ইসলাম সম্পর্কে এ ধরনের অসত্যের বেসাতি করেন, তখন অবশ্যই খারাপ লাগে। আর সেই লেখক যদি সর্বজন স্বীকৃত কোন পন্ডিত ব্যক্তি হন এবং তাঁর সেই রচনা যখন সকল মহলের নিকট সম্মানিত ও গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হতে থাকে, তাহলে সেই খারাপ লাগার মাত্রাটা তখন না বেড়ে পারেনা"।[৯১]

ডঃ মরিস বুকাইলী আরো বলেন, ''এদের মত স্বনামধন্য ব্যক্তি যখন অবলীলায় এ ধরনের অসত্য বক্তব্য পাঠকদের উপহার দেন, তখন ইসলাম ও কোরআন সম্পর্কে সাধারণের মধ্যে ভুল ধারণা গড়ে উঠবে, তাতে আর বিচিত্র কি''? [৯২]

৬.৩.৩ নারীদের কেন্দ্র করে শরীয়ত সংশ্লিষ্ট কতিপয় বিষয়

বর্তমানে শরীয়ত কি এবং কেন তা বোঝার সাথে শরীয়তের বিধানে নারী বিষয়ক কতিপয় বিধিবিধান যা ইতোমধ্যে বিতর্কিত হয়েছে, সেগুলোর উপর কিছু প্রশ্ন উত্থাপন পূর্বক পবিত্র কুরআন এবং তৎসংশিষ্ট হাদিসের আলোকে সেগুলোর উত্তর অনুসন্ধান করা হয়েছে-

১. শরীয়ত কি এবং কেন

প্রথমেই জানা প্রয়োজন **শরীয়ত** কি এবং কেন? সহজভাবে এর উত্তর হলো - ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য পবিত্র কুরআন এবং বিশুদ্ধ হাদিসের আলোকে সংবিধিবদ্ধ বিধিবিধানই হলো- **শরীয়ত**। শরীয়তের বিধান প্রণীত হয়েছে হিজরী দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতাব্দীর চারজন প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদগণ কর্তৃক। তাঁরা হলেন ঈমাম আবু হানিফা (রঃ) (৮০ থেকে ১৫০ হিজরী), ঈমাম মালিক ইবনে আনাস (রঃ) (৯৭ থেকে ১৭৯ হিজরী), ঈমাম শাফেয়ী (রঃ) (১৫০ থেকে ২০৪ হিজরী) এবং ঈমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রঃ) (১৬৪ থেকে ২৪১ হিজরী)। তাঁরা প্রচুর গবেষণা, অনুসন্ধান, অনুশীলনের মাধ্যমে তৈরী করেছেন এই সব বিধান। যার ভিত্তি হলো ঐশী গ্রন্থ পবিত্র কুরআন ও তৎসংশ্লিষ্ট হাদিস এবং ক্ষেত্র বিশেষে ইজমা, কিয়াস এবং ইজতেহাদ। যেহেতু পবিত্র কুরআন ঐশী এবং তা বিবর্তনশীল নয়, তাই এরূপ একটি দাবীও রয়েছে যে, শরীয়তের বিধানও ঐশী এবং বিবর্তনশীল নয়। আরও একটি দাবী এরূপ যে,উল্লেখিত চার ঈমামের পরবর্তীতে তাঁদের মত সুচিন্তিত বিশুদ্ধ ইজতেহাদ তথা চিন্তা-চেতনা সম্ভব নয়, তাই চার ইমামের পর ইজতেহাদের পথও বন্ধ।

২. শরীয়তের বিধান এবং এর মূল গ্রন্থ

অতঃপর প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক যে, ঠিক আছে, আর ইজতেহাদ নয় প্রখ্যাত সেই চারজন ঈমামের প্রণীত সেই মূল আইন বইগুলো কোথায়? অর্থাৎ ঈমাম আবু হানিফা সহ অন্যান্য ঈমামগণ কর্তৃক পবিত্র কুরআনের আলোকে সংবিধিবদ্ধ মূল আইন বইগুলোর কোন অস্তিত্ব আছে কি? জানা যায় প্রচুর পরিশ্রম, ব্যাপক গবেষণা, সূক্ষাতিসূক্ষ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রণীত সেই গ্রন্থগুলোর অস্তিত্বই নাকি আজ আর নেই । এই চার ঈমামের অন্যতম ঈমাম হলেন - ঈমাম আবু হানিফা। যিনি প্রণয়ন করেছিলেন ইসলামী আইনের

[৯১]. ডঃ মরিস কুকাইলী ঃ বাইবেল কোরআন ও বিজ্ঞান,(রূপান্তর-আখতার -উল-আলম) পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৭৪।

[৯২]. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৯০।

বিশ্বকোষ। তিনি তাঁর বিশিষ্ট ৪০ জন ছাত্রকে নিয়ে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করে দিনের পর দিন অবিশ্রান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে, বাস্তব প্রশ্নাবলীর উপর ব্যাপক গবেষণা, ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ, তর্ক বিতর্ক, পূর্ণ এবং স্বাধীন মতামত বিনিময়ের মাধ্যমে উপনীত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে দীর্ঘ ত্রিশ বছরের অবিরাম সাধনায় প্রণয়ন করেছিলেন ইসলামী আইনের বিরাট বিশ্বকোষ। এই আইন গ্রন্থ প্রণয়ন কালে তিনি পবিত্র কুরআন এবং তার মূলনীতি, ইজমা ও ব্যক্তিগত বিচার বুদ্ধির উপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন, তিনি মাত্র ১৮টি হাদিসকে প্রমাণসিদ্ধ এবং আইনের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন।[৯৩]

দুর্ভাগ্য যে এই অমূল্যরত্ন খানি নাকি হারিয়ে গিয়েছে। দুঃখ করে স্যার আবদুর রহিম বলেন, ''ইসলামী আইনতত্ত্বের চরম দুর্ভাগ্য যে, আইনের এই বিশ্ব-কোষ হারাইয়া গিয়াছে। ইহা খুজিয়া পাওয়া যায় নাই''।[৯৪] এবং এ যাবত ঈমাম আবু হানিফার যে দুইখানি রচনার সন্ধান পাওয়া গিয়েছে তার একখানি মাসনদ-ই-ইমাম আবু হানিফা - যা হাদিসের একখানি সংক্ষিপ্ত সংকলন, অন্যখানি তাঁর প্রিয় শিষ্য তৎকালীন কাজী আবু ইউসুফকে প্রদত্ত একখানা উপদেশ পত্র মাত্র। একই অবস্থা ঘটেছে অন্য ঈমামদের ক্ষেত্রেও। কারণ, ঈমাম মালিকের আল মুয়াত্তা নামীয় তিনশত হাদিসের একখানা সংকলন ব্যতীত অন্য কোন আইন গ্রন্থের অস্তিত্ব সম্পর্কে জানা যায় নাই। ঈমাম আহমদ ইবনে হাম্বল প্রণীত মুসনাদুল ঈমাম হাম্বল নামীয় পঞ্চাশ সহস্র হাদিসের সংকলন ব্যতীত তাঁর প্রণীত কোন আইন গ্রন্থের সন্ধান মেলেনা। কেবলমাত্র ঈমাম শাফেয়ী (রঃ) প্রণীত ইলমুল নামীয় একখানি আইন গ্রন্থের নাম জানা যায়, যার বাস্তব ব্যবহারের কোন প্রমাণ মেলেনা। স্যার আবদুর রহিম বলেছেন যে, ''তবে তাহাদের প্রবর্তিত মযহাব কালের গর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে'' এবং ''অতঃপর এ যাবত যাহা করা হইয়াছে এবং হইতেছে তাহা এই ঈমামদের প্রবর্তিত আইনের টিকা বা ভাষ্য মাত্র''।[৯৫]

৬.৩.৪ শরীয়তের নামে প্রচলিত কয়েকটি বিধান এবং নারীদের অবস্থান

তাহলে, যেখানে মূল গ্রন্থই বিলীন এবং যা চলছে যুগ যুগ ধরে টিকাকার ও ভাষ্যকারদের টিকা আর ভাষ্যের উপর অর্থাৎ যা পরিবর্তন, পরিবর্ধন এবং বিবর্তনের প্রক্রিয়ার মধ্যেই বিদ্যমান, তাকে অপরিবর্তনীয়, অখন্ডনীয় এবং বিবর্তনশীল নয়, এরূপ দাবীর যৌক্তিকতা কোথায়? লক্ষ্যনীয় যে, নারী সংক্রান্ত শরীয়তের প্রচলিত বিধানাবলীর কতিপয় ক্ষেত্রে এমন কিছু বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে যা পবিত্র কুরআন এবং তৎসংশ্লিষ্ট বিশুদ্ধ হাদিসের সাথে সম্পৃক্ত নয় - পবিত্র কুরআন এবং বিশুদ্ধ হাদিস পর্যালোচনায় তা প্রমাণ করা মোটেও কঠিন কাজ নয়। নীচে এক এক করে তার কয়েকটি বিষয় পর্যালোচনা করা হ'ল –

১. রজম বা পাথর মেরে হত্যা (Stoning of death)

এটি আমাদের শরীয়তের একটি অন্যতম বিধান। দেশ বিদেশ জুড়ে, স্বধর্মী এবং ভিন্ন ধর্মাবলম্বী দ্বারা শরীয়তের যে বিধানটি সর্বাধিক সমালোচিত সেটিও হচ্ছে ব্যভিচারিত্বের অপরাধে পাথর মেরে মারার- এই বিধান। এই বিধান অনুসারে ব্যভিচারী নারী- পুরুষ বিবাহিত হলে কোমর পর্যন্ত মাটিতে পুঁতে দূর থেকে পাথর মেরে মারার এবং অবিবাহিতদের ক্ষেত্রে দোররা (বেত) মেরে শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে। বিধানটি অত্যন্ত কঠোর এবং নিষ্ঠুর। এই বিধান প্রয়োগের ক্ষেত্রে এমনই একটি ফাঁক ফোঁকর সৃষ্টি হয়েছে

---

[৯৩]. আসফ এ ফৈজী ঃ ইসলামী আইন, (অনুসৃতিঃ গাজী শামছুর রহমান), ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ২য় সং, ১৯৮৫, পৃঃ ১৬ এবং স্যার আব্দুর রহিম ঃ ইসলামী আইন তত্ব, (অনুসৃতিঃ গাজী শামছুর রহমান),পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৬।

[৯৪]. স্যার আব্দুর রহিম ঃ ইসলামী আইন তত্ব, (অনুসৃতিঃ গাজী শামছুর রহমান),পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৮।

[৯৫]. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩২।

যার কারণে এই নিষ্ঠুরতা কেবল মাত্র নারীদের উপরেই প্রয়োগের এবং পুরুষদের রেহাই পাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। সেই ফাঁক হলো এখানে চারজন প্রত্যক্ষদর্শী পুরুষ সাক্ষীর প্রয়োজন হয়, তবে গর্ভ ধারণের কারণে নারী নিজেই সাক্ষী হিসেবে উদ্ভুত হয়। আবার এখানে ধর্ষণ ও ব্যভিচারিত্বের মধ্যে পার্থক্য করার কোন ব্যবস্থা নেই। ফলে ব্যভিচারী পুরুষ এবং ধর্ষণকারী পুরুষ সহজে পার পেয়ে যায়। ফলতঃ বেশীরভাগ ক্ষেত্রে এই শাস্তি প্রয়োগ হয় এক চেটিয়া নারীদের উপর। যার কারণে ইসলাম ধর্ম নারীদের প্রতি অত্যন্ত নিষ্ঠুর - এই প্রচারণা ছড়ানো যাচ্ছে সহজেই।

যেমন তসলিমা নাসরিন পবিত্র কুরআনকে বিন্দুমাত্র পর্যালোচনা না করেই এ সম্পর্কে বলেন, ''ব্যভিচার, বিবাহ পুর্ব যৌনাপরাধ, ধর্ষণ ও বেশ্যাবৃত্তিকে জেনা বলা হয়। অর্থাৎ পরস্পরের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক নেই এমন দু'জন নরনারীর মধ্যে যৌন মিলন ঘটলেই জেনা সংঘটিত হয় .. .. জেনার সর্বোচ্চ শাস্তি হদ, যা বিবাহিত ব্যক্তির ক্ষেত্রে পাথর মেরে মৃত্যু এবং অবিবাহিত ব্যক্তির ক্ষেত্রে একশত বেত্রাঘাত। হদের জন্য প্রয়োজন চারজন পুরুষ মুসলমান সাক্ষ্য। .. .. এটা খুবই অস্বাভাবিক যে, কোন পুরুষ চারজন পুরুষের সামনে ধর্ষণ করে এবং তারা সাক্ষ্য দেয়। চারজন নারীর সামনে একজন নারীকে ধর্ষণ করার ঘটনা ঘটতে পারে কিন্তু সাক্ষ্য দিলে সর্বোচ্চ শাস্তি হদ প্রযোজ্য হয়না। এবং আইনের বিধান অনুযায়ী ধর্ষণকারী রক্ষা পায়। নারী গর্ভ ধারণ করলে ব্যভিচারের অভিযোগে অভিযুক্ত হয়। অথচ যে পুরুষের দ্বারা গর্ভ সঞ্চার হয় সে রেহাই পেয়ে যায়। জারজ সন্তান জন্ম দেবার জন্য অনেক নারীকে বেত্রাঘাত, জেল ও জরিমানার শাস্তি দেওয়া হয় কিন্তু কোনও পুরুষ জারজের জন্মদাতা হবার অপরাধে শাস্তি পায় না। কারণ গর্ভ ধারণের মত জলজ্যান্ত প্রমাণ তাদের থাকেনা। এই হুদুদ অধ্যাদেশ ব্যভিচার ও ধর্ষনের মধ্যে এক ধরনের বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে ফলে কোন নারী নিজের উদ্যোগে ধর্ষনের অভিযোগ করলে নারী নিজে ব্যভিচারের শাস্তি ভোগ করে। আর ধর্ষণকারী সাক্ষ্য প্রমানের অভাবে মুক্তি লাভ করে''।[৯৬]

এই বিষয়ে পবিত্র কুরআন পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, সেখানে বলা হচ্ছে, ''ব্যভিচারী নারী এবং ব্যভিচারী পুরুষ তাহাদের প্রত্যেককে একশত দুররা লাগাও এবং আল্লাহ্‌তায়া'লার বিধান পালনে তাহাদের উভয়ের প্রতি তোমাদের মনে কণা মাত্র দয়া আসা উচিৎ নয়। যদি তোমরা আল্লা তায়া'লার প্রতি এবং কিয়ামত দিবসের প্রতি ঈমান রাখ। এবং উভয়ের শাস্তি প্রদান কালে মুসলমানদের একদল লোক উপস্থিত থাকা বাঞ্চনীয়'' (সুরা নূর আঃ ০২)। অর্থাৎ ব্যভিচারী নারী এবং পুরুষকে প্রকাশ্যে জনসমক্ষে একশত দুররা তথা বেত্রাঘাত প্রদানই পবিত্র কুরআনের বিধান। একই সুরার ৪নং আয়াতে আল্লা পাক বলেন, ''যারা সতীসাধ্বী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে অতঃপর চারজন সাক্ষী হাজির না করে তাদের আশি দুররা লাগাও, কখনও তাদেরকে সাক্ষী হিসেবে গ্রহণ করোনা''। এখানে অত্যন্ত চমৎকার ভাবে পবিত্র কুরআন নারীজাতির সম্ভ্রম রক্ষা করেছে। কোন নারীকে অপবাদ প্রয়োগের মাধ্যমে ব্যভিচারীর সাজা প্রদানের কোন সুযোগ তো নাই-ই বরং নারীর প্রতি মিথ্যা অপবাদকারীকে ৮০টি বেত্রাঘাত প্রদানের নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং অপবাদকারীদেরকে সাক্ষী হিসেবে অযোগ্য ঘোষণা করতে বলা হয়েছে।

একই সুরার ৩৩নং আয়াতে আল্লাহ্‌পাক বলেন, ''বল প্রযুক্ত হওয়ার পর বল প্রযুক্তকারির (নারীর) প্রতি আল্লাহ্ পাক ক্ষমাশীল'' - পবিত্র কুরআনে এখানেই ধর্ষণ তথা বল প্রয়োগে যৌনতার সাথে ব্যভিচারের পার্থক্য করা হয়েছে। অর্থাৎ ধর্ষণ বা বল প্রয়োগে যৌনতার শিকার নারীর প্রতি আল্লাহ্ ক্ষমাশীল। পক্ষান্তরে প্রচলিত শরীয়তের বিধানে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ প্রদত্ত উল্লেখিত নির্দেশ সমূহ যথাযথ অনুসরণ না করার

[৯৬]. তসলিমা নাসরিনঃ নির্বাচিত কলাম, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪২।

Dhaka University Institutional Repository

কারণে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বল প্রয়োগ হলো যার উপর, সেই বল প্রযুক্তকারীই শাস্তি পাচ্ছেন আর যিনি বল প্রয়োগ করলেন সেই বল প্রয়োগকারী ছাড়া পেয়ে যাচ্ছেন।

আরও আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে পাথর মেরে মারার বিধান বলতে কোন বিধানই পবিত্র কুরআনে নেই। তা সত্বেও আমাদের শরীয়তে পাথর মেরে মারার বিধান এসেছে। পবিত্র কুরআনে বিবাহিত এবং অবিবাহিতদের ক্ষেত্রে সাজার পার্থক্যও নেই। অথচ প্রচলিত শরীয়তের বিধানে সেই পার্থক্যও করা হয়েছে। এরূপ অবস্থায় পাথর মেরে ব্যভিচারিত্বের সাজা সংক্রান্ত শরীয়তের বিধান সম্পর্কে যে তিনটি বিষয়ের সুরাহা প্রয়োজন, সেগুলো হ'ল-

(ক) পবিত্র কুরআনে না থাকা সত্বেও এই বিধানে বিবাহিত অবিবাহিত ভাগ করা হলো কেন?
(খ) রজম বা পাথর মেরে মারার (Stoning of death) বিধান এলো কোত্থেকে?
(গ) ব্যভিচার ও ধর্ষনের ক্ষেত্রে পার্থক্যের কোন ব্যবস্থা নেই কেন?

এই বিষয়ে তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন' পর্যালোচনায় দেখা যায় এর ষষ্ঠ খন্ডে সুরা নুরের ০১ এবং ০২ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় রজমের পক্ষে একটি হাদিস এবং হযরত ওমরের একটি ভাষণের উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে। হাদিসটি এরূপ, ''রসুলুলাহ (সঃ) বলেন, আমার কাছে থেকে জ্ঞান অর্জন কর, আল্লাহ্‌তা'য়ালা ব্যভিচারী পুরুষ ও নারীর জন্য সুরা নিসায় প্রতিশ্রুত পথ সুরা নুরে বলে দিয়েছেন, তা এই যে, অবিবাহিত পুরুষ ও নারীর জন্য একশ কশাঘাত ও এক বছরের নির্বাসন এবং বিবাহিত পুরুষ ও নারীর জন্য একশ কষাঘাত ও প্রস্তরাঘাতে হত্যা'' (ইবনে কাসীর)।[৯৭]

ইতোপুর্বে হাদিস বিশুদ্ধকরণ প্রক্রিয়ায় জ্ঞানী মুহাদ্দিস, ঈমামগণ কর্তৃক সর্বশেষ উদ্ভাবিত যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির তথা দিরায়াৎ পদ্ধতির উল্লেখ করা হয়েছে, তাতে হাদিস বিশুদ্ধ করণের প্রথম শর্তটিই হলো- বক্তব্যে পবিত্র কুরআনের সুস্পষ্ট নির্দেশের বিপরীত বক্তব্য রয়েছে কিনা, তা যাচাই করা। উপরে উল্লেখিত হাদিসটিতে পবিত্র কুরআনে সুরা নুরের ০১ ও ০২ নং আয়াতের স্পষ্ট বক্তব্যের অতিরিক্ত বিষয় সংযোজিত রয়েছে। তাহলো- বিবাহিত অবিবাহিতের মধ্যে সাজার ভিন্নতর প্রকৃতি নির্ধারণ, দেশান্তর এবং প্রস্তরাঘাতে হত্যা। এখন প্রশ্ন হলো পবিত্র কুরআনের স্পষ্ট আয়াতের উপর বর্ধিত সংযোজন সংক্রান্ত উল্লেখিত হাদিসটি কতখানি গ্রহণযোগ্য? এই প্রসঙ্গে মওলানা আকরাম খাঁ বলেন, ''হাদিসের দ্বারা কোরআনের কোন আয়াতকে রহিত করা বৈধ হতে পারেনা, কারণ হাদিস হযরত মোহাম্মদ মোস্তফার (সঃ) উক্তি বা কর্মের ঐতিহাসিক বিবরণ ছাড়া আর কিছু নহে। আর হযরত (সঃ) আসিয়াছিলেন দুনিয়ায় আল্লাহর আহকামকে মানব সমাজে প্রবর্তিত করার জন্য, সুতরাং হযরতের (সঃ) উক্তি বা কর্ম আল্লাহ্‌র ফরমানের বিপরীত বা বিরোধী হইতেই পারেনা- হইতে পারে তাহার পরিপূরক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ। হযরত (সঃ) পুনঃপুন কোরআনের ভাষায় ঘোষণা করিতেছেন- 'আমি তো কেবল অনুসরণ করিয়া চলি, সেই সব বিষয়ের যাহা আমার প্রতি অহী করা হয়, আমার পরওয়ারদেগারের হুজুর হইতে' (সুরা আরাফ আঃ ২০৩, সুরা আনআম আঃ ৫০, ১০৬ প্রভৃতি)। আল্লাহ জেনাকার নর নারীর জন্য মাত্র দোররা মারার হুকুম দিতেছেন, আর আল্লাহ্‌র রসুল সে হুকুম রদ করিয়া তাহাদিগকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করার নির্দেশ দিচ্ছেন এরূপ ব্যাপার ঘটতে পারেনা''।[৯৮]

---

[৯৭]. হযরত মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ,শফী (রহঃ) ঃ তফসীরে মা'আরেফুল কুরআন,ষষ্ঠ খন্ড,(অনুবাদঃ মুহিউদ্দিন খান), ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ২য় সং, ১৯৮৬, পৃঃ ৪২৩।

[৯৮] মোহাম্মদ আকরম খাঁ ঃ সরল বাংলা অনুবাদ ও বিস্তারিত তাফসীর সহ কোরআন শরীফ, প্রথম খন্ড, পূর্বোক্ত , পৃঃ ৬০২।

এই প্রেক্ষিতে সুরা আরাফ ও সুরা আনআমের যথাক্রমে ২০৩, ৫০ ও ১০৬ নং আয়াত সমূহে আল্লাহপাকের নির্দেশ দেখা যেতে পারে। সেগুলো যথাক্রমে ''.. .. আপনি বলে দিন, আমি তো সে মতই চলি, যে হুকুম আমার নিকট আসে আমার পরওয়ার দিগারের কাছ থেকে'' (আঃ ২০৩, সুরা আরাফ)। ''আপনি বলুন, ... আমি তো শুধু ঐ ওহীর অনুসরণ করি, যা আমার কাছে আসে'' (আঃ ৫০, সুরা আনআম)। ''আপনি সেই পথ অনুসরণ করুন, যার আদেশ আপনার পালন কর্তার পক্ষ থেকে আসে' (আঃ ১০৬, সুরা আনআম)। - এরূপ অবস্থায় মহানবী (সঃ) কর্তৃক পবিত্র কুরআন বহির্ভুত বিবাহিত-অবিবাহিত ভাগ, রজম ও দেশান্তর এরূপ তিন তিনটি বর্ধিত সংযোজন যুক্ত বক্তব্য প্রদানের সুযোগ কোথায়?

আর সেজন্যই মওলানা আকরম খাঁ সুরা নুরের ০১ ও ০২ নং আয়াত প্রসঙ্গে জোরের সাথে বলেন, ''জেনার দন্ড বিধান সম্পর্কে ইহাই কোরআনের চরম নির্দেশ। এই আয়াতে বিবাহিত অবিবাহিত বলিয়া কোন প্রভেদ করা হয় নাই, এবং রজম (Stoning of death) সম্বন্ধে সামান্য কোন আভাষ ও দেওয়া হয় নাই''।[৯৯]

রজম বা (Stoning of death) প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত মুসলিম শরীফ দৃষ্টে হযরত ওমরের যে ভাষণটি তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআনে ব্যবহৃত হয়েছে তা নিম্নরূপ; ''.. .. হযরত ওমর ফারুক(রাঃ) রসুলুলাহ (সঃ) এর মিম্বরে উপবিষ্ট অবস্থায় বললেনঃ আল্লাহ্তায়ালা মুহম্মদ (সঃ) কে সত্যসহ প্রেরণ করেন, এবং তাঁর প্রতি কেতাব নাযিল করেন। কিতাবে যে সব বিষয় অবতীর্ন হয়, তন্মধ্যে প্রস্তরাঘাতে হত্যার বিধানও ছিলো, যা আমরা পাঠ করেছি, স্মরন রেখেছি এবং হৃদয়াঙ্গমও করেছি। অতঃপর রসুলুলাহ (সঃ) ও প্রস্তরাঘাতে হত্যা করেছেন এবং তারপরে আমরাও করেছি। এখন আমি আশংকা করছি যে, সময়ের চাকা আবর্তিত হওয়ার পর কেহ একথা বলতে না শুরু করে যে, আমরা প্রস্তরাঘাতে হত্যার বিধান আল্লাহ্র কিতাবে পাইনা, ফলে সে একটা ধর্মীয় কর্তব্য পরিত্যাগ করার কারণে পথ ভ্রষ্ট হয়ে যাবে, যা আল্লাহ্ নাযেল করেছেন। মনে রেখ, প্রস্তরাঘাতে হত্যার বিধান আল্লাহ্র কিতাবে সত্য এবং বিবাহিত পুরুষ ও নারীর প্রতি প্রযোজ্য যদি ব্যভিচারের শরীয়ত সম্মত সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থিত হয় অথবা গর্ভ ও স্বীকারোক্তি পাওয়া যায়''।[১০০]

আবার নাসায়ী শরীফ দৃষ্টে তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআনে এই রেওয়ায়েত এরূপ- ''শরীয়তের দিক দিয়ে আমরা ব্যভিচারের শাস্তিতে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করতে বাধ্য। কেননা এটা আল্লাহ্র অন্যতম হদ। মনে রেখ, রসুলুল্লাহ (সঃ) রজম করেছেন এবং তারপরে আমরাও রজম করেছি। যদি এরূপ আশংকা না থাকতো যে লোকে বলবে ওমর আল্লাহ্র কিতাবে নিজের পক্ষ থেকে সংযোজন করেছে তবে আমি কোরআনের এক প্রান্তে এটা লিখে দিতাম। উমর ইবনে খাত্তাব, আবদুর রহমান ইবনে আউফ এবং অমুক অমুক সাক্ষী যে রসুলুলাহ (সঃ) রজম করেছেন এবং তার পরে আমরা রজম করেছি'' (ইবনে কাসির)।[১০১]

হযরত ওমরের ভাষণ বলে কথিত উল্লেখিত বক্তব্য দু'টি হাদিস গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত হলেও উভয় বক্তব্যের বিষয়বস্তু এক- রজম (Stoning of death) এর প্রতিষ্ঠা। প্রথম ভাষণটি পর্যালোচনায় দেখা যাচেছ, হযরত ওমর নিশ্চিত ভাবে জানাচ্ছে যে, কিতাবে তথা কুরআনে যে সব বিষয় অবতীর্ন হয়েছে তন্মধ্যে প্রস্তরাঘাতে হত্যার বিধানও ছিলো- যা তাঁরা পাঠ করেছেন, স্মরণ রেখেছেন এবং হৃদয়াঙ্গম করেছেন। অথচ হযরত

[৯৯].পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬০১-৬০২।

[১০০].হযরত মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ,শফী (রহ্ঃ) ঃ তফসীরে মা'আরেফুল কুরআন,ষষ্ঠ খন্ড,(অনুবাদঃমুহিউদ্দিন খান), পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪২৫।

[১০১]. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪২৫।

ওমরই আশংকা করছেন যে, সময়ের চাকা আবর্তিত হওয়ার পর কেউ এরূপ কথা বলতে না শুরু করে যে প্রস্তরাঘাতে হত্যার বিধান আল্লাহ্‌র কিতাবে পাইনা।প্রশ্ন হলো, হযরত ওমরের অনুরূপ আশংকার কারণ কি?

হযরত ওমরের সময়কাল পর্যন্ত তো পবিত্র কুরআন লিপিবদ্ধই হয়নি, তা ছড়ানো ছিটানো অবস্থায়, হাফেজদের কন্ঠে কন্ঠে এবং মহানবী (সঃ) কর্তৃক সাজিয়ে রাখা একখন্ড তাঁর স্ত্রী বিবি হাফসা, যিনি হযরত ওমরেরই কন্যা ছিলেন তাঁর কাছে রক্ষিত ছিলো। এরূপ বিধান অবতীর্ন হয়ে থাকলে সেই বিধান মাফিক রজম কার্যকর করে যাওয়াই তো তাঁর জন্য স্বাভাবিক ছিলো। ভবিষ্যত প্রজন্ম কর্তৃক সন্নিবেশিত কোরআন যারা পাঠ করবে তাতে রজমের বিধান থাকবেনা তার জন্য আগাম আশংকাজনক একটি ভাষণ অবাস্তব নয়কি?

একথা সর্বজন বিদিত যে, হযরত ওমরের মৃত্যুর পর হযরত ওসমান খোলাফায়ে রাশেদীনের তৃতীয় খলিফা নির্বাচিত হন এবং হযরত ওসমানের আমলেই পবিত্র কুরআন বর্তমানে যে আকারে পাঠ করা হয়, সে ভাবে সন্নিবদ্ধ হয়েছে। সেখানে রজম বা পাথর মেরে হত্যা সংক্রান্ত কোন বিধান নেই।

প্রশ্ন হলো হযরত ওমর কিভাবে বুঝেছিলেন যে, তাঁর জীবনাবসানের পর যে কুরআন সন্নিবদ্ধ হবে তাতে উল্লেখিত আয়াতটি থাকবেনা? এবং হযরত ওমর যদি অনুরূপ একটি ভাষণ দিয়েই থাকবেন তবে পরবর্তী কালে হযরত ওসমান উক্ত আয়াতটি খুজে বের করে পবিত্র কুরআনে সন্নিবেশ করলেন না কেন? একথা ও তো সর্বজনবিদিত যে পবিত্র কুরআন সন্নিবেশ কালে হযরত ওসমান তৎকালীন শ্রেষ্ঠ জ্ঞানীগুণিজনদের দিয়ে কমিটি করিয়েছিলেন, যাঁরা সমস্ত আয়াত সমূহ একত্রিত করে দফায় দফায় হাফেজদের দ্বারা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে নবী পত্নি বিবি হাফসার কাছে রক্ষিত, নবী করিম (সঃ) কর্তৃক সংরক্ষিত কুরআনকেই আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে তারই আলোকে পবিত্র কুরআন সন্নিবেশ করেছেন। এরূপ অবস্থায় হযরত ওমর একটি আয়াত সম্পর্কে বলে গেলেন অথচ হযরত ওসমান তা খুঁজে বের করে পবিত্র কুরআনে সন্নিবেশ করালেননা এটি কিভাবে গ্রহণযোগ্য? এবং হযরত ওসমানের আমলে সন্নিবেশিত কুরআনে আয়াতটি লিপিবদ্ধ হবেনা ফলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এতে সন্দেহ পোষণ করবে এই বিষয়টিও হযরত ওমর আগাম জেনে গিয়ে একটি ভাষণ রেখে গেলেন এটিই বা কিভাবে বিশ্বাস্য? অর্থাৎ ভাষণে মারাত্মক কাল বিভ্রাট রয়েছে। অর্থাৎ ভাষণে হযরত ওমরের সময়কাল এবং হযরত ওমরের পরবর্তী কালের সমন্বয় সাধিত হয়েছে। যারা এই ভাষণকে সঠিক ও যথার্থ বলতে চান তাদের নিকট কি বক্তব্যের এই মারাত্মক কাল বিভ্রাট নজরে পড়েনি? তাই প্রশ্ন হযরত ওমর আদৌ এরূপ ভাষণ দিয়েছিলেন কিনা?

উল্লেখিত বক্তব্যের উপর দ্বিতীয় ভাষণটিও একইরূপ। এখানে হযরত ওমর আশংকা করছেন যে, যদি এরূপ আশংকা না থাকতো যে, লোকে বলবে ওমর আল্লাহ্‌র কিতাবে নিজের পক্ষ থেকে সংযোজন করেছেন, তবে তিনি কুরআনের এক প্রান্তে এটা লিখে দিতেন। এখানেও সেই কাল বিভ্রাট। হযরত ওমর কোন কুরআনের প্রান্তে বিষয়টি লিখে দিতে চেয়েছিলেন? যে কুরআন বর্তমানে পাঠ করা হয় তাতো সন্নিবেশিত হয়েছে হযরত ওমরের মৃত্যুর পর। হযরত ওসমানের আমলে। হযরত ওমর নিজ মৃত্যুর পর সন্নিবেশিত কুরআনের প্রান্তে কিছু লিপিবদ্ধ করার ইচ্ছা কিভাবে করবেন? এবং এটা কি সত্য নয় যে হযরত ওমরের মত কঠিন ব্যক্তিত্বের মানুষ, অনুরূপ একটি আয়াত সত্যিই বিদ্যমান থাকলে তা পবিত্র কুরআনে সংযোজনের ক্ষেত্রে লোক নিন্দাকে তোয়াক্কা করতেন না? আবারও প্রশ্ন হলো, হযরত ওমরের অনুরূপ একটি ভাষণ বিদ্যমান থাকা সত্বেও হযরত ওসমান উক্ত আয়াতটি খুজে বের করে তা কুরআনে লিপিবদ্ধ করাননি কেন?

অর্থাৎ কোন ভাবেই পাথর মেরে মারার বিধান সংক্রান্ত আয়াত পবিত্র কুরআনে লিপিবদ্ধ হয়নি। তাই এরূপ সন্দেহ কি অমূলক যে, হযরত ওমর আদৌ অনুরূপ কোন ভাষণ দিয়েছিলেন কিনা? নাকি তা পরবর্তীকালের টিকাকার ভাষ্যকারদেরই উদ্ভাবন, যা হযরত ওমরের উপর চাপানো হয়েছে? এর জবাব পাওয়া কঠিন।

রজম এর প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনের সুরা মায়েদার ৪৩ নং আয়াত এবং এ সম্পর্কে তাফসীরে মা'আরেফুল কোরআন এর ব্যাখ্যা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। সুরা মায়েদার ৪৩ নং আয়াতটি হলো, ''তারা আপনাকে কিভাবে বিচারক নিয়োগ করবে অথচ তাদের কাছে তওরাত রয়েছে তাতে আল্লাহ্‌র নির্দেশ আছে। অতঃপর এরা পেছন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তারা কখনো বিশ্বাসী নয়।'' সুরা মায়েদার ৪২ ও ৪৩ নং আয়াতদ্বয়ের শানেনযুল সম্পর্কে তাফসীরে মা আ'রেফুল কোরআনে ইহুদী সম্প্রদায় কর্তৃক নবী করিম (সঃ) কে দিয়ে একটি হত্যার ঘটনা ও একটি ব্যভিচারের ঘটনার বিচার করানোর প্রসঙ্গে নাজেল মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ এই ইহুদীরা ইসলামের 'ন্যায়-বিচার ও সাধারণ সহজ বোধ্যতা নিরীক্ষণ করতো' এবং 'তারা জানতো যে ইসলামে মাসয়ালা-মাসায়েলের ক্ষেত্রে অনেক নমনীয়তা আছে'। ব্যভিচারের একটি ঘটনার প্রেক্ষিতে ইহুদীরা যখন অপরাধীদের নিয়ে নবী করিমের (সঃ) নিকট এলেন এবং তাঁর বিচার মেনে নেয়ার অঙ্গীকার করলেন, তখনই জিব্রাঈল(আঃ) নির্দেশ নিয়ে অবতরন করলেন যে, তাদেরকে প্রস্তর বর্ষনে হত্যা করতে হবে এবং এই বিষয়ে বিশিষ্ট ইহুদী আলেম ইবনে সুরিয়াকে জিজ্ঞাসাবাদের পরামর্শ দিলেন। ইবনে সুরিয়া জানালেন যে, তওরাতে এরূপ অপরাধীদের পাথর মেরে হত্যার বিধান রয়েছে। এবং ইবনে সুরিয়া নবীজিকে জানান যে, তাদের সম্প্রদায়ের প্রভাবশালী ব্যক্তিকে তওরাত বহির্ভূত লঘু শাস্তি প্রদানের উদ্দেশ্যই ইহুদীদের মনে ছিল।[১০২] এই বর্ণনা থেকে এটি প্রমাণিত যে, পাথর মেরে মারার বিধান কুরআনের নয়-তওরাতের। কারণ যদি ওটা কুরআনেরই বিধান হতো তবে কেন জিব্রাঈল (আঃ)কে এসে নবীজিকে (সঃ) তওরাতের অনুসরনে পাথর মেরে শাস্তি প্রদানের পরামর্শ দিতে হলো? আরও লক্ষ্যনীয় যে, ইহুদীরা কিন্তু ইসলাম ধর্মের নমনীয় বিধানের কথা জেনেই তাদের প্রভাবশালী ব্যক্তিকে লঘু শাস্তি প্রদানের উদ্দেশ্যেই মহানবীর(সঃ) কাছে বিচার প্রার্থী হয়েছিলেন।

সবচেয়ে বড় কথা হলো, বর্তমানে আমরা যেই কুরআন পাঠ করি তাতে রজম এর বিধানটি নেই। এই কুরআন হযরত ওসমানের আমলে সন্নিবেশিত কুরআন। এর আগে কুরআন সন্নিবেশের কাজটি হয়নি। এই বিষয়েতো সকলেই একমত যে, হযরত ওসমান যেই প্রচন্ড সতর্কতার সাথে কুরআন সন্নিবেশ করিয়েছিলেন তাতে কোন আয়াতই বাদ পড়েনি, পড়ার কথাও নয়। এবং এই কুরআনেই ব্যভিচারী নারী- পুরুষকে পাথর মেরে মারার কোন বিধান নেই, আছে প্রকাশ্যে একশত দুররা মারার বিধান।

এখন প্রশ্ন হলো, পবিত্র কুরআনে নেই, এই যুক্তিতে ব্যভিচারী নারী- পুরুষকে পাথর মেরে মারার বিধান বাদ দিয়ে শুধু মাত্র দুররা মারার বিধানে বিদ্যমান থাকলে গুনাহগার হওয়ার কোনই সম্ভাবনা আছে কি? পবিত্র কুরআনের স্পষ্ট আয়াতের বিরুদ্ধে যাওয়া কি সম্ভব? এই ক্ষমতা তো মহানবীকেও (সঃ) আল্লাহ্‌পাক দেননি। এমতাবস্থায় গুরুতর কাল- বিভ্রাট জনিত কিছু বক্তব্যের আলোকে তৈরী একটি বিধান বলে যুগ যুগ ধরে যে ভয়ংকর কর্ম সাধিত হয়েছে এবং হচ্ছে যদি তা সত্যিই আল্লাহপাকের অভিপ্রায় না হয়ে থাকে তবে তার জবাব কি? যাতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে ও হচ্ছে অসহায় নারী সম্প্রদায়। কারণ গর্ভ ধারনের ফলে নারীর বিষয়টি প্রমাণ হয়ে যাচ্ছে, আর চারজন প্রত্যক্ষ পুরুষ সাক্ষীর অভাবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পুরুষ রেহাই পেয়ে যাচ্ছে? যাতে নারীটি ধর্ষনের শিকার কিনা তাও যাচাই হচ্ছেনা। যা ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের নিকট

---

[১০২].হযরত মা্ওলানা মুফতি মুহাম্মদ,শফী (রহ্ঃ) ঃ তফসীরে মা'আরেফুল কুরআন, (অনুবাদঃ মুহিউদ্দিন খান), ৩য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৪৯-১৫৯।

ইসলাম ধর্মকে নারী নির্যাতনকারী ধর্ম হিসেবে প্রতিফলিত করার সহায়ক হচ্ছে। অতএব এটি ভেবে দেখা প্রয়োজন নয় কি যে, ইসলাম ধর্মের জন্য প্রচন্ড ক্ষতিকর জোর করে প্রতিষ্ঠিত রজম এর বিধান অনুসরণ করা হবে, নাকি পবিত্র কুরআনকে অনুসরণ করা হবে?

আরও একটি প্রশ্ন এখানে প্রাসঙ্গিক। তাহলো, হোমোসেক্স জনিত অপরাধের সাজা সম্পর্কে। শরীয়তের বিধানে এ ধরনের অপরাধের কোন সাজার বিধান রয়েছে কি? সম্ভবতঃ নেই। কারণ এই ধরনের কোন অপরাধীদের শরীয়ত মাফিক কোন শাস্তি আরোপের ঘটনা মুসলিম বিশ্বের কোথাও ঘটেছে মর্মে শোনা যায়না। এই রকম ঘটনার কথা শোনা গেলেও তার জন্য কোন ফতওয়ার কথাও কখনও শোনা যায়না। কিন্তু কেন? এখানে অধিকাংশ ক্ষেত্রে দুইজন পুরুষের শাস্তি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলেই কি? অথচ পবিত্র কুরআন দৃষ্টে পাথর মেরে মারার শাস্তি যদি কাউকে দিতেই হয় তবে তা হোমোসেক্সীদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কারণ পবিত্র কুরআনে লূত নবীর উম্মতদের কথা বলা হয়েছে। তারা ভয়ংকর ভাবে হোমোসেক্সএ লিপ্ত হয়েছিলো। তা এতই ভয়ংকর রূপ নিয়েছিলো যে, ফেরেস্তারা লূত নবীর বাড়িতে এলে তারা দলে দলে সেখানে আসতে থাকে। সম্ভবতঃ ফেরেস্তারা সুদর্শন পুরুষের আকারে এসেছিলেন। লুত(আঃ) তার মেহমানদের ইজ্জত রক্ষার্থে নিজ পরিবারের মেয়েদের প্রতি তাদের দৃষ্টি আকর্ষনের চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। যদিও তারা ফেরেস্তাদের কোন ক্ষতি করতে সক্ষম হয়নি। আল্লাহ্পাক এই অধঃপতিত জাতিকে ভূমিকম্প এবং উপর থেকে পাথর বৃষ্টি বর্ষনের মাধ্যমে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্পাক বলেন, ‘‘অবশেষে যখন আমার হুকুম এসে পৌঁছলো তখন আমি উক্ত জনপদের উপরকে নীচ করে দিলাম এবং তার উপর স্তরে স্তরে কাঁকর পাথর বর্ষণ করলাম’’ (আঃ ৮২, সুরা হুদ)। এখন পবিত্র কুরআনের এই উপর থেকে পাথর বৃষ্টি এবং জনপদকে নীচু করে দেয়ার বিষয়টি অবলম্বন করেও যদি প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুকে সাজা হিসেবে গ্রহণ করা হয়ে থাকে তথাপিও সেটিতো হোমোসেক্সীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে, যা অধিকাংশ ক্ষেত্রে দুইজন পুরুষের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য ।

এখন প্রশ্ন হলো, প্রচলিত শরীয়তে এই ধরনের অপরাধীদের কোন শাস্তির বিধান নেই কেন? যেখানে ইমাম আবু হানিফা (রঃ) বলেছেন, ‘‘যারা এ কাজ করে, তাদেরকে ঐ রকম শাস্তিই দেয়া উচিত, যেমন লুত (আঃ) এর সম্প্রদায়কে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ আকাশ থেকে প্রস্তর বর্ষিত হয়েছে এবং মাটি উল্টিয়ে দেয়া হয়েছে। তাই এরূপ ব্যক্তিকে কোন উঁচু পাহাড় থেকে নীচে ফেলে দিয়ে উপর থেকে প্রস্তর বর্ষণ করা উচিত’’।[১০৩] হযরত আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন, “.. ..ঐ ব্যক্তি অভিশপ্ত, যে কওমে - লুতের অনুরূপ কুকর্ম করে, ঐ ব্যক্তি অভিশপ্ত, যে কওমে - লুতের অনুরূপ কুকর্ম করে, ঐ ব্যক্তি অভিশপ্ত, যে কওমে - লুতের অনুরূপ কুকর্ম করে”।[১০৪] মহানবী (সঃ) আরও বলেছেন ‘অর্থাৎ এ কাজে জড়িত উভয় ব্যক্তিকে হত্যা কর’।(ইবনে কাসির)[১০৫]। কে বলতে পারে পরবর্তীকালের টিকাকারও ভাষ্যকারদের হাতে পড়ে হোমোসেক্স এর শাস্তিই ব্যভিচারের শাস্তিতে পরিণত হয়ে পুরুষদের শাস্তি নারীদের ঘাড়ে এসে পড়েছে কিনা? কিংবা এটি মুসলমানদের উপর তওরাতের প্রভাব কিনা?

---

[১০৩]. হযরত মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ,শফীন(রহঃ) ঃ তফসীরে মা'আরেফুল কুরআন, ৩য় খন্ড, (অনুবাদঃ মুহিউদ্দিন খান), পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭০৫।

[১০৪]. হযরত মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ,শফী (রহঃ) ঃ তফসীরে মা'আরেফুল কুরআন, ২য় খন্ড, (অনুবাদঃ মুহিউদ্দিন খান), পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৮০।

[১০৫]. পূর্বোক্ত, ৩য় খন্ড, পৃঃ ৭০৫

২. নারীরা কি সাক্ষী হিসেবে তুচ্ছ?

প্রচলিত শরীয়তের বিধানে সাক্ষ্যের বিষয়টিও উল্লেখযোগ্য। এখানে সাক্ষী হিসেবে নারীকে তুচ্ছ করা হয়েছে। যাতে ইসলাম ধর্মকে নিয়ে সমালোচনার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এখানে বলা হচ্ছে যে, একজন পুরুষের প্রদত্ত সাক্ষী দুইজন নারীর সাক্ষীর সমান। এই বিধানটি নিয়ে বিদ্রুপ করে তসলিমা নাসরিন তাঁর নির্বাচিত কলাম গ্রন্থে বাংলাদেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী এবং বিরোধী নেত্রীদ্বয়ের সাক্ষীকে একজন আবুল কালামের সাক্ষীর সাথে তুলনা করেছেন।[১০৬] যদিও বিত্র কুরআন দৃষ্টে এরূপ বিদ্রুপের কোন সুযোগ নেই। সাক্ষ্য সংক্রান্ত পবিত্র কুরআনের প্রধান আয়াতটি এরূপ, ‘‘আর দুইজন পুরুষকে তোমাদের মধ্যে হইতে সাক্ষী করিয়া লও, কিন্তু যদি এই দুই সাক্ষী পুরুষ না হয়, তবে একজন পুরুষ এবং দুইজন স্ত্রীলোক, এমন সাক্ষীদের মধ্য হইতে যাহাদিগকে তোমরা পছন্দ কর, যাতে এই দুইজন স্ত্রীলোকের মধ্যে একজন ভুলিয়া গেলে তাদের একজন অপরজনকে স্মরণ করাইয়া দিতে পারে’’ (আঃ ২৮২, সুরা বাকারা)। এই আয়াতটি একটু গভীর ভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, এখানে দুইজন নারী বিচার-ফয়সালার ক্ষেত্রে যাচ্ছেন বটে, দুইজনেই কিন্তু সাক্ষ্য দিচ্ছেন না। সাক্ষ্য দিচ্ছেন একজনই। সাক্ষ্য প্রদানকারী এই নারী কিছু ভুলে গেলে কিংবা অপ্রস্তুত হলে অন্যজন তাকে সাহায্য করছেন মাত্র। সাক্ষ্য প্রদানকারী নারী কিছু ভুলে না গেলে কিংবা অপ্রস্তুত না হলে অন্যজনের কোন ভূমিকাই নেই।

এই প্রসঙ্গে জনাব রফিউল্যহ শিহাব বলেন, ‘‘According it (the verse) only one women has to give evidence. The function of the other accompaning women is to save the witnessing women from any Confusion or embarassment. But if the witnessing women is not confussed then the other Women has nothing to do at all.’’ অর্থাৎ এই আয়াত অনুসারে একজন মাত্র মহিলা সাক্ষ্য প্রদান করবেন। পুরুষ পরিবেষ্টিত কোর্ট কাচারী বা বিচার ফয়সলার ক্ষেত্র সমূহে একজন মাত্র মহিলার পক্ষে বিব্রত হওয়া বা অপ্রস্তুত বোধ করা স্বাভাবিক। এজন্যই সাক্ষ্য প্রদানকারী নারীকে তার নিজস্ব গ্রুপের একজন সঙ্গী সাথে নিয়ে আসার সুযোগ এখানে রাখা হয়েছে। কিন্তু সাক্ষ্য প্রদান কারী নারী যদি বিব্রত না হন তখন অন্য নারীর সাক্ষ্য প্রদানের বিষয়ে কোন ভূমিকাই নেই” ।[১০৭]

জনাব রফিউল্যাহ শিহাব এর বাইরে সুরা নেছার ৬ এবং ১৫, সুরা মায়েদার ১০৬, সুরা নুরের ৪, সুরা তালাকের ২ নং আয়াত সমূহের উল্লেখ করে জানান যে, এই সব ক্ষেত্রে নারী এবং পুরুষের সাক্ষ্যের ক্ষেত্রে কোন পার্থক্য নেই।[১০৮]

এছাড়া , পবিত্র কুরআনের অন্যত্র নারী সাক্ষীকে বরং পুরুষ সাক্ষীর তুলনায় প্রাধান্যই দেয়া হয়েছে। সুরা নুরের ৬,৭,৮,৯ নং আয়াত সমূহ এরূপ, ‘‘আর যাহারা নিজেদের স্ত্রীগণের প্রতি (যিনার) অপবাদ প্রদান করে এবং তাহাদের নিকট নিজেদের (দাবী) ব্যতীত অন্য কোন সাক্ষী না থাকে, তবে তাহাদের সাক্ষ্য ইহাই যে, চারিবার আল্লাহর নামে শপথ করিয়া বলিবে নিশ্চয়ই আমি সত্যবাদী এবং পঞ্চমবারে বলিবে আমার উপর আল্লাহ্ব গজব হউক যদি আমি মিথ্যাবাদী হই। আর সেই স্ত্রী লোকটি হইতে (যিনার) শাস্তি এইরূপে রহিত হইতে পারে যে, সেও চারিবার শপথ করিয়া বলিবে, নিশ্চয়ই এই পুরুষটি মিথ্যাবাদী এবং পঞ্চমবারে বলিবে যে আমার উপর আল্লাহ্র গজব হউক, যদি এই ব্যক্তি সত্যবাদী হয়’’(সুরা নুর, আয়াত ৬,৭,৮,৯)।

---

[১০৬].তসলিমা নাসরিনঃ নির্বাচিত কলাম, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১১২।

[১০৭]. Prof. Rafiullah Shehab: Rights of women in Islamic shariah, opcit, p. 17.

[১০৮] .পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৭।

Dhaka University Institutional Repository

লক্ষ্যনীয় যে এখানে একই বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করছেন একজন পুরুষ এবং একজন নারী, আর প্রাধান্য পাচ্ছে নারীর সাক্ষী। অর্থাৎ নারীর সাক্ষ্যের মাধ্যমে পুরুষের সাক্ষ্য গ্রহণ যোগ্যতা হারাচ্ছে এবং নারীর যিনার শাস্তি রহিত হয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ পবিত্র কুরআন সাক্ষী হিসেবে নারীকে তুচ্ছ তো করেইনি বরং ক্ষেত্র বিশেষে প্রাধান্য দিয়েছে।

সাক্ষীর ক্ষেত্রে নারী যে, কোন অবস্থাতেই পুরুষের অর্ধেক হিসেবে বিবেচ্য নয় কিংবা মোটেও তুচ্ছ নয়, সে বিষয়ে আরও একটি জলজ্যান্ত উদাহরণ রয়েছে। তাহলো, সহিই হাদিস বা নির্ভুল হাদিস হিসেবে যে সব হাদিস যুগে যুগে সকলের নিকট গ্রহণীয়, তন্মধ্যে বেশ কিছু হাদিস নবীপত্নি বিবি আয়শা কর্তৃক বর্ণিত। কারণ অত্যন্ত কাছের থেকে, নিতান্ত ঘনিষ্ঠ ভাবে তিনি নবীজি (সঃ) কে দেখেছেন। তাই তাঁর বর্ণিত হাদিস সকল হাদিসবেত্তাগণের নিকট নিঃসন্দেহে গ্রহণীয় হয়েছে। এখন, একজন পুরুষের সাক্ষ্য যদি দুইজন নারী সাক্ষ্যের সমানই হতো তবে হযরত আয়শা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদিস তথা মহানবী (সঃ) সংক্রান্ত দত্ত বক্তব্য আরও একজন পুরুষ ও নারীকে দিয়ে যাচাই করাতে হতো। কিন্তু এরূপ কোন প্রমাণ কোথাও নেই।

প্রশ্ন হলো, এরপরও প্রচলিত শরীয়তের বিধানের নামে সাক্ষী হিসেবে নারীকে কেন ও কিভাবে তুচ্ছ করে রাখা হ'ল? উপরে বর্ণিত বিবরণ থেকে এটিতো স্পষ্ট যে, এই বিধানে সুরা বাকারার ২৮২ নং আয়াতের আংশিক বিবেচনায় আনা হয়েছে এবং সুরা নুরের ৬-৯ নং আয়াতে সাক্ষী হিসেবে নারীকে পুরুষের তুলনায় যে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে তা গ্রাহ্যই করা হয়নি এবং পবিত্র কুরআনের সাক্ষ্য সংক্রান্ত অন্যান্য আয়াতগুলাও পর্যালোচনা হয়নি। অর্থাৎ সাক্ষী হিসেবে পবিত্র কুরআন মাফিক নারী মোটেও তুচ্ছ নয় বরং এ ক্ষেত্রে ও সে একক এবং অদ্বিতীয়।

৩. বহু বিবাহ কি অবাধ এবং উন্মুক্ত?

মুসলমান পুরুষেরা প্রচলিত শরীয়তের বিধানের নামে বহু যুগ ধরে বহু বিবাহের প্রচন্ড সুযোগ ব্যবহার করে আসছেন। এই ক্ষেত্রে তারা ইসলামের প্রাথমিক যুগে মহানবী (সঃ) ও সাহাবাগনের বহু বিবাহকে উদাহরণ হিসেবে টেনে থাকেন। কিন্তু এটি লক্ষ্য করেননা যে, এর চর্চা এতই স্বেচ্ছাচারিতা এবং জঘন্য পর্যায়ে গিয়ে ঠেকেছে যে, তা ইসলাম ধর্মকে খেইল তামাশায় পরিণত করেছে এবং ইসলাম ধর্মের মত একটি ধর্মকে নিয়ে সমালোচনার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এই প্রসঙ্গে তসলিমা নাসরিন সমালোচনা করে বলেন, ''ইসলাম তাদের চার বিয়ে করবার অধিকার দিয়েছে''। ''ইসলাম ধর্মে পুরুষের জন্য চারটি পর্যন্ত বিয়ে করবার নিয়ম প্রচলিত''। মুসলমান পুরুষদের বহুবিবাহের আকাঙ্খাকে ধর্মীয় আহ্লাদ নাম দিয়ে বিদ্রুপ করে তিনি বলেন, ''আমার স্বামী এক এক করে ঘরে চার বউ তোলার ধর্মীয় আহ্লাদ দেখাতে পারে''।[১০৯]

আর হুমায়ুন আজাদ অঙ্কন করেছেন এই আহ্লাদের ভয়ংকর সব চিত্র, ''মুসলমান পুরুষ চারটি বৈধ বিয়ে করতে পারে, পঞ্চম বিয়ে করলে বিয়েটি বাতিল হয়না, শুধু তার দরকার পড়ে আগের একটি স্ত্রীকে এক, দুই, তিন করে তালাক দেয়া। মুসলমান পুরুষের জন্য তার চারটি স্ত্রী সম্ভোগই শুধু বৈধ নয়, সে তার ক্রীতদাসীদের সাথে সঙ্গম করার অধিকারী''।[১১০] বিশেষতঃ আরব অঞ্চলের পুরুষের বহু বিবাহ চর্চার চূড়ান্ত খামখেয়ালীপনার উল্লেখ পূর্বক তিনি বলেন, ''আরব অঞ্চলে ইদ্দা নামক একটি বিধান রয়েছে। ওই বিধান অনুসারে স্বামী তিন মাসের জন্য স্ত্রীকে তালাক দিতে পারে এবং তারপর তাকে ফিরিয়ে আনতে পারে। এ

[১০৯]. তসলিমা নাসরিনঃ নির্বাচিত কলাম,পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৮, ৫৭।

[১১০]. হুমায়ুন আজাদ ঃ নারী, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭৭-৭৮।

সময়ে স্বামীটি আরেকটি বিয়ে করতে পারে। এর অর্থ হচ্ছে স্বামীটি ঘরে চারটি স্ত্রী রাখতে পারে, এবং আরো চারটি রাখতে পারে ইদ্দা তালাকে বেঁধে। অর্থাৎ এ সময়ে তার থাকে চারটি সক্রিয় স্ত্রী, আর চারটি ছুটি ভোগরত স্ত্রী। এভাবে সে চারটিকে ঘরে ও চারটিকে তালাক ছুটিতে রেখে সম্ভোগ করতে পারে অসংখ্য নারী।[১১১] হুমায়ুন আজাদের বক্তব্য সঠিক হলে, প্রচলিত শরীয়তের নামে এই সব জঘন্য চর্চা হচ্ছে খোদ আরব মুল্লুকে।

অথচ একটু সচেতনতার সাথে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, পবিত্র কুরআন এই সব স্বেচ্ছাচারিতাকে মোটেও অনুমোদন করে না। তবে ইসলামের প্রাথমিক যুগটির অবস্থা একটু ভিন্ন আঙ্গিকের। প্রাথমিক অবস্থায় নবীজি (সঃ)কে প্রচুর অনিয়ম অনাচারের বেড়াজাল ছিন্ন করতে হয়েছে। অনেক জঞ্জাল পরিস্কার করতে হয়েছে। একটি জাহিলিয়া সমাজকে সম্পূর্ণ ভাবে পরিশুদ্ধ, পরিচ্ছন্ন করতে, নিয়মতান্ত্রিকতায় আনয়নের স্বার্থে অনেক সামাজিক সংস্কার তাঁকে করতে হয়েছে। তন্মধ্যে নারী মুক্তি অন্যতম। জাহিলিয়া যুগে নারীকে ঘিরেই বিদ্যমান ছিলো সর্বাধিক সামাজিক অনাচার। এক কালীন অর্থের বিনিময়ে তখন পণ্যের মতো মানুষও ক্রয় বিক্রয় হতো, আর কিনে নেয়া মেয়েগুলা ছিলো তাদের মনিবদের যথেচ্ছ ভোগেরও সামগ্রী।

সে সময়ে গোত্রে গোত্রে অহেতুক যুদ্ধ বিগ্রহ লেগেই থাকতো। এই সব যুদ্ধ- বিগ্রহে নিহত পুরুষদের বিধবা স্ত্রীরা এবং অসহায় কন্যারা ছিলো। সম্পত্তি গ্রাসের উদ্দেশ্যে নাম মাত্র বিয়ের মাধ্যমে এই সব এতিম বালিকাদের নিকটতম আত্মীয়গণ আটক করে রাখতো। নিজেরাও স্ত্রী হিসেবে যথাযথ মর্যাদা দিতোনা আবার অন্যত্রও বিয়ে দিতো না। আবার ইসলাম প্রচারে অনেক জেহাদ করতে হয়েছিলো, এই সব যুদ্ধে নিহতদের স্ত্রী এবং বিয়েযোগ্য কন্যাদের বিষয়ও ছিলো। অনেক মহিলারা একাই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতো।

উল্লেখিত সকল অবস্থানের নারীদের বিষয়ে একটি নিয়মতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় স্বল্প সংখ্যক মুসলমান পুরুষদের একাধিক বিয়ে করতে হয়েছে। দাসী মেয়েগুলা যারা ছিলো তাদের মনিবেরই যথেচ্ছ ভোগের সামগ্রী। তাদেরকে মোহর প্রদানের মাধ্যমে স্ত্রীর মর্যাদা দিয়ে কিভাবে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনা হলো, কিভাবে যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত সর্বহারা অসহায় মেয়েদের স্ত্রী হিসেবে গ্রহণের মাধ্যমে সামাজিক শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা হলো - যার প্রসঙ্গে তসলিমা নাসরিনের মত ইসলাম ধর্মের কঠিন সমালোচক ও বলতে বাধ্য হয়েছেন, ''কিন্তু যে অন্ধকার যুগে হযরত মুহম্মদ (সঃ) বহু বিবাহ ব্যবহারে বাধ্য হয়েছিলেন তা উল্লেখ করে এ যুগের বিজ্ঞ বুদ্ধিজীবিগণ বহুবিবাহ রোধ কল্পে অনায়াসে উদ্যোগী হতে পারেন''।[১১২]

ইসলামের প্রাথমিক যুগে সামাজিক শৃঙ্খলা আনয়নই ছিলো বহু বিবাহ ব্যবহারের কারণ। এটিও ছিলো একটি নিয়ন্ত্রণ। কিন্তু তাই বলে উক্ত অস্বাভাবিক অবস্থাকে বর্তমানে উদাহরণ হিসেবে টানা যথার্থ হবেনা। কারণ ইসলাম ধর্ম শেষ পর্যন্ত এক বিয়েকেই আদর্শ বিয়ে হিসেবে নির্ধারণ করেছে। পবিত্র কুরআনে একাধিক বিয়ের লাগাম টেনে ধরা হয়েছে কঠিন এক শর্ত জুড়ে দিয়ে- ''.. .. তোমরা বিবাহ করিয়া লও দুই দুইটি, তিন তিনটি, চার চারটি নারীকে, অতঃপর যদি এই আশংকা থাকে যে ইনছাফ কায়েম করিতে পারিবেনা তবে এক স্ত্রীতেই ক্ষান্ত থাক'' (আঃ ৩, সুরা নেছা)। এবং মহান স্রষ্টা তাঁরই সৃষ্ট পুরুষদের অন্তরকেই ব্যক্ত করে দিয়ে বলেন, ''আর তোমাদের দ্বারা ইহা কখনোই সম্ভব হইবে না যে, তোমরা

---

[১১১]. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭৭, ৭৮।

[১১২].তসলিমা নাসরিনঃ নির্বাচিত কলাম, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৪০-১৪১।

পত্নিদের মধ্যে সমতা রক্ষা করিবে। যদিও তোমরা যতইনা আকাঙ্খা কর" (আঃ ১২৮, সুরা নেছা)। পবিত্র কুরআন যে, কেবল মাত্র একাধিক বিয়ের লাগামই টেনে ধরেছে তা-ই নয়, তার সাথে স্ত্রীর ভরণপোষণে ব্যর্থ হলে পুরুষদের একটি মাত্র বিয়েকেও নিরুৎসাহিত করেছে - "আর যাহারা বিবাহ করিতে অসমর্থ, তাহাদের উচিৎ যেনো তাহারা সংযমী হইয়া থাকে যে পর্যন্ত না আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে তাহাদিগকে ধনী করিয়া দেন" (আঃ ৩৩, সুরা নুর)।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, ইনছাফ কায়েম করতে না পারলে এবং প্রচন্ড আকাঙ্খা স্বত্তেও কখনই তা সম্ভব নয় বলে একের অধিক বিয়ে করা থেকে বিরত থাকা মহান আল্লাহ্র নির্দেশ। এই বিষয়ে মহানবী হযরত মুহম্মদ(সঃ) এর সতর্ক বানী পুণঃ উল্লেখ করা যায়, "যে ব্যক্তির দুই স্ত্রী রয়েছে সে যদি এদের মধ্যে ব্যবহারের ক্ষেত্রে পূর্ণ সমতা ও ইনছাফ করতে না পারে, তবে কিয়ামতের ময়দানে এমন ভাবে উঠবে যে তার শরীরের এক পার্শ্ব অবশ হয়ে থাকবে" (মেশকাত শরীফ)। হযরত মাওলানা মুফতি মুহম্মদ শফী (রহঃ) এই প্রসঙ্গে বলেন, "কেউ একের অধিক বিয়ে করতে চাইলে প্রথমে বিবেচনা করে দেখতে হবে প্রত্যেক স্ত্রীর হক পুরা করার মত সামর্থ তার রয়েছে কিনা, যদি এরূপ সামর্থ না থাকে, তবে একের অধিক বিয়ে করতে যাওয়া ইচ্ছাকৃত ভাবে নিজেকে একটা কঠিন পাপে নিমজ্জিত করার নামান্তর। এরূপ গোনাহের সম্ভাবনা থেকে বিরত থাকা এবং এক স্ত্রীতেই তুষ্ট থাকা তার পক্ষে বিধেয়"।[১১৩] তিনি আরো বলেন, "একাধিক বিয়ে ঠিক তখনই বৈধ হতে পারে যখন শরীয়ত মোতাবেক সবার সাথে সমান আচরণ করা হবে, তাদের সবার অধিকার সমভাবে সংরক্ষণ করা সম্ভব হবে। এ ব্যাপারে অপারগ হলে এক স্ত্রীর ওপরই নির্ভর করতে হবে এবং এটাই ইসলামের নির্দেশ"।[১১৪]

শুধু তাই নয়, সামাজিক ও পারিবারিক স্বাভাবিক অবস্থায় স্বয়ং মহানবীও (সঃ) এক স্ত্রীর বর্তমানে ২য় স্ত্রী গ্রহণ অনুমোদন করেননি, তাঁরই প্রিয় কন্যা ফাতেমার মাধ্যমে। বিবি ফাতেমার জীবদ্দশাতেই হযরত আলীর ২য় বিয়ে প্রসঙ্গে নবীজির (সঃ) অনুমতি চাওয়া হলে তাঁর দৃঢ় জবাব ছিলো, "আমি অনুমতি দেবনা, আমি অনুমতি দেবনা, আমি অনুমতি দেবনা। ততক্ষন পর্যন্ত - না - আলী ইবনে আবু তালিব আমার কন্যাকে তালাক দেয় এবং এর পরপরই সে তাদের মেয়েকে সাদী করতে পারে। কেননা ফাতেমা আমার কলিজার টুকরা, তাকে যা কষ্ট দেয়, তা আমাকেও কষ্ট দেয়" (বুখারী)। 'আমি অনুমতি দেবনা'- কথাটি তিনবার উচ্চারণের মাধ্যমে সামাজিক ও পারিবারিক স্বাভাবিক অবস্থায় মহানবী (সঃ) কর্তৃক দৃঢ়ভাবে একাধিক বিয়ে নিষিদ্ধ হয়েছে। নবীজির (সঃ) শেষের কথাটি আরও তাৎপর্যপূর্ণ। 'ফাতেমা আমার কলিজার টুকরা, তাকে যা কষ্ট দেয়, তা আমাকেও কষ্ট দেয়'- তার মানে মহানবী (সঃ) বুঝতে সক্ষম ছিলেন যে, হযরত আলী দুই স্ত্রীর মধ্যে ইনছাফ কায়েম রাখতে সক্ষম হবেন না, তাতে ফাতেমা কষ্ট পাবেন যা স্বয়ং নবীজির (সঃ)ও কষ্টের কারণ। নবীজির (সঃ) এই কষ্ট তো এক ফাতেমার জন্য হতে পারে না, সর্ব যুগের, সর্বকালের ফাতেমাদের কষ্টই, নবীজির (সঃ) কষ্ট। জানা যায়, পবিত্র কুরআনের নির্দেশ এবং উল্লেখিত হাদিস দৃষ্টে প্রখ্যাত ঈমাম, ঈমাম আবু হানিফা মুসলমানদের মধ্যে একাধিক বিয়ের বিরোধী ছিলেন এবং ব্যক্তি জীবনে এক বিয়েতেই সীমাবদ্ধ ছিলেন।[১১৫]

---

[১১৩]. হযরত মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ,শফী (রহঃ) ঃ তফসীরে মা'আরেফুল কুরআন, (২য় খন্ড), (অনুবাদঃ মুহিউদ্দিন খান), পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৩০।

[১১৪]. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৩০।

[১১৫]. Moulana Manager Absan Gilini ঃ Imam Abu Hanifa ki siasi zindgi , p. 137. উদ্ধৃত করেন, prof. Rafiullah Shehab ঃ Rights of Women in Islamic shariah, opcit. p. 143.

এরপরেও অত্যন্ত সহজ ও স্বাভাবিক ভাবে বহু স্ত্রী গ্রহণ কি ভাবে ইসলামিক হতে পারে? সব চাইতে বড় কথা হলো, মানুষ সৃষ্টির প্রাক্কালে আল্লাহপাক একজোড়াকেই বেছে নিয়েছিলেন। তাঁরা হলেন আদম ও হাওয়া। সেখানে এক আদমের জন্য ২,৩,৪ জন হাওয়া তৈরী হয়নি। এর পরও পুরুষের বহু বিবাহ করাই নাকি শরীয়তের বিধান। এক্ষেত্রে শরীয়তের বিধানের অন্যতম প্রবক্তা ইমাম আবু হানিফাকেও অনুসরণ করা হয়নি।

মূলতঃ এই আইন তৈরী কালে নয় নিশ্চয়ই পরবর্তীতে টিকাকার ও ভাষ্যকারদের হাতে পবিত্র কুরআন ও হাদিস আংশিক বিবেচনায় আনা হয়েছে। পবিত্র কুরআন ও হাদিস পরিপূর্ণভাবে অনুসরণ করা হলে আইনটির এমন অবস্থা হওয়ার কথা নয়। বলা যেতে পারে, পবিত্র কুরআন তো একাধিক বিয়ে একেবারে নিষিদ্ধ করেনি? হ্যাঁ, এখানেই পবিত্র কুরআনের বিশিষ্টতা ও সার্বজনীনতা। পবিত্র কুরআন কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নয়। সামাজিক ও পারিবারিক ক্ষেত্রে এমন অবস্থারও তো সৃষ্টি হতে পারে যখন একাধিক বিয়ে শুধু আবশ্যক নয়, অত্যাবশ্যকও। তাই পবিত্র কুরআনে একাধিক বিয়ে একেবারে নিষিদ্ধ হয়নি কিন্তু এমন একটা শর্ত দিয়ে রাখা আছে যা একাধিক বিয়ের লাগামকে শক্ত হাতে টেনে ধরা হয়েছে। দুঃখ জনক যে, কিভাবে ও কেন আমাদের শরীয়তে বহু বিবাহের ক্ষেত্রে পবিত্র কুরআনে প্রদত্ত, provided that হিসেবে ইনসাফ কায়েমের শর্তে একাধিক বিয়ের লাগাম টেনে ধরা হয়েছে তার উল্লেখ নেই। আবার স্ত্রীর ভরণপোষণে ব্যর্থ হলে পুরুষদের একটি মাত্র বিয়েকেও নিরুৎসাহিত করেছে - ''আর যাহারা বিবাহ করিতে অসমর্থ, তাহাদের উচিৎ যেনো তাহারা সংযমী হইয়া থাকে যে পর্যন্ত না আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে তাহাদিগকে ধনী করিয়া দেন'' (আঃ ৩৩, সুরা নুর) তাও উপেক্ষা করা হয়েছে। ফলে বিবাহ সংক্রান্ত ইসলাম ধর্মের চমৎকার একটি বিধান খেইল তামাশায় পরিণত হয়ে পড়েছে।

৪. <u>এক দুই তিন উচ্চারণেই কি তালাক সম্পন্ন হয়ে যাবে?</u>

বিয়ের সাথে তালাক প্রসঙ্গটিও উল্লেখযোগ্য। এই ক্ষেত্রেও শরীয়তের বিধানের নামে মুসলিম সমাজে প্রচুর খামখেয়ালীও স্বেচ্ছাচারিতার চর্চা হয়েছে এবং হচ্ছে, যা পবিত্র কুরআন ও তৎসংশ্লিষ্ট হাদিসের সাথে সংগতিপূর্ণ নয়। পবিত্র কুরআনের সুরা বাকারার ২২৫ থেকে ২৩০ নং আয়াতে তালাকের বিভিন্ন বিধান/পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে, আর তারই মাঝে ২২৮ নং আয়াতেই নারী ও পুরুষের সমান অধিকারের বিধান প্রদত্ত হয়েছে। তাই নারী পুরুষের সমান অধিকারের কথা যদি আমরা পবিত্র কুরআন স্বীকৃত মর্মে দাবী করি, তবে তা তালাকের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হওয়ার কথা। কিন্তু দুঃখজনক যে, শরীয়তের প্রচলিত বিধানে তালাক শুধু পুরুষেরই একচ্ছত্র অধিকার। শুধু তাই নয়, পুরুষেরা এর যথেচ্ছ ব্যবহারের সুযোগের অধিকারীও বটে! অথচ নবীজি (সঃ) ঘোষণা করেছেন যে, ''জায়েজ কাজের মধ্যে আল্লাহ্‌র কাছে সবচেয়ে অপছন্দনীয় কাজ হচ্ছে তালাক'' (আবু দাউদ, এবনে মাজা, হাকেম)। আর সেজন্যই পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ্ কর্তৃক তালাকের জন্য প্রদত্ত বিধানটি- প্রতিরোধ মূলক। সুরা বাকারার ২২৮নং আয়াত থেকে ২৩০নং আয়াত এবং সুরা তালাক এ বর্ণিত হয়েছে তালাকের বিধান। সে মাফিক তালাক সংগঠিত হবে, তিন তুহরে। একবার তালাক উচ্চারণের পর এক তুহর অপেক্ষা, অতঃপর ২য় তালাক এবং আরও এক তুহর অপেক্ষা, অতঃপর ৩য় তথা চূড়ান্ত তালাক। এ সময়ে স্বামী স্ত্রী পরস্পর দুরে অবস্থান করবেনা। সুরা তালাকে আল্লাহ্‌পাক বলেন, ''সেই স্ত্রীদিগকে তাহাদের গৃহ হইতে বাহির করিয়া দিওনা, আর তাহারা নিজেরাও যেনো স্বেচ্ছায় বাহির না হয়'' (আঃ ১, সুরা তালাক)।

মহান আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত তালাকের বিধান প্রতিরোধ মূলক এই কারণে যে, এই ক্ষেত্রে তালাকের পথ-পরিক্রমায় একটি দীর্ঘ সময় অতিক্রম হচ্ছে বলে এবং স্বামী স্ত্রী একত্রে অবস্থান করছে বলে এই সময়ে তাহাদের মধ্যে উদ্ভুত জটিলতা এবং ভুল বোঝাবোঝির অবসান হয়ে যাওয়া খুবই স্বাভাবিক। আবার সুরা নেছার ৩৫নং আয়াতে আল্লাহ্পাক যে বলেছেন- ''আর যদি তোমরা উপরস্থগণ এই স্বামী স্ত্রী উভয়ের মধ্যে ঝগড়াবিবাদের আশংকা কর, তবে মীমাংসা করার যোগ্যতা সম্পন্ন এক ব্যক্তিকে স্বামীর বংশ হইতে এবং অন্য ব্যক্তিকে স্ত্রীর বংশ হইতে প্রেরণ কর''। অর্থাৎ তালাকের সময়সীমার মধ্যে এরূপ মীমাংসার সুযোগও পাওয়া যাচেছ। যে ভাবে মূলতঃ চূড়ান্ত তালাকের সম্ভাবনা সীমিত হচ্ছে। অর্থাৎ পবিত্র কুরআনে তালাকের বিধানটি এরূপ যে, এখানে চূড়ান্ত বিচ্ছেদ সংগঠিত না হওয়ার ব্যবস্থাও অন্তর্নিহিত রয়েছে। এজন্যই তালাকের এই বিধানটি – 'প্রতিরোধমূলক'। এমন সুক্ষ্ম বিধান মহান স্রষ্টা ছাড়া আর কারও পক্ষেই দেয়া সম্ভব নয়! আল্লাহ্পাক ভয়ংকর পরিণতির আশংকা ব্যতীত তালাক অপছন্দ করেছেন বলেই তালাকের ক্ষেত্রে প্রতিরোধমূলক বিধান দিয়েছেন। কারণ তালাক শুধু স্বামী-স্ত্রীর জীবনেই নয়, নিস্পাপ নিরপরাধ শিশু সন্তানের জীবনেও ভয়ংকর পরিণতি ডেকে আনে। আর সে জন্যই বিষয়টি হওয়া দরকার ধীরে-সুস্থে, চিন্তা-ভাবনা, আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে।

মহান আল্লাহ সুরা বাকারার ২২৯ নং আয়াতে বলেন, ''অনন্তর যদি স্বামী-স্ত্রী উভয়ের আশংকা হয় যে, আল্লাহ্র বিধান সমূহ কায়েম রাখিয়া চলিতে পারিবেনা, তবে উভয়েরই কোন পাপ হইবেনা- ঐ বিনিময় গ্রহণে যাহা প্রদান করিয়া স্ত্রী নিজেকে মুক্ত করিয়া লয়'' এবং সুরা নেছার ১২৮ নং আয়াতে বলেন, ''আর যদি কোন নারী নিজ স্বামী হইতে দুর্ব্যবহার কিংবা উপেক্ষার আশংকা করে তবে (এই অবস্থায়) তাহাদের কোন পাপ নাই যে, উভয়ে পরস্পর এক বিশেষ পদ্ধতিতে মীমাংসা করিয়া লয় এবং এই মীমাংসাই অধিক কল্যানকর আর লালসার সহিত আত্মার ঘনিষ্ট সম্পর্ক''। অর্থাৎ অত্যাচারী ও ধনলিপ্সু স্বামীর কাছ থেকে স্ত্রীর পক্ষ থেকে কিছু ছাড় দিয়ে হলেও শান্তিপূর্ণভাবে তালাকের ব্যবস্থা করা যাবে। লক্ষ্যনীয় যে, সুরা বাকারার ২২৯ এবং সুরা নেছার ১২৮ নং আয়াতে কিছু ছাড় দিয়েও যে তালাকের ব্যবস্থা সেখানেও কিন্তু ভিন্ন কোন পদ্ধতির উল্লেখ নেই। পদ্ধতি সেই একটাই তিনটি তুহর। এই তিন তুহরের পদ্ধতি নির্ধারণ করে দিয়ে আল্লাহ্পাক সতর্ক করে দিয়েছেনঃ ''ইহা আল্লাহ্র বিধান সমূহ, সুতরাং তোমরা ইহার সীমা লংঘন করিওনা, আর যে ব্যাক্তি আল্লাহ্র বিধান সমূহের সীমা লংঘন করে বস্তুতঃ এরূপ লোকই নিজের ক্ষতি সাধন করে''। (আঃ ২২৯, সুরা বাকারার)।

পক্ষান্তরে প্রচলিত শরীয়তের বিধানের নামে কি ঘটনা ঘটানো হচ্ছে? সেখানে উপরে উল্লেখিত পবিত্র কুরআন অনুসারে যথাক্রমে তালাকে হাসান এবং খুল তালাক নামীয় বিধান রয়েছে বটে কিন্তু একই সাথে তালাকে-বিদয়াৎ এবং তালাকে ইলা বা জিহার নামীয় তালাকের এমন বিধানও রাখা হয়েছে, যাতে প্রায় তিন মাস সময়ের তালাককে তিন সেকেন্ড সময় সীমার মধ্যে নিয়ে আসা হয়েছে। তালাকে বিদয়াৎ এর মাধ্যমে কোন সময় না দিয়েই একত্রে তিনবার উচ্চারণের মাধ্যমে আল্লাহপাকের নিকট সর্বাধিক অপছন্দনীয় কাজটি অত্যন্ত সহজে সম্পন্ন করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এরূপ তালাককে আবার তালাকে বিদয়াৎ আখ্যা দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ একটি বেদাতি কাজকে ইসলাম সম্মত করা হয়েছে। কিন্তু কেন? এটি কি পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ্র নির্ধারিত বিধানের পরিপন্থী নয়?

আবার চার মাস স্ত্রী সহবাস থেকে প্রতিজ্ঞা পূর্বক বিরত থেকে প্রদত্ত তালাককে তালাকে ইলা বা জিহার বলে। মূলতঃ এটি জাহেলিয়া যুগের নারী নিপীড়নের নিষ্ঠুর একটি প্রথা ছিলো। তখন অনেক পুরুষেরা তাদের স্ত্রীদের কষ্ট দেয়ার উদ্দেশ্যে বছরের পর বছর তাদের থেকে পৃথক থাকতো, তালাকও দিতোনা আবার

Dhaka University Institutional Repository

স্ত্রীর মর্যাদাও দিতোনা। এই সব নারীরা পুনরায় বিয়েও করতে পারতো না, যেহেতু তারা একটি বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ। এই প্রথা নিরসনের উদ্দেশ্যে আল্লাহ্পাক এর সময় সীমা চার মাস করে দিয়ে হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন যে, ''যারা নিজেদের স্ত্রীদের নিকট গমন করবেনা বলে কসম খেয়ে বসে তাদের জন্য চার মাসের অবকাশ রয়েছে। অতঃপর যদি পারস্পরিক মিলমিশ করে নেয়, তবে আল্লাহ্ ক্ষমা□□, দয়ালু। আর যদি বর্জন করার সংকল্প করে নেয়, তাহলে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ শ্রবণকারী এবং জ্ঞানী'' (আঃ ২৬-২৭, সুরা বাকারা)।

এই বিষয়ে আবদুল্লাহ্ ইউসুফ আলী বলেন, ''The pagan Arabs had a custom very unfair to women in wedlock, and this was suppressed by Islam. Sometimes, in a fit of anger or caprice, a husband would take an oath by Allah not to approach his wife. This deprived her of conjugal rights, but at the same time kept her tied to him indefinitely, so that she could not marry agin. If the husband were remonstrated with, he would say that his oath by Allah bound him. Islam in the first place disapproved of thouthtless oaths, but insisted on proper solemn intentional oaths being scruplously observed. In a serious matter like that affecting a wife, if the oath was put forward as an excuse, the man is told that is not excuse at all. Allah looks to intention, not mere thoughtless words. The parties are allowed a period of four months to make up their minds and see if an adjustment is possible. Reconciliation is recommended, but if they are really determined against reconciliation, it is unfair to keep them tied indefinitely''. অর্থাৎ পৌত্তলিক আরব মহিলাদের উপর এটি একটি অন্যায্য রীতি ছিলযে, তাদেরকে তালাকও দেয়া হতোনা আবার দাম্পত্য সম্পর্কও বজায় রাখতোনা। এটি ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের মধ্যেও কেহ কেহ অবলম্বন করতো। কখনও কখনও রাগ বা জেদেও বশবর্তী হয়ে স্বামীরা আল্লাহর নামে শপথ নিতো যে, সে আর তার স্ত্রীর সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রাখবেনা। এটি একদিকে স্ত্রীটিকে দাম্পত্য সম্পর্ক থেকে বঞ্চিত তো করতোই, একই সাথে পুনঃ বিয়েও করার সুযোগ থেকে্ও বঞ্চিত করতো। যদি স্বামীকে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় তার উত্তর হয় যে, তিনি আল্লাহর সাথে শপথের মধ্যে আবদ্ধ আছেন। ইসলামে চিন্তাবর্জিত শপথ অসমর্থিত । তবে সঠিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে গৃহীত শপথের উপর গুরুত্বারোপ করে। শপথ যদি শুধুমাত্র অজুহাত হিসেবে পেশ করা হয় তাহলে তা ক্ষমার অযোগ্য। আল্লাহ সত্যিকারের অভিপ্রায়ের উপর গুরুত্ব প্রদান করেন, চিন্তাহীন বাক্যের উপর নয়।এরূপ ক্ষেত্রে উভয় পক্ষকে তাদের মধ্যে সমন্বয় সম্ভব কিনা তা দেখতে চারমাসের একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অনুমতি দেওয়া হয় । অতৎপর তাদেও মধ্যে পুনর্মিলন গ্রহণযোগ্য। কিন্তু যদি তারা সত্যি পুনর্মিলনের বিরুদ্ধে হয় তবে তাদেরকে অনির্দিষ্ট কালের জন্য বাঁধা রাখা অন্যায্য।[১১৬] এই নিষ্ঠুর প্রথার বিলুপ্তির উদ্দেশ্যে পবিত্র কুরআন সেই প্রথার উল্লেখ পূর্বক চার মাস সময় সীমা বেধে দিয়ে তা প্রতিরোধের ব্যবস্থা করেছে। অথচ আশ্চর্য যে, জাহেলিয়া যুগের এই নিপীড়ন মূলক প্রথাটিকেও তালাকের বিধান হিসেবে শরীয়াভূক্ত করে রাখা হয়েছে। এতে করে ঐ নিপীড়ন অদ্যাবধী মুসলিম সমাজে বিদ্যমান রয়েছে।

---

[১১৬]. Abdullah Yusuf Ali ঃ The Holy Quran (text, translation and commentary) , Amana Corporation, Brentwood, Maryland 20722, U.S.A. p. 91.

মধ্যপাচ্যে এই তালাকে ইলা বা জিহারের সুবিধা তারা কি ভাবে গ্রহণ করে সে সম্পর্কে হুমায়ুন আজাদ বলেন, ''এই বিধান অনুসারে স্বামী তিনমাসের জন্য স্ত্রীকে তালাক দিতে পারে এবং তারপর তাকে ফিরিয়ে আনতে পারে। এ সময়ে স্বামীটি আরেকটি বিয়ে করতে পারে। এর অর্থ হচ্ছে স্বামীটি ঘরে চারটি স্ত্রী রাখতে পারে, এবং আরো চারটি রাখতে পারে ইদ্দা তালাকে বেঁধে। অর্থাৎ এ সময়ে তার থাকে চারটি সক্রিয় স্ত্রী, আর চারটি ছুটি ভোগরত স্ত্রী। এভাবে সে চারটিকে ঘরে ও চারটিকে তালাক ছুটিতে রেখে সম্ভোগ করতে পারে অসংখ্য নারী''।[১১৭] পবিত্র কুরআনে পুরুষদের জন্য একটি সতর্কমূলক ব্যবস্থাকে শরীয়তে তালাকের বিধান হিসেবে রেখে দিয়ে একটি অনাচারকে কিভাবে জিইয়ে রাখা হয়েছে তালাকে ইলা বা জিহার তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

শরীয়তে তালাকের এই সব সহজ শর্তই একদিকে মুসলমান পুরুষদের জন্য তালাককে অবাধ, যত্র-তত্র ও যথেচ্ছ প্রয়োগের সুযোগ করে দিয়েছে, অপরদিকে ইসলাম ধর্মকে প্রচন্ড সমালোচনার সম্মুখীন করেছে। বিদ্রুপ করে হুমায়ুন আজাদ বলেন, ''ইসলামে বিবাহ বিচ্ছেদ বা তালাক গেলাশে থেকে জল ঢালার থেকেও সহজ স্বামীর জন্য, আর স্ত্রীর জন্য ফাঁসীর রজ্জু খোলার মতই কঠিন। অধিকাংশ মুসলমান রাষ্ট্রের নারী জীবন কাটায় তালাকের খড়গের নীচে। যে কোন সময় ওই খড়গ নেমে আসতে পারে''।[১১৮] মধ্যপাচ্যে এই তালাকের সুবিধা কতটা জঘন্য ভাবে চর্চা হয়ে থাকে সে সম্পর্কে হুমায়ুন আজাদ বলেন, ''মধ্যপাচ্যে তালাক সাধারণ ঘটনা, সেখানে সম্পদশালীরা নিয়মিত ভাবে তরুনী স্ত্রী গ্রহণ করে বেহেশতের কিছুটা স্বাদ পেতে চায় বলে ব্যবহৃতদের বাতিল না করলে চলেনা। .. .. ইসলামে স্বামীর পক্ষে তালাক দেয়া এতো সহজ ও সুবিধাজনক যে, ওই সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে তার পক্ষে একই সাথে অসংখ্য স্ত্রী রাখা সম্ভব। .. .. .. মুসলমান স্বামী কোন কারণ না দেখিয়েই যে কোন সময়ে শুধু তিনবার তালাক উচ্চারণ করে স্ত্রীকে ছেড়ে দিতে পারে, আর স্ত্রী স্বামীকে তালাক দিতে পারেনা। স্ত্রীর তালাক দেয়ার সহজাত স্বাধীন অধিকার নেই''।[১১৯]

তালাকের এই যথেচ্ছ প্রয়োগের সুযোগে পুরুষ অধিক নারী ভোগের সুযোগ পেয়েছে বটে কিন্তু নারীকে মানুষের পর্যায়ে থেকে ছুড়ে ফেলে দেয়া হয়েছে নর্দমায়, আঁস্তাকুঁড়ে। নারীর জন্য বিন্দুতম মর্যাদার অবশিষ্ট রাখেনি। সে হয়েছে পুতুল। তসলিমা নাসরিন বলেন, ''পিতার ঘরে চলে স্বামীর সংসারে যাবার নিরলস প্রশিক্ষণ এবং স্বামীর সংসারে স্বামীর মুখের একটি কথা তিনবার উচ্চারিত হলেই ঘর ভেঙ্গে যায়। সেই পিতা এবং স্বামীর ঘর কোনটিই বিশ্বাসযোগ্য নয়, নিশ্চিত বসবাস যোগ্য নয়''।[১২০] শুধু মাত্র পুরুষের খামখেয়ালী জনিত তালাকের কারণে যত মেয়ে পতিতালয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে অন্য কোন কারণে তত নয়। খামখেয়ালী জনিত তালাক সংগঠিত হয়েছে শরীয়তে তালাকের সহজ সুযোগ থাকার কারণেই। যুগ যুগ ধরে এসব হয়েছে ধর্মের নামে। অথচ পবিত্র কুরআনের সাথে যে সবের কোনই সংশ্লিষ্টতা নেই।

৫. হিল্লা বিয়ে কি যথার্থই বিয়ে?

একই সাথে তিনবার তালাক উচ্চারণ এবং তা কার্যকর করার একটি কুফল বা পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হলো- হিল্লা বিয়ে। এই প্রথা এতই জঘন্য যে এটি ইসলাম ধর্মকে চূড়ান্ত ভাবে কলঙ্কিত করে রেখেছে। রাগের মাথায় পুরুষ কর্তৃক স্ত্রীকে একসাথে তিনবার তালাক উচ্চারণের পরক্ষণেই বেশীর ভাগ পুরুষেরই হুঁশ হয় যে

[১১৭]. হুমায়ুন আজাদ ঃ নারী, পূর্বোক্ত , পৃঃ ৭৮।

[১১৮]. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭৮-৭৯।

[১১৯]. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭৮-৭৯।

[১২০]. তসলিমা নাসরিনঃ নির্বাচিত কলাম, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৯।

কাজটি সঠিক হয়নি। তখনই অত্যন্ত সহজে স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনার একটি বহুল প্রচলিত প্রথা এই হিল্লা বিয়ে। প্রচলিত ভাবে, এই প্রথা অনুসারে অন্য একজন পুরুষের সাথে তালাক প্রাপ্ত এই রমণীকে এক রাত্রির জন্য বিয়ে দেয়া হয় এই শর্তে যে, পরদিন সকালে সে এই নারীকে তালাক দেবে। এভাবে একজন পুরুষ এক রাত্রির জন্য একজন নারীকে সমাজ স্বীকৃত ভাবে ভোগাধিকার পায়। পরদিন সকালে শর্ত মাফিক তালাক হয়, অতঃপর পূর্বস্বামী তাকে পুনরায় গ্রহণ করে। এই প্রথার Justification করা হয় এই ভাবে যে, নিজ স্ত্রীকে আরেকজন পুরুষের কাছে দিতে হলো- এটি নাকি সেই স্বামীর জন্য বিরাট শাস্তি। অথচ একজন নিরাপরাধ নারী যে রাতভর কি ভয়ঙ্কর অবস্থার মুকাবিলা করলো, সে কথা কেউ ভেবে দেখলো না। যে পুরুষ জানে যে, এই রাত্রি শেষে এই নারীকে সে আর পাচ্ছেনা, তখন কি সে নরপশুতে পরিণত হয়নি? আর এই নরপশুকে রাতভর যে নারী মুকাবিলা করলো তার কি অপরাধ ছিলো? আরো বড় কথা হলো এরূপ বিয়েতে কোন মোহরানা ধার্য করা হয়না। আদায় তো দুরের কথা। আবার এই তালাকের পর ইদ্দতও পালন করা হয়না। প্রশ্ন হলো মোহরানা ব্যতিরেকে এবং পরদিন সকালেই তালাকের শর্তযুক্ত যে বিয়ে তা কি বৈধ বিয়ে? আবার এরূপ তালাকের পর যে ইদ্দত পালন হলো না তখন এই তালাকও কি বৈধ তালাক? এই রাত্রিতে এই নারীর গর্ভে কোন সন্তান এলে তার পিতৃত্ব নির্ধারিত হলো কিভাবে? এতগুলা ভয়ংকর সব অনিয়ম সমাজ সহ্য করতে পারলো অথচ রাগ সামলিয়ে পবিত্র কুরআন অনুরূপ তালাকের ব্যবস্থা করা গেলো না?

বিষয়টি নিয়ে বহু পূর্ব থেকেই সমালোচনা হচ্ছে কিন্তু কোন প্রতিকার হচ্ছেনা। মওলানা আকরাম খাঁ দুঃখের সাথে বলেছেন, ''সাময়িক উত্তেজনা বশতঃ কোন লোক স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়া বসিল, অথচ অল্প পরে নিজের কাজের জন্য সে অনুতপ্ত হইল। কিন্তু প্রচলিত ফতওয়ার ফলে সে নিরূপায়। তখন অন্য পুরুষের সহিত একটা গোপন ব্যবস্থা করিয়া তাহার সহিত স্ত্রীর বিবাহ দিল .. .. দ্বিতীয় স্বামী চুক্তি অনুসারে স্ত্রীকে তালাক দিল এবং .. .. প্রথম স্বামী সেই স্ত্রীকে পুনরায় বিবাহ করিল। .. .. দুঃখের সঙ্গে বলিতে হইতেছে যে, কোরআনের প্রবর্তিত ইদ্দতের ব্যবস্থাকে অমান্য করিয়া এক মজলিছে তিন তালাক দেওয়ার প্রথা প্রবর্তিত হওয়ায় এবং তাহাকে তিন তালাক বলিয়া গণ্য করার ফলেই সমাজে এই কদাচারের প্রচলন হইয়াছে''।[১২১]

তালাক হবে তিন তুহরে (তিন ঋতু কালের মেয়াদ), এর মধ্যে দুই পক্ষের আলাপ আলোচনা, মীমাংসার যাবতীয় প্রচেষ্টা সত্ত্বেও যদি শেষ পর্যন্ত মীমাংসা সম্ভব না হয়, সে ক্ষেত্রে অন্য কোন ভয়ংকর পরিণতির তুলনায় চূড়ান্ত তালাকই উত্তম এই বিবেচনায় যখন দম্পত্তির চূড়ান্ত বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটেই গেলো তখন এই স্বামী আর স্ত্রী দুজন দুজনার জন্য সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হয়ে গেলো। এটিই আল্লাহ্‌র নির্দেশ - ''অতঃপর যদি (দুবার তালাক দেবার পর তৃতীয়) তালাক দেয়, তাহলে ঐ স্ত্রী আর তার জন্য হালাল হবেনা'' (আঃ ২৩০, সুরা বাকারা)। অর্থাৎ এদের মিলনের পথ নিষিদ্ধ হয়ে গেল। যতক্ষণ পর্যন্ত স্ত্রীটির ২য় কোন বিয়ে না হয়। আল্লাহ্‌পাক বলেন, '' তবে যদি দ্বিতীয় কোন ব্যক্তির সাথে তার বিয়ে হয় তাহলে এক্ষেত্রে প্রথম স্বামী এবং এই মহিলা যদি আল্লাহ্‌র সীমা রেখার মধ্যে অবস্থান করতে পারবে বলে মনে করে তা হলে তাদের উভয়ের জন্য পরস্পরের দিকে ফিরে আসায় কোন ক্ষতি নেই'' (আঃ ২৩০, সুরা বাকারা)।

এই ২য় বিয়েও অবশ্যই বৈধ বিয়ে হতে হবে। মোহরানা ব্যতিরেকে এবং তালাক প্রদানের শর্তে নির্দিষ্ট মেয়াদের বিয়ে কোন অবস্থাতেই বৈধ বিয়ে নয়। অর্থাৎ স্ত্রীটি যদি কখনো আর বিয়ে না করে তবে এই স্বামী তাকে কখনোই পাবে না এবং মহান আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত নিয়মে যদি সে ২য় বার বিয়ে করে এবং সুখে শান্তিতে বসবাস করতে থাকে সে ক্ষেত্রেও প্রথম স্বামীর তাকে পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। তবে ঘটনাচক্রে যদি

---

[১২১]. মোহাম্মদ আকরম খাঁ ঃ সরল বাংলা অনুবাদ ও বিস্তারিত তাফসীর সহ কোরআন শরীফ (১ম খন্ড), পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৮৪।

Dhaka University Institutional Repository

এই বিয়েও কোন কারণে ভেঙ্গে যায়, তবে যথারীতি ইদ্দত পালনের পর অন্য যে কোন পর পুরুষের মতই সে তার পূর্ব স্বামীকে বিয়ে করতে পারবে। এই ক্ষেত্রে আল্লাহপাক এই সুযোগ রেখে বলেন, ''আর যখন তোমরা স্ত্রীদেরকে তালাক দিয়ে দাও এবং তারপর তারাও নির্ধারিত ইদ্দত পূর্ণ করতে থাকে, তখন তাদেরকে পূর্ব স্বামীদের সাথে পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে নিয়মানুযায়ী বিয়ে করতে বাধাদান করোনা (আঃ ২৩২ সুরা বাকারা)। এখানে যে 'পূর্ব স্বামী' বলা হয়েছে তা লক্ষ্যণীয়। একই স্বামীকে বোঝানো হলে পূর্ব স্বামী কথাটি আসতোনা। স্ত্রীকে ফেরত পাওয়ার এই কঠিন নিয়মটির উদ্দেশ্যই হলো তালাক ঠেকানো। এবং পূর্বস্বামীর কাছে নিয়মানুযায়ী বিয়ের সুযোগ রাখার কারণ হলো পরিশুদ্ধতা এবং বিশুদ্ধতা। আল্লাহপাক বলেন, ''এর মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে পরিশুদ্ধতা এবং অনেক পবিত্রতা'' (আঃ ২৩২, সুরা বাকারা)। এই ব্যবস্থাকে শরীয়তে তাহলীল বলে। এখন শরিয়তের বিধানের নামে এই ব্যবস্থাটি যে ভাবে প্রচলিত রয়েছে তাতে এই হিল্যা প্রথা ইসলাম ধর্মের মৌলিকত্বকেই বানচাল করে দিয়ে সত্যই তালাককে করে তুলেছে- 'গেলাসে জল ঢেলে খাওয়ার মতই সহজ' যার ফলে সমাজ লিপ্ত হচ্ছে অনাচারে, কদাচারে। প্রচলিত এই ব্যবস্থা প্রসঙ্গে সা'দ উলাহ বলেন, ''হিল্লা ব্যবস্থা মানুষের তৈরী একটা চাতুরী, বিধানকে কৌশলে এড়িয়ে সুবিধা নেয়া''।[১২২] সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী(র) বলেন, ''সহীহ হাদিস থেকে জানা যায়, যদি কোন ব্যক্তি নিজের তালাক দেয়া স্ত্রীকে নিছক নিজের হালালের জন্য চক্রান্ত ভাবে কারোর সাথে বিয়ে দিয়ে দেয় এবং প্রথম থেকে তার সাথে চুক্তি করে নেয় যে, বিয়ে করার পর সে তাকে তালাক দিয়ে দেবে, তাহলে এটা হবে একটি সম্পূর্ণ অবৈধ কাজ। এই ধরনের বিয়ে মোটেই বিয়ে বলে গণ্য হবেনা বরং এটি হবে নিছক একটি ব্যভিচার''।[১২৩] সা'দ উলাহ চৌদ্দ শ' শতাব্দির আন্দালুসিয়ার (স্পেন) একজন খ্যাতনামা ইসলামী জুরিষ্ট আবু ইসহাক আল-শাতিবির (মৃঃ ১৩৮৮) উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, ''আইনকে ফাঁকি দিয়ে কাজ সিদ্ধ করার জন্য Legal stratagem- এর অনেক গুলোর মধ্যে হিল্লা ব্যবস্থা একটি চুক্তির মাধ্যমে 'মুহালিল' নিয়োগ এবং অন্তর্বর্তীকালীন বিবাহ, কোরানিক বিধানকে চোখঠারা মাত্র''।[১২৪]

এখন প্রশ্ন হলো গভীর ভাবে ইসলাম ধর্মের যাবতীয় বিধিবিধান নিয়ম-কানুন পর্যালোচনা না করে হিল্লা নামীয় বিবাহ ও তালাকের মাধ্যমে পবিত্র ধর্মকে নিয়ে যে খেইল তামাশা করা হলো এবং হচেছ তার জবাব কি? মহান আল্লাহ কি এই বলে সাবধান করে দেননি যে, '' আল্লাহ র বিধানকে খেইল-তামাশা মনে করিওনা? (আঃ ২৩১, সুরা বাকারা)।

৬. মোহরানা কি শুধুই কাগজে কলমে লিপিবদ্ধ হওয়ার জন্য?

বিয়ের মোহরানা ধার্যের বিষয়টিও উল্লেখযোগ্য। মুসলিম বিয়ের চুক্তিনামাকে বলে কাবিন। এই কাবিনে প্রচলিত শরিয়তের নামে মোহরানার অংককে দুইভাগে ভাগ করে একটি সহজ শর্ত রাখা আছে। তাহলো মুআজ্জল তথা তলবী মোহরানা এবং মুয়াজ্জল বা স্থগিত মোহরানা। অথচ এই বিষয়ে আল্লাহ্পাক নির্দেশ করেন, ''আর তোমরা স্ত্রীদিগকে মোহর সন্তুষ্ট চিত্তে দিয়ে দাও। হ্যাঁ তবে যদি স্ত্রীগণ সন্তুষ্টচিত্তে তোমাদিগকে উক্ত মোহরের কিয়দংশ ছাড়িয়া দেয় তবে তোমরা উহা মর্যাদার তৃপ্তকর মনে করিয়া উপভোগ কর'' (আঃ ৪, সুরা নেছা)। এখানে মোহর দিয়ে দেয়ার জন্য পুরুষকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, নারীকে ছাড় দেয়ার কোন নির্দেশ দেয়া হয়নি। বলা হয়েছে, যদি সে ছাড় দেয়, তাও আংশিক। এর থেকে এটি সুস্পষ্ট যে স্বামীর পক্ষ

---

[১২২]. দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৬ জানুয়ারী, ২০০১ ইংরাজী।

[১২৩].সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী ঃ তাফহীমুল কুরআন, (আব্দুল মান্নান তালিব কর্তৃক অনুদিত), ১ম খন্ড, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা,বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০, ১৭তম প্রকাশ ২০০৪, পৃঃ ১৮৯ -১৯০। ।

[১২৪].দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৬ জানুয়ারী, ২০০১ ।

থেকে মোহর পরিশোধ করাই বাধ্যতামূলক, আর স্ত্রীর পক্ষ থেকে তার আংশিক ছাড় দেয়া হবে কি হবেনা সেটি একান্তই স্ত্রীর নিজস্ব বিচার বিবেচনার বিষয়। অথচ শরীয়তের নামে কাবিনে অনুরূপ শর্ত জুড়ে দিয়ে স্ত্রীর জন্য আংশিক ছেড়ে দেয়ার বিষয়টাকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছ, যা পবিত্র কুরআনের বিধানের সাথে সংগতিপূর্ণ নয়। এরূপ ছাড় পাওয়ার কারণেই মোহরানা সংক্রান্ত আল্লাহপাকের বিধানও মুসলিম সমাজে খেইল তামাশা বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ কাবিনে একটি শর্ত নাম মাত্রই আছে, খুব কম পুরুষই তা আদায় করে। বিষয়টি বর্তমানে বরং স্বামী দিবে কি দেবে না তা স্বামীর ইচ্ছেধীন হয়েছে এবং প্রথমতঃ আংশিক শেষে পুরোটাই ছেড়ে দেয়া স্ত্রীর জন্য বাধ্যতামূলক হয়ে গিয়েছে। শুধু তাই নয়, এই সুযোগে মেয়েটির পক্ষ থেকেই বহন করতে হচ্ছে বিয়ের খরচ এবং তার ঘাড়েই চেপেছে যৌতুকের বোঝা। অর্থাৎ ভিন্ন নামে তথা যৌতুকর নামেই স্বামী তার স্ত্রীর নিকট থেকে মোহরানা আদায় করে নিচ্ছেন। এই সব পবিত্র ধর্মকে নিয়ে খেলা তামাশার ই সামিল। এরই সুযোগে হুমায়ুন আজাদ বলেন, ''বিয়ের চুক্তির ফলে স্ত্রী স্বামীর কাছ থেকে পায় দেন মোহর, কিছু টাকা বা সম্পত্তির লিখিত প্রতিশ্রুতি। দেন মোহর শুধু কাবিনে লেখা থাকে, স্ত্রী তা সাধারণত পায়না। এমনকি বিচ্ছেদ হলেও দেনমোহর সাধারণত আদায় করতে পারেনা''।[১২৫] আর তসলিমা নাসরিন বলেন, '' বিবাহে দেন মোহরের টাকা নিয়ে দর কষাকষি চলে। কন্যা পক্ষ চান টাকা বাড়াতে, বর পক্ষ চান কমাতে। এই টাকা আদপে দৃশ্যমান নয়, কেবল উচ্চারিত''।[১২৬]

মোহরানা নিয়ে এই কষাকষির বিষয়টিও কিন্তু তিন সেকেন্ডে তালাক সংগঠনের কুফল। মেয়ের পক্ষ বাড়াতে চান এই কারণে যে, অন্ততঃ তালাকের পরও যদি টাকাটা আদায় করা যায় তবে তা দিয়ে মেয়েটির কোন একটা গতি করা যাবে, কিংবা মোটা অংকের মোহরানার ভয়েও যদি তালাক ঠেকানো যায়। অর্থাৎ এই কষাকষি কিন্তু তালাককে কেন্দ্র করেই। অবস্থা দৃষ্টে প্রতীয়মান হচ্ছে, বিয়ের সময়েই এই মোহরানা প্রদান যে বাধ্যতামূলক, মহান আল্লাহর এই নির্দেশ সকলেই যেনো ভুলে বসে আছেন। আর তাই মোহরানা বর্তমানে একটি অদৃশ্য খাত (ইনভিজিবল সেকটর) মাত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এই অদৃশ্য খাতের অংক বাড়ানোটাই মেয়ের পক্ষে আবার একটা সামাজিক মর্যাদা বা স্ট্যাটাস হিসেবেও বিবেচনা করা হচ্ছে, তাতে বরের সংগতি/অসংগতিকে বিবেচনায় আনা হচ্ছে না। এবং যেহেতু বিষয়টি অদৃশ্য একটি খাত তাই অনেক সময় ছেলের পক্ষও অধিকাংশ ক্ষেত্রে টাকার অংকের পরিমাণ নিয়ে মাথা ঘামাননা।

শাহ আবদুল হান্নান মোহরানা সম্পর্কে বলেন, 'Dowry or marriage gift by bride groom to the bride is a symbolic expression of the groom cognigance of the economic responsibilities of marriage and of his readiness to assume all such responsibilities subsiquent to marriage'. অর্থাৎ 'মোহরানা হচ্ছে পুরুষ কর্তৃক নারীর আর্থিক নিরাপত্তার পূর্বশর্ত। এর থেকে নারী নিশ্চিত হয় যে এই পুরুষ বিয়ের পর তার আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে'।[১২৭]

এভাবেই মোহরানা রূপ চমৎকার একটি কুরআনিক বিধানকেও কিভাবে সম্পূর্ণরূপে খেইল তামাশায় পরিণত করে ফেলা হয়েছে। এই বিষয়টি বাংলাদেশের আলেম-উলেমাগণের নজরে আসছেনা।

---

[১২৫]. হুমায়ুন আজাদ ঃ নারী, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭৭।

[১২৬]. তসলিমা নাসরিনঃ নির্বাচিত কলাম, পূর্বোক্ত , পৃঃ ১০০।

[১২৭].শাহ আবদুল হান্নান ঃ Social laws of Islam, Bangladesh Institute of Islamic thought (BITT), Dhaka, ১৯৯৫, পৃঃ ১৬।

Dhaka University Institutional Repository

৭. ব্যভিচারী নারী - পুরুষের বিয়ে সংক্রান্ত

ব্যভিচারী নারী কিংবা পুরুষের সাথে বিয়ের বিষয়টি শরীয়ত সংক্রান্ত আলোচনার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। পবিত্র কুরআনের সুরা নুরের ৩নং আয়াতে বলা হয়েছে, ''ব্যভিচারী পুরুষ ব্যভিচারী নারী অথবা মুশরিকা নারীকেই বিয়ে করে। এবং ব্যভিচারীনি অবশ্যই ব্যভিচারী অথবা মুশরিককে বিয়ে করে। এরা মুমিনদের জন্য হারাম''। প্রশ্ন হলো পবিত্র কুরআনের এই নির্দেশের আলোকে মুসলিম সমাজে কোন বিধিব্যবস্থা আছে কি?

অর্থাৎ অসৎ চরিত্রের নারী- পুরুষের সাথে সৎ চরিত্রের নারী - পুরুষের বিয়ে যে হারাম করে দেয়া হয়েছে এই বিষয়ে আমাদের প্রচলিত শরীয়তে কোন বিধান রয়েছে কি? সম্ভবতঃ নেই। থাকলে এই ধরনের বিয়ে নিষিদ্ধ থাকতো এবং ভুলক্রমে এ ধরনের বিয়ে সংগঠিত হয়ে গেলেও সেরূপ বিয়ের তড়িৎ তালাক সংগঠনের বিধান থাকতো। কিন্তু তাতো হচ্ছেনা? এবং আল্লাহ্‌র এই বিধান সমাজে অনুসরণ করা হলে অত্যন্ত সহজে সমাজ থেকে ব্যভিচারের মুলোৎপাটন করা যেতো। পক্ষান্তরে তা না করার কারণে এ ধরনের বিয়ে অহরহ হচেছ । তসলিমা নাসরিন দুঃখ করে বলেছেন, ''কেউ জানেনা এত ঘন ঘন এ্যবরশন হচ্ছে কেন? কেন জন্ম নিচ্ছে এত বিকলাঙ্গ শিশু। এর কারণ সিফিলিস। বড় ভয়ংকর রোগ এই সিফিলিস''।[১২৮]

যদিও একটা সিফিলিস মুক্ত সমাজ গঠনের জন্য, এইডস মুক্ত সমাজ রাখার জন্য পবিত্র কুরআনের এই নির্দেশের কোনই বিকল্প নেই, কিন্তু দুঃখজনক যে, তথাপিও পবিত্র কুরআনের এই আয়াতের আলোকে কোন বিধি বিধানের চর্চা মুসলিম সমাজের কোথাও আছে মর্মে দেখা যায়না। অন্ততঃ বাংলাদেশের সমাজে তো নেইই। নেই কেন? তা অধিকাংশ ক্ষেত্রে চরিত্রহীন পুরুষদের স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে যাবে বলেই কি?

৮. ফতওয়া কি এবং কেন?

ফতওয়া কে ফতোয়াবাজিতে পরিণত করে কিভাবে তা নারী নির্যাতনের সহায়ক হয়ে উঠেছে তার বাস্তব উদাহরণ সহ ৪র্থ এবং ৫ম অধ্যায়ে বিস্তারিত দেখানো হয়েছে। বর্তমানে দেখানো হচেছ ইসলামিক বিধি ব্যবস্থায় ফতোয়া কি ও কেন? এবং অপব্যাখ্যার মাধ্যমে তার পরিণতি কি ?।

প্রথমেই দেখা যাক ফতওয়া কি? ইসলামিক ইনসাইক্লোপেডিয়া মতেঃ ''Fatwa is the openion on a point of law, the term `law' applying in Islam, to all civil or religious matters. Bassically a Fatwa is a decree issued by a religious expert or advisor for a violation of the laws of Islam, often on issues of morality". অর্থাৎ "ইসলাম ধর্মের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যে কোন সিভিল অথবা ধর্মীয় বিষয়ে প্রদত্ত অভিমত কে আইনের পরিভাষায় ফতোয়া বলা হয়। মূলতঃ নৈতিকতার বিষয়ে ইসলামের আইন লঙ্গনের জন্য ফতোয়া, ধর্মীয় বিশেষজ্ঞ বা উপদেষ্টাদের দ্বারা জারিকৃত আদেশ বা ডিক্রি"। [১২৯] এবার দেখা যাক, কারা ফতওয়া দেয়ার অধিকারী? ''The person who gives the Fatwa or is engaged in that profession is a Mufti (Jurisconsultant)''. যিনি ফতোয়া দেন অথবা এই পেশায়(আইনবিষয়ক অভিমত দাতা) নিযুক্ত তিনি মুফতি"। তাহলে মুফতি কে? ''The Mufti would have to be a person of high moral standerds and some one who was also considerd very knowledgeable". অর্থাৎ একজন আদর্শ ব্যক্তিত্বের অধিকারী, বুদ্ধিমান এবং জ্ঞানী ব্যক্তিই হলেন - মুফতি"।[১৩০]

---

[১২৮]. তসলিমা নাসরিনঃ নির্বাচিত কলাম, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১০০।

[১২৯]. Star Magazine, March 2, 2001.

[১৩০]. Star Magazine, March 2, 2001.

কোন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ফতওয়া দেয়ার বিধান প্রচলিত হয়েছে? ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় মহানবী (সঃ) স্বয়ং যাবতীয় বিষয়ে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ প্রদান করতেন। কোন কোন বিষয়ে তিনি সাহাবাদের সাথে আলোচনাও করতেন। অতঃপর ইসলামের চার খলিফার আমলেও একই ব্যবস্থা অব্যাহত থাকে। কিন্তু পরবর্তীতে ইসলামিক সাম্রাজ্য বিস্তারের সাথে সাথে কাজী কিংবা যিনি বিচার কাজে নিযুক্ত থাকতেন তাঁকে আইনী সহায়তা প্রদানের জন্য তৎকালীন বিজ্ঞ ব্যক্তিদের মধ্যে থেকে মুফতি নিয়োগ করা হতো। কোথাও কোথাও স্থায়ী মুফতি নিয়োগ থাকতেন। Encyclopaedia of Islam দৃষ্টেঃ ''When judges of a court were confronted with a legal problem they would consult the muftis where legal opinions were recorded and circulated for study. Private citizens also consulted muftis for their opinions. These opinions or fatwas were not legally binding on the judges but considerd very important and persuasive. অর্থাৎ যখন আদালতের কোন বিচারক কোন আইনী সমস্যার মুখামুখি হন, যখন আইনী মতামত রেকর্ড করা হয় এবং প্রচারিত হয় তখন তাঁরা মুফতিদের পরামর্শ গ্রহণ করে থাকেন। সাধারণ নাগরিকেরাও আইনের ক্ষেত্রে তাদের মতামত দৃঢ় করার লক্ষ্যে প্রয়োজনে মুফতিদের সাথে পরামর্শ করে থাকেন। এই অভিমত বিচারকদের জন্য গ্রহণ বাধ্যতামূলক নয় কিন্তু তাদের সিদ্ধান্তের রক্ষার্তে সহায়ক এবং খুবই গুরুত্বপূর্ণ" [১৩১]

তাহলে ফতোয়া ব্যবস্থা বিচার ফয়সলার সাথে সম্পৃক্ত এবং যারা ফতওয়া দেবেন তাঁরা অবশ্যই সংশিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞ। সহজেই বোঝা যাচেছ যে, ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আদালতকে যাঁরা আইনী সহায়তা দিয়ে থাকেন তাঁরা মুফতি এবং তাঁদের প্রদত্ত ব্যাখ্যাই কখনও সাধারণ ভাবে কখনও আদালতের মাধ্যমে জারি হওয়াই - ফতওয়া। এই ব্যবস্থার প্রচলন হয়েছে ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য, অন্যায় অবিচার দূর করার জন্য। স্বভাবতঃই যিনি ফতোয়াদাতা তিনি ইসলামিক বিষয়ে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত।

কিন্তু বাংলাদেশের সমাজে অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত লোকেরা যত্র তত্র যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে, ইসলামিক বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে যে ফতওয়া দিয়ে তা কার্যকর করে বেড়াচ্ছেন তা কতখানি ইসলাম সম্মত হচ্ছে? বলা হয়ে থাকে যে বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থা ইসলামিক সমাজ ব্যবস্থা নয়, কিংবা এখানকার আদালত ইসলামিক আদালত নয়, তাই ফতওয়া দেয়ার দায়িত্ব অন্যরা নিয়েছে। কিন্তু এটা কি কোন যুক্তি? প্রচলিত আদালত সমূহের জন্য তো এরূপ কোন নিষেধাজ্ঞা নেই যে, তাঁরা ইসলামিক বিষয়ে কিংবা পবিত্র কুরআন ও হাদিসের বিষয়ে কোন রায় দেবেন না? এবং প্রচলিত আদালত সমূহকে আইনী সহায়তা দানকারী বিজ্ঞ কৌশলীগণ এতদবিষয়ক কোন ব্যাখ্যা দিতে পারবেননা? এবং ইসলামিক সমাজ ব্যবস্থা না হলে অজ্ঞ অশিক্ষিতরা এর আলোকে বিচার পরিচালনা করতে হবে। আসলে এই বিষয়ে স্বচছ ধারণার অভাবেই লোকেরা আদালতের স্মরণাপন্ন না হয়ে কিংবা ইসলামিক বিষয়ে বিজ্ঞ ব্যক্তিদের কাছে না গিয়ে, যাচ্ছে অজ্ঞ, অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত লোকদের কাছে। আবার এই ধরনের ব্যক্তিরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিজেরাই ফতওয়া দেয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করে ফতওয়া দিয়ে তা কার্যকরও করছেন। প্রশ্ন হলো সেটি কি ইসলাম সম্মত। এ ধরনের ফতওয়ার শিকার হচ্ছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে দরিদ্র অসহায় নীরিহ নারীরা। পুরুষকে ফতওয়ার স্বীকার হতে কমই দেখা যায়।

চুরি করলে হাত কাটতে হয় - এটি পবিত্র কুরআনেই স্পষ্ট বিধান। কিন্তু চুরি সংক্রান্ত ঘটনার বিচার প্রচলিত আদালত থেকেই হচ্ছে, যে বিচার পবিত্র কুরআন সম্মত নয়। অথচ সকলেই তা মেনে নিচ্ছে। এই বিষয়ক কোন ফতওয়ার কথা কখনই শোনা যায়না। বিয়ের সময় যৌতুক নেয়া ইসলাম সম্মত নয়। অথচ এই

[১৩১]. Star Magazine, March 2, 2001.

অপকর্মটি বাংলাদেশে অহরহই হচ্ছে, তার বিপরীতে তো একবারের জন্যও কোন ফতোয়া উচ্চারিত হচ্ছেনা? বিয়ের সময় স্ত্রীকে মোহরানা দেয়া হচ্ছেনা, পৈত্রিক সম্পত্তি থেকে হরহামেশাই মেয়েদেরকে বঞ্চিত করা হচ্ছে - যা পবিত্র কুরআনের স্পষ্ট নির্দেশনার বিরোধী। অথচ এই সব ক্ষেত্রে ফতওয়ার কথা কখনও শোনা যায়না। এর কারণ কি?

এই সব অপরাধ অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুরুষদের কর্তৃক সংগঠিত হয় বলেই কি? পবিত্র কুরআন তথা ইসলামের মৌলিক আদর্শ সম্পর্কে বিন্দুতম জ্ঞান না রেখেই এই সব অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত ফতওয়াবাজরা যে ভাবে নারীজাতির জন্য ক্ষতিকর একপেশে ফতওয়া দিয়ে যাচ্ছেন তাতে শুধু যে নারীরাই ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে তা নয়, পবিত্র ধর্ম ইসলাম ধর্মেরও মারাত্মক ক্ষতি হচ্ছে। এই ধরনের এক পেশে ফতওয়াবাজদের উদ্দেশ্যে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম যথার্থই বলেছেন-

হাদিস কোরাণ ফে’কা লয়ে যারা করিছে ব্যবসাদারী
মানেনা ক’ তারা কোরানের বাণী- সমান নর ও নারী।
শাস্ত্র ছাকিয়া নিজেদের যত সুবিধা বাছাই করে
নারীদের বেলা গুম হয়ে রয় গুমরাহ যত চোরে![১৩২]

বাংলাদেশে তো ফতওয়া দেয়া হচ্ছে নারীকে পাথর মেরে মারার জন্য, বিদয়াতি তালাকের পর তালাক প্রাপ্ত নারীকে এক রাতের জন্য ভিন্ন পুরুষকে নারীভোগের সুবিধা করে দেয়ার জন্য। এ সব যে, পবিত্র কুরআন ও সহিহ হাদিস সম্মত নয় তা পূর্বের আলোচনার থেকে স্পষ্ট। অর্থাৎ প্রদত্ত এই সব ফতওয়া ইসলাম ধর্মের মৌলিক আদর্শের সাথে প্রায়ই সংগতিপূর্ণ নয়। ইসলাম শান্তির ধর্ম। ফলে শান্তি-শৃঙ্খলার পরিপন্থি এই সব ফতোয়া যাদের উপর আরোপ হচ্ছে তাদের তো বটেই, একই সাথে পবিত্র ধর্ম ইসলামের যে ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে, তার জন্য কি এই ধর্মের অনুসারিদের মহান আল্লাহ্‌র কাছে জবাবদিহী করতে হবেনা? এইসব ফতওয়া দেশে বিদেশে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের কাছে ইসলাম ধর্মকে সমালোচনার বস্তুতে পরিণত করছে। দুঃখজনক যে তথাপিও যত্রতত্র, যার তার দ্বারা এই ধরনের নোংরা ফতওয়া দেয়ার বিষয়টি নিয়ে ইসলামিক চিন্তাবিদগণ মাথা ঘামাচ্ছেননা।

ফতওয়া দিবে ইসলামিক বিষয়ে বিশেষ ভাবে বুৎপত্তি সম্পন্ন বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ। প্রচলিত আদালতও প্রয়োজনে সংশিষ্ট বিষয়ক বিশেষজ্ঞদের মতামতও গ্রহণ করতে পারেন। অর্থাৎ যত্র তত্র ও যথেচ্ছ ফতওয়া নিষিদ্ধ হওয়া আবশ্যক। এই বিষয়ে ইসলামী চিন্তাবিদগণের অগ্রণী ভূমিকা পালন আবশ্যক। অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত ব্যক্তিগণ কর্তৃক ফতওয়া সম্পর্কে চৌদ্দশ’ শতকের স্পেনের ইসলামী চিন্তাবিদ আবু ইসহাক আল শাতিবির মতামত হলো- “Fatwas are issued with a view of satisfying, not the requirement of law, but rather personal interests and greed’’. অর্থাৎ “আইনের সন্তোষজনক অবস্থান নির্ধারণের জন্য নয় বরং ব্যক্তিস্বার্থ ও লোভ কার্যকর করার করার স্বার্থেই এটি জারি করা হয়”।[১৩৩]

ব্যক্তিগত স্বার্থ এবং লোভ যেখানে মুখ্য, সেখানে আল্লাহ্‌র বিধান অকার্যকর হতে বাধ্য। মহান আল্লাহ্ কি আমাদের হুশিয়ার করে দেননি এই বলে যে, ‘‘যে ব্যক্তি আল্লাহতা’য়ালার (বিধান অনুযায়ী) হুকুম না করে তবে এমন লোক তো পূর্ণ কাফের’ (আঃ ৪২, সুরা বাকারা)। আল্লাহ্‌পাক আরও বলেন, ‘‘আর মিশ্রিত

[১৩২] . কাজী নজরুল ইসলাম ঃ সঞ্চিতা (কবিতা- মিসেস এম রহমান), মওলা ব্রাদার্স, ঢাকা ১৯৮৩, পৃঃ ১৫৯।

[১৩৩] . উদ্ধৃতকরেন সা’দ উল্লাহ, দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৬ জানুয়ারী, ২০০১ ।

করিওনা সত্যকে অসত্যের সহিত এবং গোপন করিওনা সত্যকে" (আঃ ৪২, সুরা বাকারা)। আরও ভয়ংকর সতর্কতা এসেছে নিম্নের আয়াতে, "যাহারা আল্লাহর অবতারিত কিতাব গোপন করে এবং তৎপরিবর্তে নগন্য সম্পদ আদায় করে তারা আর কিছুই নহে, শুধু নিজেদের পেটে অগ্নি পুরিতেছে, আর আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন তাহাদের সাথে কথাও বলিবেননা এবং তাহাদিগকে নির্মলও করিবেননা, আর তাহাদের যন্ত্রনাময় শাস্তি হইবে। ইহারা এমন লোক যাহারা দুনিয়াতে হেদায়েত ত্যাগ করিয়া গোমরাহী আর আখেরাতে ক্ষমা প্রাপ্তি ছাড়িয়া আযাব গ্রহণ করিয়াছে। সুতরাং তাহারা দোজখের জন্য কতই না সাহসী"। (আঃ ১৭৪-১৭৬, সুরা বাকারা)।

এই ধরনের হুশিয়ারী এই কারণে যে, তিনিই তো স্রষ্টা, তাঁর প্রদত্ত বিধান তাঁরই সৃষ্ট সমগ্র প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাই তাঁর বিধানের পরিবর্তন করা যাবেনা। আল্লাহ্পাক বলেন, "আল্লাহ ঠিক ঠিক ভাবে কিতাব নাযেল করেছেন" (আঃ ১৭৬, সুরা বাকারা)। অর্থাৎ একেবারে যথার্থ (Accurate) বিধান তাঁর পক্ষেই দেয়া সম্ভব, তাই সীমিত জ্ঞান শক্তির অধিকারী মানুষকে তার দেয়া বিধানাবলীকে সন্দেহাতীত ভাবে গ্রহণ করতে হবে। আল্লাহ্পাক বলেন, "এই কিতাব এমন, যাতে কোনই সন্দেহ নেই" (আঃ ২, সুরা বাকারা)।

ফতওয়া নিয়ে আলোচনার মাধ্যমেই শরীয়ত সম্পর্কিত আলোচনার বর্তমান অধ্যায়ের উপসংহারে আসা যেতে পারে এই মর্মে যে, চার ঈমামের পরবর্তীকালে তাঁদের গ্রন্থ সমূহ হারিয়ে যাওয়ার কারণে পরবর্তী কালের টিকাকার ও ভাষ্যকারদের হাতে পড়েই এবং personal interests এবং greed এর বশবর্তী ফতওয়ার কারণেই ইসলামী আইন নাজেহাল হয়েছে এবং ঐশী গ্রন্থ থেকে পূর্বে উল্লেখিত পরিবর্তনগুলো ধীরে ধীরে সংগঠিত হয়েছে। তবে বিষয়টি রহস্যজনক এবং বিস্ময়কর এখানেই যে, এত্ত সব পরিবর্তন কারও চোখে পড়ছেনা বরং আজও দাবী করা হচ্ছে প্রচলিত শরীয়তি বিধি বিধান অপরিবর্তনীয় এবং ঐশী। বিষয়টি নিয়ে বিস্তর গবেষণা হচ্ছেনা, কেউ তলিয়ে দেখছেননা, অনুসন্ধান করছেননা যে, সেগুলো কতখানি পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর পরিপন্থি হচ্ছে। পক্ষান্তরে আল্লাহ্পাক বলছেন, "হে মুমিনগণ যদি কোন দুস্কার্যকারী তোমাদের নিকট কোন সংবাদ লইয়া আসে, তবে খুব অনুসন্ধান করিয়া লও, যেন অজ্ঞতা বশঃত কোন সম্প্রদায়ের ক্ষতি করিয়া না ফেল। অতঃপর নিজের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হইতে হয়" (আঃ ৬, সুরা হুজরাত)। ঘটনা কিন্তু তাই ঘটছে। শরীয়তের প্রচলিত বিধানাবলীকে খুব অনুসন্ধান না করার কারণে মুসলিম জাতি তাদের নারী সম্প্রদায়ের বিস্তর ক্ষতি করে ফেলেছে। নারী সম্প্রদায়ের ক্ষতি করতে গিয়ে বিষয়টি ভূমেরাং হয়ে পুনরায় সমগ্র মুসলিম সমাজেরই ক্ষতির কারণ হয়ে গিয়েছে। যাতে করে মুসলিম সমাজ এতই পেছনে পড়ে গিয়েছে যে, আজ অন্য সম্প্রদায়ের করুণাই মুসলমানদের পাথেয় হয়ে আছে। শুধু তাই নয় ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের কাছে আজ ইসলাম নারী নির্যাতন মূলক ধর্ম হিসেবে খ্যাতি পেয়ে আছে। পক্ষান্তরে নারীকে তার ধর্মীয় অধিকার থেকে বঞ্চিত করা না হলে, নারী তার মাতৃত্বের মহিমায় বিকশিত হতে পারতো, তখন তার হাতে সন্তানরাও বেড়ে ওঠতো যথাযথ ভাবে, এভাবেই মুসলমান সমাজই হতো পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সমাজ। কেবলমাত্র ধর্মকে একটা নির্দিষ্ট বলয়ে আঁটকে রাখার কারণেই, খুব বেশী করে অনুসন্ধান না করার কারণেই একটি শ্রেষ্ঠ ধর্ম তার মর্যাদা হারাতে বসেছে।

মহান আল্লাহ্র খুব বেশী করে অনুসন্ধান করে নেয়ার- এই নির্দেশ কিন্তু কোন নির্দিষ্ট যুগের কিংবা সময়ের জন্য নয়, বরং এই নির্দেশ সর্বকালের সর্বযুগের মুমিন মুসলমানদের জন্য অবশ্য পালনীয়। এই প্রসঙ্গে গাজী শামছুর রহমানের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, "প্রশ্ন হচ্ছে চার ঈমামের পরে অনাগত যুগে

কুরআনের মূলনীতিকে অবলম্বন করে বুদ্ধির প্রয়োগ দ্বারা যুক্তি ভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা আলকুরআনের নীতি বিরুদ্ধ হবে কিনা? রক্ষণশীল পন্ডিতগণ মনে করেন, চার ঈমামের পর ইজতিহাদ সম্ভব হবেনা। ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয় ইমাম আবু হানিফার বেলায়। তাঁর মতে ইসলামী আইন চিরগতিশীল এবং মানব সভ্যতার প্রগতির সঙ্গে মুজতাহিদরা প্রতি জমানায় ইজতিহাদের সুযোগ গ্রহণ করার অধিকারী।

মনীষী ইকবাল সহ এ কালের প্রগতিবাদীরা ইজতিহাদ সম্পর্কে উক্ত মতেরই সমর্থক। প্রগতিবাদীদের যুক্তি হচ্ছে, আল কুরআন ও সুন্নাহ ইজতিহাদের সমর্থক। কোন বিশেষ কাল বা জামানার পরে ইজতিহাদের দরজা বন্ধ হবে, এই মর্মে রসুলুলাহ (সঃ) এর আদৌ কোন নির্দেশ নেই। রসুলুল্লাহ (সঃ), তাঁর সাহাবারা কিংবা অপর কোন ইমাম, মুজতাহিদ একথা বলেননি যে, হিজরীর দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় শতাব্দীর পর মুসলমানেরা কোন পরিবর্তিত অবস্থার মুকাবিলা করবেনা। এমতাবস্থায় সন্দেহাতীত ভাবে সিদ্ধান্ত নেয়া যায় যে, ইজতিহাদের দরজা চির উম্মুক্ত। শর্ত হচ্ছে যে, ইজতিহাদ মূলে কোন আইনের সূত্র কিংবা সিদ্ধান্ত কুরআন ও সুন্নাহর বিরোধী হতে পারবেনা''।[১৩৪] অর্থাৎ ইজতিহাদ চলবে সর্বযুগে সর্বকালে কারণ ইসলাম সর্বযুগের সর্বকালের ধর্ম তাই ইজতিহাদের পথ বন্ধ করে এই ধর্মকে একটি সময় সীমার মধ্যে আটকে ফেলা চলবেনা। আটকে ফেলা হলে ধর্মটিও সীমাবদ্ধ হয়ে পড়বে নির্দিষ্ট সময়ের বলয়ে। প্রদত্ত সংকীর্ণ ব্যাখ্যার আড়ালে।

দুঃখ জনক যে, প্রতিটি মুসলিম বিশ্ব সহ বাংলাদেশেও ধর্মকে সীমাবদ্ধ করে ফেলা হয়েছে - অপব্যাখ্যার মাধ্যমে। তাই নারীকে ঘিরে ধর্মীয় বিষয়াদিতে , হাদিসে শরীয়তে উদ্ভূত ধর্মীয় অপব্যাখ্যার হাত থেকে ধর্মকে মুক্ত করা গেলেই মুক্ত হবে ধর্ম একই সাথে মুক্ত হবে নারী জাতি। ভুল এবং অপব্যাখ্যা সনাক্ত করে প্রবেশ করতে হবে ধর্মের মুল বিষয়ের দিকে। কারণ ধর্মকে নিয়ে বর্তমান অধ্যায়ের পর্যালোচনায় এটি স্পষ্ট হয়েছে যে, 'ধর্মের মৌলিক বিষয়াদির মধ্যেই রয়েছে নারীর অধিকার এবং মর্যাদা'। আর তাই, নারী নির্যাতনের যে চিত্র বর্তমান গবেষণার পঞ্চম অধ্যায়ে অঙ্কিত হয়েছে তার থেকে নারী জাতিকে মুক্ত করতে হলে একদিকে প্রয়োজন বিদ্যমান বিধিব্যবস্থা, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উদ্যোগ এবং প্রশাসনিক, দাপ্তরিক সকল কার্যক্রমকে যাবতীয় দুর্বলতা থেকে মুক্ত করা, একই সাথে প্রয়োজন ধর্মকে মুক্ত করা সকল অপব্যাখ্যা এবং কুসংস্কার থেকে।

এই লক্ষ্যেই পরবর্তী অধ্যায়ে বাংলাদেশে নারী মুক্তির লক্ষ্যে পরিচালিত কার্যক্রম পর্যালোচনা করে যাবতীয় দাপ্তরিক কার্যক্রম, আইন – কানুন এবং বিধি-ব্যবস্থাপনায়, সর্বোপরী জেন্ডার ইস্যু, নারীবাদ ইত্যাদিতে বিদ্যমান বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা আর ধর্মের সাথে বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতা সনাক্ত করা হয়েছে।

[১৩৪]. আসফ এ এ ফৈজী ঃ ইসলামী আইন, (অনুসৃতি গাজী শামছুর রহমান), পূর্বোক্ত, পৃঃ ২০-২১।

Dhaka University Institutional Repository

৭ম অধ্যায়

বাংলাদেশে নারীমুক্তির লক্ষ্যে পরিচালিত কার্যক্রমের উপর সার্বিক পর্যালোচনা এবং ধর্মীয় অপব্যাখ্যার কারণ অনুসন্ধান

নারীমুক্তির লক্ষ্যে জেন্ডার ইস্যু এবং জেন্ডার ইস্যু বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক নীতি সমূহের ভিত্তিতে বাংলাদেশে গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে একই সাথে বাংলাদেশে বিদ্যমান আইনি বিধিব্যবস্থার উপর বর্তমান গবেষণার ১ম থেকে ৪র্থ অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়েছে। দেখা গেছে বাংলাদেশে নারী মুক্তির লক্ষ্যে পরিচালিত হচ্ছে বিশাল কার্যক্রম। এতসব উদ্যোগ, কার্যক্রম সত্বেও নারী নির্যাতনের যে চিত্র গবেষণার ৫ম অধ্যায়ে অঙ্কিত হয়েছে তাতে বাংলাদেশে নারীদের মুক্তি ঘটেছে তা বলা সম্ভব নয়। বাংলাদেশে নারীরা নির্যাতিত হয়েই চলছে। দেখা গেছে, বাংলাদেশে নারীরা নির্যাতিত হয় প্রধানতঃ এই কারণে যে, পুরুষেরা এটিকে তাদের ধর্মীয় অধিকার হিসেবে গণ্য করেন। সে কারণেই ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে এসে বাংলাদেশে বিদ্যমান অন্যান্য ধর্মের উপর অল্প কিছু আলোচনা করে ইসলাম ধর্মের উপর বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে দেখানো হয়েছে যে, ধর্ম নয় মূলতঃ ধর্মের নামে নারীদের ঘিরে সৃষ্টি হয়েছে বিস্তর অপব্যাখ্যা এবং কুসংস্কার। এসব অপব্যাখ্যা এবং কুসংস্কার ই মূলতঃ নারী নির্যাতনের পেছনে প্রধান কারণ হিসেবে কাজ করছে। পাশাপাশি এটিও লক্ষণীয় যে, বর্তমান গবেষণার ১ম থেকে চতুর্থ অধ্যায়ে বর্ণিত নারী মুক্তির লক্ষ্যে সরকারী, বেসরকারী, আন্তর্জাতিক কার্যক্রমেও রয়েছে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা। আর তাই সত্যিকার অর্থে নারী মুক্তির লক্ষ্যে একদিকে প্রয়োজন সরকারী, বেসরকারী, আন্তর্জাতিক উদ্যোগ সমূহের ক্ষেত্রে বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতা সমূহ চিহ্নিত করে তা দূরীকরন, একই সাথে ধর্মীয় কুসংস্কার থেকেও মুক্ত হয়ে ধর্মের মৌলিক বিষয়ে অবস্থান।

সরকারী, বেসরকারী, আন্তর্জাতিক কার্যক্রমে বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতা সমূহ দূর করতে হলে প্রয়োজন প্রতিবন্ধকতার ধরণ অনুসন্ধান। এটি সত্যি যে, স্বাধীনতার দীর্ঘ ৪২/৪৩ বছর পরও বাংলাদেশ, নারী জাতির উন্নয়নের ক্ষেত্রে রয়েছে উন্নয়নের প্রথম পর্যায়ে। জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদন ২০১১-১২ এ বাংলাদেশের সরকার কর্তৃক ই নারীদের অবস্থার উন্নয়নকে 'উন্নয়নের প্রথম পর্যায়ের অগ্রগতি (First round progress)' বলা হয়েছে, এভাবে - ''বিগত কয়েক বছরে জেন্ডার বৈষম্য দূরীকরণে গৃহীত নীতি ও কার্যক্রমের সুফল ইতিমধ্যে পাওয়া যাচ্ছে। বহুক্ষেত্রে নারীর বাস্তব অবস্থার উন্নয়ন ঘটেছে। সমাজে, রাজনীতিতে, দারিদ্র নিরসনে, অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ এবং সক্ষমতা অর্জনে নারীদের লক্ষ্যনীয় উন্নতি অর্জিত হয়েছে। আইনগত ক্ষেত্রে এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোতেও অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। এ সকল বিবেচনায় নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, নারী উন্নয়ন এবং তাদের অধিকার অর্জনের ক্ষেত্রে প্রথম পর্যায়ের অগ্রগতি (First round progress) অর্জিত হয়েছে"।[১] অর্থাৎ উন্নতি/অগ্রগতি কিছু হলেও সেই অগ্রগতিকে বলা হয়েছে 'উন্নয়নের প্রথম পর্যায়ের অগ্রগতি (First round progress)'।

আবার কোন কোন ক্ষেত্রে কিছু অগ্রগতির বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে সরকার কর্তৃক এ মর্মেও স্বীকার করা হচ্ছে, "এ সকল অঙ্গীকার এবং অগ্রগতি অর্জন স্বত্বেও নারী এখনও বাস্তবে পুরুষের চাইতে অনেক ক্ষেত্রে কম অধিকার ভোগ করে, যার ফলশ্রুতিতে নারী-পুরুষের মধ্যে অসমতা এবং নারীর প্রতি বৈষম্যের ধারাবাহিকতা বজায় রয়েছে। নারী-পুরুষের মধ্যে বিদ্যমান ব্যবধানের কারণে নারীরা এখনও নানাবিধ বৈষম্য, অন্যায় এবং বঞ্চনার শিকার হচ্ছেন। বাংলাদেশে যত ধরনের বৈষম্য দেখা যায় তার মধ্যে নারীদের প্রতি বৈষম্য

[১]. জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদন, ২০১১-১২, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২।

সবচাইতে প্রকট। গতানুগতিক পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থাই এর মূল কারণ এবং এর ফলে সর্বস্তরে নারীর অংশগ্রহণ এখনো তুলনামূলকভাবে কম”।[২] জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ এ সরকারীভাবে এই মর্মে স্বীকার করা হচ্ছে, “দেশের শতকরা ৪০ ভাগ দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশই নারী এবং এর মাঝে নারী প্রধান পরিবারের সংখ্যা অধিক। এখনও নারীর অনেক কাজের অর্থনৈতিক মূল্যায়ন হয় নাই। গৃহস্থালী কর্মে, শ্রম ও কৃষি অর্থনীতিতে নারীর সঠিক মূল্যায়ন নিরূপিত হয়নি।”[৩]

নারীজাতির উন্নয়নের লক্ষ্যে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নির্ধারিত বিশাল কার্যক্রম বাংলাদেশের সর্বত্র পরিচালিত হচ্ছে। যা বর্তমান গবেষণার চতুর্থ অধ্যায়ে স্পষ্ট করা হয়েছে। তারপরও বাংলাদেশে নারীদের অগ্রগতি ‘প্রথম পর্যায়ে’ থাকা, ‘নারীদের এখনও বাস্তবে পুরুষের চাইতে অনেক ক্ষেত্রে কম অধিকার ভোগ করা’, ‘নারী-পুরুষের মধ্যে অসমতা এবং নারীর প্রতি বৈষম্যের ধারাবাহিকতা বজায়’ থাকার বিষয় এবং একই সাথে গবেষণার ৫ম অধ্যায়ে নারী নির্যাতনের যে বিশাল চিত্র অঙ্কিত হয়েছে তাতে বাংলাদেশে মূলতঃ নারীদের সত্যিকার অর্থে মুক্তি ঘটেছে কিনা সে বিষয়টি প্রশ্নের আবর্তে আবর্তিত হচ্ছে।

বর্তমান গবেষণায় তার কারণও অনুসন্ধান করা হয়েছে। দেখা যাচ্ছে – বাংলাদেশে নারী মুক্তির লক্ষ্যে পরিচালিত সাংবিধানিক বিধান, দাপ্তরিক কার্যক্রম, আইন – কানুন এবং বিধি-ব্যবস্থাপনায়, সর্বোপরি জেন্ডার ইস্যু, নারীবাদ ইত্যাদিতে বিদ্যমান রয়েছে কিছু কার্যকর ব্যবস্থার অভাব, কোন কোন ক্ষেত্রে জটিলতা, সীমাবদ্ধতা, আবার কোথাও রয়েছে ধর্মের সাথে প্রতিবন্ধকতা। সিডো সনদ এবং নারী উন্নয়ন নীতিমালা সে ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। আবার সমাজে বিদ্যমান রয়েছে ধর্মের বিষয়ে সচেতনতার অভাব, ধর্মীয় অপব্যাখ্যা এবং বিস্তর কুসংস্কার। গবেষণার ষষ্ঠ অধ্যায়ে ধর্মের অপব্যাখ্যা সনাক্ত করে মুল বিষয় তুলে ধরা হয়েছে। বর্তমান অধ্যায়ে নিম্নে একের পর এক এসব বিষযাদি পর্যালোচনা করে, সব শেষে ধর্মের অপব্যাখ্যা এবং কুসংস্কারাদি কবে কখন কিভাবে সৃষ্টি হয়েছে তাও পর্যালোচনা করা হয়েছে।

৭.২ নারী মুক্তির লক্ষ্যে গৃহীত দাপ্তরিক যাবতীয় কার্যক্রমের সীমাবদ্ধতা, জটিলতা এবং কার্যকর ব্যবস্থার অভাব

নারী মুক্তির লক্ষ্যে গৃহীত কার্যকমের সীমাবদ্ধতা সমূহ হ’ল-

১. সাংবিধানিক বিধান বাস্তবায়নে কার্যকর ব্যবস্থার অভাব
২. গৃহীত দাপ্তরিক কার্যক্রমের সীমাবদ্ধতা;
৩. শিক্ষা ক্ষেত্রে জেন্ডার বৈষম্য;
৪. মাতৃ মৃত্যু হার কমানোর ক্ষেত্রে এবং কন্যা শিশুর ক্ষেত্রে জেন্ডার বৈষম্য;
৫. রাজনৈতিক এবং উচ্চ পদে চাকুরীর ক্ষেত্রে জেন্ডার বৈষম্য;
৬. জাতীয় বাজেটকে জেন্ডার সংবেদনশীল করার ক্ষেত্রে কিছু সীমাবদ্ধতা;

[২].পূর্বোক্ত,পৃঃ ২।
[৩].জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি - ২০১১, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৪।

৭. ব্যবসা বানিজ্য, পারিবারিক শ্রম, এনজিও সংক্রান্ত কার্যক্রমে সীমাবদ্ধতা এবং চলাফেরার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা;
৮. বিদ্যমান আইনী বিধিব্যবস্থায় সীমাবদ্ধতা /দূর্বলতা ;
৯. জেন্ডার এবং তৎসংশ্লিষ্ট ব্যবস্থাদির মধ্যে বিদ্যমান জটিলতা ;
১০. নারীবাদের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যে বিদ্যমান জটিলতা এবং যৌনতাকে অবাধ ও উন্মুক্ত করা ;
১১. পিএফএ (বেইজিং), এমডিজি, পিআরএসপি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কিছু সীমাবদ্ধতা;
১২. দীর্ঘ মেয়াদী ও নির্ভরযোগ্য উন্নয়ন লক্ষ্য এবং ২০১৫ এর পরবর্তী গৃহতব্য বিষয়াদি নির্ধারণ।

নিম্নে এক এক করে উল্লেখিত বিষয়াদির উপর আলোকপাত করা হ'ল -

৭.২.১ সাংবিধানিক বিধান বাস্তবায়নে কার্যকর ব্যবস্থার অভাব

বাংলাদেশের সংবিধানে নারীর অধিকার ও মর্যাদার বিধানাবলী সুস্পষ্টভাবে নির্দেশিত হয়েছে। সেই নির্দেশনা সমূহ গবেষণার ৪র্থ অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে। দুঃখজনক যে সাংবিধানিক সেই মৌলিক নীতি অনুযায়ী বাংলাদেশের নারী সমাজের মর্যাদা ও অধিকারের ক্ষেত্রে তেমন পরিবর্তন হয়নি।

অদ্যাবধি বিদ্যমান রয়েছে -

১. সাংবিধানিক অধিকার বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কার্যকর ব্যবস্থার অভাব;

২.নারী জাতির অনুকুলে যথাযথ আর্থ-সামাজিক পরিবেশের অভাব;

৩.পারিবারিক ও সামাজিক অবস্থানে নারী জাতির অবনমিত অবস্থান ;

৪. সমাজকল্যান মূলক কাজে সার্বিক ভূমিকা পালনে জটিলতা;

৫. ধর্মীয় অপব্যাখ্যার কারণে সাংবিধানিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় জটিলতা।

বাংলাদেশে নারীমুক্তির লক্ষ্যে বিদ্যমান অন্যান্য ব্যবস্থাদির সীমাবদ্ধতা সমূহ দূর করা গেলে অবশ্যই সাংবিধানিক ব্যবস্থা সমূহ সহজেই বাস্তবায়িত হয়েছে মর্মে দেখা যাবে। আর সে কারণেই বাংলাদেশে নারীমুক্তির ক্ষেত্রে গৃহীত সকল কার্যক্রমের ক্ষেত্রে বিদ্যমান সীমাবদ্ধতা সমূহের উপর আলোকপাত করা হ'ল।

৭.২.২ নারীমুক্তির লক্ষ্যে বাংলাদেশে গৃহীত দাপ্তরিক কার্যক্রমের সীমাবদ্ধতা

বাংলাদেশে নারীমুক্তির লক্ষ্যে পরিচালিত দাপ্তরিক কার্যক্রমের মধ্যে যথেষ্ট উদ্যোগ থাকলেও ফলাফল সীমিত। গবেষণার ৪র্থ অধ্যায়ে বাংলাদেশে নারীমুক্তির লক্ষ্যে সাংগঠনিক ব্যবস্থার যে চিত্র অঙ্কিত হয়েছে তাতে এটি লক্ষ্যনীয় যে, নারী মুক্তির লক্ষ্যে প্রচুর কার্যক্রম মাঠ পর্যায় থেকে কেন্দ্রীয় পর্যায় পর্যন্ত বিদ্যমান রয়েছে। কার্যক্রম সমূহের উপর পর্যালোচনায় যে বিষয়টি লক্ষ্যনীয় হয়ে ওঠে, তাহলো, সেসব কার্যক্রমের ফলাফল সীমিত। দেখা গেছে, মহিলা বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের অধীনে মহিলা অধিদপ্তরের এবং মহিলা সংস্থার কার্যক্রম মাঠ পর্যায়ে তথা জেলা/ উপজেলা পর্যায়ে চলছে। তা সত্বেও মহিলা বিষয়ক মন্ত্রনলায়ের সরাসরি নিয়ন্ত্রনাধীনে মাঠ পর্যায়ে কয়েকটি কমিটি পরিচালনা করা হচ্ছে। যেগুলোতে মাঠপর্যায়ে কর্মরত মহিলা

বিষয়ক কর্মকর্তাদের নিয়ন্ত্রন নেই। যেমন জেলা প্রশাসকের, উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সভাপতিত্বে রয়েছে যথাক্রমে জেলা নারী নির্যাতন নিরোধ কমিটি, উপজেলা নারী নির্যাতন প্রতিরোধ সেল। এগুলো সরাসরি মহিলা বিষয়ক মন্ত্রনালয় কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। আবার ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক নারী নির্যাতন নিরোধ সংক্রান্ত কিছু কার্যক্রম পরিচালিত হয় যা বিদ্যমান রয়েছে স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতায়। জেলা ও উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তাগণের সে সব কার্যক্রমের উপর সরাসরি তেমন কোন নিয়ন্ত্রন নেই। একই ভাবে মহিলা সংস্থার মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম, স্থানীয় সরকার বিভাগ, সমাজ কল্যান, স্বাস্থ্য মন্ত্রনালয়, স্বরাষ্ট্র, আইন মন্ত্রনালয়ের নারী সংক্রান্ত মাঠ পর্যায়ের কমিটি এবং তাদের কার্যক্রম ও পৃথক ভাবে পরিচালিত হয়ে থাকে। এনজিওদের কার্যক্রমেরও একই অবস্থা। এত সব কার্যক্রম একটি সুনিয়ন্ত্রিত নিয়ম কাঠামোর মধ্যে চলছেনা। অনেক সময় একই ধরনের কার্যক্রম দু'টি/ তিনটি মন্ত্রনালয়/ সংস্থা থেকে পরিচালিত হয়।

ফলে নারীদের অবস্থার উন্নয়নে এবং নারী নির্যাতন প্রতিরোধে কোন সংস্থা কি কাজ করছে তা যেমন সুনির্দিষ্ট নয়, তেমনি সাধারণ নারীগণও কোথা থেকে কি উপকার পাবে সে বিষয়ে ভালোভাবে ওয়াকেবহাল নন। গ্রামীন স্বল্প শিক্ষিত নারীগণ কোথায়, কার কাছ থেকে কি ধরনের সুফল পাবেন তাও সহজে বুঝে উঠতে পারেননা। ফলে এ সবের থেকে যথাযথ সুযোগ সুবিধা নেয়া গ্রামের সাধারণ নারীদের জন্য জটিল এবং এক রকমের দুরূহ কাজই বটে।

৭.২.৩ শিক্ষা ক্ষেত্রে জেন্ডার বৈষম্য

বাংলাদেশের সংবিধানে সকল নাগরিকের জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করাকে রাষ্ট্রের দায়িত্ব হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। ১৯৯০ সালের প্রাথমিক শিক্ষা (বাধ্যতামূলক করা) আইন অনুযায়ী সকলের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতা মূলক করা হয়েছে। ৪র্থ অধ্যায়ের আলোচনায় দেখানো হয়েছে যে, বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ছেলে মেয়ে উভয়ের বিশেষতঃ নারীদের শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যাপক কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে। তার ফলশ্রুতিতে সার্বজনীন শিক্ষার টার্গেট অর্জনের পাশাপাশি বাংলাদেশে প্রাথমিক স্তরে ভর্তির ক্ষেত্রে জেন্ডার বৈষম্য দূর করতে কিছুটা সক্ষম হলেও এ ক্ষেত্রে বিদ্যমান রয়েছে যথেষ্ট উদ্বেগ ।

এখনও প্রায় ২০ লাখ শিশু বিদ্যালয়ে যাওয়ারই সুযোগ পাচ্ছে না। আবার ভর্তি হওয়া শিশুদের এক-তৃতীয়াংশই প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করার আগেই ঝরে পড়ছে।[৪] প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের এক প্রতিবেদন অনুযায়ী ২০০৭ সালে দেশের সব প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণীতে ৪৪ লাখ ৮৪ হাজার ৬৪ জন শিক্ষার্থী ভর্তি হয়। এর মধ্যে মেয়ে শিক্ষার্থী ছিলো মোট শিক্ষার্থীর ৪৯.৭৯%। ২০০৮ সালে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হয় ৪২ লাখ, ৮৩ হাজার ৯৪ জন। মেয়ে শিক্ষার্থীর হার দাঁড়ায় ৪৯.২৪%। এই পরিসংখ্যান বলছে, এক বছরে এক লাখের বেশী মেয়ে শিক্ষার্থী ঝরে পড়েছে।[৫]

আবার Bangladesh Bureau of Educational Information and Statistics(BANBEIS) এ প্রদত্ত ২০১০ এর তথ্য অনুসারে প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত বিদ্যমান ছাত্রীর সংখ্যা ৫০,৭১,২৫২ জন হলেও একই বছর প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত ঝরে পড়া ছাত্রীর হার মোট

[৪]. রাশেদা কে চৌধুরী (তত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা) প্রদত্ত তথ্য, প্রথম আলো, শুক্রবার, ১ ফেব্রুয়ারী ২০১৩।

[৫]. প্রথম আলো, শুক্রবার, ১ ফেব্রুয়ারী ২০১৩।

৩৯.৩% জন।[৬] বিশাল সংখ্যক ছাত্রীদের এই ঝরে পড়ার কারণ অনুসন্ধান করে তা সংশোধনের বিশেষ কোন উপায় এখনো নিশ্চিত করা হচ্ছেনা।

আবার ব্যানবেইস কর্তৃক প্রকাশিত Bangladesh Education Statistics, 2009 এর তথ্য নিম্নরূপ-

সারণী - ৩৫

বিভিন্ন শিক্ষা স্তরে ভর্তির সুবিধা প্রাপ্ত ছাত্রও ছাত্রী

শিক্ষার বিভিন্ন স্তর ও ধরণ	ছাত্র		ছাত্রী	
	ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা	শতকরা হার	ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা	শতকর াহার
নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়	২, ২৪,৩০০	৪১.৭৮	৩, ১২, ৪৫৪	৫৮.২১
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৩ ,১২, ৪১৭০	৪৮.৮৭	৩২,৬৮,২৮২	৫১.১২
স্কুল ও কলেজ (স্কুল পর্যায়)	২,৭১, ৭৮৫	৫৫.৭৪	২, ১৫, ৮০২	৪৪. ২৫
মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষা	৩৪, ৪২, ৯৯৫	৪৮.২১	৩৬, ৯৭, ৯৭	৫১.৭৮
স্কুল ও কলেজ (কলেজ পর্যায়)	৭৯, ০৮৫	৫১.৭৬	৭৩,৬৮১	৪৮. ২৩
উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়	১, ৭৭, ১৭৬	৫৩.৩০	১, ৫৫, ২০৫	৪৬. ৭০
স্নাতক (পাশ) মহাবিদ্যালয়	৪, ৩০, ১৩৩	৫৩. ২২	৩, ৭৮,০৪০	৪৬ .৭৮
স্নাতক (অনার্স) মহাবিদ্যালয়	১, ৫৯,৭৬০	৫৭.৬৮	১, ১৭, ২১৪	৪২.৩২
মাষ্টার্স কলেজ	৩, ৪৩, ৬৭৬	৫৯. ৭১	২, ৩১, ৯১০	৪০. ২৯
উচ্চ মাধ্যমিক ও তদূর্ধ পর্যায়	১১, ৮৯, ৮৩০	৫৫. ৪৪	৯, ৫৬, ০৫০	৪৪ . ৫৫
ক্যাডেট কলেজ	২, ৪৩৭	৮৯. ২০	২৯৫	১০. ৮০
দাখিল	**৫, ১০, ৫৮৩**	**৪২. ৬১**	৬, ৮৭, ৫৯৭	৫৭. ৩৮
আলিম	**১, ৯১, ১০৬**	**৪৮.৭৬**	২, ০০, ৮১৭	৫১.২৪
ফাজিল	**২, ০৯, ৭২৯**	**৫৮. ৪৬**	১, ৪৯, ২০৭	৪১. ৫৪

[৬]. Bangladesh Bureau of Educational Information and Statistics(BANBEIS) , 2011, September 2012, P.23.

কামিল	**৯১.৩৪৪**	**৭৬. ৯৩**	২৭, ৩৮৭	২৩. ০৬
মাদ্রাসা শিক্ষা	১০, ০২,৭৬২	৪৮.৫০	১০, ৬৪, ৮২৮	৫১. ৫০
বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা	**৪৩, ৭৭১**	৪৬. ৭৪	৪৯, ৮৭৬	৫৩. ২৫
পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট	**৭০, ৬৬২**	৯২.৩২	৫, ৮৭৮	৭. ৬৮
কারিগরিবিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়	**২৭, ৪২২**	৮৬. ৬৮	৪, ২১৩	১৩. ৩২
বানিজ্যিক কলেজ	**৩,৭০৬**	৭৬. ৯২	১, ১১২	২৩. ০৮
গ্লাস এন্ড সিরামিক ইন্সটিটিউট	**৮২১**	৯২.৮৭	৬৩	৭. ১২
গ্রাফিক্স আর্টস ইন্সটিটিউট	**৪৭০**	৮৮. ৩৪	৬২	১১. ৬৫
সার্ভে ইন্সটিটিউট	**৬৮০**	৯৫. ২৩	৩৪	৪. ৭৬
কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	**৫, ৩৩৭**	৭৬. ৩৯	১, ৬৪৯	২৩. ৬০
টেক্সটাইল ইন্সটিটিউট	**৯, ০৯৩**	৯৩ .২৪	৬৫৯	৬.৭৫
টেক্সাইল ভোকেশনাল	**৪, ৮৯৩**	৮৭. ৫৬	৬৯৫	১২. ৪৩
কৃষি প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট	**১৬, ১০১**	৭৯.৮০	৪, ০৭৫	২০. ১৯
মেরিন টেকনোলজি	**৬৬৬**	৯১. ২৩	৬৪	৮.৭৬
এসএসসি ভোকেশনাল(উন্মুক্ত)	**২০, ৬৯১**	৯২. ৫০	১,৬৭৭	৭.৪৯
এসএসসি ভোকেশনাল (একীভূত)	**৮৯, ৬২৩**	৬১.৬৫	৫৫,৭৪৫	৩৮.৩৪
এইচএসসি ভোকেশনাল(/ ব্যবস্থাপনা (উন্মুক্ত)	**৬৭,৪৪৫**	৮৯.৬৫	৭,৭৮০	১০.৩৪
এইচ.এস.সি ভোকেশনাল/ ব্যবসা ব্যবস্থাপনা (একীভূত)	**৪৫, ১৬০**	৬০.৫৯	২৯,৩৭২	৩৯.৪১
কারিগরী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা	**৩৬২, ৭৭০**	৭৬. ২৩	১, ১৩, ০৭৮	২৩.৭৬ [৭]

এখানে মোট ৩৩ প্রকারের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছেলে মেয়েদের অবস্থান দেখানো হয়েছে। তন্মধ্যে ০৭ প্রকারের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তথা নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়, মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষা, দাখিল, আলিম, মাদ্রাসা শিক্ষা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের সংখ্যা কিছু বেশী দেখা গেলেও বাকি ২৬ প্রকারের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মেয়েদের সংখ্যা কম। তন্মধ্যে ক্যাডেট কলেজ, পলিটেকনিক ইন্সটিটেউট,

[৭]. Bangladesh Bureau of Educational Information and Statistics(BANBEIS) , 2009, P. 25-26।

কারিগরী বিদ্যালয় ও মহা বিদ্যালয়, বানিজ্যিক কলেজ, গ্লাস এন্ড সিরামিক ইন্সটিটিউট, গ্রাফিক্স আর্টস ইন্সটিটিউট, সার্ভে ইন্সটিটিউট, কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, টেক্সটাইল ইন্সটিটিউট, টেক্সটাইল ভোকেশনাল, কৃষি প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট, মেরিন টেকনোলজি, এসএসসি ভোকেশনাল (উন্মুক্ত), এইচ এস সি ভোকেশনাল/ব্যবসা ব্যবস্থাপনা (উন্মুক্ত), এইচ এস সি ভোকেশনাল/ব্যবসা ব্যবস্থাপনা (একীভূত) এবং কারিগরী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ক্ষেত্রে মেয়েদের অবস্থান হতাশা ব্যঞ্জক।[৮]

তাহলে সার্বিক পর্যালোচনায় দেখা যাচ্ছে যথেষ্ট উদ্যোগ স্বত্ত্বেও মূলতঃ শিক্ষাক্ষেত্রে মেয়েদের অবস্থান এখনও সুদৃঢ় হচ্ছেনা। মেয়েদের মাধ্যমিক স্কুলে ভর্তির হার এবং ঝরে পড়ার উচ্চ হারের দরুন সার্বিক ভাবে উচ্চ শিক্ষা ক্ষেত্রে জেন্ডার বৈষম্য এখনও ব্যাপকহারেই বিদ্যমান। ঝরে পড়া মেয়েরা চলে যাচ্ছে স্বামীর সংসারে। হচ্ছে নির্যাতনের শিকার। যথাযথ শিক্ষার অভাবে তারা নির্যাতনের প্রতিকার দূরে থাকুক প্রতিবাদও করতে পারেনা।

আবার বখাটে ছেলেদের কর্তৃক পথে ঘাটে ইভটিজিং এর শিকার হচ্ছে মেয়েরা। সামাজিক নিরাপত্তাহীনতার কারণে তা মেয়েদের শিক্ষার ক্ষেত্রে বাধা হিসেবে কাজ করছে। কারণ পিতা মাতারা কন্যা সন্তানদের নিরাপত্তার স্বার্থে বিয়ে দিয়ে দেয়াকে গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। তাঁরা অল্প বয়সেই মেয়েদের বিয়ের ব্যবস্থা করে ফেলেন। এটিও দেশে নারী শিক্ষার প্রতিবন্ধকতার পেছনে কাজ করছে। (ইভটিজিং এর ফলে বিদ্যমান পরিস্থিতির উপর ৫ম অধ্যায়ে- বিস্তারিত দেখানো হয়েছে)।

মেয়েদেরকে অনেক ক্ষেত্রে তাদের পরিবার শিক্ষার চাইতে সাংসারিক কাজে অভ্যস্ত করে তোলার প্রতি বেশী মনোযোগ দিয়ে থাকেন। কোন কোন দরিদ্র পরিবারে কিশোরীদের আয় উপার্জন মূলক কাজেও নিয়োগ করা হয়। ফলে মাধ্যমিক এবং উচ্চ শিক্ষা স্তরে মেয়েদের শিক্ষা সম্পন্নের হার বাড়ছেনা।

সবচেয়ে বড় কথা হলো দীর্ঘ সময় পর্যন্ত বাংলা দেশে 'নারী শিক্ষা হারাম' বলে একটি মিথ্যা হাদিস এমনভাবে সমাজে শিকড় গেড়ে বসেছিল যার কারণেই দীর্ঘ সময় ধরে নারীদের মূর্খ রাখাই ধর্ম হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। নারীকে তথা মায়ের জাতিকে মুর্খ রেখে মুসলিম সমাজ সেই মুর্খতার কবলে পড়ে গিয়ে, পিছাতে পিছাতে বিশ্ব সভায় কোনঠাসা হয়ে পড়েছে ।

৭.২.৪ মাতৃ মৃত্যুর হার কমানোর ক্ষেত্রে এবং কন্যা শিশুর ক্ষেত্রে জেন্ডার বৈষম্য

১. মাতৃ মৃত্যুর হার অধিক

বর্তমান গবেষণার ৪র্থ অধ্যায়ে 'নারীর স্বাস্থ্য ও পুষ্টি উন্নয়ন' অংশে সরকার কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম দেখানো হয়েছে। বাংলাদেশ মাতৃ- মৃত্যু ও স্বাস্থ্যসেবা জরিপ - ২০১০ অনুযায়ী "গত দশকে মাতৃমৃত্যু কমেছে ৪০ শতাংশ। জরিপ মতে দেশে বর্তমানে মাতৃমৃত্যুর হার ১৯৪। অর্থাৎ প্রতি এক লাখ জীবিত শিশু জন্ম দিতে গিয়ে মৃত্যু হচ্ছে ১৯৪ জন মা'য়ের। সে অনুযায়ী, ২০১৫ সালের মধ্যে মাতৃমৃত্যুর হার ১৪৩ এ কমিয়ে আনার সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (এমডিজি-৫) অর্জনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এগুচ্ছে । এর আগের ২০০১ সালের

[৮].পূর্বোক্ত, P. 25-26.

জরিপ মতে মাতৃমৃত্যুর হার ছিল ৩২২।[৯] এই অগ্রগতি সত্ত্বেও মাতৃমৃত্যু হার বাংলাদেশে অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক বেশী। কারণ এখন পর্যন্ত নারী মৃত্যুর এক চতুর্থাংশের কারণ হল প্রসবজনিত মাতৃমৃত্যু।

আবার সরকারের জরিপ ও চিকিৎসা সাময়িকী 'ল্যানসেট' - এর এক বিশ্লেষণে বলা হয়েছে, " মাতৃ্য মৃত্যুর প্রত্যক্ষ কারণ কমলেও গত ১০ বছরে পরোক্ষ কারণে মৃত্যুর হার বেড়েছে ৩৯ শতাংশ। আর এই দুই কারণে মিলে প্রতিদিন গড়ে ২১ জন মায়ের মৃত্যু হচ্ছে"।[১০] এ বিষয়ে সরকারের ই অভিমত হলো- "তবে এ সব অর্জন ই সব নয়। কারণ মাতৃমৃত্যু হার এখনও গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে হ্রাস পায়নি এবং পুষ্টির ক্ষেত্রে কাঙ্খিত এম.ডি.জি. অর্জিত হয়নি"।[১১]

একই সাথে এটি সত্য যে, বাংলাদেশের প্রায় এক তৃতীয়াংশ, অর্থাৎ আড়াইকোটি নারীই দীর্ঘস্থায়ী অপুষ্টির শিকার। "আয়োডিন ঘাটতিতে ৩৪% এবং রক্ত স্বল্পতায় ভুগছে ৪২% নারী। এই নারীদের উপরই নির্ভর করছে দেশের ভবিষ্যত প্রজন্মের পুষ্টি"।[১২]

২. কন্যা শিশুর ক্ষেত্রে জেন্ডার বৈষম্য

৪র্থ অধ্যায়ে শিশু বিষয়ক কার্যক্রমের আওতায় বাংলাদেশের সফলতা দেখানো হয়েছে। দেখানো হয়েছে পুষ্টির ক্ষেত্রে তাদের অগ্রগতি। সেই সাথে শ্যামলী নাসরিনের বক্তব্যে যে চিত্র ফুটে উঠেছে তা পুরো পরিস্থিতিকে হতাশা ব্যঞ্জক করে তোলে। কন্যা শিশুদের পুষ্টি নিশ্চিত করণের উপর জোর দিয়ে শ্যামলী নাসরিন চৌধুরী তাঁর 'আর নয় শিশু নিপীড়ন' প্রবন্ধে বলেন,"দেশের মোট মেয়ে শিশুর সংখ্যা প্রায় ৩ কোটি। এদের মধ্যে খুব স্বল্পসংখ্যকই সুন্দর পরিবেশে বেড়ে ওঠার সুযোগ পায়। দরিদ্র পরিবারে জন্ম নেওয়া কন্যা সন্তানের ওপর অধিকাংশই বাবা-মায়েরই রয়েছে অমনোযোগিতা। এছাড়া স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টির অভাব, ধর্মীয় গোঁড়ামী, বাল্যবিবাহ এবং সামাজিক কুসংস্কারের কারণে ৫ বছরের আগেই মারা যায় এসব শিশু। ৫ বছরের নিচে প্রতিহাজারে মেয়েশিশুর মৃত্যুর হার প্রায় ৫৮, গ্রামাঞ্চলে তা ৭০ এর কাছাকাছি। বাংলাদেশে পথ শিশুর সংখ্যা প্রায় ৩ লাখ ৮০ হাজার বা তারও বেশী। পরিস্থিতির কারণে পরবর্তীকালে এরাই ছিনতাই, মাদকসেবন, মাদক ব্যবসা ও সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে জড়িয়ে পড়ে। .. .. দেশে শিশুমৃত্যুর হার এখনও ৫০ শতাংশ। ৫ বছর বয়সের আগেই ৪৩ জন শিশু মারা যায়। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে অন্যসব বিষয়ের পাশাপাশি শিশুদের সমস্যাগুলোর আশু সমাধান একান্ত জরুরী"[১৩]।

আবার এখনও উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়নি শিশুশ্রম, শিশু নির্যাতন, বিশেষ করে মেয়ে শিশুদের যৌন হয়রানি, এবং যৌনহয়রানির মাধ্যমে হত্যা প্রতিরোধের কার্যক্রমের। পত্রিকার পাতা খুললেই দেখা যায় শিশু ধর্ষণ, শিশু পরিচারিকা নির্যাতন, ধর্ষণ, হত্যা। পথে ঘাটে ঘটছে ইভটিজিং এর মারাত্মক সব ঘটনা।(যার চিত্র ৫ম অধ্যায়ে বিস্তারিত দেখানো হয়েছে)। যার কারণে বাংলাদেশের মেয়েদের অবস্থা হয়েছে একটি পিচ্ছিল বাঁশে ওঠার মত। এক হাত ওঠে তো দুই হাত পিছলিয়ে নীচে পড়ে।

---

[৯] .প্রথম আলো, শনিবার, ১৬ মার্চ ২০১৩।

[১০]. প্রথম আলো, ২৯ মে, ২০১৪।

[১১] .জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদন(২০১১-১২), পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৭-২৮।

[১২]. প্রথম আলো, ঢাকা, ১৬ জুলাই ২০১২।

[১৩].শ্যামলী নাসরিন চৌধুরী ঃ আর নয় শিশু নিপীড়ন, আমাদের সময়, উপসম্পাদকীয় কলাম, ৩ ফেব্রুয়ারী, ২০১৪।

৭.২.৫ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এবং উচ্চ পদে চাকুরীর ক্ষেত্রে জেন্ডার বৈষম্য

রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন, উচ্চতর পদে চাকুরীর সুবিধা, ব্যবসা বানিজ্যে সমান অংশ গ্রহণ - এ সব ক্ষেত্রে জেন্ডার লক্ষ্য অর্জনে সরকার, এনজিও ও সুশীল সমাজ সবাই সমবেত ও লাগাতার প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে সত্বেও এ ক্ষেত্রে জেন্ডার সমতা অর্জন হচ্ছেনা। সেসব ক্ষেত্রে বৈষম্যজনিত অবস্থান সমূহ নিম্নরূপ -

১. সংসদ সদস্য এবং মন্ত্রী

বাংলাদেশের অষ্টম সংসদে সংরক্ষিত আসনে মহিলাদের জন্য ৩০ টির স্থলে আরও ১৫ টি আসন বাড়িয়ে ৪৫টি করা হয় এবং ৯বম সংসদে সংরক্ষিত আসনে আরও ৫ টি বাড়িয়ে ৫০টি করা হলেও এই ক্ষেত্রে সরাসরি নির্বাচনের বিষয়টি অদ্যাবধী কোনো গুরুত্ব পাচ্ছেনা। এ সম্পর্কে সেলিনা হোসেন অষ্টম সংসদ সম্পর্কে বলেন, "জাতীয় সংসদের অষ্টম সংসদ ৩০টির পরিবর্তে ৪৫টি সংরক্ষিত আসন বাড়িয়েছে, কিন্তু সরাসরি নির্বাচন উপেক্ষিত থেকেছে। অষ্টম সংসদে নারীদের উপস্থিতি অনেক বেশী ছিল। তারা সংসদে দলের কোরাম পূর্ণ করেছে, কিন্তু নারীর ক্ষমতায়নে তা বড় পরিবর্তন ঘটায়নি। আরো অনেক বেশী সংখ্যায় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করা প্রয়োজন। সে অংশ গ্রহণ সক্রিয় হওয়া প্রয়োজন। পরিস্কার রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণা থাকা প্রয়োজন। দেশের মানুষের ভালোমন্দ, সুখ-দুঃখ তাদের জনসাধারণের আরো কাছাকাছি থেকে উপলব্ধি করা প্রয়োজন। রাজনীতিতে গুণগত পরিবর্তন আনার যে অসীম সম্ভাবনা হাতে আছে তা উন্মোচিত হওয়া প্রয়োজন।[১৪] নবম জাতীয় সংসদে আরও ৫জন বাড়িয়ে ৫০ জন করা হলেও অবস্থা একই রয়েছে। দশম জাতীয় সংসদের অবস্থাও একই। এখনও বড় কোন পরিবর্তন আসেনি।

আবার বাংলাদেশে জাতীয় সংসদে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন সৃষ্টি এবং তাতে নারীদের নেওয়া সত্বেও নারী-পুরুষের সম-অংশদারিত্ব নয় বরং সেখানে এখনো বিরাজ করছে এক অসম চিত্র। স্বাধীনতার ৪২ বছর পরও দেশের নারী সমাজ সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে ফলপ্রসূ ভূমিকা রাখতে পারছেনা। এ সম্পর্কে লাভলী ইয়াসমীন জেবা বলেন, "সংসদ সদস্যগণ হচ্ছেন একটি দেশের আইন প্রণেতা। আইন প্রণয়ন ই তাদের প্রধান কাজ। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সংসদের নির্বাচিত বা মনোনীত নারী সদস্যদের সত্যিকার অর্থে কোনো ভূমিকা পালন করতে দেখা যায়না। অষ্টম সংসদে 'শিশু-মাতৃ স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট আইন ২০০২, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০৩, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন আইন, ২০০৪ ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিল গৃহীত হলেও সংসদে এসব বিল সংক্রান্ত আলোচনায় নারী সদস্যদের কোনো ভূমিকা দেখা যায়নি। সুতরাং বলতে দ্বিধা নেই, সংসদের নারী আসন বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর স্বার্থরক্ষায় এবং বিশেষ করে নারীর আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন অর্জনে কোনো প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়নি"।[১৫]

এই পর্যালোচনা অষ্টম সংসদ সম্পর্কে হলেও নবম সংসদও এর ব্যতিক্রম নয়। এখানেও পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১০, মানবপাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০১২, জন্মও মৃত্যু নিবন্ধন (সংশোধন) আইন ২০১৩ অনুমোদিত হলেও সংসদে এই বিষয়ে নারী সদস্যদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা লক্ষ্যনীয় হয়নি। দশম সংসদ এর অবস্থান যে একই হবে তা সহজেই বলা যেতে পারে। কারণ এ সময়েও নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসনে নারী সদস্যদের নেওয়া হয়েছে সরাসরি, এখানেও নির্বাচন উপেক্ষিত থেকেছে।

---

[১৪] .সেলিনা হোসেন ঃ সংরক্ষিত আসন, জেন্ডার ও উন্নয়ন কোষ, ১ম খন্ড, পূর্বোক্ত পৃঃ ৬৪৫।

[১৫] . লাভলী ইয়াসমীন জেবা ঃ জাতীয় সংসদ ও নারীর ক্ষমতায়ন, জেন্ডার ও উন্নয়ন কোষ, পূর্বোক্ত,পৃঃ ৬১৫-৬১৬।

২. স্থানীয় সরকার

সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা এবং ওয়ার্ডে, উপজেলা পরিষদ এবং ইউনিয়ন পরিষদে সংরক্ষিত আসন নারীদের জন্য রাখা হয়েছে। এই সব আসনে নারীদের মধ্যেই প্রতিযোগিতার মধ্যে নির্বাচনের সুযোগ রাখা আছে এবং তাঁরা সেভাবেই নির্বাচিত হয়ে আসছেন। এসব ক্ষেত্রেও নারীরা কিছু প্রতিবন্ধকতার শিকার হয়ে থাকেন। লাভলী ইয়াসমীন, জেন্ডার ও উন্নয়ন কোষ গ্রন্থে , 'ইউনিয়ন পরিষদ'- নামীয় প্রবন্ধে ইউনিয়ন পরিষদের সংরক্ষিত আসনের নারীদের সম্পর্কে বলেন, "১৯৯৭ সালের স্থানীয় সরকার অ্যাক্ট অনুযায়ী প্রথমবারের মতো ইউনিয়ন পরিষদের নারী সদস্যরা জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হলেও সেখানেও বিদ্যমান রয়েছে বৈষম্য"[১৬]।

তাঁর উল্লেখিত সমস্যা সমুহের মধ্যে প্রধান কয়েকটি হ'ল-

- সাধারণ আসনের সদস্যরা নির্বাচিত হন এক ওয়ার্ডের জন্য একজন এবং সংরক্ষিত আসনের নারী সদস্যরা নির্বাচিত হন তিন ওয়ার্ডের জন্য একজন। ফলে নারী সদস্যদের কাজের পরিধি, ব্যস্ততা, দায়-দায়িত্ব তিনগুন বেড়ে গেলেও তাদের যাতায়াত খরচ, বেতন-ভাতা ইত্যাদির কোন পরিবর্তন হয়নি;
- তাঁরা সম্মানী ভাতাও পেয়ে থাকেন সাধারণ সদস্যদের সমান যদিও সংরক্ষিত আসনের নারী সদস্যরা সাধারণ আসনের সদস্যদের চেয়ে বৃহৎ এলাকার প্রতিনিধিত্ব করে থাকেন ;
- সরকারী গেজেট অনুযায়ী ইউনিয়ন পরিষদে নির্বাচিত নারী সদস্যের স্ট্যান্ডিং কমিটি সহ বিভিন্ন কমিটিতে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনের কথা কিন্তু নারী সদস্যরা সেই সুযোগ থেকে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই বঞ্চিত হচ্ছেন।[১৭]

এই সমস্যাদি কিন্তু উপজেলা পরিষদ, পৌর সভা, জেলা পরিষদ সকল ক্ষেত্রেই সংরক্ষিত নারী আসনের নারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

এ প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, " ১৯৯৭ সালের স্থানীয় সরকার অ্যাক্ট সংক্রান্ত নতুন অধ্যাদেশটি নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে ইতিবাচক পদক্ষেপ হলেও নারীর ক্ষমতা অর্জনের ক্ষেত্রে এখনও উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলতে পারেনি। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত স্থানীয় সরকার নির্বাচন ২০০৮' পর্যবেক্ষন করে একটি ফলাফল সম্পর্কে জানা গেছে যে, ৪টি সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে সংরক্ষিত আসনে নারী প্রার্থীর হার কমে গেছে প্রায় ৩৪ শতাংশ, যা ২০০৩-এর তুলনায় প্রায় তিনগুন। কারণ হিসেবে নির্বাচনে অংশ গ্রহণকারী নারীরা মনে করেন, একই সমান সুযোগ-সুবিধা নিয়ে সংরক্ষিত আসনের একজন নারী সদস্যকে সাধারণ আসনের একজন পুরুষ সদস্যেরও তুলনায় তিনগুন বেশী মানুষের জন্য কাজ করতে হয়। ফলে সকলের চাহিদা পুরণ করা সম্ভব হয়না এবং জনগণ তা বুঝতেও চায়না। এসব কারণে এক সময় মানুষ তাদের বিশ্বাস করেনা বলে আসনটি অর্থহীন হয়ে পড়ে। এছাড়া সংরক্ষিত আসনের সদস্যদের দায়দায়িত্ব ও ক্ষমতা সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট আইনি দিকনির্দেশনা না থাকায় আসনটি গুরুত্ব পায় না। অন্যদিকে সাধারণ আসনে নারীরা উৎসাহী হলেও অর্থশক্তি, পেশীশক্তি এবং দলীয় রাজনৈতিক প্রভাবের কাছে হেরে যান। এছাড়া পারিবারিক অসহযোগিতা,

---

[১৬]. লাভলী ইয়াসমীন জেবা ঃ ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ (প্রবন্ধ), জেন্ডার ও উন্নয়ন কোষ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬০২-৬০৫।

[১৭].পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬০২-৬০৫।

রাজনৈতিক নেতাদের পুরুষতান্ত্রিক মনোভাব, নিরাপত্তাহীনতা তো রয়েই গেল। প্রায় একই অভিজ্ঞতার প্রতিফল দেখা যায় পৌরসভা এবং ইউনিয়ন পরিষদের সংরক্ষিত আসনের ক্ষেত্রে" ।[১৮]

৩. সরকারী উচ্চপদে কর্মসংস্থান

স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশে বেসরকারী দাতা সংস্থা এবং সেবামূলক সংস্থার প্রসার ঘটে, যেখানে নারীর অংশ গ্রহণকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করা হয় এবং ইতিবাচক সাড়া পাওয়া যায়। কিন্তু সে তুলনায় সরকারী চাকুরিতে নারীর অংশ গ্রহণ বৃদ্ধি পাচ্ছেনা। এ সম্পর্কে লাভলী ইয়াসমীন জেবার মতামত প্রনিধানযোগ্য। তিনি, তাঁর 'সরকারী কর্মসংস্থান ও নারীর ক্ষমতায়ন', প্রবন্ধে বিভিন্ন ক্যাডার পদে নারীদের নিয়োগ সম্পর্কে বলেন, " ৫ম থেকে ২৬ তম বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (বিসিএস) পরীক্ষার গেজেট অনুযায়ী দেখা যায়, ক্যাডার পদে নারী প্রতিনিধিত্ব ক্রমশ বাড়ছে। অর্থাৎ ১৯৮৪ সালে যা ছিল ১০.৬৭ শতাংশ, ২০০৪ সালে তা বেড়ে হয়েছে ৩২.৯৫ শতাংশ। কিন্তু এই হার বাংলাদেশের অর্ধেক জনগোষ্ঠী নারী সমাজের তুলনায় খুবই নগন্য। কারণ এই সময় কালের মধ্যে বিসিএস পরীক্ষার মাধ্যমে ক্যাডার ভিত্তিক পদে নিয়োগ প্রাপ্ত নারীর সংখ্যা গড়ে মাত্র ২০.৭৩ শতাংশ, যেখানে ঐ ১০ শতাংশ কোটাভিত্তিক পদও সম্পৃক্ত রয়েছে। অন্য দিকে সাধারণ ক্যাডার এবং সুনির্দিষ্ট পেশাভিত্তিক ক্যাডার পদে নারীর প্রতিনিধিত্ব বা নিয়োগ প্রাপ্তির ক্ষেত্রেও ব্যাপক পার্থক্য দেখা যায়। কারণ শিক্ষক বা চিকিৎসক হিসেবে নারীর অবস্থান উৎসাহিত হলেও অন্যান্য জনমুখী কাজ, যেমনঃ সড়ক ও জনপথ, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলী, টেলিযোগাযোগ, রেলওয়ে প্রকৌশলীর মতো গুরুত্বপূর্ণ পদে নারীকে দেখতে সমাজ এখনো প্রস্তুত নয়। তাই এসব পদে নারীর অংশগ্রহণ এখনো ঝুঁকিপূর্ণ বলেই মনে করা হয়। প্রশাসনিক কাঠামোতে নারীর অংশগ্রহণ সমৃদ্ধ করতে নতুন মাত্রা যোগ করেছিল নারী পুলিশ। কিন্তু সেখানেও প্রথাগত বৈষম্য আর বিড়ম্বনার কবল থেকে রেহাই পাননি নারী পুলিশেরা। ব্যক্তিগত, সামাজিক, প্রশাসনিক বৈষম্য এমন একটি সাহসী পেশার ক্ষেত্রেও বিদ্যমান। সংখ্যাগত দিক থেকে নারী পুলিশের সংখ্যা খুবই কম। মাত্র ১.৮ শতাংশ। এটি একটি চ্যালেঞ্জিং পেশা, জেনেশুনেই নারীরা এ পেশায় এসেছেন। কিন্তু সামাজিক প্রথা, মূল্যবোধ, তাদের এই আগমন বা অবস্থানকে যথাযথ সম্মান দেখাচ্ছে না। এখনো তারা সমাজে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর একজন দূর্বল এবং ক্ষমতাহীন শ্রেণীর সদস্য মাত্র। সরকারী চাকুরীর উচ্চপদে নারীর সীমিত অংশ গ্রহণের কারণ অনুসন্ধান করে দেখা যায়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পুরুষতান্ত্রিক মূল্যবোধের আধিপত্য, জেন্ডার অসংবেদনশীল কর্ম - পরিবেশ, নিরাপত্তাহীনতা নারীর চলার গতিকে স্থবির করে দেয়। তদূপরী রয়েছে পারিবারিক অসহযোগিতা। পোস্টিং, বদলী ইত্যাদি পছন্দমত না হলে পরিবারের সদস্যরা উৎসাহ দেয় না। বরং অনেক সময় চাকুরী ছেড়ে দিতে চাপ প্রয়োগ করে। সে ক্ষেত্রে সন্তানের মা হলে তো সমস্যার অন্ত নেই। এসব পারিবারিক ও সামাজিক সমস্যাকে নারীর দূর্বলতা হিসেবে দেখা হয়" ।[১৯]

তিনি আরও বলেন,"কিন্তু যতদিন পর্যন্ত সামাজিক ভাবে নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত না হবে, রাষ্ট্রীয় উদ্যোগগুলোর সঠিক মূল্যায়ন হবেনা" ।[২০]

---

[১৮]. লাভলী ইয়াসমীন জেবা ঃ পূর্বোক্ত, পৃ: ৬০২-৬০৫।

[১৯]. লাভলী ইয়াসমীন জেবা ঃ সরকারী কর্মসংস্থান ও নারীর ক্ষমতায়ন (প্রবন্ধ), জেন্ডার ও উন্নয়ন কোষ, ১ম খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬৪৫-৬৪৬।

[২০]. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬৪৫-৬৪৬।

গবেষনার ৪র্থ অধ্যায়ে দেখা গেছে ৭১ টি সচিব পদের মধ্যে মাত্র চারজন নারী, ২৩৯ জন অতিরিক্ত সচিবের মধ্যে ১৫জন নারী দায়িত্ব পালন করছেন। ১০১৯ জন যুগ্ম সচিবের মধ্যে ১৩০ জন নারী এবং ১৩১৭ জন উপ সচিবের মধ্যে ১৬৫ জন নারী রয়েছেন। ১৪৩৮ জন সিনিয়র সহকারী সচিব এর মধ্যে ৩০৮ জন নারী, ১০৭৯ জন সহকারী সচিবের মধ্যে ২৮৫জন নারী রয়েছেন। দুই জন নারী পুলিশ সুপারেন্টেন্ডেন্ট পদে নিয়োগ লাভ করেন, সেনাবাহিনীর চাকুরীতে ব্রিগেডিয়ার পদে একজন নারী রয়েছেন। কুটনৈতিক পেশায় ১৪ জন নারী রয়েছেন। রাষ্ট্রদূত পদে তিনজন নারী সাম্প্রতিক সময়ে নিয়োগ প্রাপ্ত হয়েছেন। বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আপীল বিভাগে সর্বপ্রথম একজন নারী বিচারপতি নিয়োগ পেয়েছেন। আর সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশনে মধ্যে ৫ জন নারী বিচারপতি পদে রয়েছেন। হাইকোর্টের অতিরিক্ত দুই জন বিচারপতির মধ্যে ১জন নারী বিচারপতি রয়েছেন। দেশে জেলা ও দায়রা জজ হিসেবে ২২ নারী, অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ (চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট) হিসেবে ২৩ জন নারী , যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ(অতিরিক্ত চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট) হিসেবে ৪৬ জন নারী, সিনিয়র সহকারী জজ (সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট) হিসেবে ১৪৬ জন নারী এবং সহকারী জজ (জুডিশিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট) হিসেবে ৭৬ জন নারী বিচারপতি কর্মরত আছেন। অর্থাৎ মোট প্রায় ১৫৮০ জনের অধিক বিচার পতির মধ্যে মোট ৩২০ জন নারী বিচারপতি কাজ করছেন।[২১]

বলা যায়, নারীরা প্রশাসনিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রবেশ করতে পেরেছেন মাত্র। যদিও তাঁদের সংখ্যা বাড়ছে খুবই ধীর গতিতে এবং পুরুষের সমান হওয়ার তো কথাই আসছেনা।

৭.২.৬ জাতীয় বাজেটকে জেন্ডার সংবেদনশীল করার ক্ষেত্রে কতিপয় সীমাবদ্ধতা

গত ২০০৯ - ১০ সন থেকে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জাতীয় বাজেট দলিলের পাশাপাশি জেন্ডার বাজেট সংক্রান্ত পৃথক যে দলিলটি প্রণয়ন করা হচ্ছে তাতে প্রথম পর্যায়ে মাত্র ৪টি, দ্বিতীয় পর্যায়ে ১০টি এবং তৃতীয় পর্যায়ে ২০টি এবং ৪র্থ পর্যায়ে সকল মন্ত্রনালয়/বিভাগকে অন্তর্ভুক্ত করে প্রণীত হয়েছে। এটি একটি বিরাট কার্যক্রম এবং প্রশংসনীয় উদ্যোগ।

কিন্তু এ ক্ষেত্রে কিছু সীমাবদ্ধতা বিদ্যমান রয়েছে। তা হ'ল -

- বাজেট বই গুলোতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রনালয়ে কর্মরত নারীদের তালিকা দেওয়া হলেও উক্ত মন্ত্রনালয়ের আওতায় যে প্রকল্প গুলোকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে সেগুলোর অনুকুলে প্রদত্ত বাজেটে কি পরিমান নারী উপকৃত হবে বা হচ্ছে তার উল্লেখ নেই;
- ২০০৯-১০, ২০১০-১১, ২০১১-১২, ২০১২-১৩ এবং ২০১৩ -১৪ সনে প্রকাশিত জেন্ডার বাজেট গ্রন্থে এক বছরের জেন্ডার বাজেট এর সফলতা বা ব্যর্থতা পরের বছরের বাজেট বইতে উল্লেখ নেই।
- ফলে জেন্ডার বাজেট ভিত্তিক কাজের বাস্তবায়ন বা অগ্রগতি জানার কোন উপায় নেই।

[২১]. মতামত শাখা, আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রনালয়, আইন ও বিচার বিভাগ বাংলাদেশ সচিবালয়, থেকে সংগৃহিত তথ্য।

এই বাজেট কি পরিমান নারীদের কাজে আসছে তা নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছেনা। এ বিষয়ে জনাব আশরাফ সিদ্দিকীর অভিমত প্রণিধানযোগ্য। তাঁর মতে বর্তমান বিশ্বের ৫০টির বেশী দেশে বিভিন্ন পর্যায়ে জেন্ডার বাজেট প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে এবং জেন্ডার বাজেট প্রক্রিয়াটি সাধারণতঃ পাঁচটি ধাপে সম্পন্ন হয়। সেগুলো হ'ল-

- কোনো সেক্টর বা বিভাগের অধীনে নারী-পুরুষের প্রকৃত অবস্থা (যেমন কৃষি, স্বাস্থ্য ইত্যাদি) নিরূপণ;
- ঐ বিশেষ সেক্টরে যেসব নীতি রয়েছে সেগুলো জেন্ডার গ্যাপ নিরসন কল্পে যথাযথ ভূমিকা রাখতে পারছে কি না;
- জেন্ডার বান্ধব নীতিমালা সমূহ বাস্তবায়নে বাজেটে বরাদ্দ যথেষ্ট পরিমানে হয়েছে কিনা;
- বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয় করা হয়েছে কিনা, আর যদি তা হয়েই থাকে এর সুফল কারা (নারী-পুরুষ, ধনী-দরিদ্র ইত্যাদি) কী পরিমানে পেয়েছে;
- প্রথমে বর্ণিত ধাপটির পুনঃপরীক্ষণের মাধ্যমে বিবেচনা করা যে বাজেট ও তার সাথে আনুষঙ্গিক কর্মসূচি সমূহ যে উদ্দেশ্যে নেয়া হয়েছে তার সঠিক বাস্তবায়ন হয়েছে কিনা এবং এভাবেই চক্রাকারে পুরো বিষয়টি চলতে থাকে।[২২]

বাংলাদেশে জেন্ডার-বাজেট প্রণীত হচ্ছে বটে কিন্তু তাতে উল্লেখিত বিষয়াদি বিবেচনা করা হয় মর্মে কোন বিষয় এখনও লক্ষ্যনীয় হয়নি।

জনাব আশরাফ সিদ্দিকী আরও বলেন, "জেন্ডার বাজেট প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিভ্রান্তি নিরসন কল্পে বলা যায়, এটি শুধু নারীর জন্য আলাদা কোন বাজেট নয় এবং বাজেটের কত শতাংশ জেন্ডার অসমতা ও নারীর জন্য গৃহীত প্রকল্পে বরাদ্দ করা হয়েছে তা জেন্ডার বাজেট নয়। জেন্ডার বাজেটে বিভিন্ন শ্রেণি-গোষ্ঠীর জনগণের প্রয়োজন ও স্বার্থ সামগ্রিকভাবে প্রতিফলন ঘটার কথা। এক অর্থে জেন্ডার বাজেট হলো মানবাধিকার বাস্তবায়নের বাজেট। তবে বৈশ্বিক বাস্তবতা এটাই যে পৃথিবীর কোনো দেশেই সর্বাংশে জেন্ডার সমতা নেই এবং উন্নয়নের মূলধারা থেকে বাদ পড়া জনগোষ্ঠীর অধিকাংশই নারী। তাই জেন্ডার বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় যখন প্রকল্প গুলো অগ্রাধিকার মূলক ক্রম ঠিক করে নেয়, তখন পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী হিসেবে অন্যান্য প্রান্তিক ও সুবিধাবঞ্চিত জনগণের সাথে নারী স্বাভাবিকভাবেই অগ্রাধিকার পায়। কারণ নারীকে উপেক্ষা মানেই যে কোন দেশের অর্ধেক জনগোষ্ঠীকে উপেক্ষা করা এবং একই সাথে এই বিশাল মানব সম্পদের অর্থনৈতিক উৎপাদনের সম্ভাবনাকে উপেক্ষা করা। অথচ গড় আয়ু, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও উপার্জনের অধিকার, নিরাপত্তা ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ ইত্যাদি বিষয়ে নারী সমাজ এখনো অনেক পিছিয়ে আছে"।[২৩]

বাংলাদেশে জেন্ডার বাজেট প্রণীত হচ্ছে তবে ধীরে ধীরে এই বিষয়গুলো ও অন্তর্ভুক্ত হওয়া প্রয়োজন। তা না হওয়া পর্যন্ত মূলতঃ তা নারীদের ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ হয়ে উঠবেনা।

[২২]. আশরাফ সিদ্দিকী ঃ জেন্ডার রেসপনসিভ বাজেট(প্রবন্ধ), জেন্ডার ও উন্নয়ন কোষ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬১৬-৬১৭।

[২৩] .পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ৬১৬-৬১৭।

৭.২.৭ নারীদের ব্যবসা বানিজ্য, পারিবারিক শ্রম, এনজিওদের কার্যক্রমে সীমাবদ্ধতা এবং চলাফেরার ক্ষেত্রে বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতা

১. শ্রম বাজার, গার্মেন্টস ও রপ্তানী খাতের সমস্যা

(ক) শ্রমবাজারে নারীদেরকে ব্যবসার অংশীদার হিসেবে নয় বরং ভোগ্যপণ্য ও বিপণনে নারীর যৌন আবেদনকে কৌশলে ব্যবহার

শ্রমের বাজারে অনেক ক্ষেত্রে নারীর অংশ গ্রহণের সুযোগ সীমিত এবং তা সমস্যা জর্জরিত। ফলে নারীরা কম মজুরীর কাজে যুক্ত, যেখানে কর্মপরিবেশও অনুন্নত। অথচ এ দিকগুলো গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয় না বরং নারীকে ব্যবসার অংশীদার হিসেবে নয় অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভোগ্যপণ্যের বিপণনে নারীর যৌন আবেদনকে অত্যন্ত কৌশলে ব্যবহার করা হয়। এ বিষয়ে জনাব আবুল মোমেন এর মন্তব্য প্রনিধানযোগ্য। তিনি বলেন," ধরে নেওয়া হয় যে, বাজার এখনো পুরুষ ক্রেতাই নিয়ন্ত্রন করছে, তাই টোপ হিসেবেই নারীর এই অপব্যবহার।.. .. ফলে, বাজার সব কিছুর নিয়ন্ত্রন করছে, নীতি, ঔচিত্য বা সংস্কৃতির সব গন্ডিই তছনছ করে এক তরফা সর্বনাশা খেলায় মেতেছে বাজার। তাতে সমাজের মানবিক ঐতিহ্যের অনেক কিছুই বিনষ্ট হচ্ছে - নীতিনৈতিকতার চাপে পড়ছে, তবে সবচেয়ে বেশ আক্রান্ত হচ্ছে নারীর শালীন সৌন্দর্য" ।[২৪]

(খ) পোশাক এবং অন্যান্য উৎপাদন এবং নির্মাণ কারখানায় শ্রমিকদের অবহেলা এবং অসম্মান

ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্টরে সবচেয়ে বেশী সংখ্যক নারী নিয়োগ দান করলেও কিন্তু শ্রম আইন অনুযায়ী কর্ম পরিবেশ এ বেতন দেওয়া হচ্ছে না। নির্মান, পোশাক এবং অন্যান্য উৎপাদন কারখানায় মজুরী প্রদানের ক্ষেত্রে পুরুষের তুলনায় নারী বৈষম্যের শিকার হচ্ছে। নিম্ন আয়ের নারীদের জন্য আবাসন সুবিধা এখনও খুব সীমিত। বেশীর ভাগ শিল্প কারখানায় সবেতনে মাতৃত্ব কালীন ছুটি দেওয়া হয়না। যদিও শ্রম আইনে রয়েছে, তথাপিও বেশীর ভাগ কর্মস্থলে অপর্যাপ্ত আবাসন, শৌচাগার ও শিশু রক্ষনাবেক্ষন সুবিধা নেই। রপ্তানীকারক প্রতিষ্ঠান সমূহে নারীদের ট্রেড ইউনিয়ন করা নিষিদ্ধ। পোষাক শিল্প কারখানা, যেখানে বেশীরভাগ শিপমেন্ট হয় রাতে, সেখানকার নিরাপত্তা সহ অন্যান্য প্রাইভেট সেক্টর সমূহেও নিরাপত্তার প্রশ্নটি প্রধান। কিন্তু তার উপর কোন গুরুত্ব নেই।

গত ২৪ এপ্রিল ২০১৩, সাভারে রানা প্লাজা নামীয় গার্মেন্টস ফ্যাক্টরী ঢলে পড়ার কারণে এই ফ্যাক্টরীতে ৫টি কারখানায় কর্মরত ৩৪০০ মতান্তরে ৩৬১৯ জন শ্রমিকের মধ্যে ঘটনার পর পরই জীবিত উদ্ধার হয়েছেন ২৪৩৮ জন, ১১১৫ জনের লাশ উদ্ধার হয়। জীবিত উদ্ধার হওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে ১৮ জন পরে হাসপাতালে মারা গেছেন। সব মিলিয়ে সে সময়ে মারা গেছেন ১১৩৪ জন শ্রমিক ও দু'জন উদ্ধারকর্মী।[২৫] মৃত অবস্থায় উদ্ধারকৃত কোন কোন লাশের শরীর, চেহারা এতটাই নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল যে আত্মীয় স্বজন কর্তৃক শনাক্ত করা কঠিন হয়ে পড়েছে। যার অধিকাংশই নারী। জানা গেছে ধ্বংশ স্তুপের ভেতর দু'জন নারী শ্রমিক দু'টি সন্তানও জন্ম দিয়েছেন।[২৬] শিশুদের এবং তাদের মা'দের জীবিত উদ্ধারের কোন তথ্য/ প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

---

[২৪].আবুল মোমেন ঃ' ইভ টিজিং ও ধর্ষণ থেকে পরিত্রান পেতে হলে'(প্রবন্ধ), প্রথম আলো, ১৯ জানুয়ারী ২০১৩।

[২৫].মনজুরুল হকঃ ধ্বংসের ৮ মাস পরও রানাপ্লাজার শ্রমিকদের দুর্দশা কাটলনা কেন? (প্রবন্ধ), উপসম্পাদকীয় কলাম, আমাদের সময়, ২৬ জানুয়ারী ২০১৪।

[২৬].আমাদের সময়, ২৬ এপ্রিল, ২০১৩।

ফ্যাক্টরিতে শ্রমিকদের নিরাপত্তা না থাকা এবং মাতৃত্বকালীন ছুটি না দেয়া এই দুর্দশার বাস্তব উদাহরণ। প্রথম আলো দৈনিক পত্রিকা কর্তৃক এক সমীক্ষায় দেখা গেছে জীবিত উদ্ধারকৃত শ্রমিকদের মধ্যে ৪৩০ জন শ্রমিক মাথায় গুরুতর আঘাত পেয়েছেন, ৩৬৩ জন পা ও ২২৯ জন হাত হারিয়েছেন, ২০৫ জনের পাঁজর ও ১৪০ জনের মেরুদন্ড ভেঙ্গেছে এবং ২৮৮ জন মানসিকভাবে অসুস্থ বা ট্রমায় ভুগছেন।[২৭] ডিসেম্বর ২০১৩ পত্রিকার সংবাদ থেকে জানা যাচ্ছে যে রানা প্লাজা ধ্বংসের ডাম্প করে রাখা ধ্বংসস্তুপ থেকে মানুষের হাড়গোড় পাওয়া যাচ্ছে।[২৮] অর্থাৎ মৃত সকলের লাশ উদ্ধার হয়নি।

গত ৩ জানুয়ারী ২০১৫ এ দৈনিক প্রথম অলো পত্রিকায় '২৪ এপ্রিল ঃ হাজার প্রাণের চিৎকার' শীর্ষক সংকলনে সর্বশেষ সংগৃহীত তথ্য থেকে বলা হয়, "২০১৩ সালের ২৪ এপ্রিল রানা প্লাজা ধ্বসে ৫৯ জেলার ১১৭৫ জন শ্রমিক নিহতও নিখোঁজ হন। এদের মধ্যে ৮৩৫ জনের লাশ প্রাথমিক ভাবে সনাক্ত হয় ও তিন দফা ডিএনএ পরীক্ষায় ১৭৮ জনের পরিচয় নিশ্চিত হয়। নিখোজ শ্রমিকের সংখ্যা ১৬২। ১১৭৫ জন নিহত ও নিখোঁজ শ্রমিকদের মধ্যে ১৩ - ১৭ বছর বয়সের শ্রমিকের সংখ্যা ৩৯ জন, ১৮ - ২৫ বছরের ৫৮৯, ২৬ -৩৩ বছরের ২৫৭, ৩০ - ৪০ বছরের ৯৮, ৪১ -৫০ বছরের ২৯ এবং পঞ্চাশোর্ধ শ্রমিকের সংখ্যা ১১জন। তাদের মধ্যে নারী ৭১৫ এবং পুরুষ শ্রমিক ৪৬০ জন। যদিও পোষাক মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএ এর হিসেবে রানাপ্লাজা ধ্বসে নিহত শ্রমিকের সংখ্যা ১১৩৬ জন।[২৯]

কারখানা তৈরীতে উপযুক্ত ভিত্তি প্রস্তর না থাকা এই এক্সিডেন্টের কারণ। গার্মেন্টস কারখানায় নারীরাই অধিক সম্পৃক্ত বিধায় তাদের জীবনের মূল্য নগণ্য বিবেচিত হয় বিধায়ই সম্ভবতঃ এরূপ ব্যবস্থা হয়ে থাকে। মালিকগণ নারীদের নিরাপত্তার বিষয়টি বিশেষ বিবেচনায় আনয়নের প্রয়োজন বোধ করেননা।

রানা প্লাজা ধ্বসের প্রায় আড়াই মাস আগে রাজধানীর মোহাম্মদপুর বেড়িবাঁধের পাশে এক্সপোর্ট লিমিটেড নামীয় পোষাক কারখানায় আগুন লেগে সাত নারী শ্রমিক মৃত্যু বরণ করেন বেশ কিছু শ্রমিক আহত হন। আহতদের ৬ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। শ্রমিকদের অভিযোগ হ'ল জরুরী বহির্গমন সিঁড়ির ফটকে তালা লাগানো থাকায় তাঁরা বের হতে পারেননি।[৩০]

আবার রানা প্লাজা ধসের ৫ মাস আগে গত ২৪ নভেম্বর ২০১২ আশুলিয়ার নিশ্চিন্তপুরে তোবা গ্রুপের তাজরিন ফ্যাশন লিমিটেডে ঘটেছিল আরও এক ট্রাজেডি। আগুনে ১১১ শ্রমিক নিহত হন। আহত হয়েছিলেন ১০4 জন শ্রমিক।[৩১] শুধু তাজরীন নয় ২০০৬ এ কেটিএস গার্মেন্টস এ আগুন লেগে নিহত হন ৫৫ জন শ্রমিক, ২০০5 সালের ১১ এপ্রিল সাভারের পলাশ বাড়িতে ঘটেছিল স্পেকট্রাম গার্মেন্ট ট্রাজেডি। নিহত হয়েছিলেন প্রায় ৬৪ জন। ১৯90 এ সারাকা গার্মেন্টস এ আগুনে নিহত হন ৩০জন শ্রমিক।[৩২] ধ্বসের নজির আছে তেজগাঁওয়ের ফিনিক্স ভবনেরও । দেখা যাচ্ছে কখনও আগুনে পুড়ে কখনও ভবন ধ্বসে প্রাণ দিচ্ছেন পোষাক কল শ্রমিকেরা ।

---

[২৭].প্রথম আলো, ৯ জুন ২০১৩।

[২৮].আমাদের সময়, (উপসম্পাদকীয় কলাম), ২৬ জানুয়ারী ২০১৪।

[২৯].প্রথম আলো, ৩ জানুয়ারী,২০১৫।

[৩০]. প্রথম আলো,২৭ জানুয়ারী ২০১৩ ।

[৩১].প্রথম আলো, ১ মে ২০১৩এবং আমাদের সময়, ১০ ফেব্রুয়ারী ২০১৪।

[৩২]. প্রথম আলো, ১ মে ২০১৩।

এই সেক্টরে কাজ করেন বেশীর ভাগ মফস্বল থেকে আসা দরিদ্ররা, যার বেশীর ভাগই নারী। এ কারণে দুর্ঘটনায় প্রাণ যায় ওই দরিদ্র নারী শ্রমিকদেরই বেশী। জনাব আব্দুল মান্নান তাঁর "সাভার ট্রাজেডি সবার চোখ খুলে দিক" প্রবন্ধে বলেন, ''.. .. এই শিল্প এই দেশে গড়ে উঠেছে অপরিকল্পিত ভাবে, যত্রতত্র। কিন্তু এ পর্যন্ত কোন সরকারই এই গুরুত্বপূর্ণ খাতটির জন্য কার্যকর নীতিমালা তৈরী করেনি। .. শ্রমিকদের পক্ষে কথা বলার কেউ নেই। যাঁরা নিজেদের শ্রমিকদের প্রতিনিধি মনে করেন, তাঁরা নিজেদের স্বার্থের বাইরে কদাচ যেতে পারেন। .. .. তৈরী পোষাক শিল্পের জন্য একটি নিয়ন্ত্রন সংস্থার অবশ্যই প্রয়োজন, যেমনভাবে প্রয়োজন এই শিল্পের জন্য একটি সুষ্ঠ নীতিমালা। তা না হলে সাভারের মতো দেশ কাঁপানো ঘটনা ঘটতে থাকবে"।[৩৩]

বাংলাদেশে নারীরা কতটা তুচ্ছ এবং অপমান জনক ভাবে পরিগণিত হয় তা রানাপ্লাজা, তাজরিন ফ্যাশন লিমিটেড, স্পেকট্রাম গার্মেন্ট, কেটিএস গার্মেন্টস ট্রাজিডি এবং সারাকা গার্মেন্টস এর নারী শ্রমিকদের পরিণতিই তার প্রধান উদাহরন।

যদিও শ্রমিকদের জন্য একটি আইন ২০০৬ সন থেকে বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু তার প্রয়োগ দেখা যায়না। রানাপ্লাজা ধ্বসের পর একটি নীতিমালা গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু তার প্রয়োগ অদ্যাবধি শুরু হয়নি। আবার গত ২২ এপ্রিল ২০১৩ মন্ত্রিসভায় বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ এর সংশোধনী প্রস্তাব নীতিগত ভাবে অনুমোদন করা হয়। ১৩ মে ২০১৩ মন্ত্রিসভায় সংশোধনীটি চূড়ান্ত অনুমোদন পায়। পরবর্তী সংসদ অধিবেশনে আইনটি 'বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধন) আইন, ২০১৩' নামে পাস হয়। কিন্তু তার প্রয়োগ অদ্যাবধি লক্ষ্যনীয় হয়ে ওঠেনি।

২. পারিবারিক ও অবৈতনিক শ্রমে নিয়োজিত নারী

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার কর্মসংস্থান অবস্থা বিচারে দেখা যায় যে, বেশীরভাগ নারী কর্মরত রয়েছে পারিবারিক এবং অবৈতনিক কৃষি শ্রমে। যার কোন স্বীকৃতিই অদ্যাবধী নেই। প্রামাণ্য চিত্র ১-এ পারিবারিক কাজের কঠোর পরিশ্রমের পর ও নারীর কাজের কোনই স্বীকৃতি যে নেই তারই একটি চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

সারাদিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর তার আর্থিক পাওনা তো নেইই তার স্বীকৃতি পর্যন্ত মেয়েরা সমাজ থেকে, পরিবার থেকে পায়না। শিশুর যত্ন, রোগীর সেবা, ঘরের যাবতীয় কাজের দায়িত্ব পালন সহ প্রতিনিয়ত তারা অনেক দায়িত্বশীল ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে যাচ্ছে। নারীদের গৃহস্থালির এ সব কাজকে অদৃশ্য শ্রম হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কিন্তু তাদের এই সব মজুরীবিহীন কাজ পরিবারে, সমাজে এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

শেখ মেহেদী হাসান এক গবেষণার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন,"গবেষণায় দেখা গেছে, বাংলাদেশে ৮১% নারী সরাসরি গৃহস্থালী কাজে নিয়োজিত থাকে অন্যদিকে পুরুষ থাকে মাত্র ১.৩%। যেখানে ১৯% নারী চাকরির সাথে যুক্ত সেখানে ৯৮.৭% পুরুষ কোন না কোন নিয়মিত বা অনিয়মিত চাকরীতে নিয়োজিত আছে। .. .. বাংলাদেশের নারীরা প্রতিদিন ১৬ থেকে ১৮ ঘন্টা পর্যন্ত কাজ করে। সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর রাত পর্যন্ত একজন নারী ৪৫ ধরনের কাজ করে। এর মধ্যে ধানভাঙ্গা, সবজির বাগান করা, ফসল কাটা, ঘরে তোলা, খাবার প্রস্তুত করা, পশুপালন, হস্ত শিল্প, গৃহকর্ম - ঘর পরিস্কার, রান্না, পরিবারের সমস্যদের যত্ননেয়া, শিশুদের পরিচর্যা, স্বামীর সেবা সহ বিভিন্ন ধরনের কাজ বিদ্যমান। ঘন্টা প্রতি মাত্র ১০ টাকা হারে হিসাব

[৩৩] আব্দুল মান্নানঃ তৈরী পোষাক শিল্পঃ সাভার ট্রাজেডি সবার চোখ খুলে দিক, প্রথমআলো, ৩ মে ২০১৩, পৃঃ ১৩।

করলেও নারীর এ শ্রমের মূল্য দাঁড়াবে বড় অঙ্কে। রান্নার জন্য একজন গৃহকর্মীকে যদি মাসে ২০০ টাকা দিতে হয় তাহলে রান্নার মাধ্যমে নারীর কাজের পরিমাণ হিসাব করলে তার অর্থ পরিমানে ৯ হাজার টাকায় দাঁড়ায়। আর একজন নারীর ৪৫ রকমের কাজ ও তার শ্রমমূল্য হিসাব এবং বাংলাদেশের গ্রাম থেকে শহরের ৫৩.১ মিলিয়ন নারীর এই শ্রমকে অদৃশ্য বিবেচনা না করলে বছরে এর পরিমান প্রায় ১০০ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছাবে। এটিকে যদি সরকারী বেতন স্কেলের সঙ্গে তুলনা করা যায় তাহলে দেখা যাবে একজন নারী একজন প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তার পাশাপাশি কাজ করে। কেবল অদৃশ্য শ্রম বিবেচনা করে জাতীয় অর্থনীতিতে এর স্বীকৃতি দেয়া হচ্ছেনা। যতোদিন পর্যন্ত জাতীয় অর্থনীতিতে এর অবদানকে স্বীকার ও হিসাব করা না হবে, ততোদিন পর্যন্ত জেন্ডার সংবেদনশীল সমাজ গঠনের পথও দীর্ঘ থেকে যাবে। .. .. যেহেতু পরিবার সমাজ, রাষ্ট্র, নারীর গৃহস্থালী কাজকে মূল্য দিচ্ছেনা সে কারণে নারীকেও মূল্যহীন হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। নারীদের পারিশ্রমিক বিহীন এই কাজের মূল্যায়ন বর্তমান জিডিপিতে অনুপস্থিত । .. .. বাংলাদেশের দারিদ্র দূর করার লক্ষ্যে প্রণীত দারিদ্র বিমোচন কৌশলপত্রে নারীর মাতৃত্বকালীন এবং গৃহস্থালি কাজের দেয়া শ্রম এবং সময় কমিয়ে আনার পাশাপাশি এসব কাজের যথাযথ মূল্যায়নের কথা বলা হয়েছে। তবুও এ বিষয়ে এখনো কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি"।[৩৪]

আবার শাশ্বতী ঘোষ, বলেন, " ঘরের কাজের ৮০% নারীরাই করে। শিশুপালনের দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে নারীদের। ছোট বা বেশী বাচ্চা থাকলে নারীদের ঘরের কাজের পরিমাণ আরো বাড়ে, কিন্তু পুরুষদের বাড়ে না। সন্তান ধারনের জৈবিক দিকটার বাইরে বাকি কাজ তো স্বামী-স্ত্রী, পুরুষ-নারী যে কেউ করতে পারে। কিন্তু বাস্তবে তা হয়না । বাচ্চা হলে নারীই চাকরী ছাড়ে, বাচ্চা বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজের কাজ গুলোকে সেভাবে মানিয়ে নেয়। চাকুরিরত স্ত্রী শুধু স্বামীর জন্য সপ্তাহে আটঘন্টা বেশী কাজ করে, কিন্তু স্ত্রী চাকরী করলে স্বামী সপ্তাহে গড়ে আধঘন্টা বেশী কাজ করে। আর ঘরদোরের জন্য চাকরীরত স্ত্রীকে সপ্তাহে ত্রিশ ঘন্টা, চাকরীরত না হলে সপ্তাহে চল্লিশ ঘন্টা ব্যয় করতে হয়। .. .. ঘর গেরস্থালির কাজকে হেয় করে দেখা হয় কারণ তার বিনিময়ে টাকা পাওয়া যায়না অর্থাৎ সেটা পণ্য নয়, তাই সে এই সমাজে সম্মান পায় না। ফলে ঘরের মেয়ে-বউও খরচের খাতায় চলে যায়। দ্বিতীয়তঃ যে কাজ লোকের চোখের আড়ালে চলে যায় সে কাজের দামও কমে যায়। অথচ তার মানে এই নয় যে ঘরের চার দেওয়ালের ভেতরে সে কিছু কম কাজ করে। .. .. ১৯৯৩ সালে জাতিসংঘের সংশোধিত জাতীয় আয়ের পরিমাপ বা সিস্টেম অব ন্যাশনাল অ্যাকাউন্টস পদ্ধতিতে পরিবারের মধ্যে উৎপন্ন হয়ে পরিবারেই ভোগ করা হয়ে যায় এরকম জিনিসের বাজার দাম হিসেব করে দেখা গেছে পৃথিবীতে মোট ১৬ লক্ষ কোটি (ট্রিলিয়ন) ডলার দ্রব্য উৎপন্ন হয়। তার মধ্যে ১১ লক্ষ কোটি ডলার উৎপাদন করে নারীরা। তবুও জাতিসংঘের মতে, এই হিসাব বাস্তব উৎপাদনের চেয়ে অনেক কম। তাই জাতিসংঘ তার সদস্য দেশগুলোকে প্রস্তাব দিয়েছে জাতীয় আয় পরিমাপের জন্য এই প্রক্রিয়াই নিয়মিত ভাবে ব্যবহার করতে, যাতে বাজার-বহির্ভুত উৎপাদন হিসেবের আওতায় আসতে পারে। তা হলে নারীদের গৃহশ্রমের কিছুটা অন্তত স্বীকৃতি মিলতে পারে"।[৩৫]

যত হিসাব এবং পরিমাপই করা হউক না কেন, অন্ততঃ ঘরে যদি স্বামী স্ত্রীর মধ্যে প্রতিযোগিতা - প্রতিদ্বন্দ্বিতা না থাকতো, পরস্পরের প্রতি আস্থা নিষ্ঠা, কিছুটা ভালোবাসা, আদর মহব্বত থাকতো, পরিবারটি সন্তানদের নিরাপদ বেড়ে ওঠার স্থান হতো - তখন এই হিসেবের কোন প্রশ্নই আসতোনা।

---

[৩৪]. শেখ মেহেদী হাসান ঃ নারীর অদৃশ্য শ্রম(প্রবন্ধ) , জেন্ডার ও উন্নয়ন কোষ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১২৯-১৩০।

[৩৫]. শাশ্বতী গোষ ঃ গৃহশ্রম(প্রবন্ধ), জেন্ডার ও উন্নয়ন কোষ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১১৫-১১৮।

৩. এনজিওদের ঋণ কার্যক্রমের ক্ষেত্রে বিদ্যমান সীমাবদ্ধতা

পুরো বাংলাদেশ জুড়ে এনজিওরা কি ধরনের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে তা চতুর্থ অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে। এই এনজিওদের কার্যক্রমের সবচেয়ে বড় বিষয়টি হলো ঋণ কার্যক্রম। বাংলাদেশের এনজিওরা প্রধানতঃ ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্পের মাধ্যমে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকেন। এই ঋণ কার্যক্রমের আওতায় ঋণ গ্রহীতাদের অধিকাংশই নারী। এই ঋণ কার্যক্রমের আওতায় তারা হাঁস মুরগী, গবাদী পশু, মৌমাছি পালন, রেশম উৎপাদন, মৎসচাষ, সেলাইকাজ ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে দরিদ্র - অসহায়- অশিক্ষিত- অর্ধ শিক্ষিত নারীদের আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।[৩৬]

তবে এই ঋণ কার্যক্রম অনেক সময় নারীদের উপর বোঝা হয়েও দাঁড়ায়। কারণ বিভিন্ন এনজিও থেকে ঋণ গ্রহণ করে লাভ সহ তা ফেরত দিতে গিয়ে নারীরা তাদের দরিদ্র অবস্থায় আবার ফিরে যায়। বিভিন্ন সময়ে সরকারী - বেসরকারী উদ্যোগে শহরে গ্রামে কোন রিলিফ বিতরনের দৃশ্যে যে বিশাল সংখ্যক poorest of the poor নারীদের দেখা যায়, যে ধরনের ছেঁড়া পোষাক তাদের পরণে দেখা যায় এমনকি একটি শাড়ির জন্য, একখন্ড চাদরের জন্য পায়ের তলায় পিষ্ট হয়ে মরতে দেখা যায় - তখন পুরো দেশজুড়ে এনজিওদের ঋণ কার্যক্রমের ফলাফল নিয়ে সত্যিকার অর্থে প্রশ্ন দেখা দেয়। জনাব আতিউর রহমান বলেন, ‘ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহণকারীদের মধ্যে প্রায় ৯০ শতাংশই নারী’। তিনি আরও বলেন, ‘ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল দারিদ্র দূরীকরণ এবং নারীদের সামাজিক ভাবে ক্ষমতায়ন করা। ক্ষুদ্রঋণের প্রভাবে দারিদ্র হ্রাস এবং নারীর সামাজিক ক্ষমতায়ন আগের তুলনায় বৃদ্ধি ঘটেছে। .. .. তবে ঋণের সমালোচনাও বিস্তর। ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর অধিকহারে সুদ গ্রহণ, নারীকে সামনে রেখে পুরুষের ক্ষুদ্র ঋণের যাবতীয় সুবিধা গ্রহণ, হত দরিদ্র নারীকে পাশ কাটিয়ে ক্ষুদ্র ঋণের প্রসার, সামাজিক বিষয়গুলোকে গুরুত্ব না দিয়ে শুধুই আর্থিক লেনদেনের উপর গুরুত্বারোপ, অবকাঠামোর অভাবে ক্ষুদ্র ঋণের প্রকৃত সুফল না পাওয়া।[৩৭]

ড. আরএম দেবনাথ তাঁর ‘ক্ষুদ্র ঋণ নিয়ে যত কথা’ প্রবন্ধে বলেন,“ কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, যতই সময় যেতে লাগল ততই দেখা গেল ক্ষুদ্র ঋণদাতা প্রতিষ্ঠান ও এনজিও গুলো নানা অনিয়মের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ল। উচ্চ সুদ আদায়, আদায় কালীন নির্যাতন - অত্যাচার, প্রশাসকদের বিলাসী জীবনযাপন, সুদের উপর তস্য সূদ আদায়, ঋণের নামে নানাভাবে মানুষকে ঠকানো ইত্যাদি অভিযোগ পাওয়া যেতে শুরু করল। দেখা গেল এনজিওদের ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠানের কোন জবাব দিহীতা নেই। তাদের কার্যক্রমে নেই কোন স্বচ্ছতা, তাদের প্রশাসনে চলছে স্বেচ্ছাচারিতা, কার্যক্রমে দেখা যাচ্ছে ‘সুগারকোটিং’। আছে ‘উনডোড্রেসিং’। দিনের পর দিন এসব ব্যাপারে অভিযোগ জমা হয়। বাইরেও সমালোচনা প্রচুর। এতদিন ধরে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম চলছে ; কিন্তু এ কার্যক্রম দারিদ্র বিমোচনে কোন স্থায়ী ও কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারছেনা। ক্ষুদ্রঋণের আওতায় আছে কম পক্ষে সাতকোটি লোক। কিন্তু দেখাযাচ্ছে দেশে এ মুহূর্তে সাতকোটি লোকই আছে, যারা দারিদ্র সীমার নিচে বসবাস করে। অতএব প্রশ্ন , ক্ষুদ্র ঋণ তাহলে কি করল? ক্ষুদ্রঋণ দিয়ে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব এমন একটি ধারণা দেওয়া হয়েছিল। দেখা যাচ্ছে, এ ধারণাটিও মারাত্মক ভুল। এ ঋণের সীমাবদ্ধতা প্রচুর। দিনে দিনে তা ধরা পড়তে শুরু করল। এক শ্রেণীর লোক ক্ষুদ্র ঋণ দানকে পেশা হিসেবে নিয়ে বিলাসী জীবন যাপন করছে। অথচ বিপরীতে ঋণগ্রহীতারা হচ্ছে দীর্ঘকালের জন্য ঋণগ্রস্থ। এক প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে ঋণ গ্রহিতারা আরেক প্রতিষ্ঠানের ঋণ পরিশোধ করছে। কার্যত: ঋণ গ্রহিতাদের ঋণের পরিমাণ

[৩৬].মালেকা বেগম ঃ এনজিও (প্রবন্ধ), জেন্ডার ও উন্নয়ন কোষ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫৪৫।

[৩৭]. আতিউর রহমানঃ ক্ষুদ্রঋণ ও নারীরক্ষমতায়ন (প্রবন্ধ), জেন্ডার ও উন্নয়ন কোষ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬০৮- ৬১০।

Dhaka University Institutional Repository

উর্ধ্বমুখী। তাদের ঋণ মুক্তির কোন লক্ষণ নেই, দারিদ্র্যসীমার উর্দ্ধে ওঠার কোন লক্ষণ নেই"। তিনি প্রস্তাব রাখেন, "অতএব ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের জন্য 'ব্যাংক কোম্পানি আইনে'র আদলে আইন ও যথাযথ বিধিমালা চালু করা হোক। মনে রাখা দরকার, ক্ষুদ্রঋণের প্রয়োজন আছে। এর সমালোচনা মানে এর কার্যক্রম বন্ধ করা নয়। একে আইনের অধীনে আনাই হচ্ছে সময়ের দাবি। একে শোষণের হাতিয়ার হতে না দেওয়াটাই সময়ের দাবি। ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম যাতে কারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি বানানোর হাতিয়ার না হয়, তাও সময়ের দাবী"।[৩৮]

সাম্প্রতিক সময়ে এই ঋণ দান কার্যক্রম যাতে গরীব শোষণ এর পর্যায়ে না যায় এবং মানুষ যাতে ঋণ পরিশোধ করতে গিয়ে নিঃস্ব হয়ে না যায়' - এ বিষয়ে পল্লীকর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন এর একটি ঋণ দান কর্মসূচিতে স্বয়ং বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী সংশ্লিষ্ট সকলকে সজাগ থাকার নির্দেশ দিয়েছেন।[৩৯] এই নির্দেশ প্রতিপালনের মধ্যেই রয়েছে সুদ জনিত নির্যাতনের হাত থেকে নারী মুক্তির দিশা।

৪. নারীদের চলাফেরার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা

নারীরা স্বাধীন ভাবেও চলাফেরা করতে গিয়ে প্রতিবন্ধকতার শিকার হচ্ছেন ইভটিজিং/যৌনহয়রানির কারণে। গত ২৮ অক্টোবর ২০১৪ তারিখে প্রকাশিত প্রথম আলো পত্রিকায় জনাব শিশির মোড়লের এক প্রতিবেদনে অ্যাকশন এইড নামীয় একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক 'নিরাপদ নগর কর্মসূচির ভিত্তিমূলক জরিপ' এ যৌন হয়রানী এড়াতে নারীরা নিজেদেকে রক্ষার যে কৌশল অবলম্বন করে, সে সম্পর্কে প্রদত্ত তথ্য হ'ল -

রাতে ঘরের বাইরে যেতে চাননা ৬২% নারী
একা ঘরের বাইরে যেতে চাননা ৬০% নারী
নির্দিষ্ট এলাকা এড়িয়ে চলেন ৪৭% নারী
জনবহুল ও নির্জন স্থান এড়িয়ে চলেন ২৩% ও ২৬% নারী
গণপরিবহন ব্যবহার বন্ধ করেছেন ১৩% নারী
রঙ্গিন পোষাক পরা ছেড়েছেন ২১% নারী
আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্র বা যন্ত্রপাতি সঙ্গে রাখেন ৩% নারী।[৪০]

নারীদের উন্নয়নের ক্ষেত্রে এইসব বিষয়াদি প্রচুর প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করছে।

৭.২.৮ বিদ্যমান আইন এবং বিধিব্যবস্থায় সীমাবদ্ধতা /দূর্বলতা

বর্তমান গবেষণার চতুর্থ অধ্যায়ে বাংলাদেশে নারী নির্যাতন রোধকল্পে ১৯টি আইন / বিধিবিধানের বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু তা স্বত্বেও পঞ্চম অধ্যায়ে নারী নির্যাতনের যে চিত্র অঙ্কিত হয়েছে তাতে আইনী বিধি-ব্যবস্থার উপর প্রশ্নই দেখা যায় যে, এত অধিক আইন এবং আইনী সুযোগ সুবিধা বিদ্যমান থাকা স্বত্বেও কেন এত নির্যাতন চলছেই, বন্ধ করা যাচ্ছেনা। মূলতঃ বাংলাদেশের নারী নির্যাতন প্রতিরোধে

[৩৮]. ড. আরএম দেবনাথ (অর্থনীতিবিদ ও ব্যাংকার) ঃ ক্ষুদ্র ঋণ নিয়ে যত কথা (প্রবন্ধ) , যুগান্তর, ২৫ ডিসেম্বর ২০১০ ।
[৩৯]. প্রথম আলো, বৃহস্পতিবার, ১৪ ফেব্রুয়ারী, ২০১৩।
[৪০].প্রথমআলো, ২৮অক্টোবর ২০১৪।

Dhaka University Institutional Repository

বিদ্যমান আইন সমূহের মধ্যে রয়েছে যথেষ্ট সীমাবদ্ধতা এবং জটিলতা। যার কারনে নির্যাতিত নারীরা যথাযথ ভাবে আইনের সুফল থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।
বিদ্যমান আইন সমূহের সীমাবদ্ধতা এবং জটিলতা সমূহের স্বরূপ নিম্নরূপ -

১. দন্ডবিধি ১৮৬০ (The Penal Code 1860)

দন্ডবিধিতে নারী ও শিশু নির্যাতন সংক্রান্ত অপরাধ ও অপরাধের সাজা বিদ্যমান রয়েছে যে বিষয়ে চতুর্থ অধ্যায়ে সারণী ১৪ এ বিস্তারিত দেখানো হয়েছে। যা বিশেষ ভাবে নারী - সংশ্লিষ্ট বিধান । এ ছাড়া পুরো দন্ডবিধি জুড়ে আইনের যত ধারা বিদ্যমান তার সব ধারার থেকেও নারীরা বিচার পেতে কোনই অসুবিধা নেই। কিন্তু তার পরেও দেখা যাচেছ বাংলাদেশে নারী সংশ্লিষ্ট আইনের পর আইন তৈরী হয়েই চলছে। নতুন নতুন আইন তৈরী হয়ে দন্ডবিধির আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে জটিলতার সৃষ্টি হচ্ছে।

২. বাল্য বিবাহ নিরোধ আইন ১৯২৯ এবং বাল্য বিবাহ নিরোধ আইন ২০১৪

বাল্য বিবাহ নিরোধ আইন ১৯২৯ এর বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ ৪র্থ অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। এই আইনের ৮নং ধারায় যাতে বলা হয়েছে যে, প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট ব্যতীত অন্য কোন আদালত এই আইনের অধীনে কোন অপরাধ আমলে নিতে কিংবা উহার বিচার করতে পারবেননা। যেহেতু বাল্য বিবাহ বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই গ্রাম পর্যায়েই অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। সেখানে ১ম শ্রেণীর বিচারিক হাকিমগণ থাকেননা। বিচারিক হাকিম পর্যন্ত যাওয়া সাধারণ জনগণের জন্য দুঃসাধ্য হয়, ফলে বিচারে যাওয়াই কম হয়েছে। যার কারণে ঘটনা ঘটেই যাচ্ছিল।

এভাবে অভিযোগ গ্রহণের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সময় ছিল বিধায় ও অপরদিকে বিয়েটি সংগঠিত হয়ে যাওয়ার সুযোগ ও ছিল। এ ধরনের ঘটনার ক্ষেত্রে এক স্থানে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী কর্তৃক বাধা প্রাপ্ত হলে স্বয়ং বাবা কর্তৃক মেয়েকে অন্য জায়গায় নিয়ে, গিয়ে বয়স সম্পর্কে মিথ্যা তথ্য দিয়ে বিয়ে দিয়ে দেয়া হয়েছে। উক্ত আইনের উল্লেখিত ফাঁকফোকরের কারণেই বাল্য বিয়ে প্রতিরোধ হচ্ছিলনা। ফলে বিভিন্ন সংশোধনের মাধ্যমে গৃহীত হচ্ছে 'বাল্য বিবিাহ নিরোধ আইন -২০১৪'।

বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ২০১৪

বাল্য বিয়ে নিরোধ আইন, ১৯২৯ সংক্রান্ত আইনটির উপরে উল্লেখিত কারণে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত এর অস্তিত্ব ছিল কিন্তু বাস্তবায়ন ছিলনা বললেই চলে। সে জন্যই বর্তমানে যুগোপযোগী করে বাল্য বিবাহ নিরোধ আইন, ২০১৪ এর জরিমানা ও সাজার মেয়াদ বাড়িয়ে একটি আইন প্রণীত হয়েছে। যে বিষয়ে ৪র্থ অধ্যায়ে বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এখানে মেয়েদের বিয়ের বয়স ১৮ রেখে সে সাথে ১৬ বয়সের একটি সুযোগ রাখা হচ্ছে। নারী নেতৃগণ থেকে শুরু করে পত্রপত্রিকায় এর প্রচুর সমালোচনা হচ্ছে।

গত ১ এপ্রিল ২০১৫(বুধবার) প্রথম আলো পত্রিকায় উপমা মাহবুব নামের একজন উন্নয়ন কর্মী এ সম্পর্কে যুক্তি সংগত বক্তব্য রেখে বলেন, " যারা ১৬ বছর বয়সে নারীর শরীর বিয়ের উপযুক্ত হয় বিধায় এ বয়সে বিয়ে দেওয়ার পক্ষে বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমে মন্তব্য করেছেন, তাঁরা কি চলার পথে ফুটপাথে বাস করা রুগ্ন কিশোরী মা আর তার চেয়েও রুগ্ন শিশুদের দেখেননা? প্রতিদিন দেশে যৌতুকের দাবীতে অসংখ্য নারী নিগৃহীত হচ্ছেন। এদেশে ১৮ বছর বয়সে বিয়ে হওয়া নারীকেই নিজের পায়ে দাঁড়াতে কঠোর সংগ্রাম করতে হয় । ১৬ বছরের একটি মেয়ে যদি বিয়ের পর নির্যাতনের শিকার হয়, যদি অল্প বয়সেই তার স্বামী মারা যান, যদি তার সম্পর্কচ্ছেদ হয়, তাহলে তার পুরো জীবন একটা ভয়াবহ অনিশ্চয়তার চাদরে ঢেকে যাবে। ... . সমগ্র বিশ্বব্যাপী সর্বজনীনভাবে নারীর বিয়ের বয়স ১৮ বছর নির্ধারণ করার পেছনে বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে, রয়েছে অসংখ্য গবেষণা। এটাকে যাঁরা প্রশ্নবিদ্ধ করছেন, তাঁরা আসলে সারা বিশ্বের বিরুদ্ধেই অবস্থান নিচ্ছেন। বাংলাদেশে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক প্রতিটি ক্ষেত্রে নারীরা এগিয়ে

আসতে শুরু করেছেন। এ রকম একটি সময়ে মেয়েদের বিয়ের বয়স কমানোর পক্ষে যে খোঁড়া যুক্তি বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমের নামে-বেনামে তুলে ধরা হচ্ছে, তা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, এখনো অনেক তথাকথিত আধুনিক মানুষ সন্তান উৎপাদন ও সাংসারিক দায়িত্ব পালনকেই নারীর একমাত্র দায়িত্ব বলে মনে করেন।. .. .. .. নারীর ক্ষমতায়নের অগ্রযাত্রায় যার প্রভাব হবে মারাত্মক নেতিবাচক " ।[৪১]

নারীর ক্ষমতায়নের অগ্রযাত্রায় আধুনিক যুগোপযোগী সিদ্ধান্তই নেওয়া হবে মর্মে সকলেরই প্রত্যাশা, কারণ মারাত্মক নেতিবাচক সিদ্ধান্ত নারীর জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

৩. <u>মাতৃকল্যান আইন, ১৯৩৯,</u> এবং <u>ফ্যাক্টরী আইন, ১৯৫৬</u>

চতুর্থ অধ্যায়ে বিস্তারিত বর্ণনায় দেখা গেছে এই আইন দু'টি নারী শ্রমিকদের জন্য বিশেষ করে গার্মেন্টস কর্মীদের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় আইন। যদিও এই আইন দু'টির যথেষ্ট প্রচার নেই এবং নারী শ্রমিকদের এ সম্পর্কে জানাও নেই। ফলে আইন বিদ্যমান থাকা সত্বেও সহজেই নারী শ্রমিকরা বৈষম্যের শিকার হচ্ছে। মাতৃত্ব ছুটিও তারা পাচ্ছেনা।

৪. বাংলাদেশ শ্রম আইন - ২০০৬ এর সংশোধন আইন বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধন) আইন, ২০১৩

সংশোধিত শ্রম আইন নিয়েও বিভ্রান্তি রয়েছে। বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ এর সংশোধনী প্রস্তাব সহ বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধন) আইন, ২০১৩ পাস হয়। এই আইনে পাঁচ হাজার বা তার বেশী শ্রমিক আছেন এমন প্রতিষ্ঠানে কমপক্ষে ১০০ স্থায়ী শ্রমিক থাকলে তাঁদের বীমার আওতায় আনার বিষয়গুলো আইনের ভালো দিক কিন্তু এই আইনে পোষাকশিল্পে ট্রেড ইউনিয়ন করার বিষয়টি নিশ্চিত হয়নি আবার চাকুরীচ্যুতির সুবিধা রাখা হয়েছে কিন্তু চাকুরীচ্যুতির পর আর্থিক সুবিধা পাওয়া নিয়ে অনিশ্চয়তা রয়েছে।[৪২]

৫. মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ ১৯৬১, পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ, ১৯৮৫(সংশোধনী ১৯৮৯) ।

উল্লেখিত ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ এবং পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ ১৯৮৫ (সংশোধনী ১৯৮৯) – এই দু'টি আইনের একটি আইন ও অধ্যাদেশ অপরটি শুধু মাত্র অধ্যাদেশ। যে কোন বিষয়ে আইন প্রণয়ন হয়ে গেলে অধ্যাদেশ বাতিল হয়ে যায়। কিন্তু এই দু'টি অধ্যাদেশের একটি দীর্ঘ ৫০ বছর অপরটি ২৭ বছর ধরে অধ্যাদেশ হিসেবে কিভাবে এবং কেন বিদ্যমান রয়েছে তার কারণ বোঝা মুশকিল। উল্লেখিত আইন /অধ্যাদেশ দু'টির বিষয়ে চতুর্থ অধ্যায়ে বিস্তারিত বলা হয়েছে। তার থেকে লক্ষ্যনীয় হয়েছে যে, ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ এবং ১৯৮৫ সালের পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ দু'টির ক্ষেত্রে অপরাধ এবং ফয়সলার বিষয় প্রায় একই রকম।

উল্লেখিত বিষয়াদি পরিপ্রেক্ষিতে দু'টি বিধানকে একত্রিত করে একটি বিধানের আওতায় আনা খুবই সহজ ছিল। কিন্তু কেন করা হয়নি এবং হচ্ছেনা তা বোধগম্য নয়। যার কারণে মানুষকে ছুটাছুটি করতে হয়। যা ন্যায় বিচার প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বিঘ্নের সৃষ্টি হয়।

---

[৪১]. উপমা মাহবুব (উন্নয়ন কর্মী) ঃ বিয়ের বয়স ১৮ ও ১৬!, প্রথম আলো, ১ এপ্রিল ২০১৫।

[৪২]. শিশির মোড়ল ঃ সংশোধিত শ্রম আইন নিয়ে বিভ্রান্তি(প্রতিবেদন), প্রথম আলো, ২৬ মে ২০১৩।

৬. বহু বিবাহ প্রতিরোধ আইন

বহু বিবাহ প্রতিরোধে ১৯৬১ সনে পাকিস্তান আমলে প্রবর্তিত **মুসলিম পারিবারিক আইন** অধ্যাদেশের এর মাধ্যমে একাধিক বিয়ের বিষয়ে কিছু লাগাম টানার চেষ্টা নেয়া হয়েছিল। এই আইনে ১ম স্ত্রীর অনুমতি ব্যতীত ২য় বিয়ে নিষিদ্ধ হয়েছে। আইনটি তৈরী কালে পবিত্র কুরআনের নির্দেশ, হযরত আলীর দ্বিতীয় বিয়ে সংক্রান্ত নবীজির (সঃ) প্রখ্যাত হাদিস এবং প্রখ্যাত মুসলিম চিন্তাবিদগণের চিন্তাচেতনা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণকে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। বাংলাদেশেও এই আইন চালু আছে। ফলে বাংলাদেশের মেয়েরাও স্বামীর দ্বিতীয় বিয়ের বিরুদ্ধে প্রতিকার চেয়ে আদালতের স্মরণাপন্ন হতে পারে।

কিন্তু দুঃখ জনক যে, আইনটি কিছু উদার স্বত্ত্বেও এতে বেশ কিছু দূর্বলতাও বিদ্যমান। যেমন স্বামী কর্তৃক ২য় বিয়ে সংগঠিত হওয়ার পরই ১ম স্ত্রী আদালতের স্মরণাপন্ন হতে পারে এর পূর্বে নয়, অর্থাৎ এতে দ্বিতীয় বিয়ে প্রতিরোধের কোন সুবিধা নেই। এবং ১ম স্ত্রীর বিনানুমতিতে ২য় বিয়ে প্রমাণিত হলে স্বামীর কয়েক বছরের জেল এবং জরিমানা ইত্যাদি সাজা হয়ে থাকে। এতে দেখা যায়, মামলা হওয়ার সাথে সাথে স্বামীর, প্রথম এবং প্রধান কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায় ১ম স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেয়া। ১ম স্ত্রী প্রভাবশালী হলে অনেক সময় ২য় স্ত্রীকেও তালাক দিয়ে দেয়া হয়। এই আইনে এরূপ তালাক প্রতিরোধেরও কোন ব্যবস্থা নেই। এই আইনে ১ম বিয়ে গোপন রেখে ২য় বিয়ে করলে ২য় স্ত্রীর প্রতিকার প্রার্থী হওয়ার কোন সুযোগ নেই। আবার কোনরূপ তালাক যদি নাও হয়, সেই ক্ষেত্রে সাজা ভোগের পর স্ত্রীদের সাথে স্বামীর আচরণের কোন ব্যাখ্যা এই আইনে নেই। অন্যায় ভাবে তালাক প্রাপ্ত এই সব স্ত্রীদের এবং তাদের সন্তানদের ভরণপোষণের শক্ত কোন ভিত্তিও এই আইনে নেই। ফলে আইনের আশ্রয় প্রার্থীর সংখ্যা খুবই কম। আবার ১৯৮৫ সনের পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশেও বিবাহ সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তির বিষয় রয়েছে। এই আইনটি ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশের বিধানাবলী সাপেক্ষে প্রণীত হয়েছে।

কয়েকজন বিশেষজ্ঞের অভিমত হ'ল - "পারিবারিক আদালত হচ্ছে স্থানীয় সহকারী জজের আদালত। এখানে কোন সাজার বিধান নেই। তবে এই আদালত অভিযোগকারীগণের অভিযোগের প্রেক্ষিতে উভয় পক্ষকে শুনে কাগজ পত্র পর্যালোচনা করে বহু বিবাহ সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তি করে থাকেন। পারিবারিক আদালত পক্ষগণের মধ্যে আপোষ বা পুনর্মিলন ঘটানোর জন্য চেষ্টা করেন। যদি আপোষ বা পুনর্মিলন সম্ভব না হয়, তা হলে আদালত রায় প্রদান করেন। উক্ত রায়ের প্রেক্ষিতে ডিক্রি প্রদান করা হয়। যদি বিরোধ আপোষ এবং মীমাংসার মাধ্যমে নিষ্পত্তি হয়, সে ক্ষেত্রে আদালত পক্ষগণের মধ্যে সম্মত আপোস বা মীমাংসার শর্তাবলীতে ডিক্রী প্রদান করবেন"।[৪৩]

দেখা যাচ্ছে, দু'টি আইনের একটিতেও সাজার কোন ব্যবস্থা নেই। ফলে বহু বিবাহ বন্ধ ও হচ্ছেনা।

৭. পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১০

পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ এবং পারিবারিক সহিংসতা হতে নারী ও শিশুর সুরক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রণীত হয়েছে পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন ২০১০। এই আইনে পারিবারিক সম্পর্ক

[৪৩]. প্রফেসর ড. এবি সিদ্দিক, এড বাহাউদ্দিন, অধ্যক্ষ এএএম মনিরুজ্জামান ঃ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ও প্রাসঙ্গিক আইন সমূহ, (সর্বশেষ সংশোধন সহ), পূর্বোক্ত, ২০১৩, পৃঃ ৩৬৭-৩৭৮, এবং সুলতানা আকতার রুবি ঃ ভরণপোষণ বা খোরপোষ(প্রবন্ধ) জেন্ডার ও উন্নয়ন কোষ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২২৯- ২৩০।

রয়েছে এমন কোন ব্যক্তি কর্তৃক পরিবারের অপর কোন নারী বা শিশু সদস্যের উপর শারীরিক, মানসিক, যৌন নির্যাতন অথবা আর্থিক ক্ষতি করার শাস্তির বিধান বর্ণিত হয়েছে"(ধারা ৩)।[৪৪]

এই আইনের ৩০ ধারা অনুযায়ী সে ব্যক্তি অনধিক ৬(ছয়) মাস কারাদন্ড বা অনধিক ১০(দশ) হাজার টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হবেন এবং অপরাধ পুনরাবৃত্তির ক্ষেত্রে তিনি অনধিক ২(দুই) বৎসর কারাদন্ড বা অনধিক ১(এক) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হবেন। আবার শাস্তির এই বিধান নাকচ করা হয়েছে ধারা ৩১(১) এ এসে। ধারা ৩১ (১) এ এসে বলা হয়েছে "আদালতের নিকট উপযুক্ত বলে বিবেচিত হলে প্রতিপক্ষকে ধারা ৩০ এর অধীন শাস্তি প্রদান না করে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিভিন্ন ধরনের সমাজকল্যানমূলক কাজে সেবা প্রদানের জন্য আদেশ দিতে পারবেন এবং উক্তরূপ সেবা প্রদানের বিষয়টি তত্বাবধানের জন্য যে কোন প্রতিষ্ঠান বা সংস্থাকে দায়িত্ব প্রদান করা যাবে"। ৩১(২) ধারা অনুযায়ী "সমাজকল্যানমূলক কাজের সেবা প্রদানের জন্য প্রতিপক্ষ কর্তৃক উপার্জিত আয়ের মধ্য হতে আদালত যেরূপ উপযুক্ত বিবেচনা করবেন সেরূপ পরিমান অর্থ সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি এবং ক্ষেত্রমত, তার সন্তান বা তার উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিকে প্রদানের আদেশ দিতে পারবে"।

এতে করে সাজা প্রাপ্ত ব্যক্তি সহজেই সাজার থেকে অব্যাহতি পেতে পারবেন। কারণ বাংলাদেশে অপরাধিদের জন্য সমাজ কল্যান মূলক কাজ খুজে পাওয়া খুবই মুশকিল। অপরাধী টাকা উপার্জন করে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তিকে (নারী) অর্থ প্রদান করবে, তত দিনে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির অবস্থা কি হবে? এতে সংক্ষুব্ধ নারী একটি ফাঁকির মধ্যে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ই অধিক। অপরাধীকে সুযোগ প্রদান যুক্ত আইনের এই ধারার কারণে বিক্ষুব্ধ জনগণ কর্তৃক আইনের আশ্রয়ে যাওয়া এবং প্রতিকার পাওয়াও কষ্টকর এবং জটিল ।

৮. <u>যৌতুক নিরোধ আইন, ১৯৮০(সংশোধনী ১৯৮৬) এবং নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন (২০০২, সংশোধনী ২০০৩)এ যৌতুক সংক্রান্ত বিধি।</u>

যৌতুক নিরোধ আইন, ১৯৮০(সংশোধনী ১৯৮৬) বিদ্যমান থাকা অবস্থাতেই নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন (২০০২, সংশোধনী ২০০৩) এ একই অপরাধের সাজা সন্নিবেশ করা হয়েছে ।

যৌতুক নিরোধ আইন, ১৯৮০ (সংশোধনী ১৯৮৬) এ যৌতুক নেওয়া এবং যৌতুক দাবী করারকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করে তার জন্য সাজার বিধান দেওয়া হয়েছে। আর 'নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০' (সংশোধনী ২০০৩) আইন এর ১১(ক,খ,গ) নং ধারা অনুসারে যৌতুকের জন্য সংগঠিত অপরাধের সাজার বিধান করা হয়েছে।

যদিও অপরাধের বিষয় একই তথা যৌতুক। কিন্তু সাজার পরিমান বৃদ্ধির কারনে যৌতুক জনিত অপরাধের ভিত্তিতে দু'টি পৃথক আইন থাকার কোন যৌক্তিকতা নেই। দু'টি বিষয় একই আইনের আওতায় রাখা হলে মানুষের জন্য তার উপর আইনের আশ্রয়ে যাওয়া সহজ হতো। তা না হওয়ায় আইনের আশ্রয়ে যাওয়ার বিষয়টি জটিলই হয়ে আছে।

---

[৪৪].পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৫৮ নং আইন) ঃ
বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত সংখ্যা,অক্টোবর ১২, ২০১০, (পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ৯৩৭৮ - ৯৩৮৯।

৯. এ্যাসিড অপরাধ দমনের জন্য নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০, (সংশোধনী ২০০৩) এবং এসিড অপরাধ দমন আইন ২০০২

এ্যাসিড সংশ্লিষ্ট অপরাধ দমনের জন্যও দু'টি আইন বিদ্যমান। যেমন 'নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০, (সংশোধনী ২০০৩)' এর ৪(১, ২ - অ, আ) এবং ৪(৩) ধারা অনুসারে দহনকারী ইত্যাদি পদার্থ দ্বারা সংগঠিত অপরাধের জন্য সাজার যে বিধান রয়েছে সেই ধারা সমূহের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ভাবেই এ্যাসিড অপরাধ দমন আইন ২০০২ এর ৪, ৫(ক, খ) ধারায় অপরাধ এবং ৬নং ধারায় বর্ণিত শাস্তি সমূহ হুবহু আরোপ করা হয়েছে। কেবল এ্যাসিড অপরাধ দমন আইন ২০০২ এর ৭নং ধারায় এই অপরাধ সংগঠনে সহায়তা প্রদানকারীকেও একই সাজার আওতায় রাখা হয়েছে।[৪৫] এবং পূর্বের আইনে এ্যাসিডের স্থলে দহন কারী পদার্থ বলা হয়েছে। কিন্তু পূর্বের আইনটি রহিত হয়নি।

একই অপরাধের জন্য দুই দুইটি আইন বিদ্যমান থাকা, চিকিৎসকের সার্টিফিকেটে, তদন্ত কর্মকর্তার রিপোর্টে যথাযথ তথ্যের অভাবে, আলামত এবং সাক্ষীর সাক্ষ্য প্রমানাদির অভাবে এ্যাসিড- সন্ত্রাস নির্মুল হচ্ছেনা। অধ্যাবধি এ্যাসিড সন্ত্রাস বন্ধ হচ্ছেনা। এটি চলছে। শুধু সুন্দর চেহারা নিয়ে জন্ম নেয়া মেয়েটির চেহারা বিকৃত হচ্ছে। বিভিন্ন সংগঠন (ভোরের আলো পত্রিকার এ্যাসিড সংগঠন) সহ আরও কয়েকটি সংগঠন ভিকটিমদের আর্থিক সহযোগিতা করছে। কিন্তু তাদের চেহারা কি ফেরত পাচ্ছে? তাই দু'টি আইনের বিধানাবলী একটি আইনের মধ্যে এনে আইন প্রয়োগের বিষয়টি কঠিন করা হলে এ্যাসিড আক্রান্তরা উপকৃত হতো বেশী।

১০. ধর্ষণ জনিত অপরাধ ও সাজা

'নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০, (সংশোধনী ২০০৩)' এর ৯(১-৫), ৯(ক), এবং ১০ নং ধারা অনুসারে ধর্ষণ জনিত অপরাধ এবং এর আওতায় সাজার বিধান বর্তমান গবেষণার চতুর্থ অধ্যায়ে বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে। লক্ষ্যনীয় যে, মৃত্যু দন্ড বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদন্ড এবং অর্থদন্ডের মত সাজা রয়েছে এই আইনে। তা স্বত্বেও এ ধরনের অপরাধের বিচার হয় খুবই কম। এই ক্ষেত্রে বাস্তবে যে বিষয়টি লক্ষ্যনীয় হয় তা হলো, নিজেদের মান- সম্মান- ইজ্জত রক্ষার্থে মেয়েদের পক্ষ থেকে সাধারণতঃ থানায় ধর্ষণের অভিযোগ খুব কমই যায়। এই ধরনের অভিযোগ প্রমাণের জন্য নারীদের থানায় যাওয়া, মেডিকেল পরীক্ষা করানো, আলামত প্রদর্শন করা, আদালতে দাঁড়ানো, আসামী পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলীগণের অশালীন জেরার জবাব দেওয়া সবটাই নারীর জন্য এক কঠিন পরীক্ষা।

ধর্ষণ, হত্যা, দূর্ঘটনার মামলা অথবা ছেলে মেয়ের বয়স নির্ধারণে ঢাকা মেডিকেল কলেজের (ডিএমসি) ফরেনসিক মেডিসিন বিভাগ থেকে সনদ নিতে হয়। কারণ বিচার চলা কালে ঘটনা প্রমাণের জন্য এ সনদ গুরুত্বপূর্ণ দলিল। অথচ ঢাকা মেডিকেল কলেজের ফরেনসিক বিভাগে কোন নারী চিকিৎসক নেই। কোন নারী নার্স, এমনকি কোন আয়াও নেই। ১৫ বছর ধরে এই বিভাগটির কার্যক্রম চলছে স্বত্বেও এখানে পিওন পদে একজন নারী ছাড়া আর কোন পদে কোন নারীকে পদায়ন করা হয়নি।[৪৬] পত্রিকায় এই খবর প্রকাশের প্রেক্ষিতে বিষয়টি কয়েকজন বিজ্ঞ কৌশলী কর্তৃক আদালতের নজরে আনা হলে মহামান্য হাইকোর্ট কর্তৃক ধর্ষণের শিকার নারীর শারীরিক ও বয়স নির্ধারণের পরীক্ষা পুরুষ চিকিৎসকের মাধ্যমে করা কেন অবৈধ ঘোষণা করা হবেনা তা জানতে চেয়ে রুল জারি করেছেন মাহামান্য হাইকোর্ট বেঞ্চ।[৪৭]

[৪৫]. পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ১৬ ।

[৪৬]. প্রথম আলো, ১৬ এপ্রিল ২০১৩।

[৪৭]. আমাদের সময়, ১৭ এপ্রিল, ২০১৩।

অর্থাৎ এই আইন বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াটি নারীদের জন্য মোটেও সহায়ক নয়। এ ধরনের অসহনীয় পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে কেউ চায়না। ভিকটিম এবং তার পরিবারের সদস্যগণ নতুন করে আবারও সম্ভ্রম হানীর ভয়ে বিচার থেকেই মুক্ত থাকতে চায়। এতে ধর্ষণকারীরা সহজেই রেহাই পেয়ে যায়। আর সমাজে জন্ম নেয় আরেকটি ধর্ষণের ঘটনা। বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক পরিচালিত নারী নির্যাতন প্রতিরোধ কল্পে মাল্টি সেক্টরাল প্রোগ্রামের তথ্য হলো, গত ১০ বছরে ধর্ষণ সহ যত নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে, তার ৬০% ক্ষেত্রে মামলা হয়নি। বিচারের হার এক শতাংশেরও কম।[৪৮]

এ ক্ষেত্রে আইনী প্রক্রিয়া, বিচারের জন্য প্রস্তুতি প্রক্রিয়া পুরোটাই নারীদের অনুকুলে হওয়া প্রয়োজন। বিচারক থেকে শুরু করে তদন্ত কর্মকর্তা বিভিন্ন ডাক্তারী পরীক্ষা সবই মহিলা বিচারক এবং মহিলা কর্মকর্তাদের আওতায় নিয়ে আসা প্রয়োজন। মহামান্য হাইকোর্ট থেকে গত ২৮ এপ্রিল ২০১৩ তারিখে এ ধরণের কার্যক্রম মহিলা ডাক্তার এবং নার্সদের দ্বারা সম্পাদনের যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তা হু-বহু পালন করা হলেই ন্যায় বিচার নিশ্চিত হতে পারে।

১১. বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ এর সংশোধন আইন (বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০১৩) এ নারীদের প্রদত্ত সুযোগ সুবিধা সংক্রান্ত

বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ এর সংশোধন আইন বাংলাদেশ (বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০১৩) এ নারীদের প্রদত্ত সুযোগ সুবিধার সংক্রান্ত - ধারা ৪৫ (১,২,৩) , ধারা ৪৬ (১,২), ধারা ৪৭(১,২,৩,৪,৫) ধারা ৪৮(১,২), ধারা ৪৯(১,২) এবং ধারা ৫০- এ নারী শ্রমিকদের সুযেগি সুবিধা প্রদান সংক্রান্ত বিধান বর্ণিত হয়েছে।[৪৯] (চতুর্থ অধ্যায়ে ধারাগুলো বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে)।

বর্ণিত আইনের বিধান সমূহ খুবই মানবিক। কিন্তু বাংলাদেশ সহ বিশ্বের অন্যত্রও সরকারী চাকুরীরত কর্মকর্তা, কর্মচারীগণ ব্যতীত বেসরকারী খাতে নারী শ্রমিকেরা এই সুবিধা পেয়ে থাকেন বলে দেখা যায়না। তার কারণ এই আইনের সর্বশেষ ধারাটি পর্যালোচনা করলেই স্পষ্ট হয়। সেখানে তথা ধারা ৫০ এ এটি স্পষ্ট যে, মাতৃত্ব ছুটি দিতে মালিকেরা আগ্রহী নন বরং তাঁরা মহিলা শ্রমিকদের এই সময়ে চাকুরীচ্যুত করতেই আগ্রহী। এই ধারায় মালিক এরূপ কোন শ্রমিককে চাকুরীচ্যুত করে ফেলার প্রতিবন্ধকতা মূলক বিধান থেকেই তা বোঝা যায়। এই ধারায় প্রদত্ত সুযোগ ও স্পষ্ট নয়। কারণ সেখানে সন্তান প্রসবের পূর্বে যথেষ্ট কারণ ব্যতিরেকে " যদি চাকুরী হইতে ডিসচার্জ, বরখাস্থ বা অপসারণ করার জন্য অথবা তাহার চাকুরী অন্যভাবে অবসানের জন্য মালিক কোন নোটিশ বা আদেশ প্রদান করেন এবং উক্তরূপ নোটিশ বা আদেশের যদি যথেষ্ট কোন কারণ না থাকে তাহা হইলে, এই নোটিশ বা আদেশ প্রদান না করা হইলে এই অধ্যায়ের অধীন সংশ্লিষ্ট মহিলা যে প্রসূতি কল্যান সুবিধা পাইবার অধিকারী হইতেন উহা হইতে তিনি বঞ্চিত হইবেননা"।

কিন্তু কিভাবে? কোন পদ্ধতিতে সেই নারী এরূপ যথেষ্ট কারণ নেই তা প্রমান করে অতঃপর গৃহীত ব্যবস্থার প্রতিকার পেতে পারেন তার সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা নেই। এরূপ অবস্থায় এই শ্রমিককে উর্দ্ধতন আদালতে

[৪৮]. প্রথম আলো (বিশেষ প্রতিবেদন), ৮ জুন ২০১৩।

[৪৯].বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬, সংশোধনী ২০১৩।

যেতে হবে, কিন্তু সেখানে যাওয়া এবং মামলা পরিচালনার আর্থিক সংগতি কয়জন শ্রমিকের রয়েছে? - এখানেই এই আইনের দূর্বলতা আর সে কারণেই মহিলারা সন্তান ধারণের বিষয়টি গোপন রেখে কার্যক্রম চালিয়ে যেতেই থাকেন।

সেজন্যই এই আইনের এই বিধানটি আরও সুস্পষ্ট হওয়া এবং এ ক্ষেত্রে গর্ভবতী নারীকে চাকুরীচ্যুত করা হ'লে তাকে আদালতের আশ্রয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সরকারী সুযোগ সুবিধা পাওয়ার বিধান থাকা আবশ্যক। নতুবা নারীরা আইনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হতেই থাকবেন।

১২. যৌন পীড়ন /যৌন হয়রানি /ইভটিজিং সংক্রান্ত অপরাধ এবং সাজা

যৌন হয়রানি/ ইভটিজিং রোধে দেশে বেশ কিছু আইন বিদ্যমান রয়েছে। সেগুলো হল ১৮৬০ সালের দন্ডবিধির ৫০৯ ধারা, পুলিশ অধ্যাদেশ ১৯৭৬ এর ধারা ৭৬, নারী ও শিশু নির্যাতন আইন ২০০০ এর ধারা ১০।

দন্ডবিধির ৫০৯ ধারায় এ বিষয়টি এরূপ কোন নারীর শালীনতার অমর্যাদার উদ্দেশ্যে কোন মন্তব্য, অঙ্গভঙ্গি বা কোন কাজ করা হলে, সে অনুর্ধ এক বৎসর বিনাশ্রম কারাদন্ড বা অর্থদন্ডে বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হবে।

ঢাকা মহানগর পুলিশ অধ্যাদেশ - ১৯৭৬ অনুসারে, কোন পুরুষ কোন রাস্তায় বা সাধারনের ব্যবহার্য স্থানে কোন মহিলাকে পীড়ন করলে বা তাহার পথ রোধ করলে, অথবা কোন রাস্তায় বা সাধারণের ব্যবহার্য স্থানে অশালীন ভাষা ব্যবহার করে অশ্লীল আওয়াজ, অঙ্গভঙ্গি বা মন্তব্য করিয়া কোন মহিলাকে অপমান বা বিরক্ত করলে, সেই ব্যক্তি ১ বছর পর্যন্ত অথবা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হবে। (ধারা ৭৬)।[৫০]

দন্ডবিধির বিধান, পুলিশ অধ্যাদেশ বিদ্যমান থাকা স্বত্বেও 'নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০, (সংশোধনী ২০০৩)' এর ১০ নং ধারা অনুসারে যৌনপীড়ন সংক্রান্ত অপরাধের জন্য উক্ত ব্যক্তি অনধিক দশ বৎসর কিন্তু অন্যূন তিন বৎসর সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন"।[৫১] মর্মে আইনের এই ধারা রাখা হয়েছে।

এ ক্ষেত্রে লক্ষ্যনীয় যে পুলিশ অধ্যাদেশের আইন দেশের সাধারণ জনগণ অবহিত নয় বললেই চলে। আর সে জন্যই বাস্তবে এর প্রয়োগ যৎসামান্য। আবার 'নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০, (সংশোধনী ২০০৩)' এর ১০ নং ধারা অনুসারে ঘটনা সংঘটিত না হওয়া পর্যন্ত তা অপরাধ হিসেবে গণ্য হওয়ার কোন সুযোগ নেই। কিন্তু ঘটনা সংগঠিত হয়ে গেলে তো মান সম্মান ইজ্জতের বিষয় এসে দাঁড়ায়। মেয়ে পক্ষই তখন তা লুকোনের প্রচেষ্টায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

বর্তমানে এ বিষয়ে মহামান্য হাইকোর্ট থেকে গত ১৪ ই মে ২০১০ প্রদত্ত একটি যুগান্তকারী রায়ের প্রেক্ষিতে শারিরীক ও মানষিক যে কোন ধরনের নির্যাতনকে যৌন হয়রানীর পর্যায়ে নিয়ে যে কোন শারিরীক বা ভাষাগত আচরণ যার মধ্যে ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন সব কিছুকে যৌন হয়রানির আওতায় বিবেচনার জন্য বলা হয়েছে। রায়ে প্রদত্ত নির্দেশনা সমূহ ৪র্থ অধ্যায়ে বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে।

---

[৫০]. ঢাকা মহানগর পুলিশ অধ্যাদেশ, ১৯৭৬, ধারা - ৭৬।

[৫১]. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬৭।

ইতিমধ্যে সরকার কর্তৃক মেয়েদের উত্যক্ত করা ও যৌন হয়রানী প্রতিরোধে ভ্রাম্যমান আদালত আইনে, ২০০৯ এর তফসীলে দন্ডবিধি আইনের ৫০৯ ধারা সংযুক্ত করার মাধ্যমে নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেটকে ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে[৫২] ।

ভ্রাম্যমান আদালত আইনে যথাযথভাবে অনুসরণ করা হলে, একই সাথে মহামান্য হাইকোর্ট এর প্রদত্ত নির্দেশাবলীও ভ্রাম্যমান আদালত কর্তৃক বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গৃহীত হলে সমাজে এই সব অপরাধ কমে যাবে এবং এই অপরাধ থেকে নারীরা অনেক বেশী রেহাই পাবে বলে ধারণা করা যায়। তবে একই সাথে মহামান্য হাইকোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত বিষয়গুলো একত্রে সংযোজন করে একটি মাত্র আইনের আওতায় এনে, দন্ডবিধির আইনের সাথে সংযোজন করে দিয়েঅন্য অপ্রয়োজনীয় আইন সমূহ া বাতিল হওয়া প্রয়োজন। তাহলে,আইনের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলের অবহিত হওয়া সহজ হতো এবং আইনের আশ্রয় নেওয়া এবং আইনের প্রয়োগও সহজ হতো।

১৩. নারী পাচার সংক্রান্ত অপরাধ এবং সাজা

নারী পাচার হওয়া সংক্রান্তে যথেষ্ট আইন বিদ্যমান রয়েছে বাংলাদেশে। চতুর্থ অধ্যায়ে সে বিষয়ে দেখা গেছে। যেমন দন্ডবিধির ৩৬৬, ৩৬৬(খ), ৩৭২, ৩৭৩ ইত্যাদি ধারায় নারী পাচার সংক্রান্ত অপরাধের বিচার এবং সাজার বিধান রয়েছে। 'নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০, (সংশোধনী ২০০৩)' এর ৫(১-৩) এবং ৭, ৮ ধারা অনুসারে নারী পাচার সংক্রান্ত অপরাধ প্রমাণিত হলে মৃত্যু দন্ড বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদন্ড বা অনধিক ২০,১০,১৪ বছর সশ্রম কারাদন্ড এবং অর্থদন্ড রূপ সাজার বিধান রাখা হয়েছি। আবার সরকার কর্তৃক 'নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০, (সংশোধনী ২০০৩)' এর ৫(১-৩) এবং ৬ ধারা রহিত করে এবং ৭ ও ৮ ধারা এবং দন্ডবিধির ৩৬৬,৩৬৬(খ), ৩৭২, ৩৭৩ ইত্যাদি ধারায় নারী পাচার সংক্রান্ত অপরাধের জন্য প্রদত্ত সাজার পরিমান কমিয়ে নতুন কিছু বিষয় সংযোজনের মাধ্যমে প্রণীত হয়েছে - 'মানব পাচার প্রতিরোধ দমন আাইন ২০১২' । এ আইনে পাচারের শিকার ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিদের উদ্ধার, পুনর্বাসন ও তাদের অধিকার সুরক্ষায় ক্ষতিপূরণ আদায় সহ বিশেষ সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। আবার মিথ্যা অভিযোগ কারীকেও শাস্তির আওতায় আনা হয়েছে।

কিন্তু বারবার আইন এবং আইনের ধারা পরিবর্তন, সাজার পরিমান বাড়ানো কমানো তা পাচারের শিকার নারীদের বিচারের সুফল পাওয়াকে জটিল ই করে দিচ্ছে। কারণ যারা পাচারের শিকার হচ্ছে তারা সাধারণতঃ দরিদ্র এবং অশিক্ষিত। কোন আইনে তারা সহযোগিতা পাবে তা তাদের কাছে কঠিনই হয়ে পড়ে। এ ছাড়া দেশে ফিরে আরেক বাস্তবতার মুখোমুখি হয় তারা। তাহলো পাচারের শিকার নারীদের অনেককেই পরিবার ফিরিয়ে নিতে চায়না। বিপদগ্রস্থ মানুষের পাশে না দাঁড়িয়ে তাদেরকে ভয়ংকর পাপের দিকে ঠেলে দেয়াতো আরেক অপরাধ এই চিন্তা চেতনা বোধ এদেশের মানুষের মধ্যে এখনও আসেনি।

আবার পাচারকারীদের ধরতে পারলেও বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ডিএমপি অ্যাক্টের সাধারণ ধারায় মামলা করে আদালতে পাঠানোর ফলে সংশ্লিষ্ট দালালরা সামান্য জরিমানা জমা দিয়েই অশিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত নারীদের দেশের অভ্যান্তরে যৌনপল্লীতে ব্যবহার কিংবা বিদেশে একই কাজে পাচারের সুযোগ অব্যাহত থাকার প্রধান কারণ। আর মানব পাচার আইনে মামলা হলে পাচারকারীদের তা মুকাবিলা কঠিন হতো ফলে এ ধরনের অভিযোগ কমে আসত সহজেই। ৫ম অধ্যায়ে পাচার হওয়া ৪০০ তরুণীকে উদ্ধার এবং ডিএমপি অ্যাক্টের মামলা নিষ্পত্তি হওয়ার জরিমানা প্রদান করে আবার পাচারকারীদের মাধ্যমে পাচার হয়ে যাওয়ার ঘটনা তার

[৫২]. জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১, পূর্বোক্ত, পৃ: ১০।

প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তারা নিজ নিজ অভিবাবকের কাছেও ফিরে যেতে পারেননি। শুধু হাত বদল হয়েছেন মাত্র।[৫৩]

১৪. জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন আইন ২০০৪, (সংশোধনী ২০১৩)

১৮৭৩ সালের এই আইন ২০০৪ সালে একবার সংশোধনের মাধ্যমে অনুমোদন করা হয়। পরবর্তীতে ২০১৩ ডিজিটাল নিবন্ধন, ব্যক্তিগত পরিচিতি নম্বর, প্রবাসীদের জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন সংযুক্ত করে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন (সংশোধন) আইন ২০১৩ অনুমোদন করা হয়। এটি হলো সেই দলিল যা রাষ্ট্রের নাগরিকের বয়স এবং পরিচয় নিশ্চিত করে। এই আইনের মাধ্যমে রাষ্ট্রের বৃহত্তম জনগোষ্ঠী উপকৃত হলেও সুবিধা বঞ্চিত, পিতামাতা হারা এতিম, প্রতিবন্ধী, যৌনকর্মীদের শিশু সহ বিভিন্ন শিশুরা এখনও এর আওতার বাইরে রয়ে গেছে। এই আইন অনুযায়ী বাবার নাম না থাকলেও জন্ম নিবন্ধন করা যাবে। তবে এ ক্ষেত্রে প্রক্রিয়াটি কি হবে, তা সুনির্দিষ্ট ভাবে বলা নেই। সুবিধা বঞ্চিত যে সব শিশু পরিবার এতিমখানা সহ সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে থাকছে তাদের জন্ম নিবন্ধনের আওতায় আনা জটিল হয়ে যাচ্ছে। প্রতিবন্ধী শিশু ও ব্যক্তিরা বাধ্য না হলে (প্রাতিষ্ঠানিক কোন সেবা গ্রহণের ক্ষেত্র হলে জন্ম নিবন্ধন করাচ্ছে নতুবা) জন্ম নিবন্ধনের আওতায় আসছেননা। [৫৪]

১৫. ফতোয়া

ফতোয়া কিভাবে জারি হবে, কোন কোন ঘটনার প্রেক্ষিতে জারি হবে, কোন অপরাধের জন্য কি ধরনের শাস্তি দেয়া যাবে এবং কিভাবে সেই শাস্তি প্রয়োগ হবে এতদ সংক্রান্ত কোন বিধিবিধান বিদ্যমান নেই বাংলাদেশে। অথচ এটি নারী নির্যাতনের একটি বিশাল হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। সম্ভবতঃ এটি ধর্মীয় বিধিবিধানের সাথে সম্পৃক্ত বিধায় এর বিরুদ্ধে কোন আইন করা সম্ভব হচ্ছেনা। কিন্তু ধর্মীয় বিধান তথা পবিত্র কুরআন বিরোধী কোন ফতোয়া দিলেও তার বিরুদ্ধে কথা বলার কেউ নেই এই বাংলাদেশে। যদিও প্রথম বারের মত ফতোয়ার বিধান নিষিদ্ধ, অবৈধ ও আইনগত কর্তৃত্ব বহির্ভুত করে একটি হিল্লা বিয়ের ফতোয়ার ব্যাপারে এক যুগান্তকারী রায় দেন মহামান্য হাইকোর্ট ২০০১ সালের ১ জানুয়ারী। মহামান্য হাইকোর্ট ফতোয়াকে অবৈধ ও আইনগত কর্তৃত্ব বহির্ভূত ঘোষণা করে দেয়া এই রায়ের বিরুদ্ধে আপীল বিভাগে আপীল করা হয় যা দশ বছর ধরে নিষ্পত্তির অপেক্ষায় ছিল। ২০০১ সালের মহামান্য হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে আপীল অনিষ্পন্ন থাকা অবস্থায় এরই ফাঁকে ফতোয়াবাজরা তাদের অপতৎপরতা চালিয়ে যেতেই থাকে। যার শিকার হয়েছে এ দেশের সমাজের সুবিধা বঞ্চিত দরিদ্র নারী-কিশোরীরা। এরই মাঝে ফতোয়ার নামে বিচার বহির্ভুত কার্যক্রম ও শাস্তি অবৈধ ঘোষণা করে মহামান্য হাইকোর্টের অপর এক বেঞ্চ থেকে গত ৮ জুলাই, ২০১০ আরেকটি রায় দেওয়া হয়েছে।

অবশেষে ২০০১ সালে মহামান্য হাইকোর্টে ফতোয়া বিরোধী রায়ের বিরুদ্ধে আপীলের উপর গত ১২ মে ২০১১ সালে আপীল বিভাগ কর্তৃক রায় দেওয়া হয়। যা একটি ব্যালেন্স রায় হয়েছে। যাতে সকল পক্ষই খুশি হয়েছেন। আপীল বিভাগ বলেছেন - ধর্মীয় ব্যাপারে ফতোয়া দেয়া যাবে। কিন্তু এটা মানার বিষয়ে কারও ওপর কোন ধরনের জবরদস্তি করা যাবেনা। - এতে বাংলাদেশের আলেম সমাজ খুশি হয়েছেন।

---

[৫৩]. বাংলাদেশ প্রতিদিন,১৪ ফেব্রুয়ারী ২০১৪।

[৫৪]. মনসুরা হোসাইনঃ শিশুর জন্মনিবন্ধন জরুরী, (প্রবন্ধ) প্রথমআলো, ২৪ অক্টোবর, ২০১২।

কিন্তু ফতোয়ার নামে ধর্মকে যেভাবে অধর্মে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এ বিষয়ে আলেম সমাজের কোন অভিমত কেন নেই তা বোধগম্য নয়। মহামান্য আদালতের আপীল বিভাগের এই রায়ের পরও অন্যায় ভাবে অজ্ঞ এবং অশিক্ষিত লোকজন কর্তৃক ফতোয়া দেওয়া চলছেই। সে বিষয়ে কেউ কিছু বলছেননা। ফতোয়ার ভয়ংকর যে বাস্তব চিত্র ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে তাতে ইসলাম ধর্মকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সে বিষয়টি সংশ্লিষ্ট কেউ নজর দিচ্ছেননা। ফতোয় শূধু মহিলাদের ক্ষেত্রে কেন প্রয়োগ হচ্ছে তার বিষয়েও কোন ফয়সলা হচ্ছেনা।

১৬. গৃহকর্মী নির্যাতন প্রতিরোধে আইনী সীমাবদ্ধতা

শ্রমিকদের মধ্যে গৃহ শ্রমিকেরাই সর্বাধিক অবহেলিত। যদিও বাংলাদেশ শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠায় আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) – র সনদে স্বাক্ষর করেছে। সেখানে শিশুদের ঝুকিপূর্ণ শ্রম বন্ধ করার কথা বলা হয়েছে। ২০০৬ সালে শ্রম আইন পাশ হয়েছে এবং ঝুঁকিপূর্ণ বিভিন্ন শ্রম এ আইনের আওতায় থাকলেও গৃহকর্মীদের শ্রমকে 'শ্রম' হিসেবেই অদ্যাবধি ধরা হয়নি। রাষ্ট্রীয় ভাবে তারা শ্রমিক হিসেবে অদ্যাবধি স্বীকৃতও নয়। যার কারণে গৃহকর্মীদের উপর চলে বিভিন্ন রকমের নির্যাতন এবং এ সব নির্যাতনের বিষয়ে কারও মনে কোনই প্রতিবন্ধকতা কাজ করেনা। গৃহকর্মীদের নির্যাতন প্রতিরোধ কল্পে সরকারী –বেসরকারী বিভিন্ন সংগঠন কাজ করলেও বিচার পেতে আসামীদের বিরুদ্ধে যে ধরনের মামলা দায়ের করা উচিৎ সে ভাবে মামলা হয়না।

সরকারী উদ্যোগে মামলা রুজু হলেও পুলিশ কর্তৃক দন্ডবিধির যথাযথ ধারায় মামলা রুজু হয়না। বেত্রাঘাত, গরমখুনতি, লোহা, ইস্ত্রিরছ্যাঁকা, গরমপানি ঢেলে দেওয়া এমনকি হত্যা পর্যন্ত করা হলেও দন্ডবিদির ৩২৩, ৩২৪, ৩২৫, ৩২৬, ৩০২, ধারা সমূহ প্রযোজ্য হলেও সেসব ধারায় মামলা করা হয়না। কখনও সে সব ধারায় মামলা হলেও বেশীর ভাগ সময়ে টাকা পয়সা কিংবা ভয় ভীতির মাধ্যমে মামলা আপোষ হয়ে যায়।

অন্যদিকে গণমাধ্যমে প্রতিদিনই ধর্ষণসহ বিভিন্ন নির্যাতনে গৃহশ্রমিকের মৃত্যুর খবর ছাপা হলেও মামলা রুজু হওয়া পর্যন্তই। এর পরের ঘটনা আর পত্রিকায় তেমন একটা দেখা যায়না এবং বিচার ও রায়ের কথাও কারো জানা হয়না। কারণ গৃহকর্মী নির্যাতনের মামলার আসামীদের বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই সাজা হয়না। নির্যাতনের অধিকাংশ ঘটনা লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে যায়। বিভিন্ন মানবাধিকার সংস্থা এবং নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে সোচ্চার হয়ে ওঠা এবং সেসব প্রতিষ্ঠানের তৎপরতায় ইদানিং কিছু কিছু ক্ষেত্রে থানায় সুনির্দিষ্ট মামলা হয়। দাবীর মুখে আসামীদেরও পুলিশ গ্রেফতার করে। মামলা হলেও যেহেতু তারা অত্যন্ত দরিদ্র তাদেরকে বিষয়টি কেউ ধরিয়েও দেয়না এবং হলেও গৃহকর্মীরা নারী এবং গরীব বলে মামলা পরিচালনার জন্য আর্থিক সংগতিও তাদের থাকেনা। পুলিশও মেয়ে এবং গরীবদের বিষয়ে খুব আগ্রহী হয়েও মামলা পরিচালনা করেনা। ফলে কয়েকদিনের মধ্যেই অভিযুক্ত আসামীরা জামিনে বের হয়ে যায়। মামলাগুলোও বেশীদূর এগুতে পারেনা।

প্রথম আলো, ১ মে ২০১১ এ, সম্পর্কে এরূপ মন্তব্য করা হয়েছে, "গৃহকর্মী নির্যাতনের মামলায় শাস্তির নজির নেই। অধিকাংশ মামলায় ভিকটিমের পরিবার আপোষ করে ফেলে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, মামলার বাদীরা প্রথমে আসামীদের শাস্তি দিতে চাইলেও পরে আপোষ – মীমাংসা করে ফেলে। অনেক সময় তাদের আইনজীবির কাছে মীমাংসা করে দিতে কান্নাকাটি করে গৃহকর্মী নির্যাতনের মামলায় পুলিশকেও বিপাকে পড়তে হয়। এসব মামলায় ভিকটিমের বাবা – মা টাকা পয়সা নিয়ে আদালতে মামলা প্রত্যাহারের আবেদন

জানায়। সেজন্যই 'গৃহকর্মী' দের সুরক্ষা ও কল্যানে অন্তত একটি নীতিমালা থাকা কিংবা শ্রম আইনে এর অন্তর্ভুক্তি থাকা প্রয়োজন" ।[৫৫]

গত ২৮ এপ্রিল ২০১০ সালে টঙ্গীর এক গৃহকর্মী ১০ বছর বয়সের সুমীকে ফুলের টব ভাঙার অপরাধে পায়ুপথে খুন্তি ঢুকিয়ে নির্যাতনের খবরের প্রেক্ষিতে - এ ধরনের নির্যাতন এড়াতে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা চেয়ে বাংলাদেশ মহিলা আইনজীবি সমিতির পক্ষ থেকে হাইকোর্টে রিট আবেদন করা হয়। যার পরিপ্রেক্ষিতে আদালত রুল জারি করেন এবং রুলের উপর শুনানির পর গত ১৫ ফেব্রুয়ারী ২০১১ তারিখে গৃহকর্মে ১২ বছরের কম বয়সী শিশু নিয়োগ দেওয়া যাবেনা মর্মে মহামান্য হাইকোর্ট রায় দিয়েছেন। এই রায়ে ১২ বছরের ওপরে বিশেষ করে ১৪ থেকে ১৮ বছর বয়সী শিশুদের গৃহকর্মে নিয়োগের ক্ষেত্রে তাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিনোদন ব্যবস্থা নিশ্চিত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে গৃহকর্মীদের সংখ্যা নির্ণয়ের জন্য বাধ্যতামূলক নিবন্ধন ব্যবস্থা চালু করতে এবং গৃহকর্মীদের আইনী সুরক্ষা দিতে একটি মনিটরিং কমিটি গঠনের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।[৫৬]

গত ১৪ ডিসেম্বর ২০১৩ প্রথম আলো কার্যালয়ে আয়োজিত এক গোলটেবিল বৈঠকে বাংলাদেশ মহিলা আইনজীবি সমিতির নির্বাহী পরিচালক সালমা আলী বলেন, "২০১১ সালে গৃহকর্মীদের সুরক্ষায় হাইকোর্টের যে নির্দেশনা আছে, যতদিন আইন প্রণয়ন না হচ্ছে , ততদিন তা আইন হিসেবে প্রযোজ্য"[৫৭] ।

কিন্তু দু:খজনক যে বাংলাদেশে গৃহকর্মীদের জন্য মহামান্য হাইকোর্টের এ নির্দেশ আজও পরিপূর্ণ ভাবে বাস্তবায়িত হয়নি। বর্তমান গবেষণায় ৫ম অধ্যায়ে গৃহকর্মীদের উপর নির্যাতন এবং হত্যা করে তা আত্মহত্যা হিসেবে চালানোর যে উদাহরণ দেখানো হয়েছে তা এর প্রমান। গৃহকর্মীদের বিষয়টি দ্রুত আইনের আওতায় নেওয়া প্রয়োজন।

৭.২.৯ জেন্ডার এবং তৎসংশ্লিষ্ট ব্যবস্থাদির মধ্যে বিদ্যমান সীমাবদ্ধতা/ জটিলতা

বাংলাদেশে জেন্ডার ইস্যুর প্রেক্ষিতে নারী জাতির উন্নয়ন এবং মুক্তির লক্ষ্যে বাস্তবায়নাধীন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সকল পদক্ষেপ সমূহ পর্যালোচনায় যে বিষয়টি স্পষ্ট হয়, তা হলো, নারী-পুরুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠাই জেন্ডার ইস্যুর মূল লক্ষ্য| এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য বাংলাদেশ সহ বিশ্বময় জেন্ডার ইস্যুর প্রেক্ষিতে সরকারী, বেসরকারী পর্যায়ে ব্যাপক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। বর্তমান গবেষণার ২য় অধ্যায়ে জেন্ডার ইস্যুর উপর, ৩য় অধ্যায়ে জেন্ডার ইস্যু বাস্তবায়ন সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক ভাবে নির্ধারিত দিক নির্দেশনার উপর এবং ৪র্থ অধ্যায়ে জেন্ডার ইস্যু বাস্তবায়ন সম্পর্কে বাংলাদেশের অবস্থানের উপর বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়েছে। তবে যে ব্যাপক আকারে বাংলাদেশে জেন্ডার সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে তার ফলাফল ততটা ব্যাপক নয়। কারণ, **জেন্ডার ইস্যুর কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে এবং ইস্যুটির মধ্যেই বিদ্যমান রয়েছে কিছু সীমাবদ্ধতা।**

সেগুলো হ'ল -

---

[৫৫]. প্রথম আলো, ১ মে ২০১১ ।

[৫৬].প্রথম আলো, ১৬ ফেব্রুয়ারী ২০১১।

[৫৭] প্রথম আলো, ১৫ ডিসেম্বর ২০১৩।

১. শুরু থেকে জেন্ডার ইস্যুর সাথে পুরুষদের সমভাবে সম্পৃক্ত করা হয়নি

প্রাথমিক পর্যায় থেকে এ পর্যন্ত Gender ইস্যুর approach সমূহের মাধ্যমে নারীরা তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হলেও পুরুষেরা তাদের নিজস্ব অবস্থানে চিন্তায় ও চেতনায় থেকেই যায়। কারণ এ ক্ষেত্রে পুরুষদের সমভাবে সম্পৃক্ত করার বিশেষ কোন পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। অথচ নারীরা বেশীরভাগই নির্যাতিত এবং বঞ্চিত হচ্ছে পুরুষদের দ্বারাই। জেন্ডার ইস্যুতে নারী - পুরুষকে সমভাবে সম্পৃক্ত না করার কারণে পুরুষ কর্তৃক নির্যাতনের হাত থেকে তারা নিস্তার পাচ্ছেনা। যদিও বর্তমানে বিষয়টি সকলের উপলব্ধিতে এসেছে এবং চিন্তা করা হচ্ছে যে, নারী উন্নয়নের এবং মুক্তির লক্ষ্যে জেন্ডার ইস্যু সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রমের সাথে পুরুষের সম্পৃক্ততা আবশ্যক।

এই লক্ষ্যে ২০০৯ সনে জাতি সংঘের নারী বিষয়ক সংস্থা ইউএন উইমেন কর্তৃক নারী দিবসের স্লোগান নির্ধারণ করা হয় এ ভাবে-æMen and Women united to end violence aagainst women and girls"। বাংলাদেশে তা গৃহীত হয়েছে এভাবে- "কন্যা ও নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াই নারী পুরুষ একসাথে"।[৫৮] আবার ২০১০ এ জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নারী দিবসের প্রতিপাদ্য হলো-" Equal-rights, equal-opportunityঃ progress for all" আর বাংলাদেশে তার আঙ্গিকে বলছে"নারী - পুরুষের সম সুযোগ, সমঅধিকার, দিনবদলের অগ্রযাত্রায় উন্নয়নের অঙ্গীকার"।[৫৯] ২০১৪ এ জাতি সংঘর ৮ই মার্চ বিশ্ব নারী দিবসের প্রতিপাদ্য ঠিক করেছেন এভাবে, " Equality for women is progress for all" – যা বাংলাদেশে গৃহীত হয়েছে এভাবে "অগ্রগতির মূল কথা, নারী-পুরুষ সমতা"।[৬০]

আন্তর্জাতিক এই প্রতিপাদ্য বিষয় সমুহের সাথে বাংলাদেশ সরকারের উন্নয়নের অঙ্গীকার ও সুদৃঢ়। পুরুষের সমানভাবে সম্পৃক্ততার বিষয়টি উপলব্ধিতে সকল পর্যায়েই বিলম্ব হয়েছে যথেষ্ট। ফলে নারী মুক্তির বিষয়টিও হচ্ছে বিলম্বিত।

২. জেন্ডার ইস্যুর 'নারী-পুরুষের সমান অধিকার' - সংশ্লিষ্ট ইস্যুর মাধ্যমে নারীর উপর তিন বা ততোধিক কর্মদিবসের সূচনা ঘটেছে

জেন্ডার ইস্যুর সাথে পুরুষকে সমানভাবে সম্পৃক্ত না করিয়ে নারী পুরুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে যে সব নারীরা পুরুষের সমান কর্মজীবন গ্রহণ করছে তাদের উপর তিন বা ততোধিক কর্মদিবসের চাপ সৃষ্টি হয়েছে। নারীদের উপর সন্তান ধারন, জন্মদান এবং লালন পালন সহ ঘর সামলানোর যাবতীয় দায়িত্ব বিদ্যমান থাকা অবস্থাতেই তারা উপার্জনে এসেছে। নারীদের উপর এই যে তিন বা ততোধিক কর্ম দিবসের সূচনা হয়েছে, সে বিষয়টি জেন্ডার ইস্যু বর্তমানে উপলব্ধি করতে সক্ষম হলেও গ্রহণযোগ্য কোন সমাধান দিতে পারেনি। সন্তান লালন পালনে পুরুষকে সহযোগিতা করতে বলা হচ্ছে কিন্তু এ পর্যন্তই। পুরুষ সে সহযোগিতা না করলে তাকে বাধ্য করার কোন উপায় জেন্ডার ইস্যু দেখাতে সক্ষম হয়নি। তাহলে, নারীর উপর তিন বা ততোধিক কর্মদিবসের সূচনায়, পুরুষের দায়ভার ই হাল্কা হচ্ছে।

---

[৫৮]. আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০০৯ এর বার্ষিক প্রতিবেদন, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয়, ১ম পৃষ্ঠা থেকে উদ্ধৃত।

[৫৯]. আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০১০ এর বার্ষিক প্রতিবেদন, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয়, ১ম পৃষ্ঠা থেকে উদ্ধৃত।

[৬০].ড. আবুল হোসেন ঃ জাতীয় উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন সর্বস্তরে নারীর সমান অংশ গ্রহণ(প্রবন্ধ), আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০১৪ এর প্রতিবেদন ,মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয়, পৃঃ ৪৪-৪৫।

৩. জেন্ডার ইস্যু নারীর মাতৃত্বের ভূমিকাকে সামাজিক কাজ মাত্র গণ্য করেছে

জেন্ডার ইস্যু নারী পুরুষের সমান অধিকারের প্রশ্নে নারীর মাতৃত্বের ভূমিকার সাথে পুরুষের কোন ভূমিকা সমান হবে - এ বিষয়েও কোন দিক নির্দেশনা দেয়নি| বরং মহান এই দায়িত্বকে সামাজিক কাজ মাত্র গণ্য করায় নারী জাতির বিশাল ও মহৎ এক ভূমিকা খাটো হয়েছে। এ প্রসংগে নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ (সিডও) র ৫(খ) ধারাটি উল্লেখ করা যায়। তা হলো - "মাতৃত্বকে একটি সামাজিক কাজ হিসেবে যথাযথভাবে বিবেচনা এবং সকল ক্ষেত্রে শিশুদের স্বার্থই মূল বিবেচ্য বিষয় এ কথা স্মরণ রেখে সন্তান- সন্ততির লালন-পালন ও উন্নয়নে পুরুষ ও নারীর অভিন্ন দায়িত্বের স্বীকৃতির বিষয় যাতে পারিবারিক শিক্ষায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়, তা নিশ্চিত করা"।[৬১] এখানে মাতৃত্বকে একটি 'সামাজিক কাজ' হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। মাতৃত্ব কি একটি সামাজিক কাজ মাত্র? নিজ জীবন মৃত্যুর হাতে সপে দিয়ে নারী কোন অজানা স্বর্গপুরী থেকে মানব শিশুকে (ছেলে এবং মেয়ে উভয় শিশুকে) এই পৃথিবীতে আনয়নের যে পবিত্র দায়িত্ব পালন করছে তা সামাজিক কাজ মাত্র?

ধারাটির শেষের অংশটিও প্রনিধানযোগ্য। তা হলো - "সকল ক্ষেত্রে শিশুদের স্বার্থই মূল বিবেচ্য বিষয় এ কথা স্মরণ রেখে সন্তান- সন্ততির লালন-পালন ও উন্নয়নে পুরুষ ও নারীর অভিন্ন দায়িত্বের স্বীকৃতির বিষয় যাতে পারিবারিক শিক্ষায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়, তা নিশ্চিত করা" – এখানে শিশুর যত্ন আদ্যিতে সমান অংশ গ্রহনের কথা মাত্র বলা হয়নি; একই সাথে বলা হয়েছে 'সন্তান-সন্ততির লালন-পালন এবং উন্নয়নে পুরুষ ও নারীর অভিন্ন দায়িত্বের' কথা। এর ফলে শিশুর যত্ন আদ্যিতে পুরুষ আসছে কি আসছেনা তা গুরুত্ব না পেয়ে বরং সন্তান এবং সংসার পরিচালনা যাবতীয় দায়িত্বে নারীর অংশ গ্রহনের বিষয়টি নিশ্চিত করা হচ্ছে। অর্থাৎ নারী গর্ভে সন্তান ধারণ করছে মৃত্যুকে হাতে নিয়ে, সন্তান জন্ম দিচ্ছে মৃত্যুর মুখোমুখী হয়ে অতঃপর সন্তানের লালন পালন এবং উন্নয়নের দায়িত্ব পালন করছে নিজ আর্থিক উপার্জনে। সংসার পরিচালনায় শুধু সমান কেন একবার নারীর হাতে সংসারের দায়ভার দিতে সক্ষম হলে কোন কোন স্বামীরা পুরোটাই তার উপর চাপিয়ে দিয়ে নিজে ভোগ বিলাসে লিপ্ত হচ্ছে।

আর জেন্ডার ইস্যুই এখন স্বীকার করছে যে 'নারীর উপর এখন তিনবা ততোধিক কর্মদিবসের সূচনা হয়েছে'। সন্তান ধারণ জন্মদান এবং নিজের বুকের দুধে লালন পালনের যাবতীয় দায়ভার বিদ্যমান রেখে এর জন্য নারীকে বিশেষ কোনভাবে পুরস্কৃত না করে সমান অধিকারের প্রেক্ষিতে বাকি দায়দায়িত্ব সমান করতে গেলে নারীর উপর শুধু দুই বা তিন কর্মদিবসের সূচনা নয় সূচিত হচ্ছে সীমাহীন কর্মদিবসের। কারণ নারীর মাতৃত্বের ভূমিকা এই হিসাবের আওতায় আনা হলে নারীর কর্মদিবসের হিসাব মিলানোই কঠিন হয়ে পড়বে।

৪. জেন্ডার ইস্যু নারী জাতির মাতৃত্বের মর্যাদা প্রতিষ্ঠার বিষয়ে কোন উপায় উদ্ভাবন করেনি

অর্থাৎ জেন্ডার ইস্যু নারী পুরুষের সমান অধিকারের কথা বলে, কিন্তু নারীর মাতৃত্বের মর্যাদার কথা বলেনা। নারীর মাতৃত্বের মর্যাদা নিশ্চিত না করে শুধুমাত্র অধিকারের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকলে নারীর সত্যিকারের মুক্তি আসবেনা। কারণ মানব শিশুকে এই পৃথিবীতে আনয়নের প্রক্রিয়া কয়েক ঘন্টার কাজ নয়। নয় মাস দশদিন (বলা হয়ে থাকে দশ মাস দশদিন), এর পর নিজের বুকের দুধে প্রতিপালন দু'বছর/আড়াই বছর, এর পর তিল তিল করে গড়ে তোলা। এ জন্য নারীকেই জীবন-মৃত্যুর সম্মুখীন হতে হয়, পুরুষকে নয়। তাই নারীর মাতৃত্বের মর্যাদা নিশ্চিত না করে শুধুমাত্র অধিকারের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকলে নারীর সত্যিকারের মুক্তি আসা

---

[৬১]. সিডও সনদ, ধারা ৫(খ)।

সম্ভব নয়। সেজন্যই ১৯৯৫ সালে বেইজিং আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন ফার্ষ্টলেডী হিলারী ক্লিনটন নারীর মর্যাদার দাবী করেছেন। সেখানে এক প্লেনারী সেশনে তিনি যা বলেছেন, তা পুনঃ উল্লখ করা হ'ল- "নতুন মর্যাদা, নতুন সম্মান চাই নারীদের জন্য। যারা মা হিসেবে, মেয়ে হিসেবে এই বিশ্বে মানব সমাজকে বাঁচিয়ে রাখছে তাদের অকল্যান করে সমাজ ও রাষ্ট্র এগুতে পারেনা"।[৬২] কিন্তু দাবীই যা উঠেছে বাস্তবে এটিকে Ensure করার কোন উপায় স্থির করা হয়নি কিংবা এ বিষয়ে তেমন আর আলোচনাও হয়নি।

ফলে জেন্ডার ইস্যুর প্রেক্ষিতে দেশ জুড়ে নারী মুক্তির লক্ষ্যে পরিচালিত বিস্তর কার্যক্রমের তুলনায় অগ্রগতি বিস্তর আকারে হচ্ছেনা।

৭.২.১০ নারীবাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে বিদ্যমান কিছু জটিলতা এবং যৌনতাকে অবাধ ও উন্মুক্ত করা

নারী মুক্তির লক্ষ্যে জেন্ডার ইস্যুর সাথে বিদ্যমান রয়েছে নারীবাদ – যে বিষয়ে পূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। দেখা গেছে যে, মূলতঃ যে আদর্শ ও লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে নারীবাদের উদ্ভব, শেষ পর্যন্ত তা সেখানে স্থির থাকতে পারেনি। নারীর সন্তান ধারণ ও জন্মদান প্রক্রিয়ার কাছে এসে নারীবাদীরাও হিমসীম খেয়েছেন। তারা নারীর সন্তান ধারনের বিষয়টির সুরাহা করতে গিয়ে কেউ যৌনতাকে অবাধ ও উন্মুক্ত করতে চেয়েছেন কেউবা তার বিরোধীতা করেছেন। দেখা গেছে উদার নারীবাদ, মার্ক্সীয় নারীবাদ এবং আমূল নারীবাদ ইত্যাদি প্রতিটি মতবাদেই নারীর ভাগ্যোন্নয়নের লক্ষ্যে বেশ কিছু চমৎকার প্রস্তাব রয়েছে। সকলেই নারী পুরুষের মধ্যকার যাবতীয় বৈষম্য দূরীকরণ পূর্বক সমতা তথা ইকুয়ালিটি স্থাপনে একমত। এ লক্ষ্যে তাঁরা লেখাপড়া এবং পেশার ক্ষেত্রে নারীর প্রতি যে কোন সীমারেখার বিরোধী। দীর্ঘদিনের বৈষম্য দূরীকরণের লক্ষ্যে উদার নারীবাদীরা কোন কোন পেশায় পুরুষ না নিয়ে শুধু নারীদের নিয়োগের পক্ষপাতি। মার্ক্সীয় নারীবাদীরা শুধু সমাজেই নয় পরিবারেও পূঁজিবাদের বিলুপ্তি ঘটিয়ে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার পক্ষে। তবে, একটি বিষয়ে কোন মতাদর্শীরাই সুরাহায় পৌঁছতে সক্ষম হননি, তা হলো - নারীর সন্তান ধারণ ও জম্মদানের মতো অনবদ্য অথচ একক ভূমিকার সাথে পুরুষের ভূমিকার সমতা তথা ইকুয়ালিটি কিভাবে স্থাপন সম্ভব? এই বিষয়ে প্রতিটি মতবাদই দ্বিধাগ্রস্থ। যে সব কারণে নারীবাদ মানব শিশুকে গর্ভে ধারণ ও জম্মদানের মত বিরাট অবদানটিকে অবমূল্যায়নের মাধ্যমে যৌনতাকে অবাধ ও উন্মুক্ত করে নারী - মুক্তি চাচ্ছেন। যা নারী মুক্তিকে বরং জটিল করে তুলেছে। সেই জটিলতার স্বরূপ নিম্নে তুলে ধরা হ'ল -

১. মানব শিশুকে গর্ভে ধারণ ও জম্মদানের মত বিশাল অবদানটিকে যথাযথ মূল্যায়ন না করা

উদার নারীবাদীরা মানব শিশুকে গর্ভে ধারণ ও জম্মদানের মত বিরাট অবদানটিকে যথার্থ মূল্যায়ন না করে তারা এটিকে একটি সমাজ সেবা মাত্র জ্ঞান করেছেন। তারা প্রসব ছুটি ও ভাতা প্রদান, গর্ভপাতের ও জম্মনিয়ন্ত্রনের অধিকার প্রদান এবং শিশুর প্রতিপালনের ক্ষেত্রে নারী পুরুষের সমান অংশ গ্রহণের মাধ্যমে এ ক্ষেত্রে সমতা আনয়নের চেষ্টা করেছেন এবং এভাবেই ইকুয়ালিটি হচ্ছে ভেবে নিয়ে তারা আবার পুরুষকে ভরণপোষণের দায়িত্ব থেকে মুক্তি দিতে চাচ্ছেন। আমুল নারীবাদ আরো একধাপ এগিয়ে গিয়ে গর্ভধারণ নারীর জন্য অবধারিত নয়, বিবেচনা করেছেন এবং কৃত্রিম উপায়ে মানব শিশু জম্মদানের কথা বলেছেন।

[৬২].মালেকা বেগমঃ নারীর চোখে বিশ্ব (চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলন) সাহিত্য প্রকাশ, আগষ্ট ১৯৯৬,পৃঃ ৩৮।

এ ক্ষেত্রে তাদের বক্তব্য হলো, 'মানব প্রজাতিকে টিকিয়ে রাখার দায়িত্ব নারীর নয়। যদি মানব প্রজাতিকে টিকিয়ে রাখতে হয় তবে তার দায়িত্ব পালন করতে হবে পুরুষকেও, নারী আর গর্ভ ধারণ করবেনা, কৃত্রিম উপায়ে জম্ম দিতে হবে সন্তান, আর সমাজ বহন করবে তার পালনের দায়িত্ব'।[৬৩] অথচ আজ পর্যন্ত কৃত্রিম উপায়ে একটিও মানবশিশু জম্ম দেওয়া সম্ভব হয়নি। টেষ্টটিউব বেবী ও নারীর গর্ভেই সঞ্চার করানো হয়।

যদিও মার্ক্সীয় মতবাদীরা বিষয়টি কিছুটা ভিন্ন আঙ্গিকে বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁরা মনে করেন রাষ্ট্রকেই পালন করতে হবে পরিবারের আর্থিক দায়িত্ব সেখানে বিয়ে থাকবে কিন্তু কোন আর্থ চুক্তি থাকবেনা, পুরুষ হবে ভরণপোষণ মুক্ত। যদিও শেষ পর্যন্ত তাঁরা আবার নারীর সন্তান ধারনে প্রস্তুত হয়েছেন। আমুল নারীবাদীরা নারীকে পুরুষের সমান উপার্জনশীল করে সমতা স্থাপনের পক্ষপাতি যাতে নারী আর পুরুষের উপর ভরণপোষনের জন্য নির্ভর করবেনা। নারী স্বাধীন হবে।

তবে নারীর সন্তান ধারণও জম্মদান প্রক্রিয়ায় এবং জম্মের পরে লালন পালন, দুগ্ধদান ইত্যাদি ক্ষেত্রে সমতা কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে এ বিষয়ে তাদের সুস্পষ্ট কোন মতামত নেই। শেষ পর্যন্ত এই মতবাদীরা নতুন চিন্তাধারা আরোপ করে সন্তান ধারণেও প্রস্তুত হয়েছেন এবং আমুল নারীবাদীকে গণ্য করেছেন ইউটোপীয় ধারণা বলে। অর্থাৎ মার্ক্সীয়রাও নারীকে উপার্জনে এনে একটু ভিন্ন ভাবে ভরণপোষনের দায় থেকে পুরুষকেই অব্যাহতি দিতে চাচ্ছেন। অর্থাৎ সকলেই যেনো ভরণপোষণের দায়িত্ব থেকে পুরুষকে মুক্ত করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। এখন প্রশ্ন হলো সন্তান ধারণ ও জম্ম দান, শিশুর লালনপালন ও দুগ্ধদানের প্রাকৃতিক দায় নারীর ঘাড়ে রেখেই পুরুষকে ভরণপোষণ মুক্ত করার নামে যে মুক্তি, সেটি কোন ধরনের নারীমুক্তি তা বোঝা কঠিন। বরং এটি মানব শিশুকে গর্ভে ধারণ ও জম্মদানের মত বিরাট অবদানটিকে অবমূল্যায়ন করা এবং যাতে বিদ্যমান রয়েছে পরিবার সংস্থাটি ভাঙ্গার সম্ভাবনা।

২. <u>যৌনতাকে অবাধ ও উন্মুক্ত করণ</u>

সেই সাথে যুক্ত হয়েছে অবাধ যৌনতাতত্ব। আমুল নারীবাদীরা সকল প্রকারের নারী শোষণের কারণ হিসেবেই চিহ্নিত করেছেন যৌনতাকে। তারা সমকাম, বিষমকাম ইত্যাদি সকল রকমের কামকে একাকার করে দিয়ে চাচ্ছেন নারী ও পুরুষের মধ্যে সমতা তথা ইকুয়ালিটি। আমুল নারীবাদীরা এই ইকুয়ালিটির নামে যৌনতাকে এতই অবাধ ও উম্মুক্ত করতে চাচ্ছেন যে, সেখানে নারী- পুরুষ, পুরুষ-পুরুষ, নারী-নারী - কোন ভেদাভেদ থাকবেনা। সব চলবে অবাধে, উম্মুক্ত ভাবে। এভাবেই নাকি তারা নারীকে যৌনপীড়নের হাত থেকে রেহাই দিচ্ছেন। যেখানে পুরুষকে আর লুকিয়ে পতিতালয়ে যেতে হবেনা। পুরুষ নারীর পর নারীকে ভোগ করবে অবাধে এবং নিশ্চিন্তে, কারণ তার তো গর্ভ- ধারণের দায় নেই। সেই দায়ও তো নারীর।এই অবাধ যৌনতা এবং সমকামীতাই কিন্তু ভয়াবহ এইডস এর কারণ, যা শুধু নারীকেই নয়, ধ্বংশ করবে পুরুষকেও অর্থাৎ মানব প্রজাতিকে। বাংলাদেশে সরকারী হিসাব অনুসারে ৩২৪১ জন আক্রান্ত এইডস রোগীর নাম রেজিষ্ট্রিভুক্ত করা হয়েছে। বাস্তবে এর সংখ্যা আরও বেশী। ইউএনএইডস এর হিসাব অনুসারে বাংলাদেশে ৮০০০ জন এইডস রোগে আক্রান্ত। তাদের মধ্যে ৭৬০০ জনই ১৫ থেকে তদুর্দ্ধ বয়সের। তন্মধ্যে ২৭০০ জন নারী।[৬৪] অর্থাৎ সমকামীতা, বিষমকামীতা, অবাধ যৌনতা নারী-পুরুষ সকলেরর জীবনকেই সম্পূর্ণ ভাবে বিপন্ন করে দিচ্ছে।

---

[৬৩]. হুমায়ুন আজাদ ঃ নারী, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২০০।

[৬৪]. UNAIDS, http://www.unaids.org/en/regionscountries/countries/bangladesh

৭.২.১১ বিপিএফএ, এমডিজি, পিআরএসপি বাস্তবায়নে কিছু সীমাবদ্ধতা

১. বেইজিং প্ল্যাটফরম ফর এ্যাকশান (বি পিএফএ)

বেইজিং প্ল্যাটফরম ফর এ্যাকশন বা পিএফএতে জাতিসংঘ কর্তৃক সদস্য রাষ্ট্র সমুহের জন্য নারী মুক্তির লক্ষ্যে যে ১২ টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বাস্তবায়নের দিক নির্দেশনা দেয়া হয়েছে সেগুলো পুনঃ দেখা যেতে পারে- ১. নারী এবং দারিদ্রতা, ২. নারী শিক্ষা ৩.নারী ও স্বাস্থ্য, ৪.নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা, ৫. নারী এবং সশস্ত্র সংঘাত, ৬. নারী ও অর্থনীতি, ৭. ক্ষমতায় এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারী, ৮. নারীর জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো, ৯.নারীর মানবাধিকার, ১০. নারী এবং প্রচার মাধ্যম, ১১. নারী এবং পরিবেশ, ১২. মেয়ে শিশু। – এর প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে নারী-পুরুষের সমান অধিকারের দিক নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। যা বর্তমান গবেষণার ৩য় অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে এবং ৪র্থ অধ্যায়ে বাংলাদেশে সেসবের বাস্তবায়ন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়েছে। ৪র্থ অধ্যায় পর্যালোচনায় দেখা যাবে যে, বাংলাদেশে মুলতঃ নারী উন্নয়নের যাবতীয় প্রক্রিয়াই চলছে পিএফএর ১২টি দিক নির্দেশনার আলোকে।

তবে লক্ষ্যনীয় যে উক্ত ১২টি বিষয়ের সর্বত্রই নারীর অধিকারের কথা বলা হলেও কোথাও নারীর মাতৃত্বের মর্যাদার বিষয়টি বলা হয়নি। যে দাবী করেছেন হিলারী ক্লিনটন - ১৯৯৫ সালে বেইজিং আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলনে। তা পুনরায় উল্লেখ করা হ'ল,"নতুন মর্যাদা, নতুন সম্মান চাই নারীদের জন্য। যারা মা হিসেবে, মেয়ে হিসেবে এই বিশ্বে মানব সমাজকে বাঁচিয়ে রাখছে তাদের অকল্যান করে সমাজ ও রাষ্ট্র এগুতে পারনা" ।[৬৫] মূলতঃ যতদিন নারীর অধিকারের সাথে নারীর মা হিসেবে, মেয়ে হিসেবে এই বিশ্বে মানব সমাজকে টিকিয়ে রাখার দায়িত্বের মূল্যায়ন না হবে, নারী জাতির মাতৃত্বের সেই মর্যাদা নিশ্চিত না হবে, ততদিন মূলতঃ সত্যিকার অর্থে নারী মুক্তি ঘটবেনা।

২. মিলিনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল (এমডিজি)

গবেষণার ৩য় অধ্যায়ে এমডিজি তথা মিলিনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল পর্যালোচনায় দেখা গিয়েছে যে, এখানে মোট ৮টি গোল পরস্পর সম্পর্কযুক্ত এবং একটি অন্যটির পরিপূরক। তন্মধ্যে ৭টি গোল বা লক্ষ্য দরিদ্র ও উন্নয়নশীল দেশগুলোতে মানব উন্নয়নের জন্য সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ সংক্রান্ত। আর সর্বশেষ ৮ নং গোলটি হলো প্রথম ৭টি গোল অর্জনের জন্য ধনী ও উন্নত দেশগুলোর দায়-দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন সংক্রান্ত। প্রতিটি গোল বা লক্ষ্যে আবার রয়েছে এক বা একাধিক টার্গেট বা লক্ষ্যমাত্রা। আর এইসব টার্গেট কতটুকু অর্জিত হ'ল তা পরিমাপের জন্য আছে কিছু নির্দেশক বা সূচক(Indicator)। এভাবে ১৮টি টার্গেট এবং ৪৮টি নির্দেশক এর সমন্বয়ে মিলিনিয়ম ডেভেলপম্যান্ট গোল এর ৮টি গোল। এভাবে মিলিনিয়াম ডেভেলপম্যান্ট গোল, মূলতঃ গোল - টার্গেট - ইনডিকেটর এর আওতায় পরিচালিত হচ্ছে। বর্তমান গবেষণার ৪র্থ অধ্যায়ে নারী নীতিমালার আলোকে নারী মুক্তি সংক্রান্ত কার্যক্রমের সাথে বিপিএফএর কার্যক্রমের সাথে এমডিজি সম্পৃক্ত কার্যক্রমের ও অগ্রগতি দেখানো হয়েছে।

বাংলাদেশের লক্ষ্য অজনের বিষয়ে বাংলাদেশে জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়ক নিল ওয়াকার কর্তৃক তাঁর "সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য ঃ আরও পথ বাকি" প্রবন্ধে এমডিজির ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সফলতা এবং সফলতার প্রতিবন্ধকতার উপর দৃষ্টি আকর্ষণ করে যা বলেছেন, তা প্রনিধানযোগ্য। তিনি বলেন, " ১৯৯০ সালে যেখানে

[৬৫].মালেকা বেগমঃ নারীর চোখে বিশ্ব (চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলন), পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৭-৩৮।

বাংলাদেশে দারিদ্রের হার ছিল ৬০ শতাংশ, সেখানে ২০১২ সালে, বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের প্রাক্কলন অনুযায়ী তা নেমে এসেছে ২৬.৪ শতাংশে। ক্ষুধাও অনেক কমিয়ে আনা গেছে। তা হলেও খাদ্যপ্রাপ্তির সুযোগ বাড়া মানেই অধিকতর পুষ্টি আহরণ নয়। বাংলাদেশে পাঁচ বছরের নিচের শিশুদের ৪৫ শতাংশ এখনো ওজন ঘাটতিতে আছে। .. .. আসল চ্যালেঞ্জ এখনো খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত নয়, উচ্চ পুষ্টিগুণ সম্পন্ন খাদ্যপ্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টি করাই আসল চেলেঞ্জ।.. .. বাংলাদেশে ১৯৯০ থেকে ২০১১ সালে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার ৬০ থেকে ৯৫ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। এই হারের মধ্যে ছেলে ও মেয়েদের অংশ সমানসমান। এটা এক দারুণ অর্জন। .. .. বাংলাদেশ যেখানে গিয়ে এমডিজি অর্জনে কমতিতে সেটা হলো , শিক্ষার্থীদের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যন্ত ধরে রাখা। .. .. বাংলাদেশে মাতৃমৃত্যুর হার ১৯৯৪ সালে ছিল জীবিত শিশুর জন্মের ক্ষেত্রে প্রতি এক লাখে ৫৭৪ জন।.. .. ২০১১ সালে সংখ্যাটি নেমে গেছে ১৯৪ জনে। এটি যুগান্তকারী অর্জন । তা সত্বেও .. .. এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে কঠিন সাফল্য এখনো অর্জনের অপেক্ষায়। প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা এবং ক্লিনিকের অপ্রাপ্যতা এখনো মাতৃস্বাস্থ্যের সুরক্ষার বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। একই অবস্থা প্রসবের সময় পেশাদার স্বাস্থ্যকর্মী পাওয়ার বেলায়ও" ।[৬৬]

তবে জাতীয় মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল এর মধ্যকার সবচেয়ে চেলেঞ্জিং জেন্ডার গোলটি হলো এমডিজি ৩ (লিঙ্গ সমতা এবং নারীর ক্ষমতায়নে সহায়তা) । দেশে ক্রমবর্ধমান যে হারে নারী নির্যাতন বেড়েই চলছে তাতে এর সফলতা সুস্পষ্ট নয়। এ কারণে বাংলাদেশে নতুন করে নারী পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১০ প্রণীত হলেও তাতে নারী নির্যাতন রোধ হচ্ছেনা। যা বর্তমান গবেষনার ৫ম অধ্যায়ে বিস্তারিত দেখানো হয়েছে।

এই বিষয়ে নিল ওয়াকার জাতিসংঘের মহা সচিবের মতামতের আলোকে বলেন, "বাংলাদেশের সামনে এগিয়ে যাওয়ার পথে মনোযোগ দরকার এমন অন্য খাতগুলোর কথাও ভুলে যাওয়া চলবেনা আমাদের। বিশেষ করে এমডিজি ৩ (লিঙ্গ সমতা এবং নারীর ক্ষমতায়নে সহায়তা) - এর ক্ষেত্রে গতিশীলতা আনা দরকার। .. আমাদের ভুলে যাওয়া উচিৎ নয়যে, নারীর সমতা এবং ক্ষমতায়ন কেবল এই ক্ষেত্রে কাজের উপর নির্ভরশীল না, বরং তা অন্যান্য ক্ষেত্রের লক্ষ্য অর্জনের সঙ্গে সম্পর্কিত" ।[৬৭]

মিলিনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল এর বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তারই অভ্যন্তরে বড় একটি প্রতিবন্ধকতাও লক্ষ্যনীয়। আর তা হলো এর প্রথম ৭টি গোল বা লক্ষ্য যে সব ইতিবাচক পরিবর্তন সাধনের উপর আলোকপাত করেছে, তা উন্নয়নশীল দেশগুলোতে পরিমাপযোগ্য হলেও ৮ নং গোল বা লক্ষ্য বাস্তবায়ন ছাড়া তা অর্জন সম্ভব নয়। ৮ নং গোল বা লক্ষ্যটি হলো ঃ 'উন্নয়নের জন্য বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব বা গ্লোবাল পার্টনারশীপ গড়ে তোলা'। ৮ নং গোল বা লক্ষ্যের সফলতা আবার নির্ভর করছে উন্নত ও ধনী দেশগুলোর রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের অঙ্গীকার এবং সেই অঙ্গীকার বা প্রতিশ্রুতি পূরণে তাদের কার্যক্রম গ্রহণের সদিচ্ছার উপর।

[৬৬].নিল ওয়াকার (বাংলাদেশে জাতিসংঘের আবাসিক সমন্ব য়ক) ঃ "সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য ঃ আরও পথ বাকি"(প্রবন্ধ), প্রথম আলো (বিশেষ সংখ্যা), ৬ নভেম্বর ২০১৩।

[৬৭]. নিল ওয়াকার (বাংলাদেশে জাতিসংঘের আবাসিক সমন্ব য়ক) ঃ পূর্বোক্ত প্রথম আলো, (বিশেষ সংখ্যা), ৬ নভেম্বর ২০১৩।।

এমডিজির লক্ষ্য সমূহ অর্জনের জন্যই বাংলাদেশে প্রণীত হয়েছে দারিদ্র হ্রাস করণ কৌশলপত্র বা পিআরএসপি (PRSP) । দেখা যাক সেখানকার অবস্থা কি?

৩. দারিদ্র হ্রাস করণ কৌশলপত্র (পিআরএসপি)

বাংলাদেশ ২০০৫ এ পূর্ণাঙ্গ পিআরএসপি (PRSP) প্রণয়নের কাজ সমাপ্ত করেছে।[৬৮] পূর্ণাঙ্গ এই দলিলটির নাম দেয়া হয়েছে,`Unlocking the potentialঃ National Strategy for Accelerated Poverty Reduction" বা 'সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন ঃ দ্রুত দারিদ্র কমানোর জাতীয় কৌশল'।

বাংলাদেশে এমডিজি র লক্ষ্য সমূহ পূরণই পি আর এস পির নীতিমালার অন্যতম লক্ষ্য। এম ডি জির লক্ষ্য সমূহ পূরণের জন্য পি আর এস পি জেন্ডার সংশ্লিষ্ট যে সকল কৌশল নির্ধারণ করেছে সেগুলো পূর্বে দেখানো হয়েছে। তবে এই পিআরএসপি বাস্তবায়নেও রয়েছে যথেষ্ট প্রতিবন্ধকতা। বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তির পূর্বশর্ত রূপে পিআরএসপি প্রণয়নের বাধ্যবাধকতা এবং এ ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাংক, আই এম এফ সহ দাতা গোষ্ঠীর ফরমায়েশ মেনে চলার চাপ, সর্বোপরী এই পরিস্থিতিতে বিভিন্ন দেশের পিআরএসপি আদৌ 'জাতীয় মালিকানাধীন' থাকবে কিনা এসব নিয়ে সারা বিশ্ব জুড়ে নানা তর্ক বিতর্ক ও সমালোচনার ঢেউ উঠেছে। বাংলাদেশও এর বাইরে থাকেনি। আবার পিআরএসপি কতটুকুন জেন্ডার সচেতন বা জেন্ডার সংবেদনশীল-তা নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠেছে জাতীয় ও বৈশ্বিক স্তরে। এখানে রয়েছে জেন্ডার ডাটা ও তথ্য সূচকের স্বল্পতা।

এ সম্পর্কে শাহীন রহমান বলেন- "পিআরএসপি বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের ক্ষেত্রে আউটকাম ইন্ডিকেটর রাখা হয়েছে, সেখানে লিঙ্গভিত্তিক ইন্ডিকেটরও রয়েছে। কিন্তু আউটপুট ইন্ডিকেটরের অধীনে কোনো লিঙ্গভিত্তিক ইন্ডিকেটর নেই। অথচ আউটপুট পর্যায়ে যদি এ ধরনের অগ্রগতি নিশ্চিত বা পরিবীক্ষণ করা না হয়, তবে আমরা আউটকামের ক্ষেত্রে সে অগ্রগতি আশা করতে পারিনা। আউটপুট এবং আউটকাম লেবেলে যে অন্যান্য ইন্ডিকেটর রয়েছে সেগুলোকে জেন্ডার সংবেদনশীল করা দরকার। যেমন পরিবার পরিকল্পনার ক্ষেত্রে জন্মনিয়ন্ত্রন ব্যবস্থা গ্রহণ সংক্রান্ত ইন্ডিকেটর কেবল নারী কেন্দ্রিক, পুরুষকে এখানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। নারীর দারিদ্রকে তুলে ধরার জন্য জেন্ডার ডিজএগ্রিগেটেড ডাটা থাকা দরকার। নারী প্রধান পরিবারের মত দরিদ্রতম গ্রুপের ডাটাও থাকতে হবে। সামাজিক পরিসেবার জন্য ব্যয়ের ক্ষেত্রে জেন্ডার ডাটা থাকতে হবে । যেমন - স্কুলে ভর্তি হার, ঝরে পড়া, স্কুলে শিক্ষা শেষ করা এসব ক্ষেত্রে জেন্ডার ডাটা থাকতে হবে। নারী- পুরুষ অনুপাত, নারীর মৃত্যু ও অসুস্থতা, মাতৃ মৃত্যু হার - এসব স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে নির্দেশক হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। সরকারী পরিসেবা, নিরাপত্তা জাল বা সেফটি নেট কার্যক্রম - এর ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট আকারে জেন্ডার ডাটা থাকতে হবে"।[৬৯]

দারিদ্রের জেন্ডার প্রেক্ষিত বিশ্লেষনে দূর্বলতা সম্পর্কেও শাহীন রহমান বলেন- " নগর ও গ্রামীন দারিদ্র প্রবণতা তুলে ধরার ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট ভাবে জেন্ডার বিশ্লেষণ ও এ সংক্রান্ত তথ্য উঠে আসেনি বললেই চলে। নারী প্রধান পরিবারের দারিদ্র পরিস্থিতি বর্ণনাতেও কোন তথ্য নেই। দারিদ্র পরিমাপের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতিগত সীমাবদ্ধতার ফলে পরিবারের ভেতরে দারিদ্র সংক্রান্ত কোনো জেন্ডার ডাটা - তথ্য আমরা পাইনা। এছাড়া নগর ও গ্রামীন দারিদ্রের জেন্ডার প্রেক্ষিতের প্রাসঙ্গিকতা তুলে ধরা উচিত। জেন্ডার প্রেক্ষিত থেকে দারিদ্র

---

[৬৮].শাহীন রহমান ঃ জেন্ডার প্রসঙ্গ, ২য় প্রকাশ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১০৫।

[৬৯].শাহীন রহমান ঃ জেন্ডার প্রসঙ্গ, ২য় প্রকাশ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১০৫-১১৬।

ধারনাকে উন্নত করার জন্য এবং প্রচলিত দারিদ্র পরিবীক্ষণ জরিপ দ্বারা কীভাবে পরিবারের ভেতরকার বন্টন বৈষম্যকে তুলে আনা যায়, সে সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ এখানে গ্রহণ করা হয়নি" ।[৭০]

শাহীন রহমান পিআরএসপি- র আউটকাম ইন্ডিকেটর, লিঙ্গভিত্তিক ইন্ডিকেটর সংক্রান্ত পদ্ধতিগত ত্রুটি বিচ্যুতির কথা বলেছেন আর বাংলাদেশে এর লক্ষ্য সমূহ অর্জনের প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কে জনাব আতিউর রহমান বলেছেন রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক স্বচ্ছতার প্রয়োজনীয়তার কথা । তিনি বলেন, "২০০০ সালে জাতিসংঘ আয়োজিত বিশ্ব সভায় মিলিনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল (এমডিজি) এ যে সব লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছিল, তারই আলোকে বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোর দারিদ্র হ্রাস করার কৌশল হিসেবে প্রণীত হয়েছে পিআরএসপি। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। .. মিলিনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল (এমডিজি) পূরণে বাংলাদেশ অনেক দেশের চেয়ে ভালো অবস্থানে আছে। জাতীয় পর্যায়ে এই সাফল্য সত্বেও সমাজের গরিব শ্রেণীর মানুষ সচ্ছল বা ধনী শ্রেণীর মানুষের চেয়ে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টির বিচারে অনেকখানি পিছিয়ে আছে। তাই দারিদ্র নিরসনে যে লক্ষ্য এমডিজি বেঁধে দিয়েছে তা পূরণ করতে হলে শাসনব্যবস্থার গুণগতমান উন্নতি ও উৎকর্ষ সাধন করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। শ্রমিক, গরীব ও খেটে খাওয়া মানুষেরা অক্লান্ত পরিশ্রম করে দেশের অর্থনীতিকে সচল রাখলেও সুশাসনের অভাবের কারণে তারা তার ভাগ থেকে প্রতিনিয়ত বঞ্চিত হন। রাজনীতি ও রাজনৈতিক পরিমন্ডলে অনৈতিকতা, প্রশাসনে অদক্ষতা ও অন্যায্যতা এবং সর্বগ্রাসী দূর্নীতির কারণে সৃজনশীল জনগোষ্ঠীর মানুষদের সামাজিক ও আর্থিক অবস্থা এবং ভাগ্য দ্রুত পরিবর্তন করা যাচ্ছেনা। আর সে কারণেই চুড়ান্ত পিআরএসপিতে সুশাসনের বিষয়টিকে বিশেষভাবে জোর দেয়া হয়েছে" ।[৭১]

মূলতঃ রাজনৈতিক অস্থিরতা, রাজনৈতিক পরিমন্ডলে অনৈতিকতা, প্রশাসনে অদক্ষতা ও অন্যায্যতা এবং সর্বগ্রাসী দূর্নীতি দূর না হওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশে শুধু পিআরএসপি কেন কোন নীতিই বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। ফলে সম্ভব নয় মানুষের ভাগ্যও পরিবর্তন হওয়া। এ বিষয়ে নিল ওয়াকারের বক্তব্য আবারও প্রনিধানযোগ্য। তিনি বলেন," কেবল জ্বালানি, অবকাঠামো ও শিক্ষায় বিনিয়োগ করলেই চলবেনা, দুর্নীতি দূরীকরণ এবং টেকসই গণতান্ত্রিক শাসন অর্জন, নারীর ক্ষমতায়ন ও সমতা প্রতিষ্ঠার দিকে আমাদের সচেষ্ট হতে হবে। .. .. ন্যায়পরায়নতাকে শক্তিশালী করা, শক্তিশালী ও উদার গণতন্ত্রকে সক্ষম করে তোলা, তরুণদের জন্য সুযোগ সৃষ্টি করা এবং পুরোনো ও নতুন অংশীদারকে কাজে লাগানোই হবে সামনে এগিয়ে যাওয়ার হাতিয়ার। গত ১৩ বছরে এমডিজি অর্জনের ফল প্রমাণ করেছে, বাংলাদেশ বিশ্বেই হোক আর দেশেই হোক, যা অর্জন করতে চায় , তা বাস্তবায়নে সক্ষম" ।[৭২]

শাহীন রহমান এবং নিল ওয়াকার যে সব সমস্যা তুলে ধরেছেন তার সবই বর্তমান গবেষণার ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ এবং বর্তমান অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়েছে। সৌভাগ্যের বিষয় যে, বাংলাদেশের সরকার কর্তৃকও তা অনুধাবন করা হয়েছে। যার কারণে Bangladesh Report on The Implemenaion of he Beijing Declaration and Platform for Acion (1995) and the outcomes of the Twenty –third Special Session of the General assembly(2000), May, 2014 এ সরকারী

---

[৭০].পূর্বোক্ত, পৃঃ ১০৫-১১৬।

[৭১].আতিউর রহমান ঃ পিআরএসপি,(জেন্ডার ও উন্নয়ন কোষ), ১ম খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫৭৯।

[৭২].নিল ওয়াকার (বাংলাদেশে জাতিসংঘের আবাসিক সমন্ব য়ক) ঃ "সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য ঃ আরও পথ বাকি" পূর্বোক্ত, প্রথম আলো (বিশেষ সংখ্যা), ৬ নভেম্বর ২০১৩।

বেসরকারী যাবতীয় সফলতা উল্লেখ করেও সরকারী এই প্রতিবেদনে এটি স্বীকার করতেই হয়েছে যে, বাংলাদেশে এমডিজির কার্যক্রম স্বত্বেও এখনও বিদ্যমান রয়েছে কিছু দুর্বলতা। তা হ'ল -

(১) মা ও শিশুর পুষ্টিহীনতা, (২) গর্ভবতী মায়েদের সুরক্ষার অভাব, (৩) বাল্যবিবাহ , (৪) অল্পবয়সে মেয়েদের গর্ভবতী হওয়া, (৫) গর্ভকালীন সময়ে মায়েদের অপুষ্টি, (৬) গর্ভের শিশুর অপুষ্টি, (৭) কম ওজনের সন্তান জন্ম দেয়া, (৮) গর্ভবতী অবস্থায় এবং শিশু জন্মের সময় মায়েদের মৃত্যু,(৯) উচ্চতর পর্যায়ে শিক্ষার ক্ষেত্রে স্বল্পতা (১০) রাজনীতিতে নারীদের স্বল্পতা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ পর্যায়ে নীরবতা (১১) প্রশাসনিক ক্ষেত্রে ও নারীদের পর্যাপ্ত ও সরব উপস্থিতির অভাব (১২) নারী নির্যাতনের ব্যাপকতা ইত্যাদি।[৭৩]

এমডিজির বিষয়াদি বাস্তবায়নে কিছু প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কেও উক্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হ'ল -

(১) এমডিজির কার্যক্রম পরিচালনার পদ্ধতিই হলো 'উপর থেকে নীচ পদ্ধতি'(Top down process) যার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছে যাওয়া সহজ হয়নি;

(২) সমস্যা চিহ্নিত করে তা সমাধানের সঠিক পথ নির্দেশক নির্নয় করা হয়নি এখানে;

(৩) মানবাধিকার এবং মানব উন্নয়নের ক্ষেত্রে এখানকার দিকনির্দেশনা দূর্বল।[৭৪]

এসব সহ এমডিজির উপরে উল্লেখিত দুর্বলতা সমূহ স্বীকার করে বাংলাদেশ সরকার দীর্ঘ মেয়াদী ও নির্ভরযোগ্য কিছু উন্নয়ন লক্ষ্য এবং ২০১৫ এর পরবর্তী গৃহতব্য বিষয়াদি নির্ধারণ (Susainable Development Goals (SDG) and the post 2015 Agenda) করে জাতিসংঘের অনুমোদনের জন্য পেশ করেছে।

৭.২.১২ দীর্ঘ মেয়াদী ও নির্ভরযোগ্য উন্নয়ন লক্ষ্য এবং ২০১৫ এর পরবর্তী গৃহতব্য বিষয়াদি নির্ধারণ (Susainable Development Goals (SDG) and the post 2015 Agenda)

পূর্বে উল্লেখিত সমস্যাদি সহ দেশের আরও বেশ কিছু প্রয়োজনীয়তা পূরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার উন্নয়নের একটি দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য যা ২০১৫ সালের পরবর্তী বিষয়াদি নির্ধারণের লক্ষ্যে Susainable Development Goals (SDG) and the post 2015 Agenda নামীয় নিজস্ব উন্নয়ন কৌশল নির্ধারণ করে জাতিসংঘের নিকট পেশ করেছেন। জাতীয় এই প্রস্তাব পত্রে ১১টি গোল, ৫৮টি লক্ষ্যমাত্রা, ২৪১টি সূচক স্থির করা হয়েছে। যাতে এমডিজির অসমাপ্ত কার্যক্রমের মধ্যে প্রস্তাবিত এসডিজি একটি সেতু হিসেবে কাজ করতে পারে। তাতে অংশগ্রহন, ধারণক্ষমতা, সাম্যও সমতা, আইনের শাসন, মানবাধিকার, সুশাসন, ন্যায়বিচার এর সুযোগ সকল স্টেকহোল্ডারদের অংশগ্রহনের ভিত্তিতে পরিচালিত হতে পারে। এতে জবাবদিহীতা ও স্বচ্ছতা দেশে এবং বিশ্বব্যপী অন্তর্ভুক্ত করে সুযোগ-সুবিধা সহ, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের সকল পর্যায়ে সততা নিষ্ঠা, দায়দায়িত্ব বজায় থাকা, ভিষণ ২০২১, ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, এমডিজির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের বাস্তবায়ন অগ্রগতি, তথ্য ও যোগাযোগ টেকনোলজি

---

[৭৩]. Bangladesh Report on The Implemenaion of he Beijing Declaration and Platform for Acion (1995) and the outcomes of the Twenty –third Special Session of the General assembly(2000), May, 2014 , P 59-61.

[৭৪] .পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬২।

(Informaion Communicaion technology) র সাথে Inernet and informaion echnology সম্পৃক্ত করণ প্রক্রিয়ার প্রস্তাব রয়েছে।

এসডিজিতে ১১টি গোল নির্ধারণ করা হয়েছে। সেগুলো হ'ল -

১. টেকসই উন্নয়নের জন্য মানব সম্পদের সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করণ (Unleash human potentials for Sustainable development) ;

২. দারিদ্র সমূলে উৎপাটন এবং মানুষের মধ্যে বৈষম্য কমানো (eradicate poverty and reduce inequality) ;

৩. সকলের জন্য নিরাপদ খাদ্য এবং পুষ্টির ব্যবস্থা নিশ্চিত করা যাতে গর্ভবতী নারী, স্তন্যদাত্রী মা এবং তাদের নবজাতক শিশুদের পুষ্টির উন্নয়নের বিষয় সম্পৃক্ত থাকবে।(Ensure Sustainable food Security and nutrition for all turgate relates to imroving nutration status of pragnant women,lactating mothers and their new born babies);

৪. স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবার সার্বজনীন গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি করা (Universal access of health and Family planning services) ;

৫. লিঙ্গ সমতা অর্জন (Achieve Gender equality) ;

৬. সবার জন্য মান সম্মত শিক্ষা ও দক্ষতা নিশ্চিত করা (Ensure Quality educaion and Skills for all) ;

৭. কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি এবং শ্রমিক অধিকার নিশ্চিত করা (Increase emploment oppurtunities and ensure worker rights) ;

৮. সুশাসন নিশ্চিত করা(Ensure good Governance) ;

৯. টেকসই উৎপাদন এবং গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি করণ (Promote sustainable producion and consumpion) ;

১০. টেকসই উন্নয়নের জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও অংশীদারিত্ব জোরদার করা (Strengthen inernational cooperation and partnership for Sustainable Development) ;

১১. লিঙ্গ ভিত্তিক ডাটার মাধ্যমে সকল উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা উচিৎ (All progress should track using sex - disagregated data) ।[৭৫]

---

[৭৫].Bangladesh Report on The Implemenaion of he Beijing Declaration and Platform for Acion (1995) and the outcomes of the Twenty –third Special Session of the General assembly(2000), May, 2014 , P 62-64.

যেহেতু বাংলাদেশ নিজস্ব সমস্যাদি বিবেচনায় নিজেদের উন্নয়নের লক্ষ্যে দীর্ঘ মেয়াদী ও নির্ভরযোগ্য উন্নয়ন লক্ষ্য এবং ২০১৫ এর পরবর্তী গৃহতব্য বিষয়াদি নির্ধারণ করে জাতিসংঘে অনুমোদনের জন্য সুপারিশ পেশ করেছে তাতে এর মাধ্যমে গৃহীত কার্যক্রম অধিকতর ফলপ্রসূ হবে বলে প্রত্যাশা করা যেতে পারে। কেবল বাস্তবায়ন পর্যায়েই এর সীমাবদ্ধতা দূর্বলতা লক্ষ্যনীয় হবে।

উপরে বর্ণিত বাংলাদেশে নারী মুক্তির লক্ষ্যে পরিচালিত সরকারী/ বেসরকারী কার্যক্রমের যে সব সীমাবদ্ধতা সমূহ চিহ্নিত করা হয়েছে তার সবই সরকারী এবং বেসরকারী উদ্যোগের মাধ্যমে সংশোধন সম্ভব। সেই সাথে এটিও সত্য যে, সরকারী বেসরকারী যাবতীয় উদ্যোগ স্বত্বেও ধর্মের সাথে বিদ্যমান জটিলতা অপব্যাখ্যা কুসংস্কারাদি দূরীভূত না হলে ধর্মের নামে নারী নির্যাতন বন্ধ করা যাবেনা, নারী জাতির ও মুক্তি আসবেনা। আর সেজন্যই ধর্মীয় অপব্যাখ্যা কুসংস্কারাদির প্রতি ও নজর দেওয়া আবশ্যক।

৭.৩ সিডো সনদ, নারী উন্নয়ন নীতিমালার সাথে ধর্ম বিষয়ক বিদ্যমান কিছু জটিলতা/প্রতিবন্ধকতা

নারী উন্নয়নের যাবতীয় প্রচেষ্টা এসে যখন ঠেকে ধর্মের অপব্যাখ্যার কাছে তখন বিষয়টি কিছুটা জটিল ই হয়ে পড়ে। দেখা গেছে বাংলাদেশে নারী জাতির মুক্তির ক্ষেত্রে অন্যতম আন্তর্জাতিক সনদ - সিডো সনদে এবং বাংলাদেশের নারী উন্নয়ন নীতি মালাতেও এই বিষয়টি ঘটেছে যা নারী উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির সহায়ক হচ্ছে। আবার ধর্মের অপব্যাখ্যা কুসংস্কারাদি শুধু যে বর্তমান সময়ের সৃষ্ট তা নয়। তাই অপব্যাখ্যা কুসংস্কারাদি সৃষ্টির সময়সীমা এবং কারণ ইত্যাদি ও বর্তমানে অনুসন্ধান করা হয়েছে।

৭.৩.১ সিডো সনদ এবং ধর্মের সাথে এর কিছু জটিলতা

জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত মানবাধিকার চুক্তি হিসেবে আখ্যায়িত সনদ সমূহের মধ্যে সিডও সনদ অন্যতম। জাতিসংঘের মানবাধিকার চুক্তি সমূহের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, এগুলো অনুমোদনকারী দেশের পক্ষে মুচলেকাবদ্ধ (Binding) বলে বিবেচিত হয়। তবে সেখানে একটা সুযোগ রাখা হয়েছে যে, কোন সার্বভৌম রাষ্ট্র এই সনদকে বা সনদের সকল ধারার মুচলেকা বা বাধ্যবাধকতা গ্রহণ নাও করতে পারে। যে কোন রাষ্ট্র সনদ অনুমোদন করার সময় কোন ধারায় বা অংশ বিশেষে সংরক্ষণ জারি করতে পারে। আবার যে কোন সময় রাষ্ট্র সংরক্ষণ প্রত্যাহারও করতে পারে। তবে কোন সংরক্ষণ যদি সনদের মূল উদ্দ্যেশ্যের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ হয় তবে তা গ্রহণযোগ্য হবেনা। (ধারা ২৮, সিডও সনদ)। বাংলাদেশ ৬ নভেম্বর ১৯৮৪ সালে সিডও সনদ অনুমোদন করে। বাংলাদেশ- প্রাথমিক ভাবে ধারা নং ২, ধারা ১৩(ক) ও ধারা ১৬.১(গ) ও(চ) তে সংরক্ষণ জারি করে। বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে এই ধারাগুলো সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এই ধারাগুলো পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা শরিয়া আইনের পরিপন্থি। পরবর্তীতে সম্মিলিত তৃতীয় ও চতুর্থ প্রতিবেদন পেশ কালে ২৪ শে জুলাই ১৯৯৭ এ ১৩(ক) ও ১৬.১(চ) ধারা গুলোর উপর থেকে সংরক্ষণ প্রত্যাহার করে নেয়। তবে ধারা ২ এবং ১৬.১ (গ) এখনও সংরক্ষণের আওতায় রয়েছে।[৭৬] সিডও সনদের কয়েকটি ধারা ধর্মের পরিপন্থি বিবেচনায় বাংলাদেশে পুরো সিডও সনদের

---

[৭৬].সালমা খান, সদস্য, আন্তর্জাতিক সিডও কমিটি, চেয়ারপারসন, বেইজিং প্লাস ফাইভ সংক্রান্ত এনজিও কমিটি, বাংলাদেশ(এনসিবিপি) ; নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ ঃ বিশ বছরে সিডও ও বাংলাদেশ ঃ সিডও-র সাম্প্রতিক তথ্য(প্রবন্ধ), পৃঃ ১,২।

আঙ্গিকে কার্যক্রম গ্রহণে কিছুটা প্রতিবন্ধকতাই বিদ্যমান রয়েছে। এর ধারা সমুহের আঙ্গিকে প্রণীত নারী নীতিমালাও বাস্তবায়নে বাধাগ্রস্থ হচ্ছে ফলে এর আঙ্গিকে উন্নয়ন বিলম্বিত হচ্ছে।

প্রতি বছর ৩ সেপ্টেম্বর ২০১২ তারিখে আন্তর্জাতিক সিডও (নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ) দিবস উপলক্ষে নারী নেতৃবৃন্দ সভা সমাবেশের আয়োজন করে থাকেন। আয়োজিত এ সব সভায় বাংলাদেশের নারী নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। তাঁরা এই মর্মে বিস্ময় প্রকাশ করেন যে, সরকার কেন সিডও সনদের দু'টি ধারায়, বিশেষ করে ধারা ২ থেকে আপত্তি তুলছেন না। আবার একই তারিখে সম্মিলিত উলামা মাশায়েখগণও বিবৃতি প্রদান করেন। সিডও সনদ বাস্তবায়নকে তাঁরা দেশ থেকে ইসলাম নির্মূল করার শামিল বলে উল্লেখ করে বিবৃতি প্রদান করে থাকেন। তাঁরা বিভিন্ন সময়ে মহাসমাবেশেরও আয়োজন করে থাকেন।[৭৭]

আশ্চর্যের ব্যাপার এখানে যে, একদল 'আপত্তি তুলে নেয়ার জন্য বলেন', আরেক দল তাতে 'ইসলাম ধর্মের নির্মূল হওয়ার আশংকা প্রকাশ করেন'। কিন্তু কেউই বিস্তারিত এবং সুনির্দিষ্ট ভাবে কিছু বলেননা। তারা কেউই বলেননা যে কিভাবে এবং কোথায় ধর্ম নির্মূল হচ্ছে এবং কেন ধর্ম নির্মূল হচ্ছেনা।

বর্তমানে ধর্মের আঙ্গিকে সিডও সনদটি পর্যালোচনা করা হ'ল-

সিডও সনদের সংরক্ষিত ধারা সমূহ এখানে উল্লেখযোগ্য। এই সনদের ধারা ২ এর ক - ছ এবং ১৬(গ) ধারাটি ধর্মের সাথে সম্পৃক্ত বিবেচনায় সংরক্ষণ করে রাখা হয়েছে। ধারাগুলো হ'ল -

(ক) রাষ্ট্র সমূহ কর্তৃক সংবিধান ও সংশ্লিষ্ট আইন সমূহে নারী - পুরুষের সমতার নীতি অন্তর্ভুক্তি ও তার বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা;

(খ) নারীর প্রতি বৈষম্য দূর করার লক্ষ্যে আইনগত ও অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

(গ) জাতীয় আদালত এবং অন্যান্য আইন, বিচারবিভাগীয় ও সরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের মাধ্যমে নারীর সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা ও তা সুরক্ষার ব্যবস্থা করা;

(ঘ) সরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহে নারীর প্রতি সমতার নীতি অনুযায়ী কাজ নিশ্চিত করা;

(ঙ) ব্যক্তি এবং বেসরকারী সংগঠন বা প্রতিষ্ঠান সমূহে নারীর প্রতি সমতার নীতি অনুযায়ী কাজ □রা, তা নিশ্চিত □□া এবং প্রয়োজনে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা,

(চ) যে সকল আইন, বিধি, প্রথা ও অভ্যাস নারীর প্রতি বৈষম্য সৃষ্টি করে, রাষ্ট্র সমূহ সেগুলো সংশোধন বা বাতিল করবে এবং প্রয়োজনে নতুন আইন প্রণয়ন সহ সকল উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

(ছ) যেসব জাতীয় দন্ড বিধান নারীর প্রতি বৈষম্য সৃষ্টি করে, সেগুলো বাতিল করা।

উল্লেখিত (ক) অনুচ্ছেদ অনুসারে বাংলাদেশের সংবিধানে সমতার নীতি গৃহীত হয়েই আছে, আর (খ) - (ঙ) এবং (ছ) অনুসারে ও অফিস আদালতে কার্যক্রমে ও সমান অধিকারের বিষয়টি স্বীকৃত এবং চেষ্টাও চলছে। তা হলে এ অনুচ্ছেদ সমূহ সংরক্ষিত রাখার কোন কারণ দেখা যাচ্ছেনা। আর ২(চ) অনুচ্ছেদটি

[৭৭] .প্রথম আলো, ৪ সেপ্টেম্বর ২০১২।

নিয়ে পর্যালোচনা করা যেতে পারে এই কারণে যে, কেন এটিকে ধর্মের আওতায় আনা হ'ল? বিধানটি এরূপ - " যে সকল আইন, বিধি, প্রথা ও অভ্যাস নারীর প্রতি বৈষম্য সৃষ্টি করে রাষ্ট্র সমূহ সেগুলো সংশোধন বা বাতিল করবে এবং প্রয়োজনে নতুন আইন প্রণয়ন সহ সকল উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে"। সিডো সনদের ধারা ২(চ) অনুচ্ছেদের কোথাও পবিত্র কুরআনের কথা কিংবা কোন ধর্মের বিষয়ে উল্লেখ মাত্র নেই।

তা হলে- দেশে বৈষম্য সৃষ্টিকর বহু বিষয় বিদ্যমান থাকা অবস্থায় বাংলাদেশের নারী নেতৃবৃন্দ ই বা কেন পবিত্র কুরআনে হস্তক্ষেপ করে এ ক্ষেত্রে মৃত পিতামাতার সম্পত্তিতে নারী পুরুষের সমান অধিকার স্থাপনের দাবী করেই যাচ্ছেন - তা বোধগম্য নয়। এ বিষয়টিও পূর্বে দেখানো হয়েছে যে, জীবিত অথবা মৃত পিতা মাতার সম্পত্তি বন্টনের ক্ষেত্রে পবিত্র কুরআনের বিধানে মূলতঃ কোন বৈষম্য নেই বরং সেখানে সার্বিকভাবে নারীকে জেতানোই হয়েছে। আর সেজন্যই -

- সম্পত্তির মালিক যেহেতু জীবিত অবস্থায় তাঁর সম্পত্তি কেনা বেচা, দান অসিয়ৎ ইত্যাদি সব কিছুই করতে পারেন সেহেতু তিনিই ইচ্ছে করলে তাঁর সন্তানদের (পুত্র/ কন্যা) নিজ ইচ্ছে মত বন্টন করে দিতে পারেন। যাঁরা সম্পত্তিতে নারী পুরুষের সমান অধিকার দাবী করেন তারা সহজেই নিজেরা অসিয়তের মাধ্যমে সে কাজটি করতে পারেন এবং সম্পত্তির মালিকদের কাছে সে দাবী ও করতে পারেন।

- উত্তরাধিকারের ভিত্তিতে সম্পত্তি বন্টনের ক্ষেত্রে পুরুষের একটি বাড়তি অংশ প্রাপ্তি এই কারণে যে, পুরুষকে স্ত্রী ও সন্তানদের ভরণ-পোষণ করতে হয়। আল্লাহ্‌পাক সুরা নেসায় যে পুরুষকে নারী জাতির 'কাউয়াম' হিসেবে নির্ধারণ করে দিয়ে বলেছেন,"ওয়ালের রেজালে কাউয়ামুনা আলান্নেসায়ে" - প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ ঈমাম রাগেব এই 'কাউওয়াম' এর অর্থ সম্পর্কে বলেন, "স্ত্রীলোকের 'কাউওয়াম' অর্থে- তার ভরণপোষণ, তার মানসম্ভ্রম রক্ষার ও তার সমস্ত অভাব অভিযোগের প্রতিকার করার দায়িত্বশীল হিসেবে পুরুষকে বোঝাবে"। এ সম্পর্কে মোহাম্মদ আকরম খাঁ বলেছেন, ''পুরুষের প্রাপ্য নারীর প্রাপ্যের দ্বিগুণ হওয়ার কারণ এই যে, পরিবার প্রতিপালনের ও সংসার চালাইবার দায়িত্ব নারীর থাকেনা, সে দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে ন্যস্ত আছে পুরুষের উপর। স্ত্রী লক্ষ টাকা আয়ের মালিক হইলেও তাহার সন্তানদিগের প্রতিপালন করার দায়িত্ব তাহার উপর বর্তায়না, দরিদ্র হইলেও স্বামীই তাহার জন্য এমন কি, এই অবস্থাপন্ন স্ত্রীর খোরপোষের জন্যও দায়ী। স্ত্রীর মোহরের টাকা স্বামীর পরিত্যাক্ত সম্পত্তির উপর প্রথম দায়েন বা দায় হিসেবে গণ্য''।[৭৮] তাহলে দেখা যাচ্ছে পুরুষ উত্তরাধিকার সম্পত্তিতে নারীর তুলনায় যে বাড়তি অংশ পেয়ে থাকে সেই বাড়তি অংশের সাথে তাঁর স্ত্রী তথা একজন নারীর প্রতি তার বাড়তি দায়িত্বই সম্পৃক্ত। কারণ পুরুষ তার স্ত্রীর এবং সন্তানদের যাবতীয় ভরণপোষণের জন্য বাধ্য, আর নারী স্বামী/ সন্তানদের ভরণ-পোষনে বাধ্য নন।

- ইসলাম ধর্ম আত্মীয়ের সম্পর্ককে গুরুত্বারোপ করে থাকে। যদি ভাই না থাকে সে ক্ষেত্রে মৃত পিতা - মাতার কন্যা সন্তানটিকে পুরো সম্পত্তির মালিক করা হলে তার রক্তের সম্পর্কীয় আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক বজায়ের আর সুযোগ থাকেনা। কন্যাটি বিবাহিত জীবনে স্বামীর সংসারে কোন

---

[৭৮]. মোহাম্মদ আকরম খাঁ অনুদিতঃ সরল বাংলা অনুবাদও বিস্ত্মরিত তাফছির সহ কোরান শরীফ, ১ম খন্ড, পূর্বোক্ত,, পৃঃ ৫৯৪।

জটিলতার সম্মুখীন হলে তা মুকাবিলার জন্য তার পাশে দাঁড়াবার তো কেউই থাকবেনা। তাই আত্মীয়ের সম্পর্ককে বহাল রাখার স্বার্থেই নিকট আত্মীয়ের অনুকুলে কিছু সম্পদ বিতরনের সুযোগ যে কতটা প্রয়োজন তা বিবেকবান যে কোন মানুষের পক্ষে বোঝা সহজ|

- সার্বিকভাবে ইসলামিক বিধিব্যবস্থায় সম্পত্তি প্রাপ্তির ক্ষেত্রে কিন্তু নারীই লাভবান। যারা সম্পত্তি প্রাপ্তির ক্ষেত্রে নারীদের কম প্রাপ্তির কথা বলেন তাঁরা শুধু মাত্র land property র কথাই বলেন। তাঁরা নারীর মোহরানা এবং ভরণপোষণ এর কথা ভুলেই যান।

- সে সম্পর্কে আমেরিকার ভার্জিনিয়ার রিচমন্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিষয়ক অধ্যাপক আজিজাহ ই আল হিবরী বাংলাদেশের 'The Independent' পত্রিকার সাথে প্রদত্ত এক সাক্ষাৎকারে বলেন, ''Under the Quranic law women had provision for a lot of income. In Islam a women never spent her own money for her expenses. All her expenses were paid by her father or husband or another male member of the family. Whatever money she earned through her work, Den-mohar', and from inheritance were all her profits''. অর্থাৎ "কুরআনিক আইন অনুযায়ী নারীর আয়ের প্রচুর বিধান রয়েছে। আর সকল রকমের আয় যেমন, নিজের কাজের মাধ্যমে উপার্জিত অর্থ, দেন মোহর এবং উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ সকলই তার লাভ। কারণ ইসলামে নারী তার নিজের আয়ের অর্থ নিজের জন্যও খরচে বাধ্য নয়, তার সমস্ত খরচ তার পিতা বা স্বামী বা পরিবারের অন্য পুরুষ সদস্যদের উপর দেওয়া আছে"। [৭৯] দেখাযাচেছ ইসলামে নারী সর্বদাই আর্থিক ভাবে লাভবান তথা ধনাঢ্য।

দুখঃজনক যে, বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থায় পবিত্র কুরআনে আল্লাহপাক প্রদত্ত এই অকাট্য অংশ থেকে যুগ যুগ ধরে নারীদের বঞ্চিত করা হচ্ছে। সেদিকে কারও খেয়াল নেই। মহান আল্লাহ্ প্রদত্ত এই অকাট্য অংশ থেকে নারীদের বঞ্চিত রাখার কারনেই যেইনা নারীরা সমান অধিকারের দাবী তোলেন অমনি ধর্ম রক্ষার জন্য সকলেই যেনো মরিয়া হয়ে ওঠেন। যুগযুগ ধরে অকাট্য অংশটা যখন দেওয়া হয়নি এবং হচ্ছেনা তখন কারও পক্ষ থেকে কোন সাড়াশব্দ দেখা যায়নি। তখন কি ধর্মের বিরুদ্ধাচরণ হয়নি এবং হচ্ছেনা?

আবার নারী নেত্রীগণের পক্ষ থেকে নারীর কুরআনিক সব ধরনের পাওনার উপর জোর না দিয়ে কেনইবা সম্পত্তিতে সমান অংশ দাবী করা হচ্ছে তাও বোধগম্য নয়? তারা নিজেরাই নিজেদের সন্তানদের পুরোপুরি না দিয়ে সরকারকে পবিত্র কুরআনে হস্তক্ষেপের দাবী করেন কেন তাও বোধগম্য নয়। মূলতঃ সত্যিকার অর্থে নারী মুক্তির জন্য তাদের বেশী দেওয়ারও দরকার নেই আবার কমও দেওয়ার দরকার নেই। সমান করারও দরকার নেই। পবিত্র কুরআন মাফিক নারীদের পাওনা মিটানোর ব্যবস্থাই হওয়া উচিৎ।

উপরের বর্ণিত অবস্থার প্রেক্ষিতে সিড্ও সনদের ২এর ক-ছ ধারা বিশেষতঃ ২(চ) ধারা সমূহ ধর্মের নামে সংরক্ষণ রাখা এবং এখানে পবিত্র কুরআনকে সংযুক্ত করনের কোন যৌক্তিকতাই দেখা যাচ্ছেনা। নারী নেতৃগণের এই আন্দোলন বরং বহির্বিশ্বে ইসলাম ধর্মকে নারী মুক্তির অন্তরায় হিসেবে দেখানোর প্রয়াস

---

[৭৯]. The Independent ,Dhaka, Wednesday, 9 June 1999, p. 16.

পাচ্ছে। যা মোটেও সঠিক নয়। অন্যদিকে এই দাবী বিভিন্ন সময়ের সরকারকে পবিত্র কুরআনকে হস্তক্ষেপ করানোর প্রচেষ্টার কারণে নারী নীতিমালা বাস্তবায়নেও বিলম্ব হচ্ছে।

তবে সিডও সনদের ধারা ১৬(গ) ধারাটি ধর্মের সাথে সম্পৃক্ত। তা হ'ল 'বিবাহ এবং বিচ্ছেদ কালে একই অধিকার ও দায়িত্ব''। বিয়ের ক্ষেত্রে একই অধিকার রাখতে গেলে তো মেয়েরাই বঞ্চিত হবে। কারণ মুসলিম বিয়েতে স্ত্রীর মোহরানা এবং ভরণ-পোষনের অধিকার সম্পৃক্ত। মুসলিম বিয়েতে পুরুষদেরকে মোহরানা দিতে হয় এবং স্ত্রীর ভরণপোষনের দায়িত্ব নিতে হয়। হউক মেয়েটি উপার্জনশীল কিংবা অনুপার্জনশীল। বিয়েতে একই অধিকার ও দায়িত্ব দিতে গেলে মোহরানা ও ভরণ - পোষণ বাতিলের প্রশ্ন আসবে। বাংলাদেশের নারীরা পবিত্র কোরআনিক এই অধিকার ছাড় দেবে কিনা এ বিষয়ে সারা দেশের মেয়েদের পূর্বে মতামত নেয়া প্রয়োজন।

আবার একজন স্বামীর কাছ থেকে মোহরানা নিয়ে তালাকের ক্ষেত্রে সহজ শর্ত থাকলে তা প্রয়োগের মাধ্যমে স্বামী পরিবর্তন এবং মোহরানা একটি ব্যবসার আকারও ধারণ করতে পারে। এটি বিবেচনায়ই সম্ভবত যারা তালাকের বিধান প্রণয়ন করেছেন সেখানে মেয়েদেরকে আদালত থেকে অনুমোদনের একটি শর্ত রেখেছেন। যদিও পবিত্র কুরআন মাফিক ইসলাম ধর্মে বিবাহ বিচ্ছেদ কারও জন্যই এত সহজ নয়। তালাকের পথ পরিক্রমায় তিনটি তুহর বা মাস বেঁধে দেওয়া হয়েছে। তালাকের বিধান বর্ণনার পর্যায়েই সুরা বকারার ২২৮ নং আয়াতে আল্লাহ্পাক বলেন, "আর নারীদের উপর পুরুষের যে সব অধিকার আছে পুরুষের উপর ও নারীদের সে সব অধিকার রয়েছে"- তাহলে তালাকের ক্ষেত্রেও নারী পুরুষের উভয়ের ক্ষেত্রে তিনমাসের পবিত্র কুরআনিক বিধান অব্যাহত রাখলে নির্যাতনের কারণেই তালাক, নাকি খামখেয়ালির বশে তালাক তা স্পষ্ট হবে। তাই সিডও সনদেও ধারা ১৬(গ) অনুসারে ''বিবাহ এবং বিচ্ছেদ কালে একই অধিকার ও দায়িত্ব'' প্রদানের প্রশ্নই আসেনা। তাই এ বিষয়টি সংরক্ষণের আওতায় রাখাই অধিক যুক্তিযুক্ত হয়েছে।

সিডও সনদের অনুচ্ছেদ ৫ এর বিষযটিও প্রশ্নসাপেক্ষ। এখানে ধর্মে প্রদত্ত নারীর অধিকার বিঘ্নিত হয়েছে। কারণ সেখানে বলা হয়েছে, "মাতৃত্বকে একটি সামাজিক কাজ হিসেবে যথাযথ ভাবে বিবেচনা এবং সকল ক্ষেত্রে শিশুদের স্বার্থই মূল বিবেচ্য বিষয় – এ কথা স্মরণ রেখে সন্তান - সন্ততির লালন- পালন ও উন্নয়নে পুরুষ ও নারীর অভিন্ন দায়িত্বের স্বীকৃতির বিষয় যাতে পারিবারিক শিক্ষায় অন্তর্ভুক্ত করা হয় তা নিশ্চিত করা"। - এই অংশে মাতৃত্বকে একটি সামাজিক কাজ মাত্র গণ্য করা হয়েছে। মূলতঃ সন্তান ধারণ ও জন্ম দানের বিশাল অবদানটি একটি সামাজিক কাজ মাত্র হতে পারেনা। নয়মাস /দশমাস ধরে নিজ জীবন বাজি রেখে মানব শিশুকে এই পৃথিবীতে আনয়নের বিশাল এবং একক দায়িত্বের সাথে পুরুষেরও নারীর প্রতি একটি বড় ধরনের দায়িত্ব কর্তব্য স্থির থাকা অবশ্যই জরুরী। নইলে সমান অধিকারের বিষয়টি অবশ্যই প্রশ্নবিদ্ধ থাকবে। তাই সন্তান-সন্ততির লালন- পালন ও উন্নয়নে পুরুষ ও নারীর অভিন্ন দায়িত্বের স্বীকৃতি নয় বরং পুরুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য অধিক স্থির হওয়া বাঞ্ছনীয়। তাই সিডও সনদের ৫ ধারাটিও ধর্মীয় বিধানের আঙ্গিকে পর্যালোচনা আবশ্যক।

৭.৩. ২ নারী উন্নয়ন নীতিমালা এবং ধর্ম

বাংলাদেশে নারী উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রধান নীতি হলো 'নারী উন্নয়ন নীতিমালা'। বাংলাদেশে সিডো সনদ, বেইজিং প্ল্যাট ফরম ফর এ্যাকশান, এমডিজি, পিআরএসপি ইত্যাদিতে নারীদের সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নারী নীতিমালা একটি পথ নির্দেশক। এই নীতিমালার আলোকেই দেশব্যাপি

নারী মুক্তি এবং উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম চলছে। ৪র্থ অধ্যায়ে এই নীতিমালার আলোকেই বাংলাদেশের নারী উন্নয়ন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রমের উপর আলোকপাত করা হয়েছে।

তথাপিও এই নীতিমালাটি নিয়ে সৃষ্টি হচ্ছে বিভিন্ন প্রকারের জটিলতা। দেখা যাচ্ছে, ইতিমধ্যে নারী উন্নয়ন নীতিমালাটি কয়েক দফা পরিবর্তন হয়েছে। ফলে এর উপর ব্যবস্থাদি গ্রহণ বার বার শুধু বিলম্বিত হয়েছে। দেশে অন্যান্য মন্ত্রনালয়ে বেশ কিছু নীতিমালার ক্ষেত্রে কিন্তু বারবার এমন পরিবর্তনের ব্যাপার ঘটছেনা। কেবল নারী নীতিমালাটিই বার বার নতুন করে প্রণীত হচ্ছে। অনুমোদিত নীতিমালায় নতুন সরকারের কিছু সংশোধন কিংবা সংযোজনের প্রয়োজন থাকলে সেটুকুন পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজন, সংস্কার হতে পারে। বাকি অংশের কার্যক্রম চলতে থাকতে পারে। কিন্তু সম্পূর্ণ নীতিমালাটি সংশ্লিষ্ট সরকার তাঁদের নিজস্ব সৃষ্টি হিসেবে দেখাতে চান বলেই কিছু ক্ষেত্রে সংযোজনের জন্য পুরো নীতিমালাটির কার্যক্রম বন্ধ হয়ে পড়ে। অতঃপর নতুন নীতিমালা হিসেবে আরেকটি নীতিমালা জারী করা হয়। এভাবে নতুন একটি নীতিমালা জারি হতে হতেই এই বিষয়ে কোন রকম কার্যক্রম ব্যতিরেকেই একটি সরকারের সময় সীমা প্রায় শেষ হয়ে আসে।

দেখা গেছে ১৯৯৭ সালে নারী উন্নয়ন নীতিমালাটি প্রণয়নের পর ২০০৪ সালে ক্যাবিনেট কর্তৃক পূর্বের নীতিমালাটি অনুমোদিত হয়নি বলে ক্যাবিনেট কর্তৃক অনুমোদনের প্রয়োজনে এর কিছু ধারায় সংশোধন এনে পুনরায় জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০০৪ প্রণয়ন ও নতুন করে জারি করা হয়।[৮০] আবার ২০০৮ সনে তত্বাবধায়ক সরকারের সময় সংশোধিত আকারে প্রণীত হয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০০৮, কিন্তু তাও কার্যকর করণ এবং বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি। পরবর্তীতে বর্তমান সরকারের আমলে পুনরায় জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ প্রণয়ন করা হয়। এভাবে বাংলাদেশের নারী নীতিমালাটি স্থগিত আর নতুন করে প্রণয়নের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। সেজন্য এর ভিত্তিতে কার্যক্রম গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন দূরুহ ব্যাপার হয়ে পড়ে।

বাংলাদেশে 'নারী উন্নয়ন নীতিমালা' বার বার পরিবর্তন করা নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে বিভিন্ন প্রকারের জটিলতা। দেখা যায় ১৯৯৭ সালের নারী উন্নয়ন নীতিমালাটি গত ২০০৪ , ২০০৭, এবং ২০১১ এ বিভিন্ন সরকারের আমলে বারবার নতুন করে প্রণীত হয়েছে। এর পেছনের কারণ হলো মূলতঃ ধর্ম । তথা পিতা মাতার সম্পত্তিতে নারী পুরুষের সমান অংশীদারিত্ব স্থির করা।

নিম্নে ১৯৯৭, ২০০৪, এবং সবশেষে ২০১১ এর জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালার সম্পদের অংশে পরিবর্তনের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি অংশ তুলে ধরা হ'ল-

সারণী - ৩৬

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতির বার বার পরিবর্তন

ক্র	জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ১৯৯৭	জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০০৪	জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১
১.	নীতির মূল অংশের ১ নং ক্রমিকের শিরোনামে "নারীর মানবাধিকার এবং মৌলিক স্বাধীনতার **বাস্তবায়ন**" মর্মে উল্লেখ ছিল।	**বাস্তবায়ন** এর পরিবর্তে **নিশ্চিতকরণ** শব্দটি দিয়ে নীতির মূল অংশের ১নং ক্রমিকের শিরোনামে	নীতির মূল অংশের ১নং ক্রমিকের পরিবর্তে দ্বিতীয় ভাগ এ এসে ১৭ নং ক্রমিকের শিরোনামে "নারীর মানবাধিকার এবং মৌলিক স্বাধীনতার **নিশ্চিতকরণ**"-

[৮০]. নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের এতদ সংশ্লিষ্ট নথি থেকে তথ্য সংগৃহীত।

২.	এই নীতির মূল অংশের ৭ নং ক্রমিকের জাতীয় অর্থনীতির সকল কর্মকান্ডে নারীর সক্রিয় ও সমঅধিকার নিশ্চিতকরণ শীর্ষক শিরোনামের আওতায় দ্বিতীয় বিষয়টিতে “অর্থনৈতিক নীতি (বানিজ্যনীতি, মুদ্রানীতি, কর নীতি প্রভৃতি) প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে **নারীর সমান অধিকার নিশ্চিতকরা”** উল্লেখ ছিল।	“নারীর মানবাধিকার এবং মৌলিক স্বাধীনতার **নিশ্চিতকরণ** মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে **নারীর সমান অধিকার নিশ্চিতকরা’ র** পরিবর্তে “অর্থনৈতিক নীতি (বানিজ্যনীতি, মুদ্রানীতি, কর নীতি প্রভৃতি) প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে **নারীর সংবিধান সম্মত অধিকার নিশ্চিতকরা** উল্লেখকরা হয়।	ই রাখা হয়েছে। এখানে ২৩ নং ক্রমিকের ২৩.২ উপক্রমিকে এই বিষয়টি উদ্ধৃত হয়েছে এবং ১৯৯৭-এর নীতিমালার অনুরূপ “অর্থনৈতিক নীতি (বানিজ্যনীতি, মুদ্রানীতি, কর নীতি প্রভৃতি) প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে **নারীর সমান অধিকার নিশ্চিতকরা”**- বহাল রাখা হয়েছে।
৩.	এই নীতির মূল অংশের ৭.২ উপক্রমিকে নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন শিরোনামের আ্ওতায় বর্ণিত বিষয়ের দ্বিতীয় লাইনে ‘নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে জরুরী বিয়াদি যথা স্বাস্থ্য , শিক্ষা, প্রশিক্ষণ .. .. .. উপার্জনের সুযোগ, **উত্তরাধিকার**, সম্পদ, ঋণ, প্রযুক্তি এবং বাজার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অর্জিত সম্পদ সহ **ভূমির উপর অধিকার** ইত্যাদিও ক্ষেত্রে নারীর পূর্ণ ্ও সমান সূযোগ এবং নিয়ন্ত্রনের অধিকার দেয়া এবং সেই লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নতুন আইন প্রণয়ন”- উল্লেখ ছিল।	এখানে এই অংশের “উত্তরাধিকার” এবং “ভূমির উপর অধিকার” অংশ দুটি বাদ দেয়া হয়েছে।	এখানে ২৫ ক্রমিকে নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন’ শিরোনামের ২৫.১ ও ২৫.২ উপক্রমিকে বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে। তবে ২০০৪ নীতিমালার বক্তব্য হবহু না রেখে দুটি উপক্রমিকে ভাগ করে কিছুটা পরিবর্তনের মাধ্যমে ২৫.২ উপক্রমিকে এভাবে বলা হয়েছে, “ উপার্জন, **উত্তরাধিকার**, ঋণ, ভুমি এবং বাজার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অর্জিত সম্পদের ক্ষেত্রে নারীর পূর্ণ নিয়ন্ত্রনের অধিকার প্রদান করা”। [৮১]

দেখা যাচ্ছে পরিবর্তনের বিষয়গুলো হলো নারীর উত্তরাধিকার, সম্পদ সহ ভূমির উপর অধিকার সংক্রান্ত। সিডও সনদ, পিএফএ, এমডিজি এবং পিআরএসপি তে নারী পুরুষের সমান অধিকারের প্রশ্নে বাংলাদেশের নারী নেত্রীগণের পিতামাতার সম্পত্তিতে ভাই বোনের সমান অংশ প্রাপ্তির বিষয়ে রাষ্ট্রীয় আইনের সুবিধা পেতে চান। সেজন্য তাঁরা সম্পত্তিতে নারী নীতি মালায় এরূপ বিষয় অন্তর্ভুক্তির দাবী করেন। এখানে ধর্ম প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। কারণ পৈত্রিক সম্পত্তির ভাগভাটোয়ারার বিষয়টি পবিত্র কুরআন সংশ্লিষ্ট এবং পবিত্র কুরআন মাফিক মৃত পিতা মাতার সম্পত্তির ক্ষেত্রে বোন ভাই এর অর্ধেক সম্পত্তির মালিক। এ ক্ষেত্রে ভাইবোনকে সম্পত্তির সমান অংশীদার করা হলে সরকারকে পবিত্র কুরআনে হস্তক্ষেপ করার বিশাল এক দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়। ফলে পবিত্র কুরআনে হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকার প্রয়াসে প্রতিবারই ক্ষমতাশীন সরকার বিষয়টি এড়িয়ে যেতে চান। ফলে বিভিন্ন সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে থাকেন।

গত ২০০৪ সনে তৎকালীন সরকার অস্পষ্ট ভাবে হলেও কিছুটা সমান করার চেষ্টা করেছিলেন পরবর্তী সরকার ২০০৭ এ উত্তরাধিকার এবং সম্পদের ক্ষেত্রে সমান অধিকারের বিষয়টি বাদ দিয়ে পরিবর্তন করেন, এর পর ২০০৮ সালে নারী নীতি আবার পরিবর্তিত আকারে ঘোষণা করা হলেও এই নীতিতে নারীর উত্তরাধিকার, সম্পদসহ ভূমির অধিকারের বিষয়ে কিছুটা পরিবর্তনের মাধ্যমে বলা হয় যে, “স্বাস্থ্য, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, জীবনব্যাপী শিক্ষা, কারিগরী শিক্ষা, তথ্য, উপার্জনের সুযোগ, ঋণ, প্রযুক্তি ও বাজার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অর্জিত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে নারীর পূর্ণ ও সমান সুযোগ এবং নিয়ন্ত্রনের অধিকার দেওয়া এবং সেই লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নতুন আইন প্রণয়ন করা”-এখানে উত্তরাধিকার সম্পত্তির কথা বলা

[৮১]. জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি, ১৯৯৭, ২০০৪ এবং ২০১১, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয়, পৃ ঃ যথাক্রমে ১২, ১৪, ১৫ এবং ৮, ১০, ১১ এবং ১৫, ১৭, ১৮।

Dhaka University Institutional Repository

হয়নি, হয়েছে উপার্জিতসম্পত্তিতে নারীর পূর্ণ ও সমান সুযোগের কথা।[৮২] ২০১১ এর সরকার কর্তৃক ও একই ভাবে " উপার্জন, **উত্তরাধিকার**, ঋণ, ভুমি এবং বাজার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অর্জিত সম্পদের ক্ষেত্রে নারীর পূর্ণ নিয়ন্ত্রনের অধিকার প্রদান করা" হয়েছে। অর্থাৎ সকলেই পবিত্র কোরআনে হস্তক্ষেপ হয় সেরকম কিছু করা থেকে বিরত থাকতে চান। এ ভাবে নারীদের জন্য প্রণীত নারী নীতি মালা বাস্তবায়নে হচ্ছে বিলম্ব।

দুঃখজনক যে, কেহই ধর্মের মৌলিক বিষায়াদি পর্যালোচনা করে দেখেননি যে সম্পত্তি বন্টনের ক্ষেত্র সহ নারী মুক্তির বিষয়ে ধর্মে আদৌ হস্তক্ষেপের প্রয়োজন ছিল কিংবা আছে কি না। কারণ সকলেই যেন ধর্মের অপব্যাখ্যা এবং কুসংস্কারাদিকেই ধর্ম জ্ঞান করে নিয়েছেন।

এবার দেখা যাক অপব্যাখ্যা এবং কুসংস্কারাদি কবে, কখন, কিভাবে ধর্মের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছে-

৭.৪ ধর্মের অপব্যাখ্যা ও কুসংস্কারাদি সৃষ্টির কারণ ও সময়সীমার অনুসন্ধান

এতক্ষনের আলোচনা থেকে এটি পরিস্কার হচ্ছে যে , মূলতঃ নারী মুক্তি এবং নারী মুক্তির লক্ষ্যে নারী উন্নয়নের বিষয়টি এসে ঠেকেছে - ধর্মের কাছে। নারীজাতির মুক্তি এবং উন্নয়নের লক্ষ্যে জেন্ডার ইস্যু যখন নারী পুরুষের সমান অধিকারের কথা বলে - তখন ধর্মের দিক থেকে আসে আপত্তি। ধর্মীয় দিক থেকে আপত্তি আসে যে, নারী পুরুষের সমান হতে পারেনা। তার বিরুদ্ধে আবার অবস্থান নেন - নারীবাদীরা। তাদের বিভিন্ন মতবাদে নারীকে পুরুষের সমান করার জোর প্রচেষ্টার মধ্যে অন্য একটি প্রচেষ্টা চলে, তা হলো **ধর্ম**কে বাতিল করা। ফেমিনিষ্ট বা নারীবাদীদের মধ্যে উদার বা ব্যক্তি স্বাতন্ত্রবাদী নারীবাদ, মার্ক্সীয় নারীবাদ, আমুল নারীবাদীগণ তাদের মতাদর্শে নারী মুক্তির লক্ষ্যে যে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন, তাঁদের সে বিদ্রোহ মূলতঃ ধর্মীয় রক্ষণশীলদের বিরুদ্ধে। এই ক্ষেত্রেও যে গলদটির সৃষ্টি হয়েছে তা হলো আধুনিক নারীবাদীগণ ধরেই নিয়েছেন যে রক্ষণশীলরা যা যা বলেছেন এবং করেছেন তা ই ধর্ম কিংবা ধর্মের বিধান। তাঁদের এই ধারণা প্রখ্যাত নারীবাদী লেখক হুমায়ুন আজাদের বক্তব্য থেকে স্পষ্ট। তিনি বলেন, ''এ মতবাদ মেলে পিতৃতন্ত্রের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থে, ধর্ম গ্রন্থ, আইন, দর্শন সবখানেই এই মতবাদ ছড়িয়ে আছে''।[৮৩] অর্থাৎ ধর্মের মূল গ্রন্থ পর্যালোচনা না করেই এবং ধর্মের মৌলিকত্বকে অনুধাবন না করেই এই মতবাদীগণ ধর্মের বিরুদ্ধাচরণকে তাদের মূল আদর্শ হিসেবে ধরে নিয়েছেন।

জেন্ডার এবং নারীবাদের দিকে লক্ষ্য রেখেই বাংলাদেশে নারী নীতিমালায় প্রথম পর্যায়ে পৈত্রিক সম্পত্তিতে নারী পুরুষের সমান অধিকারের প্রশ্নে সৃষ্টি হয় ব্যাপক আলোড়ন ফলে নারী নীতিমালা বিভিন্ন সময়ে পরিবর্তনের আবর্তে চলতে থাকে। এর বাস্তবায়ন হতে থাকে সুদূর পরাহত।

দুখঃজনক যে, নারীবাদীগণ যদি একবারও পবিত্র গ্রন্থ কুরআন গভীর মনোনিবেশের সাথে পর্যালোচনা করতেন তবে এটি সহজেই তাঁদের কাছে পরিস্কার হতো যে মূলতঃ, 'কুসংস্কার- ধর্ম নয় বরং ধর্মহীনতা' এবং পবিত্র গ্রন্থ কুরআন যাবতীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে। যা বর্তমান গবেষণার ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে।

বর্তমানে দেখা যাক ধর্মের ভেতরে অপব্যাখ্যা সমূহ কবে কখন কি ভাবে সৃষ্টি হয়েছে ?

---

[৮২]. জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিঃ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার,২০০৮, পৃঃ ১৫, ১৭, ১৮।

[৮৩]. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩২৭।

১. ধর্মকে কেন্দ্র করে অপব্যাখ্যা একদিনের সৃষ্ট নয় এবং কেবল মাত্র বর্তমান সময়ের সৃষ্টও নয়

মূলতঃ ধর্মকে কেন্দ্র করে যাবতীয় অনাসৃষ্টি যে একদিনের সৃষ্ট, তা নয় এবং কেবল মাত্র বর্তমান সময়ের সৃষ্ট তাও নয়। কারণ বাংলায় পবিত্র কুরআন এবং হাদিসের অধিকাংশ অনুবাদ এসেছে উর্দু কিংবা ফার্সি থেকে। রাজা বাদশাদের আমলে দরবারের ভাষা ছিলো উর্দু কিংবা ফার্সি। প্রফেসর রফিউল্যাহ শিহাবের মতে, "নারীকে তুচ্ছ করে ধর্মীয় আবহ সৃষ্টির কাজটি তখনই হয়েছিলো- ইসলাম ধর্মের অন্যতম মৌলিক আদর্শগুলো নস্যাতের মাধ্যমে। যেমন ইসলামের সাধারণ জীবনযাপন পদ্ধতির স্থলে তাঁরা বিলাসবহুল জীবনযাপন পদ্ধতির প্রবর্তন করেছেন। যে দাসদাসী প্রথা ইসলাম প্রায় বিলুপ্ত করেছে তারা সেই প্রথার পুনঃ উদ্ভব ঘটিয়েছেন। 'মায়ের পায়ের নীচে সন্তানের বেহেস্ত' ঘোষণার মাধ্যমে ইসলাম নারী জাতিকে যে সর্বাধিক মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছে তারা তা নস্যাৎ করে দিয়ে নারীকে প্রাসাদের ভোগ্যবস্তুতে রূপান্তরিত করেছে। দাসী উপভোগকে বৈধ করেছে। তাদের এই সব ভোগ বিলাসিতাকে যথার্থতা দানের উদ্দেশ্যেই তাঁবেদার অনুবাদকদের মাধ্যমে হুর শব্দের রমণী অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে। এভাবে তাঁদের ইহলৌকিক অন্যায় ভোগ বিলাসিতাকে পারলৌকিক যথার্থতা দানের চেষ্টা করা হয়েছে। এই রাজা বাদশাহদের শাসন চলেছে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে। সে সময়েরই সৃষ্ট এইসব অপব্যাখ্যা পরবর্তীকালের মানুষের হাতে পড়েছে"।[৮৪]

২. পূর্বেকার সময়ের জ্ঞান বিজ্ঞান ততটা উৎকর্ষ ছিলোনা, তাই তখনকার অনুবাদ ব্যাপক অর্থ ভিত্তিক ও হতে পারেনি

আর ডঃ মরিস বুকাইলীর মতে "পূর্বেকার সময়ের জ্ঞান বিজ্ঞান ততটা উৎকর্ষ ছিলোনা, তাই তখনকার অনুবাদ ব্যাপক অর্থ ভিত্তিকও হতে পারেনি। আধুনিক যুগের মানুষেরা, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পুরাতন অনুবাদকেই নিঃশর্তে গ্রহণ করেন, খুব কমই যাচাইবাছাই করে থাকেন। তাই পুরাতন সময়ের সৃষ্ট সংকীর্ণতা আজও ধর্মে বিদ্যমান। তাঁর মতে পবিত্র কুরআন আরবী ভাষায় নাজেল হলেও এতে আরবী ভাষার সর্বোৎকৃষ্ট রূপটিই ধরা পড়েছে। এতে শব্দচয়ন অত্যন্ত উচ্চাঙ্গের। আরবী ভাষায় কোন কোন শব্দ ব্যাপক অর্থবোধক এবং একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এমতাবস্থায় অনুবাদের সময় সংকীর্ণ অর্থটি ব্যবহৃত হলে অনুবাদও সংকীর্ণ হতে বাধ্য। তিনি পবিত্র কুরআনের ক্ষেত্রে আরবী ভাষা ও সাহিত্যজ্ঞানের সাথে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার ওপর পর্যাপ্ত দখলের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন"।[৮৫]

৩. ইসলাম ধর্মের বিষয়ে ভ্রান্ত ধারণা ছড়ানোর এবং ইসলাম ধর্মকে হেয় প্রতিপন্ন করার অপকৌশল চলেছিল

ডক্টর মরিস বুকাইলী আরও একটি কারণ উল্লেখ করেছেন তা হ'ল, সুপরিকল্পিত ভাবে ইসলাম ধর্মের বিষয়ে ভ্রান্ত ধারণা ছড়ানোর এবং ইসলাম ধর্মকে হেয় প্রতিপন্ন করার অপকৌশল চলেছিল। এই ঘটনাটি ঘটেছে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের দ্বারা। ডঃ মরিস বুকাইলী বলেন, ''খ্রীষ্টানদের কোন কোন মহল মুসলমানদের কি ঘৃণার চোখেই না দেখে থাকেন। এই অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে তখন, যখন আমি বাইবেল ও কোরআনের তুলনামূলক বিচার বিশ্লেষণের ব্যাপারে ঐ সব মহলের সাথে মত বিনিময়ের প্রয়াস চালিয়েছিলাম। .. .. সুখের বিষয় এই যে, মুসলমানদের ব্যাপারে ভাটিকানের দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে।

[৮৪]. prof. Rafiullah Shehab ঃ Rights of Women in Islamic shariah , opcit, p124- 125..

[৮৫]. ড. মরিস বুকাইলি ঃ বাইবেল কোরআন ও বিজ্ঞান, পূর্বোক্ত পৃঃ ১৭৪।

ভাটিক্যান থেকে প্রকাশিত একটি তথ্যমূলক পুস্তিকায় ইসলাম সম্পর্কে খৃষ্টানদের প্রতি 'অতীত থেকে প্রাপ্ত যাবতীয় বাতিল ধারণা ও কুসংস্কার এবং বিদ্বেষ প্রসূত বিকৃত মতামত' পরিহারের আহ্বান জানানো হয়েছে। এই দলিলে স্বীকারও করা হয়েছে যে, 'অতীতে মুসলমানদের প্রতি অবিচার করা হয়েছে এবং সেজন্য খৃষ্টবাদী শিক্ষায় শিক্ষিত পাশ্চাত্য সমাজই দায়ী''।[৮৬]

৪. ধর্মের বিষয়ে অনুসন্ধান এবং গবেষণাকেও বহু যুগ ধরে উৎসাহিত করা হয়নি

খৃষ্টান ধর্ম যাজকদের কেন্দ্রস্থল ভাটিক্যানের পূর্বে উল্লেখিত এই মত পরিবর্তনের কারণ সম্ভবতঃ সাম্প্রতিক সময়ে পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন ভাষায় ব্যাপক অনুবাদ এবং ডঃ জামাল বাদাবির, ডঃ মরিস বুকাইলী, ঈমাম রাগেব, জনাব রফিউলাহ শিহাব, ইঞ্জিনীয়ার আসগর আলী এবং আরও বহুসংখ্যক ইসলামী চিন্তাবিদগণের ইসলামিক মৌলিক বিষয়ের উপর আন্তর্জাতিক ভাষায় গবেষণা এবং গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশ।

অথচ ধর্মের বিষয়ে অনুসন্ধান এবং গবেষণাকেও বহু যুগ ধরে উৎসাহিত করা হয়নি। বরং নিঃশর্ত গ্রহণের উপরই জোর দেয়া হয়েছে। যদিও ধর্মের বিষয়ে যাচাই বাছাই এবং অনুসন্ধানের উপর গুরুত্বারোপ পূর্বক স্বয়ং আল্লাহ্পাক বলেন, ''আর যখন তাদের কাছে পৌঁছে কোন সংবাদ শাস্তি সংক্রান্ত কিংবা ভয়ের, তখন তারা সেগুলোকে রটিয়ে দেয়। আর যদি সেগুলোকে পৌঁছে দিত রসুল পর্যন্ত কিংবা তাদের শাসকদের পর্যন্ত, তখন অনুসন্ধান করে দেখা যেত সে সব বিষয়, যা তাতে রয়েছে অনুসন্ধান করার মত'' (আঃ ৮৩, সুরা নেসা)। এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মাওলানা মুহিউদ্দিন খান বলেন, ''আয়াতে আল্লাাহতায়া'লা কোরআন সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করার জন্য মানবকুলকে আহ্বান জানিয়েছেন''।[৮৭] অন্যত্র রয়েছে, ''হে মমিনগণ যদি কোন দুস্কার্যকারী তোমাদের কাছে কোন সংবাদ লইয়া আসে, তবে খুব অনুসন্ধান করিয়া লও, যেন অজ্ঞতা বশতঃ কোন সম্প্রদায়ের ক্ষতি করিয়া না ফেল, অতঃপর নিজের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হইতে হয়'' (আঃ ৬, সুরা হুজরাত)। 'খুব অনুসন্ধান না করিয়া লওয়ার জন্য' বহু যুগ ধরে নারী সম্প্রদায়ের যে ক্ষতি করা হলো তা প্রকারান্তরে মানব সম্প্রদায়েরই ক্ষতির কারণ হয়েছে। এর কি জবাব দেবেন মানব সম্প্রদায় মহান স্রস্টার কাছে?

৫. ধর্মের মধ্যে সৃষ্ট কুসংস্কার, গোঁড়ামীর বিরুদ্ধে কথা বলার পেছনে অকারণ ভীতি, দ্বিধাদ্বন্দ্ব প্রবল ভাবে কাজ করেছিল যুগ যুগ ধরে

শুধু গবেষণা বা অনুসন্ধানে নিরুৎসাহিত করাই নয়, ধর্মের মধ্যে সৃষ্ট কুসংস্কার, গোঁড়ামীর বিরুদ্ধে কথা বলার পেছনে একটা অকারণ ভীতি, দ্বিধাদ্বন্দ্ব প্রবল ভাবে কাজ করেছে যুগ যুগ ধরে। এই একটা রহস্য! রহস্য এখানেই যে ধর্মে অনুপ্রবেশ করা কিংবা ধর্মের নামে সৃষ্ট অপব্যাখ্যা, কুসংস্কার লালনপালনের পরিণাম কিন্তু ধর্মকেই ধ্বংস করা, যে পরিণাম ইহুদী, খৃষ্টান ধর্ম সহ অন্যান্য ধর্মের ক্ষেত্রে ঘটেছে।। জেনে শুনে সত্য গোপনের ক্ষেত্রে কিন্তু কারোরই রেহাই নেই। কারণ পবিত্র কুরআনে আল্লাহপাক বহুবার তাঁর বিধান মতই হুকুম করার জন্য সতর্ক করে দিয়েছেনঃ ''আর যে ব্যক্তি আল্লাহতায়ালার বিধান অনুযায়ী হুকুম না করে তবে এমন লোকতো পূর্ণ কাফের'' (আঃ ৪৪, সুরা মায়েদা)।

আরও নির্দেশ হলোঃ ''আর মিশ্রিত করিওনা সত্যকে অসত্যের সহিত। এবং গোপন করিওনা সত্যকে'' (আঃ ৪২, সুরা বকারা)। আরও ভয়ংকর সতর্কতা এসেছে এখানেঃ ''যাহারা আল্লাহর অবতারিত কিতাব

---

[৮৬]. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৭৩, ১৭৪।

[৮৭]. পবিত্র কোরআনুল করীম, বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তফসীর, ১৪১৩, পৃঃ ২৬৭।

গোপন করে এবং তৎপরিবর্তে নগণ্য সম্পদ আদায় করে তারা আর কিছুই নহে, শুধু নিজেদের পেটে অগ্নি পুরিতেছে। আর আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাহাদের সাথে কথাও বলিবেননা এবং তাহাদিগকে নির্মলও করিবেননা, আর তাহাদের যন্ত্রনাময় শাস্তি হইবে'' (আঃ ১৭৪ সুরা বকারা)। মহান আল্লাহ পাকের এই সতর্ককে ভয় না করে, মানুষ ভয় করেছে মানুষকে। এটি রহস্য নয়তো কি? অজ্ঞাত রহস্য জনক ভাবে মানুষের প্রতি মানুষের এই ভীতিই বহু যুগ ধরে ধর্মকে বিশুদ্ধ রাখার এবং বিশুদ্ধ করার পরিপন্থি ছিলো।

৬. ধর্মের গভীরে যাওয়া এবং ধর্ম নিয়ে গবেষণার ক্ষেত্রেও মানুষের অনীহা আর অলসতা বিদ্যমান।

এছাড়া ধর্মের গভীরে যাওয়া এবং ধর্ম নিয়ে গবেষণার ক্ষেত্রেও মানুষের অনীহা আর অলসতাও বিদ্যমান ছিলো। এই সম্পর্কে মোঃ আকরম খাঁ বলেন, ''মানুষের দেহের ন্যায় তাহার অভ্যন্তরীন প্রবৃত্তিগুলিও খুব বাবু। এই বাবুগিরীর খাতিরে আমাদের জ্ঞান ও বিবেক, স্বাধীন আলোচনা ও গবেষণার দ্বারা অসত্যের পুঞ্জিভূত ন্যাক্কারজনক আবর্জনা রাশির নিম্ন হইতে সত্যের উদ্ধার সাধন করার জন্য পরিশ্রম স্বীকার করিতে বড় একটা চাহেনা। এই সহজিয়া মানষিকতা কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের গাড়ি পাল্কিগুলিতে চড়িয়া পরম আনন্দে গা' এলাইয়া শুইয়া পড়ে। ইহা মানবীয় দুর্বলতার সর্বাপেক্ষা মারাত্মক দিক। মহাপুরুষগণের জ্ঞানের গভীরতা, তাহাদের চরিত্রের মহিমা, তাঁহাদের জীবনের ব্রত ও সাধনা- এই সব লইয়া আলোচনা করিতে গেলে অনেক হাঙ্গামা উপস্থিত হয়। পক্ষান্তরে মহাপুরুষকে ভক্তি করিতে হইলে, তাহাদের জীবনীকে একেবারে বাদ দিয়া গেলেও চলেনা। তাই ভক্তগণ খুব সহজে উভয়কুল রক্ষা করার জন্য কতকগুলি আজগুবি, অনৈতিহাসিক গল্পগুজব এবং কতকগুলি অলৌকিক ও অস্বাভাবিক উপকথার আবিস্কার করেন এবং সেগুলির মধ্য দিয়া মহাপুরুষের নামের জয় জয়কার করিয়া মনে করিয়া লন যে, তাহাকে যথেষ্ট ভক্তি করা হইল। ক্রমে ঐ সব কুসংস্কারমূলক উপকথা ও অলৌকিক কেচ্ছাকাহিনী, মহাপুরুষগণের জীবনের প্রকৃত শিক্ষনীয় বিষয়গুলিকে দূরে সরাইয়া দিয়া, ইতিহাস ও পূরান পুস্তক সমূহের পৃষ্ঠায় স্থায়ীভাবে অধিকার জমাইয়া বসে। কালক্রমে তাহাই শাস্ত্র হইয়া দাঁড়ায়। এবং সেগুলি সম্বন্ধে সাধারণ সংস্কারের বিপরীতে কেহ কোন কথা বলিতে চেষ্টা করিলে, তাহাকে শাস্ত্রদ্রোহী, ধর্মদ্রোহী ও কাফের বলিয়া নির্ধারণ করা হয়। যুক্তির দিক দিয়া কোন কথা বলিয়া উদ্ধার পাইবার আশাও এইক্ষেত্রে খুবই কম। তুমি ঐতিহাসিক, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক যুক্তি প্রদান করিয়া, এমনকি মূল শাস্ত্র গ্রন্থের শতশত অকাট্য প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাও, কিন্তু ভক্তের নিকট সবই বিফল! .. .. জগতের সমস্ত উন্নত ও প্রাচীন জাতির পতন ও মৃত্যু মূলতঃ এক মাত্র এই রোগেই সংঘটিত হইয়াছে। রোমান ও গ্রীকের মৃত্যু ও হিন্দুর সর্বনাশ এই অন্ধবিশ্বাস, তাকলীদ (গতানুগতিক) ও স্থিতিস্থাপকতার জন্যই সংগঠিত হইয়াছে। খ্রীষ্টান যতদিন গীর্জার বাহিরেও খ্রীষ্টান ধর্মের প্রভাব স্বীকার করিয়াছিলো, ততদিন তাহার দুর্দশার ইয়ত্তা ছিলোনা এখন সেই খ্রীষ্টান ধর্মের সমস্ত উপকথা ও আজগুবী অলৌকিকতা গুলিকে গীর্জার গুদাম ঘরে পুরিয়া তালাচাবী বন্ধ করিয়া দিয়াছে। তাহার কর্ম জীবনের সহিত ধর্মের আর কোনই সম্বন্ধ নাই। জীবনে একবারও কোরআন শরীফের কোন একটি অধ্যায় পাঠ করার সৌভাগ্য যিনি লাভ করিয়াছেন, তাঁহাকে স্বীকার করিতেই হইবে যে, এই শ্রেণীর গতানুগতিক ও অন্ধবিশ্বাসের মুলোচ্ছেদ করাকেই কোরআন নিজের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য বলিয়া নির্ধারণ করিয়াছে। কিন্তু হইলে কি হইবে? আজ মুছলমান নিজের জন্মগত ও পারিপার্শ্বিক কুসংস্কারের চাপে কোরআনের সেই স্পষ্ট শিক্ষার বিরুদ্ধাচরণ করাকেই এছলাম বলিয়া মনে প্রানে বিশ্বাস করিতে অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। ফলে যে সকল কারণে রোমান, গ্রীক, হিন্দু, ইহুদী প্রভৃতি প্রাচীনতম জাতিসমূহের সর্বনাশ হইয়াছিলো, মুছলমানও আজ ঠিক সেই সমস্ত কারণে স্বাভাবিক অভিশাপে উৎসন্নে যাইতে বসিয়াছে''।[৮৮]

[৮৮]. মোঃ আকরম খাঁ ঃ মোস্তফা চরিত , পূর্বোক্ত, পৃঃ ০১-০৩।

৭. সমাজের প্রগতিশীল ব্যক্তিত্বগণের ধর্মের বিষয়ে রক্ষনশীলতাও ধর্মীয় কুসংস্কারকে স্থায়ী করতে সহায়ক হয়েছে

আবার তসলিমা নাসরিন এবং হুমায়ুন আজাদগণের মত প্রগতিবাদীদের ধর্মের বিষয়ে একধরনের রক্ষনশীলতাও ধর্মীয় কুসংস্কারকে স্থায়ী করতে সহায়ক হয়েছে। কারণ সমাজের জ্ঞানীগুণী প্রগতিশীল সমাজ প্রচুর বই পড়েন কিন্তু ধর্মীয় বই পড়েননা, তাঁরা বিস্তর বিষয় নিয়ে গবেষণা করেন কিন্তু ধর্মীয় বিষয়ে নয়। তাঁদের অধিকাংশেরই ধারণা, ধর্ম নিয়ে আলাপ আলোচনা, লেখাপড়া, গবেষণা করলে বোধ হয় প্রগতির বিরুদ্ধে করা হবে। এভাবে ধর্ম বিরুদ্ধ কথা ও কাজ প্রগতির কথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলশ্রুতিতে ধর্ম একটা নির্দিষ্ট বলয়ে আটকা পড়ে গেছে। ফলে তা বিস্তার বিস্তৃতি ও সার্বজনীনতা পাচ্ছেনা।

৮. বিকৃতি, অপব্যাখ্যা, গোড়ামী, কুসংস্কার যেদিন সর্বশেষ ধর্ম ইসলামকেও একে বারে গ্রাস করে ফেলবে- সেদিন পৃথিবীও সত্য সুন্দর ও কল্যান থেকে সম্পূর্ণ রূপে বঞ্চিত হবে।

যেহেতু, ইসলাম সর্বশেষ ধর্ম, তাই বিকৃতি, অপব্যাখ্যা, গোড়ামী, কুসংস্কার যেদিন এই ধর্মটিকেও একে বারে গ্রাস করে ফেলবে- সেদিন পৃথিবীও সত্য সুন্দর ও কল্যান থেকে সম্পূর্ণ রূপে বঞ্চিত হবে। পৃথিবী নিমজ্জিত হবে অজ্ঞানতার অন্ধকারে।এতে চূড়ান্ত ধ্বংসের পথও হবে ত্বরানিত। তাই এই ধর্মের অনুসারীদের এতদসংক্রান্ত যে কোন দুষ্ট গলি সম্পর্কে সতর্ক হওয়া আবশ্যক, যাতে এটি পূর্ববর্তী ধর্মগুলোর অবস্থায় পড়ে না যায়। সেজন্যই ধর্মের বিষয়ে ব্যাপক আলোচনা, সমালোচনা, গবেষণা, অনুসন্ধান অব্যাহত থাকা আবশ্যক। যেনো কোন সংকীর্ণতা অনুপ্রবেশ করলেও তা দূর হতে সময় না লাগে। সুখের বিষয় যে যথেষ্ট প্রতিকুলতা সত্বেও, অদ্যাবধী ইসলাম ধর্মের বিষয়ে এখনও কিছু কিছু গবেষণা অব্যাহত আছে বলেই আজও এর মহিমা বিলীন হয়ে যায়নি। সৃষ্ট অপব্যাখ্যা ধরা পড়ে যাচ্ছে।

৯. পৃথিবীর প্রতিটি ধর্মই যেখানে নারীর অনুকুলে, অপব্যাখ্যার মাধ্যমে যুগ যুগ ধরে তা ব্যবহৃত হয়েছে নারীর প্রতিকুলে।

দুঃখজনক ব্যাপার এখানে যে, পৃথিবীর প্রতিটি ধর্মই যেখানে নারীর অনুকুলে, অপব্যাখ্যার মাধ্যমে যুগ যুগ ধরে তা ব্যবহৃত হয়েছে নারীর প্রতিকুলে। **নারী শিক্ষা হারাম** ঘোষণা করে নারীকে অশিক্ষিত রেখে তাকে তার ধর্মীয় অধিকারটুকু পর্যন্ত জানতে দেয়া হয়নি। মাতৃত্বের মহিমাকে ভুলুণ্ঠিত করে নারীকে ইতর প্রাণী বিশেষে পরিণত করা হয়েছে। এই ভূ-ভারতে এক বেগম রোকেয়া ছাড়া আর কোন নারী এ সবের প্রতিবাদ করেছে? বেগম রোকেয়ার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে ইতোমধ্যে অনেক সংগ্রাম ত্যাগ তিতিক্ষার মাধ্যমে যেই না নারীদের শিক্ষা ও পেশার কিঞ্চিত সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, অমনিই একদিকে নারী শিক্ষার বিরুদ্ধে বিষোদগার করা হচ্ছে, অন্যদিকে ইকুয়ালিটির প্রশ্নে নারীর পাওনা মোহরানা এবং ভরণপোষণের বিষয় সংকীর্ণ করা হচ্ছে। বলা হচ্ছে এতে করে নারী নাকি বিক্রি হচেছ। অন্যদিকে পুরুষকেও ভরণপোষণের দায় দায়িত্ব থেকেও অব্যাহতি দেওয়ার প্রয়াস শুরু হয়েছে। পক্ষান্তরে নারীর সন্তান ধারণ ও জন্মদানের ভূমিকা নারীর উপরই একক ভাবেই বিদ্যমান রয়েছে। নারীর মাতৃত্ব জনিত এই ভূমিকার সাথে পুরুষের কোন ভূমিকা ইকুয়াল হবে তার কোন সমাধান না করেই মোহরানা এবং ভরণপোষণ মুক্ত ইকুয়ালিটি তো ইকুয়ালিটি হতে পারেনা। এই ধরনের ইকুয়ালিটির মাধ্যমে নারী নয়, মুক্ত হচ্ছে পুরুষেরাই। কারণ প্রাকৃতিক ভাবেই গর্ভধারণ তথা নারী - পুরুষ উভয়কে এই পৃথিবীতে আনয়নের বিশাল এক পবিত্র দায়িত্বের পরও নারীকে সামান্য লেখাপড়ায় এবং সামান্য উপার্জনে আনার সাথে সাথেই পুরুষদেরকে ইকুয়ালিটির নামে করা হচ্ছে মোহরানা এবং ভরণপোষণ মুক্ত। ফলে নারীর উপর আসছে তিনমুখী/চারমুখি দায় দায়িত্বের বোঝা।

এভাবেই বর্তমান বিশ্বের নারী মুক্তি আন্দোলন প্রকারান্তরে চলে যাচ্ছে সন্তান গর্ভে ধারণ থেকে মুক্ত পুরুষের আরও একধাপ মুক্তির দিকে। এদিকে কেহই নজর দিচ্ছেননা।

মূলতঃ ধর্মীয় বিধি বিধানের সাথে সমন্বয় না করার কারণে বিভিন্ন তত্ব, মতবাদ, Approach, ইস্যু এমনকি খোদ জাতিসংঘের ঘোষণায়ও ফাঁক ফোকর থেকেই যাচ্ছে। নারীর সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত হচ্ছেনা। দেখা গেছে জাতিসংঘও উদার নারীবাদের আদর্শে মাতৃত্বকে একটি সামাজিক কাজ ঘোষণার মাধ্যমেই নারীর এত কষ্ট আর ত্যাগ তিতিক্ষার পুরস্কার দিয়েছে! বলা হয়ে থাকে, শিশুর যত্ন আদ্যিতে পুরুষের সমান অংশ গ্রহণের বিষয়টি নিশ্চিত করাই সিডও সনদের ৫(খ) ধারার মূল লক্ষ্য। কিন্তু কিভাবে? শিশুর যত্ন আদ্যিতে অর্ধেক অংশ গ্রহণে পুরুষ উদাসীন হলে তাকে বাধ্য করানো যাবে কিভাবে? কোন আইনের বলে? যদি আইন তৈরীও করা হয় তবে কি মায়েরা এই বিষয়ে আদালতে নালিশ করতে যেতে পারবে? গেলে, অতঃপর তার দাম্পত্য সম্পর্ক টিকবে কি? মায়ের গর্ভ ধারনের দায় যে অনেক বড়! নিজ জীবন বিপন্ন করে পাওয়া তারই নাড়ী ছেড়া ধনের যত্নের ক্ষেত্রে আরেক জনের জন্য অপেক্ষা করা নারীর জন্য কতটা অবাস্তব এবং অসম্ভব তা যে কোন মায়ের পক্ষেই বোঝা সহজ। আর এটিই পুরুষের জন্য শিশুর যত্ন আদ্যিতে সমান অংশ গ্রহণ না করার মস্ত বড় সুযোগও বটে। আর এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করবেনা এই রকম পুরুষের সংখ্যা হাতে গোনা সম্ভব। তাই এটি সহজেই বলা যায় জাতি সংঘের সিডও সনদের এই ধারার বলে শিশুর যত্ন আদ্যির ক্ষেত্রে ইকুয়ালিটি সুদুর পরাহত। এতে বরং পরিবার প্রতিপালনে পুরুষের আর্থিক দায়িত্ব দ্বিখন্ডিত হবে মাত্র। নারীর উপার্জন এবং খরচ একরকম বাধ্যতামূলক হয়ে দাঁড়াবে।

পক্ষান্তরে ধর্মের বিষয়গুলো একটু গভীর ভাবে অনুধাবন করলে দেখা যাবে, সেখানে নারীর মাতৃত্বকে এতটা মহিমান্বিত করা হয়েছে যে, মাতৃত্বের এই গুরুদায়িত্বের পর নারীর উপর আর কোন গুরুদায়িত্ব চাপানো হয়নি। এর পর নারী স্বাধীন। সেখানে নারীর জন্য লেখাপড়া করার স্বাধীনতা রয়েছে, রয়েছে নারীর উপার্জনের স্বাধীনতাও। নারী শিক্ষিতা এবং উপার্জনক্ষম হলেও নারীকে খরচে বাধ্য করার কোন সুযোগ ধর্মে নেই, সেখানে নারী স্বাধীন। সে যদি কোন খরচ করে তবে পুরুষ তাতে খুশি হবে, তৃপ্ত হবে এবং মর্যাদাকর বিবেচনা করতে পারবে (আয়াত ৪ সূরা নেছা মোহরানা সংক্রান্ত)। কিন্তু তাকে খরচে বাধ্য করতে পারবেনা। এভাবেই নারীর পক্ষে উপার্জনে যাওয়া সম্ভব না হলেও ধর্ম পরিপূর্ণ ভাবে নারীর আর্থিক এবং সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। ধর্মীয় বিধিব্যবস্থায় এইটি নারীর এক বিশেষ মর্যাদা। যা তার মাতৃত্বের ভূমিকার সাথে পুরুষের ভূমিকার সামঞ্জস্য বিধান করে। ভিন্ন ভাবে বলা যায় নারী-পুরুষ-সন্তান এই প্রক্রিয়ায় নারী অন্তর্ভূক্ত হচ্ছে প্রাকৃতিক ভাবেই আর পুরুষ অন্তর্ভূক্ত হচ্ছে তাদের প্রতি খরচ এবং দায়-দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে। এটি স্রষ্টা প্রদত্ত ভারসাম্য। নারী মুক্তির লক্ষ্যে যত ব্যবস্থাই নেওয়া হোক না কেন, নারীর এই বিশেষ মর্যাদা কিংবা আল্লাাহ প্রদত্ত এই ব্যালান্স বিনষ্ট হলে অনেক কিছুই বিনষ্ট হয়ে পড়বে।

আসলে সার্বিক ও চূড়ান্ত নারীমুক্তির প্রত্যাশা থাকলে দেশ বিদেশ এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যত তত্ব কিংবা বাদই সৃষ্ট হউক না কেন তা গ্রহণ করা প্রয়োজন পবিত্র কুরআনিক বিধি বিধানের সাথে সামঞ্জস্য রেখে। যেহেতু পবিত্র কুরআন এখনও অটুট রয়েছে অপব্যাখ্যা এবং কুসংস্কার থেকে। তাই নারীর কুরআনিক অধিকার এবং তাকে দেয়া কুরআনিক মর্যাদার সাথে সমন্বয় করে Gender & Development issue টি সুসমন্বয় করা আবশ্যক। কারণ, মূলতঃ মহান স্রষ্টা তাঁর সৃষ্টিকে টিকিয়ে রাখার জন্য যে নিয়ম পছন্দ করেছেন তা-ই পবিত্র কুরআনে ব্যক্ত করেছেন। পরিবারে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে প্রেমপ্রীতি সম্পর্কে আল্লাহপাক স্বয়ং বলেন, ‘‘যেহেতু তোমরা পরস্পরের সংশ্রবে শান্তি লাভ করিবে এবং তোমাদিগের পরস্পরের মধ্যে প্রেম ও প্রীতি প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়াছেন; নিশ্চয়ই এই সৃষ্টি বৈচিত্রের নিগুঢ় তত্বগুলিতে চিন্তাশীল সমাজের জন্য অনেক তথ্য নিহিত রহিয়াছে’’ (আঃ ১৪, সুরা রুম)।

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমান গবেষণার পরবর্তী অধ্যায়ে ধর্মীয় ঈমামগণের, নারী নেতৃগণের, সরকারী নীতি বাস্তবায়ন পর্যায়ের কিছু কর্মকর্তাগণের, আইন প্রয়োগকারী মাননীয় আদালতের সাথে সম্পৃক্ত কয়েকজন বিজ্ঞ কৌশলীর, দেশব্যাপী নারী মুক্তির লক্ষ্যে সরকারী কার্যক্রম যারা পরিচালনা করেন- সেই জেলা/ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা গণের এবং নির্যাতিত নারীগনের গৃহীত সাক্ষাৎকার এর উপর পর্যালোচনা করে, পুনরায় ধর্মের মৌলিক বিষয়াদি উপর বিদ্যমান কিছু অপব্যখ্যা এবং কুসংস্কারের উপর পর্যালোচনা করে পরিস্কার করে দেখানো হয়েছে যে, ধর্মেই বিদ্যমান রয়েছে নারী মুক্তি এবং নারীর মর্যাদার সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা। সেই দিক নির্দেশনার আলোকে বর্তমান গবেষণার সুপারিশও চূড়ান্ত করা হয়েছে পরবর্তী অধ্যায়ে।

অষ্টম অধ্যায়

জরীপের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য /উপাত্তের ভিত্তিতে গবেষণার বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ, বিদ্যমান কুসংস্কারাদি পর্যালোচনা, ফলাফল নির্ধারণ এবং সুপারিশ/ প্রস্তাব প্রদান।

বর্তমান গবেষণায় নারীমুক্তির লক্ষ্যে বাংলাদেশে গৃহীত জেন্ডার সংশ্লিষ্ট যাবতীয় কার্যক্রম এবং ধর্মীয় বিষয়াদি বিস্তারিত অলোচনা- পর্যালোচনা করা হয়েছে। কিন্তু গবেষণার ৫ম অধ্যায়ে বাংলাদেশে নারী নির্যাতনের যে ভয়ংকর চিত্র সমূহ অঙ্কিত হয়েছে তাতে এটি স্পষ্ট হয় যে, বাংলাদেশে বিস্তর কার্যক্রম সত্বেও নারী জাতির মুক্তি ঘটেছে খুবই স্বল্প পরিসরে। এর বেশ কিছু কারণের মধ্যে বর্তমান গবেষণায় প্রধানতঃ বিদ্যমান ধর্মীয় অপব্যাখ্যা এবং কুসংস্কারকেই চিহ্নিত করা হয়েছে। তারই প্রেক্ষিতে ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে এসে গবেষণায় বড় বড় ইসলামী চিন্তাবিদগণের প্রদত্ত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের আলোকে প্রধানতঃ ইসলাম ধর্ম অবলম্বনে নারীজাতি সংশ্লিষ্ট পবিত্র কুরআনের বিধিব্যবস্থা, হাদিস এবং শরীয়তের বিভিন্ন বিধিব্যবস্থার মধ্যে সৃষ্ট বেশ কিছু অপব্যাখ্যা সনাক্ত করা হয়েছে। দেখা গেছে নারী জাতি নির্যাতিত হয় প্রধানতঃ ধর্মীয় ভুল এবং অপব্যাখ্যার মাধ্যমে। কারণ ধর্ম, নারী-পুরুষের সমান অধিকার তো বটেই সেই সাথে মাতৃত্বের কারণে নারীজাতিকে আরও কিছু বেশী অধিকার এবং মর্যাদা প্রদান করে। গবেষণার সপ্তম অধ্যায়ে এসে নারী মুক্তির লক্ষ্যে সরকারী বেসরকারী পর্যায়ে পরিচালিত কার্যক্রমের ত্রুটি বিচ্যুতি এবং বিদ্যমান সীমাবদ্ধতা সমূহের উপর আলোকপাত করে, সেসবের সংশোধনের উপর গুরুত্বারোপ পূর্বক নারী মুক্তির লক্ষ্যে বিদ্যমান যে সব সীমাবদ্ধতা দূর করা প্রয়োজন তা তুলে ধরা হয়েছে। একই সাথে কবে, কখন, কিভাবে ধর্মে কুসংস্কার সমূহের অনুপ্রবেশ ঘটেছে তার উপর বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়েছে।

আর বর্তমান অধ্যায়ে সমাজে বিদ্যমান ধর্মীয় কুসংস্কারাদির আলোকে ধর্মের মৌলিক বিষয়াদির উপর নির্যাতিত নারী, ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ, বিশিষ্ট সামাজিক ব্যক্তিত্ব এবং সরকারী-বেসরকারী কর্মকর্তাগণের সাক্ষাৎকার গ্রহণ পূর্বক তাদের মতামতের ভিত্তিতে গবেষণার মৌলিক বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে। অতঃপর সমাজে প্রচলিত বেশ কিছু কুসংস্কার এবং অপব্যাখ্যা চিহ্নিত করে ধর্মের মূল বিষয়ের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে গবেষনার মূল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

৮.২ নির্যাতিত নারী, মসজিদের ঈমাম/ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ, সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব, সরকারী বেসরকারী কর্মকর্তাগনের সাক্ষাৎকার এবং ফলাফল বিশ্লেষন

বর্তমান গবেষণায় ব্যবহৃত তিনসেট (১,২,৩) নমুনা প্রশ্নমালা রক্ষিত আছে[১]। তন্মধ্যে প্রশ্নমালা - ৩ এর মাধ্যমে নির্যাতিত নারীদের, প্রশ্নমালা - ২ এর মাধ্যমে মসজিদের ইমাম এবং ধর্মীয় ব্যক্তিত্বগণের আর প্রশ্নমালা - ১ এর মাধ্যমে সমাজসেবক, চাকুরীজীবি, ছাত্রছাত্রী এবং গৃহবধূদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশের জেলা এবং উপজেলায় কর্মরত মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তাগণের সাক্ষাৎকার গৃহীত হয়েছে প্রশ্নমালা ১ এর মাধ্যমেই। আর তাদের মাধ্যমেই বিভিন্ন জেলায় নির্যাতনের শিকার নারীগণের সাক্ষাৎকার এবং দেশের বিভিন্ন জেলা /উপজেলা মসজিদের ঈমামগণের মধ্যে ৫৫জন এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকায়, প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত বিভিন্ন জেলা/উপজেলার ঈমাম সাহেবগণের মধ্য থেকে ৬০ জন মোট ১১৫ জন ধর্মীয় ঈমাম এবং আলেম মুহাদ্দেসগণের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে। ঢাকার ২৫ জন নারী নেতৃবৃন্দের, বাংলাদেশ লেখিকা সংঘের ১০ জন লেখিকা, সাংস্কৃতিক মন্ত্রনালয়ের সচিব সহ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয়,

[১]. নমুনা প্রশ্নপত্র পৃঃ ৫২৩-৫৩০ এ সংযুক্ত।

সমাজকল্যান মন্ত্রনালয় সমূহের কয়েকজন অতিরিক্ত সচিব, যুগ্মসচিব, উপসচিব সহ আরও কয়েকজন কর্মকর্তা , নারী নির্যাতন প্রতিরোধ কল্পে মাল্টিসেক্টরাল পোগ্রামের প্রকল্প পরিচালক সহ কয়েকজন কর্মকর্তার, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের এবং জাতীয় মহিলাসংস্থায় কর্মরত মোট ২৫ জনের এবং বিভিন্ন জেলার জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা এবং উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তাগণের মধ্যে ৪১ জনের - যারা নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছেন, আদালতে নারী নির্যাতন সংক্রান্ত মামলা পরিচালনা করে থাকেন সেরূপ প্রায় ১৫ জন আইনজীবির, ১৫ জন এনজিও কর্মী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫ জন ছাত্রী, ২জন কলেজের সহকারী অধ্যাপক, ৬ জন গৃহবধু এবং কয়েকজন গার্মেন্টস কর্মীর প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে।

সাক্ষাৎকারে প্রাপ্ত প্রশ্নোত্তর সমূহ জরিপের মাধ্যমে তাদের মতামত পর্যালোচনাও করা হয়েছে। তাদের মতামতের ভিত্তিতে প্রচলিত বেশ কিছু ধর্মীয় অপব্যাখ্যা সনাক্ত করে, ধর্মের মৌলিক বিষয়াদি যে নারী মুক্তির সহায়ক তা প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টার মাধ্যমে জেন্ডার ইস্যুর সাথে নারীদের সম্পর্কিত ধর্মের মৌলিক নির্দেশনা সম্পৃক্ত করে নারীজাতির মুক্তির লক্ষ্যে নতুন একটি ইস্যুর প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।

৮.২.১ নির্যাতীত নারীদের উপর প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে জরিপ, সাক্ষাৎকার গ্রহণ এবং প্রাপ্ত তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষন

গবেষণায় ৫০টি জেলা থেকে মোট ৬৪ জন নির্যাতিত নারীর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। নির্যাতীত এই নারীদের প্রদত্ত প্রশ্নপত্রের উত্তর পর্যালোচনায় দেখা যাচ্ছে এদের মধ্যে তিন জন এ্যাসিড আক্রান্ত নারী রয়েছেন। একজনের মাথা মুখমন্ডল, হাতে, আরেক জনের মাথায় এবং পিঠে আবার অন্য জনের গলা, কান, বুক, দুই হাত ও বগলের নিচে এ্যাসিড আক্রান্ত হয়েছে। সাত জন মানষিক নির্যাতনের শিকার। তন্মধ্যে একজন শারীরিক এবং মানষিক উভয় নির্যাতনের শিকার। ১৫ জন নারীর সাক্ষাৎকার প্রদানকালীন নির্যাতনের চিহ্ন মুছে গিয়েছে, কেউ চড়-থাপ্পড় খেয়েছেন দাগ পড়েনি। অবশিষ্ট ৩৯ জনের সকলেই বিভিন্ন ভাবে শারীরিক নির্যাতনের শিকার। তন্মধ্যে রয়েছে হাতে, কানে, মাথায় আঘাতের চিহ্ন, কেউ কেউ আঘাতের কারণে কানে কম শুনেন, চোখে কম দেখেন, পিঠে লাঠির আঘাতের দাগ, কাউকে গলায় কাপড় জড়িয়ে মেরে ফেলতে চেয়েছে, পা দিয়ে লাথি মেরেছে। রীতিমত মারধর করা, চুলের মুঠো ধরে টেনে ফেলে দেয়া, যৌতুকের দাবীতে মারপিট করা, ডান হাতের উপর, মাথায় আঘাতের চিহ্ন, হাতে লাঠির পেটার দাগ, দুই হাতের উপরে, হাঁটুর উরুর উপর মারের দাগ ইত্যাদি। তাদের চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা হয়নি। প্রশ্ন প্রত্রের শুরুতেই তারা নির্যাতনের এই চিত্র তুলে ধরেছেন।

অতঃপর অন্যান্য বিষয় সমূহের উপর তাদের নিকট থেকে প্রাপ্ত ফলাফল নিম্নে সারণী ৩৭ এ দেখানো হ’ল -

৬৪ জন নির্যাতিত নারীর গৃহীত সাক্ষাৎকার

সারণী-৩৭

আপনার শরীরে যে সব নির্যাতনের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে -তা কে করেছে?	আপনি কি মনে করেন, আপনাকে এ ধরণের নির্যাতনের অধিকার তার রয়েছে ?	ধর্ম নারীর অধিকার এবং মর্যাদার কথা বলে অত্যাচার /নির্যাতন নয় - তা আপনি জানেন কি ?	জেন্ডার ইস্যুর আওতায় যেখানে কার্যক্রম পরিচালিত হয় সেখানে কোন নালিশ করেছেন কি?	ধর্মে প্রদত্ত অধিকার এবং মর্যাদা প্রতিষ্ঠা হলে নারী নির্যাতন কমে যাবে এবং সমাজ ও পরিশুদ্ধ হবে?	আপনি কি জানেন নারীদের হালাল উপার্জনে কোন বাধা নেই।	আবার নির্যাতন কারী স্বামীর কাছে ফেরত যাবেন কি?	মন্তব্য
দেখা যায় স্বামী কর্তৃক ২৫ জন, স্বামী- শাশুড়ী- দেবর ননদ কর্তৃক ১১জন, স্বামী ও দেবর কর্তৃক ২ , শুধু মাত্র শাশুড়ী কর্তৃক ৩ জন, দেবর কর্তৃক ১ জন, স্বামী ও সতীন কর্তৃক ১ জন, স্বামী ও সতীন কর্তৃক ১ জন, বাবা কর্তৃক ২ জন, ভাই বোন কর্তৃক ১ জন, এসিড আক্রান্ত ৩ জনের মধ্যে ১ জন স্বামী এবং শ্বশুর, ২ জন পাড়া-প্রতিবেশী কর্তৃক আক্রান্ত হয়েছেন। আর ২ জন কার দ্বারা আক্রান্ত হয়েছেন সে সম্পর্কে কিছু বলেননি।	৬১ জন না সূচক আর ৩ জন হ্যাঁ সূচক উত্তর দিয়েছেন।	জানেন মর্মে বলেছেন ৫৬ জন আর জানেননা মর্মে বলেছেন ৮ জন ।	২৪ জন মামলা বা অভিযোগ করেছেন মর্মে বাকি ৪০ জন মামলা বা অভিযোগ করেনি মর্মে জানিয়েছেন।	৬৪ জন উত্তর দাতার সকলেই দু'টি বিষয়েই হ্যাঁ সূচক উত্তর দিয়েছেন।	জানেন মর্মে হ্যাঁ সূচক উত্তর দিয়েছেন ৫১ জন আর জানেননা মর্মে না সূচক উত্তর দিয়েছেন ১৩ জন।	এসিড আক্রান্ত ৩ জন সহ মারাত্মক আঘাত প্রাপ্ত আরও ৩১ জন মোট ৩৪ জন আর কখনও ফেরত যাবেননা মর্মে উল্লেখ করেছেন। ১৫ জন স্বামী তার কৃত কর্মের ভুল বুঝতে সক্ষম হলে,আর কখনও নির্যাতন না করলে ফেরত যেতে চান, ২জন সন্তানদের মুখের দিকে তাকিয়ে, ১১জন কোন শর্ত ছাড়াই মোট ১৩ জন স্বামীর সংসার করছেন।	মন্তব্য সমূহ নিম্নে পৃথক ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

নির্যাতিত নারীদের প্রদত্ত মতামত/মন্তব্য পর্যালোচনা।

দেখা যায় স্বামী কর্তৃক ২৫ জন, স্বামী- শাশুড়ী- দেবর ননদ কর্তৃক ১১জন, স্বামী ও দেবর কর্তৃক ২ জন , শুধু মাত্র শাশুড়ী কর্তৃক ৩ জন, দেবর কর্তৃক ১ জন, স্বামী ও সতীন কর্তৃক ১ জন, স্বামী ও সতীন কর্তৃক ১ জন, বাবা কর্তৃক ২ জন, ভাই বোন কর্তৃক ১ জন, এ্যাসিড আক্রান্ত ৩ জনের মধ্যে ১ জন স্বামী এবং শ্বশুর কর্তৃক, ২ জন পাড়া-প্রতিবেশী কর্তৃক আক্রান্ত হয়েছেন। আর ২ জন কার দ্বারা আক্রান্ত হয়েছেন সে সম্পর্কে কিছু বলেননি।

শারীরিক নির্যাতনের অধিকার তাদের স্বামীদের এবং অন্যদের আছে কি নেই মর্মে ৬১ জন 'না' সূচক আর ৩ জন 'হ্যাঁ' সূচক উত্তর দিয়েছেন।

ধর্ম নারীর অধিকার এবং মর্যাদার কথা বলে অত্যাচার /নির্যাতন নয় - এ বিষয়ে জানা আছে কি নেই মর্মে ৫৬ জন জানেন মর্মে এবং ৮ জন জানেননা মর্মে বলেছেন।

জেন্ডার সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম গ্রহণ করা যায় মর্মে কোন সুযোগ নিয়েছেন মর্মে ২৪ জন অভিযোগ বা মামলা করেছেন এবং ৪০ জন কিছু করেননি মর্মে জানিয়েছেন।

ধর্মে প্রদত্ত নারী জাতির অধিকার এবং মর্যাদা প্রতিষ্ঠা হলে নারী নির্যাতন কমে যাবে এবং সমাজ ও পরিশুদ্ধ হবে মর্মে ৬৪ জন উত্তর দাতার সকলেই এই বিষয়ে 'হ্যাঁ' সূচক উত্তর দিয়েছেন।

আবার নির্যাতনকারী স্বামীর কাছে ফেরত যাবেন কিনা প্রশ্নের জবাবে এ্যাসিড আক্রান্ত ৩ জন সহ মারাত্মক আঘাত প্রাপ্ত আরও ৩১ জন সহ মোট ৩৪ জন আর কখনও ফেরত যাবেননা মর্মে উল্লেখ করেছেন। ১৫ জন নারী স্বামী তার কৃত কর্মের ভুল বুঝতে সক্ষম হলে, আর কখনও নির্যাতন না করলে ফেরত যেতে চান, ২জন সন্তানদের মুখের দিকে তাকিয়ে কোন শর্ত ছাড়াই আরও ১১ জন সহ মোট ১৩ জন নির্যাতন স্বত্বেও স্বামীর সংসার করছেন। দেখা যায় নারীরা স্বামীকে নিয়ে সংসার করতে চায়। তারা সংসার ভাঙ্গতে মোটেও প্রস্তুত নয়। মূলতঃ স্বামীরাই ঘর ভাঙ্গতে সহায়তা করে।

প্রদত্ত সাক্ষাৎকার পর্যালোচনায় দেখা যাচ্ছে ধর্ম নরীজাতির প্রতি নির্যাতন নয় বরং নির্যাতনের বিরুদ্ধে এবং ধর্ম নারীর অধিকার এবং মর্যাদা প্রদান করে এই বিষয়ে সমাজের দরিদ্র শ্রেনীর নারীরাও ধারণা রাখেন। কেবল রাখেননা তাদের স্বামীরা। স্বামীরা ধর্মের বিষয়ে পরিষ্কার ধারণা গ্রহণ করতে সক্ষম হলে নারীদের নির্যাতনও করতেননা আর ঘরও ভাঙতো না। তাতে সন্তানেরা সুস্থ পরিবেশে বড় হতে পারতো এবং সত্যিকার অর্থে মানুষও হতো।

এবার সাক্ষাৎকারের ৮ম অনুচ্ছেদে প্রদত্ত নারীদের প্রদত্ত নিজস্ব কিছু মতামত নিম্নে তুলে ধরা হ'ল -

১. ধর্মীয় নেতারা নারীর প্রতি ইসলামে প্রদত্ত অধিকার এবং তাদের প্রতি আচরণের বিষয়গুলো সঠিক ভাবে ব্যাখ্যা করলে সমাজে নারীর অবস্থার পরিবর্তন ঘটবে।

২. নারী নির্যাতনের মূল কারণ যৌতুক, তাই আমি চাই যৌতুকের কারণে যাতে আর নির্যাতন না হয় সে বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়া হোক।

৩. যে কোন নির্যাতনের সঠিক বিচার হতে হবে। আইনের আওতায় অপরাধীকে সাজা দিতে হবে। মেয়েদের দেনমোহর বিয়ের সময় নিশ্চিত করতে হবে। বাল্য বিয়ের জন্য কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে।

৪.নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে এমন কিছু বিচার চাই যাতে আর কোনদিন, কখনও যেন , কোন পুরুষ নারীর উপর নির্যাতন না করে। এ সমাজে যেন নারীদের যথার্থ মূল্যায়ন দেওয়া হয়। তারা যেন নির্যাতিত না হয়।

৫. আমার ২পুত্র ২টা কন্যা। তারা ইউনিভার্সিটিতে পড়াশুনা করে। বাচ্চারা মা -বাবা দু'জনেরই সংগ পেতে চায়। তাই তাদের মানষিক শান্তি, সামাজিক মর্যাদা ও মান সম্মানের কথা ভেবে নির্যাতন সহ্য করে স্বামী-সন্তান সহ সংসার ধর্ম পালন করে যাচ্ছি।

৬. আমি অসহায় এবং নিরুপায়, কারণ আমার করার কিছুই নেই, আমাকে নিরুপায় হয়ে থাকতে হয়। সমাজের উঁচুতলার লোকেরা তাদেরকেই সহযোগিতা করে ।

৭. ২টি সন্তানের কারণে সহ্য করে স্বামীর সংসারে আছি। .. নিজে কর্ম করে জীবনযাপন করতেছি। খাওন খোরাক কিছুই দেয়না। মেয়ে ২টার দিকে তাকাই স্বামীকে বাদ দিতে পারিনা।

৮. সন্তানদের কারণে অনেক নির্যাতন সহ্য করেছি। নারী নির্যাতন বন্ধ হোক, নির্যাতনকারি পুরুষের শাস্তি চাই। আমিও মানুষ, মানুষ হয়ে কেন মানুষকে মারবে?

১০. আমি মনে করি সমাজের মেয়েরা যেন আর নির্যাতন মুখ বুঝে সহ্য না করে, তারা যেন আত্ম-স্বাবলম্বী হয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে।

১১. আমি স্বামীর সাথে সংসার করতে চাইনা। আমি আমার অবুঝ সন্তানদেরকে তার কাছ থেকে ফেরত চাই।

১২. আমি আমার ছেলে মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে স্বামীর নির্যাতন সহ্য করি। আমি এখন বাসা-বাড়িতে কাজ করে সংসার চালানোর চেষ্টা করি।

১৩. আমি নারী হলেও আমি তো মানুষ। আমি সম্মানের সাথে, অধিকারের সাথে বাঁচতে চাই এবং আমি এখন অনেক অসহায়, আপনাদের সাহায্য চাই।

১৪. আর কখনও স্বামীর কাছে ফেরত যেতে চাইনা । সে যাতে আমার সন্তানদের ভরণপোষণ দেয় সে ব্যবস্থা চাই। তার যথাযথ ব্যবস্থা চাই।

১৫. নির্যাতিত মেয়েরা কিভাবে নারী নির্যাতন থেকে মুক্তি পাবে, তার সুব্যবস্থা করতে হবে। আইনের সঠিক প্রয়োগ করতে হবে।

১৬.নারী নির্যাতন বন্ধ করা উচিৎ। নারীকে সম্মান করতে হবে। আমাদেরও বাঁচার অধিকার আছে।

বাংলাদেশের ৬৪ টি জেলার মধ্যে ৫০টি জেলা থেকে নারীদের নির্যাতনের তথ্য নেওয়া হয়েছে। এই তথ্য জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তাগণের মাধ্যমে পাওয়া গিয়েছে। তাতে প্রতীয়মান হচ্ছে যে আইন কানুন, বিধি-ব্যবস্থায় চালু থাকা অবস্থাতে, সে সব স্থানের সরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের কার্যক্রম চালু থাকা স্বত্বেও নারী নির্যাতন বন্ধ হচ্ছেনা।

সাক্ষাৎকার থেকে এটি প্রতীয়মান হচ্ছে যৌতুক, বাল্য বিবাহ, নারীদের সম্মান ও মর্যাদা দেওয়ার ধর্মীয় বিধিবিধান ইত্যাদি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পুরুষদের জানা থাকলে এ ধরণের নির্যাতন হতো না। সেজন্যই বিদ্যমান বিধিব্যবস্থার সাথে পুরুষদেরকে ধর্মের মৌলিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ হওয়া প্রয়োজন।

৮.২.২ ধর্মীয় ঈমাম, আলেম, মুহাদ্দেসগণের উপর প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে জরিপ, সাক্ষাৎকার গ্রহণ এবং প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ

বাংলাদেশের প্রতিটি জেলায় /উপজেলায় যথেষ্ট পরিমানে মসজিদ/মাদ্রাসা /মক্তব ইত্যাদি বিদ্যমান রয়েছে। ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক তাদেরকে প্রশিক্ষনও দেয়া হয়ে থাকে। সেখানে আইন-কানুন সহ ধর্মের মৌলিক বিষয়াদির সাথে মায়ের জাতি তথা স্ত্রীদের নির্যাতন না করার বিষয়াদিও রয়েছে। এবার ধর্মীয় ঈমাম সাহেবগণের সাক্ষাৎকারের উপর আলোকপাত করা হল। দেখা যাক এতদসম্পর্কে ধর্মীয় ঈমাম, আলেম, মুহাদ্দেসগণের অভিমত কি?

দেশের প্রত্যন্ত এলাকা থেকে ইসলামিক ফাউন্ডেশনে ঈমামগণ প্রশিক্ষন নেয়ার জন্য এসে থাকেন। বর্তমান গবেষণায় ইসলামিক ফাউন্ডেশনে প্রশিক্ষণরত প্রায় ৬০ জন ঈমাম এবং দেশের ৬৪টি জেলার জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তাগণের নিকট প্রশ্নপত্র পাঠিয়ে মোট ৫৫ জন ঈমাম সাহেবগণের নিকট প্রশ্নপত্র জরিপের মাধ্যমে মোট ১১৫ জন ঈমামগনের মতামত পাওয়া গিয়েছে।

উত্তর দাতাদের মধ্যে ঢাকার ৮ জন, মুন্সিগঞ্জের ২ জন, জামালপুরের ৩ জন, নেত্রকোনার ৫ জন, নারায়নগঞ্জের ২ জন, লক্ষীপুরের ২ জন, গাজীপুরের ৬ জন, শেরপুরের ২ জন, ময়মনসিংহের ১৪ জন, মানিকগঞ্জের ২ জন, চাঁদপুরের ১১ জন, গোপালগঞ্জের ২ জন, ভোলার ৩ জন, কুমিল্লা জেলার ২ জন, পাবনার ৩ জন, ফেনীর ৩ জন, নাটোরের ৬ জন , টাঙ্গাইলের ৭ জন, বান্দরবান পার্বত্য জেলার ৩ জন, নওগার ৩ জন, জয়পুরহারের ৩ জন, মেহেরপুরের ৩ জন, মৌলভী বাজারের ৩জন (তন্মধ্যে মাওঃ শেখ মোঃ বাহাউদ্দিন ২০০৭-২০০৮ অর্থবছরে ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমী ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক মৌলভী বাজার জেলার শ্রেষ্ঠ ইমাম হিসেবে সম্মানিত হয়েছিলেন) , বরগুনার ৩ জন, কক্সবাজারের ২ জন, ঝিনাইদহের ৩ জন।

আরও ৯ জন ইমাম সাহেব প্রশ্নের উত্তর পাঠিয়েছেন, তাঁরা তাদের নিজের এবং মসজিদের নাম উল্লেখ করলেও কোন জেলার নাম উল্লেখ করেননি। তথাপিও তাদের প্রদত্ত প্রশ্নোত্তর গবেষণার ক্ষেত্রে পর্যালোচনা করা হয়েছে।

নিম্নের ছকে তাঁদের থেকে প্রাপ্ত তথ্য তুলে ধরা হ'ল-

<u>১১৫ জন ধর্মীয় ঈমাম, আলেম, মুহাদ্দেসগণের নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে গৃহীত সাক্ষাৎকার</u>

<u>সারণী-৩৮</u>

বাংলা দেশে নারী জাতির মুক্তির লক্ষ্যে জেন্ডার ইস্যু ভিত্তিক নারী পুরুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে চলছে প্রচুর কার্যক্রম	জেন্ডার ইস্যু বাস্তবায়নের মাধ্যমে নারীদের সত্যিকার অর্থে মুক্তি ঘটেছে কি? নারীরা নির্যাতনের হাত থেকে মুক্তি পেয়েছে কি?	বিদায় হজ্বে মহানবীর (সঃ) কর্তৃক নারী ও পুরুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রদত্ত দিক নির্দেশনা তো পবিত্র কুরআনের সুরা বকারার ২২৮ নং আয়াতের সাথে সম্পৃক্ত।	মূলতঃ ধর্ম নয় ধর্মের নামে প্রচলিত অপব্যাখ্য এবং কুসংস্কার ই নারী নির্যাতনের হাতিয়ার ?	ধর্মের মৌলিক বিষয়াদি নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে এবং তা অনুসরণে সমাজ থেকে নারী নির্যাতন নির্মূল হবে সহজে।	মন্তব্য
৯৪ জন ঈমাম হ্যাঁ সূচক জবাব দিয়েছেন , ১৯ জন বাংলাদেশে জেন্ডার ইস্যু ভিত্তিক কার্যক্রম চলছে মর্মে একমত হলেও জেন্ডার ইস্যু নারী-পুরুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কার্যক্রম চালাচ্ছে এ মর্মে এক মত হননি , ১ জন ইমাম এ বিষয়ে মন্তব্য নেই বলেছেন, ১জন কুরআন এবং সুন্নাহর ভিত্তিতে কার্যক্রম পরিচালনাই যথেষ্ট বলেছেন।	১০৭ জন না সূচক উত্তর দিয়েছেন, ৬ জন হ্যাঁ সূচক উত্তর দিয়েছেন, ১ জন মন্তব্য নেই বলেছেন, ১জনএ বিষয়ে কোন মন্তব্যই দেননি ।	১০০ জন হ্যাঁ সূচক উত্তর দিয়েছেন, ১৪ জন না সূচক উত্তর দিয়েছেন এবং ১জন এ বিষয়ে কোন মন্তব্য করেননি।	৯৯ জন হ্যাঁ সূচক উত্তর দিয়েছেন। ১৩ জন না সূচক উত্তর দিয়েছেন, ৩ জন এই বিষয়ে কোন মন্তব্য করেননি ।	১০৮ জন হ্যাঁ সূচক উত্তর দিয়েছেন , ৪ জন না সূচক উত্তর দিয়েছেন এবং ৩ জন এ বিষয়ে কোন মন্তব্য করা থেকে বিরত থেকেছেন।	ঈমাম সাহেব গণের প্রদত্ত গুরুত্ব পূর্ণ কিছু মন্তব্য পরবর্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

ঈমাম সাহেব/ ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের প্রদত্ত মতামত/মন্তব্য পর্যালোচনা-

দেখা যাচ্ছে, ঈমাম সাহেবগণের অধিকাংশই জেন্ডার ইস্যু এবং নারী নির্যাতন সম্পর্কে ওয়াকেবহাল। বাংলা দেশে নারী জাতির মুক্তির লক্ষ্যে জেন্ডার ইস্যুভিত্তিক নারী পুরুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে চলছে প্রচুর কার্যক্রম এরূপ প্রশ্নের উত্তরে তাঁদের অধিকাংশই তথা ৯৪ জন ঈমাম হ্যাঁ সূচক জবাব দিয়েছেন, ১৯ জন বাংলাদেশে জেন্ডার ইস্যু ভিত্তিক কার্যক্রম চলছে মর্মে একমত হলেও জেন্ডার ইস্যু নারী-পুরুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কার্যক্রম চালাচ্ছে এ মর্মে এক মত হননি, ১ জন ইমাম এ বিষয়ে মন্তব্য নেই বলেছেন, ১জন কুরআন এবং সুন্নাহর ভিত্তিতে কার্যক্রম পরিচালনাই যথেষ্ট বলেছেন।

জেন্ডার ইস্যু বাস্তবায়নের মাধ্যমে নারীদের সত্যিকার অর্থে মুক্তি ঘটেছে কি? নারীরা নির্যাতনের হাত থেকে মুক্তি পেয়েছে কি? এ প্রশ্নের জবাবে ১০৭ জন ‘না’ সূচক উত্তর দিয়েছেন, ৬ জন ‘হ্যাঁ’ সূচক উত্তর দিয়েছেন, ১ জন মন্তব্য নেই বলেছেন, ১জন এ বিষয়ে কোন মন্তব্যই দেননি ।

বিদায় হজ্বে মহানবীর (সঃ) কর্তৃক নারী ও পুরুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রদত্ত দিক নির্দেশনা তো পবিত্র কুরআনের সুরা বকারার ২২৮ নং আয়াতের সাথে সম্পৃক্ত। এ বিষয়ে ১০০ জন ‘হ্যাঁ’ সূচক উত্তর দিয়েছেন, ১৪ জন ‘না’ সূচক উত্তর দিয়েছেন এবং ১জন এ বিষয়ে কোন মন্তব্য করেননি।

মূলতঃ ধর্ম নয় ধর্মের নামে প্রচলিত অপব্যাখ্য এবং কুসংস্কার ই নারী নির্যাতনের হাতিয়ার মর্মে অধিকাংশ ঈমাম তথা ১১৫ জনের মধ্যে ৯৯ জনই ‘হ্যাঁ’ সূচক উত্তর দিয়েছেন।

ধর্মের মৌলিক বিষয়াদি নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে এবং তা অনুসরণে সমাজ থেকে নারী নির্যাতন নির্মূল হবে সহজে, মর্মে প্রশ্নের জবাবে ১১৫জনের মধ্যে ১০৮ জনই ‘হ্যাঁ’ সূচক উত্তর দিয়েছেন।

সাক্ষাৎকার প্রদানকারী ঈমাম সাহেবগণ পবিত্র কুরআন এবং হাদিস যে নারীর অধিকার ও মর্যাদা সংরক্ষনের কথা বলে সে বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান রাখেন। আর সেজন্যই সাক্ষাৎকার প্রদানকারী ঈমাম সাহেবগণের অধিকাংশই নির্যাতনের হাত থেকে নারীদের মুক্তির বিরুদ্ধে নন বরং ইসলাম ধর্ম যে, নারীদের সম্মান ও মর্যাদা প্রদান করেছে এই বিষয়ে তাঁরা সচেতন। অর্থাৎ বর্তমান গবেষণায় যে বিষয়টি তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে তা হলো ধর্ম নয় বরং ধর্মের নামে অপব্যাখ্যা এবং কুসংস্কারই নারী নির্যাতনের সহায়ক সে বিষয়ে সাক্ষাৎকার প্রদানকারী ধর্মীয় ঈমামগণের অধিকাংশের কাছ থেকেই ‘হ্যাঁ’ সূচক উত্তর পাওয়া গিয়েছে।

প্রদত্ত সাক্ষাৎকারে তাঁদের প্রদত্ত নিজস্ব মতামতের মধ্যে কেহ নারীদের পর্দাপুষিদা তথা শালীনতার কথা বলেছেন এবং ধর্মের বিধান অনুসারে নারী যে সমান অধিকারের চেয়েও বেশী কিছু পাওয়ার অধিকার রাখে তা স্পষ্ট করেছেন। যেহেতু ইসলাম ধর্মে নারীর অধিকার এবং মর্যাদা সুস্পষ্ট তাই জেন্ডার ইস্যুতে ইসলামী বিধান ব্যবহারে কোন আপত্তি নেই মর্মেও কেহ কেহ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। সাক্ষাৎকার গ্রহণকালে তাঁদের প্রদত্ত বেশ কিছু নিজস্ব মতামত নিম্নরূপ-

১. সারা বিশ্বব্যাপী নারীর অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যে আন্দোলন চলছে তা আরো বেগবান হওয়া দরকার।

২. মুসলিম নারীকে ইসলামের মূলনীতির আলোকে তাদের অধিকার সুনিশ্চিত করে মুসলিম জাতির সার্বিক উন্নয়নে অবদান রাখতে দেয়া সময়ের একমাত্র দাবী।

৩. ধর্মকে ব্যবহার করে নারী নির্যাতন সম্ভব নয়। এ জন্য ‘নারী অপরাধ ও ইসলাম’ সম্পর্কে ধারণা থাকলেই এমন প্রশ্নের বিষয় আর থাকবেনা।

৪. ইসলাম পূর্ব যুগে নারীর কোন অধিকারই ছিলনা। সেখানে নারী ছিল ভোগ্যসামগ্রী। এমনকি নারীকে তখন জীবন্ত প্রোথিত করা হত। একমাত্র ইসলামই নারী নির্যাতন বন্ধের পাশাপাশি নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে। তাই ধর্মের মৌলিক বিষয়ের আলোকে নারী মুক্তি সম্ভব তা জনসভায় তুলে ধরা আবশ্যক।

৫. দেন মোহর নগদ পরিশোধ করার বাধ্যতামূলক আইন প্রণয়ন করা প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে নারীরা প্রতারিত হচ্ছে। যৌতুক প্রতিরোধে আইন প্রণয়ন প্রয়োজন।

৬. পুরুষের অনৈতিক ভোগ থেকে রক্ষা পাওয়া নারীর অন্যতম অধিকার । এই অধিকার প্রতিষ্ঠায় নারীর জন্য সম্মানজনক আলাদা কর্মক্ষেত্র, আলাদা শিক্ষাকেন্দ্র, আলাদা পরীক্ষাকেন্দ্র ও আলাদা পরিবহন সার্ভিসের ব্যবস্থা করা আবশ্যক - যেখানে কোন পুরুষ লোকের প্রবেশাধিকার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ থাকবে।

৭. ব্যক্তিগত জীবন, সামাজিক জীবন ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রেই ইসলাম পূর্নাঙ্গ অনুসরণের মাধ্যমেই কেবল সম্ভব নারী মুক্তি ও নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা। সরকারীভাবে এ ব্যাপারে সত্যিকারের উদ্যোগ গ্রহণ করা গেলে সুফল পাওয়া সহজ হবে।

৮. কুরআন এর আলোকে নারী - পুরুষের যে অধিকারের কথা লেখা আছে সেটি সঠিক ভাবে মানলে নারী মুক্তি আসবে। ধর্মীয় কুসংস্কার ব্যবহার করা যাবেনা।

৯. ইসলাম সর্ব যুগের সকল মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে। ঠিক নারীদের ক্ষেত্রে ইসলাম তাদের যথাযথ মর্যাদা দিয়েছে। কেবল ইসলামী অনুশাসন মেনে চললে তাদের পূর্ণাঙ্গ যথাযথ মর্যাদা প্রতিষ্ঠা হবে।

১০. ইসলাম নারী-অধিকার প্রতিষ্ঠায় অবদান রেখেছে। ইসলাম নারীদেরকে সম্পদের অধিকার দিয়েছে। ইসলাম পর্দা প্রথার মাধ্যমে নারীদেরকে সম্মান করেছে। নারী শিক্ষায় ইসলাম অগ্রাধিকার প্রদান করেছে। ইসলাম নারীকে তার ন্যায্য অধিকার প্রদান করেছে।

১১. রাষ্ট্রীয় ভাবে ইসলামের বিষয়াদি প্রয়োগের মাধ্যমে নারী মুক্তির সম্ভব হবে। আমাদের সমাজে যদি ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান থাকত তাহলে নারী নির্যাতন দূর করা সহজ হত। কুরআন এবং রাসুল(সাঃ) এর হাদিস সম্পর্কে সঠিক ধারণা থাকা প্রয়োজন।

১২. নারী নির্যাতন রোধ ও নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলামী জীবন ব্যবস্থা আবশ্যক। ইসলামী জীবনব্যবস্থা পূর্ণাঙ্গ ভাবে বাস্তবায়িত হলে নারীরা তাদের অধিকার পুরোপুরিভাবে ফিরে পাবে। নারী নির্যাতন রোধ ও নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আলকুরআন ও হাদিসের আইন অনুসরণ এবং বাস্তবায়ন আবশ্যক।

১৩. নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় ইসলামী জীবন ব্যবস্থা বাধা নয়, বরং সহায়ক। সকল ক্ষেত্রে নারীর মর্যাদা ধর্মের দৃষ্টিকোন থেকে অগ্রাধিকার দেওয়া জরুরী। নারী নির্যাতন প্রতিরোধের জন্য ধর্মীয় মূল্যবোধকে প্রাধান্য দেওয়া উচিৎ।

১৪. নারীর মর্যাদা ও ধর্ম কর্তৃক প্রদত্ত অধিকার সর্বত্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে নারী জাতিকেই অগ্রণী ভূমিকা রাখতে হবে এবং নাম সর্বস্ব আত্ম-চিৎকার ও আত্ম -প্রদর্শনের সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে আসতে হবে।

১৫. ইসলামে নারীর যে অধিকার দিয়েছে, যে সম্মান ও মর্যাদা দিয়েছে, পৃথিবীতে আর কোন ধর্মে নারীর এত অধিকার, সম্মান ও মর্যাদা দেয় নাই। অথচ সমান অধিকারের নামে তাদেরকে তাদের প্রকৃত অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে।

১৬. 'নারী পুরুষের সমান অধিকার' কথাটি সুচিন্তিত নয়, বলা যেতে পারে 'নারী - পুরুষের প্রাপ্য/উপযুক্ত অধিকার'। নারী- পুরুষের শারীরিকও মানষিক অবস্থাতো সমান নয়, উভয়ের প্রয়োজনও সমান নয়। তাই অধিকার সমান বললে অনেক ক্ষেত্রে নারী সীমাহীন সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে। যেমন নারীর মাতৃত্ব কালীন ছুটির প্রয়োজন হয়। ছুটির ক্ষেত্রে তাকে পুরুষের সমান করা হলে সে নিদারুণ সমস্যায় পড়বে। সুতরাং তার জন্য উপযুক্ত ছুটিটাই সে ভোগ করবে। এটাই তার অধিকার।

১৭. ইসলামে বা ইসলাম ধর্মে নারীর অধিকার ও নারীর মর্যাদা সুস্পষ্ট। তাই জেন্ডার ইস্যুতে ইসলামী বিধান ব্যবহৃত হলে কোন আপত্তি নেই।

অর্থাৎ ইসলাম ধর্মে নারীর অধিকার ও মর্যাদার যে বিষয়টি রয়েছে সে বিষয়ে ইমাম সাহেবগণ ঐক্যমত্য পোষণ করেছেন। তাঁদের প্রদত্ত প্রশ্নোত্তরে এবং নিজস্ব মতামত প্রদানের ক্ষেত্রে ইসলাম ধর্মে যে নারীর অধিকারও মর্যাদার বিষয়ে স্পষ্ট বিধান রয়েছে এ বিষয়ে তাদের মধ্যে বিশেষ কোন দ্বিমত দেখা যায়নি।

উপরে উল্লেখিত ১৫ এবং ১৬ নং ক্রমিকে প্রদত্ত ইমাম সাহেবগণ যে মতামত প্রদান করেছেন, তা পুনরায় উল্লেখ করা হ'লা - " ইসলামে নারীর যে অধিকার দিয়েছে, যে সম্মান ও মর্যাদা দিয়েছে, পৃথিবীতে আর কোন ধর্মে নারীর এত অধিকার, সম্মান ও মর্যাদা দেয় নাই। অথচ সমান অধিকারের নামে তাদেরকে তাদের প্রকৃত অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে" এবং ''নারী পুরুষের সমান অধিকার'' কথাটি সুচিন্তিত নয়, বলা যেতে পারে 'নারী - পুরুষের প্রাপ্য/উপযুক্ত অধিকার'। নারী- পুরুষের শারীরিকও মানষিক অবস্থাতো সমান নয়, উভয়ের প্রয়োজনও সমান নয়। তাই অধিকার সমান বললে অনেক ক্ষেত্রে নারী সীমাহীন সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে। যেমন নারীর মাতৃত্ব কালীন ছুটির প্রয়োজন হয়। ছুটির ক্ষেত্রে তাকে পুরুষের সমান করা হলে সে নিদারুণ সমস্যায় পড়বে। সুতরাং তার জন্য উপযুক্ত ছুটিটাই সে ভোগ করবে। এটাই তার অধিকার।

সামান্য কয়েকজনের সামান্য কিছু দ্বিমত ব্যতিরেকে অধিকাংশ ঈমাম সাহেবগণের মতামত মূলতঃ বর্তমান গবেষণার মূল বিষয়বস্তুর সাথে এক ও অভিন্ন হয়েছে।

৮.২.৩ <u>সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বগণের সাথে আলোচনা তাদের উপর প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে জরিপ, সাক্ষাৎকার গ্রহণ এবং প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ</u>

বর্তমান গবেষণায় সামাজিক এলিট এবং মানবাধিকার কর্মীদের নিয়ে মোট ১০ জন নেতৃস্থানীয় নারী নেতৃবৃন্দের সাথে গবেষণার বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা হয়েছে। আর বাংলাদেশ লেখিকা সংঘের প্রায় ৯ জন বিশিষ্ট লেখিকা, ১১জন আইনজীবি, ১৩ জন এনজিও কর্মী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫ জন শিক্ষার্থী, ১ জন কলেজ শিক্ষার্থী, ১ জন ইউপি চেয়ারম্যান সহ মোট ৫০ জন ব্যক্তিত্বের সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে তাদের মতামত গ্রহণ করা হয়েছে।

বেশ কিছু নারী নেতৃবৃন্দ কোন লিখিত মন্তব্য দিতে রাজি হননি। তাঁরা মোখিক ভাবে কিছু বক্তব্য দিয়েছেন। তাঁদের ক্ষোভ প্রকাশ হয়েছে ধর্মীয় আলেমগণের উপর। তাঁদের বক্তব্য হলো ধর্মীয় আলেমগন নারীদের বিরুদ্ধাচরণ করে ওয়াজ নসিহত করে থাকেন, তাঁরা যে অভিমত ব্যক্ত করেন তার থেকে বোঝা যায় যে, ধর্মে নারীকে কোন মর্যাদা প্রদান করা তো হয়ই না অধিকন্তু তাঁরা নারীদের বন্দী জীবন যাপন করাতে চান। তাঁরা নারী শিক্ষা হারাম বলেন এবং নারীদের উপার্জনে আসতে বাধার সৃষ্টি করেন। একদিকে নারীদের আয় উপার্জনে আসতে বাধার সৃষ্টি করা হয় অন্যদিকে উপার্জন হীন, দরিদ্র পিতামাতার কন্যাদের কাছে যৌতুক দাবী করা হয়, না দেওয়া হলে মারধর করা হয়, আবার মেরেও ফেলা হয়। এ জন্য ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের পক্ষ থেকে কোন প্রতিবাদ দেখা যায়না, তাঁরা এসবের কোনরূপ বিরুদ্ধাচরণও করেননা। দেশের বড়বড় আলেমগণ এ সবের কোন প্রতিবাদও করেননা। যদি যৌতুক ইসলামে না থাকবে তবে তারা এর বিরুদ্ধাচরণ করেন না কেন? - এই প্রশ্ন তাঁদের।

তথাপিও তাঁদের অভিমত হলো, যদি ইসলামে নারীর মর্যাদার কথা বলে, নারীর যৌতুকের বিরুদ্ধে বলে, নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে বলে, নারীর অধিকারের কথা বলে তবে সে সম্পর্কে লেখা/লেখি হউক, দেখা যাবে তখন অবস্থা কি হয়? তাঁদের আরও কয়েকটি সুনির্দিষ্ট বক্তব্য হলো - দেশ জুড়ে জেন্ডার ভিত্তিক বিস্তর কার্যক্রম চলছে এবং নারীদের অবস্থারও বেশ কিছু অগ্রগতি হয়েছে। তবে ধর্মীয় অপব্যাখ্যার কারণেই নারী নির্যাতন বন্ধ করা যাচ্ছেনা, যদিও সরকারী এবং বেসরকারী উদ্যোগ / প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

আর লেখিকা সংঘের ৯ জন লেখিকা এবং উপরে উল্লেখিত অন্যান্য ৩১ জন সহ মোট ৪০ জন লিখিত প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে যে সুস্পষ্ট বক্তব্য প্রদান করেছেন তা নিম্নের ছকে তুলে ধরা হ’ল -

<u>লেখিকা সংঘ সহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মোট ৪০ জনের গৃহিত সাক্ষাৎকার</u>

<u>সারণী-৩৯</u>

জেন্ডার ইস্যু নারী পুরুষের সমান অধিকার নিশ্চিত করার যে কথা বলে- সে লক্ষ্যে বাংলাদেশে গৃহীত হচ্ছে প্রচুর উদ্যোগ	নারী মুক্তির লক্ষ্যে গৃহীত প্রচুর কার্যক্রম স্বত্ত্বেও বাংলাদেশে সত্যিকার অর্থে নারী-মুক্তি ঘটেছে কি এবং নারীরা নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে কি?	বেইজিংএ অনুষ্ঠিত ৪র্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনে হিলারী ক্লিনটন নারীর মর্যাদার যে দাবী করেছেন নারীর সেই মর্যাদা নির্ধারনের লক্ষ্যে জেন্ডার ইস্যু কোন দিক নির্দেশনা স্থির করেছে কি?	নারী নির্যাতনের ক্ষেত্রে ধর্মের মৌলিক বিষয় নয় বরং ব্যবহৃত হচ্ছে ধর্মে অনুপ্রবেশ করা কুসংস্কার।	পবিত্র কুরআন নারীর প্রতি পুরুষের দায়িত্ব কর্তব্য এবং নিরাপত্তা প্রদানের বিষয়টি বাধ্যতা মূলক রেখে ‘নারী-পুরুষের’ অন্যান্য ভূমিকাকে সমান করে - নারীর মাতৃত্বের ভূমিকার সাথে পুরুষের জন্য নির্ধারিত এই ভূমিকা অনবদ্য এবং যথার্থ কিনা?	ধর্মে নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে এবং নারীর অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা রয়েছে বিধায় জেন্ডার ইস্যু এই বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে কার্যক্রম গ্রহন করতে পারে কিনা?	মন্তব্য

এ বিষয়ে লেখিকা সংঘের ৯ জনের সকলে একমত পোষণ করেছেন, ১১জন আইনজীবির মধ্যে ৯ জন হ্যাঁ সূচক আর, ২ জন না সূচক জবাব দিয়েছেন, ১৩ জন বিশিষ্ট এনজিও কমী গণের মধ্যে ১২ জন হ্যাঁ সূচক উত্তর দিয়েছেন, ১ জন না সূচক উত্তর দিয়েছেন, ১ জন ইউপি চেয়ারম্যান এই বিষয়ে হ্যাঁ সূচক উত্তর দিয়েছেন, ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়ের ৫ জন এবং বেসরকারী কলেজের ১ জন শিক্ষার্থী জেন্ডার ইস্যুর উপর তাদের তেমন ধারণা নেই মর্মে জানিয়েছেন ।	নির্যাতনের হাত থেকে নারীরা মুক্তি পায়নি তবে প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে মর্মে লেখিকা সংঘের ৯ জনের সকলে একমত পোষণ করেছেন, ১১জন আইনজীবির মধ্যে ১০ জন না সূচক আর, ১ জন হ্যাঁ সূচক উত্তর দিয়েছেন, এই বিষয়ে ১৩ জন এনজিও কর্মীর মধ্যে ১১ জন না সূচক উত্তর প্রদান করেন আর কেবলমাত্র ১জন উত্তর প্রদান থেকে বিরত থাকেন , ১ জন 'মুক্তি শব্দটি স্পষ্ট করা দরকার' মর্মে মন্তব্য প্রদান করেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫ জন এবং বেসরকারী কলেজের ১ জন শিক্ষার্থী যে অর্থে নারী মুক্তি হওয়া প্রয়োজন তা হয়নি মর্মে জানিয়েছেন, ১ জন ইউপি চেয়ারম্যান নারীদের সুযোগ সুবিধা কিছুটা বৃদ্ধি পেলেও নির্যাতন থেকে মুক্তি পায়নি বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।	এ বিষয়ে লেখিকা সংঘের ৯ জনের সকলে না সূচক উত্তর প্রদান করেছেন, আইনজীবিদের মধ্যে ৭ জন না সূচক উত্তর প্রদান করেন আর ৩ জন হ্যাঁ সূচক উত্তর প্রদান করেন, ১ জন এই বিষয়ে কোন উত্তর প্রদান করা থেকে বিরত থাকেন, এই বিষয়ে ১৩ জন বিশিষ্ট এনজিও কমী গণের মধ্যে ৭ জন না সূচক উত্তর প্রদান করেন আর ৫জন হ্যাঁ সূচক উত্তর প্রদান করেন, ১ জন এই বিষয়টি 'জানা নেই' মর্মে মন্তব্য প্রদান করেন, ১ জন ইউপি চেয়ারম্যান এই বিষয়ে না সূচক উত্তর দিয়েছেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫ জন এবং বেসরকারী কলেজের ১ জন শিক্ষার্থী এই বিষয়েও তাদের তেমন ধারণা নেই মর্মে জানিয়েছেন।	এ বিষয়ে লেখিকা সংঘের ৯ জনের সকলে একমত পোষণ করেছেন, ১১জন আইনজীবির সকলেই হ্যাঁ সূচক উত্তর দিয়েছেন, ১৩ জন বিশিষ্ট এনজিও কমী গণের মধ্যে উত্তর দাতার সকলেই হ্যাঁ সূচক উত্তর প্রদান করেন, ১ জন ইউপি চেয়ারম্যান এই বিষয়ে হ্যাঁ সূচক উত্তর দিয়েছেন ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়ের ৫ জন এবং বেসরকারী কলেজের ১ জন মোট ৬ জন শিক্ষার্থীই এই বিষযৈ হ্যাঁ সূচক উত্তর দিয়েছেন	এ বিষয়ে লেখিকা সংঘের ৯ জনের সকলে একমত পোষণ করেছেন, এই বিষয়ে ৭ জন আইনজীবি হ্যাঁ সূচক উত্তর প্রদান করেন আর ৩ জন আইনজীবি নাা সূচক উত্তর প্রদান করেন, ১ জন কোন মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকেন, ১৩ জন বিশিষ্ট এনজিও কমীগণের মধ্যে এই বিষয়ে ৭ জন হ্যাঁ সূচক উত্তর প্রদান করেন আর ৫ জন নাা সূচক উত্তর প্রদান করেন আর ১ জন 'বুঝিনি' বলে মন্তব্য প্রদান করেন, ১ জন ইউপি চেয়ারম্যান হ্যাঁ সূচক উত্তর দিয়েছেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫ জন এবং বেসরকারী কলেজের ১ জন শিক্ষার্থী হ্যাঁ সূচক উত্তর প্রদান করেন।	এ বিষয়ে লেখিকা সংঘের ৯ জনের সকলে একমত পোষণ করেছেন, ১১ জন আইনজীবির সকলেই হ্যাঁ সূচক উত্তর প্রদান করেন, ১৩ জন বিশিষ্ট এনজিও কমীর মধ্যে ১২ জন উত্তর দাতা হ্যাঁ সূচক উত্তর প্রদান করেন, ১ জন প্রদান করেন না সূচক উত্তর। ১ জন ইউপি চেয়ারম্যান এই বিষয়ে হ্যাঁ সূচক উত্তর দিয়েছেন, ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়ের ৫ জন এবং বেসরকারী কলেজের ১ জন শিক্ষার্থী এই বিষয়ে একমত পোষণ করেছেন।	সাক্ষাৎকার প্রদানকারী বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব গণের প্রদত্ত গুরুত্ব পূর্ণ কিছু মন্তব্য নিম্নে পৃথক ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বগণের প্রদত্ত মতামত/মন্তব্য পর্যালোচনা-

উপরে সাক্ষাৎকার প্রদানকারীদের মধ্যে বাংলাদেশ লেখিকা সংঘের প্রতিনিধিগন যারা তাঁদের হাতের শক্ত লেখনীর মাধ্যমে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নারী মুক্তির কথা বলেন, বর্তমানে গৃহীত সাক্ষাৎকারেও তাঁদের সেই অভিমতই ব্যক্ত হয়েছে। তাঁরা জেন্ডার ইস্যু যে নারী পুরুষের সমান অধিকার নিশ্চিত করার কথা বলে এবং সে প্রেক্ষিতে বাংলাদেশে গৃহীত হচ্ছে প্রচুর উদ্যোগ এ বিষয়ে একমত পোষণ করেন, তবে বেইজিংএ অনুষ্ঠিত ৪র্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনে হিলারী ক্লিনটন নারীর মর্যাদার যে দাবী করেছেন নারীর সেই মর্যাদা নির্ধারনের লক্ষ্যে জেন্ডার ইস্যু কোন দিক নির্দেশনা স্থির করেছে কিনা এই বিষয়ে তাঁরা 'না' সূচক উত্তরই দিয়েছেন। আবার নারী নির্যাতনের ক্ষেত্রে ধর্মের মৌলিক বিষয় নয় বরং ব্যবহৃত হচ্ছে ধর্মে অনুপ্রবেশ করা কুসংস্কার, পবিত্র কুরআন নারীর প্রতি পুরুষের দায়িত্ব কর্তব্য এবং নিরাপত্তা প্রদানের বিষয়টি বাধ্যতা মূলক রেখে 'নারী-পুরুষের' অন্যান্য ভূমিকাকে সমান করে - নারীর মাতৃত্বের ভূমিকার সাথে পুরুষের জন্য নির্ধারিত এই ভূমিকা অনবদ্য এবং যথার্থ এবং ধর্মে নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে এবং নারীর অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা দিয়েছে বিধায় জেন্ডার ইস্যু এই বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে কার্যক্রম গ্রহন করতে পারে - এই বিষয়গুলোর সাথে তাঁরা একমত পোষণ করেছেন।

তাঁরা কিছু মৌখিক অভিমতও ব্যক্ত করে বলেন , জেন্ডার ইস্যু হউক আর আইন কানুনই হউক ধর্মের সঠিক নির্দেশনা উদ্ভাবন করা না গেলে নারী মুক্তি সম্ভব নয়। বাস্তবে ধর্ম অবহেলিত এবং বিকৃত হওয়ার কারণেই এত অধিক পরিমানে নারী নির্যাতন চলছে। তাঁরা ধর্মে নারী জাতির সঠিক অবস্থান নির্ধারন এবং নারী জাতির সম্মান ও মর্যাদা বাস্তবায়নের পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেন। তাঁদের মধ্যে একজন জোরালো ভাবে অভিমত ব্যক্ত করেন এই মর্মে যে, "বাংলাদেশে নারী নির্যাতন চলছেই। নারীকে মানুষ হিসেবে মর্যাদা দান যুক্তিযুক্ত। .. .. ধর্মে নারীকে অনেক উচ্চ আসন দিয়েছে। কিন্তু পুরুষ নারীকে তার আপন মর্যাদা দিতে পারেনি। নারীর প্রতি বৈষম্য নয় - ভালবাসা চাই, সহমর্মীতা চাই"।

বিজ্ঞ আইনজীবিগণের যাঁরা নির্যাতিত নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আদালতে মামলা পরিচালনা করে থাকেন তাঁদের সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায়, নারী নির্যাতনের ক্ষেত্রে ধর্মের নামে ব্যবহৃত হচ্ছে ধর্মে অনুপ্রবেশ করা কুসংস্কার/অপব্যাখ্যা -এ ই বিষয়ে ১১ জন আইনজীবির সকলেই 'হ্যাঁ' সূচক উত্তর প্রদান করেন। আবার ধর্মের মৌলিক বিষয়ে যদি নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে এবং নারীর অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা থেকে থাকে সে বিষয়ে জেন্ডার ইস্যু ও কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারে কিনা এই বিষয়ে ১১ জন আইনজীবির সকলেই 'হ্যাঁ' সূচক উত্তর প্রদান করেন।

বিজ্ঞ আইনজীবিগণের মধ্য থেকে তেমন কোন ব্যক্তিগত মতামত পাওয়া যায়নি। কেবল মাত্র একজন গুরুত্বের সাথে নিজস্ব মন্তব্য হিসেবে উল্লেখ করেন যে, ধর্মকে পুজি করে, ব্যবহার করে নিজস্ব মনগড়া নীতি যেন নারীর উপর প্রয়োগ না হয় সে দিকে সকল নারীকে স্বোচ্চার হতে হবে। সাক্ষাৎকারে প্রদত্ত মতামত এবং গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য থেকে এটি প্রমাণিত যে আইনজীবিগণেরও এই অভিমত যে, নারী মুক্তির ক্ষেত্রে প্রয়োজন ধর্মের কুসংস্কার থেকে মুক্তি এবং ধর্মের মৌলিক বিষয়াদি বাস্তবায়ন।

এনজিও কর্মীগণের যাঁরা নির্যাতিত নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকেন তাঁদের সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায়, নারী নির্যাতনের ক্ষেত্রে ধর্মের নামে ব্যবহৃত হচ্ছে ধর্মে অনুপ্রবেশ করা কুসংস্কার/অপব্যাখ্যা - এ ই বিষয়ে ১৩ জন উত্তরদাতার সকলেই 'হ্যাঁ' সূচক উত্তর প্রদান করেন। আবার ধর্মের মৌলিক বিষয়ে যদি নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে এবং নারীর অধিকার

ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা থেকে থাকে সে বিষয়ে জেন্ডার ইস্যু ও কার্যক্রম গ্রহন করতে পারে কিনা এই বিষয়ে ১২ জন এনজিও কর্মী 'হ্যাঁ' সূচক উত্তর প্রদান করেন ১ জন 'না' সূচক উত্তর প্রদান করেন। কয়েকজন অতিরিক্ত মতামত হিসেবে গুরুত্ব পূর্ণ যে অভিমতও ব্যক্ত করেছেন, তা হ'ল -

১. নারীর অধিকার ও মর্যাদার ক্ষেত্রে ধর্মের মৌলিক দিক নির্দেশনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এই নির্দেশনা যদি ধর্ম ভেদে ভিন্ন হয় তা হলে তা কিন্তু ভিন্ন ধর্মের নারীর জন্য ভিন্ন ভিন্ন হবে, তাই যে যে ধর্মের অনুসরণকারীরা তাদের ধর্মকে সম্মান করবে অবশ্যই কিন্তু নারীর অধিকার ও মর্যাদার বিষয়ে দিক নির্দেশনা শুধু রাষ্ট্রীয় ভাবে নয় বরং আন্তর্জাতিক ভাবে সার্বজনীন হওয়া উচিত। তা হলে তা অধিক গ্রহণযোগ্য হবে।

২. জেন্ডার - বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে অকার্যকর এবং অস্পষ্ট ধারনার উপর কার্যক্রম চলছে। যেখানে নারী অধিকারের ক্ষেত্রগুলো আরো কঠিন হয়ে উঠছে। এর চেয়ে ধর্মীয় অনুশাসন নারী উন্নয়নের ফ্রেমওয়ার্কে কোন কার্যক্রম গ্রহণে তা ফলপ্রসু হতে পারে।

এনজিওকর্মীগণের সাক্ষাৎকারের মতামত এবং গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য থেকে এটি প্রমাণিত যে, নারী মুক্তির ক্ষেত্রে প্রয়োজন ধর্মের কুসংস্কার থেকে মুক্তি এবং ধর্মের মৌলিক বিষয়াদি বাস্তবায়ন।

৮.২.৪ সরকারী উর্দ্ধতন কর্মকর্তাগণের উপর প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে সাক্ষাৎকার গ্রহণ এবং প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ

সাংস্কৃতিক মন্ত্রনালয়ের সচিব সহ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয়, সমাজকল্যান মন্ত্রনালয় সমূহের কয়েকজন অতিরিক্ত সচিব, যুগ্মসচিব, উপসচিব সহ আরও কয়েকজন কর্মকর্তা কর্মচারীগণের, নারী নির্যাতন প্রতিরোধ কল্পে মাল্টিসেক্টরাল পোগ্রামের প্রকল্প পরিচালক সহ কয়েকজন কর্মকর্তার, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের এবং জাতীয় মহিলা সংস্থায় কর্মরত কর্মকর্তা গণ সহ মোট ২৫ জনের গৃহীত সাক্ষাৎকার নিম্নে দেখানো হ'ল-

২৫ জন সরকারী উর্দ্ধতন কর্মকর্তার গৃহিত সাক্ষাৎকার

সারণী-৪০

জেন্ডার ইস্যু নারী পুরুষের সমান অধিকার নিশ্চিত করার কথা বলে। সে লক্ষ্যে বাংলাদেশে গৃহীত হচ্ছে প্রচুর উদ্যোগ।	জেন্ডার ইস্যুর ভিত্তিতে প্রচুর কার্যক্রম স্বত্ত্বে ও বাংলাদেশে সত্যিকার অর্থে নারী- মুক্তি ঘটেছে কি এবং নারীরা নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে কি?	বেইজিংএ অনুষ্ঠিত ৪র্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনে হিলারী ক্লিনটন নারীর মর্যাদার যে দাবী করেছেন নারীর সেই মর্যাদা নির্ধারনের লক্ষ্যে জেন্ডার ইস্যু কোন দিক নির্দেশনা স্থির করেছে কি?	নারী নির্যাতনের ক্ষেত্রে ধর্মকে ব্যবহার করা হচ্ছে যুগ যুগ ধরে, এ ক্ষেত্রে ধর্মের মৌলিক বিষয় নয় বরং ব্যবহৃত হচ্ছে ধর্মে অনুপ্রবেশ করা কুসংস্কার।	পবিত্র কুরআন নারীর প্রতি পুরুষের দায়িত্ব কর্তব্য এবং নিরাপত্তা বিষয়াদি বাধ্যতামূলক ভাবে সম্পৃক্ত রেখে 'নারী-পুরুষের' অন্যান্য ভূমিকাকে সমান করে - নারীর সন্তান ধারনের ও জন্মদনের ভূমিকার সাথে পুরুষের এই ভূমিকা অনবদ্য এবং যথার্থ কিনা?	ধর্মের মৌলিক বিষয়ে যদি নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে এবং নারীর অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা থেকে থাকে সে বিষয়ে জেন্ডার ইস্যু ও কার্যক্রম গ্রহন করতে পারে কিনা?	মন্তব্য

২৫ জন সাক্ষাৎকার প্রদান কারীদের মধ্যে ২৩ জন এ ক্ষেত্রে হ্যাঁ সূচক জবাব দিয়েছেন কেবল মাত্র ২ জন না সূচক উত্তর দিয়েছেন।	২১ জন না সূচক উত্তর দিয়েছেন, হ্যাঁ সূচক উত্তর দিয়েছেন ৩ জন, ১ জন হ্যাঁ সূচক উত্তরে টিক চিহ্ন দিয়েও ব্রাকেটেএই মন্তব্য লিখে দিয়েছেন- ’কিছু সীমাবদ্ধতা স্বত্বেও’ ।	১২ জন না সূচক উত্তর দিয়েছেন, ১ জন হ্যাঁ কিংবা না কোথাও টিক চিহ্ন না দিয়ে ’অদ্যাবধি নয়’ লিখে দিয়েছেন, তাতে না সূচকে ১৩ জন ধরা যায় , ৮ জন হ্যাঁ সূচক উত্তর দিয়েছেন, ৪ জন এ বিষয়ে কোন মন্তব্য করেননি।	এ বিষয়ে ২৫ জন উত্তর দাতার সকলেই হ্যাঁ সূচক উত্তর দিয়েছেন।	১৭ জন হ্যাঁ সূচক উত্তর দিয়েছেন। ৭ জন না সূচক উত্তর দিয়েছেন, ১ জন এই বিষয়ে কোন মন্তব্য নেই মর্মে উল্লেখ করেছেন ।	এ বিষয়ে ২৪ জন উত্তর দাতাই হ্যাঁ সূচক উত্তর দিয়েছেন। ১ জন না সূচক উত্তর দিয়েছেন।	কর্মকর্তা গণের প্রদত্ত গুরুত্ব পূর্ণ কিছু মন্তব্য নিম্নে পৃথক ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

সরকারী উর্দ্ধতন কর্মকর্তাগণের নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ -

দেখা যাচ্ছে সাক্ষাৎকার প্রদানকারী সরকারী কর্মকর্তাগণের অধিকাংশই বাস্তব জীবনে জেন্ডার ইস্যুর সাথে সম্পৃক্ত থেকে সরকারী কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকেন। বর্তমান সাক্ষাৎকারে জেন্ডার ইস্যুর ভিত্তিতে প্রচুর কার্যক্রম স্বত্তে ও বাংলাদেশে সত্যিকার অর্থে নারী- মুক্তি ঘটেছে কিনা এবং নারীরা নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে কিনা এ প্রশ্নের ক্ষেত্রে ২১ জন ‘না’ সূচক উত্তর দিয়েছেন, ‘হ্যাঁ’ সূচক উত্তর দিয়েছেন ৩ জন, ১ জন হ্যাঁ সূচক উত্তরে টিক চিহ্ন দিয়েও ব্রাকেটেএই মন্তব্য লিখে দিয়েছেন- ‘কিছু সীমাবদ্ধতা স্বত্বেও’।

বেইজিংএ অনুষ্ঠিত ৪র্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনে হিলারী ক্লিনটন নারীর মর্যাদার যে দাবী করেছেন নারীর সেই মর্যাদা নির্ধারনের লক্ষ্যে জেন্ডার ইস্যু কোন দিক নির্দেশনা স্থির করেছে কিনা মর্মে প্রশ্নের ক্ষেত্রে ১২ জন ‘না’ সূচক উত্তর দিয়েছেন, ১ জন ‘হ্যাঁ’ কিংবা ‘না’ কোথাও টিক চিহ্ন না দিয়ে ’অদ্যাবধি নয়’ লিখে দিয়েছেন, তাতে না সূচকে ১৩ জনই ধরা যায়, ৮ জন ‘হ্যাঁ’ সূচক উত্তর দিয়েছেন, ৪ জন এ বিষয়ে কোন মন্তব্য করেননি।

নারী নির্যাতনের ক্ষেত্রে ধর্মকে ব্যবহার করা হচ্ছে যুগ যুগ ধরে, এ ক্ষেত্রে ধর্মের মৌলিক বিষয় নয় বরং ব্যবহৃত হচ্ছে ধর্মে অনুপ্রবেশ করা কুসংস্কার - এ বিষয়ে ২৫ জন উত্তর দাতার সকলেই ‘হ্যাঁ’ সূচক উত্তর দিয়েছেন।

পবিত্র কুরআন নারীর প্রতি পুরুষের দায়িত্ব কর্তব্য এবং নিরাপত্তা বিষয়াদি বাধ্যতামূলক ভাবে সম্পৃক্ত রেখে ‘নারী-পুরুষের’ অন্যান্য ভূমিকাকে সমান করে - নারীর সন্তান ধারনের ও জন্মদনের ভূমিকার সাথে পুরুষের এই ভূমিকা অনবদ্য এবং যথার্থ কিনা মর্মে প্রশ্নে ১৭ জন ‘হ্যাঁ’ সূচক উত্তর দিয়েছেন। ৭ জন না সূচক উত্তর দিয়েছেন, ১ জন এই বিষয়ে কোন মন্তব্য নেই মর্মে উল্লেখ করেছেন ।

ধর্মের মৌলিক বিষয়ে যদি নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে এবং নারীর অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা থেকে থাকে সে বিষয়ে জেন্ডার ইস্যু ও কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারে কিনা - এ বিষয়ে ২৫ জন উত্তর দাতার মধ্যে ২৪ জনই ‘হ্যাঁ’ সূচক উত্তর দিয়েছেন। ১ জন ‘না’ সূচক উত্তর দিয়েছেন।

প্রদত্ত উত্তর সমূহ পর্যালোচনায় এটি স্পষ্ট যে, জেন্ডার সংশ্লিষ্ট সরকারী দায়িত্ব এবং কার্যক্রম পরিচালনাকারী সরকারী কর্মকর্তাগণের অধিকাংশই ধর্মের বিপরীতে নন। তাঁদের অধিকাংশই এই অভিমত ব্যক্ত করছেন যে, ধর্মীয় প্রেক্ষাপটে জেন্ডার ইস্যু অত্যন্ত ইতিবাচক। তাঁরা ধর্মীয় অপব্যাখ্যা এবং কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তাঁদের অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

জেন্ডার সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের অভিজ্ঞতার থেকেই সরকারী কর্মকর্তাগণের বেশ কয়েকজন উপরে উল্লেখিত মতামতের অতিরিক্ত কিছু মতামতও প্রদান করেছেন। **তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য মতামত সমূহ হ'ল -**

১. নারীকে মানুষ হিসেবে যথাযথ মর্যাদা দেয়া উচিৎ। পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র তার ভূমিকাকে সম্মান দেয়া প্রয়োজন। ধর্মের অপব্যাখ্যা দিয়ে নারীর ভূমিকাকে সংকীর্ণ করা ঠিক নয়।

২.ধর্মীয় প্রেক্ষাপটে জেন্ডার ইস্যু অত্যন্ত ইতিবাচক। এ জন্য স্বচ্ছভাবে ধর্মীয় শিক্ষার প্রয়োজন। ধর্মীয় শিক্ষাগুরুদের অস্বচ্ছ ও বিভ্রান্তমূলক ব্যাখ্যা ও প্রচারের জন্য ধর্মীয় প্রেক্ষাপটে জেন্ডার ইস্যু সাংঘর্ষিক অবস্থানে রয়েছে। অথচ ইসলাম ধর্মে জেন্ডার ইস্যু অত্যন্ত মর্যাদা সম্পন্ন, ভারসাম্যমূলক।

৩. ধর্মের মৌলিক বিষয়াদির মধ্যে নারীর যে পর্দার কথা বলা হচ্ছে সে বিষয়ে নারীদের সচেতন হতে হবে। খোলা মেলা নারীজাতিকে নিজেদের পণ্য হিসেবে ব্যবহার থেকে বিরত থাকতে হবে। ইহাতে নির্যাতন/ অবহেলা অনেক কমবে।

৪. জেন্ডার ইস্যুতে কাজ করে নারীর অধিকার নিশ্চিত করতে হলে ধর্মের অপব্যবহার করে নিশ্চিত করা যাবেনা। বরং ধর্মের মৌলিক বিষয়ের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যাগুলো সবার সামনে তুলে ধরার পদক্ষেপ নিতে হবে।

৫.ধর্ম সম্পর্কে প্রতিটি মুসলমান নরনারীকে সঠিক ভাবে জানতে হবে। আলেম ওলেমাদের কুরআন হাদীসের সঠিক বিষয় জানতে হবে এবং মুসল্লিদের জানতে হবে। তাই বাংলাদেশে নারী মুক্তির ক্ষেত্রে ধর্মের সঠিক বিষয়াবলী দেশের প্রতিটি নাগরিকের জানতে হবে তবেই জেন্ডার সমতা সম্ভব হবে।

৬.নারীকে বাদ দিয়ে কোনভাবেই জাতীয় উন্নয়ন সম্ভভ নয়। সর্বক্ষেত্রেই ধর্মীয় গোড়ামী, অপব্যাখ্যার উর্দ্ধে থেকে উন্নয়নের মূল স্রোতধারার সাথে নারীকে সম্পৃক্ত করতে হবে।

সরকারী কর্মকর্তাদের সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য এবং প্রদত্ত মতামতের ভিত্তিতে যে বিষয়টি অধিকাংশ সাক্ষাৎকার দাতাদের অভিমত বলে প্রতীয়মান হ'ল, তা এই যে - স্বচ্ছভাবে ধর্মীয় শিক্ষার প্রয়োজন। ধর্মীয় শিক্ষাগুরুদের অস্বচ্ছ ও বিভ্রান্তমূলক ব্যাখ্যা ও প্রচারের জন্য ধর্মীয় প্রেক্ষাপটে জেন্ডার ইস্যু সাংঘর্ষিক অবস্থানে রয়েছে। অথচ ইসলাম ধর্মে জেন্ডার ইস্যু অত্যন্ত মর্যাদা সম্পন্ন, ভারসাম্যমূলক এবং নারীদের অধিকার এবং মর্যাদা সম্পর্কে ইসলামের মৌলিক আদর্শের সাথে জেন্ডার ইস্যু সমন্বয় সাধন করে নারী মুক্তির লক্ষ্যে কার্যক্রম পরিচালনা করলে তা নারী মুক্তির সহায়কই হবে।

৮.২.৫ জেলা/ উপজেলায় কর্মরত মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তাগনের উপর প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে জরিপ সাক্ষাৎকার গ্রহণ এবং প্রাপ্ত তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ

নারী মুক্তির লক্ষ্যে জেন্ডার ইস্যু বাস্তবায়ন, নারী নির্যাতন প্রতিরোধ কল্পে মাঠ পর্যায়ে সরকারী কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকেন জেলা এবং উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তাগণ। তাঁরা এনজিওদের দ্বারা পরিচালিত কার্যক্রমের সহায়তা ও করে থাকেন। তাদের মধ্যে থেকে বর্তমান গবেষণায় মোট ৪১ জন

কর্মকর্তার নিকট থেকে প্রশ্নপত্র জরিপের মাধ্যমে তাদের মতামত গ্রহণ করা হয়। তাঁদের নিকট প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে গুরুত্ব সহকারে প্রশ্নপত্রে উল্লেখিত বিষয় সমূহই জানতে চাওয়া হয়েছিল। তৎপ্রেক্ষিতে তাঁদের উত্তর এবং প্রদত্ত কিছু মতামত হ'ল -

সারণী-৪১

জেন্ডার ইস্যুর প্রেক্ষিতে নারী পুরুষের সমান অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশে গৃহীত হচ্ছে প্রচুর উদ্যোগ	জেন্ডার ইস্যুর ভিত্তিতে প্রচুর কার্যক্রম স্বত্ত্বেও বাংলাদেশে সত্যিকার অর্থে নারী- মুক্তি ঘটেছে কি এবং নারীরা নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা পাচ্ছে কি?	বেইজিংএ অনুষ্ঠিত ৪র্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনে হিলারী ক্লিনটন নারীর মর্যাদার যে দাবী করেছেন নারীর সেই মর্যাদা নির্ধারনের লক্ষ্যে জেন্ডার ইস্যু কোন দিক নির্দেশনা স্থির করেছে কি?	নারী নির্যাতনের ক্ষেত্রে ধর্মের নামে ব্যবহৃত হচ্ছে ধর্মে অনুপ্রবেশ করা কুসংস্কার/ অপব্যাখ্যা।	পবিত্র কুরআন নারীর প্রতি পুরুষের দায়িত্ব কর্তব্য এবং নিরাপত্তার বিষয়াদি বাধ্যতামূলক ভাবে সম্পৃক্ত রেখে 'নারী-পুরুষের' অন্যান্য ভূমিকাকে সমান করে - নারীর সন্তান ধারনের ও জন্মদনের ভূমিকার সাথে পুরুষের উপর প্রদত্ত এই ভূমিকা অনবদ্য এবং যথার্থ কিনা?	ধর্মের মৌলিক বিষয়ে যদি নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে এবং নারীর অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা থেকে থাকে সে বিষয়ে জেন্ডার ইস্যু ও কার্যক্রম গ্রহন করতে পারে কিনা?	মন্তব্য
এই বিষয়ে ৩৮ জন কর্মকর্তা হ্যাঁ সূচক উত্তর প্রদান করেছেন, আর ৩ জন প্রদান করেছেন না সূচক উত্তর।	এই বিষয়ে ৩১ জন কর্মকর্তা না সূচক উত্তর প্রদান করেন আর ১০ জন কর্মকর্তা হ্যাঁ সূচক উত্তর প্রদান করেন।	এই বিষয়ে ২১ জন কর্মকর্তা না সূচক উত্তর প্রদান করেন আর ২০ জন কর্মকর্তা হ্যাঁ সূচক উত্তর প্রদান করেন।	এ ই বিষয়ে ৪০ জন কর্মকর্তা হ্যাঁ সূচক উত্তর প্রদান করেন, কেবলমাত্র ১ জন কর্মকর্ত না সূচক উত্তর দিয়েছেন ।	এই বিষয়ে ২৪ জন কর্মকর্তা হ্যাঁ সূচক উত্তর প্রদান করেন আর ১৭ জন না সূচক উত্তর প্রদান করেছেন।	এ ই বিষয়ে ৩৯ জন কর্মকর্তা হ্যাঁ সূচক উত্তর প্রদান করেছেন আর না সূচক উত্তর দিয়েছেন ১জন, কোন উত্তর দেওয়া থেকে বিরত থেকেছেন ১ জন।	মাঠ পর্যায়ে কর্মরত কর্মকর্তা গণের প্রদত্ত গুরুত্ব পূর্ণ কিছু মন্তব্য নিম্নে পৃথক ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

মাঠ পর্যায়ে কর্মরত মহিলা বিষয়ক সরকারী কর্মকর্তাগনের সাক্ষাৎকার থেকে প্রাপ্ত তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ-

দেখা যাচ্ছে সাক্ষাৎকার প্রদানকারী সরকারী কর্মকর্তাগণের অধিকাংশই বাস্তব জীবনে জেন্ডার ইস্যুর সাথে সম্পৃক্ত থেকে মাঠ পর্যায়ে সরকারী কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকেন। বর্তমান সাক্ষাৎকারে দেশ জুড়ে জেন্ডার ভিত্তিক কার্যক্রম পরিচলনার বিষয়ে তাদের ৪১ জনের ৩৮ জনই 'হ্যাঁ' সূচক উত্তর দিয়েছেন।

জেন্ডার ভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালনা সত্বেও সত্যিকার অর্থে নারী মুক্তির বিষয়ে ৩১জন কর্মকর্তা 'না ' সূচক উত্তর এবং ১০জন 'হ্যাঁ' সূচক উত্তর দিয়েছেন।

বেইজিংএ অনুষ্ঠিত ৪র্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনে হিলারী ক্লিনটনের নারীর মর্যাদা সংশ্লিষ্ট প্রস্থাবনার বিষয়ে কোন পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে কিনা মর্মে প্রশ্নে ২১ জন 'না' সূচক আর ২০ জন 'হ্যাঁ' সূচক উত্তর দিয়েছেন। যারা 'হ্যাঁ' সূচক উত্তর দিয়েছেন তা কতটা বুঝে উত্তর দিয়েছেন, তা সুস্পষ্ট হয়নি। কারণ বাংলাদেশে এখনও নারীর মর্যাদার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠেনি।

ধর্মের মৌলিক বিষয়ে যদি নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে এবং নারীর অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা থেকে থাকে সে বিষয়ে জেন্ডার ইস্যু ও কার্যক্রম গ্রহন করতে পারে কিনা - এ বিষয়ে ৪১ জন কর্মকর্তার মধ্যে ৩৯ জন কর্মর্তাই 'হ্যাঁ' সূচক উত্তর দিয়েছেন।

দেখা যাচ্ছে মাঠ পর্যায়ে নারী মুক্তি সংক্রান্ত কার্যক্রম যে সব কর্মকর্তাগন পরিচালনা করছেন তাদের অধিকাংশই ধর্মীয় ভাবে নারীর অধিকার এবং মর্যাদার বিষয়টির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করছেন। বর্তমানে ছকে বর্ণিত সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য এবং সাক্ষাৎকার দাতাদের প্রদত্ত মতামতের ভিত্তিতে যে বিষয়টি অধিকাংশ সাক্ষাৎকার দাতাদের অভিমত বলে প্রতীয়মান হলো, তা এই যে, ইসলামের মৌলিক আদর্শের সাথে জেন্ডার ইস্যু সমন্বয় সাধন করে নারী মুক্তির লক্ষ্যে কার্যক্রম পরিচালনা - নারী মুক্তির সহায়ক।

বর্তমান গবেষণা সংশ্লিষ্ট তাদের প্রদত্ত উল্লেখযোগ্য মতামত সমূহ হ'ল-

১. ধর্মীয় মূল্যবোধ নারীর উন্নয়ন অগ্রগতির পথে প্রতিবন্ধকতা নয়, বরং সহায়ক।

২. কোরান এবং হাদিসে নারীর প্রতি সম্মান দেখানোর কথা বলা আছে। কোথায়ও নারীর প্রতি অবহেলা বা অবমাননার কথা বলা নাই।

৩. পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নারীর প্রতি নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের জন্য ধর্মীয় নির্দেশনা গুলো জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে বাস্তব প্রয়োগ প্রয়োজন। এ জন্য ধর্ম শিক্ষা ক্ষেত্রে, ধর্মীয় পাঠ্য পুস্তকে শ্রেণী ভেদে পর্যায়ক্রমে অন্তর্ভুক্ত করণ, প্রশিক্ষণ মডিউলে অন্তর্ভুক্ত করণ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক ইমাম প্রশিক্ষণে নারীর প্রতি পুরুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য নিরাপত্তার বিষয়াদি বাধ্যতামূলক প্রশিক্ষণের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৪. বাংলাদেশে নারীদের মুক্তির ক্ষেত্রে ধর্ম সাংঘর্ষিক নয়।

৫. প্রথমতঃ প্রয়োজন ধর্মীয় অপব্যাখ্যা রোধ করা, নারীর অধিকার ও মর্যাদা সম্পর্কিত ধর্মীয় ব্যাখ্যা গুলোর যথাযথ প্রচারের ব্যবস্থা করা। আর সবচেয়ে বেশী দরকার সচেতনতা তৈরী এবং নৈতিক মূল্যবোধ জাগ্রত করা।

৬. সংবিধান, আইন, ধর্ম সকল ক্ষেত্রেই নারীর মর্যাদা ও অধিকারের কথা বলা আছে।

৭.ধর্মে যে সকল অধিকার নারীকে দিয়েছে তা' এবং যুগ ও সময়ের চাহিদা অনুযায়ী কল্যানকর ব্যবস্থা / কার্যক্রম নারীদের জন্য নেওয়া প্রয়োজন। ধর্ম কল্যান মুখী। কাজেই এক্ষেত্রে সংকীর্ণতার উর্ধ্বে থাকা প্রয়োজন।

৮.ধর্মীয় কুসংস্কার নারী উন্নয়নে বাধাস্বরূপ এজন্য ধর্মীয় বিষয়ে সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা থাকা আবশ্যক।

৯. নারীর প্রতি সহিংসতা কমাতে ধর্মীয় অপব্যাখ্যা প্রদানকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ধর্মীয় গোড়ামী ও কুসংস্কার থেকে সমাজকে মুক্ত করতে হবে।

১০. কোরান ও হাদিসে নারীকে যথেষ্ট সম্মান দেয়া আছে । তথাপিও ধর্মীয় অনুশাসন অনেক ক্ষেত্রে না মানার কারণে নারী নির্যাতন কমছেনা।

১১. ধর্মীয় অপব্যাখ্যা প্রদানকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ করতে হবে।

মাঠ পর্যায়ে কর্মরত কর্মকর্তাগণের প্রদত্ত উল্লেখিত গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য থেকে এটি প্রমাণিত যে নারী মুক্তির ক্ষেত্রে প্রয়োজন ধর্মের কুসংস্কার থেকে মুক্তি এবং ধর্মের মৌলিক বিষয়াদি বাস্তবায়ন।

দেখা যাচ্ছে, মাঠ পর্যায়ে জেন্ডার ইস্যু নিয়ে কাজ করছেন যে সব সরকারী কর্মকর্তাগণ, তাঁদের যে অভিমত উপরের সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে ব্যক্ত হয়েছে তাতে এটি স্পষ্ট যে, ধর্মীয় মৌলিক আদর্শের সাথে নারী মুক্তির বিষয়টি একত্রিত করে কার্যক্রম পরিচালনা করা হলে নারী মুক্তির বিষয়টি অধিকতর সহজ হবে।

৮.২.৬ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫ জন এবং ১জন প্রাইভেট শিক্ষার্থী সহ মোট ৬ জন শিক্ষার্থীর গৃহীত সাক্ষাৎকারের ফলাফল

পর্যালোচনায় দেখা যাচ্ছে - এই ৬ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে দুইজনের জেন্ডার ইস্যুর উপর তেমন কোন ধারণা নেই বলে সে ক্ষেত্রে তারা কোন মন্তব্য করেননি। বাকি চারজনই নারী মুক্তির লক্ষ্যে জেন্ডার ইস্যুর কার্যক্রমের উপর তাদের Positive মতামত ব্যক্ত করেছেন এবং সকলেই ধর্মের এই বিষয়ে একমত হয়েছেন যে নারী নির্যাতনের ক্ষেত্রে ধর্মকে যুগ যুগ ধরে ব্যবহার করা হচ্ছে, সেক্ষেত্রে ধর্ম নয় ব্যবহৃত হচ্ছে ধর্মে অনুপ্রবেশ করা অপব্যাখ্যা এবং কুসংস্কার। নারীর অধিকার এবং মর্যাদার ক্ষেত্রে ধর্মের মৌলিক বিষয়ে সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা থাকলে তা গ্রহণের ক্ষেত্রে তাদের দ্বিমত নেই মর্মেও তারা একমত হয়েছেন যে, ধর্মের মৌলিক বিষয়াদি যদি নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে হয় এবং সেখানে নারীর অধিকার ও মর্যাদা নিশ্চিত করার নির্দেশনা থাকে তবে তার ভিত্তিতে জেন্ডার ইস্যুও কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারে। তাদের দুইজন নিম্নে উল্লেখিত বিশেষ মতামতও প্রদান করেছেন-

১. আমাদের দেশে নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় ধর্মে অনেক অপব্যাখ্যা রয়েছে। বিশেষ করে গ্রামীন নারীরা এর প্রধান হাতিয়ার। নারীদের পর্দা, কাজকর্ম এবং পিতার সম্পত্তির যে অংশীদার সব ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হচ্ছে। অথচ ইসলাম সবার সমান অধিকার দিয়েছে।

২. ইসলাম ধর্ম নারীকে সর্ব উর্ধ্বে স্থান দিয়েছে। যেখানে ৩ বার মায়ের মর্যাদা দানের পর পিতার মর্যাদা দান করেছে। সুতরাং যে ধর্ম যেভাবেই নিজেদের প্রকাশ করেনা কেন সকল ধর্মেই নারীকে একটি সুপ্রতিষ্ঠিত মহিমায় স্থান দিয়েছে যেখানে একজন নারী একজন মেয়ে হিসেবে মা হিসেবে, স্ত্রী হিসেবে, পুত্রবধূ হিসেবে এবং একজন শাশুড়ী হিসেবে নিজেদের ভূমিকা পালন করে আসছে।

ছয় (৬) জন ছাত্রীর সাক্ষাৎকারের মতামত থেকেও এটি দেখা যাচ্ছে যে, ছাত্রী হলেও এরা ধর্মের মৌলিক আদর্শ বাস্তবায়নের পক্ষে।

৮.২.৭ কয়েকজন গৃহবধূর সাক্ষাৎকার গ্রহণ এবং প্রাপ্ত ফলাফল

৬ জন গৃহবধূও বর্তমান গবেষণায় সাক্ষাৎকার প্রদান করেছেন। যে কোন ভাবে তারা জেন্ডার ইস্যু এবং ধর্মীয় বিষয়ে সচেতন বলে প্রতীয়মান হয়েছে। তাঁরা সকলেই নারী মুক্তির লক্ষ্যে জেন্ডার ইস্যু এবং তার কার্যক্রমের উপর Positive অভিমতই ব্যক্ত করেছেন। সেই সাথে তারা এ অভিমতও জ্ঞাপন করেছেন যে, জেন্ডার ইস্যুর উপর কার্যক্রম বিদ্যমান স্বত্বেও বাংলাদেশে এখনও সত্যিকার অর্থে নারী মুক্তি ঘটেনি। নারীরা নির্যাতনের হাত থেকে রেহাইও পায়নি এবং পাচ্ছেওনা। তাঁরাও এ বিষয়ে একমত হয়েছেন যে, নারী নির্যাতনের ক্ষেত্রে ধর্মের নামে যুগ যুগ ধরে, ব্যবহৃত হচ্ছে ধর্মে অনুপ্রবেশ করা কুসংস্কার এবং অপব্যাখ্যা সমূহ। যেহেতু মূল ধর্ম নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে আর সেজন্যই এবং সেখানে নারীর অধিকার এবং মর্যাদার বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে তাই সে বিষয়গুলোর আলোকে জেন্ডার ইস্যুর কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারে মর্মে একমত পোষণ করেছেন।

নির্যাতীত নারীগণ সহ গবেষণায় সাক্ষাৎকার প্রদান করেছেন সেসব ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ- তাঁরা এবং অন্যান্যদের বেশীর ভাগই এ মর্মে একমত হয়েছেন যে, ধর্মের নামে প্রচলিত অপব্যাখ্যা এবং কুসংস্কার এর মাধ্যমেই সমাজে নারী নির্যাতন চলছে সর্বাধিক। তাদেও অভিমত থেকে এটি স্পষ্ট হচ্ছে যে, একক ভাবে জেন্ডার ইস্যু- সংশ্লিষ্ট নারীর অধিকার দিয়ে নারীজাতির মুক্তি সম্ভব নয়। একই সাথে ধর্মীয় অপব্যাখ্যা এবং কুসংস্কার থেকে মুক্ত হওয়া প্রয়োজন। এবং পবিত্র কুরআনে প্রদত্ত অধিকার এবং মর্যাদা সম্পর্কে সকলের অবহিত হওয়া প্রয়োজন।

বর্তমানে ধর্মীয় কুসংস্কার সমূহের উপর পরিস্কার ধারণা গ্রহণের লক্ষ্যে বিদ্যমান বেশ কিছু কুসংস্কার সমূহের উপর বিশ্লেষণ পূর্বক দেখানো হ'ল যে, সে সব মোটেও ধর্ম নয় বরং অপব্যাখ্যা এবং কুসংস্কার।

৮.৩ ধর্মের নামে বিদ্যমান কতিপয় কুসংস্কারাদির উপর বিশ্লেষণ

প্রশ্ন দাঁড়াচ্ছে নারীকে ঘিরে বেশ কিছু ধর্মীয় কুসংস্কার - অপব্যাখ্যা সমূহ কি? যে সব কারণে পুরুষেরা নারীকে নির্যাতনের অধিকার রাখে বলে মনে করেন? ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে পবিত্র কুরআন, হাদিস এবং শরীয়ার বিধিবিধানকে ঘিরে বিশেষভাবে নারীদের কেন্দ্র করে সৃষ্ট অপব্যখ্যা সমূহের উপর আলোচনা করে ধর্মের মৌলিক বিষয়াদি অনুসন্ধান করা হয়েছে। ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে বর্ণিত ধর্মের মৌলিক বিষয়াদির আলোকে বর্তমানে বাংলাদেশের সমাজে বিদ্যমান বেশ কিছু অপব্যাখ্যা এবং কুসংস্কার সমূহ অপনোদনের মাধ্যমে ধর্ম কিভাবে নারীর অধিকার এবং মর্যাদাকে নিশ্চিত করেছে তা বিশ্লেষণ করে নারীর অধিকার এবং মর্যাদার বিষয়ে ধর্মের মৌলিক আদর্শকে আরও স্পষ্ট করা হ'ল -

১. নারী পুরুষের হাড় থেকে সৃষ্ট নয়

যুগ যুগ ধরে এটি একটি প্রচলিত ধারণা যে, নারী পুরুষের হাড় থেকে সৃষ্ট। ধারণাটি এরূপ যে, প্রতোক স্বামীর পাঁজরের হাড় থেকেই তার স্ত্রীকে সৃষ্টি করা হয়েছে। এই ধারণা যে কতটা অযৌক্তিক এবং অবাস্তব তা এই প্রশ্নের মাধ্যমেই বোঝা যাবে যে, যখন একজন পুরুষ একাধিক বিয়ে করেন তখন কি একজনের হাড় থেকে একাধিক নারীকে সৃষ্টি করা হয়? আবার সেই স্বামীই যখন স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেয় তখন হাড়ের অবস্থা কি হয়?

কিংবা একজন নারী যখন একাধিক পুরুষকে বিয়ে করে, (স্বামীর মৃত্যু বা তালাকের কারনে) তখন কি একাধিক পুরুষের হাড় থেকে একজন নারী সৃষ্টি হয়েছে? এ সব প্রশ্নের কোন উত্তর নেই সত্বেও এরূপ একটা জটিল ধারণার সৃষ্টি করে তাতে আবার ধর্মীয় আবহ দানের মাধ্যমে মূলতঃ নারীকে নরের অধীনস্থ করার একটা কৌশল দীর্ঘ সময় ধরে চলে আসছে।

নারী পুরুষের হাড় থেকে সৃষ্ট এই বর্ণনা আসলে বাইবেলের, পবিত্র কুরআনের নয়। বাইবেলে যে প্রচুর মানবিক হস্তক্ষেপ হয়েছে তা পূর্বে দেখানো হয়েছে। বাইবেলে এই সংক্রান্ত বর্ণনাটি এরূপঃ ''আর সদাপ্রভু ঈশ্বর কহিলেন মনুষ্যের একাকী থাকা ভালো নয়। আমি তাহার জন্য অনুরূপ সহকারিনী নির্মাণ করি। .. .. সদাপ্রভু ঈশ্বর আদমকে ঘোর নিদ্রায় মগ্ন করিলে তিনি নিদ্রিত হইলেন। আর তিনি তাহার একখানা পঞ্জর লইয়া মাংস দ্বারা সে স্থান পুরাইলেন। সদাপ্রভু ঈশ্বর আদম হইতে গৃহিত সেই পঞ্জরে এক স্ত্রী নির্মাণ করিলেন ও তাহাকে আদমের নিকট আনিলেন। তখন আদম কহিলেন- এবার হইয়াছে, ইনি আমার অস্থির অস্থি ও মাংসের মাংস, ইহার নাম নারী হইবে, কেননা ইনি নর হইতে গৃহিত হইয়াছেন। এই কারণে মনুষ্য আপন পিতামাতাকে ত্যাগ করিয়া স্ত্রীতে আসক্ত হইবে"।[২]

পক্ষান্তরে পবিত্র কুরআন বলে, ''হে মানব! স্বীয় প্রতিপালককে ভয় কর, যিনি তোমাদিগকে একই প্রাণ থেকে বা মূল উপাদান থেকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং সেই উপাদান হইতে তোমাদের যুগলকে পয়দা করিয়াছেন" (আঃ ১ সুরা নেছা)। আবার, ''তাহার নির্দশন সমূহের মধ্যে একটি এই যে, তিনি মানব সাধারণকে একই মূল উপাদান হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং সেই উপাদান হইতেই তোমাদের যুগলকে সৃষ্টি করিয়াছেন" (আঃ ২১ সুরা রূম)। একই বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে সুরা আরাফ এর ১৮৯ নং আয়াতে, সুরা জুমার ৬নং আয়াতে। এই আয়াত সমূহে যে, 'নফসেন ওয়া হেদাতেন' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে 'মোহাম্মদ মারমিউএডিউক পিকথল'(Mohd. Marmuaduke Pickthall তাঁর বিখ্যাত 'The Holly Quran'(With Arabic Text) এ এর অর্থ করেছেন -'সিঙ্গলসোল বা একক আত্মা'।

আল্লামা ইউসুফ আলী ও তাঁর অনুদিত 'দি হোলি কুরআন' এ সুরা নেসার ১নং আয়াতের টিকায় এই অর্থ সমর্থন করেছেন। আখতার উল আলম, ডঃ মরিস বুকাইলীর 'মানুষের আদি উৎস' নামীয় গ্রন্থের অনুবাদ করতে গিয়ে কিছু কিছু নিজস্ব বক্তব্য সংযোজন করেছেন। সেখানে তিনি এই 'নফসেন ওয়া হেদাতেন' এর অর্থ করেছেন অভিন্ন সত্বা বা একটি প্রাণ অথবা একটি জীবকোষ হিসেবে। সেই অর্থেই তিনি উপরে উদ্ধৃত আয়াতের এরূপ অর্থ প্রদান করেছেন, ''সেই তিনি যিনি তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন একটি অভিন্ন প্রাণ কিংবা একক জীবকোষ হইতে এবং উহা হইতেই সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার জোড়া (জওজ)"। এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, ''কুরআনের এই বক্তব্য থেকে এই অর্থে মানুষের আদি পিতা ও আদি মাতার সৃষ্টি প্রক্রিয়া যে অভিন্ন ছিলো, সেই তথ্যই বেরিয়ে আসে"।[৩]

অর্থাৎ নারী পুরুষের হাড় বা পাঁজরের হাড় দ্বারা সৃষ্ট তা পবিত্র কুরআন বলেনা। বরং মানব প্রজনন সম্পর্কে পবিত্র কুরআন যা বলে আধুনিক বিজ্ঞানও তাই সমর্থন করছে। এই সম্পর্কে বিস্মিত ডঃ মরিস বুকাইলী বলেন, ''মোদ্দাকথা এই যে, মানব প্রজনন সম্পর্কে আধূনিক বৈজ্ঞানিক তথ্য-জ্ঞানের সাথে কুরআনের বক্তব্যের এই যে সার্বিক মিল তা, যে কাউকে বিস্মিত না করে পারেনা"।[৪]

---

[২]. পবিত্র বাইবেল, পুরাতন নিয়ম, দ্বিতীয় অধ্যায়ের বাণী ১৮ থেকে ২৫।

[৩]. ডঃ মরিস বুকাইলী ঃ মানুষের আদি উৎস(অনুবাদ- আখতার উল আলম),পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৬৩।

[৪]. ডঃ মরিস বুকাইলী ঃ বাইবেল কুরআনও বিজ্ঞান,পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩২৬।

২. আদি পাপ নারী নয়

প্রায়শঃই নারী জাতিকে আদি পাপ বলে দোষারোপ করা হয় এবং তুচ্ছ করা হয়। বলা হয়ে থাকে পবিত্র বেহেস্তে, যে ফল খেতে নিষেধ করা হয়েছিলো মা হাওয়া শয়তানের প্ররোচনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রথমে তা নিজে খেয়েছেন এবং পরে আদমকে তা খেতে প্ররোচিত করেছেন। পরিণতিতে উভয়েই বেহেস্ত থেকে বহিস্কৃত হয়েছেন। বস্তুত এই বর্ণনাও বাইবেলের। পবিত্র কুরআনের নয়। বাইবেলে মানুষের হস্তক্ষেপের বিষয়ে ড. মরিস বুকাইলি প্রচুর তথ্য প্রমান উত্থাপন করেছেন। তার থেকে বাইবেলে মানুষের হস্তক্ষেপের বিষয়টি আজ সুপ্রমানিত। এরূপ হস্তক্ষেপের মাধ্যমে বেহেস্তের সুখ সাচ্ছন্দ্য থেকে আদম ও হাওয়ার বহিস্কৃত হওয়ার দোষ সুকৌশলে নারীর উপর আরোপ করে পুরুষকে নির্দোষ সাব্যস্ত করা হয়েছে। যা নারী জাতিকে খাটো করার একটি অপকৌশল মাত্র।

এই বিষয়ে তওরাতের বর্ণনা হলো, " সদাপ্রভু ঈশ্বরের নির্মিত ভূচর প্রাণীদের মধ্যে সর্প সর্বাপেক্ষা খল ছিল। সে ঐ নারীকে কহিল, ঈশ্বর কি বাস্তবিক বলিয়াছেন, তোমরা এই উদ্যানের কোন বৃক্ষের ফল খাইওনা? নারী সর্পকে কহিলেন, আমরা এই উদ্যানস্থ বৃক্ষ সকলের ফল খাইতে পারি, কেবল উদ্যানের মধ্যস্থানে যে বৃক্ষ আছে, তাহার ফলের বিষয়ে ঈশ্বর বলিয়াছেন, তোমরা তাহা ভোজন করিওনা, স্পর্শ করিওনা, করিলে মরিবে। তখন সর্প নারীকে কহিল, কোনক্রমে মরিবেনা; কেননা ঈশ্বর জানেন, যে দিন তোমরা তাহা খাইবে , সেইদিন তোমাদের চক্ষু খুলিয়া যাইবে, তাহাতে তোমরা ঈশ্বরের সদৃশ হইয়া জ্ঞান প্রাপ্ত হইবে। নারী যখন দেখিলেন, ঐ বৃক্ষ সুখদায়ক ও চক্ষুর লোভজনক, আর ঐ বৃক্ষ জ্ঞান দায়ক বলিয়া বাঞ্চনীয়। তখন তিনি তাহার ফল পাড়িয়া ভোজন করিলেন। পরে আপনার মত নিজ স্বামীকে দিলেন, আর তিনিও ভোজন করিলেন। তাহাতে তাহাদের উভয়ের চক্ষু খুলিয়া গেল এবং তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন যে তাঁহারা উলঙ্গ; আর ডুমুর বৃক্ষের পত্র সিঙ্গাইয়া ঘাগ্‌রা প্রস্তুত করিয়া লইলেন। পরে তাঁহারা সদাপ্রভু ঈশ্বরের রব শুনিতে পাইলেন, তিনি দিবাবসানে উদ্যানে গমনাগমন করিতেছিলেন; তাহাতে আদম ও তাঁহার স্ত্রী সদাপ্রভু ঈশ্বরের সম্মুখ হইতে, উদ্যানস্থ বৃক্ষ সমূহের মধ্যে লুকাইলেন। তখন সদাপ্রভু ঈশ্বর আদমকে ডাকিয়া কহিলেন, তুমি কোথায়? তিনি কহিলেন, আমি উদ্যানে তোমার রব শুনিয়া ভীত হইলাম, কারণ আমি উলঙ্গ, তাই আপনাকে লুকাইয়াছি। তিনি কহিলেন, তুমি যে উলঙ্গ, ইহা তোমাকে কে বলিল? যে বৃক্ষের ফল ভোজন করিতে তোমাকে নিষেধ করিয়াছিলাম, তুমি কি তাহার ফল ভোজন করিয়াছ? তাহাতে আদম কহিলেন, তুমি আমার সঙ্গিনী করিয়া যে স্ত্রী দিয়াছ, সে আমাকে ঐ বৃক্ষের ফল দিয়াছিল, তাই খাইয়াছি। তখন সদাপ্রভু ঈশ্বর নারীকে কহিলেন, তুমি একি করিলে? নারী কহিলেন, সর্প আমাকে ভুলাইয়াছিল তাই খাইয়াছি" ।[৫]

দেখা যাক, এই বিষয়ে পবিত্র কুরআন কি বলেঃ ''আর হুকুম দিলাম হে আদম বাস কর তুমি এবং তোমার সঙ্গিনী বেহেশতে এবং খাও উভয়ে স্বচ্ছন্দে ও যথেচ্ছ, আর যাইও না এই বৃক্ষের কাছে। অন্যথায় তোমরাও পরিগণিত হইবে জালেমদের মধ্যে, অনন্তর পদস্খলিত করিল শয়তান, আদম ও হাওয়াকে ঐ বৃক্ষের কারনে। অতঃপর বহিস্কৃত করিয়া ছাড়িল তাহাদিগকে সেই সুখ শান্তি হইতে, যাহাতে তাহারা ছিলেন" (আঃ ৩৬ সুরা বাকারা)।

বিষয়টি আরো বিস্তারিত এসেছে সুরা আল আরাফ এ- ''আর আমি আদেশ করিলাম, হে আদম! তুমি ও তোমার সঙ্গীনি বেহেশতে বাস কর। অনন্তর যে স্থান হইতে ইচ্ছা উভয়ে ভক্ষণ কর। আর এই বৃক্ষটির

---

[৫].পবিত্র বাইবেল(পুরাতন ও নূতন নিয়ম): আদি পুস্তক, অনু ঃ ৩' মানব জাতির পাপে পতন', বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি, ১৯৮৭, ঢাকা, পৃঃ ৪।

নিকটেও যাইওনা। অতঃপর শয়তান তাহাদিগের **উভয়ের** অন্তরে প্ররোচনার সঞ্চার করিলো যেনো তাহাদিগের দেহের আবৃতাঙ্গ গুলি যাহা পরস্পর হইতে গোপন ছিলো **উভয়ের** সমক্ষে প্রকাশ করিয়া দেয়। আর বলিতে লাগিলো তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের **উভয়কে** এই বৃক্ষটি হইতে অন্য কোন কারনে নিষেধ করে নাই, কিন্তু শুধু এই কারনে যে, তোমরা ফেরেশতা হইয়া যাইবে অথবা অনন্ত জীবন ধারণকারীদের অন্তর্ভূক্ত হইবে। আর সে তাহাদের **উভয়ের** সম্মুখে শপথ করিয়া বলিলো যে, বিশ্বাস করুন আমি আপনাদের **উভয়ের** হিতকামী। অনন্তর তাহাদের **উভয়কে** ধোকা দিয়া নীচে লইয়া আসিলো, তৎপর যেমনি **উভয়ে** বৃক্ষটির আস্বাদ গ্রহণ করিলো তৎক্ষনাৎ **উভয়ের** আবৃতাঙ্গ পরস্পরের সম্মুখে প্রকাশ হইয়া পড়িল এবং **উভয়েই** বেহেস্তের পত্রগুলি নিজেদের উপর সংযুক্ত করিতে লাগিল। এবং তাহাদের রব তাহাদিগকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, আমি কি তোমাদের **উভয়কে** এই বৃক্ষ (ভক্ষন করা) হইতে নিষেধ করিয়াছিলাম না? এবং ইহা কি বলিয়াছিলাম না যে, শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন। **উভয়ে** বলিলেন, হে আমাদের রব। আমরা নিজেদের বড়ই ক্ষতি করিয়াছি, আর যদি আমাদিগকে ক্ষমা না করেন এবং আমাদের প্রতি অনুগ্রহ না করেন তবে অবশ্যই নেহায়েৎ ক্ষতি হইবে" (আঃ ১৯-২৩ সুরা আল আরাফ)।

দেখা যাচ্ছে প্রথম আয়াতে আল্লাহপাক আদম ও হাওয়া - **উভয়কে** পদস্খলন করার কথা বলছেন। দ্বিতীয় আয়াতে বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয়েছে। অর্থাৎ আদম ও হাওয়া **উভয়ের** জন্যই যে বৃক্ষটি নিষিদ্ধ হয়েছিলো, শয়তান সেই বৃক্ষের বিষয়ে 'তাহাদিগের **উভয়ের** অন্তরে প্ররোচনা সঞ্চার করিল', **উভয়কে** ধোকা দিয়া নীচে লইয়া গেল' এবং '**উভয়ে** বৃক্ষটির আস্বাদ গ্রহণ করিল'।

এর থেকে অনুমান করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে যে কেবল মাত্র নারীকে খাটো করার জন্যই পবিত্র কুরআনে নেই সত্বেও পরবর্তীকালে এই আজগুবি গল্প বাইবেলের অনুকরণে বানানো হয়েছে। দুঃখজনক যে মুসলমানেরাও এরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করে তৃপ্তি পেয়ে থাকেন। এদের উদ্দেশ্যে কবি নজরুল ইসলাম যথার্থই বলেছেন -

নরককুন্ড বলিয়া কে তোমা করে নারী হেয় জ্ঞান?
তারে বল আদিপাপ নারী নহে সে যে নর শয়তান
অথবা শয়তান যে নর নহে নারী নহে ক্লীব সে
তাই সে নর ও নারীতে সমান মিশিয়া রহে।[৬]

৩. স্বামী প্রভূ নয়, বন্ধু

স্বামী শব্দটির আক্ষরিক অর্থ প্রভু। একজন নারী ও একজন পুরুষ যখন ঘর বাঁধে ইসলামিক দৃষ্টিকোন থেকে তথা পবিত্র কুরআন মতে এরা তখন পরস্পর পরস্পরের জওজ তথা সঙ্গী বা বন্ধু, কোন অবস্থাতেই প্রভু নয়। অথচ দুঃখজনক যে, আমাদের সামাজিক ব্যবস্থায় এমন একটা ধর্মীয় আবহ সৃষ্টি করে রাখা হয়েছে যে, নারী জাতি যেনো পুরুষের জন্ম জন্মান্তরের দাসী, আর পুরুষ নারীর মালিক তথা প্রভূ কিংবা ঈশ্বর। এই ধারণার থেকেই জীবন সাথী পুরুষকে স্বামী আখ্যা দেয়া হয়েছে। এই ধ্যান ধারণা ইসলাম ধর্মে অনুপ্রবেশ করেছে হিন্দু ধর্ম থেকে। কারণ এই ধারণা বহু যুগ থেকে হিন্দু ধর্মে চর্চা হয়ে আসছে। যদিও এরূপ ধারণা অমূলক নয় যে, বিষয়টি হিন্দু ধর্মেরও মৌলিক আদর্শ নয়, তা পরবর্তী কালের সংযোজন। তথাপিও হিন্দু ধর্মে বহুল প্রচলিত বিষয়টিতে মুসলমান পুরুষ সমাজ ধীরে ধীরে আকৃষ্ট হয়েছে এবং তা ধীরে ধীরেই ইসলাম ধর্মে আসন করে নিয়েছে।

---

[৬].কাজী নজরুল ইসলাম ঃ সঞ্চয়িতা(কবিতা - নারী), পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭৪।

এই বিষয়টি মুসলমান নারীরাও ভেবে দেখেনি যে জীবন সাথীকে স্বামী বা প্রভূ বা মালিক বলা কিংবা সে হিসেবে গ্রহণ করার সাথে সাথে স্পষ্টতঃ নিজেকে শরিকীর মত কবিরা গুনাহের সাথে জড়িয়ে ফেলা হলো, যা আল্লাহপাক কখনোই ক্ষমা করবেন না। পবিত্র কুরআনে নারী পুরুষদের পরস্পরকে পরস্পরের সঙ্গী বা যুগল হিসেবে উল্লেখ পূর্বক আল্লাহপাক বলেন, ''হে মানব! স্বীয় প্রতিপালককে ভয় কর তিনি তোমাদিগকে একই প্রাণ বা মূল উপাদান থেকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং সেই উপাদান হইতেছে তোমাদের যুগলকে পয়দা করিয়াছেন'' (সুরা নেছা আঃ ১)।

সুরা রুমের ২১নং আয়াতে এই যুগল সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য সম্পর্কে আল্লাহপাক বলেন, ''যেহেতু তোমরা পরস্পরের সংশ্রবে শান্তি লাভ করিবে এবং তোমাদিগের পরস্পরের মধ্যে প্রেম ও প্রীতি প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়াছেন; নিশ্চয়ই এই সৃষ্টি বৈচিত্রের নিগুঢ় তত্বগুলিতে চিন্তাশীল সমাজের জন্য অনেক তথ্য নিহিত রহিয়াছে'' (আঃ ১৪, সুরা রুম)। এই প্রেমপ্রীতি ভালোবাসার বন্ধনের দীর্ঘ জীবন প্রক্রিয়ায় ক্লেশের পর ক্লেশ স্বীকারের মাধ্যমে (আঃ ১৪ সুরা লোকমান) একজন জন্ম দিচ্ছে উভয়ের সন্তান আর অন্যজন হচ্ছে তাদের জন্য 'কাউওয়াম'। আর সেজন্যইঃ ''Men are the protector and maintainers of women. He stands firm in her business; protect her interest, and looks after her affairs'' তথা পুরুষ মহিলাদের নিরাপত্তা বিধানকারী এবং ভরণ-পোষণ কারী। তিনি তার (নারীর) স্বার্থ রক্ষায় দৃঢ় থাকেন, নিরাপত্তা নিশ্চিত করেন এবং তার যাবতীয় বিষয় দেখাশুনা করেন''।[৭]

সে জন্যই আল্লাহপাক আরও বলেন, ''তোমরা পরস্পর পরস্পরের অংশ'' (আঃ ২৫ সুরা নেছা)। ''মমিন পুরুষ মমিন নারী পরস্পর পরস্পরের বন্ধু, তারা সৎ বিষয়ে শিক্ষা দেয় অসৎ বিষয়ে বারণ করে, আর নামাজের পাবন্দি করে, আল্লাহ ও তার রাসুলের আদেশ মানিয়া চলে। এই সমস্ত লোকের প্রতি আল্লাহ রহমত বর্ষণ করেন'' (আঃ ৭১, সুরা তওবা)। অর্থাৎ পবিত্র কুরআন পুরুষকে নারীর প্রভূ বলে না বলে বন্ধু বা সঙ্গী বা সাথী। কিন্তু দুঃখ জনক যে আমাদের পুরুষ সমাজ নারীকে তাদের বন্ধু বা সঙ্গী হিসেবে চিন্তা না করে চিন্তা করেছেন নিজেদেরকে তাদের প্রভু হিসেবে এবং নিজেদেরকে প্রভু বানানোর যত অপকৌশল আছে তাও তারা উদ্ভাবন করেছেন। এই একটা দুষ্ট গলি, যার মাধ্যমে প্রথমতঃ পৃথিবীর মানুষকে অতঃপর অন্যান্য কিছুকে পূজা করার পদ্ধতি প্রচলন শুরু হবে। তাই এই বিষয়ে নারী- পুরুষ উভয়কেই সতর্ক হওয়া অত্যন্ত জরুরী।

৪. নারীকে ঘর থেকে বের করে দেওয়া সহজ নয় কারণ ঘরগুলো নারীদের নিরাপত্তার জন্য

সমাজে, বাড়ি-ঘরে কথায় কথায় নারীকে ঘর থেকে বের করে দেওয়ার প্রবণতা বিদ্যমান। যদি সেই নারী পিতার দিক থেকে অসহায় থাকে এবং তার নিজের পায়েও দাঁড়ানোর কোন সংগতি না থাকে তখনই তাকে স্বামীর বাড়ির ঘর থেকে বের করার প্রবণতাটা হয় অধিক। এই সব নারীর একমাত্র আশ্রয় স্থল হয় তখন পতিতালয়। যারা এ কাজটি করেন তারা একবারের জন্যও ভেবে দেখেন না যে, কত বড় অনৈসলামিক কাজ তারা করেন। আর কার ঘর থেকে কাকে বের করেন? কারণ আল্লাহপাক ঘরকে নারীদের জন্যই নির্ধারণ করেছেন।

সুরা তালাকে আল্লাহপাক বলেন,''হে রাসুল! যখন তোমরা স্ত্রীদিগকে তালাক দিতে চাও তবে ইদ্দতের প্রতি লক্ষ্য রেখে তালাক প্রদান কর, আর ইদ্দতকাল গণনা করিও আর আল্লাহ্কে ভয় করিতে থাক ,

[৭]. Abdullah Yusuf Ali ঃ The Holy Qur-an (text, translation and commentary), p. 195 and The Holy Qur-an. English translation of the meanings and commentary (Revised & edited by The Presidency of Researches, King Fahd Holy Qur-an printing complex), p. 219. (সুরা নেছায় 'কাউয়ামুন' - এর অর্থ প্রসঙ্গে) ।

যিনি তোমাদের রব, সেই স্ত্রী দিগকে তাহাদের গৃহ হইতে বাহির করিয়া দিওনা, তাহারাও যেনো বাহির না হয়, যদিনা তারা কোন সুস্পষ্ট নির্লজ্জ কাজে লিপ্ত হয়। এগুলো আল্লাহর নির্ধারিত সীমা। যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সীমা লংঘন করে, সে নিজের অনিষ্ট করে" (আঃ ১ সুরা তালাক)।

সুরা তালাকের এই আয়াতে ঘরকে নারীদের ঘর বলা হয়েছে, এমনকি তালাক সংগঠিত হলেও নারীদেরকে 'তাহাদের' ঘর থেকে বের করতে নিষেধ করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনের কতিপয় অনুবাদে এই ঘর থেকে বের না করার বিষয়টি ইদ্দত কালীন সময়ে মর্মে উল্লেখ থাকলেও লক্ষ্যনীয় যে সেই সব অনুবাদে ইদ্দত কালীন কথাটি ব্রাকেটে রাখা হয়েছে। তাতে এটি স্পষ্ট যে ব্রাকেটের কথাটি অনুবাদকের নিজস্ব সংযোজন।[৮]

উল্লেখ্য যে সুরা তালাকের এই আয়াতের ভিত্তিতেই লিবিয়ার প্রেসিডেন্ট কর্নেল গাদ্দাফী লিবিয়ায় ঘর সমূহের মালিকানা স্ত্রীদের উপর ন্যস্ত করে দিয়েছিলেন। তিনি তাঁর গ্রীন-বুক নামীয় গ্রন্থে যেটি বাংলায় 'সবুজ গ্রন্থ' নামে অনুদিত ও প্রকাশিত সেখানে গ্রন্থের তৃতীয় খন্ডের 'নারী' নামীয় প্রবন্ধে ঘরকে নারীর নিরাপত্তার প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তাঁর যুক্তি হলো- মানব শিশু হাঁসমুরগীর বাচ্চা নয় যে, সে পোল্ট্রী ফার্মে বড় হবে। মানব শিশুর জন্য আবশ্যক একটি নিরাপদ আশ্রয়স্থল, যেটি হলো- ঘর। যেহেতু মানব শিশুর মাকেই প্রয়োজন সর্বাধিক, তাই মানব শিশুর সত্যিকারের নিরাপত্তার জন্য ঘর হবে মায়ের। তিনি বলেন," ঘরের মালিক বা অধিকর্ত্রী নারী, কারণ, এখানে এমন একটি অনুকুল ও উপযুক্ত পরিবেশ রয়েছে যেখানে নারী নিরাপদে ঋতুকাল কাটাতে পারে, গর্ভধারণ করতে পারে এবং সন্তানের পরিচর্যা করতে পারে। নারী সেই সূতিকাগার বা মাতৃসদনের কর্ত্রী যা গৃহের অন্তর্গত"।[৯]

লিবিয়ার নারীরা দীর্ঘসময় ধরে পবিত্র কুরআনের এই আয়াতের ভিত্তিতে ঘরের স্বাধীনতা ভোগ করেছিল। এতে লিবিয়ার সমাজে স্বাভাবিক যে শান্তিটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা হলো, সেখানে যথেচ্ছ তালাকের সংখ্যা কমে যায়। এর কারণ হলো, একই সাথে একাধিক বাড়ির মালিক হওয়ার সুযোগ সেখানে নেই। তাই কোন পুরুষ ইচ্ছে হলেই অহেতুক স্ত্রীকে তালাক দিতে পারেননা, কারণ স্ত্রীকে তালাকের সাথে সাথেই স্বামীকেই ঘর ত্যাগ করতে হয়।[১০]

লিবিয়ার গৃহিত এই ব্যবস্থায় পরবর্তীতে মিশরও অনুপ্রাণিত হয়ে ওঠেছিল। মিশরের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাতের স্ত্রী জিহান সাদাত ঘর ও নারীদের বিষয়ে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করলে ১৯৭৯ সালে প্রেসিডেন্ট ঘরের মালিকানা স্ত্রীদের উপর ন্যস্ত করে এক অধ্যাদেশ জারি করেন। যদিও রক্ষনশীল উলেমা সমাজ এই অধ্যাদেশকে স্বাভাবিক ভাবে গ্রহণ করতে পারেননি। কিন্তু প্রেসিডেন্ট সাদাতের জীবদ্দশায় তাঁরা এ ব্যাপারে বিশেষ কিছু বলেননি। তবে প্রেসিডেন্ট সাদাতের মৃত্যুর পর তাঁরা এই অধ্যাদেশটিকে চেলেঞ্জ করে আদালতে মামলা করে দেন। আদালত ধর্মীয় কারণে নয় বরং প্রেসিডেন্ট অর্ডিন্যান্স বলে এরূপ বিধান জারী করেছেন যা পার্লামেন্টে পাশ করানো হয়নি- পদ্ধতিগত এই ত্রুটির কারণে তা বাতিল করে দেন।

---

[৮]. পবিত্র কুরআনের অভ্যন্তরে ব্রাকেট দিয়েও নিজস্ব সংযোজন অত্যন্ত ঝুকিপুর্ন কাজ। কারণ যে কোন সময়ে ভুল বশতঃ এই ব্রাকেট উঠে গেলে কুরআনের অভ্যন্তরে অনুবাদকের নিজস্ব বক্তব্য অনুপ্রবেশ করবে, তাতে মহান আল্লাহর অভিপ্রায়ের কিঞ্চিৎ হেরফের হলেও তার দায়িত্ব তাঁকেই বহন করতে হবে যিনি তা পবিত্র কুরআনে প্রথম ব্যবহার করেছেন। তাই অনুবাদের সময় অনুবাদকের নিজস্ব বক্তব্য ফুটনোটে ব্যবহারই বাঞ্চনীয়। যাতে পবিত্র কুরআনে হস্তক্ষেপের ঝুঁকি থেকে রেহাই পাওয়া যায়।

[৯].মুয়াম্মার আল গাদ্দাফী ঃ সবুজ গ্রন্থ (প্রথম-তৃতীয় খন্ড), গণ সমাজতান্ত্রিক লিবীয় আরব জামাহিরীয়্যান পিপলস ব্যুরো, গুলশান, ঢাকা, বাংলাদেশ, পৃঃ ১০৮ -১২৩।

[১০]. Prof. Rafiullah Shehab ঃ Rights of Women in Islamic Shariah , পূর্বোক্ত, পৃঃ ৯৮।

এই বিষয়ে প্রফেসর রফিউল্যাহ শিহাব বলেন, "It is strange that it was not challenged on religious grounds but on a mere technical point. This law was promulgated through an ordinance by president Sad at and was not passed by the Egyptian parliament. On this technical ground the court nullified this law." অর্থাৎ এটি আশ্চর্যের ব্যাপার যে, বিষয়টি ধর্মের ভিত্তিতে চ্যালেঞ্জ করা হয়নি বরং হয়েছে নিছক একটি টেকনিক্যাল বিষয়ের ভিত্তিতে। কারণ এটি প্রেসিডেন্ট সাদ কর্তৃক অর্ডিন্যান্স হিসেবে জারী করা হয়েছিল, মিশরের সংসদে পাস করানো হয়নি। এই প্রযুক্তিগত ত্রুটির কারণে আদালত কর্তৃক এই আইন বাতিল করা হয়েছিল"।[১১]

পরবর্তীতে মিশরের মেয়েরা প্রচন্ড আন্দোলন উথাপন করে। তাদের দাবী ছিলো এটি তাদের কুরআনিক অধিকার। যা আল্লাহ্ প্রদত্ত। মিশরে ইসলামিক বিষয়ে সুপন্ডিত এরূপ প্রচুর বিদূষী রমণী রয়েছেন, তাঁরা এই বিষয়ে উলেমাদের সাথে প্রকাশ্য যুক্তি তর্কে অবতীর্ণ হন। উলেমা সমাজ বিভিন্ন যুক্তির মাধ্যমে দাবী করেন, ঘর পুরুষের। পক্ষান্তরে নারী সমাজের যুক্তি হ'ল এই আয়াতে বায়ুত- ই- খুম বলা হয়নি, তা হলে অর্থ দাঁড়াতো স্বামীদের ঘর। বলা হয়েছে বায়ুত ই হিনা অর্থাৎ স্ত্রীদের ঘর। সব শেষে মিশরে নারীরাই জয়ী হয়েছে। মিশরের পার্লামেন্ট ঘরে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা করে আইন পাশ করেছে। এই আইনের বিধান অনুসারে "একজন পুরুষ তার স্ত্রীকে তালাক দিলে কিংবা ২য় স্ত্রী গ্রহণ করলে প্রথম স্ত্রী যে ঘরে বাস করতো সেই ঘরের মালিকানা প্রথম স্ত্রী ও তার সন্তানদের উপর বর্তাবে"। [১২]

আরও লক্ষ্যনীয় যে, সুরা আহযাবের ৩৩নং আয়াতে নবীপত্নিগণকেও নিজেদের গৃহ সমূহকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করতে বলা হয়েছে। এও লক্ষ্যনীয় যে, নবীপত্নিদের প্রত্যেকেরই নিজস্ব ঘর ছিলো। পক্ষান্তরে নবীজির (সঃ) কোন ঘরই ছিলোনা। নবীজি(সঃ) কোনদিন বিবি আয়শার ঘরে, কোনদিন বিবি হাফসার ঘরে, কোন দিন বিবি সুফিয়ার ঘরে, কোনদিন বিবি জয়নবের ঘরে অর্থাৎ বিভিন্ন বিবিদের ঘরে অবস্থান করতেন। আরও দেখা যায় যে, হযরত ওমর (রাঃ) মৃত্যুর পুর্বে হযরত আয়শার কাছে আয়শার ঘরে নবীজির (সঃ) রওজার পাশে নিজ রওজার স্থান পাওয়ার অনুমতি চেয়েছেন।[১৩]

অর্থাৎ ঘরের অধিকার নারীর। তা এজন্য যে ঘরের সাথে নারীর সম্পর্ক অচ্ছেদ্য। নারীর নিরাপত্তার জন্য, মাতৃত্বের সুরক্ষার জন্য, সন্তানের তথা মানব শিশুর হেফাজতের জন্য, তার নিরাপদ বেড়ে ওঠার জন্য ঘর অপরিহার্য মা'য়ের জন্য। তাই পবিত্র কুরআন তথা ইসলাম ঘরকে নারীর জন্যই নির্ধারণ করে। পবিত্র কুরআনকে যাচাই বাছাই করে ঘরের অধিকার কোন কোন মুসলিম রাষ্ট্রের নারীরা ইতোমধ্যে ভোগ করতে শুরু করেছে। যদিও অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রে এ বিষয়টি এখনও চিন্তায়ও আনতে সক্ষম হয়নি।

৫. নারী গৃহবন্দী পাখী নয় - মুক্ত মানুষ

ঘর নারীর জন্য বটে কিন্তু ইসলাম নারীকে গৃহবন্দী করেনা। পুরুষের মত নারীরও রয়েছে ব্যাপক সামাজিক কর্মকান্ডে অংশ গ্রহণের অধিকার, রয়েছে পথের অধিকার। এই পথের অধিকার ভোগরত নারীর নিরাপত্তার প্রশ্নেই আল্লাহ্পাক পুরুষদের উদ্দেশ্যে বলেন, "আপনি মুসলমান পুরুষদের বলিয়া দিন, যেন তাহারা স্বীয় দৃষ্টি অবনত রাখে, এবং নিজ নিজ লজ্জার স্থানের হেফাজত করে, ইহা তাহাদের জন্য অধিকতর পবিত্রতার কথা" (আঃ ৩০ সুরা নুর)। মহান আল্লাহ্ পুরুষদের সতর্ক করে দিয়ে বলেন, "নিশ্চয়ই আল্লাাহ সবই জানেন তাহারা যাহা কিছু করিয়া থাকে" (আঃ ৩০ সুরা নুর)।

---

১১. পূর্বোক্ত,পৃ ঃ ৯৮.

১২. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৯৭-৯৮।

১৩. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৯৭-৯৮।

ইসলামের প্রাথমিক যুগে নারীরা এই পথের অধিকার ভোগ করেছে অবাধে এবং স্বচ্ছন্দ্যে। তারা মসজিদে গিয়েছে দিনে এবং রাতেও। পুরুষের সাথে একত্রে নামায আদায় করেছে, ঈদের জমাতে শরীক হয়েছে, বাড়িতে পুরুষ অতিথিকে আপ্যায়ন করেছে, মাঠে পশু চরিয়েছে, কাঠ সংগ্রহ করেছে। পুরুষ বেষ্টিত সমাবেশে নবীজির (সঃ) নিকট দীক্ষা নিয়েছে তথা বিদ্যা অর্জন করেছে। হজ্বে গিয়েছে, এমন কি যুদ্ধেও গিয়েছে। এরূপ বিস্তর হাদিস বুখারী শরীফে রয়েছে। আজও পবিত্র হজ্বের মত বড় এবাদত নারী- পুরুষ বেষ্টিত সমাবেশেই হয়ে থাকে।

কিন্তু পরবর্তীতে ধর্মের মৌলিক বিধানের অপব্যাখ্যার মাধ্যমে নারীদেরকে অবরোধ করা হয়েছে। এবং অবরোধ জীবন যাপনে বাধ্য করা হয়েছে। লক্ষ্যনীয় যে সমগ্র কুরআনের সুরা নেছার ৩৪নং আয়াতের শেষাংশে কেবলমাত্র ব্যভিচারী নারীদের আটক রাখার বিধান বর্ণিত হয়েছে এবং আরও বলা হয়েছে যে এরাও যদি তওবা করে তবে যেনো তাদের পেছনে লেগে থাকা না হয়। আমাদের সমাজে সতীত্বের হেফাজতকারী নারীরাই বরং যুগ যুগ ধরে বিনাদোষে আটক থেকেছে। এক সময়ে সতীত্বের হেফাজতকারী নারীদের এই অবরোধ এতই কঠিন হয়েছিলো যে, সূর্য পর্যন্ত তারা দেখতে পেতোনা। তাদেরকে নাম দেয়া হয়েছিলো "অসূর্যাস্পর্শা রমণী"।

কোন রকম পেশা গ্রহণ দূরে থাকুক, লেখা পড়াটা পর্যন্ত করতে দেয়া হয়নি। এই আটক রাখার পেছনের অন্যতম যুক্তি হলো পর্দা। পর্দাকে তারা শালীনতা অর্থে গ্রহণ না করে করেছিলেন অবরোধ অর্থে। এখানেই ঘটেছে ধর্মের বিকৃতি। এই পর্দা বা অবরোধ নারী শিক্ষার বিরুদ্ধে কত অযৌক্তিক ভাবে যে প্রয়োগ করা হয়েছে তা জানা যায় পূর্বে উল্লেখিত ইংরাজ আমলের ১৮৬৭ সালে কোলকাতা মাদ্রাসার প্রখ্যাত মৌলভী আবদুল হাকিমের উক্তি থেকে। অর্থাৎ ইসলাম ধর্মে নারী শিক্ষার বিধান ও উদাহরণ থাকা সত্বেও এবং সেই বিষয়ে ওয়াকেবহাল থাকা সত্বেও এমনকি সামাজিক ও পারিবারিক ক্ষেত্রে নারী শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা জানা থাকা সত্বেও মুসলিম সমাজের নেতৃস্থানীয় জ্ঞানীগুণি জনেরাও কেবল মাত্র পর্দা-পুষিদার অজুহাতে নারীকে জ্ঞানের আলো থেকে বঞ্চিত রেখেছেন যুগের পর যুগ ধরে। [১৪]

পর্দা সংক্রান্ত পবিত্র কুরআনের আয়াতসমূহ পুর্বে উল্লেখ করে এটি স্পষ্ট করা হয়েছে যে, সেই আয়াত সমূহের কোথাও নারীকে গৃহবন্দী হওয়ার কথা নেই। সেখানে বাইরে বেরুতে হলে বুকের উপর চাদর জড়িয়ে নেয়া, সজ্জিত হয়ে গৃহের বাইরে যেয়ে নিজেদের সৌন্দর্য ও বেশ ভুষা প্রদর্শনী থেকে বিরত থাকা এবং স্ব স্ব আবরণী সংবিন্যস্থ অবস্থায় বের হওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে ।

অর্থাৎ সর্বত্রই নারীকে শালীনতার সাথে চলাফেরার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সাজ সজ্জার আতিশয্য থেকে বিরত থেকে শালীন পোষাকে বের হওয়ার কারণও এভাবে স্পষ্ট করা হয়েছে, ''ইহা তদপেক্ষা সমীচিন যে, তাহারা পরিচিত হইবে, অনন্তর তাহারা অত্যাচারিত হইবেনা"। অর্থাৎ শালীন পোষাকের নারী ভদ্র মহিলা হিসেবে এবং নিজ সতীত্বের হেফাজতকারী হিসেবে পরিচিত হবে বিধায় পথে ঘাটে সে উৎশৃঙ্খল পুরুষ কর্তৃক উত্যক্ত হবেনা।

---

[১৪]. Dr. Mohar Ali (edited) ঃ Nawab Abdul Luteef Khan Bahadoor (Autobiography and the writings) p. 103-105.

Dhaka University Institutional Repository

এই প্রসঙ্গে জনাব কাজী আওলাদ হোসেন ১৮ সেপ্টেম্বর ৯৭ সংখ্যা দৈনিক ইনকিলাব পত্রিকায় বলেন, ‘‘মহিলাদের স্বাধীনতা সীমাবদ্ধ করার কোন উদ্দেশ্য তখন ছিলোনা বরং সে সময়ে মদিনায় বিরাজমান পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে তাদেরকে উৎপীড়ন থেকে রক্ষা করাই ছিলো উদ্দেশ্য’’ ।[১৫]

আল্লাহ্পাক নারীর নিরাপত্তার জন্য, মাতৃত্বের সুরক্ষার জন্য, মানব শিশুর সঠিক হেফাজতের জন্য ঘরকে নারীর ক্ষেত্রে গুরুত্ব দিয়েছেন, তাই নারীকে ঘরকে দৃঢ় রূপে ধারণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। এখানেও নারীকে গৃহবন্দী থাকার কথা বলা হয়নি। মূলতঃ সব কিছুই নারীর নিরাপত্তার জন্য। কারণ নারীকে যদি গৃহবন্দী রাখাই মহান আল্লাহ্পাকের অভিপ্রায় হতো তবে নারীর পথের অধিকারকে নিরাপদ করার জন্য আল্লাহ্পাক পুরুষদের প্রতি এরূপ নির্দেশ দিতেন না যে, ‘‘আপনি মুসলমান পুরুষদিগকে বলিয়া দিন যে, যেন তাহারা স্বীয় দৃষ্টি অবনত রাখে এবং নিজ নিজ লজ্জার স্থানের হেফাজত করে’’(সুরা নুর, আঃ ৩০)। মহান আল্লাহ পুরুষদের এরূপ সতর্কবাণীও দিতেননা যে, ‘‘নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সবই জানেন তাহারা যাহা কিছু করিয়া থাকে’’(সুরা নুর, আঃ৩০)। এবং নারীদের উদ্দেশ্যে একথাও বলতেননা যে, ‘‘ইহা তদপেক্ষা সমীচিন যে তাহারা পরিচিত হইবে, অনন্তর তাহারা অত্যাচারিত হইবেনা এবং আল্লাহ্ ক্ষমাশীল করুণাময়’’ ।(সুরা আহযাব, আঃ ৫৯) অর্থাৎ পবিত্র কুরআন কোন অবস্থাতেই নারীকে গৃহবন্দী তো করেই না বরং নারীর শালীন পোষাকে পথের অধিকার নিশ্চিত করে। শালীন পোষাক কেবল নারীর জন্যই নয়, পুরুষের জন্যও।

৬. নারী স্বাধীন ও স্বতন্ত্র মানুষ

ইসলামে নারী ব্যক্তি স্বাতন্ত্রে উজ্জল স্বাধীন ও স্বতন্ত্র মানুষ। এখানে পুরুষের মাঝে নারীর স্বত্বা লীন হওয়ার কোন সুযোগই নেই। মহান আল্লাহ্র নিকট নারীর স্বত্বা পৃথক অস্তিত্বে বিবেচিত। পবিত্র কুরআন বলে, ‘‘আমি তোমাদের মধ্য হইতে কোন আমলকারীর আমলকে বিফল করিনা, চাই সে পুরুষই হোক কিংবা নারী’’ (আঃ ১৯৫ সুরা আল এমরান)। সুরা আহযাবে, এ বিষয়টি আরও স্পষ্ট ভাবে বর্ণিত হয়েছে, ‘‘নিশ্চয়ই মুসলমান পুরুষ, মুসলমান নারী, ঈমানদার পুরুষ, ঈমানদার নারী, অনুগত পুরুষ অনুগত নারী, সত্যপরায়ণ পুরুষ, সত্যপরায়ণ নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ, ধৈর্যশীল নারী, বিনীত পুরুষ, বিনীত নারী, দানশীল পুরুষ, দানশীল নারী, রোযা পালনকারী পুরুষ, রোজা পালনকারী নারী, যৌনাঙ্গ হেফাজতকারী পুরুষ, যৌনাঙ্গ হেফাজতকারী নারী, আল্লাহ্র অধিক যিকির কারী পুরুষ, আল্লাহ্র অধিক জিকির কারী নারী, তাদের জন্য আল্লাহ্ প্রস্তুত রেখেছেন ক্ষমা ও মহা পুরস্কার’’ (আঃ ৩৫)।

পবিত্র কুরআন এবং তৎসংশ্লিষ্ট হাদিস থেকে এটি স্পষ্ট যে, লুত নবী এবং নুহ নবীর স্ত্রীগণ নবী - স্ত্রী হওয়া সত্বেও নবীর স্ত্রী হিসেবে আল্লাহ্পাকের নিকট বিশেষ কোন সুবিধা পাননি। কারণ তারা ব্যক্তিগত ভাবে পাপী ছিলেন। তাঁরা ধর্মের বিষয়ে নবীদের বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন। আল্লাহ্ পাক বলেন, ‘‘সুতরাং সেই দুইজন নেককার বান্দা আল্লাহ পাকের মুকাবিলায় তাহাদের কিছুমাত্র কাজে আসিতে পারে নাই’’ (আঃ ১০ সুরা আত্তাহরীম)। পক্ষান্তরে পাপাচারী ফেরআউন এর স্ত্রীকে তার স্বামীর পাপ স্পর্শ করতে পারেনি। কারণ তিনি ব্যক্তিগত ভাবে নেককার বান্দা ছিলেন। আল্লাহ্পাক মমিনদের জন্য ফেরআউনের স্ত্রীর দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, ‘‘ আল্লাহ্তায়ালা মুমিনদের জন্য ফেরআউন পত্নির দৃষ্টান্ত বর্ণনা করছেন। সে বলল, হে আমার পালনকর্তা। আপনার সন্নিকটে জান্নাতে আমার জন্য একটি গৃহ নির্মাণ করুন, আমাকে ফেরআউন

[১৫]. কাজী আওলাদ হোসেন ঃ কুরআনের আলোকে মহিলাদের বাড়ির বাইরে জিলবাব, ঢিলা বহিরাবরন/চাদর ব্যবহার প্রসঙ্গে’, দৈনিক ইনকিলাব, ১৮ সেপ্টেম্বর, ৯৭, পৃঃ ৬।

ও তার দুস্কর্ম থেকে উদ্ধার করুন'' (আঃ ১১, সুরা আত্তাহরীম)। অর্থাৎ এই রমণীদের পাপ পুন্যের হিসাব তাদের ব্যক্তিগত পাপপুন্যের আঙ্গিকেই বিবেচিত হচ্ছে, তাদের স্বামীর পাপপুন্যের আঙ্গিকে নয়। আল্লাহ্‌পাক আরও বলেন, '' পুরুষ যা অর্জন করে সেটা তার অংশ, আর নারী যা অর্জন করে সেটা তার অংশ'' (আঃ ৩২ সুরা নেসা)। অর্থাৎ নারী ও পুরুষ উভয়কে ব্যক্তিগত বিচার বুদ্ধি প্রয়োগের মাধ্যমেই অর্জন করতে হবে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সফলতা।

অথচ কি আশ্চর্যজনক ভাবেই না সমাজ ব্যবস্থায় এমন একটা ভাবধারার সৃষ্টি করে রাখা হয়েছে যেন বিয়ের মাধ্যমে নারীর সমস্ত ব্যক্তিস্বত্বা লীন হয়ে যাবে স্বামীর স্বত্বায়, তা সেই স্বামী পাপীই হউন আর পুণ্যবানই হউন। মূলতঃ পবিত্র কুরআন দৃষ্টে তা মোটেও সঠিক নয়। সেখানে নারী ব্যক্তি স্বাতন্ত্রে উজ্জল স্বাধীন ও স্বতন্ত্র মানুষ।

৭. নারী শিক্ষা ফরজ

পবিত্র কুরআন নাজেল করতে গিয়ে আল্লাহ্‌পাকের প্রথম নির্দেশ হলো - 'পড়' (আঃ-১, সুরা আলাক)। অর্থাৎ জ্ঞান অর্জন কর। এই নির্দেশ মানুষের মধ্যে কোন একটি অংশের জন্য নির্দিষ্ট নয়। শুধু তাই নয়, পবিত্র কুরআনের পাতায় পাতায় ব্যক্ত হয়েছে জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা প্রশাখার কথা। কখনও ফিজিক্স, কখনও কেমেষ্ট্রি, বায়োলজী, জিওলজি, ইতিহাস, ভূগোল, জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক ইত্যাদি ছাড়াও নীতিকথা, আদর্শ, সততা, সামাজিক-পারিবারিক আচার আচরণের নির্দেশ, ফৌজদারী, দেওয়ানি এবং সাক্ষ্য প্রদান সংক্রান্ত বিষয়াদি। আরও রয়েছে এবাদতের কথা, ইহকালীন এবং পরকালীন সাফল্যের কথা, আল্লাহ্‌পাকের অস্তিত্ব উপলব্ধির বিষয়াদি সহ সব কিছুর ইঙ্গিত রয়েছে এখানে। এই সব কিছু সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করতে হলে পড়তে হবে, অনুশীলন করতে হবে। তাই আল্লাহ্‌পাক তাঁর সৃষ্টির রহস্য এবং সত্য উপলব্ধির জন্য পবিত্র কুরআনে জ্ঞান চর্চার উপর গুরুত্বারোপ করেছেন সর্বাধিক; ''নিঃসন্দেহে আসমান সমূহ এবং জমিনের সৃজনে এবং পর্যায়ক্রমে দিবা ও রাত্রির গমনাগমনে নিদর্শন সমুহ রহিয়াছে জ্ঞানবানদের জন্য'' (আঃ ১৯০, সুরা আল এমরান)। আবার, ''নিঃসন্দেহে আল্লাহতায়ালা বীজ ও আটিগুলিকে বিদীর্ণকারী, তি সজিব হইতে নির্জীবকে বাহির করিয়া থাকেন এবং তিনি নির্জীব হইতে সজীবকে বাহির করেন। .. .. তিনি প্রভাতের বিকাশকারী, তিনি রাত্রিকে বিশ্রামকাল এবং সূর্য ও চন্দ্রকে হিসাব নিরূপক বানাইয়াছেন, ... আর তিনি এমন যে, যিনি তোমাদের জন্য নক্ষত্ররাজিকে সৃষ্টি করেছেন যেনো তোমরা উহাদের সাহায্যে অন্ধকার পথের সন্ধান পাইতে পার স্থল ভাগে এবং সমুদ্রেও। নিশ্চয়ই আমি প্রমাণ সমূহ খুব বিষদ ভাবে বর্ণনা করি ঐ সকল লোকদের জন্য, যারা জ্ঞান রাখে''। ''আর তিনি এমন, যিনি তোমাদিগকে একই নফস হইতে সৃজন করিয়াছেন, অনন্তর একটি স্থান অধিক দিন, একটি স্থান অল্প দিন থাকিবার জন্য রহিয়াছে। নিশ্চয়ই আমি প্রমাণ সমূহ বিশদরূপে বর্ণনা করিয়াছি ঐ সকল লোকের জন্য, যাহারা বুঝে। আর তিনি এমন যিনি আকাশ হইতে পানি বর্ষণ করিয়াছেন, অনন্তর আমি তদ্বারা সর্বপ্রকার উদ্ভিদ উদগত করিয়াছি, অতঃপর আমি উহাতে সবুজ গাছগুলি বাহির করিয়াছি, যাহা হইতে আমি একে অন্যের উপর সংস্থাপিত দানা বাহির করি। এবং খেজুর বৃক্ষ হইতে ছড়া বাহির হয় যা নিচের দিকে ঝুলিয়া থাকে। আঙ্গুরের উদ্যান সমূহ এবং যাইতুন ও আনার যার কতক একে অন্যের সদৃশ এবং কতক অসাদৃশ্য। প্রত্যেক বৃক্ষের ফলের প্রতি তো লক্ষ্য কর, যখন উহা ফলবান হয়, আর উহা পাকিবার সময়তো লক্ষ্য কর, এই সমূদয়ের মধ্যে প্রমাণ সমূহ রহিয়াছে ঐ সকল লোকের জন্য, যারা ঈমান আন'' (আঃ ৯৫-৯৯ সুরা আনআম)। এই যে বোঝার জন্য এবং জ্ঞান অর্জনের নির্দেশ তার কোনটিই কিন্তু মানুষের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট অংশের জন্য সীমাবদ্ধ নয়। আল্লাহ্‌পাক জ্ঞানী ও অজ্ঞদের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করে বলেন, ''আপনি বলুন যে যারা জ্ঞানী ও যারা অজ্ঞ তারা কি সমান হতে পারে''? (আঃ ৯ সুরা ঝুমুর)।

দুঃখ জনক যে, নারী জাতিকে শিক্ষা থেকে, জ্ঞান অর্জন থেকে বঞ্চিত রেখে জ্ঞানী ও অজ্ঞদের মধ্যে যে পার্থক্য পুরুষ ও নারীর মধ্যে সেরূপ পার্থক্য সৃষ্টি করে, পুরুষ জাতি যুগ যুগ ধরে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করেছেন, যা মোটেও ইসলামিক ছিলোনা এবং ইসলামিক নয়।

বরং ইসলামে পুরুষের মতই নারী শিক্ষা ফরজ তথা অবশ্যপালনীয়। কারণ সত্যকে বুঝতে হলে, উপলব্ধি করতে হলে নারী পুরুষ নির্বিশেষে সমগ্র মানব জাতির জন্য জ্ঞান অর্জন অপরিহার্য। আর সে জন্যই মহানবী হযরত মুহম্মদ (সঃ) ঘোষণা করেছেনঃ 'বিদ্যা শিক্ষা(এলেম তলব করা) প্রত্যেক মুসলমান নর নারীর জন্য ফরজ' (মোছনাদে আবু হানিফা)।[১৬]

অথচ কোন এক অজ্ঞাত রহস্যজনক কারণে এই ফরজ কাজটিকেই নারীদের জন্য হারাম করে দেয়া হয়েছিলো। কে করেছে, কেন করেছে, কখন করেছে তার কোন নির্দিষ্ট প্রমাণ আজ খুঁজে পাওয়া মুশকিল। ব্যাপক কোন গবেষণার দ্বারা হয়ত এই রহস্যের উন্মোচন হতে পারে, কিন্তু বহু যুগ ধরে নারীকে শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত রেখে মুসলিম সমাজের যে অপুরণীয় ক্ষতি হয়ে গেলো তার হিসাব কে দেবে? অথচ এই অত্যাবশ্যকীয় অধিকারটি আদায়ের জন্য মুসলমান নারীদের আন্দোলন করতে হয়েছে এবং হচ্ছে।

৮. নারী হবে উপার্জনক্ষম এবং স্বাবলম্বী

শুধু বিদ্যা শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়াই নয়, ইসলাম নারীকে উপার্জনক্ষম এবং স্বাবলম্বী করে। মহান আল্লাহ্ নারীকে পিতা-মাতা, ভাই-বোন, স্বামী, পুত্র সকলের সম্পত্তির অধিকারী করেছেন। (আঃ **১১,১২,১৭৬** সুরা নেছা)। এবং সুস্পষ্ট ভাবেই সম্পত্তির মালিকানার বিষয়ে আল্লাহ্পাক বলে দিয়েছেন, ''পুরুষদের জন্য অংশ রহিয়াছে উহা হইতে, যাহা পিতা মাতা এবং নিকট আত্মীয়গণ ছাড়িয়া যায় এবং নারীদের জন্যও অংশ রহিয়াছে যাহা পিতা-মাতা এবং নিকট আত্মীয়গণ ছাড়িয়া যায়, সে বস্তু অল্পই হোক আর বেশীই হোক অংশ অকাট্য'' (আঃ ৭ সুরা নেছা)। আল্লাহপাকের বিধান অর্থহীন হতে পারেনা। অর্থাৎ যেমনি পুরুষদের তেমনি নারীদেরও উক্ত সম্পত্তি থেকে আয় উপার্জন করাই উদ্দেশ্য। যাতে নারী অসহায়, নিঃসম্বল হয়ে না পড়ে।

আবার বিয়ের মাধ্যমে নারী পায় মোহরানা। এটিও নারীকে প্রদেয় একটা মূলধন। এটি সুদ বিহীন এমনই একটি মূলধন, যা খাটিয়ে নারী ব্যবসার মাধ্যমে আয়-উপার্জন করতে পারে। এবং জীবনের যে কোন ঝুকি মুকাবিলা করতে পারে। এর মাধ্যমে নারী প্রচুর লাভবান হলেও মূলধন ফেরত যোগ্য নয়। সুদ বিহীন এবং মূলধনও ফেরত যোগ্য নয়, এমন আশ্চর্য মূলধন আর কোথায় আছে?

ধর্মে শিক্ষা গ্রহণকে যেমনি পুরুষদের জন্য তেমনি নারীর জন্যও ফরজ করা হয়েছে। অর্জিত এই বিদ্যা পুরুষেরা কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগ করবে আর নারী মগজে নিয়ে বসে থাকবে এরূপ নির্দেশ তো কোথাও নেই। তাই যেমনি পুরুষদের তেমনি নারীও তার অর্জিত বিদ্যা কাজে লাগাবে, ঘরে বাইরে তথা কর্মক্ষেত্রে।

পবিত্র কুরআন মাফিক, কোন ব্যক্তি শুধু মাত্র পুরুষদের সম্পত্তির মালিক হচ্ছেন তা কিন্তু নয়, নারীর সম্পত্তিরও মালিক হচ্ছেন। যেমন পিতার মতই মায়ের সম্পত্তিরও মালিক হচ্ছে সন্তান সন্ততিগণ। সুরা নেছার **১১**নং আয়াতে মৃত ব্যক্তি বলতে পুরুষ মাত্রকে বোঝানো হয়নি, তিনি পুরুষও হতে পারেন নারীও

[১৬]. মেশকাত শরীফ ঃ মাওলানা নূর মোহাম্মদ আ'জমী (রঃ) কর্তৃক বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা সহ, এমদাদিয়া লাইব্রেরী, চকবাজার , ঢাকা, ১৯৮৭,
পৃঃ ২০ এবং গোলাম মোস্তফা ঃ বিশ্বনবী, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ৬৬ প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার,ঢাকা -১১০০, ১৯৪২, পৃঃ ৪১৬।

হতে পারেন। এ ছাড়া স্বামীও হচ্ছেন স্ত্রীর সম্পত্তির মালিক (আঃ ১২ সুরা নেছা)। ভাই হচ্ছে বোনের সম্পত্তির মালিক (আঃ ১৭৬, সুরা নেছা)। এই সম্পত্তি নারী কোথা থেকে এবং কিভাবে অর্জন করছে? যদি তার নিজস্ব আয় উপার্জনই না থাকবে? এর থেকে এটি প্রমাণিত যে, ইসলামে নারী, পুরুষদের মতই উপার্জনশীল, স্বাবলম্বী। নবী হযরত মুহম্মদ (সঃ) এর পত্নি বিবি খাদিজা তার প্রকৃষ্ট উদাহরন। আবার হযরত মুহম্মদ (সঃ) এর ওফাতের পর তিনি তো বিন্দু পরিমান সম্পদ কারও জন্য রেখে যাননি। তাঁর কোন সম্পদ ছিলওনা। তখন তাঁর স্ত্রীগণ চলেছেন কিভাবে? নিজস্ব আয় রোজগারের মাধ্যমে।

অথচ দুঃখ জনক যে, নারীকে তার নিজস্ব সম্পদ থেকে, পিতা মাতার সম্পত্তি থেকে, স্বামীর নিকট থেকে প্রাপ্য মোহরানা থেকে, স্বামীর সম্পত্তি থেকে, সন্তানের সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করার নানা প্রকারের কুটকৌশল আবিস্কৃত হয়েছে আমাদের মুসলিম সমাজে। নারীকে শিক্ষা দীক্ষা থেকে বঞ্চিত রেখে তার নিজস্ব আয় উপার্জনের যাবতীয় পথ ঘাট রুদ্ধ করে দিয়ে, অসহায়, সহায় সম্বলহীন করে রেখে যুগ যুগ ধরে মুসলমান সমাজ কোন ফায়দা পেয়েছে কি? পায়নি, বরং মুসলিম সমাজই সংকীর্ণতায় আবদ্ধ হয়েছে।

৯. শিক্ষিত/ অশিক্ষিত/উপার্জনে সক্ষম/ উপার্জনে অক্ষম সকল নারীই নিরাপদ আর্থিক ও সামাজিক ভাবে

পুর্বের আলোচনা থেকে দেখা গেছে যে, ইসলামে নারীর শিক্ষিত হওয়া, উপার্জনক্ষম এবং স্বাবলম্বী হওয়ার যাবতীয় পথ উন্মুক্ত। এছাড়াও আল্লাহ্পাক যে পুরুষকে নারী জাতির জন্য 'কাউওয়াম' হিসেবে নির্ধারণ করে দিয়েছেন (সুরা নেছা আঃ ৩৪), যার কারণে Men are the protector and maintainers of women. He stands firm in her business; protect her interest, and looks after her affairs. তথা পুরুষ মহিলাদের নিরাপত্তা বিধানকারী এবং ভরণ-পোষণ কারী। তিনি তার (নারীর) স্বার্থ রক্ষায় দৃঢ় থাকেন, নিরাপত্তা নিশ্চিত করেন এবং তার যাবতীয় বিষয় দেখাশুনা করেন" ।[১৭]

এই কাউওয়ামের কারনেই পুরুষকে নারীর ভরণপোষণ করতে হচ্ছে। একজন পুরুষ যখন বিয়ে করছেন তখন তিনি উক্ত নারীর ভরণপোষণকারী হচ্ছেন কিনা তার পুর্বশর্ত হিসেবে তাকে মোহরানারূপ পুঁজি অর্পণের মাধ্যমে নিশ্চয়তা প্রদান করতে হচ্ছে। আল্লাহ্পাকের নির্দেশ -''আর তোমরা স্ত্রীদিগকে তাহাদের মোহর সন্তুষ্ট চিত্তে দিয়া দাও'' (আঃ ৪, সুরা নেছা)। এ বিষয়ে শাহ আবদুল হান্নান এর বক্তব্য প্রাসঙ্গিক। তিনি বলেন, ''Dowry or marriage gift by bride groom to the bride is a symbolic expression of the groom cognigance of the economic responsibilities of marriage and of his readiness to assume all such responsibilities subsequent to marriage." তথা "বরের পক্ষ থেকে কনেকে যৌতুক অথবা বিবাহকালীন উপহার প্রদান মূলত স্বামী কর্তৃক স্ত্রীর বিবাহকালীন খরচাদি সহ বিবাহের পরে জীবনভর স্ত্রীর ভরণ-পোষণ এবং যাবতীয় খরচাদি বহনের মূর্ত-প্রতিক" ।[১৮] এই ভরণ-পোষণ এবং মোহরানা প্রাপ্তির মাধ্যমে নারীর সর্বাধিক আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছে। যার উদাহরণ বিরল। এতে করে নারী উপার্জনশীল হলে তো সোনায় সোহাগা, উপার্জনে অক্ষম নারীও নিশ্চিত আর্থিক ভাবে।

---

[১৭]. Abdullah Yusuf Ali ঃ The Holy Qur-an (text, translation and commentary), p. 195 and The Holy Qur-an. English translation of the meanings and commentary (Revised & edited) পূর্বোক্ত, p. 219. (সুরা নেছায় 'কাউয়ামুন' - এর অর্থ প্রসঙ্গে)

[১৮]. শাহ আবদুল হান্নান ঃ Social laws of Islam, p. 16.

এই কাউওয়ামের দায়িত্ব একজন পুরুষের জন্য এতই কঠিন যে তার যোগ্যতা অর্জন না করা পর্যন্ত তাকে অবিবাহিত থাকতে বলা হয়েছে- ''আর যাহারা বিবাহ করিতে অসমর্থ, তাহাদের উচিত যেনো তাহারা সংযমী হইয়া থাকে, যে পর্যন্ত না আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাব মুক্ত করে দেন" (আঃ ৩৩ সুরা নুর)।

প্রফেসর রফিউল্যাহ শিহাব বলেন, ''In Islam the responsibility for bearing all the expenses of marriage rests on the shoulders of the bridegroom. If he is in a position to meet this expenditure, well and good, otherwise he should refrain from marrying till he is able to arrange the dower-money (mehr) required for meeting the expenses of the marriage. In the mean time he is asked to control his passions by fasting.'' অর্থাৎ "ইসলাম ধর্মে বিবাহের যাবতীয় খরচের দায়িত্ব বরের। যদি তিনি এই খরচ চালাতে সক্ষম থাকেন তবে ভালো, এবং মোহরানা সহ বিয়ের খরচ চালাতে যদি তিনি সক্ষম না থাকেন তবে তাঁর বিয়ে করা থেকে বিরত থাকাই উত্তম। এই সময়ে তাঁকে রোজা রাখার মাধ্যমে ধৈর্য ধারণ করতে হবে"। [১৯]

পক্ষান্তরে, নারীদের ক্ষেত্রে হউন তিনি উপার্জনে সক্ষম কিংবা সম্পদশালী তিনি কিছু খরচ করবেন কি করবেন না, মোহরানার অংশ বিশেষ ছেড়ে দেবেন কি দেবেন না তার সবই নারীর নিজস্ব এখতেয়ার। আল্লাহ্পাক বলেন, ''তবে যদি স্ত্রীগণ মোহরের কিয়দংশ ছাড়িয়া দেয়, তবে তোমরা উহা মর্যাদার তৃপ্তকর বলিয়া ভোগ কর" (আঃ ৪ সুরা নেছা)। এখানে 'যদি' শব্দটির মাধ্যমে কোনরূপ ছাড় কিংবা খরচ, নারীর এখতেয়ারে রেখে দেয়া হয়েছে। এই অর্থে একজন স্বামীর সম্পদ, আয় উপার্জন নারীর জন্যে, নারীর নিজস্ব সম্পদ আয় উপার্জনও নারীর জন্যে। অর্থাৎ সবই নারীর জন্য। ঠিক মক্ষিরাণীর মতই তার মর্যাদা। অর্থাৎ ইসলামে নারী সর্বদাই আর্থিক ভাবে স্বচ্ছল তথা একেবারে নিরাপদ। হউক সে শিক্ষিত কিংবা অশিক্ষিত, উপার্জনে সক্ষম, কিংবা অক্ষম, ধনী কিংবা গরীব। যার আর্থিক ভিত্তি যত মযবুত সেইতো তত ক্ষমতাবান। তাহ'লে নারীর ক্ষমতায়নের জন্য পবিত্র কুরআনকে কেন পর্যালোচনা করা হচ্ছেনা?

শুধু আর্থিক ভাবেই নয়, ইসলামে নারী নিরাপদ সামাজিক ভাবেও। কারণ 'কাউওয়ামুনে'র দায়িত্ববোধ থাকলে কোন স্বামীর পক্ষেই স্ত্রীকে মারধর করা, নিপীড়ন, নির্যাতন করা সম্ভব নয়। শুধু ঘরে নয়, বাইরেও। যেহেতু পবিত্র কুরআন 'কাউওয়াম' এর দায়িত্ব কেবল স্বামী স্ত্রীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ করেনি বরং সার্বিক ভাবেই পুরুষ জাতিকে নারীজাতির জন্য 'কাউওয়াম' হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। তাই ঘরে বাইরে সর্বত্রই এমনকি রাতের অন্ধকারেও একজন নারী নিরাপদ পুরুষের হাত থেকে। ফলে মুসলিম সমাজে নারী নির্যাতন, নারী হরণ, নারী ধর্ষণ হওয়া অনুচিত এবং অকল্পনীয় ব্যাপার। সেখানে পতিতালয়ের অস্তিত্বই থাকার কথা নয়।

এভাবে নারী নিরাপদ রাস্তা ঘাটের উদ্যত ইভটিজারদের হাত থেকে, নারী পাচারকারীদের হাত থেকে। শুধু উদ্যত ইভটিজার এবং পাচারকারী ইত্যাদিই নয়, ইসলামে নারী নিরাপদ পুরুষের লালসা মিশ্রিত চক্ষু থেকে পর্যন্ত। আল্লাহ্পাক পুরুষদের বলেন, ''যেন তাহারা স্বীয় দৃষ্টি অবনত রাখে এবং নিজ নিজ লজ্জার স্থানকে হেফাজত করে। ইহা তাহাদের জন্য অধিকতর পবিত্রতার কথা, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সবই জানেন তাহারা যাহা কিছু করিয়া থাকে" (আঃ ৩০ সুরা নুর)।

এত অধিক নিরাপত্তা নারী আর পাচ্ছে কোথায়? একমাত্র ইসলাম তথা পবিত্র কুরআনই নারীকে দিয়েছে সর্বাধিক এবং সর্বাত্মক সামাজিক এবং আর্থিক নিরাপত্তা।

[১৯]. Prof. Rafiullah Shehab ঃ Rights of Women in Islamic shariah. p. 61.

১০. নারীর অধিকার পুরুষের অধিকারের সমান

নারী- পুরুষের সমান অধিকারের বিষয়টি কারো দয়ার দান নয়, এটি মহান আল্লাহ প্রদত্ত নারীর জন্য তার কুরানিক অধিকার। পবিত্র কুরআনে আল্লাহপাক বলেন, ''আর নারীদেরও (পুরুষেরউপর) তদ্রুপ দাবী যদ্রুপ ঐ নারীর উপর (পুরুষের) দাবী আছে'' (আঃ ২২৮, সুরা বাকারা)। এই আয়াতের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ভাবেই মহানবী হযরত মুহম্মদ (সঃ) বলেন, ''জানিও তোমাদের স্ত্রীদের উপর তোমাদের যেরূপ দাবীদাওয়া ও স্বত্বাধিকার আছে তোমাদের উপরও তাহাদের সেরূপ দাবী দাওয়া ও স্বত্বাধিকার রয়েছে'' (মুসলিম/আবু দাউদ)। এই আয়াত এবং হাদিসের বর্ণনাভঙ্গী অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ; কারণ এখানে ''নারী ও পুরুষের পরস্পরের অধিকার সমান'' এরূপ মোদ্দা কথা বলে দেয়া হয়নি। বরং বলা হয়েছে, ''নারীর উপর পুরুষের যে যে দাবী বা অধিকার রয়েছে (নিয়মমত) পুরুষের উপরও নারীর সেই সব দাবী ও অধিকার রয়েছে''।

''নারী ও পুরুষের পরস্পরের অধিকার সমান''- এরূপ মোদ্দা কথা বলে দেয়া হলে সুরা নেসায় উল্লেখিত **'কাউওয়ামুনে'র** তাৎপর্যই ব্যাহত হতো। (কাউওয়াম এর তাৎপর্য সম্পর্কে ইসলামিক চিন্তাবিদগণের ব্যাখ্যার আলোকে ইতোপূর্বে বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে)। বর্তমানে লক্ষ্যনীয় যে, এই 'কাউওয়ামুনে'র তাৎপর্য তথা স্ত্রীর প্রতি ভরণপোষণ এবং নিরাপত্তা বিধানের কর্তব্য বহাল রেখেই মহান আল্লাহ্ নারী ও পুরুষের বাকি অধিকারকে সমান করে দিয়েছেন। এর চাইতে অধিক নারীর আর কি চাওয়ার থাকতে পারে?

অথচ অত্যন্ত দুঃখ জনক ভাবে নারী ও পুরুষের মধ্যে Gender balanced equity স্থাপনের চমৎকার এই বিধানটিও দীর্ঘদিন যাবত অপব্যাখ্যার অনলে দগ্ধ হয়েছে। বহু পূর্ব থেকেই মুসলমান পুরুষ সমাজ নারী ও পুরুষের এরূপ সমান অধিকারের বিষয়টি মেনে নিতে পারেননি। তাই সুরা বাকারার ২২৮ নং আয়াতের দ্বিতীয় অংশের উপর ভর করে ভিন্ন ব্যাখ্যা দেয়ার প্রয়াস নেয়া হয়েছে। আয়াতের দ্বিতীয় অংশে বলা হয়েছে- ''ওয়ালেররেজালে আলাইহেন্না দারাজাতুন''। যার আক্ষরিত অর্থ হলো 'তাহাদের স্ত্রীদের সম্বন্ধে পুরুষদিগের একটা বিশেষ দর্জা (degree) আছে'। পবিত্র কুরআনের কোন কোন অনুবাদে এই অংশের অর্থ এভাবে করা হয়েছে যে, 'আর পুরুষদের অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠত্ব রহিয়াছে নারীদের উপরে'। এরূপ অর্থ যে ২২৮ নং আয়াতটির সার্বিক অর্থকে স্ববিরোধী করে তোলে তা যারা এরূপ অনুবাদ গ্রহণ করেছেন তারা সম্ভবতঃ খেয়াল করেননি। কারন ২২৮নং আয়াতটির 'ওয়ালেররেজালে আলাইহেন্না দারাজাতুন' এর উল্লেখিত অনুবাদ বলে, যখনই পুরুষ নারীর উপর তার শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করবে তখনই আয়াতের প্রথমাংশের ''আর নারীদেরও (পুরুষদের উপর) তদ্রুপ দাবী আছে যদ্রুপ ঐ নারীর উপর (পুরুষের) দাবী আছে'' বলে নারীরাও একইরূপ শ্রেষ্ঠত্ব দাবীর ক্ষমতা রাখে। এরূপ ভিত্তিহীন অনুবাদ কিভাবে গ্রহণীয় হতে পারে?

পক্ষান্তরে বিশ্ববিখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ ডঃ জামাল বাদাবির এই ডিগ্রীকে পুরুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য মর্মে উল্লেখ করে সুরা নেছায় মহান আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত কাউওয়াম এর সাথে সম্পৃক্ত করে বলেন 'Such degree is Qiwam (maintenance and protection)'।[২০] মোঃ আকরাম খাঁ ও পুরুষের এই বিশেষ দর্জা বা ডিগ্রীকে কাউওয়াম এর দায়িত্ব ও কর্তব্য মর্মে উল্লেখ করে বলেন, ''নারীর তুলনায় পুরুষের দর্জা এক ডিগ্রী বেশী'' অর্থাৎ '' পুরুষের কর্তব্য নারীর তুলনায় অধিক''। যা নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে সুরা নেছার ৩৪নং আয়াতে। সেখানেই পুরুষকে নারীর ভরন পোষনকারী এবং নিরাপত্তা বিধানকারী তথা 'কাউওয়াম' হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে। সুরা বাকারার ২২৮ নং আয়াতের শেষোক্ত Clause টি জুড়ে

---

[২০]. Gamal A. badawi ঃ Women in Islam. তসলিমা নাসরিনের ইসলাম বিদ্বেষ ও অপব্যাখ্যা গ্রন্থের পরিশিষ্টে প্রবন্ধটি সংযোজন করা হয়েছে, পৃ ঃ ৫৯-৭৯।

দিয়ে পুরুষের সেই 'কাউওয়ামের' দায়িত্ব ও কর্তব্যকেই এখানে সংরক্ষণ করা হয়েছে। ঈমাম রাগেব, ডঃ জামাল বাদাবীর এবং মাওলানা আকরম খাঁ প্রমুখ বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদগণ সেই বিষয়টিই নিকট পরিস্কার করেছেন।[২১]

তা হ'লে সুরা বাকারার ২২৮ নং আয়াতের সার্বিক অর্থ দাঁড়াচ্ছে এই, ''আর নারীদেরও (পুরুষদের উপর) তদ্রুপ দাবী আছে যদ্রুপ ঐ নারীর উপর (পুরুষদের) দাবী আছে। তবে পুরুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য অধিক''। অর্থাৎ আল্লাহ্পাক নারীর প্রতি পুরুষের দায়িত্ব ও কর্তব্যের বিশেষ শর্ত আরোপ করেই তাদের উভয়ের অধিকারকে সমান করেছেন। এভাবে নারীর সন্তান ধারণ ও জন্ম দানের বিশেষ ভূমিকার সাথে পুরুষের ভরণপোষণ এবং নিরাপত্তার বিধানের বিশেষ ভূমিকা আরোপের মাধ্যমে উভয়ের ভূমিকার সমন্বয় সাধিত হয়েছে। আবারও বলতে হচ্ছে এটিই হচ্ছে কুরআনিক ইকুইটি। তথা Gender Justice। পৃথিবীতে মানব প্রজাতিকে টিকিয়ে রাখার এমন Balanced Strategy মহান স্রষ্টা ছাড়া আর কার পক্ষে দেওয়া সম্ভব? এমন নিরপেক্ষ ইকুইটিই বা আর কে বিধান করতে পারে? এ হচ্ছে নারীর এক বিশেষ মর্যাদা। মাতৃত্বের মর্যাদা।

ইসলামের প্রাথমিক যুগে স্বয়ং মহানবী (সঃ) যখন কল্যান রাষ্ট্র পরিচালনা করছিলেন তখন অত্যন্ত নিরপেক্ষ ভাবে নারী ও পুরুষের সমান অধিকারের বিষয়টি চর্চা হতো। তা এতই নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠ ছিলো যে জানা যায়, জায়েদ ইবনে জুবায়েরের কন্যা হাবিবার সাথে তাঁর স্বামী সাদ ইবনে রাবীর মধ্যে কোন কারণে বিরোধ দেখা দিলে রাবী (স্বামী) হাবীবাকে থাপ্পড় মেরে বসেন। হাবীবা এই বিষয়ে তাঁর পিতার নিকট অভিযোগ করলে পিতা জুবায়ের হাবিবাকে নিয়ে নবীজির (সঃ) সমীপে উপস্থিত হন। এবং মহানবী (সঃ) নির্দেশ দেন যে যতটা জোরে সাদ ইবনে রাবী হাবীবাকে থাপ্পড় মেরেছে, হাবীবারও অধিকার রয়েছে তাকে ততটা জোরে থাপ্পড় মারার।[২২] পবিত্র কুরআনের সুরা বাকারার ২২৮ নং আয়াতের সমান অধিকারের প্রেক্ষিতে এর চাইতে নিরপেক্ষ ফয়সলা আর কি হতে পারে?

যদিও পরবর্তীকালে হাবিবা সংক্রান্ত ঘটনা অপব্যাখ্যার কবলে পতিত হয়েছে - একটা শানে নযুলের মাধ্যমে। তাহলো মহানবী (সঃ) কর্তৃক হাবীবাকে সমান জোরে থাপ্পড় মারার উল্লেখিত ফয়সলা দেয়ার পরপরই নাকি সুরা নেছার ৩৪ নং আয়াতটি নাজেল হয়েছে যাতে আল্লাহ্পাক কর্তৃক পুরুষকে নারীর শাসনকর্তা স্থির হয়েছে। যার কারণে নাকি মহানবী (সঃ) তাঁর প্রদত্ত ফয়সলা বাতিল করেছেন।[২৩]

হাবিবা সংক্রান্ত মহানবীর (সঃ) ফয়সলা এবং এই শানে নযুল সম্পর্কে প্রফেসর রফিউল্যাহ শিহাব বলেন, ''In the 'Jahilia' society before Islam, it was customary for the husbands to beat their wives. But equal rights granted by Islam to women convinced the believers that this custom was against the teachings of Islam. It was due to this conviction that when an Ansary slapped the face of his wife, she complained against him in the court of the holy prophet (peace be upon him). The Holy prophet ordered that the husband should be treated similarly". তিনি আরও বলেন, "But according to a report, Almighty Allah did not like this decision of the

---

২১. মোঃ আকরম খাঁ ঃ সরল বাংলা অনুবাদও বিস্তারিত তাফসীর সহ কোরআন শরীফ, প্রথম খন্ড, পৃঃ ২৭৫।

২২. তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন, (২য় খন্ড), পৃঃ ৪৫।

২৩. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৫-৪৬।

holly prophet and the above mentioned Verse 34 revealed". অর্থাৎ "ইসলাম ধর্মের পূর্বে জাহিলিয়া সমাজে স্বামীদের কর্তৃক তাদের স্ত্রীদের মারধর করার বিষয়টি গতানুগতিক ব্যাপার ছিল। কিন্তু ইসলাম ধর্মের সমান অধিকার বিধানের প্রেক্ষিতে ইসলাম ধর্মের অনুসারিরা বুঝতে সক্ষম হন যে, স্ত্রীকে মারধরের বিষয়টি ইসলাম ধর্মের শিক্ষার বাইরে। এটি এজন্য বিশ্বাসযোগ্য হয় যে, যখন একজন স্বামী তার স্ত্রীর মুখে থাপ্পড় মারে, তিনি মহানবী (সঃ) কাছে তার স্বামীর বিরুদ্ধে এই জন্য নালিশ করলে নবী (সঃ) আদেশ দেন যে, স্বামীর প্রতিও একই ধরনের আচরণ করা হউক" কিন্তু পরবর্তী সময়ের আর একটি রিপোর্ট অনুসারে বলা হয় যে, "আল্লাহপাক মহানবীর এই সিদ্ধান্ত পছন্দ করেননি যার কারণে সুরা নেছার ৩৪ নং আয়াতটি নাজেল হয়েছে"[২৪]। জনাব রফিউল্লাহ শিহাব এ প্রসঙ্গে বলেন 'This report speaks against itself as it presented the Holly prophet as a person could not differentiate between right and wrong'. অর্থাৎ এই শানে নযুল মহানবীকে (সঃ) সেই মানুষ হিসেবে প্রতিভাত করে যিনি ভালো ও মন্দে পার্থক্য করতে সক্ষম ছিলেননা"।[২৫]

এই শানে নযুল মহানবী (সঃ) কেই শুধু বৈপরিত্যের মধ্যে ফেলে তা নয়, এটি গ্রহণ করা হলে পবিত্র কুরআনের ক্ষেত্রেও বৈপরিত্য ও স্ববিরোধীতা আরোপ করা সম্ভব। তা হলো একবার নারীর অধিকার পুরুষের অধিকারের সমান বলে আবার পুরুষকে নারীর শাসনকর্তা বানানো হলে উভয় বক্তব্য বৈষম্য মন্ডিত হয়ে পড়ে। অথচ আল্লাহ্ পাক বহুবার পবিত্র কুরআনে কোনই বৈষম্য নেই মর্মে ঘোষণা দিয়েছেন।

মূলতঃ 'কাউওয়াম' শব্দের শাসনকর্তা রূপ অর্থ বহাল রাখার উদ্দেশ্যেই এবং পুরুষ কর্তৃক নারীকে মারধর করার বিষয়টিতে ধর্মীয় আবহ দানের উদ্দেশ্যেই যে শানে নযুলটির উদ্ভব তা অনুমান করা মোটেও কঠিন নয়। বিখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ জামাল বাদাবির, আবদুলাহ ইউসুফ আলী, এম. পিকাথল, আবদুল আতি, মোহাম্মদ আসাদ, ঈমাম রাগেব, মোঃ আকরম খাঁ প্রমুখেরা 'কাউওয়ামুন' শব্দের অর্থ যে ভরনপোষনকারী এবং নিরাপত্তাবিধানকারী এবং কোন অবস্থাতেই শাসনকর্তা নয় তা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাঁদের কেউ কেউ মহান আল্লাহ্র এক গুনবাচক বৈশিষ্ট্য কাউয়াম এর সাথে এর তুলনা করেছেন। তাহলে কাউওয়ামের দায়িত্ব কত বড়, কত অধিক তা কল্পনাতেও শরীর শিউরে ওঠার কথা। অথচ নির্বোধেরা নিরাপত্তা প্রদানের এই গুরুদায়িত্বকে মারধর করার অধিকারের পর্যায়ে নামিয়ে এনে আল্লাহ্পাকের বিধানকে কি ভয়ংকর অপব্যখ্যার অনলেই না দগ্ধ করেছেন।

উপরে উল্লেখিত ইসলামী চিন্তাবিদগণের বক্তব্য উল্লেখ করে মিসেস নাসিমা হাসান তাঁর 'Wife: Her Status in Islam প্রবন্ধে বলেন, ''Hence a Qawwam cannot be a dictator, unjust, irresponsible or adamantine.''অর্থাৎ কাউয়াম বলতে একনায়ক শাসনকর্তা, অবিবেচক, দায়িত্বহীন, প্রশাসককে বুঝায়না"।।[২৬]

পবিত্র কুরআন খেইল তামাশা নয়। স্বয়ং আল্লাহপাক বলেন, ''আল্লাহ্র বিধানকে খেইল তামাশা মনে করিও না" (আঃ ২৩১ সুরা বাকারা)। পবিত্র কুরআনে অসংগতি, স্ববিরোধীতা অসম্ভব। কারণ ইহা স্রষ্টার তরফ থেকে আগত। আল্লাহপাক বলেন, ''তবে কি তাহারা কুরআনে মনোসংযোগ করেনা? আর যদি তা

[২৪]. Prof. Rafiullah shehab ঃ Rights of Women in Islamic Shariah.opcit. p. 116.

[২৫] ..opcit. p. 116.

[২৬]. Md Mahmudul Hasan (Editor) ঃ The pioneer: A speacial issue in gender question: Gender Issue: An Islamic Approach, opcit. p. 62.

আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাহারও নিকট হইতে হইত তবে উহার মধ্যে তাহারা বহু বৈসাদৃশ্য পাইত'' (আঃ ৮২, সুরা নেছা)। তাহলে দাঁড়াচ্ছে এই যে, ''আর নারীদেরও (পুরুষদের উপর) তদ্রুপ দাবী আছে যদ্রুপ ঐ নারীর উপর (পুরুষের) দাবী আছে'' এবং "ওয়ালেররেজালে কাউয়ামুনা আলাননেছায়ে" অর্থাৎ পুরুষ নারীর ভরণপোষণ কারী এবং নিরাপত্তাবিধানকারী"। তাহ'লে কাউওয়াম অর্থ হচ্ছে তথা নিরাপত্তা বিধান ও ভরণপোষনের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

১১. নারীর মর্যাদা অতুলনীয়

বেইজিংএ অনুষ্ঠিত চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনে তৎকালীন আমেরিকার ফাষ্টলেডী হিলারী ক্লিনটন যে নারীর মাতৃত্বের মর্যাদার প্রশ্ন তুলে দাবী করেছেন," নতুন মর্যাদা, নতুন সম্মান চাই নারীদের জন্য। যারা মা হিসেবে, মেয়ে হিসেবে এই বিশ্বে মানব সমাজকে বাঁচিয়ে রাখছে তাদের অকল্যান করে সমাজ ও রাষ্ট্র এগুতে পারেনা"।[২৭] সেই মর্যাদাই Ensure করা আছে ইসলাম ধর্মে। হিলারী ক্লিনটন এর তা জানা থাকলে নিশ্চয়ই তিনি তার উল্লেখ করতেন। আমরা দেখি ইসলামে নারী স্বমহিমায় উজ্জল এক মর্যাদাশীল মানুষ। নারীর এই মর্যাদা তার মাতৃত্বের জন্যে। নারী হচ্ছে মা। সে মানব শিশুকে গর্ভে ধারণ করে পলে পলে কষ্টের সাথে। অতঃপর তীব্র তীক্ষ্ণ যন্ত্রনার মধ্যে নিজ জীবন বাজি রেখে জন্ম দেয় মানব শিশু। এর পর স্বীয় বুকের দুধে লালন করে। এই সম্পর্কে পবিত্র কুরআন বলে, ''কত কষ্টে জননী তাহাকে গর্ভে ধারণ করিয়াছে। কত কষ্টে সে তাহাকে প্রসব করিয়াছে। তাহাকে ধারণ করা হইতে দুগ্ধ ত্যাগ করা পর্যন্ত মুদ্দত চলিতে থাকে'' (আঃ ১৪, সুরা লোকমান)।

কোন এক অজানা স্বর্গপুরি হতে মানব শিশুকে পৃথিবীতে আনয়নের দায়িত্ব যার কাঁধে সে কি অবহেলার, অমর্যাদার, তুচ্ছতাচ্ছিল্যের এবং মারধরের পাত্র হতে পারে? না মহান স্রষ্টা আল্লাহ্পাক তা করেননি, করেছে পৃথিবীর মানুষেরা। তাদের অজ্ঞতা আর নির্বুদ্ধিতার কারণে। আল্লাহ্পাকের নির্দেশ হলো - এই নারীর জন্য পুরুষ হবে কাউওয়াম। যে তার নিরাপত্তার বিধান করবে, করবে ভরণপোষণ। পুরুষকে নারীর নিরাপত্তা বিধানকারী করে দিয়ে এবং ভরণপোষণকারী করে দিয়ে আল্লাহ্পাক নারীকে বিশেষ মর্যাদা প্রদান করেছেন। এর জন্যই বিয়ের সময় পুরুষকে দিতে হয় মোহরানা। এটিও নারীর মর্যাদা। নারীর উপার্জনে খরচের বাধ্যবাধকতা আরোপ না করে এটিও তার এখতিয়ারে রাখা আছে তাও নারীর মর্যাদা। তার মাতৃত্বের মর্যাদা। শুধু স্বামীর কাছে নয়, ইসলামে নারী সন্তনের কাছেও বিশেষ ভাবে মর্যাদাশীল। আল্লাহ্র নবী ঘোষণা করেন- ''মায়ের পায়ের নীচে সন্তানের বেহেস্ত''। (ইবনে হাম্বল, ইবনে মাজাই)। অর্থাৎ পরকালীন সফলতার জন্য সকল সন্তানের জন্য মায়ের সন্তুষ্টি অত্যাবশ্যক।

পূর্বে উল্লেখিত একটি হাদিস এখানেও প্রাসঙ্গিক। নবীজির (সঃ) নিকট জানতে চাওয়া হয়েছিলো -

আল্লাহ্ ও নবীর পরে পৃথিবীতে কাকে বেশী ভালোবাসতে এবং শ্রদ্ধা করতে হবে?

আল্লাহ্র নবীর উত্তর ছিলো- তোমার মাকে।

আবার প্রশ্ন- তারপর?

উত্তর হলো- তোমার মাকে।

আবার প্রশ্ন- তারপর?

---

[২৭]. মালেকা বেগম ঃ নারীর চোখে বিশ্ব , চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলন, সাহিত্য প্রকাশ, আগষ্ট ১৯৯৬, পৃঃ ৩৮।

উত্তর হলো- তোমার মাকে।

আবার প্রশ্ন- তারপর?

উত্তর হলো- তোমার পিতাকে। (বুখারী, মুসলিম)।

অর্থাৎ পিতার তুলনায় মাতা তিনগুন বেশী শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার অধিকারী। তা নবীজির (সঃ) তিনবার উচ্চারণ থেকে স্পষ্ট।

অর্থাৎ একজন পুরুষ তাঁর মাকে শ্রদ্ধা করবে, ভালোবাসবে এবং মর্যাদা দেবে কারণ তিনি তার গর্ভধারিনী, জননী এবং একজন পুরুষ তার স্ত্রীকে ভালোবাসবে, মর্যাদা দেবে কারণ সে তার সন্তানের গর্ভধারিনী, জননী। এবং সমাজের সকল পুরুষ সকল নারীকে মর্যাদা দেবে কারণ কার্যতঃ নারীরাই সৃষ্ট জগতের মাতা।

এই- তো- কুরআন, এই তো হাদিস, এই তো ইসলাম! নারীরা এর চাইতে বেশী মুক্তির, সম্মানের, মর্যাদার সন্ধান আর কোথায় পাবে?

৮.৪ গবেষণার বিষয়বস্তুর আলোকে, ফলাফল নির্ধারণ এবং শুপারিশ/প্রস্তাবনা

উপরে বর্ণিত সমাজের বিভিন্ন স্তরে বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বগণের সাক্ষাৎকার থেকে এটি প্রতীয়মান হচ্ছে যে, ধর্মের অপব্যাখ্যা এবং ধর্মের মৌলিক আদর্শ সম্পর্কে সকলকে অবহিত করা গেলে সমাজ থেকে নারী নির্যাতন বন্ধ হবে অত্যন্ত সহজে। কারণ ধর্ম নারী- পুরুষের সমান অধিকারের সাথে নারীর মাতৃত্বের মর্যাদা প্রদান করে। যে বিষয়ে ১৯৯৫ সালে বেইজিং আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন ফার্ষ্টলেডী হিলারী ক্লিনটন যিনি পরবর্তীতে আমেকিার পররাষ্ট্র মন্ত্রী হয়েছিলেন, তিনি নারীর মর্যাদার দাবী করেছেন। তিনি বলেছেন,“নতুন মর্যাদা, নতুন সম্মান চাই নারীদের জন্য। যারা মা হিসেবে, মেয়ে হিসেবে এই বিশ্বে মানব সমাজকে বাঁচিয়ে রাখছে তাদের অকল্যান করে সমাজ ও রাষ্ট্র এগুতে পারেনা”।[২৮] তাই সমাজকে ও রাষ্ট্রকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজন, নারীর অধিকারের সাথে নারীর মর্যাদাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা। সেটি হ'ল তার মাতৃত্বের মর্যাদা। নারীর মাতৃত্বের এই মর্যাদা জেন্ডার ইস্যু নিশ্চিত করেনি।

তবে নারীর এই মর্যাদা নিশ্চিত করেছে পবিত্র কুরআন। পবিত্র কুরআনের সুরা বাকারার ২২৮ নং আয়াতটি পুনঃ উল্লেখ করা হচ্ছে এই জন্য যে, সেখানে নারী ও পুরুষের যাবতীয় অধিকারকে সমান বা ইকুয়াল করেছে এই ভাবে, ‘‘আর নারীদেরও (পুরুষদের উপর) তদ্রুপ দাবী আছে যদ্রুপ ঐ নারীর উপর (পুরুষের) দাবী আছে’’। অতঃপর বলা হচ্ছে ‘‘ওয়ালেররেজালে আ'লাইহেন্না দারাজাতুন’’। পূর্বে দেখানো হয়েছে বড় বড় ইসলামিক চিন্তাবিদগণ এর অর্থ করেছেন এভাবে যে - “নারীর প্রতি পুরুষের দর্জা এক ডিগ্রী বেশী”।[২৯] - তথা ‘নারীর প্রতি পুরুষের দায়িত্বও কর্তব্য অধিক’। যেই দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো ‘কাউওয়ামুন’ তথা ভরণপোষণকারী এবং নিরাপত্তা বিধানকারী’র দায়িত্ব ও কর্তব্য - যা পবিত্র কুরআনের সুরা নেসার ৩৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে। নারীর প্রতি পুরুষের এই বিশেষ দায়িত্ব ও কর্তব্যই ভারসাম্য রক্ষা করেছে নারীর মাতৃত্ব ও মাতৃত্বজনিত বিশেষ ভূমিকার সাথে। যার আলোকে মহানবী হযরত মুহম্মদ(সঃ) বিদায় হজ্বে এই

---

[২৮].মালেকা বেগমঃ নারীর চোখে বিশ্ব(চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলন), সাহিত্য প্রকাশ, আগষ্ট ১৯৯৬, পৃঃ ৩৭-৩৮।

[২৯] . এই বিষয়ে পূর্বে ৬ষ্ঠ এবং ৭ম অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

নির্দেশনা দিয়েছেন - "জানিও নারীদের উপর তোমাদের যে সব দাবীদাওয়া এবং স্বত্বাধিকার রয়েছে তোমাদের উপরও নারীদের সেসব দাবীদাওয়া ও স্বত্বাধিকার রয়েছে"(বিদায় হজ্ব এর ভাষণ)।

এমতাবস্থায় এটি সুস্পষ্ট যে Gender-Issue নারী-পুরুষের সমান অধিকারের কথা বলে আর ধর্মও নারী পুরুষের সমান অধিকারের কথা বলে। তবে ধর্ম সমান অধিকারের সাথে নারীর প্রতি পুরুষের বাড়তি কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্ধারণ করে দেয়। আর তা হ'ল পুরুষ কর্তৃক নারীকে বিয়ের সময় প্রদত্ত মোহরানা, জীবনভর প্রদত্ত ভরণপোষণের দায়িত্ব, একই সাথে পুরুষ কর্তৃক নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা - যা জীবনমৃত্যুকে হাতের মুঠোয় রেখে নারী কর্তৃক মানব শিশুকে এক অজানা স্বর্গপুরী থেকে পৃথিবীতে আনয়নের একক দায়িত্বের সাথে সমন্বয় করে এবং নারীর মাতৃত্বের মর্যাদা নিশ্চিত করে। ফলে দুইজন দুইজনের প্রতি শক্ত বন্ধনের রুজুতে বদ্ধ হয় এবং যখন তখন তালাক, সংসার ভাঙ্গনের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা ও দৃঢ়তর হয়। মানব শিশু জীবনে বেঁচে থাকা, বড় হ্ওয়ার জন্য পায় সুদৃঢ় রজ্জু।

আর সেজন্যই বর্তমান গবেষণায় দীর্ঘ সময় ধরে জেন্ডার ইস্যু, পবিত্র কুরআন, হাদিস, শরীয়া - সব কিছু বিস্তারিত পর্যালোচনায় গবেষণা কার্যক্রমের শেষে এসে এই মর্মে সুপারিশ করা হচ্ছে - "জেন্ডার ইস্যুর মধ্যকার নারীপুরুষের সমান অধিকারের সাথে, ধর্মে প্রদত্ত নারী পুরুষের সমান অধিকার এবং নারীর প্রতি পুরুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য তথা ভরণ-পোষণ ও মোহরানার সহ এবং নারীর মাতৃত্বের মর্যাদা নিশ্চিত করার দায়িত্ব অর্পন করার" - মাধ্যমে Gender & Development issue - র - সাথে নারীর ধর্মীয় অধিকার এবং মর্যাদার সমন্বয়ের মাধ্যমে নতুন একটি APPROACH - যা GENDER-APPROACH WITH QURANIC RIGHTS AND HONOUR FOR THE WOMEN - সংযুক্ত করার প্রস্তাব প্রদানের মাধমে শেষ করা হ'ল গবেষণা কার্যক্রম।

৮.৫ গবেষণা কার্যক্রমে সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি, গেজেটিয়ারস, রিপোর্ট, নথিপত্র, পত্রপত্রিকা ইত্যাদি

১. পবিত্র কুরআন শরীফ (ইংরাজী ও বাংলা অনুবাদ) এবং অন্যান্য ধর্মীয় গ্রন্থ

ক. পবিত্র কুরআন শরীফ (ইংরাজী ও বাংলা অনুবাদ)

Abdullah Yusuf Ali ঃ The Holy Quran - text, translation and commentary, Amana Corporation, Brentwood, Maryland, 20722, U.S.A. 1989.

Dr. Muhammed Taqi –ud-din Al- Hillali And Dr. Muhammed Muhsin Khan ঃ The Noble Qur'an ঃ (English Translation of the meanings and commentary), King Fahd Holy Quran printing Complex, Al – Madinah Al Munawarah, 1420 H.

Muhammad Marmuaduke Pickthall (Translator) ঃ The Holy Quran -Translation with Arabic Text, Kutub Khan Ishaat-ul-Islam, Delhi (India), 6th Revised Edition Jan.2005.

The Holy Quran (English translation of the meanings and Commentary) ঃ King Fahd Holy Quran printing Complex, Al – Madinah Al Munawarah, 1410 H.

মাওলানা মুহিউদ্দীন খান কর্তৃক অনুদিত ও সম্পাদিত ঃ পবিত্র কোরআনুল করিম (বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তফসীর),খাদেমুন হারামাইন শরীফাইন বাদশাহ ফাহ্দ কোরআন মুদ্রণ প্রকল্প, মদীনা মোনাওয়ারা কর্তৃক রাজকীয় সউদী সরকারের হজ্ব ও আওক্বাফ মন্ত্রনালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রকাশিত, ১৪১৩ হিঃ।

মাওলানা (হযরত) মুফতি মুহম্মদ শাফি (রাহ) ঃ তফসীরে মা'আরেফুল, কোরআন, (১ম - ৮ম খন্ড), (অনুবাদ ও সম্পাদনা ঃ মাওলানা মুহিউদ্দিন খান), ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ১৯৮৬।

মোহাম্মদ আকরম খাঁ ঃ সরল বাংলা অনুবাদ ও বিস্তারিত তাফছির সহ কোরান শরীফ, ১ম খন্ড, ২য় সং, ঝিনুক পুস্তিকা, ঢাকা, ১৩৮২ বাংলা।

মোঃ আবদুল হাকিম ও মোঃ হাসান আলী (অনুদিত) ঃ কুরআন শরীফ (তফসীর ও বঙ্গানুবাদ), ওসমানিয়া বুক ডিপো, ৩০/৩২ নর্থব্রুক হল রোড, ঢাকা, সন-তারিখ উল্লেখ নেই।

মোহাম্মদ মুবারক করিম (মাওলানা), এবং মোহাম্মদ হাতিউবী ,আলম মোরশেদ (মাওলানা) কর্তৃক অনুদিত ঃ নূরনূরানী কোরআন শরীফ (বাংলা উচ্চারণ,অর্থ ও শানে নুযূলসহ) সোলেমানিয়া বুক হাউস, ৩৬ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, সংশোধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ সেপ্টেম্বর-২০১২।

মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান ঃ কোরান সূত্র, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৪।

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী (রহ) ঃ তাফহীমুল কুরআন, (আব্দুল মান্নান তালিব কর্তৃক বাংলায় অনুবাদ), আধুনিক প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা, ২০০৪।

(খ) অন্যান্য ধর্মীয় গ্রন্থ

ইঞ্জিল শরীফ (বাংলা অনুবাদ) ঃ বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি (বি.বি.এস), ঢাকা, ১৯৮০।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা কৃষ্ণকৃপা (বাংলায় অনুবাদ শ্রীমদ ভক্তি চারু স্বামী) ঃ শ্রীমুর্তি ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ শ্রীল, অভয় চরনারবিন্দ (ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ ও বিস্তৃত তাৎপর্য-সমন্বিত) ,ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাষ্ট, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ,নবম সং-২০০২।

পবিত্র বাইবেল (পুরাতন ও নতুন নিয়ম) ঃ বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি, (বি.বি.এস), ঢাকা, ১৯৮৭।

মনু সংহিতা ঃ দিপালী বুক হাউজ , কলিকাতা, (সন তারিখ পাওয়া যায়নি)।

শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন ঃ মনুসংহিতা (শ্রীমতৎ কুল্লূ কভট্ট কৃত বঙ্গানুবাদ) , সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কলিকাতা, ১৯৯৩।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ঃ বৌদ্ধধর্ম, নবযুগ প্রকাশনী, বাংলা বাজার, ঢাকা- ১১০০, জানুয়ারী ২০১১।

২. পবিত্র হাদিস সংকলন, নবীজীবনী এবং ধর্ম সংশ্লিষ্ট অন্যান্য গ্রন্থ

আবু দাউদ সুলায়মান ইবনুল আশআছ আসসিজিস্তানী ঃ সহীহ্ আবু দাউদ শরীফ ১ম- ৩য় খন্ড, (অনুবাদক ঃ মাওলানা মোহাম্মদ মিজানুর রহমান জাহেরী), সোলেমানিয়া বুক হাউস, ৪৫ বাংলাবাজার, ঢাকা -১১০০, জুলাই ২০০৮।

আবু ফয়সল ও আহমদ মনসুর ঃ নির্বাচিত কলামে তসলিমা নাসরিন কর্তৃক কুরআন, হাদিস ও ধর্মের অবমাননা এবং অপব্যাখ্যা ঃ তসলিমা নাসরিনের ইসলাম বিদ্বেষ ও অপব্যাখ্যা, আমান প্রকাশনী, ফরিদপুর, ১৯৮৪।

আল্লামা শিবলী নো'মানী ও সৈয়দ সুলাইমান নাদভী ঃ সীরাতুন্নবী - ১ম - ২য় খন্ড (বঙ্গানুবাদ ঃ আলহাজ্ব মাওলানা এ. কে.এম. ফজলুর রহমান মুনশী), দি তাজ পাবলিশিং হাউস, ৬/২ প্যারিদাস রোড, ঢাকা-১১০০।

আসফ এ. এ. ফৈজী ঃ ইসলামী আইন, (অনুসৃতি ঃ গাজী শামছুর রহমান), ২য় সং, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ, ঢাকা- ১০০০, ১৯৮৫ ।

ইমাম মুহম্মদ আত-তিরমিজি (র) ইবনে ঈসা ঃ তিরমিজি শরীফ(১ম -৬ষ্ঠ খন্ড), (অনুবাদক মাওলানা মোঃ মাজহারুল ইসলাম), মীনা বুক হাউস, বুকস এন্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স, ৪৫ বাংলাবাজার, ঢাকা -১০০০, ফেব্রুয়ারী ২০০৮।

গোলাম মোস্তফা ঃ বিশ্বনবী, আহমদ পাবলিশিং হাউস, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, জানুয়ারী ২০০৬ (২১তম মুদ্রন)।

ডা. জাকির নায়েক (লেকচার সমগ্র) ঃ (ভাষান্তর মাওলানা মুহাম্মদ শাহজাহান খান, ইসলামী ষ্টাডিজ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়), মীনা বুক হাউজ, ঢাকা, ২০১০।

ড. মুহম্মদ হায়কুল হোসাইন ঃ মহানবীর (সা.) জীবন চরিত, (অনুবাদঃ মওলানা আবদুল আউয়াল), ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ, ঢাকা -১০০০, জুন ১৯৯৮ ।

ডঃ মরিস কুকাইলী ঃ বাইবেল কোরআন ও বিজ্ঞান (রূপান্তর-আখতার -উল-আলম) রংপুর পাবলিকেশন্স লিঃ, ঢাকা, বাংলাদেশ, ২য় সং, ১৯৮৮ এবং মানুষের আদি উৎস (২য় সংস্করণ), (রূপান্তর- আখতার উল আলম), জ্ঞানকোষ প্রকাশনী, বাংলা বাজার, ঢাকা ১১০০, ১৯৯৬।

মোঃ আবুল কালাম ঃ বাইবেল কুরআন ও মানবজাতি, আধুনিক প্রেস ২৫, শিরিশ দাস লেন, বাংলাবাজার, ঢাকা, ২০১৪।

ম্ওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম ঃ হাদীস সংকলনের ইতিহাস (পঞ্চম সংস্করণ), ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ, ঢাকা - ১০০০, ১৯৯২ ।

মাওলানা নূর মোহাম্মদ আজ'মী (রঃ) ঃ মেশকাত শরীফ, (বঙ্গানুবাদও ব্যাখ্যাসহ- প্রথম জিলদ), এমদাদিয়া লাইব্রেরী, চকবাজার, ঢাকা, ১৯৯৩।

মুহম্মদ ইমাম বুখারী (র ঃ) ইবন ইসমাঈল ঃ বুখারী শরীফ (১ম -৮ম খন্ড), সম্পাদনা পরিষদের অনুদিত এবং সম্পাদিত, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ, ঢাকা -১০০০, ১৯৯১।

মুয়াম্মার আল গাদ্দাফী ঃ সবুজ গ্রন্থ (১ম - ৩য় খন্ড) গ্রীন বুক, গণ সমাজতান্ত্রিক লিবীয় আরব জামাহিরীয়্যান পিপলস ব্যুরো , গুলশান, ঢাকা, সন-তারিখ উল্লেখ নেই।

মোহাম্মদ আকরম খাঁ ঃ মোস্তফা-চরিত (৪র্থ সং), ঝিনুক পুস্তিকা, ৩/১৩, লিয়াকত এভিন্যু, ঢাকা, ১৯৭৫।

রওশন আরা বেগম ঃ অকৃত্যাপনোদন, রাহাত প্রিন্টার্স , নীলক্ষেত, বাবুপুরা, ঢাকা, ১৯৯৫।

স্যার আবদুর রহিম ঃ ইসলামী আইন তত্ব (অনুসৃতিঃ গাজী শামছুর রহমান), ২য় সং, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ, ঢাকা-১০০০, ১৯৮৪।

৩. সহায়ক বাংলা রচনামূলক/আইন ও বিধিবিধান সংক্রান্ত গ্রন্থ

অধ্যাপিকা রাশিদা খানম (সম্পাদিত) ঃ সমাজ ও নারী এ. এইচ ডেভেলপমেন্ট পাবলিশিং হাউজ, ১৪৩ নিউমার্কেট, ঢাকা, ২০১০।

আলিমুজ্জামান চৌধুরী ঃ ইসলামিক জুরিসপ্রুডেন্স ও মুসলিম আইন, কুমিল্লা ল' বুক হাউজ, ইসলামিয়া মার্কেট, নীলক্ষেত, ঢাকা, ২০১০(৫ম সং)।

উইনিফ্রেড হল্টবি ঃ নারী এবং ক্রমপরিবর্তিত সভ্যতা ১৯৩৪, (ভাষান্তর- মোবাশ্বেরা খানম), সুবর্ণ ১৫০, বঙ্গবন্ধু জাতীয় ষ্টেডিয়াম দোতলা, ঢাকা -১০০০, প্রথম প্রকাশ ২০১০।

খাদিজা লীনা এবং চিররঞ্জন সরকার ঃ নির্যাতিত নারী উপেক্ষিত মানবাধিকার, আদর্শ, ৩৮ বাংলাবাজার, ঢাকা - ১১০০, ২০১১।

গোলাম মুরশিদ ঃ নারী ধর্ম ইত্যাদি, অন্য প্রকাশ, ৩৮/২-ক বাংলাবাজার, ঢাকা, ২০০৭।

ড. আবুল হোসেন (সংগ্রহ ও সম্পাদনা) ঃ বাংলাদেশে নারী নির্যাতন প্রতিরোধে প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ, (নারী সংক্রান্ত যাবতীয় আইন সংশ্লিষ্ট) নারী নির্যাতন প্রতিরোধ কল্পে মাল্টিসেক্টরাল প্রোগ্রাম, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয়, ২০১০।

ড. সাঈদা আখতার বেগম ঃ যুগে যুগে নারী, ছায়ানীড়, থানাপাড়া, টাঙ্গাইল, ২০১১ ।

তসলিমা নাসরিন ঃ নির্বাচিত কলাম, জ্ঞানকোষ প্রকাশনী, ১ম সং, ২য় মুদ্রন, লক্ষী বাজার, ঢাকা, ১৯৯৩।

প্রফেসর ড. এবি সিদ্দীকি, এড.বাহাউদ্দিন, অধ্যক্ষ এ এম মনিরুজ্জামান ঃ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ও প্রাসঙ্গিক আইন সমূহ (সর্বশেষ সংশোধন সহ) সামছ পাবলিকেশন, ঢাকা ২০১৩।

ফারজানা নাজ ঃ জেন্ডার শব্দকোষ, এ এইচ ডেভেলপমেন্ট পাবলিশিং হাউজ, ১৪৩ নিউমার্কেট, ঢাকা-১২০৫, ২০০৮।

ফরিদা আখতার(সম্পাদনা) ঃ আটই মার্চ - আন্তর্জাতিক নারী দিবস, (প্রথম পকাশ, ২০০৪, পুণঃমুদ্রন ২০০৯), নারীগ্রন্থ প্রবর্তনা, ২/৮ স্যার সৈয়দ রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

মমতাজ দৌলতানা ঃ ধর্ম ও নারীর অধিকার (আধুনিকতা ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে), জ্ঞানকোষ প্রকাশনী , ৩৮/২-ক বাংলাবাজার, ঢাকা, ১৯৯৭।

মালেকা বেগম ঃ নারীর চোখে বিশ্ব (চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলন), সাহিত্য প্রকাশ, আগষ্ট ১৯৯৬, ভাদ্র ১৪০৩।

মালেকা বেগম (মূল অনুবাদক) ঃ জাতি সংঘ চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলন, প্রথম প্রকাশ, রাজকীয় ডেনমার্ক দূতাবাস, ঢাকা, ১৯৯৭।

মুন্‌শী মুহাম্মদ মেহেরউল্লাহ ঃ হিন্দু ধর্ম রহস্য ও দেবলীলা, মুন্‌শী মুহাম্মদ মেহেরউল্লাহ একাডেমী, মাতওয়াইল, কোনপাড়া, ডেমরা রোড, ঢাকা, ১৯৯৭।

মুশফিকা ইকফাৎ, মোহাম্মদ আলী খান, ড. আবুল হোসেন ঃ জেন্ডার সাম্য ও সমতা - বাংলাদেশে নারী সম্পর্কিত আইন ও প্রাসঙ্গিক বিষয় (নারী সংশ্লিষ্ট যাবতীয় আইন/বিধিবিধান সংযুক্ত ম্যানুয়্যাল), মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয়, ২০০৮।

রওশন আরা বেগম ঃ নবাব ফয়জুন্নেছা ও পূর্ববঙ্গের মুসলিম সমাজ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম পুনর্মুদ্রণ - জানুয়ারী, ২০১১ |

শাহ্ আব্দুল হান্নান ঃ নারীর সমস্যা ও ইসলাম, ৪৩৫ বড় মগবাজার, ঢাকা, চৈত্র ১৪০৯।

শামীম আরা ঃ জেন্ডার ইস্যু এবং, জেনারেশন পিপিএ, ১৮০ ফকিরাপুল, ঢাকা , ২০০৯।

শাহীন রহমান ঃ জেন্ডার প্রসঙ্গ (রচনা গ্রন্থনা ও সম্পাদনা), স্টেপস টুয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট, ৩/৪, ব্লক ডি, লালমাটিয়া, ঢাকা-১২০৭, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৮।

শাহীন রহমান ঃ জেন্ডার প্রসঙ্গ (রচনা গ্রন্থনা ও সম্পাদনা), স্টেপস টুয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট, ৩/৪, ব্লক ডি, লালমাটিয়া, ঢাকা - ১২০৭, দ্বিতীয় প্রকাশ, ২০০৭।

সেলিনা হোসেন সম্পাদিত ঃ জেন্ডার ও উন্নয়ন কোষ, ১ম খন্ড, সময় প্রকাশন, ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা, ২০০৯।

৪. <u>সহায়ক বাংলা সাহিত্য গ্রন্থ</u>

আবদুল কাদির সম্পাদিতঃ রোকেয়া-রচনাবলী , বাংলা একাডেমী, বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৭৩।

কাজী নজরুল ইসলাম ঃ সঞ্চিতা, মাওলা ব্রাদার্স, ৩৯, বাংলাবাজার, ঢাকা-১, ১৯৮৩।

কাজী নজরুল ইসলাম (অনুদিত) ঃ ওমর খৈয়াম ঃ রুবাইয়াত, কলিকাতা, ষ্ট্যান্ডার্ড, ১৯৫৯।

হুমায়ুন আজাদ ঃ নারী, (২য় সংস্করণ) , ৩য় মুদ্রন , আগাম প্রকাশণী , ৩৬ বাংলা বাজার, ঢাকা, ১৯৯৩

৫. সহায়ক বাংলা প্রবন্ধ

আ.ক.ম সাইফুল ইসলাম চৌধুরী ঃ জন্ম নিবন্ধন দিবস ২০১৪ঃ তথ্যের শুদ্ধতা ও আমাদের করণীয়', যুগান্তর ৩ জুলাই ২০১৪ ।

আনসার আলী মল্লিক রাজ ঃ সামরিক বাহিনীতে নারী, (সেলিনা হোসেন সম্পাদিত 'জেন্ডার ও উন্নয়ন কোষ' ১মখন্ড) সময় প্রকাশন, ৩৮/২ক বাংলা বাজার, ঢাকা, ২০০৯ ।

আবুল বারকাত ঃ নারী ও উন্নয়ন, বঞ্চনা ও ক্ষমতায়ন, (সেলিনা হোসেন সম্পাদিত 'জেন্ডার ও উন্নয়ন কোষ' ১মখন্ড) সময় প্রকাশন, ৩৮/২ক বাংলা বাজার, ঢাকা, ২০০৯ ।

আবুল মোমেন ঃ ইভটিজিং ও ধর্ষণ থেকে পরিত্রান পেতে হলে, প্রথম আলো, ২৯ জানুয়ারী, ২০১৩ ।

আব্দুল মান্নান ঃ তৈরী পোষাক শিল্প, সাভার ট্রাজেডি সবার চোখ খুলে দিক, প্রথমআলো, মে ২০১৩ ।

আতিউর রহমান ঃ পিআরএসপি, ক্ষুদ্র ঋণ্ ও নারীর ক্ষমতায়ন, (সেলিনা হোসেন সম্পাদিত 'জেন্ডার্ ও উন্নয়ন কোষ' ১মখন্ড) সময় প্রকাশন, ৩৮/২ক বাংলা বাজার, ঢাকা, ২০০৯ ।

আশরাফসিদ্দিকী ঃ এফিসিয়েন্সি অ্যাপ্রোচ, দারিদ্র বিমোচন অ্যাপ্রোচ,্ওয়েলফেয়ার অ্যাপ্রোচ, জেন্ডার রেসপনসিভ বাজেট, (সেলিনা হোসেন সম্পাদিত 'জেন্ডার ও উন্নয়ন কোষ' ১মখন্ড সময় প্রকাশন, ৩৮/২ক বাংলা বাজার, ঢাকা, ২০০৯) ।

ইলিরা দেওয়ান (মানবাধিকার কর্মী) ঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম - নারীর প্রতি সহিংসতা ও সাম্প্রতিক ঘটনা, উপসম্পাদকীয় কলাম, প্রথম আলো, ১৭ জুলাই ২০১২ ।

উদিসা ইসলাম ঃ উন্নয়ন ইস্যু হিসেবে জেন্ডার (সেলিনা হোসেন সম্পাদিত 'জেন্ডার ও উন্নয়ন কোষ' ১মখন্ড) সময় প্রকাশন,৩৮/২ক বাংলা বাজার , ঢাকা, ২০০৯ ।

উপমা মাহবুব (উন্নয়ন কর্মী)ঃ বিয়ের বয়স ১৮ ও ১৬!, প্রথম আলো, ১ এপ্রিল ২০১৫ ।

কাজী আওলাদ হোসেন ঃ কুরআনের আলোকে মহিলাদের বাড়ির বাইরে জিলবাব, ঢিলা বহিরাবরন/চাদর ব্যবহার প্রসঙ্গে', দৈনিক ইনকিলাব, ১৮ সেপ্টেম্বর ৯৭ ।

কফি আহমদঃ সরকারী চাকুরী, নারী ও সরকারী চাকুরী, (সেলিনা হোসেন সম্পাদিত ‘জেন্ডার্ ও উন্নয়ন কোষ’ ১মখন্ড) সময় প্রকাশন, ৩৮/২ক বাংলা বাজার, ঢাকা, ২০০৯ ।

ড. আবুল হোসেন ঃ জাতীয় উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন সর্বস্তরে নারীর সমান অংশ গ্রহণ, আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০১৪ এর প্রতিবেদন, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয়।

ড. আর এম দেবনাথ (অর্থনীতিবিদ ও ব্যাংকার) ঃ ‘ক্ষুদ্র ঋণ নিয়ে যত কথা’, যুগান্তর, ২৫ ডিসেম্বর ২০১০।

ড. বেনু প্রসাদ বড়ুয়া ঃ বৌদ্ধ ধর্ম ও নারী , (অধ্যাপিকা রাশিদা খানম সম্পাদিত সমাজ ও নারী গ্রন্থে প্রকাশিত প্রবন্ধ), এ. এইচ ডেভেলপমেন্ট পাবলিশিং হাউজ, ১৪৩ নিউমার্কেট, ঢাকা, ২০১০।

ড. জিনবোধী ভিক্ষু ঃ বৌদ্ধ ধর্মে নারীর ভূমিকা, (অধ্যাপিকা রাশিদা খানম সম্পাদিত সমাজ ও নারী গ্রন্থে প্রকাশিত প্রবন্ধ), এ. এইচ ডেভেলপমেন্ট পাবলিশিং হাউজ, ১৪৩ নিউমার্কেট, ঢাকা, ২০১০।

নিল ওয়াকার (বাংলাদেশে জাতিসংঘের আবাসিক সমন্ব য়ক) ঃ “সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য ঃ আরও পথ বাকি”(প্রবন্ধ), প্রথম আলো (বিশেষ সংখ্যা), ৬ নভেম্বর ২০১৩।

মঙ্গল কুমার চাকমা , জেমস্ ওয়ার্ড খকশী, পল্লব চাকমা, মংসিং মারমা, হেলেনা বাবলী তানাং ঃ বাংলাদেশের আদিবাসী - এথনোগ্রাফীয় গবেষণা (প্রথম খন্ড), ১২৭ আজিজ সুপার মার্কেট, শাহবাগ. ঢাকা, ১০০০, ২০১০।

মঞ্জুরুল হক ঃ ধ্বংসের ৮ মাস পরেও রানাপ্লাজার শ্রমিকদেও দুর্দশা কাটলনা কেন? উপ সম্পাদকীয় কলাম, আমাদের সময়, ২৬ জানুয়ারী ২০১৪।

মানসুরা হোসাইন ঃ ‘বৈচিত্র আসছে নারী উদ্যোক্তাদের মধ্যে’ প্রথম আলো, ১৪ এপ্রিল ২০১২, শিশুর জন্ম নিবন্ধন জরুরী, প্রথম আলো, ২৪ অক্টোবর ২০১২।

মালেকা বেগম ঃ উন্নয়নে জেন্ডার ইস্যু, উৎপাদন-পুনরুৎপাদন ও উন্নয়ন, এনজিও, নারী আন্দোলন ও উন্নয়ন, নারী অধিকার বিষয়ক আইন, (সেলিনা হোসেন সম্পাদিত ‘জেন্ডার ও উন্নয়ন কোষ’ ১মখন্ড) সময় প্রকাশন,৩৮/২ক বাংলা বাজার , ঢাকা, ২০০৯।

মাসুদুজ্জামান ঃ নারীবাদ (সেলিনা হোসেন সম্পাদিত ‘জেন্ডার্ ও উন্নয়ন কোষ’ ১মখন্ড) সময় প্রকাশন, ৩৮/২ক বাংলা বাজার , ঢাকা, ২০০৯।

মোশাররফ হোসেন (পরিচালক, বাংলাদেশ শিশু একাডেমী) ঃ শিশু অধিকারের মূল কথা- চাই শিশুর নিরাপত্তা, আমাদের সময়, সোমবার ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৪ এর বিশেষ ক্রোড়পত্রে প্রকাশিত ‘বিশ্ব শিশুদিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ - উপলক্ষে প্রকাশিত।

যতীন সরকারঃ মুক্তি , (সেলিনা হোসেন সম্পাদিত ‘জেন্ডার্ ও উন্নয়ন কোষ’ ১মখন্ড) সময় প্রকাশন, ৩৮/২ক বাংলা বাজার , ঢাকা, ২০০৯।

রোকেয়া রহমানঃ নারীর প্রতি সহিংসতা বেড়েই চলেছে, প্রথম আলো, ২৮ মে ২০১৩।

রীতা ভৌমিক ঃ জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন আইন ২০০৪, বাল্য বিবাহ নিরোধ আইন ১৯২৯, ফ্যাক্টরী আহিন ১৯৫৬, (সেলিনা হোসেন সম্পাদিত 'জেন্ডার ও উন্নয়ন কোষ' ১মখন্ড) সময় প্রকাশন, ৩৮/২ক বাংলা বাজার, ঢাকা, ২০০৯।

লাভলী ইয়াসমীন জেবা ঃ ইউনিয়ন পরিষদ-জেলা পরিষদ, সরকারী কর্মসংস্থান ও নারীর ক্ষমতায়ন (সেলিনা হোসেন সম্পাদিত 'জেন্ডার ও উন্নয়ন কোষ' ১মখন্ড) সময় প্রকাশন,৩৮/২ক বাংলা বাজার , ঢাকা, ২০০৯।

বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন ঃ মতিচুর, পদ্মরাগ, অবরোধ বাসিনী, (আবদুল কাদির সম্পাদিত) রোকেয়া-রচনাবলী , বাংলা একাডেমী, বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৭৩।

শেখ মেহেদী হাসান ঃ নারীর অদৃশ্য শ্রম, মাতৃকল্যান আইন, (সেলিনা হোসেন সম্পাদিত 'জেন্ডার ও উন্নয়ন কোষ' ১মখন্ড) সময় প্রকাশন, ৩৮/২ক বাংলা বাজার, ঢাকা, ২০০৯।

শফি আহমদ ঃ নারী ও সরকারী চাকুরী, (সেলিনা হোসেন সম্পাদিত 'জেন্ডার ও উন্নয়ন কোষ' ১মখন্ড) সময় প্রকাশন,৩৮/২ক বাংলা বাজার , ঢাকা, ২০০৯।

শ্যামলী নাসরিন চৌধুরী ঃ আর নয় শিশু নিপীড়ন, আমাদের সময়, উপসম্পাদকীয় কলাম, ৩ ফেব্রুয়ারী ২০১৪ ।

শিশির চক্র ঃ অপুষ্টির চক্রে বাংলাদেশ, প্রথম আলো, ২১ জুলাই ২০১২।

শিশির মোড়ল ঃ সংশোধিত শ্রম আইন নিয়ে বিভ্রান্তি, প্রথম আলো, ২৬ মে ২০১৩।

শাশ্বতি ঘোষ ঃ গৃহশ্রম (সেলিনা হোসেন সম্পাদিত 'জেন্ডার ও উন্নয়ন কোষ' ১মখন্ড) সময় প্রকাশন,৩৮/২ক বাংলা বাজার , ঢাকা, ২০০৯।

শাহেদা ফেরদৌস মুন্নী ঃ 'পারিবারিক নির্যাতন', উন্নয়ন পদক্ষেপ, ১০ বর্ষম পঁয়ত্রিশ সংখ্যা, অক্টোবর ২০০৪ ষ্টেপস টুওয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট, লালমাটিয়া, ঢাকা -১২০৭।

সা'দ উল্যাহ ঃ ফতওয়া, দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৬ জানুয়ারী, ২০০১।

সুলতানা আকতার রুবী ঃ মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ, ১৯৬১, ভরণপোষণ বা খোরপোষ, (সেলিনা হোসেন সম্পাদিত 'জেন্ডার ও উন্নয়ন কোষ' ১মখন্ড) সময় প্রকাশন, ৩৮/২ক বাংলা বাজার , ঢাকা, ২০০৯।

সেলিনা হোসেন ঃ উন্নয়নে নারী, ক্ষমতায়ন, জেন্ডার ও উন্নয়ন, বাস্তব মুখী জেন্ডার চাহিদা ও কৌশলগত জেন্ডার চাহিদা, সংরক্ষিত আসন (সেলিনা হোসেন সম্পাদিত 'জেন্ডার ও উন্নয়ন কোষ' ১মখন্ড) সময় প্রকাশন,৩৮/২ক বাংলা বাজার, ঢাকা, ২০০৯।

৬. সহায়ক গেজেটিয়ারস/বিভিন্ন রিপোর্ট/ সরকারী নথীপত্র

অভিন্ন পারিবারিক আইন (Uniform Family Code), বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, সুফিয়া কামাল ভবন, ১০/ বি/ ১, সেগুনবাগিচা, ঢাকা- ১০০০

আন্তর্জাতিক নারী দিবস (৮ মার্চ) ২০১০, ২০১১, ১০১২, ২০১৩, ২০১৪ এর বিশেষ প্রতিবেদন ঃ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয়, ৮ই মার্চ ২০১০, ২০১১, ২০১২, ২০১৩, ২০১৪।

ইউএনএফপি (UNFPA) - এর সহযোগিতায় মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয় এর আওতায় পরিচালিত ঃ 'প্রমোশন অফ জেন্ডার ইক্যুয়ালিটি এন্ড উইমেনস এমপাওয়ারমেন্ট প্রোজেক্ট এর কর্মপরিধির আওতায় প্রণীত জেন্ডার, রিপ্রোডাকটিভ রাইটস এবং এইচআইভি/ এইডস সংক্রান্ত প্রতিবেদন ।

ইউনিয়ন পরিষদ প্রশিক্ষন ম্যানুয়েল ঃ ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রম, জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনষ্টিটিউট (এন আই এলজি), ২৯, আগারগাও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা ১২০৭।

ইসলাম ও মানবাধিকার ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, গবেষণা বিভাগ, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা, ২০০১।

উন্নয়ন পদক্ষেপ (মাসিক পত্রিকা) ঃ ষ্টেপস টুওয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট (প্রকাশক) , ৩/৪, ব্লক ডি, লালমাটিয়া, ঢাকা-১২০৭, ৫ তম সংখ্যা, অক্টোবর ২০০৪ ।

এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর ১৮ বছর ঃ এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা, ২০০৮।

কাপেং ফাউন্ডেশন রিপোর্ট, পার্বত্য চট্টগ্রাম, রাঙাগামাটি, ২০১২।

গাজী শামছুর রহমান ঃ দন্ডবিধির ভাষ্য, ৪র্থ সংস্করণ , খোশরোজ কিতাব মহল, ঢাকা ১৯৯২।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান ঃ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকরের আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রনালয় সংশ্লিষ্ট লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ থেকে প্রকাশিত, (অক্টোবর ২০১১ পর্যন্ত সংশোধনী সহ)।

জাতিসংঘের সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা, ১৯৪৮।

জাতিসংঘের নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ ঘোষণা, **১৯৯৩।**

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি, ১৯৯৭, ২০০৪ এবং ২০১১, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয়, গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ বাস্তবায়ন কল্পে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা ঃ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয়, গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০১৩।

জাতীয় মহিলা সংস্থার সাংগঠনিক কাঠামো ঃ নারী নির্যাতন প্রতিরোধে প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যেগ, মহিলা বিষয়ক মন্ত্রনালয়, ২০০৭।

জাতীয় সমাজসেবা দিবস-২০১৩ (বার্ষিক প্রতিকেদন) সমাজসেবা অধিদপ্তর, সমাজসেবা মন্ত্রনালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতিসংঘ, চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলন, বেইজিং ঘোষণা ও কর্মপরিকল্পনা (অনুবাদক মালেকা বেগম), রাজকীয় ডেনমার্ক দূতাবাস, ঢাকা, ১৯৯৭।

জন প্রতিনিধিত্ব সংশোধিত অর্ডিন্যান্স, আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রনালয়, গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০০৮।

জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদন(২০১১-১২), জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদন(২০১৩ -১৪) ঃ অর্থবিভাগ, অর্থমন্ত্রনালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

জেন্ডার সাম্য ও সমতা - (বাংলাদেশে নারী সম্পর্কিত আইন ও প্রাসঙ্গিক বিষয়) ঃ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয় , গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০০৮|

জেন্ডার সমতা ও মূলধারাকরণ সংক্রান্ত হ্যান্ড আউট (প্রতিবেদন) ঃ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয় ও মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর(সহায়তায় পলিসি লিডারশীপ অ্যান্ড অ্যাডভোকেসী ফর জেন্ডার ইক্যুয়ালিটি প্রকল্প), গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০১০।

জেন্ডার শব্দকোষ, ২০০৭ ঃ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের প্লাজ-২ প্রকল্প কর্তৃক প্রকাশিত।

ঢাকা মহানগর পুলিশ অধ্যাদেশ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ, ১৯৭৬।

ত্রিবার্ষিক আবর্তক পরিকল্পনা ও বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি(১৯৯৫-৯৮) ঃ পরিকল্পনা কমিশন, পরিকল্পনা মন্ত্রনালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার. ঢাকা।

নারীর আইনী অধিকার ঃ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার. ঢাকা, জুন ২০০০।

নারী ২০০০ ঃ বেইজিং প্লাস ফাইভ বিশেষ অধিবেশনের ফলাফল ও বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে করনীয়, সংকলন প্রকাশনা উপ কমিটি এবং বেইজিং প্লাস ফাইভ সংক্রান্ত এনজিও কমিটি, বাংলাদেশ (এনসিবিপি), শুক্রাবাদ, ঢাকা -১২০৭।

নারী উন্নয়নে জাতীয় পরিকল্পনা (২য় সংস্করণ), মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০০০ ।

নারী নির্যাতন, এখনই প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে (সম্পাদকীয়) প্রথম আলো , ২৬ জানুয়ারী, ২০১৪।

নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ (সিডো) ঃ জাতিসংঘ শিশু তহবিল (ইউনিসেফ) কর্তৃক প্রকাশিত, বাড়ি নং-৭১, রোড নং ঃ ৫-এ, ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা, বাংলাদেশ ১৯৭৯।

নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণ সনদের তৃতীয় ও চতুর্থ পর্যায়ের সম্মিলিত প্রতিবেদন ঃ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয় কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৯৭ ।

নারী নির্যাতন প্রতিরোধ কল্পে মাল্টি সেক্টরাল প্রোগ্রাম সংশ্লিষ্ট দপ্তর এবং নিউজ লেটার , ভলিউম -৮, ইস্যু - ৩ জুলাই ২০১৪।

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা(১৮৭৩-৭৮), দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনা(১৯৭৮-১৯৮০), তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৮৫- ৯০), চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা(১৯৯০-৯৫) ,পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা(**১৯৯৭-২০০২**) , ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা(**২০১১ - ২০১৫**) ঃ পরিকল্পনা কমিশন, পরিকল্পনা মন্ত্রনালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার. ঢাকা।

পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন (২০১০ সনের ৫৮ নং আইন, বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত সংখ্যা, অক্টোবর ১২, ২০১০।

ফরিদা আখতার (সম্পাদনা) ঃ আটই মার্চ - আন্তর্জাতিক নারী দিবস, নারী গ্রন্থ প্রবর্তনা, ২/৮ স্যার সৈয়দ রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ, ২০০৪, পুণ:মুদ্রণ- ২০০৯।

বেইজিং + ১০ সংক্রান্ত এনজিও প্রতিবেদন (বাংলাদেশে নারী উন্নয়ন ঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা), সিডও ও বেইজিং কর্মপরিকল্পনা সংক্রান্ত এনজিও কোয়ালিশন (এনসিবিপি), ফেব্রুয়ারী ২০০৬।

বাংলাদেশ(এনসিবিপি), নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ- বিশ বছরে সিডও ও বাংলাদেশ, সিড্ও-র সাম্প্রতিক তথ্য (প্রবন্ধ)।

বাংলাদেশ গেজেট (অতিরিক্ত সংখ্যা), গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, মন্ত্রীপরিষদ বিভাগ, ফেব্রুয়ারী ৮, ২০০৯ এবং জুলাই ২০০৯।

বাংলাদেশ গেজেট (অতিরিক্ত সংখ্যা), গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ৪মে ১৯৯১।

বাংলাদেশে নারী উন্নয়ন ঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা ঃ বেইজিং +১০ সংক্রান্ত এনজিও প্রতিবেদন, সিড্ও ও বেইজিং কর্মপরিকল্পনা সংক্রান্ত এনজ্িও কোয়ালিশন(এনসিবিপি এনসিবিপি), উইমেন ফর উইমেন, শুক্রাবাদ, ঢাকা - ১২০৭।

বাংলাদেশ জনমিতি এ স্বাস্থ্য জরিপ, ২০১১ অনুসারে প্রথম আলো ২৭ নভেম্বও ২০১৩ এর প্রতিবেদন।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) এর ভায়োলেন্স এগেইনষ্ট উইমেন (ভিএন্ডবি) নামীয় সার্ভে প্রতিবেদন ২০১১।

বাল্য বিবাহ আইন, ২০১৪, আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রনালয়, গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ।

বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬, সংশোধনী ২০১৩, আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রনালয়, গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ।

বার্ষিক প্রতিবেদন (২০১১ -২০১২) ঃ মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

বার্ষিক প্রতিবেদন (২০১১ -২০১২) ঃ মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ৩৭/৩ ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা ।

বার্ষিক প্রতিকেদন (২০১১-১২) ঃ স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয় গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ।

মো ঃ ফিরোজ মিয়া ঃ স্থানীয় সরকার বিধানাবলী, স্থানীয় সরকার (জেলা পরিষদ) আইন, ১৯৮৮, ১৯৮৮ সনের ২১ নং আইন, রোদ্দুর প্রকাশণী, ৫০২, পশ্চিম নাখালপাড়া,ঢাকা-১৯৯০।

মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামো, (২০১২-১৩ হতে ২০১৬-১৭) ঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রনালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান মন্ত্রনালয়ের ১৬ সেপ্টেম্বর ২০০২ এর পরিপত্র নং স্বাপকম/ জিআই -৯/৯৭/৯৩।

৯/৩ বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত সংখ্যা, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, মে ১৯৯১।

৭. সহায়ক ইংরাজি গ্রন্থ/

Amina ,Wadud ঃ Qur'an and Women (reading the Sacred Text from a Women's Perspective), Oxford University press, New York,-19916, 1999(second ed.)

Board of Researchers under the project Science in Al- Quran ঃ Scientific Indications in the Holy Quran, Islamic Foundation of Bangladesh, 1969, Second edition, December 1990.

Dr. Mohar Ali (edited) ঃ Nawab Abdul Luteef Khan Bahadur (Autobiography and other writings), The Meharab Publications, Chittagong, 1968.

Gamal A. badawi ঃ Women in Islam.www.iupui.edu/~msaiupu/womeninislampage.hfm.

Hammudah Abdalati ঃ Islam in Focus, Al Madina Printing & Publication co. (সন ,তারিখ উল্লেখ নেই)।

Roushan Jahan (edited) ঃ Empowerment of Women, Nairobi to Beijing (1985- 1995), Women for Women, Dhaka, Bangladesh, 1995.

Kamla Bhasin & Nighat Said Khan ঃ Some questions on Feminism and its Relevance in South Asia, Kali for Women, k-92, 1st Floor, Hauz Khas Enclave, New Delhi, 1986.

Md. Mahmudul Hasan (Editor) ঃ The Pioneer (A special issue in gender question), Gender Issue ঃ An Islamic Approach,The Pioneer, 144 Shantinagar, Dhaka, 1999.

Mohammad Hashim Kamali ঃ Principles of Islamic Jurisprudence, Revised edition, Islamic text Societies, Cambridge, U.k. 1991.

Moulana Manager Absan Gilini ঃ ঃ Imam Abu Hanifa ki siasi zindgi by prof. Rafiullah Shehab: Rights of Women in Islamic shariah.

Nicholas Awde (translator, & Editor) ঃ Women in Islam (An Anthology from the Qur'an and Hadish) , Hippocrene Books, Inc, 171 Madison Avenue, New York, NY 10016.

Prof. Rafiullah Shehab ঃ ঃ Rights of women in Islamic sharah, Indus Publishing House, 17-Urdu Bazar, Lahore, August, 1986.

Salma Khan(Member,Women for Women)Former Division Chief Planning commission, Government of Bangladesh t Review Paper on Women's Issues In the National Five years plans - Assesment and Suggested future Strategies – on Behalf of NCBP.

Shah Abdul Hannan ঃ Social laws of Islam, Bangladesh Institute of Islamic thought (BITT), Dhaka, 1995.

Shah Manzoor Alam ঃ Scientific Significance In Selected Quranic Verses, Saudi Arabia, 1420 A.H./ 1999 A.d.

Syed Amir Ali ঃ The Spirit of Islam, MB 55 College Street, Calcutta.

৮. সহায়ক ইংরাজি রিপোর্ট, আইন ও বিধিবিধান এবং ইন্টারনেট ভিত্তিক তথ্য

Accelerated Poverty reduction ঃ General Economic Division, planning Commission, Government of the People's Republic of Bangladesh, Bangladesh ২০০৫. ।

Bangladesh Burue of Statistics (BBS) ঃ House hold income and expenditure, survey, 2010.

Bangladesh Education Statistics, 209, 2011, Bangladesh Bureau of Educational Information and Statistics (BANBEIS), Ministry of Education, September, 2012.

Bangladesh Report of the United Nations Fourth World Conference on women, Beijing, Chaina 4-15 September, United Nations, 1995.

Bangladesh Report ঃ The implementation of the Beijing Declaration and platform for Action(1995) and the outcome of the twenty third Special session of the General

Assembly(2000) ঃ Ministry of women and Children Affairs, Govt. of the Peoples republic of Bangladesh, May 2014.

Country Report, 2010, Combating Human Trafficking, Ministry of Home Affairs, Dhaka, Bangladesh.

Declaration On the Elimination of Violance Against Women, 1993 ।

Fakhrul Ahsan ঃ Sixth Five year plan(2011- 15) as the tool of accelerating growth and reducing Poverty, 6th June 2011 .

Millennium Development Goals, Mid- term Bangladesh Progress Report 2007, Government of the People's Republic of Bangladesh, General Economics Division, Planning Commission ।

Millennium Development Goals, Bangladesh Pvogress Report 2000 -2015, Jointly Prepared by Government of Bangladesh and the United Nations Country Team in Bangladesh, 2005.

Oxford Advanced learners Dictionary , Millinium Dictionary -2000.

Outline Perspective Plan of Bangladesh 2010 – 2021, Making vision 2021 A reality, General Economics Division, Planning Commission, Govt. of Bangladesh, June 2010.

Report of the United Nations Fourth World Conference on Women, Beijing China, 4 – 15 September, United Nations, 1995.

Statistics of civil officers and Stuff 2011, Ministry of public Administration Gov. of peoples republic of Bangladesh, Statics and research cell.

The Counter Trafficking Frame work Report ঃ Bangladesh Perspective, Govt. of Bangladesh, Mowca, 2004.

The Independent Dhaka, Wednesday, 9 June 1999.

The Prevention & Suppression of humen Trafficking Act,2012(Act No.3 of 2012), আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রনালয়, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, বাংলাদেশ গেজেট অতিরিক্ত সংখ্যা , আগষ্ট ৪, ২০১৩।

United Nations General Assembly resulation 48/104 on Declaration on the Elemination of Violence against women, সংগ্রহ ও সম্পাদনা মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয় ঃ বাংলাদেশে নারী নির্যাতন প্রতিরোধে প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ, ২০০৭, পূণর্মুদ্রণ ঃ ২০১০।

Unlocking the potential, national Strategy for accelerated poverty reduction, Economic Division, Planning commission, Government of the People's Republic Republic of Bangladesh, 2005

women in Bangladesh ঃ A country profile, United Nations, Newyork, 1995.

http // www.acidsurvivors.org/statistics/2.accessed12.4.14.

www.bbs.gov.bd

www.mopa.gov.bd

www.mofa.gov.bd

http//www.idrc.ca/en/env

http//www.parliament.gov.bd

Wikipedia.org / Wiki / Bangladesh - police

UNAIDS, http://www.unaids.org/en/regionscountries/countries/bangladesh

৯. পত্রিকা/ বিশেষ সংখ্যা ইত্যাদি (সন ভিত্তিক)

Daily Star
Monday 21 january 2013, Dhaka.

The Independent
Wednesday 9 June 1999, Dhaka .

Star Magazine,
Friday 2 March 2001, Dhaka .

আমাদের অর্থনীতি
মঙ্গলবার ২৮ আগষ্ট ২০১২, শনিবার ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১২, রোববার ৫ নভেম্বর ২০১২, রোববার ২ ডিসেম্বর ২০১২।

আমাদের সময়
মঙ্গলবার ৫ জুলাই ২০১০, শুক্রবার ৮ জুলাই ২০১০, বৃহস্পতিবার ২১ জুলাই ২০১০, বুধবার ১১ আগষ্ট ২০১০, শুক্রবার ২৯ অক্টোবর ২০১০, শনিবার ১৯ ডিসেম্বর ২০১০, মঙ্গলবার ২১ ডিসেম্বর ২০১০।

বৃহস্পতিবার ২৭ জানুয়ারী ২০১১, মঙ্গলবার ৩ মে ২০১১, বুধবার ৪ মে ২০১১, শুক্রবার ৬ মে ২০১১,

মঙ্গলবার ১৪ জুন ২০১১, বুধবার ১৫ জুন ২০১১, মঙ্গলবার ৫ জুলাই ২০১১, শুক্রবার ৮ জুলাই ২০১১, রোববার ১৭ জুলাই ২০১১, সোমবার ৮ আগষ্ট ২০১১, বুধবার ১০ আগষ্ট ২০১১, শনিবার ২০ আগষ্ট ২০১১, বুধবার ২৪ আগষ্ট ২০১১।

মঙ্গলবার ২৪ এপ্রিল ২০১২, রোববার ২ ডিসেম্বর ২০১২, বৃহস্পতিবার ৬ ডিসেম্বর ২০১২, মঙ্গলবার ২৫ ডিসেম্বর ২০১২ , শুক্রবার ২৮ ডিসেম্বর ২০১২, রোববার ৩০ ডিসেম্বর ২০১২।

শুক্রবার ৪ জানুয়ারী ২০১৩, শুক্রবার ২৫ জানুয়ারী ২০১৩, রোববার ২৭ জানুয়ারী ২০১৩, সোমবার ২৮ জানুয়ারী ২০১৩, শুক্রবার ১ ফেব্রুয়ারী ২০১৩, সোমবার ৪ ফেব্রুয়ারী ২০১৩, বুধবার ১৩ ফেব্রুয়ারী ২০১৩, শনিবার ১৩ এপ্রিল ২০১৩, বুধবার ১৭ এপ্রিল ২০১৩, শুক্রবার ২৬ এপ্রিল ২০১৩, শুক্রবার ৩ মে ২০১৩, শুক্রবার ১৭ মে ২০১৩, বুধবার ৫ জুন ২০১৩, শুক্রবার ১৪ জুন ২০১৩, মঙ্গলবার ২৩ জুলাই ২০১৩, মঙ্গলবার ২০ আগষ্ট ২০১৩, বৃহস্পতিবার ৫সেপ্টেম্বর ২০১৩, শুক্রবার ২০ সেপ্টেম্বর ২০১৩, বৃহস্পতিবার ২১ নভেম্বর ২০১৩ ।

রোববার ২৬ জানুয়ারী ২০১৪, সোমবার ৩ ফেব্রুয়ারী ২০১৪, সোমবার ১০ ফেব্রুয়ারী ২০১৪ , শুক্রবার ১৪ ফেব্রুয়ারী ২০১৪, রোববার ১৬ ফেব্রুয়ারী ২০১৪, রোববার ২ মার্চ ২০১৪, বৃহস্পতিবার ১৩ মার্চ ২০১৪, বুধবার ১৪ মে ২০১৪, মঙ্গলবার ১০ জুন ২০১৪, বৃহস্পতিবার ২৪ জুলাই ২০১৪, শনিবার ১৬ আগষ্ট ২০১৪ , সোমবার ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৪, মঙ্গলবার ৪ নভেম্বর ২০১৪, শনিবার ১৫ নভেম্বর ২০১৪।

ইত্তেফাক

শুক্রবার ৭ মার্চ ২০১৪, শুক্রবার ১৬ মে ২০১৪।

কালের কণ্ঠ -

সোমবার ১০ জানুয়ারী ২০১১, রোববার ২২ মে ২০১১, শনিবার ৩ সেপ্টেম্বর ২০১১ ।

জনকণ্ঠ

বৃহস্পতিবার ২১ শে এপ্রিল ২০১০ ।

দৈনিক জনকণ্ঠ

শুক্রবার ২৬ জানুয়ারী ২০০১।

বৃহস্পতিবার ৩ ফেব্রুয়ারী ২০১১।

প্রথম আলো

রোববার ২০ জুলাই ১৯৯৭।

শনিবার ১৫ আগষ্ট ২০০৯।

বৃহস্পতিবার ২৮ অক্টোবর ২০১০, সোমবার ৬ ডিসেম্বর ২০১০, মঙ্গলবার ১৪ ডিসেম্বর ২০১০ ।

সোমবার ৩ জানুয়ারী ২০১১, বৃহস্পতিবার ৩ ফেব্রুয়ারী ২০১১, রোববার ৬ ফেব্রুয়ারী ২০১১, মঙ্গলবার ৮ফেব্রুয়ারী ২০১১, শনিবার ১২ফেব্রুয়ারী ২০১১, রোববার ১৩ ফেব্রুয়ারী ২০১১, বুধবার ১৬ ফেব্রুয়ারী ২০১১, শনিবার ২৬ ফেব্রুয়ারী ২০১১, রোববার ৬ মার্চ ২০১১, মঙ্গলবার ৮ মার্চ ২০১১, মঙ্গলবার ১৫ মার্চ ২০১১, মঙ্গলবার ১৯ এপ্রিল ২০১১, বুধবার ২০ এপ্রিল ২০১১, রোববার ১ মে ২০১১, সোমবার ২ মে ২০১১, মঙ্গলবার ৩ মে ২০১১, রোববার ৮ মে ২০১১, বৃহস্পতিবার ১২ মে ২০১১, শুক্রবার ১৩ মে ২০১১, শুক্রবার ২০ মে ২০১১, বৃহস্পতিবার ২ জুন ২০১১, শুক্রবার ৩ জুন ২০১১, বৃহস্পতিবার ১৬ জুন ২০১১, শুক্রবার ১৭ জুন ২০১১, সোমবার ২০ জুন ২০১১, বুধবার ২২ জুন ২০১১, বৃহস্পতিবার ২৩ জুন ২০১১, শুক্রবার ২৪ জুন ২০১১। বৃহস্পতিবার ৭ জুলাই ২০১১, শুক্রবার ৮ জুলাই ২০১১, সোমবার ১১ জুলাই ২০১১, মঙ্গলবার ১২ জুলাই ২০১১, মঙ্গলবার ১৯ জুলাই ২০১১, বুধবার ২০ জুলাই ২০১১,

সোমবার ২৫ জুলাই ২০১১, মঙ্গলবার ২৬ জুলাই ২০১১, সোমবার ১ আগষ্ট ২০১১, বুধবার ৩ আগষ্ট

২০১১, বৃহস্পতিবার ৪ আগষ্ট ২০১১, শনিবার ৬ আগষ্ট ২০১১, রোববার ৭ আগষ্ট ২০১১, বুধবার ১০ আগষ্ট ২০১১, বৃহস্পতিবার ১১ আগষ্ট ২০১১, সোমবার ১৫ আগষ্ট ২০১১, মঙ্গলবার ১৬ আগষ্ট ২০১১, শনিবার ২০ আগষ্ট ২০১১, রোববার ২১ আগষ্ট ২০১১, সোমবার ২২ আগষ্ট ২০১১, শুক্রবার ২৬ আগষ্ট ২০১১, মঙ্গলবার ৬ সেপ্টেম্বর ২০১১।

বৃহস্পতিবার ১৯ জানুয়ারী ২০১২, শনিবার ২১ জানুয়ারী ২০১২, সোমবার ২৩ জানুয়ারী ২০১২,শনিবার ১৮ ফেব্রুয়ারী ২০১২, মঙ্গলবার ১০ এপ্রিল ২০১২, সোমবার ৯ এপ্রিল ২০১২, শনিবার ১৪ এপ্রিল ২০১২, সোমবার ১৬ জুলাই ২০১২, মঙ্গলবার ১৭ জুলাই ২০১২, রোববার ২৯ জুলাই ২০১২,মঙ্গলবার ৪ সেপ্টেম্বর ২০১২, মঙ্গলবার ১১ সেপ্টেম্বর ২০১২, রোববার ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১২, বুধবার ২৪ অক্টোবর ২০১২ , সোমবার ১২ নভেম্বর ২০১২, বুধবার ১২ ডিসেম্বর ২০১২, রোববার ২৩ ডিসেম্বর ২০১২, শুক্রবার ২৮ ডিসেম্বর ২০১২।

শনিবার ৫ জানুয়ারী ২০১৩, বুধবার ৯ জানুয়ারী ২০১৩, সোমবার ১৪ জানুয়ারী ২০১৩, বুধবার ১৬ জানুয়ারী ২০১৩, শনিবার ১৯ জানুয়ারী ২০১৩ , রোববার ২০ জানুয়ারী ২০১৩ , সোমবার ২১ জানুয়ারী ২০১৩, বৃহস্পতিবার ২৪ জানুয়ারী ২০১৩, শুক্রবার ২৫ জানুয়ারী ২০১৩, শনিবার ২৬ জানুয়ারী ২০১৩, রোববার ২৭ জানুয়ারী ২০১৩ , সোমবার ২৮ জানুয়ারী ২০১৩, বৃহস্পতিবার ৩১ জানুয়ারী ২০১৩, শুক্রবার ১ ফেব্রুয়ারী ২০১৩, সোমবার ১১ ফেব্রুয়ারী ২০১৩, বুধবার ১৩ ফেব্রুয়ারী ২০১৩, বৃহস্পতিবার ১৪ ফেব্রুয়ারী ২০১৩, শুক্রবার ১৫ফেব্রুয়ারী ২০১৩, মঙ্গলবার ১৯ ফেব্রুয়ারী ২০১৩, বৃহস্পতিবার ২১ ফেব্রুয়ারী ২০১৩, রোববার ২৪ ফেব্রুয়ারী ২০১৩, শুক্রবার ৮মার্চ ২০১৩, শুক্রবার ১৫ মার্চ ২০১৩, শনিবার ১৬ মার্চ ২০১৩, রোববার ১৭ মার্চ ২০১৩, মঙ্গলবার ১৬ এপ্রিল ২০১৩ , বুধবার ১ মে ২০১৩, শুক্রবার ৩ মে ২০১৩, রোববার ১২ মে ২০১৩ , মঙ্গলবার ১৪ মে ২০১৩, রোববার ২৬ মে ২০১৩, মঙ্গলবার ২৮ মে ২০১৩, বুধবার ২৯ মে ২০১৩, মঙ্গলবার ৪ জুন ২০১৩, শুক্রবার ৭ জুন ২০১৩, রোববার ৯ জুন ২০১৩, সোমবার ১০ জুন ২০১৩, বৃহস্পতিবার ২০ জুন ২০১৩, বুধবার ১৭ জুলাই ২০১৩, রোববার ১ সেপ্টেম্বর ২০১৩, সোমবার ২ সেপ্টেম্বর ২০১৩, শুক্রবার ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৩, শুক্রবার ২০ সেপ্টেম্বর ২০১৩, রোববার ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৩, বুধবার ৬ নভেম্বর ২০১৩, সোমবার ২৫ নভেম্বর ২০১৩, মঙ্গলবার ২৬ নভেম্বর ২০১৩, বুধবার ২৭ নভেম্বর ২০১৩, রোববার ১৫ ডিসেম্বর ২০১৩, শনিবার ২৮ ডিসেম্বর ২০১৩।

শনিবার ২৫ জানুয়ারী ২০১৪, রোববার ২৬ জানুয়ারী ২০১৪, মঙ্গলবার ২৮ জানুয়ারী ২০১৪ , শুক্রবার ৩১ জানুয়ারী ২০১৪, শনিবার ৮ ফেব্রুয়ারী ২০১৪, মঙ্গলবার ১১ ফেব্রুয়ারী ২০১৪, শুক্রবার ১৪ ফেব্রুয়ারী ২০১৪ , শুক্রবার ২৮ ফেব্রুয়ারী ২০১৪, সোমবার ৫ মে ২০১৪, শুক্রবার ১৬ মে ২০১৪,

রোববার ১৮ মে ২০১৪, সোমবার ২৬ মে ২০১৪, বৃহস্পতিবার ২৯ মে ২০১৪, শনিবার ৩১ মে ২০১৪, সোমবার ২৩ জুন ২০১৪, শুক্রবার ৩ অক্টোবর ২০১৪, মঙ্গল ২৮ অক্টোবর ২০১৪, শনিবার ৮ নভেম্বর ২০১৪, মঙ্গলবার ২৫ নভেম্বর ২০১৪, মঙ্গলবার ১৮ নভেম্বর ২০১৪, সোমবার ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৪, মঙ্গল বার ২৩ ডিসেম্বর ২০১৪।

বৃহস্পতিবার ১ জানুয়ারী, ২০১৫।

বাংলাদেশ প্রতিদিন

রোববার ১৪ আগষ্ট ২০১১।
শুক্রবার ১৪ ফেব্রুয়ারী ২০১৪।

মানব জমিন

বৃহস্পতিবার ১২ মে ২০১১।

যুগান্তর

বৃহস্পতিবার ২১ জানুয়ারী ২০১০, শনিবার ২৫ ডিসেম্বর ২০১০।
বৃহস্পতিবার ৩ জুলাই ২০১৪ , শনিবার ১২ জুলাই ২০১৪, বৃহস্পতিবার ২৪ জুলাই ২০১৪, বৃহস্পতিবার ৭ আগষ্ট ২০১৪, মঙ্গলবার ১২ আগষ্ট ২০১৪, রোববার ২৪ আগষ্ট ২০১৪, বুধবার ২৭ আগষ্ট ২০১৪, রোববার ৩১ আগষ্ট ২০১৪, বুধবার ১০ সেপ্টেম্বর ২০১৪।

সমকাল

মঙ্গলবার ২৪ এপ্রিল ২০০৭।
শনিবার ২৮ ফেব্রুয়ারী ২০০৯।
শুক্রবার ২৫ জুন ২০১০।

৮.৬ চিত্র/ প্রামান্য চিত্র /পাইচার্ট

১. চিত্র/ ছবি

(১) মানচিত্রে বাংলাদেশ - (চতুর্থ অধ্যায়, পৃ ঃ ৮১)

(২- ক,খ,গ) সেনা বাহিনী, বিমান বাহিনী ও নৌবাহিনীর দুইজন করে ছয়জন নারী কর্মকর্তার ছবি

ক. সেনা বাহিনীর দুইজন নারী কর্মকর্তার ছবি

সেনাবাহিনীর মেজর মিশকাত বেগম ও লেফটেন্যান্ট সুতপা জামান

খ. নৌ বাহিনী র দুইজন নারী কর্মকর্তার ছবি

নৌবাহিনীর লেফটেন্যান্ট কমান্ডার (এলবিএন) তানিয়া সওগাত ও সাব লেফটেন্যান্ট (ইবিএন) সেহলিনা নাবিলা

গ. বিমান বাহিনীর দুইজন নারী কর্মকর্তার ছবি

বিমানবাহিনীর স্কোড্রন লিডার রুমানা আকতার (ডানে) ও ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মুনীরা হক।
ছবি : সৈকত ভদ্র

৩ .(ক,খ,গ) সর্বোচ্চ পর্বত শৃঙ্গে আরোহনকারী নারীর ছবি

ক. অ্যান্টার্কটিকার সর্বোচ্চ শৃঙ্গে ওয়াসফিয়া

অ্যান্টার্কটিকার সর্বোচ্চ শৃঙ্গে ওয়াসফিয়া

তুষার ছিল নিত্যসঙ্গী, তাই এভাবেই যাওয়া ● ছবি : ডিলান টেইলর

পল্লব মোহাইমেন ●

পৃথিবীর একেবারে দক্ষিণের বরফ-ঢাকা অ্যান্টার্কটিকা মহাদেশে বাংলাদেশের মানুষের পা পড়েছে আগেই। তবে অ্যান্টার্কটিকার সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ ভিনসন ম্যাসিফের চূড়ায় বাংলাদেশের পতাকা ওড়ার ঘটনা আগে ঘটেনি। প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে এ কাজটি করলেন এভারেস্ট বিজয়ী ওয়াসফিয়া নাজরীন, ৪ জানুয়ারি ভিনসন সময় (অ্যান্টার্কটিকায় একেক অঞ্চলে একেক রকম সময়) বিকেল চারটায়। ওয়াসফিয়া নাজরীন পৃথিবীর সাত মহাদেশের সাত পর্বতচূড়া জয়ের যে 'বাংলাদেশ অন সেভেন সামিট' কর্মসূচি ঘোষণা করেছেন, ১৬ হাজার ৫০ ফুট উঁচু ভিনসন ম্যাসিফ আরোহণের মাধ্যমে তার চারটি ধাপ অতিক্রম হয়ে গেল। গত ২৬ মে তিনি মাউন্ট এভারেস্ট জয় করেন।

ভিনসন ম্যাসিফ জয়ের পর এখনো দেশে ফেরেননি ওয়াসফিয়া। চিলি থেকে ই-মেইলেই জানালেন এই অভিযানের সংক্ষিপ্ত তথ্য। গত ১২ ডিসেম্বর ঢাকা থেকে কানাডা যান তিনি। কানাডায় তাঁকে দক্ষিণ মেরুর এই পর্বতাভিযানের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ নিতে হয়। প্রশিক্ষক পৃথিবীর প্রথম সেভেন সামিটজয়ী পর্বতারোহী প্যাট্রিক মোরো। ওয়াসফিয়া বললেন, 'সেটা ছিল কঠোর প্রশিক্ষণ। ক্রিভাস রেসকিউ, গ্লেসিয়ার

খ. ওয়াসফিয়া মালামাল বহন করেই পর্বতে আরোহন করছে

ভিনসন ম্যাসিফ অভিযানের এই পথে মালামাল এভাবেই নিজেদের বহন করতে হয় ● ছবি : ডিলান টেইলর

গ. পর্বত চূড়ায় ওয়াসফিয়া বাংলাদেশের পতাকা তুলে ধরেছেন

ভিনসন ম্যাসিফের চূড়ায় ওয়াসফিয়া ● ছবি : ডিলান টেইলর

চিত্র ৪. শিশু ধর্ষণ ও হত্যার প্রতিবাদ

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র -৫. এসিড সহিংসতার শিকার চিকিৎসারত মেয়েটি।

চিত্র -৬. এ্যাসিডে চোখ ঝলসে গেছে মাসুদার দু'চোখ তারপর্ও সে চালিয়ে যাচ্ছে তার লেখা পড়া

৬ (ক,খ,গ). যৌতুকের নিষ্ঠুরতা

ক. শিকল বন্দী স্ত্রী

যৌতুকের দাবিতে আট দিন ধরে স্ত্রীকে শেকলবন্দী

কুতুবদিয়া (কক্সবাজার) প্রতিনিধি ঃ

বিয়ের পর থেকেই নিয়মিত যৌতুক দাবি করছিলেন স্বামী মাহামুদুল করিম। যৌতুক না দেওয়ায় স্ত্রী খালেদা বেগমকে অনেকবার শারীরিক নির্যাতনও করেন তিনি। সর্বশেষ ৯ ফেব্রুয়ারি থেকে রান্নাঘরে স্ত্রীর হাত ও পায়ে শেকল দিয়ে বেঁধে রাখেন মাহামুদুল। বন্ধ করে দেওয়া হয় খাওয়া-দাওয়া।

প্রতিবেশীদের কাছ থেকে খবর পেয়ে কক্সবাজারের কুতুবদিয়া থানার পুলিশ গত বৃহস্পতিবার বিকেল চারটার দিকে কুতুবদিয়া উপজেলার লেমশীখালী ইউনিয়নের কলালপাড়া গ্রামের বাড়ি থেকে শেকলবন্দী খালেদাকে উদ্ধার করে।

এ দিকে খালেদাকে উদ্ধারে পুলিশকে সহযোগিতা করায় মাহামুদুলের আত্মীয়স্বজন তাদের প্রতিবেশী আবু বক্করকে গতকাল শুক্রবার দুপুরে বেধড়ক মারধর করেছে। বর্তমানে তিনি কুতুবদিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন।

উদ্ধারের পর খালেদা বেগম বৃহস্পতিবার প্রথম আলোকে জানান, তাঁদের বাড়ি চট্টগ্রামের পটিয়ায়। বাবা সুলতান আহমেদ বেঁচে নেই। দুই বছর আগে কুতুবদিয়ার কলালপাড়া গ্রামের মাহামুদুল করিমের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। বিয়ের সময় তাঁর পরিবার মাহামুদুলকে ৩০

এভাবেই শেকলবন্দী ছিলেন খালেদা

হাজার টাকা নগদ দেয়। এর পর মাহামুদুল আরও ৫০ হাজার টাকা চায়।

কান্নাজড়িত কণ্ঠে খালেদা বলছিলেন, আমি তাকে (মাহামুদুল) বলেছি, আমার বাবা বেঁচে নেই। আমি কীভাবে টাকার ব্যবস্থা করব। এ নিয়ে তিনি আমাকে অনেক মারধর করেছেন। নির্যাতন সইতে না পেরে অনেকবার সংসার ছেড়ে চলে যেতে চেয়েছি, কিন্তু পারিনি।'

খালেদা জানান, যেভাবেই হোক আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে ৫০ হাজার টাকা এনে দেওয়ার দাবিতে ৯ ফেব্রুয়ারি সকালে মাহামুদুল তাঁকে বেধড়ক মারধর করেন। পরে রান্নাঘরে নিয়ে হাত-পায়ে শেকল দিয়ে বেঁধে রাখেন। আর তাকে সহযোগিতা করেন শ্বশুর-শাশুড়ি ও দেবরেরা।

বিষয়টি টের পেয়ে প্রতিবেশীরা মাহামুদুল ও তাঁর পরিবারকে একাধিকবার শেকল খোলার অনুরোধ করেন। শেষমেশ প্রতিবেশীরা বিষয়টি কুতুবদিয়া থানার পুলিশকে জানান।

কুতুবদিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহফুজুল হক প্রথম আলোকে জানান, শেকলবাঁধা অবস্থায় উদ্ধারের পর খালেদাকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়। পরে তাঁকে আত্মীয়স্বজনের কাছে বুঝিয়ে দেওয়া হয়। এ ব্যাপারে খালেদা স্বামী মাহামুদুলসহ পাঁচজনকে আসামি করে থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলা করেছেন।

অন্য আসামিরা হলেন মাহামুদুলের বাবা মোহাম্মদ হোসাইন, মা জহিরা বেগম, ভাই জয়নাল ও শফিক। মামলার তদন্ত কর্মকর্তা উপপরিদর্শক (এসআই) আজিজ আহমদ ভূঁইয়া, আসামিরা পলাতক। তাদের গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে।

খ. টাকা চেয়ে না পেয়ে স্বামী কর্তৃক স্ত্রীর গায়ে আগুন

বগুড়ার সারিয়াকান্দিতে স্বামীর দেওয়া আগুনে দগ্ধ লতিফুনকে গতকাল শজিমেক হাসপাতালে ভর্তি করা হয় ● আমাদের সময়

স্বামীর আগুনে দগ্ধ স্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদক, বগুড়া ●
বগুড়ার সারিয়াকান্দিতে লতিফুন (২৮) নামের এক গৃহবধূর গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন দিয়েছে তার স্বামী। মারাত্মক দগ্ধ ওই গৃহবধূকে বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিক্যাল কলেজ (শজিমেক) হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। চিকিৎসকরা বলছেন, তার শরীরের ৯০ শতাংশ পুড়ে গেছে। অবস্থা খুবই আশঙ্কাজনক। এ ঘটনায় গতকাল শনিবার বেলা আড়াইটার দিকে বগুড়া শহর থেকে গৃহবধূর স্বামী হায়দার আলীকে আটক করেছে পুলিশ।

গৃহবধূর স্বজনরা জানিয়েছেন, বগুড়ার সারিয়াকান্দির নান্দিয়ার পাড়ার লতিফুন পোশাককলে কাজ করতেন। কয়েক মাস আগে গাবতলি উপজেলার বাইগুনি এলাকার হায়দার আলীর সঙ্গে তার পরিচয় হয়। পরিবারের অমতে ৩ মাস আগে দুই জন বিয়ে করেন। দুই দিন আগে লতিফুন তার স্বামীকে নিয়ে সারিয়াকান্দিতে ভাইয়ের বাড়িতে বেড়াতে যান। শুক্রবার রাতে টাকাপয়সা নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বাকবিতণ্ডা হয়। এক পর্যায়ে স্বামী তার গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন দিয়ে পালিয়ে যায়। পরে এলাকার লোকজন তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করায়।

বগুড়া শজিমেক হাসপাতালের বার্ন ইউনিটের চিকিৎসক আব্দুল জলিল জানান, আগুনে লতিফুনের শরীরের ৯০ ভাগ এরপর পৃষ্ঠা ২, কলাম ৮

গ.কুমিল্লায় যৌতুকের দাবীতে তাছলিমাকে পুড়িয়ে হত্যা

৭.(ক, খ) বাল্য বিবাহ

ক. দুই শিশু সহ শিশু মাতা ফিরোজা বেগম

দুই সন্তানের সঙ্গে মোহাম্মদপুর বস্তির ফিরোজা বেগম ● ছবি: মুসলিম জাহান

Dhaka University Institutional Repository

খ. বাল্য বিবাহ - শিশুর কোলে শিশু

শিশু কোলে নিয়ে নুরী ● ছবি : সাবিনা ইয়াসমিন

শিশুর কোলে শিশু

৮. এসএসসি পরীক্ষায় জিপিএ- ৫ পা্ওয়া দুই কন্যা এবং তাদেও মাতা চাঁপারানীর ছবি।

চাঁপা রানীর দুই মেয়ে হিরা (বাঁয়ে) ও মুক্তা — সুমন ইসলাম

বখাটের হাতে নিহত চাঁপারানীর দুই মেয়ে পেয়েছে জিপিএ ৫

সুমন ইসলাম ◉ ফরিদপুর থেকে: মায়ের ছবি বুকে চেপে ধরে অঝোরে কাঁদছিল হিরা-মুক্তা। চোখের জল গড়িয়ে পড়ছিল পিতা স্বপন বিশ্বাসেরও। মেয়েদের সাফল্যে যে মানুষটি সবচেয়ে বেশি খুশি হতেন, শুধু তিনি অনুপস্থিত। তিনি নেই বলেই এ কান্না। তিনি

বখাটের মোটরসাইকেল চাপায় নিহত চাঁপা রানী —(ফাইল ছবি)

হলেন বখাটের হাতে নিহত হিরা ও মুক্তার মা চাঁপা রানী। এ কথা ভেবেই হাউ মাউ করে বার বার কেঁদে উঠছেন দুবোন। শোকের সাগরে নিমজ্জিত থেকেও এবারের এসএসসি পরীক্ষায় গোল্ডেন এ প্লাস পেয়ে মায়ের আশা পূরণ

এরপর পৃষ্ঠা ২, কলাম ৩

৯. দোররার কারণে মৃত হেনার ছবি

সমাজপতিদের বিচারে দোররার শিকার নিহত হেনা

১০.(ক,খ,গ) গৃহকর্মী নির্যাতন

ক. হাসপাতালে কাতরাচ্ছে গৃহকর্মী লিলি

হাসপাতালে কাতরাচ্ছে গৃহকর্মী লিলি

গাইবান্ধা প্রতিনিধি ▶

গাইবান্ধা আধুনিক হাসপাতালে মহিলা ওয়ার্ডের ৬ নম্বর বেডে শুয়ে কান্নাজড়িত কণ্ঠে লিলি আক্তার (১৪) জানাল, 'চার বছর ধরিয়া ঢাকাতও মার বাড়িত কাম করবার যায়া মেলা কিল আর ছেঁকা খাইচি, সারা গায়োত (শরীরে) তার চেহ্ন ! এই দ্যাহেন...।' কাপড় সরিয়ে সেসব চিহ্ন দেখে আঁতকে ওঠেন উপস্থিত সাংবাদিক, নারী সংগঠনের নেতা ও আশপাশে দাঁড়িয়ে থাকা লোকজন।

গৃহকর্ত্রীর নির্মম নির্যাতনের শিকার কিশোরী গৃহকর্মী লিলি আক্তারের বাড়ি গাইবান্ধা সদর উপজেলার বোয়ালী ইউনিয়নের দক্ষিণ হরিণসিংহা গ্রামে। তার বাবা দিনমজুর আবদুল গফুর। ঢাকার উত্তরায় গৃহকর্ত্রীর নির্মম নির্যাতনের শিকার লিলিকে গত বৃহস্পতিবার পুলিশ সুপার বাসুদেব বণিকের নির্দেশে সদর থানার পুলিশ উদ্ধার করে গাইবান্ধা আধুনিক হাসপাতালে ভর্তি করায়। তার পেটের বিভিন্ন স্থানে বড় বড় ফোসকা, হাতের তালুতে দগদগে ঘা, বাম হাতে কাটা দাগ এবং মাথা ও গোটা শরীরে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে।

পুলিশ ও কিশোরী লিলি আকতার জানায়, চার বছর আগে কাজের মেয়ে হিসেবে গাইবান্ধা সদর উপজেলার বোয়ালী ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান আবদুল্লাহ খান লিলিকে ঢাকার উত্তরায় তাঁর বোন সীমা আক্তারের বাসায় পাঠান। ওই বাড়ির সব কাজই তাকে করতে হতো। এরপরও নানা অজুহাতে তার ওপর অমানুষিক নির্যাতন চালানো হতো। রুটি তৈরির বেলুন, গরম খুন্তি আর ডাল ঘুটনির আঘাত ছিল লিলির প্রতিদিনের পাওনা। সীমার স্বামী ও দুই সন্তান তার ওপর তুচ্ছ কারণে একই কায়দায় নির্যাতন চালাত।

ঈদের সাত দিন আগে ছেলের দুধের পানি গরম করে দিতে দেরি হওয়ায় রুটি তৈরির বেলুন দিয়ে লিলির বাম গালে আঘাত করেন সীমা। এরপর সীমা ফ্লাস্কের ফুটন্ত পানি ঢেলে দেন লিলির শরীরে। এতে তার শরীরের বিভিন্ন অংশে ফোসকা পড়ে। এরপর কোনো চিকিৎসা না করিয়েই ঈদের দুই দিন আগে লিলিকে ঢাকা থেকে একাকী বাসে করে পাঠিয়ে দেওয়া হয় গাইবান্ধায় তার বাড়িতে। অর্থাভাবে গরিব বাবা গ্রাম্য ডাক্তার দিয়ে তার চিকিৎসা করান। কিন্তু এতে তার শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটে। বিষয়টি স্থানীয় নারী সংগঠন ও সাংবাদিকদের কানে পৌঁছলে তাঁরা পুলিশ সুপারকে খবর দেন। পুলিশ অসুস্থ অবস্থায় তাকে বাড়ি থেকে এনে গাইবান্ধা আধুনিক হাসপাতালে ভর্তি করায়। হাসপাতালের জরুরি বিভাগে কর্তব্যরত ডাক্তার মলয় কুমার সরকার বলেন, লিলির অবস্থা ভালো নয়। তার শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাতের চিহ্ন এবং কোথাও কোথাও ফোসকা ও ঘা রয়েছে। হাসপাতালে তার প্রয়োজনীয় চিকিৎসার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। পুলিশ সুপার বাসুদেব বণিক জানান, অভিযোগ পেলে অপরাধীদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

Dhaka University Institutional Repository

খ. ডাষ্টবিনে পড়ে থাকা মানবতা (জীবন্মৃত আদুরীর)(আছে)

গ. নির্যাতীত আসমাউলের ছবি

শিশু গৃহকর্মীকে বর্বরভাবে নির্যাতন, দম্পতি গ্রেপ্তার

চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি ●

শিশু গৃহকর্মীকে বর্বরভাবে নির্যাতনের ঘটনায় চুয়াডাঙ্গা সদর থানার পুলিশ গত বুধবার রাতে এক দম্পতিকে গ্রেপ্তার করেছে। তাঁরা হলেন চুয়াডাঙ্গার রেলপাড়ার মো. শমসের আলীর মেয়ে চিকিৎসক জান্নাতুল বাকী রত্না ওরফে রত্না বেগম ও তাঁর প্রকৌশলী স্বামী নাটোরের রেজাউল করিম।

নির্যাতনের শিকার গৃহকর্মী আসমাউলের মা শিল্পী খাতুন এ ঘটনায় ওই রাতেই চুয়াডাঙ্গা থানায় লিখিত অভিযোগ করেছেন। গ্রেপ্তার হওয়া দম্পতিকে গতকাল বৃহস্পতিবার থানা থেকে আদালতে হাজির করা হলে আদালত তাঁদের কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

আসমাউল জেলার জীবননগর উপজেলার সুবলপুর গ্রামের শহিদুল ইসলামের মেয়ে। চুয়াডাঙ্গা বিএডিসির শ্রমিক শহিদুল স্ত্রী শিল্পী খাতুন ও চার সন্তানকে নিয়ে বর্তমানে শহরের একটি বাড়িতে ভাড়া থাকেন। রেজাউল-রত্না দম্পতি থাকেন ঢাকার পশ্চিম ধানমন্ডির ফ্ল্যাটে।

আসমাউল বলে, ঢাকার ওই বাসায় এক বছর ধরে প্রায়ই তার ওপর নির্যাতন চালানো হতো। প্রতিদিন সকালে দুটি রুটি খেতে দিয়ে রেজাউল-রত্না কর্মস্থলে যেতেন। প্রায়ই বাড়ি ফিরতে তাঁদের সন্ধ্যা হতো। তাই মাঝেমধ্যে ঘরে থাকা খাবার খেলে রত্না তাকে গরম খুন্তি দিয়ে ছ্যাঁকা দিতেন। কখনো খামচি দিয়ে রক্তাক্ত করতেন।

আসমাউলের শরীরে নির্যাতনের চিহ্ন

দিনভর কাজ শেষে রাতে ঝিমুনি এলে চোখে আঘাত করতেন। প্রায় দিনই এভাবে নির্যাতন চালানো হতো। তবে বাইরে বের হওয়ার সুযোগ না থাকায় এ কথা কাউকে জানাতে পারেনি।

বাসায় প্রতিবেশী বা মেহমান এলে তাদের সামনে তাকে যেতে দেওয়া হতো না। ১৫ দিন আগে দুপুরে না বলে ভাত খাওয়ায় গরম তাওয়া দিয়ে তার নিতম্বে ছ্যাঁকা দেওয়া হয়। এতে চামড়া ঝলসে ঘা হয়ে যায়। এর পরও তাকে চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়নি।

শিল্পী খাতুন বলেন, অভাবের সংসারে সহযোগিতার নামে দূরসম্পর্কের আত্মীয় চুয়াডাঙ্গা শহরের রেলপাড়ার শমসের আলীর মেয়ে রত্না বেগম ও তাঁর স্বামী রেজাউল তাঁদের শিশুসন্তানকে দেখাশোনা করার জন্য আসমাউলকে ঢাকায় নিয়ে যান। সে সময় তাঁরা আশ্বাস দিয়েছিলেন, মেয়েটিকে পড়াশোনার পাশাপাশি ভবিষ্যতে বিয়ে-শাদির ব্যবস্থা করবেন। অথচ মেয়েটিকে বর্বর কায়দায় নির্যাতন করেছেন। মঙ্গলবার রাত ১১টার দিকে চুয়াডাঙ্গায় তাঁদের কাছে মেয়েটিকে দিয়ে দ্রুত সটকে পড়েন তাঁরা।

এদিকে শিশু নির্যাতনের ঘটনাটি বুধবার এলাকায় জানাজানি হয়ে যায়। পুলিশ নির্যাতনকারী দম্পতিকে খুঁজতে থাকে। তাঁদের না পেয়ে বুধবার সন্ধ্যায় রত্নার বাবা শমসের আলীকে আটক করে। রত্না বাবাকে ছাড়াতে থানায় এলে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। এর পরপরই স্থানীয় একটি পরিবহন কাউন্টার থেকে রেজাউল করিমকে গ্রেপ্তার করা হয়।

রেজাউল করিম বলেন, নির্যাতনের অভিযোগ সঠিক নয়। গরম পানির পাত্রের ওপর পড়ে যাওয়ায় মেয়েটির শরীরে ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে।

সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এরশাদুল কবীর চৌধুরী জানান, ঘটনাস্থল ঢাকার হাজারীবাগ থানা এলাকায় হওয়ায় সেখানে মামলা দায়েরের বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। স্থানীয়ভাবে তাঁদের ৫৪ ধারায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

১১.(ক,খ, গ) স্বামীর নির্মম নিষ্ঠুরতার শিকার -ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক রুমানা মঞ্জুর

ক. শিশু সন্তান সহ্ চমৎকার এক রূমানা

মেয়েসহ রুমানা মনজুর

নির্যাতন মেনে নেওয়া যায় না

পারিবারিক নির্যাতন এখন আর শুধু ব্যক্তিগত বিষয় নয়। মানুষে মানুষে মতবিরোধ, ভিন্নতা থাকতেই পারে। কিন্তু তার পরিণতিতে সহিংস, নির্মম, নৃশংস কিছু ঘটুক তা কখনোই কাম্য নয়। একজন উচ্চশিক্ষিত, আত্মনির্ভরশীল নারী নির্যাতনের শিকার হয়ে দৃষ্টি হারাবেন, সেটা মেনে নেননি তাঁর পরিচিত-অপরিচিত কেউই। কেউ চিঠি পাঠিয়েছেন, কেউ ই-মেইলে বার্তা দিয়েছেন, কেউ বা পত্রিকা অফিসে এসে নিজের মতামত জানিয়ে গেছেন। রুমানা মনজুরের ঘটনায় যাঁরা প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন, তাঁদের লেখা থেকেই নির্বাচিত কয়েকটি এখানে। আর ভারতে চিকিৎসা নিতে যাওয়ার আগে রুমানা মুখোমুখি হয়েছিলেন *প্রথম আলোর* প্রতিবেদকের

খ. স্বামীর হাতে অন্ধ হয়ে যাওয়া রুমানা (শিশু সন্তানটিকে দেখতে পাচ্ছেননা)

দেশে ফিরেছেন রুমানা

'আমি আমার বাচ্চাটাকে দেখতে পাচ্ছি না'

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

'আমার পৃথিবীটা অন্ধকার করে দিল। আমি আমার বাচ্চাটাকে দেখতে পাচ্ছি না।' দেশে ফিরে এই কথাটুকু বলেই কান্নায় ভেঙে পড়েন রুমানা মনজুর। গতকাল সোমবার ভারত থেকে ফিরে আবারও ল্যাবএইড হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন তিনি।

হাসপাতালের কেবিনে শুয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক রুমানা কেবল কেঁদেই গেলেন। চিকিৎসকেরা রুমানাকে জানিয়ে দিয়েছেন, তাঁর দুটি চোখই পুরোপুরি নষ্ট হয়ে গেছে। বাঁ চোখটা বন্ধ হয়ে আছে, ডান চোখ আধখোলা। সবাই আশা করেছিল, ডান চোখটায় হয়তো কিছু করা যাবে। কিন্তু ভারতের চিকিৎসকেরাও কোনো আশার কথা শোনাতে পারেননি।

এরপর পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ২

পাঁচ বছরের মেয়েকে নিয়ে গতকাল ঢাকায় ফিরেছেন রুমানা মনজুর। হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে ছবিটি তোলা ● প্রথম আলো

গ. রুমানা এখন অন্ধদের লাঠি ভর করে হাঁটছেন

রুমানা এখন

কানাডায় 'ডটার ডে'তে পুরস্কার নিচ্ছেন রুমানা মনজুর (ডান থেকে দ্বিতীয়)

১২. (ক,খ) সন্তান সহ মা'য়েদের আত্মাহুতি

ক. চার সন্তান সহ আত্মাহুতি দেওয়া মায়ের বেঁচে যাওয়া দু'টি সন্তান

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার লাইফ কেয়ার ক্লিনিকে চিকিৎসাধীন জীবন ও ঝর্না —এফএনএস

নানার বাড়ির কথা বলে ফেরদৌসী ৪ সন্তান নিয়ে রেললাইনে যান

রুহুল হাসান শরীফ ॥ হবিগঞ্জ থেকে: দুই সন্তানসহ ... তার ছোট বোন ঝর্নাকে কোল থেকে ছুড়ে ফেলে আর

Dhaka University Institutional Repository

খ. এই দু'টি মেয়েকে নিয়েই আত্ম-হত্যা করেছেন আরেক মা জাহানারা বেগম

দুই মেয়ে নিয়ে মায়ের আত্মহনন

জাহানারা বেগম | হাওয়া | শারমিন

ইসমাইল হুসাইন ইমু : রাজধানীর কাফরুলে পারিবারিক কলহের জের ধরে জাহানারা বেগম (৩৬) নামের এক গৃহবধূ তার ২ মেয়ে হাওয়া (৮) ও শারমিনকে (৫) নিয়ে বিষপানে আত্মহত্যা করেছেন। গতকাল সোমবার দুপুরে মিরপুর-১৪ নম্বর আশিদাগ এলাকায় এ মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে। ঘটনাস্থল থেকে লাশ উদ্ধার করে মর্গে পাঠিয়েছে। ঘটনার পর থেকে জাহানারার স্বামী নুরুল ইসলাম পলাতক রয়েছেন। কাফরুল থানার ওসি আব্দুল লতিফ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। ওসি স্থানীয়দের বরাত

এরপর পৃষ্ঠা ৭, কলাম ৫

১৩. বৃদ্ধা আরাফুন্নেছা - নিজ সন্তানেরা যেই মাকে বাড়ির বাইরে রেখে গেছে

সেই মায়ের ঠাঁই গাজীপুর বৃদ্ধাশ্রমে

বরিশাল প্রতিনিধি ●

'আমারই ঠিকানা তাই বৃদ্ধাশ্রম!' অবশেষে বরেণ্য শিল্পী নচিকেতার মর্মস্পর্শী সেই গানের সত্যিকারের রূপ মিলেছে অভাগী মা আরাফাতুন নেছার (৮৫) জীবনে। গতকাল বিকালে আরাফাতুন নেছার ভরণ-পোষণের দায়িত্ব নেন গাজীপুরের বয়স্ক পুনর্বাসন কেন্দ্রের সমন্বয়কারী মো. রবিউল ইসলাম। জানা গেছে, কুমিল্লায় থাকা দুই ছেলে বোনের বাড়িতে বেড়াতে নিয়ে যাওয়ার কথা বলে তাদের গর্ভধারিণী মা আরাফাতুন নেছাকে বরিশালের গৌরনদীর টরকী বাসস্ট্যান্ডের রাস্তার পাশে ফেলে যায়। এ-সংক্রান্ত সচিত্র প্রতিবেদন আমাদের সময় পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার পর অভাগী মা আরাফাতুন নেছার ভরণ-পোষণের দায়িত্ব নিলেন গাজীপুরের বয়স্ক পুনর্বাসনকেন্দ্রের সমন্বয়কারী মো. রবিউল ইসলাম। গতকাল শনিবার বিকালে তিনি অভাগী আরাফাতুন নেছাকে নিয়ে গাজীপুরের উদ্দেশে রওনা হয়েছেন। সূত্র জানায়, গত ৩০ জানুয়ারি রাতে দুর্গাপাশার একটি বাস থেকে বৃদ্ধা আরাফাতুন নেছাকে তার ছেলে শামীম ও শাহিন গৌরনদীর টরকী বাসস্ট্যান্ডে ফেলে যায়। রোগাক্রান্ত বৃদ্ধা পরবর্তী ১০ দিন রাস্তার পাশেই ছেলেদের আশার অপেক্ষায় দিনাতিপাত করতে থাকেন। পরে স্থানীয় এনজিওকর্মী মোহাম্মদ আলী বৃদ্ধার করুণ কাহিনি শুনে তার খাবার ও প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। সচিত্র প্রতিবেদন প্রকাশিত হওয়ার পর দেশজুড়ে হৈ চৈ পড়ে যায়। একপর্যায়ে গৌরনদী উপজেলা নির্বাহী অফিসার বৃদ্ধা আরাফাতুন নেছাকে উদ্ধার করে উন্নত চিকিৎসার জন্য গৌরনদী হাসপাতালের ভিআইপি কেবিনে ভর্তি করেন। ৮ দিনের চিকিৎসায় বৃদ্ধা পুরোপুরি সুস্থ হয়ে ওঠেন। হাসপাতালের মেডিক্যাল অফিসার ও বৃদ্ধার চিকিৎসক ডা. মো. সেকান্দার আলী মোল্লা জানান, চিকিৎসাধীন অবস্থায় আরাফাতুন নেছা দিন-রাত সব সময় তার ছেলে শাহিন ও শামীমের নাম ধরে ডেকে ডেকে কান্নাকাটি করছিলেন।

আরাফাতুন নেছা

Dhaka University Institutional Repository

১৪. নারীর প্রতি সহিংসতা এখনই বন্ধ করুন শীর্ষক গোল টেবিল বৈঠক

প্রথম আলো কার্যালয়ে গতকাল অনুষ্ঠিত 'নারীর প্রতি সহিংসতা এখনই প্রতিরোধ করুন' গোলটেবিল বৈঠকে আলোচকেরা ● ছবি: প্রথম আলো, [illegible], ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৬

নারী নির্যাতন এখনই বন্ধ করতে হবে

৮.৬ চিত্র/ প্রামান্য চিত্র/পাইচার্ট ৮.৬ চিত্র/ প্রামান্য চিত্র/পাইচার্ট

৮.৬ চিত্র/ প্রামান্য চিত্র/পাইচার্ট ৮.৬ চিত্র/ প্রামান্য চিত্র/পাইচার্ট

৮.৬ চিত্র/ প্রামান্য চিত্র/পাইচার্ট ৮.৬ চিত্র/ প্রামান্য চিত্র/পাইচার্ট

প্রামান্য চিত্র

প্রামান্য চিত্র -১
দশহাতে কাজ করেও স্বীকৃতি নেই নারীর

প্রামান্য চিত্র - ২. নারী মুক্তি ও অগ্রগতি কার্যক্রম পরিচালনা সংক্রান্ত বিদ্যমান প্রাতিষ্ঠানিক সেটআপ ঃ (পৃ ঃ ১০০, চতুর্থ অধ্যায়, পরিশিষ্ট ১৫ দ্রঃ)

প্রামান্য চিত্র - ৩. **Allocation of gender as % of Annual Budget** ঃ (পৃঃ ১৪১, চতুর্থ অধ্যায়)

পাইচার্ট

পাইচার্ট ১. এ্যাসিড সন্ত্রাসে আক্রান্তের সংখ্যা ঃ (পৃঃ ১৮৯, পঞ্চম অধ্যায়)

পাইচার্ট ২. এ্যাসিড সন্ত্রাসে আক্রান্ত নারী পুরুষ ঃ (পৃঃ ১৮৯,পঞ্চম অধ্যায়)

৮.৭ চিত্র/ প্রামান্য চিত্র/পাইচার্ট

পাইচার্ট ৩. আত্মহত্যার প্রবনতার একটি চিত্র ঃ (পৃঃ ২৩১,পঞ্চম অধ্যায়)

৮.৭ পরিশিষ্ট (Appendix)

পরিশিষ্ট ১ - সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করণঃ দারিদ্র হ্রাস কৌশলপত্র ২০০৫ থেকে Policy Matrics 16ঃ Womens Advancement & Righs সংক্রান্ত তথ্য। পৃঃ ৪৫৮-৪৬০

পরিশিষ্ট ২ - আদম শুমারী ও গৃহগণনা ২০১১/২০১২ এর চূড়ান্ত ফলাফল। পৃঃ৪৬১

পরিশিষ্ট -৩ এক নজরে সহস্রাব্দ উন্নয়ন (এমডিজি) অর্জনের অগ্রগতি।৪৬২

পরিশিষ্ট -৪ বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত সংখ্যা, ফেব্রুয়ারী ৮, ২০০৯ ও জুলাই ৯, ২০০৯ এ প্রকাশিত জাতীয় মহিলা ও শিশু উন্নয়ন পরিষদ(NCWD) । ৪৬৩-৪৬৮

পরিশিষ্ট - ৫ মহিলা শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি ।৪৬৯

পরিশিষ্ট - ৬ নারী ও শিশু উন্নয়ন বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন কমিটি। ৪৭০- ৪৭২

পরিশিষ্ট - ৭ নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ এবং যৌতুক বিরোধী জাতীয় কার্যক্রম পরিচালনা সংক্রান্ত আন্তঃমন্ত্রনালয় সমন্বয় কমিটি। ৪৭৩ -৪৭৪

পরিশিষ্ট - ৮ আন্তঃমন্ত্রনালয় সমন্বয় কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে - ষ্টিয়ারিং কমিটি ।৪৭৫-৪৭৬

পরিশিষ্ট - ৯ জেলা এবং উপজেলা মহিলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটি ।৪৭৬-৪৭৯

পরিশিষ্ট - ১০ জেলা নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটি ।৪৮০-৪৮১

পরিশিষ্ট -১১ উপজেলা নারী নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটি। ৪৮২-৪৮৩

পরিশিষ্ট - ১২ জাতীয় মহিলা সংস্থা সম্পর্কিত বাংলাদেশ গেজেট অতিরিক্ত সংখ্যা, ৪ মে ১৯৯১।৪৮৪-৪৯২

পরিশিষ্ট -১৩ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের জন্য পি এফএ বাস্তবায়নে জাতীয় পরিকল্পনা। ৪৯৩ - ৫০৬

পরিশিষ্ট - ১৪ পি এফএ বাস্তবায়নে সাধারণ কর্মপরিকল্পনা। ৫০৭

পরিশিষ্ট - ১৫ এক নজরে নারীমুক্তি ও অগ্রগতি পরিচালনা সংক্রান্ত বিদ্যমান প্রাতিষ্ঠানিক সেটআপ।৫০৮

পরিশিষ্ট -১৬ জেন্ডার সংশ্লিষ্ট দীর্ঘ মেয়াদী প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০ - ২০২১ এর অনুচ্ছেদ - ১.৩ এর Promoting Gender Balance নামীয় প্রবন্ধ।৫০৯

পরিশিষ্ট -১৭ (ক,খ)মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের মাধ্যমে ২০১৩- ১৪ সনে দরিদ্র মা'দেও জন্য প্রদত্ত মাতৃত্বকাল ভাতা। ৫১০

পরিশিষ্ট -১৮ (ক,খ) মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের মাধ্যমে ২০১৪ - ১৫ সনে দরিদ্র মা'দেও জন্য প্রদত্ত মাতৃত্বকাল ভাতা ।৫১১-৫১২

পরিশিষ্ট - ১৯ (ক,খ) মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের মাধ্যমে ২০১৩ - ১৪ সনে প্রদত্ত ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা তহবিল। ৫১৩- ৫১৪

পরিশিষ্ট - ২০ (ক,খ) মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের মাধ্যমে ২০১৪ - ১৫ সনে প্রদত্ত কর্মজীবি ল্যাকটেটিং মা'দের বাজেট বরাদ্দ সংক্রান্ত এবং বরাদ্দপ্রাপ্ত কার্ডধারী উপকারভোগীর তালিকার অনুলিপি।৫১২-৫১৩

পরিশিষ্ট - ২১ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের মাধ্যমে ২০১৪ - ১৫ সনে ভিজিডি কার্যক্রমের আওতায় দরিদ্র কর্মজীবি নারীদের জন্য বাজেট বরাদ্দের অনুলিপি।৫১৪

পরিশিষ্ট - ২২(ক,খ,গ) মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের আওতায় মহিলা অধিদপ্তরের মাধ্যমে মাধ্যমে পরিচালিত ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান এবং আর্থিক সংশ্লিষ্টতার বিবরণ । ৫১৫-৫১৭

পরিশিষ্ট - ২৩ পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের আওতায় বর্তমানে কর্মরত ৪৯ জন নারী কর্মকর্তাগণের একটি তালিকা। ৫১৮-৫১৯

পরিশিষ্ট ২৪ - বদরগঞ্জে এক মাসেই ১৬ স্কুল ছাত্রীর বাল্য বিয়ে । তাদের নাম ও ঠিকানা এবং কিছু তথ্য যুগান্তর পত্রিকার ৩১ আগষ্ট ২০১৪ এর সংশ্লিষ্ট অংশ। ৫২০

৮.৮ গবেষণায় ব্যবহৃত তিনসেট নমুনা প্রশ্নমালা (১, ২, ৩)

"বাংলাদেশে নারী মুক্তির ক্ষেত্রে জেন্ডার ও ধর্মের অবস্থান - একটি বিশ্লেষণ" - নামীয় গবেষণা কার্যক্রমের আওতায় তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রশ্নমালা ।

প্রশ্নমালা - ১

সাক্ষাৎদাতার নাম : ---

ব্যক্তিগত জীবনে কি করেন (চাকুরী / রাজনীতি/সমাজসেবা/ ছাত্র/ছাত্রী / গৃহবধূ) : ----------

যে সংস্থার /প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত --------------------------------

পদবী : --

ঠিকানা : ---------------------------------------

(অনুগ্রহ পূর্বক নিচের প্রশ্ন গুলোর ক্ষেত্রে আপনার মতামত হ্যাঁ কিংবা না এর মাধ্যমে দিন। যদি আপনি অতিরিক্ত কিছু বলতে চান তবে প্রশ্ন পত্রের নীচে সংরক্ষিত স্থানে প্রশ্নের নম্বর উল্লেখ করে আপনার বিস্তারিত বক্তব্য লিখে দিতে পারেন। প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজও ব্যবহার করতে পারেন।)

১. বাংলাদেশে নারীদের উন্নয়নের জন্য, নারী-মুক্তির জন্য আন্তর্জাতিক ভাবে প্রতিষ্ঠিত জেন্ডার ইস্যু সংশ্লিষ্ট বিস্তর কার্যক্রম চলছে তা-তো সত্যি?

হ্যাঁ   না

২. ইংরাজী জেন্ডার (**Gender**) শব্দটির অর্থ লিঙ্গ। তা পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ সকলকেই বোঝায়। এই জেন্ডার যখন সামাজিক উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত হলো তখন তো পুরুষ/ নারী উভয়েরই উন্নয়ন এর আওতায় আসার কথা। কিন্তু তা শুধু মাত্র নারীদের উন্নয়নের সাথে অধিকতর সম্পৃক্ত হলো এই কারণে যে মূলতঃ দীর্ঘ সময় ধরে নারী জাতির উন্নয়ন তেমন কিছুই হয়নি নারীরা পুরুষের চেয়ে অনেক বেশী পিছিয়ে ছিল এবং আছে। আপনার বিবেচনায় তা কি যথার্থ?

হ্যাঁ   না

Dhaka University Institutional Repository

৩. জেন্ডার ইস্যু নারী মুক্তির লক্ষ্যে জীবনের সকল ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমান অধিকার নিশ্চিত করার কথা বলে এবং সে লক্ষ্যে বাংলা দেশে গৃহীত হচ্ছে প্রচুর উদ্যোগ-

হ্যাঁ না

৪. বাংলাদেশ সহ বিশ্ব জুড়ে নারী মুক্তির লক্ষ্যে জেন্ডার ইস্যু প্রচুর অবদান রাখছে। কিন্তু তাতে ও কি নারীদের সত্যিকার অর্থে মুক্তি ঘটছে? নারীরা নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা পাচ্ছে?

হ্যাঁ না

৫. বেইজিং এ অনুষ্ঠিত চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনে আমেরিকার তৎকালীন ফাষ্টলেডী হিলারী ক্লিনটন যে নারীর মর্যাদার দাবী করেছেন সেই মর্যাদা নিশ্চিত করার জন্য জেন্ডার ইস্যু কোন ভূমিকা উদ্ভাবন করেছে কি?

হ্যাঁ না

৬. নারীর (স্ত্রীর) সন্তান ধারণ এবং জন্মদান প্রক্রিয়ায় জেন্ডার ইস্যু পুরুষের(স্বামীর) যে ভূমিকাটি নিশ্চিত করার কথা বলে তা হলো সেসময়ে তার (স্ত্রীর) কাছে থাকা, তার যত্ন-আদ্যি করা, চাকুরীজীবি স্বামীদের ছুটি নেয়া ইত্যাদি। এসব ভুমিকায় পুরুষকে বাধ্য করানোর কোন উপায় জেন্ডার ইস্যু নিশ্চিত করেছে কি?

হ্যাঁ না

৭. যদি স্বামীরা বাধ্যবাধকতা ব্যতিরেকে স্বত:স্ফুর্ত ভাবেও তা করেন তবুও কি নারীর সন্তান ধারণ ও সন্তান জন্মদানের (জীবন-মৃত্যুও সন্ধিক্ষন উত্তরণ) ভূমিকার সাথে পুরুষের ভূমিকা সমান হবে?

হ্যাঁ না

৮. পবিত্র কুরআন নারীর প্রতি পুরুষের দায়িত্ব কর্তব্য এবং নিরাপত্তার (আর্থিক-সামাজিক-পারিবারিক) বিষয়াদি বাধ্যতা মূলক ভাবে সম্পৃক্ত রেখে ‘নারী - পুরুষের’ অন্যান্য ভূমিকা কে সমান করে । নারীর সন্তানধারণ ও জন্মদানের ভূমিকার সাথে পুরুষের এই ভূমিকা অনবদ্য এবং যথার্থ কিনা?

হ্যাঁ না

৯. নারী নির্যাতনের ক্ষেত্রে ধর্মকে ব্যবহার করা হচ্ছে যুগ যুগ ধরে। এ ক্ষেত্রে ধর্মের মৌলিক বিষয় নয় বরং ব্যবহৃত হচ্ছে ধর্মে অনুপ্রবেশ করা কুসংস্কার / অপব্যাখ্যা সমূহ-

হ্যাঁ না

১০. নারীর অধিকার ও মর্যাদার ক্ষেত্রে ধর্মের মৌলিক বিষয়ে যদি সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা থেকে থাকে তবে তা গ্রহণের ক্ষেত্রে আপনার দ্বিমত রয়েছে কি?

হ্যাঁ না

১১. আপনি কি মনে করেন ধর্মের মৌলিক বিষয়াদি যদি নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে হয় এবং সেখানে নারীর অধিকার ও মর্যাদা নিশ্চিত করার নির্দেশনা থাকে তবে তার ভিত্তিতে জেন্ডার ইস্যু ও কার্যক্রম গ্রহণ করত পারে?

হ্যাঁ না

১২. আপনার আর কোন মতামত থাকলে তা উল্লেখ করতে পারেন-

স্বাক্ষর

নাম:

তারিখ:

Dhaka University Institutional Repository

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ অনুগ্রহ পূর্বক আপনার বক্তব্য সুদৃঢ় ভাবে উল্লেখ করুন। অতিরিক্ত বক্তব্য থাকলে ভিন্ন কাগজ ব্যবহার করতে পারেন।

"বাংলাদেশে নারী মুক্তির ক্ষেত্রে জেন্ডার ও ধর্মের অবস্থান - একটি বিশ্লেষণ" - নামীয় গবেষণা কার্যক্রমের আওতায় তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রশ্নমালা-

প্রশ্নমালা - ২

সাক্ষাৎ দাতার নামঃ -- ------

পিতার নামঃ--

মাতার নামঃ--

যে মসজিদের / সংস্থার সাথে আপনি সম্পৃক্ত তার নাম ঃ---

পদবী ঃ --

ঠিকানা ঃ ---

(অনুগ্রহ পূর্বক নিচের প্রশ্ন গুলোর ক্ষেত্রে আপনার মতামত হ্যাঁ কিংবা না এর মাধ্যমে দিন। যদি আপনি অতিরিক্ত কিছু বলতে চান তবে প্রশ্ন পত্রের নীচে সংরক্ষিত স্থানে প্রশ্নের নম্বর উল্লেখ করে উত্তরের সাথে আপনার বিস্তারিত বক্তব্য লিখে দিতে পারেন। প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজও ব্যবহার করতে পারেন।)

১. বাংলাদেশে নারীদের উন্নয়নের জন্য, নারী-মুক্তি অর্থাৎ নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক ভাবে প্রতিষ্ঠিত জেন্ডার ইস্যু সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে কার্যক্রম চলছে তা-তো সত্যি?

হ্যাঁ   না

২. জেন্ডার ইস্যু বিষয়ক চিন্তা ধারায় নারী-পুরুষের সমান অধিকার নিশ্চিত করার কথা বলে এবং সে লক্ষ্যে বাংলা দেশে গৃহীত হচ্ছে প্রচুর উদ্যোগ-

হ্যাঁ   না

৩. বাংলাদেশ সহ বিশ্ব জুড়ে নারী মুক্তি/ নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য লক্ষ্যে জেন্ডার ইস্যু প্রচুর অবদান রাখছে। তার পরেও নারীদের সত্যিকার অর্থে মুক্তি ঘটছে কি? নারীরা নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা পাচ্ছে কি ?

হ্যাঁ   না

৪. নারী নির্যাতনের ক্ষেত্রে ধর্মকে ব্যবহার করা হচ্ছে যুগ যুগ ধরে; এ ক্ষেত্রে ধর্মের মৌলিক বিষয় নয় বরং ব্যবহৃত হচ্ছে ধর্মে অনুপ্রবেশ করা কুসংস্কার / অপব্যাখ্যা সমূহ-

হ্যাঁ   না

Dhaka University Institutional Repository

৫. নারীর অধিকার ও মর্যাদার ক্ষেত্রে ধর্মের মৌলিক বিষয়ে যদি সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা থেকে থাকে তবে তা গ্রহণের ক্ষেত্রে আপনার দ্বিমত রয়েছে কি?

হ্যাঁ না

৬. আপনি কি মনে করেন ধর্মের মৌলিক বিষয়াদি যদি নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে হয় এবং সেখানে নারীর অধিকার ও মর্যাদা নিশ্চিত করার নির্দেশনা থাকে তবে তার ভিত্তিতে জেন্ডার ইস্যু ও কার্যক্রম গ্রহণ করত পারে?

হ্যাঁ না

৭. বিদায় হজ্বে মহানবী হযরত মুহম্মদ(স:) নারী জাতির মর্যাদা রক্ষার্থে যে নির্দেশনা দিয়েছেন তা হলো 'জানিও তোমাদের স্ত্রীদের প্রতি তোমাদের যেরূপ দাবী দাওয়া ও স্বত্বাধিকার আছে তোমাদের উপরও তাদের সেরূপ দাবী-দাওয়া ও স্বত্বাধিকার রয়েছে। মহানবী (স:) এই নির্দেশ পবিত্র কুরআনের সুরা বকারের ২২৮ নং আয়তের যেমন "আর নারীর উপর পুরুষের যে রূপ অধিকার রয়েছে পুরুষের উপরও নারীর সেরূপ অধিকার রয়েছে" সাথেই তো সম্পৃক্ত তাই নয় কি?

হ্যাঁ না

৮. আপনি কি মনে করেন নারী নির্যাতনের ক্ষেত্রে যদি ধর্মকে ব্যবহার করা হয় সে ক্ষেত্রে ধর্মের মৌলিক বিষয় নয় বরং ধর্মের নামে কুসংস্কার / অপব্যাখ্যার মাধ্যমেই তা করা হয়-

হ্যাঁ না

৯. নারীর অধিকার ও মর্যাদার ক্ষেত্রে ধর্মের মৌলিক বিষয়ের সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা সমাজে অনুসরণ করা আবশ্যক-

হ্যাঁ না

১০. আপনি কি মনে করেন ধর্মের মৌলিক বিষয়াদি নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে? এবং সেখানে নারীর অধিকার ও মর্যাদা নিশ্চিত করার নির্দেশনা রয়েছে। তা হুবহু অনুসরণ করা হলে সমাজ থেকে নারী নির্যাতন নির্মুল হবে অনেক সহজে -

হ্যাঁ না

১১. আপনার আর কোন মতামত থাকলে তা উল্লেখ করুন-

স্বাক্ষরঃ --------------------

নামঃ

তারিখঃ

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ অনুগ্রহ পূর্বক আপনার বক্তব্য সুদৃঢ় ভাবে উল্লেখ করুন। অতিরিক্ত বক্তব্য থাকলে ভিন্ন কাগজ ব্যবহার করতে পারেন।

"বাংলাদেশে নারী মুক্তির ক্ষেত্রে জেন্ডার ও ধর্মের অবস্থান - একটি বিশ্লেষণ" - নামীয় গবেষণা কার্যক্রমের আওতায় তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রশ্নমালা-

(প্রশ্নমালা - ৩)

সাক্ষাৎকার দাতার নাম : --

পিতা/স্বামীর নাম :-------------------------------------

কর্মজীবি হলে পদবী : ---

ঠিকানা : ---

(অনুগ্রহ পূর্বক নিচের প্রশ্ন গুলোর ক্ষেত্রে আপনার মতামত হ্যাঁ কিংবা না এর মাধ্যমে দিন। যদি আপনি অতিরিক্ত কিছু বলতে চান তবে প্রশ্ন পত্রের নীচে সংরক্ষিত স্থানে প্রশ্নের নম্বর উল্লেখ করে উত্তরের সাথে আপনার বিস্তারিত বক্তব্য লিখে দিতে পারেন প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজও ব্যবহার করতে পারেন।)।

১. আপনার শরীরে নির্যাতনের যে চিহ্ন দেখা যাচ্ছে সে গুলো দয়া করে উল্লেখ করুন -
----

----

২. আপনাকে এ ধরনের নির্যাতন কে করেছে? (টিক চিহ্ন দিন)

স্বামী/ শাশুড়ী/ দেবর/ননদ/ বাবা/ ভাইবোন/ পাড়া-প্রতিবেশী।

৩. আপনি কি মনে করেন আপনাকে নির্যাতনের অধিকার তার রয়েছে?

হ্যাঁ না

৪. সেকি মনে করে ধর্মই তাকে এ ধরনের নির্যাতনের অধিকার দিয়েছে?

হ্যাঁ না

৫. আপনি কেন সহ্য করেছেন? প্রতিবাদ করেননি কেন? আপনিও কি মনে করেন ধর্মই তাকে এ ধরনের নির্যাতনের অধিকার দিয়েছে।

হ্যাঁ না

৬. আপনি তার বিরুদ্ধে কোন মামলা করেছেন কি?

হ্যাঁ না

৭. স্বামী/ মুরব্বীদের বিরুদ্ধে অন্যায়ের বিরুদ্ধে মামলা করলে আপনি গুনাহগার হবেন এরূপ ভয় করেন কি?

হ্যাঁ না

৮. আপনার আর্থিক সঙ্গতি থাকলে আপনি তা সহ্য করতেন কি?

হ্যাঁ না

৯. জেন্ডার ইস্যুর নাম শুনেছেন কি?

হ্যাঁ না

১০. জেন্ডার ইস্যুর আওতায় সরকারের কার্যক্রম আপনার এলাকার যেখানে পরিচালিত হয় সেখানে কোন নালিশ করেছেন কি?

হ্যাঁ না

১১. কখনও পবিত্র কুরআন এবং হাদিস পড়াশুনার সুযোগ হয়েছে কি?

হ্যাঁ না

১২. আপনি জানেন কি ধর্মের মূল আদর্শ নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে? সেখানে নারীকে তার অধিকার ও মর্যাদা দেওয়ার নির্দেশ রয়েছে?

হ্যাঁ না

১৩. ধর্ম কে যথাযথ ভাবে অনুসরণ করা হলে সমাজ থেকে নারী নির্যাতন কমে যাবে কি?

হ্যাঁ না

১৪. আপনি কি মনে করেন ধর্মের মুল বিষয়াদি সকলের জানা থাকা প্রয়োজন? তাহলে সমাজ ও অনেক বেশী পরিশুদ্ধ হবে?

হ্যাঁ না

১৫. আপনি জানেন কি নারীদের আর্থিক সঙ্গতি লাভের জন্য তার হালাল উপার্জনে ধর্মে কোন বাধা নেই?

হ্যাঁ না

১৬. আবার আপনার স্বামী/ নির্যাতনকারী দের কাছে ফেরত যাবেন কি?

হ্যাঁ না

১৭. আপনার আর কোন মতামত থাকলে তা উল্লেখ করুন-

স্বাক্ষর/টিপসই---------------------------------

নামঃ

তারিখঃ

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ অনুগ্রহ পূর্বক আপনার বক্তব্য সুদৃঢ় ভাবে উল্লেখ করুন। অতিরিক্ত বক্তব্য থাকলে ভিন্ন কাগজ ব্যবহার করতে পারেন।